উত্তরাধিকার

বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ

সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত

বুদ্ধদেব বসুর
জন্মশতবর্ষে

বাংলা একাডেমীর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

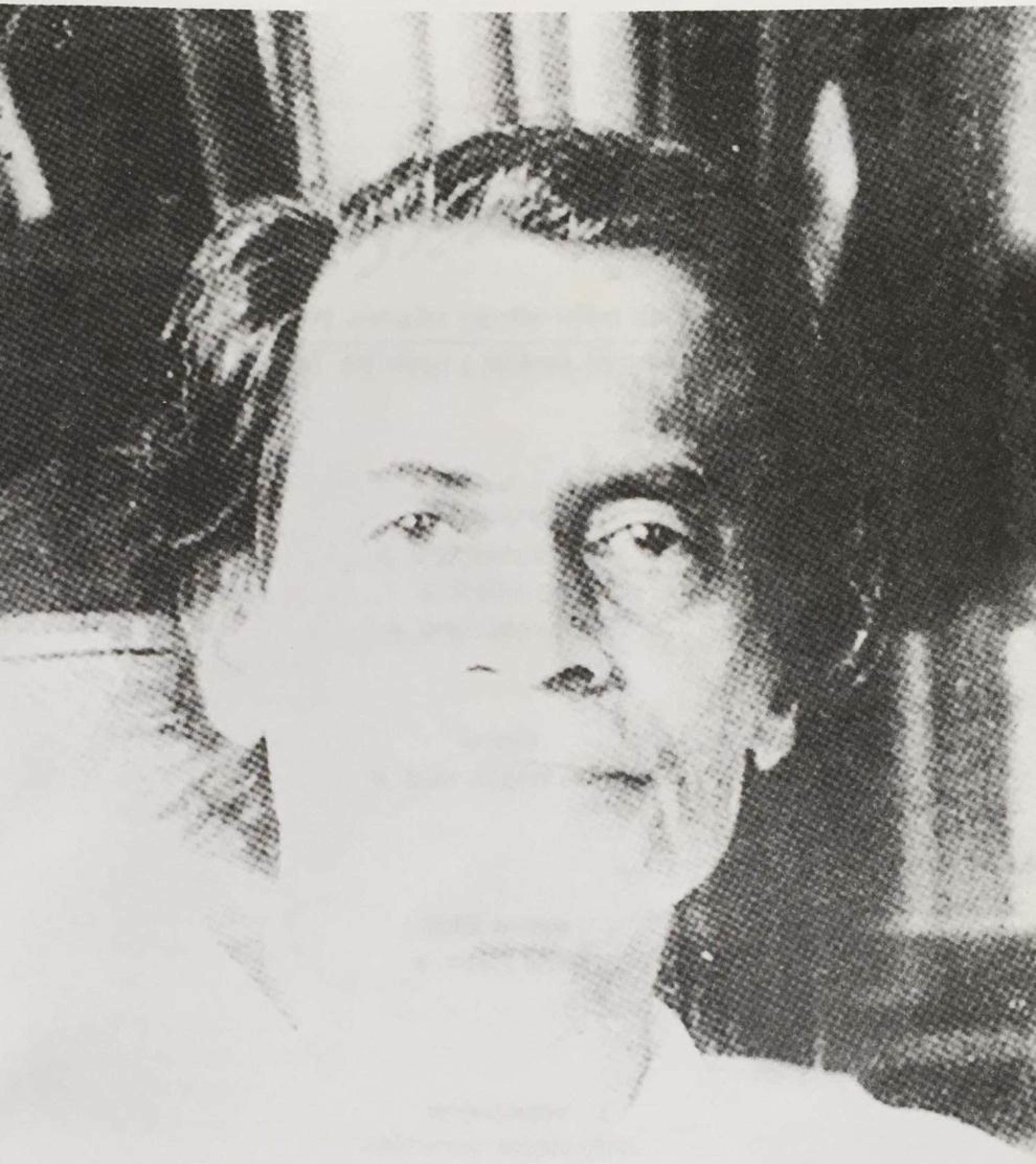

জন্ম : ১৯০৮

মৃত্যু : ১৯৭৪

সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার
ঢাকা

উত্তরাধিকার

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. সৈয়দ আকরম হোসেন
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
ড. সৈয়দ আজিজুল হক

সম্পাদক
ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

নির্বাহী সম্পাদক
ড. সরকার আমিন

সম্পাদনা-সহায়ক
কাজী রুমানা আহমেদ সোমা
এ. কিউ. এম. মাসুদ আলম

বাংলা একাডেমী

উত্তরাধিকার

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
৩৬ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ ১৪১৫ ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
[বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা]

বাএপ ৬৬৪
[২০০৮–২০০৯ ॥ ভাসাসপ : পত্রিকা : ৬]

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল হাই
পরিচালক
ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

লোগো
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ
রাজিব রায়

মূল্য : তিনশত টাকা

UTTARADHIKAR : Literary Quarterly Vol-4 : Year 36 (October - December 2008). Editor : Dr. Syed Mohammad Shahed, Executive Editor : Dr. Sarker Amin. Published by Bangla Academy Dhaka-1000, Bangladesh. Price : Taka Three Hundred only.

উত্তরাধিকার

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ১৪১৫/ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ

সূচিপত্র

আবু তাহের মজুমদার
বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ ১

আবু দায়েন
'ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা' : বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচৈতন্য ২৬

আবুল আহসান চৌধুরী
বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত পত্রাবলি ৩৪

আমিনুর রহমান সুলতান
বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বাংলাদেশ ৪৭

আলফ্রেড খোকন
কার কবি বুদ্ধদেব বসু ৫৭

আলম তালুকদার
বুদ্ধদেব বসুর কিশোর কবিতা ও ছড়া সাহিত্য ৬১

আল মাহমুদ
কবিদের কবি ৬৬

আল মুজাহিদী
পুরানা পল্টন থেকে কবিতা ভবন ৬৮

আহমেদ মাওলা
পরিব্রাজক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য ৭২

ইকবাল আজিজ
বাঙালির আধুনিক সাহিত্যরুচির অন্যতম রূপকার বুদ্ধদেব বসু : কিছু প্রশ্ন ৭৮

এজাজ ইউসুফী
উত্তর-আধুনিকতা তত্ত্ব ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ৮৪

ওবায়েদ আকাশ
অন্ত্যজগাথা, মানবিকবোধের প্রগাঢ় সুরভি ১০০

ওমর কায়সার
বুদ্ধদেব বসুর চোখে রামায়ণ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর-সাধক ১০৩

কামরুল হাসান
আধুনিকতার নান্দীপাঠ ১১১

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
আত্মতার বন্দীই মূলত ১২০

গাউসুর রহমান
বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নির্মাণ-শিল্প ১৩১
তপন বাগচী
বাংলাদেশ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বুদ্ধদেবচর্চা ১৩৬
তারেক রেজা
বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে ঢাকা শহর ১৪৪
নির্মলেন্দু গুণ
বুদ্ধদেব বসুর ভালো-মন্দ ১৫৭
ফরিদ আহমদ দুলাল
বুদ্ধদেব বসু : নিভৃতির ছায়ায় উজ্জ্বল বাতিঘর ১৬০
ফেরদৌস মাহমুদ
বুদ্ধদেব বসুর ‘পুনর্মিলন’ নাটকে সার্ত্রের ছায়া ১৬৯
বিশ্বজিৎ ঘোষ
বুদ্ধদেব বসু : শতবার্ষিক অবলোকন ১৭৭
বেগম আকতার কামাল
বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতার শত্রু ও মিত্র : একটি খোলা চিঠি’র উত্তর ১৮৪
বেলাল চৌধুরী
বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যের কষ্টিপাথর ২০৩
ভীষ্মদেব চৌধুরী
বুদ্ধদেব বসুর ‘নির্জন স্বাক্ষর’ : মৃত্যু ও স্তব্ধতার কথামালা ২১৩
মহি মুহাম্মদ
বুদ্ধদেব বসুর গল্প : রোমান্টিক চেতনার চালচিত্র ২২৪
মাসুদুল হক
বুদ্ধদেব বসু’র কাব্যে নন্দনচিন্তা ২৩১
মাহফুজা হিলালী
চিঠির বুদ্ধদেব বসু ২৪১
মাহবুব সাদিক
বুদ্ধদেব বসু : কবিতার প্রকরণ ২৬১
মাহবুব হাসান
দ্রোহী-দ্রষ্টা বুদ্ধদেব বসু ২৭০
মাহমুদ কামাল
দ্বিতীয় পাঠের তিথিডোর ২৭৭
মুজিবুল হক কবীর
বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ ২৮১
মুশাররাফ করিম
কাব্যপ্রতিভূ বুদ্ধদেব বসু ২৯১
মুহম্মদ মুহসিন
নীলাঞ্জনের খাতা : অস্তিত্ববাদের জানালা থেকে একটি দৃষ্টিপাত ২৯৭
মোস্তাক আহমাদ দীন
বুদ্ধদেবের সম্ভব অসম্ভবের গান ৩০৫

শান্তনু কায়সার
অতি রাবীন্দ্রিক, না রবীন্দ্রবিরোধী ৩১৫
শামীম রেজা
কালের সম্পাদক, বুদ্ধদেব বসু ও কিছু প্রশ্ন ৩২৫
শাহজাহান হাফিজ
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক কালসন্ধ্যা ৩৩৪
শিহাব সরকার
বুদ্ধদেব বসুর গদ্য সুষমা ৩৫০
সিরাজ সালেকীন
প্রেমকথার ছেলেমানুষি ৩৫৬
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা ৩৬০
সৌভিক রেজা
বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-ভাবনা ৩৭৩
সৌমিত্র দেব
বুদ্ধদেব বসুর পৃথিবীর পথে ৩৮৩
হাবীবুল্লাহ সিরাজী
মহাভারতের কথা : বুদ্ধদেব-দর্শন ৩৮৬
হেনরী স্বপন
বুদ্ধদেব বসু : লালমেঘে চিত্রকল্পের ক্যানভাস ৩৯১

পুনর্মুদ্রণ

অমিয় দেব
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য ৩৯৫
অরুণকুমার সরকার
বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ ৪০৬
আবদুল কাদির
বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ ৪১১
কমলেশ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : রূপে ও রূপকল্পে ৪২৮
কুমার রায়
এক ক্রান্তিকাল ও বুদ্ধদেবের চারটি কাব্যনাটক ৪৩৯
জগন্নাথ ঘোষ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু ৪৪৯
জীবনানন্দ দাশ
দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণের প্রতি ৪৫৪
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু ৪৫৬

নীলিমা ইব্রাহিম
চিত্ত-সত্তায় বুদ্ধদেব বসু ৪৬১
প্রবুদ্ধ বাগচী
'কবিতা'র কথা ৪৭০
প্রবোধচন্দ্র সেন
বাংলায় মহাভারত-চর্চা ৪৭৯
বিজয়া মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসুর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও মেঘদূত প্রসঙ্গ ৪৮৪
মানসী দাশগুপ্ত
সেই সব দিন সাক্ষীর আত্মকথা ৪৮৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নবীন কবি ৪৯৩
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি ৪৯৫
শঙ্খ ঘোষ
ছন্দের বারান্দা ৪৯৬
শামসুর রাহমান
বুদ্ধদেব বসুর প্রতি ৫০৪
শ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু ও মহাভারতের কথা ৫০৬
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
অশ্লীলতার কাব্য ৫২৭
সন্তোষকুমার ঘোষ
সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব ৫২৯
সুভাষ ভট্টাচার্য
বুদ্ধদেব বসুর বানাননীতি ৫৩৫
সিকদার আমিনুল হক
বুদ্ধদেব বসু : কবি ৫৪২

বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে

কবিতা

একখানা হাত ৫৫১
কঙ্কাবতী ৫৫৩
অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট ৫৫৬
আকাশ-স্বপ্ন ৫৫৭
ইলিশ ৫৬০
চাঁদ ও তুষার ৫৬১
তিথিডোর ৫৬২
দ্রৌপদীর শাড়ি ৫৬৪

নিজের কবিতার প্রতি ৫৬৬
পুনরুজ্জীবন ৫৭০
বিবাহ ৫৭২
মোহমুক্ত ৫৭৩
সন্ধ্যায় ৫৭৬
সন্ধ্যায় শান্তি ৫৭৭

প্রবন্ধ

আমার যৌবন ৫৭৯
জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে ৫৮৮
নোয়াখালী ৬০১
পুরানা পল্টন ৬০৭
বাথরুম ৬১৩
রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী ৬১৮
রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য ৬২৫
স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা ৬৩৩
সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্ ৬৪১

গল্প

আমরা তিনজন ৬৪৯

নাটক

কাঠঠোকরা ৬৭০

চিঠি

অমৃত প্রসাদ : বাবার চিঠি, দময়ন্তী বসু সিংহ ৬৯৩
বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, নরেশ গুহকে লেখা ৭০৬
বুদ্ধদেব বসুকে লেখা জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত চিঠি ৭১১

বুদ্ধদেব বসু : জীবনকথা ও গ্রন্থপঞ্জি ৭১৩

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

উত্তম দাশ (সম্পাদক) : *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব*, কলকাতা : ২০০৮
শুভাশিস চক্রবর্তী (সম্পাদক) : *অহর্নিশ* (বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা), কলকাতা : ২০০৮
মানব চক্রবর্তী (সম্পাদক) : *জলার্ক* (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), কলকাতা : ২০০৮
জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পাদক) : *কলকাতা* (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), কলকাতা : ২০০২
উত্তরাধিকার (সম্পাদক : নীলিমা ইব্রাহিম, নির্বাহী সম্পাদক : রফিক আজাদ), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৪
বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

এ পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার মতামত, মন্তব্য, ভাবনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণত লেখকের – বাংলা একাডেমীর নয়।

সম্পাদকীয়

'উত্তরাধিকার'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে প্রকাশিত হলো । এটিকে ১৯৭৪ সালে বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'উত্তরাধিকার'-এর উত্তরসূরি বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার জন্য বুদ্ধদেব বসু স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তনে বুদ্ধদেব বসু পালন করেছেন অনন্যসাধারণ ভূমিকা। পাশাপাশি কথাসাহিত্য, অনুবাদ, সৃজনশীল সমালোচনা, ভ্রমণসাহিত্য, সম্পাদনা— সর্বত্রই তাঁর প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত। বাংলাদেশের জীবন ও জনপদের সঙ্গেও তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন। জন্মেছিলেন তিনি বাংলাদেশে, জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এদেশে, পড়ালেখা করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা শহরেও তাঁর স্মৃতি চির-উজ্জ্বল। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতায় নিরলস কাজ করেছেন। শত প্রতিকূলতা, আর্থিক বিপর্যয়, চাকরিগত অনিশ্চয়তা এবং বৈরী প্রতিবেশ অতিক্রম করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতির্ময় এক প্রতিষ্ঠান।

'উত্তরাধিকার'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় দেশের সৃষ্টিশীল ও মননশীল ধারার পঁয়তাল্লিশ জন লেখকের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁরা বুদ্ধদেব-মূল্যায়নে এগিয়ে এসেছেন। এই আন্তরিক সহায়তার জন্যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশেষ সংখ্যাটিকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় এ যাবৎ প্রকাশিত বুদ্ধদেব-সাহিত্য মূল্যায়ন-বিষয়ক বাইশটি নির্বাচিত রচনা পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। পুনর্মুদ্রিত লেখাগুলো বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পাঠকচিত্তে একটি সামগ্রিক বোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, বুদ্ধদেব বসুর প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু রচনাও পত্রিকায় রয়েছে।

পত্রিকায় রচনাগুচ্ছ বিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক-নামের বর্ণ-ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। সার্বিক সহযোগিতার জন্য উপদেষ্টা সম্পাদকবৃন্দের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ

আবু তাহের মজুমদার

বিচ্ছিন্নতাবোধ বুদ্ধদেব বসুর কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার উপন্যাস এবং ছোটগল্পেও বিচ্ছিন্নতাবোধের উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। তার আত্মজীবনী এবং চিঠিপত্র পাঠ করলেও বিচ্ছিন্নতাবোধের অনেকগুলো কারণের সঙ্গেই পাঠকেরা পরিচিত হবেন। আলোচ্য নিবন্ধে কবিতায় তার বিচ্ছিন্নতাবোধের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে নিবন্ধটিকে ৬টি অংশে ভাগ করা হয়েছে : (১) বিচ্ছিন্নতাবোধ – সংজ্ঞা ও বিকাশ; (২) বুদ্ধদেব বসুর জীবনালেখ্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ; (৩) বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য জীবন ও বিচ্ছিন্নতাবোধ; (৪) বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে যৌন চেতনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ; (৫) বিদেশী সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও বিচ্ছিন্নতাবোধ; (৬) বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ।

১.

বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি মানসিক অবস্থা। ছোটবেলা থেকেই চাওয়া-পাওয়ার দ্বৈরথ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের অঙ্কুরোদগম এবং ক্রমবিকাশ হতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং এর ফলশ্রুতিতে অঙ্কুরিত এবং বিকশিত হতে থাকে জীবনব্যাপী নিজের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিভিন্ন এবং বিচিত্র মাত্রার বর্ণগন্ধ এবং সংরাগের দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ। দ্বন্দ্ব ভেতরের এবং বাইরের। যারা কোন-না-কোন মাত্রায় আত্মজয়ী হতে পারে এবং সংযত ও সংহত জীবনযাপন করতে পারে তারা এসব দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমঝোতার ভিত তৈরি করে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে পারে। যারা একটু বেশিমাত্রায় সংবেদনশীল তারা কোন-না-কোনভাবে বেসামাল হয়ে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সঙ্কটে পড়ে, টুটে যায় সংযম ও সংহতির বাঁধন এবং পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাদের ব্যক্তিত্বের ও মানসের বিশেষ বিশেষ প্রবণতাগুলো, যার একটি হচ্ছে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত, বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মধ্যে এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বোধের প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্নমাত্রায়। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করে যে তারা প্রত্যেকেই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। আবেগ-অনুভব-প্রেম-ভালবাসা এবং হিংসা ও বিদ্বেষ এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই অবধারিতভাবেই স্বতন্ত্র ও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। পারস্পরিক সম্পর্ক, সে রক্তেরই হোক বা বন্ধুত্বেরই হোক, যতই নিবিড় হোক বা শিথিল হোক, সংলগ্নতার কখনো একান্ত একাত্মতায় উত্তরণ ঘটেনা। সচেতনতার মাত্রা যা-ই হোক না কেন বিচ্ছিন্নতার সংক্রমণ থেমে থাকে না। ঘরে-বাইরে, পথে ঘাটে বা এখানে সেখানে যখনি কাউকে বলতে শোনা যায় 'কিছুই ভাল লাগছেনা', 'কিছুই ভাল লাগে না', 'জীবনটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে বা কেমন হয়ে গেল', 'এ সংসারে কে কার'; কিংবা

"জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে, চিরদিন ধরে দিবসের পিছে,
সমস্ত ধরাময়।"[১]

তখনি বুঝতে হবে যাদের মুখে একথাগুলো ধ্বনিত হলো তারা সবাই বিচ্ছিন্নতাবোধের অসহায় শিকার। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারাটি বয়ে চলেছে মানবসমাজের মধ্য দিয়ে : "the whole of history up to now has been a history of man's self-alienation"।[২] সভ্যতার শুরু এবং বিকাশ বিচ্ছিন্নতাবোধের কোন অবসান না ঘটিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বরং এর সূক্ষ্মতা এবং তীব্রতার বিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। নানা রকমের সংঘাত এবং ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে নিক্ষেপ করছে অভাবিতপূর্ব সব পরিস্থিতির আবর্তে, মানুষ পড়ছে অস্তিত্ব সঙ্কটে এবং হয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন।

সভ্যতার উদ্ভব এবং বিকাশ জীবনকে ক্রমাগত জটিলতার একটি আবর্ত থেকে আরেকটি আবর্তে নিক্ষেপ করে চলেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবোধকেও করে চলেছে বহুমাত্রিক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের সাহিত্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সব যুগের সাহিত্যেই বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায়। যখন সাহিত্য ছিল না তখনও বিচ্ছিন্নতাবোধ ছিল, কারণ এই বোধ যাপিত জীবনেরই একটি অংশ। অস্তিত্ব সঙ্কটও ছিল, কারণ তা'ও যাপিত জীবনেরই অংশ। তবে সাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়ে স্থায়ী বিবরণের রূপ লাভ করেছে। এসব বিবরণ পর্যালোচনা করলে এটিই প্রতিভাত হয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বা আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধের গুণগত এবং মানগত পরিবর্তন হয়েছে এবং এ ধরনের পরিবর্তন থেকে উদ্ভব হয়েছে অনেক তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকের, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। জটিলতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিকেরা তার ব্যাখ্যা ও নিদান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এক্ষেত্রে ইউরোপই পালন করেছে সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও রূপায়নে উজ্জ্বলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবোধের তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে দার্শনিক প্রথম দর্শনভিত্তিক অবদান রাখেন তিনি হলেন হেগেল, তার সঙ্গে যুক্ত হন ফয়ার বাখ্ এবং কার্ল মার্ক্স। তাদের বিশ্লেষণমূলক বিবরণ থেকেই শুরু হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত হাল আমলের সব রকমের দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা। তবে বিচ্ছিন্নতাবোধের মূর্ত প্রতীক ছিলেন আজীবন দুঃখবাদী এবং দুঃস্বপ্নতাড়িত শপেনহাওয়ার। এরপর কির্কেগার্ড থেকে শুরু করে আরও অনেক দার্শনিক এবং লেখক বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেন। তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয়েছে অনেক শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলনেরও, যেমন– দাদাইজম, ইম্প্রেশানিজম, এক্সপ্রেশানিজম, রিয়েলিজম, Futurism, ইত্যাদি। এসব আন্দোলনও বিচ্ছিন্নতাবোধের ওপর গভীরভাবে আলোপাকত করে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিসত্ত্বার প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচ্ছিন্নতাবোধের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা গভীর থেকে গভীরতর এবং ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। কবি জীবনানন্দের মত বুদ্ধদেব বসুও উপরে উল্লিখিত পাশ্চাত্য দর্শন এবং শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

শিল্পীরা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশিমাত্রায় সচেতন, সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াপরায়ণ। তাই তাদের শিল্পকর্মে, বিশেষ করে সাহিত্যে, বিচ্ছিন্নতাবোধ যে রকমভাবে চিত্রিত হয় সেভাবে অন্যকোন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয় না। দেশ-বিদেশের সাহিত্যে এর রূপায়ণ তাই পাঠক চিত্তকে আলোকিত, আন্দোলতি, শিহরিত এবং অভিভূত করে।

নানাভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকেরাও বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যাপারে শুধু সচেতনই হননি, বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্তও হয়েছেন এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্যে এর প্রতিফলন নির্ভুল।[৩] আমাদের প্রধান কবিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের উপস্থিতি ছিল তীব্র মাত্রায়। আর্থ-সামাজিক এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্কটের জন্য মাইকেল মধুসূদনও ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবোধের অসহায় শিকার। তাই দেখা যায় "জীবনের অন্তিম সময়ে রোগশয্যাশায়ী মধুসূদন মৃদুস্বরে আবৃত্তি করছিলেন সেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের এই কয়েকটি পঙ্ক্তি–

Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more : It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
signifying nothing."[৪]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মম নিষ্পেষণই তাকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও অন্তঃসারশূন্যতার বাণীবহ এই পঙ্ক্তিগুলো উচ্চারণের পথে তাড়িত করে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল যন্ত্রণাক্লিষ্ট। প্রবলভাবে জীবনবাদী হলেও বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকেও জীবনের সবপথে ছাড় দেয়নি। তাইতো তিনি দীপ্তস্বরে–

"কিসের তরে অশ্রুঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।"[৫]

এরকম সংগ্রামী উচ্চারণ করার পর বলতে বাধ্য হন–

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপনা গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনীরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহ চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।"[৬]

এখানে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাজর্জর জীবনে চাওয়া-পাওয়ার যে অমোঘ-কঠোর দ্বান্দ্বিকতার আলোকে আশা ভঙ্গের বেদনার্ত উচ্চারণ করেছেন তা বিচ্ছিন্নতাবোধেরই দ্যোতক হিসেবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। সে যাই হোক, পূর্বপূরি কবিদের প্রভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিধ্বংসী প্রভাব, পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও ব্যাপক এবং সংক্রামক প্রভাব, দেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিষক্রিয়া, ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও পরিস্থিতি, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, নিশ্চিত চাকরির কোন চেষ্টা না করে লেখার ওপর নির্ভরশীল অনিশ্চয়তাভরা জীবন বেছে নেওয়া– ইত্যাদি বুদ্ধদেব বসুর জীবনকে আক্রান্ত করে বিচ্ছিন্নতাবোধের সুতীব্র জ্বালায়। বস্তুত কল্লোল যুগের প্রায় সব কবিই কোন-না-কোন মাত্রার বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন। এই ঘরানার কবিরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত,

জগদীশ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেন। তবে আজীবন বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার ছিলেন জীবনানন্দ দাশ - *ঝরা পালক*-এর বিবর্ণ আকাশতলে যার কবি জীবনের শুরু এবং শেষ পর্যন্ত যার যাত্রা শেষ কুয়াশা-অনিশ্চিত প্রায়ান্ধকার ভোরে ট্রামের চাকার নিচে। অন্য কবিরা একাধারে বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার এবং জীবনবাদীও। একমাত্র জীবনানন্দের জীবনই কোনদিন তার মুখের সামান্য হাসির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়নি।

জীবনানন্দের মতো বুদ্ধদেব বসুও ছিলেন 'ঘরকুনো' এবং 'অনমনীয়' কিন্তু জীবনবাদী। জীবনানন্দ যেখানে ঘর থেকে বের হতে চাইতেন না এবং লোকজনকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন, বুদ্ধদেব বসু সেখানে ঘর থেকে বেরও হতেন এবং ছিলেন আড্ডাবিলাসীও।[৭] কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই তার ভেতরে বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ এসে পড়ে অদৃষ্টপূর্ব এবং অভাবিতপূর্ব পারিপার্শ্বিকতা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হবার পর চাকরি জীবনে নানা টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ হয় প্রবল থেকে প্রবলতর এবং গভীর থেকে গভীরতর। এখানে তার জীবন ও জীবন সংগ্রামের ওপর দৃষ্টিপাত করলেই তার জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

২.

কবি জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবন তথা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে রকম নিহিত ছিল তার বিচ্ছিন্নতাবোধের যাবতীয় বীজ, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত জীবন এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই নিহিত ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ। একদিক দিয়ে বিচার করলে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের শুরুটা ছিল অনেক বেশি করুণ এবং মর্মস্পর্শী। কারণ "পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান তাঁর মা বিনয় কুমারী ১৬ বছর বয়সে প্রথম ও একমাত্র সন্তান জন্মদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধনুষ্টকার রোগে মারা যায়।"[৮] বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন, 'তাঁর (মায়ের) মৃত্যুই আমার নামকরণের কারণ।"[৯]

শুরু থেকেই জীবনানন্দের চাকরি জীবন ছিল অত্যন্ত বিড়ম্বিত এবং অনিশ্চিত। সারা জীবনই তাকে অর্থনৈতিক সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে হয়েছে। চাকরি পেয়েছেন হারিয়েছেন। নিজে ছেড়েছেনও। বুদ্ধদেব বসুও একইরূপ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে চাকরি জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি ১৯৩৪-এ কলকাতার রিপন কলেজে বাড়তি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু "দিলীপ রায়ের সহায়তা না পেলে বুদ্ধদেবের অসুবিধা হতো– তখন কলকাতায় ঢাকার ডিগ্রির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল।

... কলেজের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তার প্রতি যে অবিচার করেছিলেন তার তুলনা হয় না, ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ কণ্ঠ নতুন অধ্যাপককে সবচেয়ে বাজে ক্লাসগুলি দেওয়া হতো। ... বুদ্ধদেবের অস্বস্তির সীমা ছিল না। উচিত কাজ হতো তাকে ছোট ছোট অনার্স ক্লাসগুলি দেওয়া ...

আমার মনে হয়েছে যে রিপন কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেবের কাছে শিক্ষা বৃত্তিতেই অনীহা এনে দিয়েছিল। ওকে দিনাজপুরের শাখা কলেজে পাঠাবার কথা যারা ভেবেছিলেন তাদের দুর্মতির কথা মনে পড়লে অবাক হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেব পদত্যাগ করলেন।"[১০]

১৯৫৪ সালে তাকে কলকাতার দৈনিক দি স্টেটস্ম্যান পত্রিকার ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে চাকরি নিতে হয়। ১৯৪৯ সালে তাকে এই পত্রিকাতেই নিযুক্ত করা

হয় তৃতীয় সম্পাদকীয় রচনার চাকরিতে। ১৯৫১ সালে তিনি এই চাকরি ছেড়ে দেন। এসব করেও তিনি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছেন, এক দারুণ অর্থ সঙ্কটের সময় তিনি নিরুপায় হয়ে সে সময়ে ভারতের সংস্কৃতিবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরকে স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করে একটি চিঠি লিখতে বাধ্য হন। হুমায়ুন কবির সেই যাত্রায় তাকে উদ্ধার করেন ইউনেস্কোর একটি প্রকল্পের সঙ্গে ছয় মাসের জন্য যুক্ত করে দিয়ে।[১১] দেখা যাচ্ছে যে অর্থকষ্টের দারুণ যন্ত্রণা বুদ্ধদেব বসুকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। তবে শুরু থেকেই স্বীয় মেধার গুণে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় ফলাফল অত্যন্ত ভালো হওয়ার ফলে তার সম্মুখের অনেক সুযোগের দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকায় অধ্যাপনা করার একটি দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌সবার্গের পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন-এ শিক্ষক নিযুক্ত হন। এবং বেশ সাফল্যের সঙ্গেই স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যান। এ সময়টায় বুদ্ধদেব বসু কেন যে, শত অভাব অনটন সত্ত্বেও, সঞ্চয় করার মনোবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হননি তা বলা মুশকিল। জীবন পথের বন্ধুরতার অভিজ্ঞতায় তিনি যে খুব কম সমৃদ্ধ ছিলেন তা কিন্তু বলা যাবে না। তার কর্মজীবনের প্রথম পর্ব ১৯৩১ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পুরো সময়টাই ছিলো অর্থনৈতিকভাবে কন্টকাকীর্ণ। এই সম্পর্কে তার বন্ধু সহকর্মী অধ্যাপক সুবীর রায় চৌধুরীর মন্তব্য আলোকপ্রদ। বুদ্ধ দেবের কলকাতা জীবনের শুরু থেকেই তার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে চৌধুরী লিখেছেন–

> “কলিকাতায় তিনি চলিয়া আসেন প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থাতে। এই মহানগরে তিনি বৃহত্তর মুক্তির স্বাদ পাইলেন ঠিকই, কিন্তু তাহার জীবনযাত্রা মসৃণ ছিল না। তিনি অবিরত সংগ্রাম করিয়াছেন নিজেকে পেশাদার লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। অচিন্ত্য কুমারের [সেন গুপ্ত] সৌজন্যে কলিকাতায় পৌছাইবার পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি টিউশনি নির্দিষ্ট ছিলো – ছাত্র হইলেন পরবর্তীকালে ‘সিগনেট প্রেস’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক দিলীপ কুমার গুপ্ত। কিন্তু তাঁহার রোজগারের প্রধান অবলম্বন তখন লেখা। সেই কারণে, অমল হোম তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন, ‘তার মানে unemployed’. বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র প্রমুখ দুই-একজন ছাড়া শুধুমাত্র লিখিয়া জীবিকা নির্বাহ করা সে যুগে প্রায় দুঃস্বপ্ন ছিল। বুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন যে হেমচন্দ্র বাগচীর উদ্যোগে ‘লেখনীর দ্বারা’ তাঁহার ‘প্রথম অর্থার্জন’ ঘটিয়াছিল ‘স্বদেশী বাজার’ সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে। ‘রেখাচিত্র’-র অধিকাংশ গল্প এই খানেই প্রকাশিত হয়।
>
> অশ্লীল লেখক এই অভিযোগের দরুন বুদ্ধদেব বসুর কর্মসংগ্রহেও হয়ত অনেক বাধা আসিয়াছিল। দিলীপ কুমার রায়ের সুপারিশ সত্ত্বেও রিপন কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকের পদে দুই দুইবার প্রার্থী হইয়া তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। অবশেষে তৃতীয়বারের চেষ্টায় তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে।”[১২]

আমেরিকা থেকে ফেরার পর ১৯৫৬ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি অধ্যাপনা করেন ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। দু’বছর অবস্থান করে তাকে পরিকল্পনা মতো বক্তৃতা করতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুই বৎসর ছুটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি না দিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সমসাময়িক কয়েকটি প্রকাশনায় তিনি তার লেখনীতে অশ্লীলতার অবতারণা করেছেন। অগত্যা অধ্যাপনার পদটি ত্যাগ করেই তিনি দুই বছরের জন্য আমেরিকায় চলে যান। এরপর তিনি আর কোথাও চাকরির জন্য

ঘোরাঘুরি করেননি। সম্ভবত ঘোরাঘুরির করার কথা তেমন করে ভাবেনওনি। এখন তার একমাত্র ব্রত হল সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। কিন্তু এ জীবন ছিল চাকরি জীবন থেকেও অনেক কষ্টের। অনেক সংগ্রামের। অনেক অধ্যবসায়ের এবং অনেকটা গ্লানিরও বটে। এর প্রথম এবং প্রধান কারণই হলো আর্থিক অনটন। বুদ্ধদেব বসু সেভাবে না বললেও তার জীবনের অনেকগুলো দিক পর্যালোচনা করে বলতে পারা যায় যে রোমান্টিক কবি শেলীর মত তিনিও "thorns of life" এ বিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার হৃদয় থেকে ক্ষরণ হচ্ছিল; কিন্তু হৃদয়ের এই ক্ষরণ বাইরে কেউ বুঝতে পেরেছিল কিনা, বা বুঝতে চেয়েছিল কিনা, বা বুদ্ধদেব বসু কাউকে বোঝার সুযোগ দিয়েছিলেন কিনা, নাকি যে অন্তর হতে ক্ষরণ হচ্ছিল সে অন্তরেরই নিভৃত কোন কোণে তা আড়াল করে রেখেছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু তার আর্থিক অনটন ছিল সবারই দৃষ্টিগোচর।

তার লেখক জীবন কি খুব সুবিধার ছিল? – না, কখনোই নয়। শুধু লেখালেখি করে জীবনধারণ সেও ছিল এক অত্যন্ত কষ্টকর অভিজ্ঞতা। বুদ্ধদেবের উৎসাহে এবং অধ্যবসায় কখনো ভাটা পড়েনি বটে, তবু এই জীবনের যন্ত্রণাকাতর দিকটি ছিল অত্যন্ত প্রকটভাবে বাস্তব। তার নিজের কথাতেই – বেদনা-বিদীর্ণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে তার নিজেরই লেখায়। স্মৃতিকথার পাতা ভরে–

> "আমার নাট্যকার স্বপ্ন চৌচির, কবিতা লেখা বন্ধ। আমি লিখছি শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস আর ছোটগল্প আর ছোটদের গল্প– আর ফাঁকে ফাঁকে, বিনোদন হিসেবে, খেয়ালি চালে মজুরিহীন প্রবন্ধ দু'একটা। মনে পড়ে প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম যে, আমার দৈনিক খাদ্য আপসে চলে আসবে না, আমাকেই চেষ্টা করে তা জোটাতে হবে; তারপর মনে হলো এই অন্ন একটু অধিক স্বাদ, কেননা আমি নিজে তা অর্জন করেছি, দু-বেলা খেতে বসে প্রায় অভিনন্দন জানাই নিজেকে। কিন্তু, এই নতুন ব্যবস্থা অভ্যেস হয়ে যাবার পর যা বাকি রইলো তা নিছক খাটুনি – শুধু লেখার নয় (তাতে আমি সর্বদাই রাজী!), উপরন্তু আবার *নতুন এবং নতুনতর প্রকাশক-সন্ধান, আর কখনো বা পাওয়া টাকা আদায়ের জন্য ধন্না, এক এক দফায় পাঁচ টাকা বা দু'টাকা পর্যন্ত হাত পেতে নেয়া– সবচেয়ে তেতো অংশ সেটাই।*
>
> অনুকূলে ছিলো না সময়টা .... কারো পক্ষেই নয়, সদ্য যারা উপার্জনে সচেষ্ট তাদের পক্ষে রীতিমত বৈরি। জগৎ জুড়ে ব্যবসা-মন্দা চলছে, ভারতবর্ষে গান্ধীজীর উপবাস, ঢাকা-চাটগাঁর সন্ত্রাসবাদ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। আর অবশ্য বিবর্ধমান বেকারবাহিনী, বেসরকারী অফিসগুলোতে ছাঁটাই– বাঙালির বিপুলবাঞ্ছিত সরকারি কর্মেও কুঞ্চিত হলো মাসান্তিক বেতনে, যেন ব্রিটিশ দণ্ডের শৈথিল্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত জানিয়ে। ... *আমি তাক করে আছি কলকাতার কোনো কলেজের দিকে, কিন্তু মনে হচ্ছে সব দরজা বন্ধ;* আমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধু বলেছেন ওপথে আমার কোনো আশা নেই, কেননা *আমার ডিগ্রি ঢাকার এবং আমার লেখা অশ্লীল,* অন্তত 'লোকেরা' তাই বলে থাকে। এই অবস্থায় বাড়ি ভাড়া দিয়ে, একটি ভৃত্য রেখে, আমার উপর নির্ভরশীল আরো দুজনকে নিয়ে, রোজ তিন প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক আর সবান্ধবে বারো-চৌদ্দ পেয়ালা চা উড়িয়ে *চাল-চুলাহীন আমার পক্ষে সংসার যাত্রা যে সহজ হয়নি তা হয়তো না বললেও চলে* – আশ্চর্য এই যে আমি চালাতে পেরেছিলাম, শুধুমাত্র লেখনী থেকে অক্ষররাশি নিঃসৃত করে। ... আমার সাহিত্যিক বৃত্তি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা– যে সংগ্রাম ও অনিশ্চয়তা আমি সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।" (বাঁকা হরফ লেখকের)

তার অবস্থা দেখে অবশ্যই দয়াদ্রচিত্ত হয়ে তার এক প্রাক্তন অধ্যাপক তাকে কৃষ্ণনগর কলেজে তিন মাসের জন্য শিক্ষকতা করতে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তার আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা তার জন্য দিল্লীতে সাংবাদিকতার চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এর কোনটিই গ্রহণ করতে রাজি হননি কলকাতার টানে। কিন্তু এ দুটি প্রস্তাবের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপারটি প্রকট।[১৩]

স্মৃতিকথার অন্য এক জায়গায়ও নিজের সম্পর্কে তার যে বক্তব্য তার মধ্যেও যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ নিহিত রয়েছে। এই বক্তব্যে রয়েছে তার তীব্র আত্মসচেতনাবোধ–

> "সমবয়সী অন্য ছেলেদের তুলনায় আমি বেঁটে, আমি রোগা এবং দুর্বল—ফুটবল দূরে থাক, ব্যাডমিন্টনেও আমার অল্পেই দম ফুরিয়ে যায়। আমার স্বাস্থ্য ভালো নয় - ঘুরে ঘুরে ভুগি জ্বরে, সর্দিতে, দাঁত ব্যথায়, আমাকে গিলতে হয় বিস্বাদ বার্লি, আর তীব্র তেতো কবরেজি পাঁচন – পরপর দুটো শীত ঋতু ভরে চর্মরোগে কুৎসিত কষ্ট পেলাম। তার উপর আমি তোতলা; হঠাৎ কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে ওঠে।"[১৪]

এই সব থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে তিনি সাহিত্য সাধনায় গভীর অভিনিবেশ সহকারে আত্মনিয়োগ করে প্রকৃতির বঞ্চনার সকরুণ এবং বেদনাদায়ক বাস্তবতার পীড়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। শারীরিক এই সব দুর্বলতার উপলব্ধি একজন আত্মসচেতন শিল্পীকে নিজেকে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রণোদিত করার জন্য যথেষ্ট। জীবনানন্দের মতো অতো তীব্রভাবে না হলেও বুদ্ধদেব বসু নিজেকে নিজের মধ্যে অনেকখানি গুটিয়ে রেখেছিলেন। তবে জীবনানন্দের তুলনায় তার বন্ধুভাগ্য ছিল অনেক প্রসন্ন। ফলে তাকে তেমনভাবে কোথাও ঠেকে থাকতে হয়নি। কিন্তু নিজের চারিদিকে গড়া নির্মোক তাকে নানাভাবে জীবনের অনেক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। যে লেখককে গ্লানিকরভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে "নতুন এবং নতুনতর প্রকাশক-সন্ধান"-এ "আর কখনো বা পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ধন্না, ১/১ দফায় পাঁচ টাকা বা দু-টাকা পর্যন্ত হাত পেতে নেয়া" সে সময়ের জীবনের "সবচেয়ে তেতো অংশ সেটাই।"[১৫] এই ধরনের একজন প্রখর এবং প্রবলভাবে সংবেদনশীল শিল্পী যে যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হবেন তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন সময়ে দেয়া এইসব বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ভেতরে ভেতরে মন-মানসিকতার দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু একেবারে কুঁকড়ে ছিলেন। তবে জীবনানন্দের তুলনায় বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অনেক ভাগ্যবান, এই অর্থে যে যেখানে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবন্য ছিলো– সারাজীবন ধরেই যন্ত্রণার অনিঃশেষ উৎস সেখানে বুদ্ধদেবের স্ত্রী প্রতিভা বসু ছিলেন অনিঃশেষ প্রণোদনার এবং সহায়তার উৎস। এবং এর ফলে টানাটানির সংসার হলেও বুদ্ধদেব বসুকে সংসার নিয়ে কখনো ভাবতে হয়নি। প্রতিভা বসুর নিজের কথাতেই একবার ভীষণ অসুখের সময় : "একটু ভালো হয়ে উঠতেই একটি নতুন চিন্তা আমাকে আক্রমণ করলো। এতোদিন বাদে আমি ভাবতে লাগলাম চিকিৎসার এই দক্ষযজ্ঞ বুদ্ধদেব কী করে চালাচ্ছেন। তাঁর হাতে তো কোন সঞ্চিত অর্থ ছিলো না। আমি উদ্বিগ্ন হলাম।"[১৬]

৩.

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-জীবন এবং বিচ্ছিন্নতবোধও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তার সাহিত্য জীবন শুরু হয় নয় বা আরো বেশি কিছু বয়সে। একটি ইংরেজি কবিতার মাধ্যমে। কিন্তু এর আগে তার মনে কবিতা লেখার কথা কখনো উদয় হয়নি। সেই যে শুরু হল তিনি আর কবিতা লেখা ছাড়তে পারলেন না। তার নিজের কথায়– "অথবা কবিতাই আর নিস্তার দিলো না আমাকে– কিন্তু এরপর থেকে যা কিছু লিখি, সবই বাংলায়।"[১৭] দীর্ঘ জীবনে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তার সাহিত্যজীবনও কম নিগৃহীত ছিল না। অশ্লীলতা এবং অনুকরণ বা নকল তথা প্ল্যাজিয়ারিজমের জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিন্দিত হন। এইরূপ নিন্দাবাদ তাকে লেখালেখি থেকে নিবৃত্ত করতে না পারলেও তার বিচ্ছিন্নতাবোধকে তীব্রতর করে। অশ্লীলতার অভিযোগটি খুবই ব্যাপক, এই অর্থে যে এটি করা হয় তার ছোট গল্প, উপন্যাস এবং কবিতাকে ঘিরে। ১৯২৬ সালে রচিত এবং ১৯৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'কল্লোল"-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর গল্প 'রজনী হলো উতলা" গল্পটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠে এবং গল্পটি অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়। স্বয়ং সজনীকান্ত দাশ বুদ্ধদেব বসুর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করেন এবং এটিকে একটি বিদেশী গল্প দ্বারা প্রভাবিত বলে প্ল্যাজিয়ারিজমের অভিযোগও করেন। *শনিবারের চিঠি* সংখ্যার পর সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠোরভাবে আক্রমণ করেছে। এসব আক্রমণে বুদ্ধদেব বসু যে মর্মাহত হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিষয়টিও বুদ্ধদেব বসুর বিচ্ছিন্নতাবোধকে গভীরতর করেছে একথা বলা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার যৌনতাবিষয়ক উপাদান নিয়েও *শনিবারের চিঠি* কঠোরভাবে বুদ্ধদেব বসুকে আক্রমণ করেছে।[১৮] নানা আক্রমণ এবং নির্যাতনে জীবনানন্দের জবিন অতিষ্ঠ করে তোলার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তা তার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : "তাঁর কবি জীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোন-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল।"[১৯]

৪.

বহু গল্পে এবং বহু উপন্যাসে তথাকথিত অশ্লীলতার ছড়াছড়ি এবং কবিতাতেও এর উল্লেখযোগ্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নের উদ্রেগ করে যে বুদ্ধদেব বসু কি 'লিবিডো– আবেশে' ভুগছিলেন? নাকি জীবনের বাস্তবতার সাহিত্যিক রূপায়ণে মনোনিবেশ করেছিলেন?– নাকি তথাকথিত অশ্লীলতার নির্মোকে একটি ইন্দ্রিয় আবেগ ও আনন্দঘন কল্পলোক সৃষ্টি করে কোন জীবনযন্ত্রণা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে লিভিডোর ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে 'রেজিস্টেন্স' বা 'প্রতিরোধ' এবং 'রিপ্রেসন' বা 'দাবিয়ে' রাখার বা অবদমনের ব্যাপারে তেমন বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। যৌনতার ব্যাপারে তিনি যে সব ঘটনার বর্ণনা করেছেন বা উল্লেখ করেছেন তাতে পর্নোগ্রাফি সুলভ উপাদানের চেয়ে নান্দনিক উপলব্ধিমূলক উপাদান অনেক বেশি বলে মনে হয়। একথাটি কবিতার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, কবিতায় যে দেহ বর্ণনা রয়েছে বা নগ্নতার আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে তাকে কোনো মতেই পর্নোগ্রাফিক বলে অভিহিত করা যাবে না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সাংসারিক টানাপোড়েন এবং অন্যান্য মানসিক যন্ত্রণা উদ্রেক-করা সংবেদনশীল পরিস্থিতি থেকে

আত্মরক্ষার জন্য তিনি একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক-যৌন-আনন্দমূলক নির্মল নান্দনিক লোক সৃষ্টি করে সেখানে একটি বেদনা-ভারমুক্ত-জীবন খুঁজে নেন। তার গল্প-উপন্যাসে যৌনতাযাপিত জীবনেরই একটি স্বাভাবিক অংশ। এর মধ্যে কোন অপরাধবোধের বা মানবিক সীমালঙ্ঘনের বা অনৈতিক বোধসুলভ উপাদান নেই। যৌনতার মাধ্যমে তিনি হয়তো বিচ্ছিন্নতাবোধকে সহনীয় করে তুলতে চেয়েছেন। কবিতায় এ বোধ নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। এখানে আমরা মনোবিশ্লেষণের একটি সূত্রের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি। 'Man is more disturbed by his environment than by his inherited ... instinct'[২০]। মনে হয় Freud-এর মতই বুদ্ধদেব বসুও "Because of the depth and extent of the sublimation of his own sexual drive into creative work"[২১], দৈহিক বর্ণনায় যৌনতার সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে এক মনোহর অনুভবের নন্দনলোকে উত্তরণে অনন্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এখানে আমরা D. H. Lawrence-এর কথা মনে করতে পারি। Lawrence বারবার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৈহিক প্রেমের সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। এর ফলে তার মধ্যে যে সুগভীর এবং যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মনোবেদনার উদ্ভব হয়েছিল তা তাকে অনতিক্রম্য অতৃপ্ত যৌন তাড়নায় অস্থির করে রেখেছিল এবং তাকে পরিচালিত করেছিল সৃষ্টিশীলতার চূড়ার দিকে এবং তার সব উপন্যাসে, ছোটগল্পে, কবিতায় এবং চিত্রশিল্পে যৌনবিষয়কে চূড়ান্ত প্রাধান্য দিতে এবং সমালোচকদের ভাষায় "Religion of the Blood" কে রূপ দান করতে। *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* এর নিবিড়তম মানসিক বিকলনের প্রতিরূপ। বুদ্ধদেব বসুকে লরেন্স-এর অনুভবের উত্তুঙ্গ চূড়া পর্যন্ত হয়তো টেনে আনা যাবে না। তাঁর অনুভব এর চেয়ে অল্প মাত্রায় নন্দনলোকের সীমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে পরিসমাপ্ত হয়। বুদ্ধদেব বসু যেখানে চিত্ররূপ পরিদর্শন করে দর্শনেন্দ্রিয়– অনুভবে তার সুগভীর চেতনার ইতি টেনেছেন লরেন্স সেখানে তাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়ে দৈহিক অনুশীলনের চরম পর্যায়ের উন্নীত হয়েছেন। সভ্যতার উৎকর্ষের জন্য লরেন্স সুস্থ এবং সফল ও পরিতৃপ্ত যৌনজীবনের প্রবল সমর্থক ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু সেখানে যৌনজীবনের দার্শনিক ভিত্তির ব্যাপকতা এবং গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি শুধু নির্মল নন্দনলোকের আনন্দ-শিহরিত ঝর্ণা ধারায় স্নাত হয়েই পরিতৃপ্ত। জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধের তাড়না না থাকলে তিনি হয়তো নারী-দেহ-সৌন্দর্যের অভয়াশ্রমে ঠাঁই নিতেন না। লরেন্সের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে "Man is a sexual animal, and the power of sex is the strength of his well being."[২২] তবে যৌনজীবনের এই সব বাস্তবতা কবি জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তিনি দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত অসুখী অবস্থায় চরম বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়েও সৃষ্টিশীলতার সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন। বুদ্ধদেব বসু লরেন্সের মত যৌন সমস্যায় ভোগেন নি। তার গল্প-উপন্যাস বা কবিতায় কোথাও যৌন সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠেনি। কবিতায় তার যৌন-আনন্দলোক 'sensuous', 'sensual' নয় এবং তিনি এই আনন্দলোকে আশ্রয় গ্রহণ করে পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধকে তরলীকরণে সফল হয়েছিলেন।

৫.

বিদেশী সাহিত্যের পঠন-পাঠনও বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধকে প্রভাবিত করে তাতে বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ বপন করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উৎসাহী

পাঠক। ইংরেজি তথা ইউরোপের সব যুগের সাহিত্যই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন। মার্কিন, রাশিয়ান এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যও তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করেছেন। তার লেখালেখিতে এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। রয়েছে এসব সাহিত্যের প্রভাবেরও স্বাক্ষর। এলিয়ট, ইয়েট্স, হাক্সলি ইত্যাদি কবি-সাহিত্যিক তাঁকে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করেছেন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। তিনি অনুবাদ করেছেন বোদলেয়ার, রিল্ক ইত্যাদি কবির কবিতাও। অনুবাদ করতে গিয়েও এসব কবির ধ্যান-ধারণার প্রভাব-বলয়ে সমর্পিত হয়েছেন সচেতনভাবে এবং অবচেতনেও। রিল্‌কের মত বুদ্ধদেবও "অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতাকে জানতেন কবিতার উপকরণে পরিণত করতে—আত্মজৈবনিক সমস্ত উপাদানকে"।[২৩] বোদলেয়ারের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন, "একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হ'লেও, ভ্রান্ত হলেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে)"।[২৪] অনুবাদ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুও বোদলেয়ারের "কাব্যের বিষয় হিসেবে যা - কিছু উল্লেখ্য, তার একটি বড়ো অংশ – বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, ... ইন্দ্রিয়-বিলাস ... দরিদ্র ও পতিতের জীবন"[২৫] ইত্যাদির প্রতি 'সংক্রামকভাবে সাড়া' দিয়েছেন এবং এসব 'অভিজ্ঞতাকে' নিজের 'কবিতার উপকরণে পরিণত' করেছেন। তেমনি করেছেন এলিয়ট প্রমুখ কবিদের নির্বেদের অভিজ্ঞতাকেও। এভাবে বিশ্বসাহিত্যও, বিশেষ করে কাব্যসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসুকে বিচ্ছিন্নতাবোধের উপকরণ জুগিয়েছে এবং তার মন ও মানসে বিচ্ছিন্নতাবোধকে গভীরতর এবং তীব্রতর করেছে। তিনি তার মনের – তার চৈতন্যের – প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছেন বোদলেয়ারে এবং টি.এস. এলিয়টে। পাউন্ড তথা অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও তাকে প্রভাবিত করেছেন গভীরভাবে।

৬.

বুদ্ধদেব বসু যে জীবনের শুরু থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন তা তার জীবনালেখ্য থেকেই নির্ভুলভাবে জানা যায়। এ বিচ্ছিন্নতাবোধ যে কীভাবে তার চেতনাকে সংক্রমিত করেছিল তা তার প্রথম দিককার কবিতাতেও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সেই যে শুরু হলো তা আর কখনো তাকে পুরোপুরি মুক্তি দেয়নি। কবিতার পর কবিতায় বিভিন্নভাবে বেদনার্ত উচ্চারণে তা নিজের অবস্থান ঘোষণা করেছে অপ্রতিহতভাবে। বুদ্ধদেব বসু তাকে এড়াতে বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি। তার প্রথম কবিতার বই *বন্দীর বন্দনা*-য় "আমরা দেখতে পাই ... কবি জীবনের কলুষিত কদর্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, কুৎসিত পারিপার্শ্বিকে নিজের পাশবসত্তার মুখোমুখি হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন :

> আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
> আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
> সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
> হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।
> ('শাপভ্রষ্ট' ...)[২৬]

কবিতাটি চূড়ান্ত বিচারে ইতিবাচক। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। তবে তা কিন্তু শুধু এ কবিতাতেই। অন্যান্য অজস্র কবিতায় তার সিংহাসন যে অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হয় তাতে প্রকটিত হয়ে ওঠে

তার বিচ্ছিন্নতাবোধের তীব্র দহন। সুন্দর ফিরে যায়। আবার আসে। কিন্তু ফিরে চলে যাবার জন্যই। "সুন্দরও কুৎসিতের দাবী পৃথিবীর ও জীবনের উপর নিত্য সত্য"।[২৭] এক অমোঘ পালাবদল। বিচ্ছিন্নতাবোধও তাই অনিঃশেষ। বিচ্ছিন্নতাবোধ সংবেদনশীল মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন এবং আক্রান্ত করে রাখে যে সুন্দর প্রকৃতির মধ্যেও সে শুধু দেখে বিষণ্নতাবোধের করুণ আর্তি যেনো জগৎ ও জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হতাশার বিধ্বংসী চিত্র এঁকে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃতিবিষয়ক এক কবিতায় হতাশার ও বিষণ্নতাবোধের এইরূপ ব্যথা-সকরুণ চিত্রই ফুটে উঠেছে। যেমন তার "কার্তিক" শিরোনামের কবিতাটি :

ঘুমে ভরা, বিষণ্ন নিশ্বাসে ভরা নীরক্ত কার্তিক।
নিশ্চল নিষ্প্রভ দিন, আকাশ পান্ডুর।
স্তম্ভিত নিঃস্রোত বেলা, পৃথিবীতে পীত পাণ্ডুরোগ।
নিশ্চিত মৃত্যুর মতো
আসন্ন শীতের বেলা
হামাগুড়ি দিয়ে চ'লে আসে;
শূন্য দিনে শূন্য মনে শুয়ে শুয়ে
শহরের বিমর্ষ গোঙানি শুনি,
কাক আর কুকুরের ডাক;
শহরের মুমূর্ষু নিশ্বাস শুনি।
কিরাত-কার্তিকে কাক ডেকে ডেকে
গৃহস্থের ঘরে-ঘরে নিয়ে এলো।
বিবর্ণ আকাশে
ওৎ পেতে চুপ ক'রে থাকে
সারাদিন ধূসর শ্বাপদ এক;
সারারাত্রি ধূসর শ্বাপদ এক
হা-হা করে চ'ষে-চ'রে ফেরে
আকাশের অনাকার অন্ধকারে।[২৮]

নিঃসন্দেহে হেমন্তকাল তথা কার্তিক যথাক্রমে রিক্ততার প্রতিমূর্তি একটি ঋতু ও একটি মাস। কিন্তু কবিতাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তাহলো নিদারুণ অবক্ষয় আক্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন পোড়োজমির। বুদ্ধদেব বসু এইখানে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন। এই কবিতাটি আমাদের আরেক বিচ্ছিন্নতাবোধের কবি জীবনানন্দের শরৎ ও হেমন্তবিষয়ক কবিতাগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এসব কবিতায় বেদনার আর্তি থাকলেও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির মতো এত গভীর তীব্রতা নেই। মনে করিয়ে দেয় আরো দুটি ইংরেজি কবিতা– যথাক্রমে শেলীর Autumn : A Dirge এবং কীটস-এর Ode to Autumn-এর কথা। এই দুটির মধ্যে শেলী Dirge শব্দটির মধ্য দিয়ে এই কবিতাটি যে একটি শোকমূলক কবিতা তা স্পষ্ট করেছেন এবং এটিকে আমরা একটি বিচ্ছিন্নতাবোধগ্রস্ত মানসিকতার কবিতা হিসেবে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু কীটস-এর Autumn একেবারেই নিরেট একটি গভীরভাবে ইতিবাচক কবিতা। জীবন ও প্রকৃতিতে পূর্ণতা জ্ঞাপক কবিতা। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা এই সবগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়ে তার অন্তর্লোকের গভীর সঙ্কটকে প্রকটিত করেছে। এই কবিতায় জীবনানন্দের অনেক কবিতার মতোই দাদাবাদ (Dadaism), প্রকাশবাদ

(Expressionism) এবং বাস্তবরূপবাদ (Impressionism) প্রভৃতি শৈল্পিক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। "ম্যাল্"-এ কবিতায়ও রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধের বিধ্বংসী খণ্ড চিত্র। সৌন্দর্যের বক্ষ ভেদ করে উঠে আসে ছেঁড়াখোঁড়া দিন;

ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন।[২৯]

এই কবিতার চিত্রকল্পেও আমরা দাদাবাদ, প্রকাশবাদ এবং বাস্তবরূপবাদের প্রভাব লক্ষ করি।

এই কবিতায় 'তুষার-চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়' একটি প্রখর ইন্দ্রিয় চেতনাঘন চিত্রকল্প, কিন্তু এটিও ম্লান হয়ে যায় বাণিজ্য সভ্যতার অবক্ষয়ী দাপটে–'ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার'। এরই মধ্যে যুদ্ধের ভয়াবহতার বিদারি ইঙ্গিতে ঘটলো নান্দনিক বোধের করুণ অপমৃত্যু : 'হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,/ হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদগন্ধী মেঘে'। "জলাপাহাড়ে কুয়াশা" ও একটি প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা যেখানে প্রকৃতি সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতার শুধু প্রতিরূপই নয়, প্রতিরূপ বিধ্বংসী ভয়াবহতারও; যে ভয়াবহতা কুয়াশার মতই সব সীমা অবলুপ্তকারী এবং সবকিছুর পরিচয় নিশ্চিহ্নকারী ও বিবর্তনের বুলডোজারের নির্মমতায় সবকিছুকে করে দেয় একাকার। একটি ছোট ঘরের স্নেহ-প্রেম ভালবাসা-উষ্ণতার পাশাপাশি রয়েছে এই বিপুল বিশ্ব একাকার করা হাহাকার :

কুয়াশায় লুপ্ত চরাচর।
        প্রভাতমধ্যাহ্নহীন দিন।
আলো-ছায়া, মেঘ-মেলা, সবুজ-নীলের ইন্দ্রজাল
অঙ্গীভূত, একীভূত।
        পাহাড়, আকাশ, শতরূপী বন্ধুরশরীর
        পৃথিবীর প্রদর্শনী,
        উদ্ধত তুষারশ্রেণী, কিছু আজ নেই।
সূর্যের উজ্জ্বল সেতু চুরমার। আলোর প্রাকার ছারখার। আজ
        আলো নেই, অন্ধকার নেই।
...   .

আলো এবং অন্ধকার নেই শুধু প্রকৃতিতে নয়, জীবনেও। কী ভয়াবহ ত্রিশঙ্কু অবস্থা কবির মনের।

সেই ১৯৩৫-১৯৪২ সালের মধ্যেই বিশ্বায়ন-আতঙ্কে কবি আঁৎকে ওঠেন। আঁৎকে ওঠেন নিসর্গকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখে। তার মধ্যে যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আজকের 'পরিবেশ-বাঁচাও' আন্দোলন, 'জলবায়ু রক্ষা কর' আন্দোলন। স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে পরধর্মলিপ্সু রাজনৈতিক চক্রান্তের লীলাখেলা তাকে উদভ্রান্ত করে। বিচ্ছিন্ন করে। তার জীবনকে করে তোলে দুর্বহ : জলপাহাড়ে কুয়াশায় শুনি তার একাকিত্বের হাহাকার :

                পৃথিবীর জটিল জ্যামিতি
রেখা কোন বাঁক বৃত্ত, চঞ্চল স্থাপত্যলীলা,
রঙের অসংখ্য সূক্ষ্ম শ্রুতি, নৃত্যশীল ছায়া, প্রতিচ্ছায়া
নিঃসংজ্ঞ নির্বেদ। নিসর্গ নিশ্চিহ্ন আজ,
        অভিন্ন অরণ্য মেঘ *উচ্চচূড়া নিম্নভূমি,*

যেন কোন প্রাক্-ইতিহাস
বিবর্তন-অতিক্রমকারী
জন্তুর চতুর বংশধর
সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে
মুছে নিলো রূপ, সজ্জা, ভঙ্গি, ভান, পরিবর্তনের
বিচিত্রতা, এলো কাল রাহুরূপে
করাল বিশাল গ্রাসে
বিশ্বব্যাপী সমীকরণের
অবিচ্ছেদ ধূসরতা।[৩০] (বাঁকা হরফ লেখকের)

কুয়াশা ঢাকা জলপাহাড়ের ছবি কবিকে নিয়ে গেছে এক বীভৎস কল্পলোকে, বর্তমান সভ্যতা- নিষ্পেষিত ভুবনকে অতিক্রম করে তিনি চলে এসেছেন আজকের সংঘাত-সঙ্কুল ভয়ার্ত পৃথিবীতে, যেখানে হিংস্র মানুষের হাতে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই আজ বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন। এখানে বুদ্ধদেব বসু একাধারে যেমন গভীর বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন-আক্রান্ত তেমনি দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবোধাক্রান্ত কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর সুস্থ এবং ভারসাম্যকৃত জীবন অন্বেষার দিগন্ত অনেক সুদূরপ্রসারী। কুয়াশা যে রকম সবকিছু একাকার করে দিয়েছে, তেমনি বিশ্বায়ন বা globalization-এর আগ্রাসী থাবা "অবিচ্ছেদ ধূসরতায়' সব বৈচিত্র্য করে দিয়েছে নির্মূল।

কবির অন্তর এবং বহির্জগৎ দু'খানেই অসুন্দরের, অবক্ষয়ের, ভয়াবহতার, রিক্ততার এবং বিষণ্ণতার করাল থাবার অধিকার বিস্তৃত। এই লোমহর্ষক পরিস্থিতি থেকে, এই নির্জীবকারী রূঢ় বাস্তবতার গ্রাস থেকে কবি সহজ-সরল প্রকৃতির আনন্দ এবং নান্দনিক লোকে বন্ধু বা প্রিয়াকে নিয়ে পালাতে চান; কিন্তু কীটস্-এর মতো 'On the viewless wings of poesy'-এর সাহায্য নিয়ে নয়, বরং সম্ভব হলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Fever and fret' এর চরম দুর্দশা-সঙ্কুল উষর ধূসর মরু অঞ্চল পার হয়ে। কিন্তু পথে পথে কাঁটা-বন্ধুর নির্মমতায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সোনালি স্বপ্নের সুরভীসমৃদ্ধ মুখর প্রত্যাশার উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো। কবি যেতে চান আনন্দভরা নন্দনলোকে, যেমন 'এখন বিকেল' কবিতায় :

সেখানে সোনালী আলো সোনালী বৃষ্টির মতো ঝরে
মুখের উপরে। উজ্জ্বল জলের মতো ঝরে
তোমার আমার মন; উচ্ছল স্রোতের মতো পরস্পরে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঝলকে-ঝলকে মিশে যায়
তোমার আমার মন।

কিন্তু,

চল যাই রাস্তা পার হ'য়ে
ট্রাম-লাইন পার হ'য়ে—ঝাঁকে-ঝাঁকে দেয়ালে-দেয়ালে
শকুনের দুরন্ত ডানার মতো প্ল্যাকার্ডের দল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত শকুন যেন প্ল্যাকার্ডের দল
ছিঁড়ে কেড়ে নিতে চায়, কেড়ে নিয়ে খেতে চায় চোখ —
আমরা এড়িয়ে যাব।

না, কবি এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ রূঢ় বাস্তবতার গভীর অতলে তার অস্থির অসমতল জীবনের শিকড় গ্রথিত :

আমাদের এ পাড়ায়
শান্তি নেই, প্রতিবেশী গ্রামোফোন। *আমাদের এই ঘরে*
আলো নেই, চলো বাইরে যাই।
কড়া ইলেকট্রিক আলো *কাঁচা চর্বির মতো শাদা*
এখনই জ্বালতে হবে। চায়ের চামচে
বাজবে তোমার
হাতের চুড়ির তালে-তালে। পাশের ফ্ল্যাটের
উনুনের ধোঁয়া এসে নিমেষে নিশ্বাস
কেড়ে নেবে অতি-উন্নাসিক সমালোচনার মতো
...   .
এখনও বিকেল আসে চুপে চুপে কলকাতায়,
এখনও কোকিল ডাকে হঠাৎ– ব্যথার মতো
দক্ষিণে হাওয়ায়।
...   .
হঠাৎ-ব্যথার মতো যেখানে কোকিল
চুপচাপ আকাশেরে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।
হঠাৎ-ব্যথার মতো যেখানে কোকিল
চুপচাপ আকাশেরে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।
...   .
আঁটোসাঁটো ছোটো ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা,
ঘরে ব'সে পাশের বাড়ির গ্রামোফোন;
ঝাঁকে-ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনের মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙ্গে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায় চাকায়।
...   .
এখনও বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়
হঠাৎ ব্যথার মতো এখনও কোকিল ডাকে
অস্থির হাওয়ায়।[৩১] (বাঁকা হরফ লেখকের)

যাপিত জীবনের কী করুণ গ্লানি আর আর্তি ফুটে উঠেছে এই কবিতাটিতে!

এত ভয়ানকভাবে ভীতিকর পরিবেশ যে কলকাতার আকাশে চাঁদকে চুপি-চুপি সিঁড়ি ভেঙে আসতে হয়। এই কবিতাতেও ও বুদ্ধদেবের বিচ্ছিন্নতাবোধ চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও আমরা পাই বাস্তবরূপবাদের প্রভাব। পাই দাদাবাদ এবং প্রকাশবাদও 'Futurism'-এর ও প্রভাব। ভিড় করে পরাবাস্তববাদী চিত্রকল্পও। পাঠকচিত্তকে আক্রান্ত করে কবিমনের বিচ্ছিন্নতাবোধের করুণ আর্তি।

বুদ্ধদেব বসুর কর্মজীবনের প্রথম পর্যায় আলোচনার সময় আমরা লক্ষ করেছি যে চাকরির অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক টানাটানিতে তার এই জীবন ছিলো ভীষণভাবে

পর্যদুস্ত। বিপর্যস্ত। এই সময়টায় তিনি যে বিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতাবোধের অসহায় শিকার ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তার এই বিচ্ছিন্নতাবোধ অত্যন্ত তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে তার আত্মজৈবনিক কবিতা 'কোন কবি-বন্ধুর প্রতি'। পুরো কবিতাটিই এখানে তুলে দেয়া হলো :

> জীবিকার নিরানন্দ অন্বেষণে ঘুরি রাজপথে।
> মন্থর, মসৃণ ট্রামে, ক্ষীপ্রগতি কিন্তু উৎকেন্দ্রিক
> বাস-এ, কিংবা (তাপমান শতাধিক!) রুষ্ট পদাতিক।
> বহু চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো; এবার কি হবে কেল্লা ফতে?
> ঘুরবে কি চাকা? বহুবার প্রবৃত্তির প্রিয় ব্রতে
> ভ্রষ্ট হ'য়ে, *প্রতিভারে পণ্য ক'রে ঘৃণ্য ব্যবসার*
> *ব্যভিচারে—তবু, তবু মেটে না আক্ষেপ, অবসর*
> *জোটে না ক্ষণিক; অবরুদ্ধ প্রয়োজনে।*
> ব্রত হতে
> মুক্তি চাই, বিবেক করে না ক্ষমা। বিবেক? অথবা
> অক্ষমের ছদ্মবেশী ভয়? *মূঢ় যারা, ক্রূর যারা,*
> *হিংস্র লোভে অকুণ্ঠলুণ্ঠনকারী, তারাই তো জয়ী।*
> *তুমি, আমি পরাজিত ... ক্রীতদাস। কল্পনা-আশ্রয়ী*
> *কবি শুধু। ... তবু আত্মরক্ষা ইষ্ট। শিল্পের অমরা*
> *অগত্যা প্রত্যয়। আর পরস্পরে বিষণ্ন বাহবা।*[৩২]

(বাঁকা হরফ লেখকের)

কবিতো শুধুই কবি। কল্পলোকে—শিল্পের অমর লোকে যার শেষ ঠাঁই। কিন্তু কী বিধ্বংসী ঘূর্ণির বলয়াবদ্ধ বিবর্ণ জীবন! বিচ্ছিন্নতাবোধের এমন চিত্তবিদীর্ণকারী প্রভাব সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। বিচ্ছিন্নতাবোধাকীর্ণ এরকম আর্তনাদ-কাতর করুণ কবিতা সমসাময়িক আর কোনো কবি লেখেন নি। এমনকি জীবনানন্দও না।

বিচ্ছিন্নতাবোধে বিপর্যস্ত কবি কখনো কখনো নিজেকে আবিষ্কার করেন কোন নিঃসঙ্গ বরফ শীতল শিল্পলোকে 'রাজ্যচ্যুত', 'নির্বাসিত' একটি সত্তা হিসেবে, যেখানে তিনি 'অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস' : 'প্রত্যেহের ভার" শিরোনামের কবিতায় পাওয়া যায় তার আর্তনাদ সঙ্কুল কাতর চিত্তের সকরুণ অভিব্যক্তি :

> ... এ-স্বরাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
> বঞ্চিত শুধু কি আমি? ... আমি কবি! ... শুধু আমি
> রাজ্যচ্যুত ... নির্বাসিত? ... অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
> আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
> অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? ... সত্যি তা-ই? ... না কি আমি, কবি-আমি,
> কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
> সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে![৩৩]

"নদী, তুমি নটী" শিরোনামের কবিতার শেষ স্তবকে কবির যে একান্ত প্রার্থনা, মুক্তির জন্য এবং পূর্ণতার জন্য, তার যে স্বকাতর কামনা তা বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে পরিত্রাণের জন্যই একটি প্রার্থনা বা কামনা হিসেবে ব্যাখ্যাত হতে পারে :

হে নর্তকী
নাও তুমি আমার স্বপ্নের স্পর্শ,
দাও মোরে তোমার কম্পন-কণা।
তোমার অঙ্গের রঙ্গে, তরঙ্গের শাণিত আভায়
দীর্ণ করো আমার পাষাণ-পুঞ্জ,
আমার প্রাণের স্তব্ধ আদিম পাহাড়ে
মূর্ত হোক তোমার পূর্ণতা।[৩৪]

'বৃষ্টি' শিরোনামের কবিতাটিতে তার যে ঐকান্তিক প্রার্থনা সেটিও উপরে উল্লিখিত প্রার্থনার অনুরূপ। মুক্তি পেতে হবে বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মম নিগড় থেকে। বৃষ্টিও দিতে পারে এ মুক্তি।

এসো মগ্ন কল্পনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টির উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন করো স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।
তোমার ঝঞ্ঝার স্বরে শূন্যতার কুহরে-কুহরে
জন্মের প্রচণ্ড মন্ত্র উচ্চারিত হোক;
ভেসে যাক স্খলিত পাহাড়
বিগলিত বস্তুর বন্যায়।[৩৫]

এ দুটো গভীর আবেগ দীপ্ত উচ্চারণ শিল্পলোকে সৃষ্টিশীল উজ্জ্বল উত্তরণের ব্যাকুলতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই দুটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'Ode to the West Wind"-এ 'West Wind'-কে লক্ষ করে শেলীর অনুরূপ আকুল উচ্চারণের কথা :

Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud!
I fall upon the throns of life! I bleed!
A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee : tameless and swift, and proud.

Make me thy lyre, even as the forest is :
What if my leaves are falling like its own!
... ...
Be thou me, impetuous one!
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth!
And, by the incantation of this verse,

Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind![৩৬]

দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিবোধ এবং গ্লানিকর উপলব্ধিও বুদ্ধদেব বসুর বিচ্ছিন্নতাবোধকে তীব্রতর, গভীরতর এবং ব্যাপকতর করেছে। এধরনের বোধ বারবার পুরো কবিতা বা বিচ্ছিন্ন পঙ্ক্তিতেও নির্ভুলভাবে ফুটে উঠেছে। "নির্মম যৌবন" কবিতায় ভিখারিনীর মেয়ের জীবনে যৌবনের দেহ-গঠনরূপ পরিবর্তনকারী চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি যে গভীর বাস্তবতা বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সুতীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধে

পরিপূর্ণ। এখানেও আমরা পাই প্রকাশবাদ, দাদাবাদ এবং বাস্তবরূপবাদের পরিচয়। প্রকৃতির কী অদ্ভুত, নিষ্ঠুর-নির্মম কৌতুক অভাব-বিধ্বস্ত ভিখারিনীকে নিয়ে 'বিশ্বপ্রকৃতির' কী 'নিষ্ঠুর অসঙ্গতি'! -

এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিনী মেয়ে
আঁস্তাকুড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
তাকেও ছাড়েনা
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
তাকেও সুন্দর করে, তাকেও সাজায়,
লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য হিল্লোলে।
...		...		...
বিশ্ব ভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিনী।
যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা।[৩৭]

জীবনধারণের এবং দৈনন্দিনতার ছোট-বড় ঘটনাবলী ও কবির জীবনে তীব্র গ্লানি তথা বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎস ছিল। কারণ-

সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
...	...	...	...
কেননা জীবন কেবলই জীবনধারণ,
জীবিকাই, হায়, জীবন।[৩৮]

এই পঙ্‌ক্তিগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত সনেট "The world is too much with us"-এর কথা :

The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon![৩৯]

কবির বিচ্ছিন্নতাবোধ এক তীব্র এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর মাত্রায় প্রকটিত হয়েছে "ছিন্ন সূত্র" কবিতার বিভিন্ন পর্যায়ে। বেদেদের কথা বলতে গিয়ে কবি অত্যন্ত আত্মসচেতনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেন বিচ্ছিন্নতার জটিল আবর্তে :

মনে মনে বলি, আমি ঢের ভলো আছি
নিয়মিত পানাহারে, নিশ্চিন্ত আরামে
শিক্ষিতের শৌখিনতায়।
জীবনের অবরুদ্ধ ক্ষীণতায়
ওরাই কৃপার পাত্র, প্রবৃত্তির আবর্তে ওরাই
বন্দী হ'য়ে আছে; *ভাবনার চড়াই-উৎরাই*
ওদের অনধিগম্য, সভ্যতার বিচিত্র রম্যতা

উবু : ২—

ওরা তার কিছুই জানে না।

(বাঁকা হরফ লেখকের)

কবির নির্বেদ এখানেই শেষ নয়, কবি এতটাই বিচ্ছিন্ন যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন সুস্থ-স্বাধীন জীবন থেকে গ্লানিকর এবং তথাকথিত ভদ্র জীবনের অন্ধকূপে নিরুপায় নির্বাসনে। তার যথাস্থান থেকে তিনি আজ চ্যুত :

মনে হয়, আমি কবি, আমার আসন
ওদেরই ধুলোয় ছিলো, *কবে হ'লো নির্বাসন*
সে-সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে
গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি-পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি করা ভদ্রতায়।
আমাকে যে পলে-পলে বেঁধে ক্ষুদ্রতায়
আমার স্বজাতি যারা; কেরানি কি ইস্কুল মাষ্টার হ'য়ে
ছদ্মবেশে চলাফেরা করি, আসলে আমি যে কবি
সেই পরিচয়
প্রাণপণে লুকায়ে-লুকায়ে
আদি স্রোত ক্রমেই শুকায়।

(বাঁকা হরফ লেখকের)

এখানে বেদেরা সভ্যতার পঙ্কিলতা মুক্ত, স্বাভাবিক এবং সুস্থ জীবন, সমাজ ও মনমানসিকতার প্রতীক। সভ্যতা মানুষকে ইস্ত্রি করা ধুতি-পাঞ্জাবির ভদ্রতার খাঁচায় এবং মুখোশে আবদ্ধ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে নিক্ষেপ করেছে। বেদেদের জীবন এক ধরনের বাধাবন্ধনহারা আদিম এবং অকৃত্রিম উল্লাসে শিহরিত, উদ্বেলিত এবং আনন্দে অধীর। 'খুব ভালো' আছি এই উপলব্ধি কবির জন্য কোন উপশমী সান্ত্বনার উদ্দীপনায় সমৃদ্ধ নয়। তিনি এখন শৃঙ্খলিত এবং পথ-হারা :

যদিও বোঝায় বুদ্ধি ভালো আছি, খুব ভালো আছি,
তবু এ হৃদয়
চায় ফিরে যেতে ঐ পথের ধুলায়
বিস্মৃত জন্মের সেই অস্থির কুলায়ে।
কিন্তু এও জানি মনে-মনে
এ কেবল নিষ্ফল আক্ষেপ, অনর্থক বাসনা-বিলাস,
জীবনের সরল উল্লাস
আমার তো নয় আর।
সর্বস্বত্বতার
ত্যাগ করে এসেছি যে, সভ্যতার কাছে
এই মোর দেনা।
হবে না, হবে না
বেদের মহলে ফিরে যাওয়া
যে শৃঙ্খলে বাঁধা আছি, ঢুকেছে তা জীবনের মূলে,
ছাড়পত্র হারায়েছি, রাস্তা গেছি ভুলে।[৪০]

(বাঁকা হরফ লেখকের)

কবি ভেবেছিলেন তিনি 'মানস জীবনে' মুক্ত। বেদেরা সবাই প্রকৃতির আবর্তে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু সে অনিন্দ্য সুন্দর, সহজ-সরল বাধাবন্ধনহারা জীবনের সর্বস্বত্ব সভ্যতার কাছে ত্যাগ করে তিনি পথ ভুলে এক দিগন্ত-দীর্ঘ ব্যথাদীর্ণ বিচ্ছিন্ন লোকে পদচারণায় নিমগ্ন। সেখান থেকে তার বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই। মনে হতে পারে এখানে তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধে জীবনানন্দ তথা সমসাময়িক অন্যান্য সব কবিকে অতিক্রম করে গেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর বেদে প্রীতিতে বা বেদে জীবনের ব্যাপারে মুক্ত জীবনাগ্রহী আর্তিভরা উপলব্ধিতে মার্কসবাদ তথা সামাজিক সাম্যবাদ বা শ্রেণীবৈষম্যের ও শ্রেণীসংগ্রামের নিগড়-মুক্ত জীবনের গন্ধ পাওয়া যায়। বামপন্থী কবিরাও তার বন্ধু ছিলেন। বাম ভাবধারার সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিলো। তবে তার এই আগ্রহ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি মনস্কতার সঙ্গে তুলনীয়। তাদের দু'জনের আগ্রহের উৎসমূলেই রয়েছে সভ্যতাক্লিষ্ট বদ্ধজীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তাড়িত 'ছেঁড়াখোঁড়া' প্রাণ, মানস-স্থিতিহীনতার অস্থিরতায় নিপীড়িত হয়ে দুঃস্বপ্নের অতলের অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি কামনা।

বুদ্ধদেব বসু জীবনের শিকড়ে জল না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। সভ্য জীবনের নির্মম চাপ, বেঁচে থাকার নিরাপোষ দাবি, দৈনন্দিনতার বিষাক্ত ছোবল অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তার জীবন। তাই তিনি মুক্তি কামনা করেছিলেন সৌন্দর্যলোকে 'রূপান্তর'-এ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে :

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
        রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা
        বসন্তপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
                মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
...   .
                মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ মন।[৪১]

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন একজন সবল-প্রবলভাবে নিবেদিত প্রেমিক। প্রেমকে তিনি নানাভাবে অবলোকন করেছেন। হাত-চুল-স্তন থেকে সমগ্র নারীদেহ তাকে করেছে উত্তাল-আকুল। শরীরী প্রেম ছাড়িয়ে তার নিকট নারী দেহের উত্তরণ ঘটেছে এক অনিন্দ্য নন্দনলোকে। 'কঙ্কাবতী'-র দ্বিতীয় কবিতা 'কখনো'তে গোধূলির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর মৃত্যু ভাবনার অবস্থান পাশাপাশি :

গোধূলি রয়েছে শুয়ে পশ্চিমের গোলাপি বালিশে;
গোধূলির অন্ধকারে ম'রে গেল আজিকার দিন।

'গোলাপি বালিশ' যে সুখস্বপ্নের সম্ভাবনায় মনকে আপ্লুত করেছিল, দিনের মৃত্যুতে তার নস্যাৎ হয়ে যাবার বেদনার গ্লানিতে সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কবি অবরুদ্ধ জাগতিক কর্মকোলাহলের অবক্ষয়ী আবর্তে এবং প্রেমের যন্ত্রণাদায়ক অনিশ্চয়তার মধ্যে। কাজের কলের সবগুলো চাকা তার ওপর। তিনি নিষ্পেষিত। নিপীড়িত। এক কথায় শৃঙ্খলিত :

পৃথিবী-মানুষে ভরা, মোর 'পরে সকলের দাবি—
পৃথিবী– কাজের কল, মোর 'পরে সবগুলি চাকা—
এই নিয়ে কাটে মোর আজ।
কিন্তু কাল! কে জানে কাল কী হবে, বুঝি সে আসিবে।

আমি যারে দেখিয়াছি, হয় তো বা আসিবে সে কাল![৪২]

বিচ্ছিন্নতার কালো ছায়া ক্রমাগত বেড়েই চলে। যেমন 'সুখান্বেষী' কবিতায়-

পিপাসার্ত, অশান্ত অন্তর।
হৃদয়ের ব্যবসায় আজ মোর ধ'রে গেছে ঘৃণা।

কবি উচ্চাশার সব অভিলাষ এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে এই বিশ্বে একটি নিরূপদ্রব শান্তসমাহিত আশ্রয়স্থল কামনা করেন–

ছোট একখানি বাসা খোলা মাঠে, ছোটো শহরেতে,
কাজ নাই বড়ো কাজে, বড় কথা কহিবোনা আর;
রাত্রি আর দিন যাবে ছোট সুখে, তবুও সুখেতে।
একটু সুখের তরে দেহ কাঁদে মনে হাহাকার।[৪৩]

এই আর্ত হাহাকার বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ : চারিদিকে তার একি ঘোর কারাগার!

এই শ্বাসরোধকারী বেদনার্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে কেবলি ক্লান্তশ্রান্ত করে। প্রেমিকার নিকট তাই তার সকরুণ নিবেদন 'একটি মুহূর্ত' 'একটু সময়'-এর জন্য :

জানো, কাল মোর মনে নেমেছিলো ধূসর অসুখ,
কপালে জ্বরের তাপ, অসুখের অবসাদ মনে।
ঘুমের আড়ালে কাল সারারাত্রি পুড়েছে চোখেরা,
ভোরের হাওয়ায় আজ ছেড়ে গেছে হৃদয়ের জ্বর;–
শুধু আছে অবসাদ–চারিদিকে ক্লান্তির কুয়াশা।
ক্লান্তির কুয়াশা ছিঁড়ে সূর্যেরে আনিতে পারি কেড়ে,
গানে আর সুরে আর চোখে-ঠোঁটে মেশা—তুমি মোরে
একটি মুহূর্ত দাও যদি।
... ...
আজ আমি ক্লান্ত বড়ো, আজ মোর মন ভাল নেই,
শুধু কাছে এসে বসো, নিচুস্বরে গান গেয়ে যাও—
আজ আর কিছু নয়, তুমি আর আমি আর গান—
একটু সময়![৪৪]

এই আর্তি কোন সাধারণ প্রেম কাতরতা নয়। এখানে দেখা যায় একটি বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন হৃদয় উদ্ধারের পথ জেনে সেটির সংলগ্নতার কামনাকাতর। এই সংলগ্নতাতেই মুক্তি। হোক না ক্ষণিকের। একটি সূক্ষ্ম নিক্তির ওপর উপশম নির্ভরশীল—নিক্তির একপাশে উপশম আর একপাশে অনিশ্চয়তা। দোদুল্যমানতার জন্যই কবি অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থির। কিন্তু প্রেমের পূর্ণতায় যে কোন আশ্বাসের গ্যারান্টি নেই। শুরুর গর্ভেই শেষের গোপন বীজের ধীর অঙ্কুরোদগম ঘটে। 'মিলনে বিরহ' কবিতায় যে দুঃসহ দীর্ঘশ্বাস তার উদগম এই বোধে যে-

এই দিন শেষ হবে
রক্ত-মেঘে, বজ্র-রবে
বক্ষ বিদারণ—
তুমি ছেড়ে যাবে যবে আমার জীবন।[৪৫]

বিচ্ছিন্নতাবোধের উপশম হয়না, কারণ 'জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পেছনে ভয়।'

যুদ্ধও বুদ্ধদেব বসুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মভেদী নির্মম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অবশ্য তার বয়স ছিল কম। কতটুকু আতঙ্কের খবর পেয়েছেন তা নির্ণয় করা কঠিন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব তার মনমানসিকতা যে নিদারুণভাবে আক্রান্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তোর বিপুল সাহিত্য সম্ভার তার ব্যাপক পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কবিরা— Robert Bridges, Wilfred Owen, Seigfrid Sassoon, Louis Macniece প্রমুখের— তার মনমানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে পরোক্ষভাবে যুদ্ধের বিভৎসতা সম্পর্কে তিনি ব্যাপকভাবে অবহিত হয়েছেন। সর্বোপরি এলিয়ট তথা অন্যান্য যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের লেখার তিনি মনোযোগী পাঠক ছিলেন। 'অধুনা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা' শিরোনামের কবিতায় তার বোমা পড়ার পরে ভীতিকর এবং শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বর্ণণা রয়েছে :

(বোমা পড়ার পরে)
অধুনা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা; উপরন্তু রাত্রি দীর্ঘজীবী।
সময় চলেনা আর, ঘোলা-জল যেন পচা ডোবা
জ'মে আছে শতাব্দীর মধ্যদিনে। যতবাবু, বিবি
ফুর্তিহারা গৃহনীড়ে; দাম্পত্য নীরস, বই বোবা।
… … …
কেননা অধুনা দেখি *মড়ার খুলির মতো চাঁদ*
নাগরিক আকাশেরে প্রতি রাত্রে *আতঙ্কে শানায়;*
শূন্য পথ, রুদ্ধ গৃহ, অন্ধ দৃষ্টি যদিও জানায়
তমিস্রার বরেণ্যতা, তবু *ঘৃণ্য পূর্ণিমার ফাঁদ*
সুনীল সপ্তমে চ'ড়ে আজো গড়ে পঞ্চমবাহিনী,
শত্রুর পাখায় ওড়ে এ অকথ্য কলঙ্ককাহিনী।[৪৬]

(বাঁকা হরফ লেখকের)

বোমাতঙ্ক যে কবিকে ভীতি-বিহ্বল এবং বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত করেছে তা এই উদ্ধৃতি থেকে পরিস্ফুট হয়। 'খুলির মতো চাঁদ', 'আতঙ্কে শানায়', 'শূন্য পথ', 'রুদ্ধ গৃহ', 'অন্ধ দৃষ্টি' তমিস্রার বরেণ্যতা ও 'ঘৃণ্য পূর্ণিমার ফাঁদ' ইত্যাদি বর্ণনামূলক শব্দগুচ্ছের—চিত্রকল্পের—মধ্যে যে অবক্ষয় চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যেই সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ, এবং এই শব্দগুচ্ছ বুদ্ধদেব বসুর মন মানসিকতার ওপর 'দাদাইজম, ইমপ্রেশনিজম এবং এক্সপ্রেশনিজম'- 'Futurism'-এর প্রভাব প্রকটিত করে। সুরিয়ালিজমের প্রভাবও কার্যকর ছিল তার ওপর। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' শিরোনামের কবিতাও ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রতিবাদ। এটি তার বিচ্ছিন্নতাবোধকেও প্রকটিত করে :

সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।

…   …   …   …
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরো থরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

…   …   …   …
প্রাণ রুদ্ধ, গান স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে।[৪৭]

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ত্রাস, ধনীদের লোভ-লালসা, দস্যুতার উত্থান ইত্যাদি তার মর্মে দারুণভাবে আঘাত করে। লুণ্ঠন, মনুষ্যত্বের অবমাননা, 'যাদের ঘর্মাক্ত শ্রমে/ধনীর ঐশ্বর্য জমে' তাদের—শ্রমিকদের—ওপর নির্যাতন, ইত্যাদি তার মনে গভীর ক্ষোভ সঞ্চারিত করে। এবং এসবও তার মনে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খলা শান্তিরে করেছে অন্তরীণ,
নগরে বন্দরে গঞ্জে ঘাটে
অনিশ্চিত উৎকণ্ঠায় কাটে
দিন পরে দিন।

…   …   …   …
দুর্দিন উন্মত্ত রণ
হিংস্র নখদন্তে ছিঁড়ে মানবের হৃৎপিণ্ড, হত্যার তিমিরে
আরক্ত আকাশ, জলে স্থলে ত্রাস![৪৮]

ঔপনিবেশিক আগ্রাসন আফ্রিকার বুকে যেভাবে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে মূল্য ও মানবতাবোধের ক্ষেত্রে যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা কবির মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। মানুষের লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের চরমতম প্রকাশ ঘটেছে আফ্রিকার বুকে। শাসন ও শোষণের নিদারুণ তীব্রতায় আফ্রিকার জনজীবনে দুর্ভাগ্যের যে দাবানল জ্বেলেছে তা মানুষকে আক্রান্ত করেছে নৈঃসঙ্গতার তীব্রতায়। 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' শিরোনামের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু জোরালো ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন ও নিন্দা করেছেন এবং ঘৃণাও প্রকাশ করেছে। পশ্চিমা সভ্যতাকে লুণ্ঠন ও শোষণের জন্য অভিযুক্ত করেছেন। বাণিজ্য সভ্যতাকে জানিয়েছেন ধিক্কার। আফ্রিকাকে নিয়ে গভীর আশাবাদের—গভীর সম্ভাবনার—পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশবাদ এবং বাণিজ্য সভ্যতার অপরিমিত আগ্রাসন কবির চিত্তে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে তাও হয়েছে তার বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি উপলক্ষ। এভাবে আরো বহু কবিতায় বুদ্ধদেব বসু তার বেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধকে নির্ভুলভাবে রূপায়িত করেছেন।

যে আঁধার আলোর অধিক গ্রন্থের বহু কবিতাতেই বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্ভুল স্বাক্ষর রয়েছে। যদিও এই গ্রন্থের মূল বিষয় হলো কবি ও কবিতা অথবা শিল্প ও সৃষ্টিশীলতা। বহু কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বুদ্ধদেব বসু কী ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেন কল্লোকের পোড়োজমির বিচ্ছিন্নতায় ম্লান এবং ম্রিয়মাণ। 'সমুদ্রের প্রতি– জাহাজ থেকে' কবিতায় সমুদ্র পূর্ণতার, বিশালতার, সঙ্গীতময়তার, ফলপ্রসূতার এবং সৃষ্টিশীলতার কোন প্রতীক না হয়ে, প্রতীক হয়েছে নিঃসঙ্গতার, বঞ্চনার, যন্ত্রণার এবং একটি রুদ্ধশ্বাস পারিপার্শ্বিকের শিকার :

আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।

শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস, আর
সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার।
… … … … …
'যাকে ভালোবাসো তাকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।'
তাই আর শান্তি নেই। তাই চাপা-কান্নার তাণ্ডবে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উতরোল প্রতিবাদ। তাই হাহাকার,
তুফান, তুষার-শিলা, *ডুবে-মরা নাবিকের হাড়,*
হাঙরের দাঁতে ছেঁড়া যন্ত্রণার অব্যক্ত চিৎকার
এইসব ছেয়ে আছে তিক্ত নীল রক্তের লবণ।

আমিও তোমারই মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।[৪৯]
(বাঁকা হরফ লেখকের)

এই গ্রন্থেরই আরেকটি কবিতার কথা ধরা যাক। 'কেন?' শিরোনামের এই কবিতায় কুলীশ-কঠোর জ্বরা ব্যাধি আক্রান্ত অমসৃণ পৃথিবীতে কবির ভূমিকার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে পাঠকেরা পান যন্ত্রণার অঙ্গারে দগ্ধ কবির হৃদয়ের ক্ষরণ-সিক্ত উচ্চারণঃ

শুধু, কোন অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত– সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।[৫০]

আপাতদৃষ্টিতে যা নিতান্ত সরল, সহজ এবং স্বাভাবিক তাও কিন্তু একসময়ে ভার হয়ে ওঠে এবং কবির চারিদিকে গড়ে তোলে বিচ্ছিন্নতার এক দুর্ভেদ্য নির্মোক :

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার –
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতে তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।[৫১]

'চতুর পাহাড়'-এর উপলব্ধিটিই কবি যে তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তার পরিচায়ক। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে নিতান্ত স্বাভাবিক যে কর্মকাণ্ড তাও আজকাল অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। 'প্রত্যহের ভার' মনকে বিপর্যস্ত-ব্যথাদীর্ণ করে বেঁচে থাকার আনন্দকে নিক্ষেপ করছে অবক্ষয়ের আবর্তে।

জীবনানন্দ 'অনন্ত সূর্যোদয়'-এর আশার বাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু 'অদ্ভুত আঁধার' লোক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। 'তিমির হননের গান গেয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন কেটেছে অন্তহীন তিমিরেই। সেই তুলনায় বুদ্ধদেব বসু জীবন-বিচ্ছিন্ন হয়েও, 'ছাড়পত্র হারিয়ে'ও, 'রাস্তা ভুলে গিয়ে'ও আলোর ভুবনে ফিরেছেন। সভাসমিতিতে অংশ নিয়েছেন। দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন। তারপরও একথা স্বীকার করতেই হয় যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সংক্রমণ তিনি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'রাহুর প্রেম', *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, পৃ. ৪১।

২. Paul, Edward (Edit) : *The Encyclopedia of Philosophy*, New York, 1971, p. 79.

৩. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন : Paul, Edward (Edit) : *op.cit.*, pp. 76-80.

ঘোষ, বিশ্বজিৎ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০-৬৫।

সাদিক, মাহবুব : *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২২৯-২৫২।

মজুমদার, আবু তাহের : "জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ", *জীবনানন্দ*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১-৫১।

Barry, Peter : Marxist Criticism", *Beginning Theory*, Manchester and New York, 2002, pp. 156-170.

Friedman, Maurice : *Problematic Rebel* (Revised Edition), Chicago and London, 1970, pp. 437-461.

৪. কাদির, আবদুল : 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', *কবি মধুসূদন*, সম্পাদনা মুহম্মদ নূরুল হুদা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ২৭-২৮।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।

৬. উপর্যুক্ত : পৃ. ৪৬৩।

৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ : "শাপ ভ্রশ্‌ট দেব শিশু", *কলকাতা*, সম্পাদনা জ্যোতির্ময় দত্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩২।

৮. ইকবাল, ভূঁইয়া : 'জীবন কথা', *বুদ্ধদেব বসু*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯।

৯. উপর্যুক্ত : পৃ. ১২-১৩।

১০. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৩।

১১. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৩।

১২. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৩-১৪।

১৩. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৪-১৫।

১৪. উপর্যুক্ত : পৃ. ২০।

১৫. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৫।

১৬. বসু, প্রতিভা : *জীবনের জলছবি*, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২৯৩।

১৭. ইকবাল, ভূঁইয়া : *প্রাগুক্ত* : পৃ. ১৯।

১৮. উপর্যুক্ত : পৃ. ২২-২৩, ৮৯-১১৭।

১৯. বসু, বুদ্ধদেব : *কালের পুতুল*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪১।

২০. Puner, Helen Waker : *Freud His Life and His Mind*, New York, 1947, p. 160.

২১. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৬১।

২২. উপর্যুক্ত : পৃ. ২৬৫।

২৩. সিকদার, অশ্রুকুমার : "বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কাব্যজিজ্ঞাসা", *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*, কলকাতা, ১৩৯৮ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১৯৯।

২৪. বসু, বুদ্ধদেব : *বোদলেয়ার তাঁর কবিতা* (অনুবাদ), কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১ (ভূমিকা)।

২৫. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৩।

২৬. ভট্টাচার্য, সঞ্জয় : "বুদ্ধদেব বসু", *আধুনিক কবিতার ভূমিকা*, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ৭৫।

২৭. উপর্যুক্ত : পৃ. ৮।

২৮. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, (৮ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯০ (পু. মুদ্রিত), পৃ. ৭৩।

২৯. উপর্যুক্ত : পৃ. ৭৬।

৩০. উপর্যুক্ত : পৃ. ৭৩-৭৪।

৩১. উপর্যুক্ত : পৃ. ৭০-৭১।
৩২. উপর্যুক্ত : পৃ. ৬১।
৩৩. উপর্যুক্ত : পৃ. ১০৩।
৩৪. উপর্যুক্ত : পৃ. ৯৪।
৩৫. উপর্যুক্ত : পৃ. ৯৫।
৩৬. Shelley, P. B. : *Poetical Works*, London, 1968 (reprint), p. 579.
৩৭. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পাদক) : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮
৩৮. উপর্যুক্ত : পৃ. ৭৬।
৩৯. Wordsworth, William in *The Norton Anthology of English Literature*, (Fifth Edition), New York, London, 1962, p. 1440.
৪০. *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ : প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬।
৪১. উপর্যুক্ত : পৃ. ৯২।
৪২. উপর্যুক্ত : পৃ. ৬।
৪৩. উপর্যুক্ত : পৃ. ৮।
৪৪. উপর্যুক্ত : পৃ. ১২।
৪৫. উপর্যুক্ত : পৃ. ১৫।
৪৬. গুহ, নরেশ (সম্পাদক) : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ (পাঁচ খণ্ড), ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৮০-২৮১।
৪৭. উপর্যুক্ত : পৃ. ২৭।
৪৮. উপর্যুক্ত : পৃ. ২৮৩, ২৮৫।
৪৯. উপর্যুক্ত : পৃ. ৬৯।
৫০. উপর্যুক্ত : পৃ. ৮৪।
৫১. উপর্যুক্ত : পৃ. ৭৭।

‘ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা’: বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচৈতন্য

আবু দায়েন

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের এক সব্যসাচী শিল্পী। তিরিশের নতুন কবিতার গুরুত্বপূর্ণ কবিব্যক্তিত্ব তিনি। সম্পাদনা করেছেন সাহিত্যপত্রিকা ‘প্রগতি’ ও ‘কবিতা’। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এ কবি পেশাগত প্রয়োজনে ঘুরে বেরিয়েছেন দেশ-বিদেশ। শিল্পসাহিত্যের সমকালীন ও ঐতিহ্যিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল তাঁর। কথাসাহিত্য ও নাটক রচনা এবং বিশ্বসাহিত্য ও ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর অবস্থান ও নৈপুণ্য ঈর্ষণীয়। ষড়ঙ্গ শিল্পের সব প্রকরণই তাঁকে ভাবিয়েছে। তবে তাঁর মস্তিষ্কে ছিল মূলত সাহিত্য। শিল্পের অন্তর্গত চারিত্র্য বিবেচনায় ভিন্নতর শিল্পরূপের সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গতি পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বলা যায়, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সম্পর্কযুক্ত।

সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিচিত্র প্রকরণ বুদ্ধদেব বসুর সংশয়াতীত যোগ্যতার জ্ঞাপক। সে-কারণে তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক রচনায় শিল্প-সাহিত্যের রূপ-রীতি-স্বভাব-প্রকরণ সম্পর্কে স্বকীয় মনন ও ভাবুকতার পরিচয় স্পষ্টগোচর। সমকালীন কবি-সমালোচকদের মনোযোগ মূলত বিদেশী সাহিত্যের পাঠ ও সমালোচনায় নিবিষ্ট হলেও বুদ্ধদেব বসুর হৃদয়জুড়ে ছিল স্বদেশ ও সংস্কৃতি। তাই সমকালে পরিণত ও নতুন কবিদের কাব্যপাঠ ও সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে দেশীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি। কখনো-কখনো শিল্প-সাহিত্যের স্বভাব-রূপ-রীতি সম্পর্কে সৃষ্টি করেছেন তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। সে-সব রচনায় শিল্প বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর অন্তর্গত বোধের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান রচনায় বিভিন্ন সূত্র বা ‘কারিকা’র মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে প্রতিফলিত শিল্পদৃষ্টি অন্বেষণ করা হয়েছে।

শিল্পের স্বরূপ : ‘মুক্তি, শুদ্ধতা ও ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা’; উপস্থিতির জন্যই শিল্প মূল্যবান

বুদ্ধদেব বসুর মতে, সংস্কৃত ‘শিল্প’ বা ‘কলা’, আর ইয়োরোপীয় ‘আর্ট’– শব্দ দুটোর যাত্রাস্থল একই : দুয়েরই আদি অর্থ ‘ক্রাফট’, কারিগরি, যে-কোনো প্রকার হাতের কাজে দক্ষতা। ‘কলা’র সংখ্যা যে চৌষট্টি হতে পারে এ-কথা শুনে তিনি একদিকে যেমন এর অর্থ-ব্যাপকতা অনুভব করতে পেরেছেন, অন্যদিকে ‘কলা’র সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনার অবান্তরতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওই তালিকা যাঁরা রচনা করেন তাঁদের কাছে ভাস্কর্য আর মাল্যরচনায় প্রভেদ ব্যবহারগত, কিংবা শ্রমের পরিমাণে। বুদ্ধদেবের মতে, যে-মহাশিল্পীরা এলিফ্যান্টা বা এলুয়ার গুহামূর্তি গড়েছিলেন তাঁরা আজকের অর্থে নিজেদের শিল্পী বলে ভাবতেই পারতেন না। মধ্যযুগের ইয়োরোপেও

কোনো 'শিল্পকর্মে'র সৃষ্টি চিত্রকরের সচেতন লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মন্দিরের প্রয়োজন-মতো যিশুজীবনীর দৃশ্যরচনা, যাতে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের পাত্র চোখের সামনে মূর্ত হয়ে থাকে। রেনেসাঁসের পরে 'আর্ট'-এর অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও বহুগুণে বর্ধিত হল, যা থেকে অন্য সব পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে *সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ* প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বলেন :

> "আর্ট : তা বিচ্ছিন্ন হ'লো মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে, দেবার্চনার সেবাদাসী আর থাকলো না, সিংহাসনের চামরধারিণীও নয়, সগর্বে বলতে পারলে, 'আমি কোনো কাজে লাগি না। আমি আছি।' আর্ট : তার মানে মুক্তি, শুদ্ধতা, এক ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা, যার সামনে এসে জগৎবাদীরা বলতে বাধ্য হয়– 'তোমার কাছে আর-কিছু চাই না, তুমি যে আছো, হ'তে পেরেছো, তারই জন্যে তুমি মূল্যবান" (বসু, ১৯৮২ক: ২০৭)।

শিল্পের স্বরূপ অন্বেষণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর এ দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্ত অভিনব না-হলেও স্বকীয় অনুভূতির প্রগাঢ়তায় চিত্তাকর্ষক ও অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পের সঙ্গে প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহ কিংবা ধর্মানুষঙ্গের অবিচ্ছেদ্যতাকে স্বীকার না করার মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রথম পর্বে বিরল শিল্পরুচির পরিচয় দিতে তিনি সমর্থ হয়েছেন, যা পরিবর্তীকালে শুদ্ধ শিল্পবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিল্পরস-প্রসঙ্গ : শিল্পী ও শিল্প উভয়কে না জানলে তা খণ্ডিত হবার আশঙ্কা থাকে

সব শিল্পী নিজেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন না। কেউ-কেউ শিল্পের অনুপুঙ্খ অন্তরালে থেকেই সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ একে বলেন 'সত্যকে আড়াল-ক'রে-রাখা কুয়াশা'। বুদ্ধদেবের মতে, 'তা হচ্ছে শিল্পীর মনের রং, যার সাহায্যে ফুটে ওঠে ছবি' (বসু, ১৯৮২ খ: ৪৪৯)। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বলতে সঙ্কোচবোধ করেন তিনি। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে যে বেশি-কিছু জানা যায় না, তা বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় মঙ্গলজনক। কাহিনীর স্বপ্নলোকে তিনি চির-জ্যোতির্ময় হয়ে আছেন। তিনি নিজেকে দান করে গেছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তাঁর সত্তা-বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নয়। তাঁর সাধনা যে-স্তরের তাতে গৌতম বুদ্ধ যে-ব্যক্তি, আহারে-বিহারে অভ্যাসে-মুদ্রাদোষে, নানা ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণতায় যে-মানুষ, তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। বুদ্ধের সাধনার কাছে তা কিছু নয়। কিন্তু যে-সব শিল্পী আত্মদান করে যান রূপসৃষ্টিতে, তাদের সম্পর্কে সে-কথা খাটে না। কেননা, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন জানলে তার সৃষ্টিকে বোঝার পথ সুগম হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, শিল্পীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তবেই তাঁর সৃষ্টির সম্পূর্ণ অর্থটা ধরা পড়ে। কারণ বুদ্ধদেব বসুর মতে, শিল্পীর সৃষ্টি তিনি নিজে। শিল্পীর চরিত্র, তার জীবনের পারিপার্শ্বিকতা ও সময়কে জানতে পারলে বোঝা যায়, কেন তাঁর সৃষ্টি এই বিশেষ রূপধারণ করল। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে এত কম জানতে পারায় ক্ষোভ নেই বুদ্ধদেব বসুর। কিন্তু কালিদাস সম্পর্কে কিছুই না জানতে পারায় তার দুঃখ অন্তহীন। শিল্পের রস-স্বরূপ ও আনন্দ আস্বাদনে শিল্পীকে জানার তাগিদ বুদ্ধদেব বসুর একার নয়, এমনকি তা নতুনও নয়। কিন্তু জানা কথার নিম্নরূপ বিশেষায়িত ব্যঞ্জনা সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ : "শিল্পীর জীবনের পরিচয় না-জানলে তার শিল্পের প্রকাশ আমাদের পক্ষে খণ্ডিত হবার আশঙ্কা থাকে। এবং সেখানে যে-কোনো খুঁটিনাটি

সম্ভাব্যরূপে মূল্যবান, কোনো জিনিশই চলতি অর্থে তুচ্ছ ব'লেই তুচ্ছ নয়, চলতি অর্থে অবান্তর ব'লেই অবান্তর নয়" (বসু, ১৯৮২খ: ৪৪৯)।

শিল্পের উপযোগিতা : 'নিজের জন্যই আর্ট; অন্যসব কপটভাষণ'

শিল্প-সাহিত্যের উপযোগিতার ব্যাপার এক বহুপুরনো ও বিতর্কিত প্রসঙ্গ। লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিককে যেমন, সাধারণ পাঠককেও তেমনিভাবে তা বিব্রত ও বিভ্রান্ত করেছে। লেখক-শিল্পীদের মধ্যে তর্ক ও মতভেদের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকও এ বিষয়ে শরণ নিয়েছে পছন্দের ব্যক্তিত্ব, তথা কবি-সাহিত্যিকের। এমন এক ব্যাপার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পত্রযোগাযোগ। মি. চক্রবর্তী জানতে চেয়েছিলেন, বহুল প্রচলিত Art for Art's sake-এর বদলে অন্য-কোনো কথা ব্যবহার করা যায় কিনা। বুদ্ধদেব বসু উদাহরণ দেন ডি এইচ লরেন্সের, যিনি Art for Art's sake-এর পরিবর্তে বলতেন 'Art for my sake। Art for my sake–'। *কিসের জন্য আর্ট* প্রবন্ধে লরেন্সকে সমর্থন করে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> "আর্টিস্‌টের দিক থেকে এত বড় সত্য আর-কিছু নয়। আমার জন্য আর্ট– এই একমাত্র কথা, যার প্রতিবাদ করা যায় না, যাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, কোনোরকম চাঁছাছোলা করবার দরকার হয় না। আমার জন্য আর্ট– এখানে কোনো তর্কের ক্ষেত্র নেই : প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিস্‌টের এটা গূঢ়তম মনের কথা" (বসু, ১৯৮২খ: ৪৮৭)।

একজন শিল্পী কেন শিল্পের পেছনে ছোটেন–এর উত্তর হয়তো নানাজন নানাভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে বুদ্ধদেবের বিবেচনায়, এ প্রশ্নের উৎকৃষ্ট উত্তর 'নিজের জন্য'ই। কারণ, চিত্রী কেন আঁকেন বা গায়ক কেন গান করেন– এসব প্রশ্নের উত্তর বহুরকম হওয়া সম্ভব। কিন্তু বুদ্ধদেবের উত্তর অব্যর্থ ও অদ্বয় বা নির্বিকল্প। তাঁর মতে, সাধারণ লোকের চোখে 'আর্টিস্‌টে'র দুটো মস্ত প্রণোদনা হচ্ছে যশ আর অর্থ। উভয় ব্যাপারকেই 'মোটামুটি রকম ভালো' মনে করেন তিনি। যত বড় আর্টিস্টই হোন যে-ব্যক্তি বলে 'চাহি না অর্থ চাহি না মান', বুদ্ধদেবের বিবেচনায় সে ভণ্ড। বরং অলিখিত হলেও বহুল প্রচলিত কথা, যা উদ্ধৃত করেন বুদ্ধদেব নিজেই যে, বেইঠোফেন তাঁর প্রকাশককে অকপটে ঠকাতেন; গ্যয়টে রাজন্যবর্গের প্রসাদ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করতেন। বুদ্ধদেবের ধারণা, আত্ম-উপলব্ধির স্বচ্ছ মুহূর্তে প্রত্যেক আর্টিস্ট ওই কথাই বলবেন : আমারই জন্য আর্ট। বোঝা স্বাভাবিক, তাঁর এ অনুভব অমূলক নয়। কেননা, নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে আমিত্ব ফুটে ওঠে, 'খোসার পর খোসা ছাড়াতে–ছাড়াতে' কবির ভাবনায় তা যেন 'আত্মা দীপ্ত' হয়ে ওঠে 'বিশুদ্ধ নগ্নতা'য়। সেখানেই আর্টের চরিতার্থতা। তাঁর মতে, তারপর আর যা-কিছু লোকের চোখে যতো বড় প্রতীয়মান হোক– তা অবান্তর। ব্যক্তির বিশুদ্ধ শিল্পী-সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই তার। লেখক যতক্ষণ লেখেন, তা কেবল নিজের জন্যই : আত্মপ্রকাশের অপ্রতিরোধ্য প্রেরণায়, আত্মপ্রকাশের দুঃসহ যন্ত্রণায়, অনির্বচনীয় আনন্দের জন্য। তা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই। পৃথিবীর ভালো মন্দ অন্য-কিছুর জন্য শিল্পীর ভাবনা থাকা উচিত নয়। সে-ক্ষেত্রে শিল্প স্থূল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সৃষ্টিক্ষণে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না– কেবল নিজেকে প্রকাশ করার অসহনীয় তাগিদ ছাড়া। যন্ত্রণার মতো সেই আনন্দই শিল্পীর ভালোবাসা। বুদ্ধদেবের মতে, রূপের স্ফটিক-পাত্রে কোনো বিরল সুরার মতো নিজেকে নিঃশেষে নিষ্কাশন করে বিন্দু-বিন্দু মেলে ধরার নিষ্ঠুর অত্যাচারই শিল্পীর ভালোবাসা। তার পরিপূর্ণতা সেখানেই।

শিল্পীর কৃত্য : তিনি স্বজাতি কিংবা বিশ্ব-মানবের মুখপাত্র

একজন সাহিত্যিকের কাছে শিল্পকলা শুধু তত্ত্ব নয়, জীবনের অংশ। শিল্পী নিজেও প্রথমত মানুষ, এবং অন্যান্য মানুষের মতোই দেহের সীমায়, দেশকালের পরিবেশে আবদ্ধ। সত্য যে, তাঁর সমাজ থেকে, সমসাময়িক ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতার অধিকাংশ তিনি আহরণ করেন। অর্থাৎ যেখানে তিনি সবার সঙ্গে অভিন্ন, সেখানেই তার উপাদানের ভাণ্ডার। তাঁর হাতে পড়ে সেই উপাদান যা হয়ে ওঠে, শিল্পরচনায় যে-অভিজ্ঞতাটি প্রকাশিত হয়, সংক্রমিত হয়, সেটা বিশেষ, সেটা অনন্য, সেটা তারই ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত। তার মানে সেটা 'ব্যক্তিগত' নয়, 'প্রাইভেট' নয়;– তাহলে কোনো প্রকাশ হত না, অন্যদের মনে কোনো সংক্রাম সম্ভব হত না, মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। সর্বসাধারণের এই অভিজ্ঞতা হঠাৎ এক জায়গায় এসে বিশেষ হয়ে ওঠে। এমন হয়ে ওঠে যেন তা তুলনাহীন। এখানেই শিল্পপ্রক্রিয়ার মূল রহস্য। জীবনের অতি সাধারণ তথ্যের রূপান্তর ঘটে সেখানে; তারা অর্থ পায়, দ্যোতনা পায়, দূরস্পর্শী ইঙ্গিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যপাঠকালে আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের তথ্যগুলোকে চিনে নিতে পারি সেখানে। কিন্তু তা-ও যেন ঠিক সেগুলোকে নয়। *শিল্পীর স্বাধীনতা* প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> "সেই সব তথ্য, যা বাস্তব জীবনের অস্পষ্ট, এলোমেলো, যোগসূত্রহীন, কিংবা অভ্যাসে পরিজীর্ণ, সেগুলোকে যেখানে সুসংবদ্ধরূপে দেখতে পাই, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করি, তাকেই আমরা বলি আর্ট, বলি শিল্পকর্ম। এমন প্রবল তাঁর সংঘাত, এমন নিবিড় তার প্রভাব আমাদের মনের উপর, যে হাজার বার জানা কথাটাও নতুন লাগে সেখানে, মনে হয় যেন এ-রকম আর-কিছুই হয়নি, যেন এই প্রথম এটাকে দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম" (বসু, ১৯৮১: ১৬১)।

অর্থাৎ তাঁর মতে, শিল্পীর যেটা নিজস্ব এবং বিশেষ দৃষ্টি, তার অংশীদার হয়েই আমরা সাধারণকে চিনতে পারি। এই অর্থেই শিল্পী তাঁর স্বজাতির কিংবা বিশ্ব-মানবের মুখপাত্র বলে বুদ্ধদেবের অভিমত। অন্যত্র বুদ্ধদেব বলেন :

> "মানুষের বুদ্ধিবল যখন কর্দমাক্ত স্থূল ধাতুকে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে সংস্কৃত, নম্য ও ব্যবহার্য ক'রে তোলে, তখন সেই যন্ত্রমুখর বহুশ্রমজাত ক্রিয়াকাণ্ডকে সহজেই যুদ্ধ ব'লে মনে হতে পারে; কিন্তু গণিতের সাহায্যে বিশ্বের রহস্য যিনি সন্ধান করছেন, সেই একলা-মানুষটির কঠিন সংগ্রাম অনভিজ্ঞ চোখে ধরাই পড়ে না। কবির অবস্থাও তা-ই; একান্তে ও গোপনে তিনি কাজ করেন, প্রত্যক্ষভাবে সহকর্মী বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাঁর হয় না, এবং তিনি যা সৃষ্টি করেন তাও এক বায়বীয় বস্তু, প্রায় কোনো বস্তুই নয়; শাদায় কালোতে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ শব্দ শুধু; সেটা যে সভ্যতার বা আমাদের অস্তিত্বের এক প্রধান উপাদান, তা অনেকেরই উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়। কিন্তু তিনিও যোদ্ধা, তাঁর শৌর্য অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত, শুধু অনুভূতির গোচর, ভাবনার অধিগম্য।... কবি চান আত্মোপলব্ধি, তাই তাঁর জীবন এক অনবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম : চিন্তার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে ইঙ্গিতের যুদ্ধ, ক্ষমাহীন, বিরামহীন, পর্যায়হীন" (বসু, ১৯৬৩ : ৬৯)।

উল্লেখ্য, 'কবির কৃত্য' সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এ অনুভব একজন কবির সংজ্ঞা-প্রসূত। আমরা সমাজে-রাষ্ট্রে একেক জনকে একেকভাবে তাঁর কর্মের জন্য বাহবা দিয়ে থাকি। এক-রকম বিমূর্ত বা অদৃশ্যপ্রায় বলে কবির কাজ সম্পর্কে সাধারণত সহৃদয়

দৃষ্টিবিক্ষেপ করা হয় না। উপরিউক্ত অংশে বুদ্ধদেব বসু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, ব্যবহারিক পারম্পর্যে কবির ভূমিকাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পের উপস্থাপন : সাধারণ বিষয় শিল্পরূপে অসাধারণ হয়ে ওঠে

কোনো 'মুগ্ধ সূর্যাস্ত' দেখে কেউ বলতে পারেন, 'এ-রকম সূর্যাস্ত তো কখনো দেখিনি'। শিল্পী হয়তো প্রশ্ন করবেন, 'কিন্তু দেখতে পেলে কি খুশি হন না?' বুদ্ধদেব মনে করেন, সমস্ত আর্টের এই হচ্ছে মূল কথা। হ্যামলেটের মত রাজকুমার, রোজালিন্ডের মত প্রেমিকা, লিয়রের Fool-এর মত ভাঁড়– এমনকি, ম্যাকবেথের মত হত্যাকারী, ইয়াগোর মত শয়তান, কি পিতা- কারামাজফ-এর মত লম্পট সুলভ নয়। বাস্তবে এমনটা দেখতে নিশ্চয়ই কেউ আশাও করেন না। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পরসিক ব্যক্তি শিল্পরূপে অক্ষয় এরূপ চরিত্র পেয়ে খুশিই হন। সে-কারণে বুদ্ধদেব বসু বলেন, "আর্টের কারবার সাধারণকে নিয়ে নয়, বরং জীবনে যা হয়-তো সাধারণ, আর্টে রূপায়িত– কি রূপান্তরিত করলে তা-ই অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। সেটা অনিবার্য। সেটাই আর্টের জাদু" (বসু, ১৯৮২খ: ৪৮২)। অর্থাৎ শিল্পী এমন এক চরিত্র বা বাস্তবতা নির্মাণ করতে পারেন, বা করে থাকেন যা হয়তো বাস্তব পৃথিবীতে নেই। এই নির্মাণ বা সৃষ্টি-সামর্থ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা : প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপট থেকে সরে যেতে হয় শিল্পীকে

বুদ্ধদেব বসুর মতে, তথ্যের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি যুগপৎ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, কোনো শিল্পেই ঘটনার হুবহু পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়। সার্থক প্রকাশের স্বার্থে শিল্পীকে ঘটনা থেকে নিরপেক্ষ অবস্থানে সরে দাঁড়াতে হয়। এই দূরস্থিতির জন্য শিল্পীর প্রয়োজন নিরাসক্ত দৃষ্টি। মানুষ হিসেবে সাধারণ সুখ-দুঃখ সবার সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করবেন তিনি। তিনি যখন শিল্পী, তখন মানবভাগ্যের অন্তর্গত হয়েও তাকে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে বাইরে থেকে; বলতে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী নন, দর্শক এবং দর্শয়িতা বা সূত্রধার। ঘটনার বিশৃঙ্খলতায় বিহ্বল হ'লে তার চলবে না। অর্থ বোঝার জন্য, অন্বয়সাধনের জন্য তাকে তখনকার মতো হতে হবে মনের দিক থেকে আত্মস্থ, আত্ম-সম্পূর্ণ। এই সরে যাওয়ার, সরে দাঁড়াবার প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয় শিল্পীর স্বাধীনতা। তাঁর মতে, "শিল্পীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সেই স্বরাজ; যতক্ষণ এবং যতটুকু তিনি শিল্পী, ততক্ষণ এবং ততটুকুই স্বতঃসিদ্ধ" (বসু, ১৯৮১ : ১৬১)। শিল্পীর জীবনের অনেকটা অংশই আকস্মিক। যে-দেশে, যে-সময়ে তিনি জন্মান, যে-সব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয় তার কিছুই বেছে নিতে পারেন না তিনি; অনেক সময় তাঁর জীবিকার উপায় বা জীবনযাপনের রীতির উপরেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সে-ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

শিল্পীর অধিকার : প্রথম কাজ নিজেকে আবিষ্কার করা

শিল্পমানের প্রশ্নে শিল্পীকে অনেক ছাড় দিতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তিনি যতোটা নমনীয়, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে হতে হয় ততোটা কঠোর। কারণ, শিল্পতত্ত্ব উপলব্ধি করবেন শিল্পী নিজে। কোনো বহিরাগত সত্তা তা বুঝবে না। শিল্পীর ভাবনায় কী কাজ করছে তা টের পাওয়া অন্য যে-কোনো জগদ্বিখ্যাত শিল্পী বা শিল্পবোদ্ধার পক্ষেও অসম্ভব। তাই সময়, সাময়িকতা বা বস্তু-ঘটনার ব্যবহারে তাকে যেমন নৈর্ব্যক্তিক হতে হয়, তেমনি শিল্পের জায়গায় তাঁর অধিকারের প্রশ্নে তাঁকে হতে হয় অপ্রতিহত। *শিল্পীর স্বাধীনতা* প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> "পুঞ্জ-পুঞ্জ অভিজ্ঞতাকে কেমন ক'রে তিনি ব্যবহার করবেন, কতটুকু তার রাখবেন, কতটা ফেলে দেবেন, সেই অসংলগ্ন ভগ্নাংশ রাশিকে কোন চিন্তা-সূত্রে গ্রথিত করবেন, কী-রকম আকৃতি, অবয়ব দেবেন তাকে, কী অর্থ তাঁর পাত্রটুকুতে ধরাবেন– এ-সব বিষয়ে তিনিই তাঁর নিয়ন্তা, তাঁর উপরে কথা বলার কেউ নেই, তাঁর শিল্পের যে-সব শাসনে স্বেচ্ছায় তিনি নিজেকে বাঁধেন, তা ছাড়া আর কোনো শর্তেরই তিনি অধীন নন। মানুষ হিশেবে তাঁর অবস্থা তাঁর আজ্ঞাবহ নয়, ঘটনাচক্র তাঁর ইচ্ছা মেনে চলে না, কিন্তু শিল্পী হিশেবে তাঁর অধিকার অনাহত; তাঁর রচনার রূপ, বিষয় বক্তব্য, এ-সব বিষয়ে মুক্ত ইচ্ছার প্রয়োগে কোনো বাধা নেই তাঁর, থাকতেই পারে না– যদি তার জন্য সমসাময়িক সমাজের হাতে তাঁকে উপেক্ষিত বা নিপীড়িত হ'তেও হয়, তবু এখানে তাঁর আপন প্রবৃত্তির পরামর্শই চরম" (বসু, ১৯৮১ : ১৬২)।

যখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দুর্গম বেগে বয়ে চলে, তখন তাঁকে যে-কোনোভাবে শাসন করা শিল্পীর পক্ষে অসাধ্য হতে পারে। অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো, তিনিও বন্যার তোড়ে ভেসে যেতে পারেন। এমনও হতে পারে যে অবস্থার চাপ সইতে না-পেরে হেরে গেলেন তিনি, শিল্পকর্মে ইস্তফা দিলেন। তাতেও এ-কথা প্রমাণ হল না যে শিল্প যথেষ্ট শক্তিমান নয়। তাতে বোঝা গেল যে শিল্পীরও মানবিক দুর্বলতা আছে। কথাটা এই যে শিল্পী যতক্ষণ তার নিজের বৃত্তি পালন করেন, ততক্ষণ যে-কোনো অবস্থায় তিনিই কর্তা; তার কর্মের উপাদান এবং রূপায়ণ আদ্যন্ত তাঁর বশবর্তী। অর্থাৎ শিল্পী হিশেবে তিনি যা-কিছু করেন সেখানে তিনি স্বভাবতই স্বাধীন। বাইরের দিক থেকে যতো কঠোর আবদ্ধতাই থাক, এর কখনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। কেননা, এই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়া মানেই তার শিল্পী-সত্তার অবসান।

বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের (১৮৭৫-১৯২৬) উক্তি স্মরণ করেন। শিল্পী যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এই কথাটাই রিলকে তাঁর 'তরুণ কবিকে লেখা পত্রাবলি'তে বলেছেন। বলেছেন যে, ঠিক সে-টুকু অতিরঞ্জন করে, মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য অনেক সময়ই যার প্রয়োজন হয় :

> 'মনে করো তুমি কারাগারে আছো, যার দেয়াল পেরিয়ে পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার চেতনায় পৌঁছায় না– তবু, তবুও কি নিয়ত তোমার শৈশব তোমার সম্পদ হ'য়ে নেই, সেই মূল্যবান, রাজকীয় ঐশ্বর্য, স্মৃতির সেই রত্নভাণ্ডার?... আর সেই অন্তর্গামিতা, অন্তর্মুখিতা থেকে যদি কোনো কবিতা আসে, তাহ'লে এ-কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করার চিন্তা কোরো না সেগুলো ভালো হয়েছে কিনা। ... সেই শিল্পকর্মই ভালো, যার জন্ম হয়েছে প্রয়োজন থেকে' (বসু, ১৯৮১ : ১৬৩)।

আক্ষরিক অর্থে এ-রকম উক্তি অসার মনে হতে পারে। কিন্তু এ-ধীর ও গম্ভীর কথাগুলোর মধ্যে সত্যের যে-কঠিন সারবত্তা আছে, তা উপলব্ধি করবেন তাঁরাই, যাঁরা জীবনের যে-কোনো সময় নিজের ভেতর থেকে বাইরে কিছু টেনে আনতে চেয়েছেন, চেয়েছেন অঙ্কুরিত হতে, সৃষ্টি করতে– অনুভব করেন বুদ্ধদেব বসু। রিলকে যাকে বলেছেন 'প্রয়োজন'– যা থেকে শিল্পকলার জন্ম– তার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হয় শিল্পীকে, কিছুই হাতে রাখলে চলে না। এই আত্মসমর্পণ সহজ নয়, তার জন্য নিজের মধ্যে স্তব্ধ হ'তে হয়, অতিশয় শান্ত হয়ে, ক্ষুদ্র হয়ে, প্রতীক্ষা করতে হয় তাঁকে। না বলে উপায় নেই, তাই কথা বলেন শিল্পী; সেটা তাঁর বাধ্যবাধকতা; নিজের কাছে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই। কিন্তু কী তিনি বলতে চান, কী

সেই বাণী, যার বীজ জন্মের জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছে তাঁর মধ্যে– তা অনুধাবন করতেও ভুল হয় অনেক সময়, নিজেকে জানতেও ভুল হয়।

যা আকস্মিক, যা সময়োচিত তা অনেক সময় উদ্ভ্রান্ত করে। কিংবা ঘটনার উত্থান-পতনের কলরোলে অন্তরের মৃদু গুঞ্জন ডুবে যায়। তাই বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> "শিল্পীর প্রথম কর্তব্য তাই নিজেকে আবিষ্কার করা, আর তার জন্য নিজের মনের অনেক গভীরে নামতে হয় তাঁকে, পৌঁছতে হয় মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে সেই গহনে, যেখানে পাথর কাদা আবর্জনার স্তূপের ফাঁকে-ফাঁকে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত আছে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতা, যেন মূল্যবান ধাতুর আদিম রূপ, অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে হাতের স্পর্শে হাতুড়ির আঘাতে রূপান্তরিত হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আর এই আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-প্রকাশের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি যতক্ষণ চলতে থাকে– জীবন ভ'রেই চলা উচিত– ততক্ষণ বাইরের কোনো শাসন শিল্পীর উপর প্রযোজ্য নয়, এই কাজেরই যা অন্তর্গত নয় এমন কোনো দাবি তাঁর উপর করা চলবে না; এই দায়িত্ব একাই যথেষ্ট গুরুভার। এইভাবে, তাঁর কর্মের বাধ্যতাই তাঁকে মুক্তি এনে দেয়, সৃষ্টিকর্মের সুকঠিন শর্ত থেকেই এর উদ্ভব" (বসু, ১৯৮১: ১৬৩)।

এই স্বাধীনতা শিল্পীর অর্জিত; বাইরে থেকে তা কেউ দান করে না তাকে। কেউ কেড়ে নিতেও পারে না তা; যদি না তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে রাজি হন। বুদ্ধদেবের উপরিউক্ত বক্তব্যে কেউ ভাবতে পারেন যে, তিনি শিল্পীকে তাঁর সাংসারিক কর্তব্য থেকে ছুটি দিতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, চিন্তার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বরাজ বোঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলতে চান যে, শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য। কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া বা কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ, নিষ্ঠার সঙ্গে সে-মত বয়ে চলা শিল্পীর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্যসব চিন্তার ধারা বর্জন করে একান্তভাবে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদে দীক্ষিত হলে তাঁর নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না কেন, তাতে শিল্পদৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে। তাতে শিল্পীর অভিজ্ঞতাগুলো আপন প্রেরণার সুস্থিরতায় সুপক্ক না-হয়ে কেটে-ছেঁটে শাস্ত্রের মাপে মিলিয়ে নেবার ব্যাপার হবে। ফলত, সমগ্র মানবাত্মা শিল্পীর বাণীর লক্ষ্য হবে না। বরং তা হবে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়।

প্রসঙ্গ : শিল্পীর গোষ্ঠী-আদর্শ ও জীবনের অবিকল চেতনা

স্বাভাবিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় শিল্পীর কিছু দায়িত্ব থাকে। শিল্পীর দায়িত্ব মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখা। সেই সব বড়ো-বড়ো পুরোনো মূল্য, যা মানবসভ্যতার সমবয়সী বলে কোনোদিন পুরোনো হয় না, যা মানুষের সকল শুভকর্মের উৎপত্তিস্থল। তা নিজের ও অন্যের মধ্যে জাগিয়ে তোলা শিল্পীর কর্তব্য। মূল্যবোধ জাগাতে গিয়ে তিনি যদি বৃত্তবন্দি হয়ে পড়েন, যদি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়ে পড়েন তিনি, তবে সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণ হয় না; শিল্পের কল্যাণ তো দূরের কথা। বুদ্ধদেব বলেন :

> "শিল্পী যদি একান্তভাবে গোষ্ঠিগত হ'য়ে প'ড়েন, যদি তাঁর নিজেরই দৃষ্টি খণ্ডিত হয়, তাহলে জীবনের অবিকল চেতনা কেমন ক'রে আশা করবো তাঁর কাছে? যাঁকে শিল্পী বলি, তাঁর বুদ্ধি পূর্ণ জাগ্রত, সংবেদনশীলতা চরম; জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠেন তিনি, কোনো-একটা জায়গায় এসে আটকে যান না" (বসু, ১৯৮১ : ১৬৬)।

যদি আটকে যান তবে ক্ষতি তাঁর নিজের, বিশ্বমাতা ও তার সন্তানের। যেহেতু তার জিজ্ঞাসা সর্বগ, তার এষণা স্বাধীনভাবে ধাবিত হয় সর্বক্ষেত্রে, তাই আপন প্রকৃতির দাবি অনুসারে চারদিক থেকে তিনি শোষণ করে নেন যে-টুকু তাঁর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের মতে, শিল্পীর মন বহুরূপী, তার গতিবিধি অনির্ণেয়, তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সে-কারণে শিল্পীর অন্তর্গত মনন ও কল্যাণীয় শক্তির গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বুদ্ধদেব বসু সমর্থন করেন না।

বুদ্ধদেব বসু শিল্পের শুদ্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ শুদ্ধতা নিশ্চয়ই জীবনের অন্য-কোনো প্রসঙ্গে নয়; বরং শিল্পধর্মে। তাতে যেমন থাকে নিপুণতার প্রসঙ্গ, তেমনই থাকে প্রায়োজনিক স্থূলতাও। শিল্পধর্মের অবধারিত দাবিতে যদি অঙ্গীকৃত হয়, তবে স্থূলতাও তার অলঙ্কার এবং তা নির্ধারিত হয় শিল্পেরই মূল্যে। ব্যাপারটা ঘোমটা পরানো বা খসানোর নয়। শিল্পকে তিনি দেখতে চান তার শাশ্বত বাস্তবতার মূল্যে। আপাত কাঠিন্য যেমন তার প্রয়োজন, একই সঙ্গে তাতে চাই সদীপ্ত নম্রতা, সুস্থির কোমলতা। জীবনের এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই যা শিল্পে পরিত্যাজ্য। যে-কোনো উপাদানকে শিল্পরূপদানের সামর্থ্য যদি শিল্পীর থাকে তবে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে নেহায়েত ঘৃণ্য বস্তুও শাশ্বত সৌন্দর্যে বরণীয় হতে পারে। স্বতন্ত্র-স্বাধীন সত্তা হিসেবে শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশের পর থেকে এর রূপ-স্বরূপ, অন্তর্গত উপাদান ও সুন্দর-অসুন্দরের সমন্বয় নিয়ে যে-সব আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে তার তাত্ত্বিক আবহ শিল্পের উচ্চতাকে স্থাপন করেছে বোধ-বুদ্ধি-চেতনা-উপলব্ধির সদীপ্ত-কোমল বিশেষত্বে। শিল্পের ষড়ঙ্গ রূপের ভিন্নতায় বা নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের বিবেচনায় আধুনিক যুগে তা মানবীয় চৈতন্য বা মনন-আশ্রয়ী হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ বা কবিতার সৃষ্টি-শিল্পগুণ-প্রেষণা-প্রণোদনা-উপযোগিতা তথা প্রকরণ ও সমাজধর্মিতা নানা-যুগে নানা-জন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এসব বিষয়-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু সবিশেষ অবগত, তাঁর প্রবন্ধসমূহ যার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার পাশাপাশি এসব প্রবন্ধ সাক্ষ্য দেয়, বুদ্ধদেব বসুর বহুমুখী প্রতিভার এক বিস্তৃত দিগন্ত তাঁর চিন্তন-বিশ্ব। এ-বিশ্ব নির্মাণে তাঁর পঠনস্বভাবের ব্যাপকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একজন শুদ্ধ শিল্পীর নিজস্ব উপলব্ধির দার্ঢ্য ও মননের স্নিগ্ধতা। ফলে তাঁর গদ্যরচনায় যে বুদ্ধদেবকে পাওয়া যায় তিনি স্বকীয় বোধ-বুদ্ধি-অনুভবের ভিন্নতর উচ্চতায় একজন রূপতাত্ত্বিকও। অবশ্য এরূপ তত্ত্বচিন্তার সক্রিয় কোনো আয়োজন তাঁর মধ্যে ছিল না। একজন সৃষ্টিশীল কবি যে-ভাবে সমাজ ও শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে যান, তাঁর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। যেহেতু তিনি সৃষ্টিশীল শিল্পী, তাই শিল্প-সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি-অভিভাষণও নতুন-যুগ ও হাওয়ার আঁচে সমৃদ্ধ। শিল্পের শাশ্বত রূপ-রীতির অন্তর্গত সুর আত্মীকরণ করেও, সাহিত্যের ধ্রুপদী আদর্শের প্রতি সবিশেষ মুগ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে রোমান্টিক মনোভঙ্গির প্রকাশ স্পষ্ট।

তথ্যসূত্র

বসু, বুদ্ধদেব
১৯৬৩। *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*। এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
১৯৮১। *সাহিত্যচর্চা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১৯৮২ক। *প্রবন্ধ সংকলন*। প্রথম দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
১৯৮২খ। *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*. অন্তর্ভুক্ত *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, খণ্ড-৫*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ঢাকা

বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত পত্রাবলি

আবুল আহসান চৌধুরী

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)— এই নামটির সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার সম্পর্ক অতি নিবিড় ও আত্মিক। রবীন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে কীর্তিমান সব্যসাচী লেখক হিসেবে স্বীকৃত বুদ্ধদেবের সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় অনায়াস যাতায়াত থাকলেও, মূলত তিনি কবি এবং বলা চলে কবিতাতেই তাঁর প্রকৃত সিদ্ধি। জীবনের শেষতক্ কবিতার সপক্ষে তিনি লড়াই জারি রেখেছিলেন। বাংলা কবিতার আধুনিকায়নের জন্যে তাঁর ভূমিকা অনন্য। রবীন্দ্রপ্রভাব-বলয় ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন অনেকেই; তিরিশের কবিদের বেশ আগেই এবং সমসময়ে। কিন্তু তিরিশের কবিরাই, যাঁরা ‘কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি’ এবং কিছু পরে ‘পরিচয়-পূর্ব্বাশা-কবিতা’-র সঙ্গে ছিলেন যুক্ত, তাঁরাই মূলত আধুনিক কবিতার স্থপতি : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)– পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের (১৯০৯-১৯৬৯) নামও এসে যায়। তবে বুদ্ধদেব বসুর কথা একটু আলাদাভাবেই উচ্চারণ করতে হয়। কবিতার জন্যে এতো শ্রম, ত্যাগ, অনুরাগ আর নিন্দা-সমালোচনা-ভোগ তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে সম্ভবত আর কেউ করেন নি। কবিতাই ছিল তাঁর অশরীরী প্রণয়িনী– তাই পত্রিকার নাম দেন ‘কবিতা’, আবাসের নাম হয় ‘কবিতাভবন’, তাঁর হাতেই সঙ্কলিত হয় ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, আধুনিকতার শত্রু রক্ষণশীল ‘শনিবারের চিঠি’র আক্রমণের শিকার হতে হয় তাঁকেই। দুঃসময়ে বিপন্ন কবির পাশে এসে দাঁড়ান স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে ক্ষীণতনু সুলভ কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশেও তাঁর ভূমিকা অগ্রণীর, নতুন-প্রতিশ্রুতিশীল কবির রচনাকে স্বাগত জানানো কিংবা আধুনিক কবির রচনার মূল্যায়নেও তিনি ছিলেন গভীর আন্তরিক। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব ছিলেন কবি-কর্মী, কবিতার শিক্ষক ও প্রচারক এবং সেই অর্থে আধুনিক কবিতার মূল প্রতিনিধি। তাই লেখক-পরিচয়ে ‘কবি’ অভিধাটিই তাঁর জন্যে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে ওঠে।

২.

প্রকৃত-অর্থে চিঠিপত্রই ব্যক্তির অন্তরমহলের খাঁটি খবর পরিবেশন করে। তাঁর আবেগ, অনুভূতি, বেদনা, উল্লাস, নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষার পরিচয় কখনো প্রকাশ্যে– কখনো প্রচ্ছন্নভাবে মিশে থাকে চিঠির হরফে। ব্যক্তি-মানুষের আর কোনো প্রকাশ-মাধ্যমে এতো অকপট, বিশ্বস্ত ও আন্তরিকভাবে নিজেকে উন্মোচিত করার সুযোগ মেলে না। তাই চিঠিপত্র কোনো ব্যক্তির অন্তর্জগতের যথার্থ পরিচয়ের স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আর এই ব্যক্তি যখন শিল্পী হন, তখন তাঁর পত্রাবলি এক নতুন তাৎপর্য ও মাত্রা লাভ করে। বুদ্ধদেবের চিঠিপত্র সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

৩.

বুদ্ধদেব বসুর আয়ুর পরিধি ছিল ৬৬ বছর। এই সময়কালে নানাজনকে বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রসঙ্গে তাঁকে চিঠি লিখতে হয়। সেইসব চিঠির সংখ্যা বলা চলে কম নয়। চিঠি লেখায় বা জবাব দিতে তাঁর কখনো আলস্য ছিল না। বেশ কিছু চিঠিপত্র প্রকাশ পেয়েছে নানা পত্র-পত্রিকায়– সঙ্কলিত হয়েছে বইয়েও। বিশেষ করে তাঁর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে তাঁর চিঠিপত্র ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর রচনার রমণীয় শৈলীর গদ্যের স্বাদ পত্রাবলিতেও পাওয়া যায়। আর তাঁর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যও এইসব চিঠিতে ফুটে উঠেছে–স্পষ্ট ভাষণ, মিতবাক স্বভাব, গুছিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য পেশ এবং সেইসঙ্গে প্রীতি-অনুরাগ-কৃতজ্ঞতা-বিনয় বা সৌজন্য প্রকাশও অনুপস্থিত থাকে নি। এক অন্তরঙ্গ কাছের মানুষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর পত্রগুচ্ছে। অন্তত এখানে সঙ্কলিত ১৭টি অগ্রন্থিত চিঠিতে বুদ্ধদেবের এই রূপের সাক্ষাৎ মেলে। নানা সূত্রে ও প্রসঙ্গে চিঠিগুলো লিখেছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), হেমচন্দ্র বাগচী (১৯০৪-১৯৮৬), কায়সুল হক (জ. ১৯৩৩), সুরজিৎ দাশগুপ্ত (জ. ১৯৩৪), মোহিত রায় (১৯৩৫-২০০৫), আবু জাফর (জ. ১৯৪২) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে। চিঠিগুলো পাওয়া গেছে প্রাপক ও তাঁদের পরিবারের সৌজন্যে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রমুখের চিঠি সাবিত্রীপ্রসন্নের পুত্র দীপ্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (জ. ১৯২৮) সৌজন্যে সংগ্রহ করি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপা হয় আমার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি' (ঢাকা, ২০০০)-তে। জীবনানন্দের চিঠি আমার ভূমিকাসহ অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়। মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করি 'সাপ্তাহিক' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় (২০০৮)। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের চিঠিও আমার সম্পাদনায় প্রকাশ পায় ২০০৭-এর ঈদ সংখ্যা 'প্রথম আলো'য়। বুদ্ধদেব বসুর চারটি চিঠি বন্ধু আবদুল মোহিত ও আমি উপরিউক্ত অভিন্নসূত্র থেকে সংগ্রহ করি। মোহিত সেই চিঠিগুলো 'উলুখাগড়া' পত্রিকায় (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা : নভেম্বর ২০০৫) ছাপেন। সেই চিঠিগুলোও বর্তমান পত্র-সঙ্কলনে শামিল হলো।

বুদ্ধদেব যাঁদের পত্র লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন কবি ও সাময়িকপত্র-সম্পাদক হিসেবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একসময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে কারাবরণও করতে হয় তাঁকে। বীমা কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ছিলেন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা বিজ্ঞাপন-লাভের জন্য তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁর আনুকূল্য থেকে কেউই বঞ্চিত হতেন না। অন্নদাশঙ্কর– বাঙালি পাঠকের কাছে এই বহুমাত্রিক সব্যসাচী লেখক ও মুক্তমনের বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সারাজীবন তিনি শুভবুদ্ধি ও কল্যাণচেতনার পরিচয় দিয়ে গেছেন। সমাজ ও সমকাল তাঁর রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর আন্তরিক সৌজন্যবোধের কারণে লেখকদের সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি। চিন্তাদর্শের মতান্তর কখনো মনান্তরে পৌঁছায় নি। হেমচন্দ্র কল্লোল-যুগেরই এক প্রতিশ্রুতিবান কবি, যাঁর ট্র্যাজিক জীবন-পরিণতি পাঠকের মনে গভীর বেদনা জাগায়। কবি ও সাময়িকপত্র-সম্পাদক কায়সুল হক পাকিস্তান-কালপর্বে অনেকাংশে দুই বঙ্গের লেখকদের সেতুবন্ধ ছিলেন,

এ-কথা অনায়াসে বলা যায়। সাহিত্যবোদ্ধা সুরজিতের পরিচয় কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক, পত্রিকা-সম্পাদক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে। মোহিত রায় মূলত নদীয়ার জন-ইতিহাসের নিষ্ঠ গবেষক হিসেবে পরিচিত, এর বাইরে শিশুতোষ-সাহিত্য, লোকসংস্কৃতিচর্চা, সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠকের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। কবি-প্রাবন্ধিক আবু জাফর গীত-রচয়িতা হিসেবেও খ্যাতিমান– এদেশের সংগীতজগতের এক ব্যতিক্রমী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

৪.

এখানে সঙ্কলিত বুদ্ধদেব বসুর পত্রগুচ্ছের বিষয়-বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি চকিত অবলোকনে তার মন-মনন-মানসের পরিচয় গ্রহণও আবশ্যক।

অগ্রজ-কবি সাবিত্রীপ্রসন্নকে যে চিঠি লিখেছিলেন বুদ্ধদেব তাতে আন্তরিক সৌজন্য ও সেইসঙ্গে বিনয়েরও সাক্ষাৎ মেলে। চিঠিতে 'আনন্দিত হয়েছি', 'যদি দয়া করে পাঠান', 'আমার এই অনুরোধ রক্ষা করা', 'সেজন্য অপরাধ নেবেন না', 'একটি স্বল্পায়তন কবিতা পাঠিয়ে সুখী করবেন'– এ ধরনের উক্তি কথিত উন্নাসিক ও অহমবোধে আচ্ছন্ন লেখক ও মানুষ হিসেবে প্রচারিত বুদ্ধদেবের ভিন্ন এক চরিত্র-চিত্র তুলে ধরে।

লেখার জগতে দীর্ঘকালের এক নাওয়ের সওয়ারি অন্নদাশঙ্কর 'আর্ট' বইখানা বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করেছিলেন। বইখানা হাতে পেয়ে তিনি অন্নদাশঙ্করকে যে-চিঠি লেখেন তাতে 'আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন' এই কথা জানিয়ে এই 'ব্যক্তিগত প্রীতির নিদর্শন'-এর জন্যে 'কৃতজ্ঞতা' নিবেদন করেছেন। পাশাপাশি প্রসঙ্গত অন্নদাশঙ্করের লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নির্ভার ও স্বচ্ছন্দগামী গদ্য পড়ার বিশুদ্ধ সুখ' এই বইয়ের সূত্রে তিনি পেয়েছেন। এরপর টুকরো মূল্যায়ন-মন্তব্যে যথার্থই উল্লেখ করেছেন :

> বাংলা সাহিত্যে বীরবলের সার্থকতম উত্তরসাধক আপনি; সরলতা ও কৌতুক মিশিয়ে জ্ঞানগর্ভ বিষয়কে এমনভাবে রমণীয় করে তুলতে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ– এক প্রমথ চৌধুরী ছাড়া।

স্বল্প-পরিসরের এই চিঠিতে একদিকে যেমন সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, অপরপক্ষে লেখক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের নির্ভুল স্থান নির্দেশ করেছেন। আবার স্মৃতির ভেলায় ভাটির দিকে ফিরে গিয়ে বিগতকালের সেই আনন্দময় নির্দ্বন্দ্ব 'দিনগুলির সৌরভ' অনুভব করেছেন।

কায়সুল হক ও সুরজিৎ দাশগুপ্তকে যে-সব চিঠি লিখেছেন তাতে লেখার কথা ও '*কবিতা*' পত্রিকার প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। নবিশ লিখিয়েদের পৃষ্ঠপোষক চিরকালই ছিলেন বুদ্ধদেব। এ-দুজনকেও প্রেরণা জুগিয়েছেন নানাভাবে। '*কবিতা*' পত্রিকা ছিল তাঁর প্রিয় আত্মজার মতো। তাই বেদনা-কম্পিত কণ্ঠে 'কবিতা' 'উঠে যাবার আশঙ্কা খুবই আছে' বলে যখন সংশয় প্রকাশ করেন– তখন তাঁর অন্তরের হাহাকার প্রচ্ছন্ন থাকে এই কথার ভেতরে। *কবিতা*কে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে এঁদের কাছে গ্রাহক সংগ্রহের জন্যে কাতর আবেদনও জানাচ্ছেন বারবার। আর-একটি কথা, ততদিনে বুদ্ধদেব 'শখের' সাহিত্যচর্চার সময় পেরিয়ে গেছেন, লেখাকে 'পেশা' হিসেবে গ্রহণ করেছেন– উপার্জনের উপায় হিসেবে দেখছেন। তাই মফস্বলের তরুণ সম্পাদকের পত্রিকায় লেখার জন্যেও অর্থ দাবি করছেন। না করে উপায় নেই। প্রথম

জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে– তার পরেও অর্থ-সংকট কাটিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত সচ্ছলতার মুখ কখনোই দেখেন নি– জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে অনেকখানিই লেখার ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে– কখনো বা আপস করতে হয়েছে সাহিত্যরুচির আর শিল্পমানের সঙ্গে।

আবু জাফর– এখন একটি অপচায়িত প্রতিভার নাম। যৌবনের শুরুতে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন তাঁর আদর্শ–ধ্যান-জ্ঞান। বুদ্ধদেবের মতো জাফরকেও লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। বুদ্ধদেব যেমন মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে তাপদগ্ধ হয়ে শীতল আশ্রয় প্রত্যাশা ও প্রার্থনা করেছেন, ঠিক তেমনি। মফস্বল শহরের অখ্যাত কলেজে শিক্ষকতা করেও চলনে-বলনে-লেখায়-চিন্তা-চেতনায় যথার্থ অর্থে আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন এই মেধাবী যুবক। একরাশ অবসাদ-ক্লান্তি-হতাশা-আত্মপ্রকাশের অন্তরায় তাঁকে একসময়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। অস্তিত্বের এই সংকটের মুহূর্তে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঘটে বুদ্ধদেবের সঙ্গে। বুদ্ধদেব মমত্বশীল অভিভাবকের মতো এই মেধাবী সাহিত্যপ্রেমী যুবককে দূর থেকে পথনির্দেশ করেছিলেন, যা তার পরম পাথেয় হয়ে উঠেছিল, মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে– উত্তরকালে প্রতিষ্ঠার পথে। বুদ্ধদেব যা বলেছিলেন 'অস্থির ও সংবেদনশীল'– পথ খুঁজে না-পাওয়া জাফরকে, তার ভেতরে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও অনেকখানি প্রচ্ছন্ন ছিল :

> ... তোমার এই বেদনা, অস্থিরতা, পারিপার্শ্বিকের উপর অসন্তোষ– এগুলি আমার খুব পরিচিত সামগ্রী, আমার মধ্যে, এই বয়সেও, তাদের বীজাণু নিত্য উপস্থিত। ...এ থেকেও কখনো-কখনো সঞ্চারিত হয় সেই শক্তি যাতে আমরা জগৎকে না হোক, নিজেকে বদলাতে পারি।

তিনি পরামর্শচ্ছলে আরো যে-কথা বলেছিলেন তা যে-কোন লেখকের জন্যেই অনুসরণীয় বক্তব্য :

> তুমি সাহিত্য ভালোবাসো, সাহিত্যিক হতে চাও; তোমার জীবনের এই ভিত্তিটিকে যদি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারো তাহলে কোনো অবস্থাতেই নিজেকে দুঃসহভাবে পীড়িত মনে হবে না। সেইটিকে ভিত্তি করে তোমার জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করো।

নিছক উপদেশ-দানের প্রবণতা থেকে নয়, নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এ-কথা বলতে পেরেছিলেন :

> ...এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কেউ কাউকে হাতে ধরে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না; আমরা জীবন ভরে নানা লোকের সংস্পর্শে উদ্দীপিত ও উপকৃত হয়ে থাকি, কিন্তু আসল কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হয়, সেখানে আমরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ।

হেমচন্দ্র বাগচী ছিলেন কল্লোলের কালের লেখক– মূলত কবি– অধুনা প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম। তাঁর রচনার সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় হয়তো কেবল বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪০/ সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ : ২০০২) সঙ্কলনের সৌজন্যে। অবশ্য তাঁর জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে কলকাতার প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান 'ভারবি'র পক্ষ থেকে *শ্রেষ্ঠ কবিতা* নামে একটি শীর্ণকায় কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশ পেয়েছে। অথচ হেমচন্দ্র কল্লোল-যুগের এক বিশিষ্ট কবি, –যিনি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর মনোযোগ কেড়েছিলেন, মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) যাঁকে দিয়েছিলেন কবি-স্বীকৃতি, বুদ্ধদেব বসু-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪-১৯৭৬) যাঁর মূল্যায়নে ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ।

হেমচন্দ্রের কবিকণ্ঠ ছিল ভিন্ন স্বরের– একধরনের স্নিগ্ধ নম্রতায় আচ্ছন্ন– কোমল-পেলব, রোমান্টিক। তাঁর স্বভাব ও কবিতার মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য সহজেই আবিষ্কার করা যায়। বন্ধু বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতিচর্চায় (*আমার যৌবন*, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৬; পৃ. ৭৪-৭৫) উল্লেখ করেছেন :

> 'কল্লোল' থেকেই আমার বন্ধু ছিল হেম বাগচী। ...চালচলনে আমাদের মতো নয় হেম, উড়ুক্কু তার আদৌ আসে না। ...তার সঙ্গে আমার মনের প্রকৃতি ঠিক মেলে না, কিন্তু তবু– অথবা সেইজন্যেই– আমার বিশেষ-একটু ভালো লাগে তার শান্ত হাসি ও স্নিগ্ধ আলাপ, অনুভব করি তার মধ্যে একটা নির্মলতা যা আমরা হারিয়েছি। ...সে কথা বলে নরম গলায় থেমে-থেমে, তর্ক করে না; কারো বিরুদ্ধে কিছু বলে না, কাউকে বা কোনো কিছুকে নির্দোষভাবেও ঠাট্টা করে না– কোনো বিষয়ে প্রবল মতামত আমি তার মুখে শুনিনি, তার লেখারও কোনো নিন্দুক বা সমালোচক নেই। আমাদের মধ্যে নির্দ্বন্দ্ব লেখক সে-ই একমাত্র।

বুদ্ধদেব হেমচন্দ্রের প্রকৃতির স্বরূপ যেমন তুলে ধরেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে, তেমনি তাঁর কবিতার বিচারও করেছেন নির্মোহভাবে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণে কল্লোলগোষ্ঠীর কবিদের রচনায় ঐতিহ্য-অস্বীকার ও প্রথাবিরোধিতার যে প্রয়াস ছিল, হেমচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের রচনায় সেই আধুনিক মনন ও প্রতিবাদী চেতনার নির্ভুল স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-কথা সত্য যে, 'তার কবিতায় সুষ্ঠুতা থাকলেও ভাবে-ভঙ্গিতে চমকপ্রদ কিছু নেই, তার কবিতার বই 'দীপান্বিতা'র নামকরণটিও অনাধুনিক' (বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৫)। তবে মানসিক ভারসাম্য হারানোর কিছু আগে তিনি যে *গীতিগুচ্ছ* রচনা করেন, বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা 'কল্লোলে'র আধুনিক কবিতার সমানধর্মা। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> এই সময়েই [হেমচন্দ্র যখন কলকাতার পাঠ চুকিয়ে দিতে উদ্‌যোগী], তার মন ভাঙনের প্রান্তে, তখনই তার ঘূর্ণি-কৃষ্ণনগরের ঠিকানা থেকে হেম আমাকে পাঠিয়েছিল তাঁর *গীতিগুচ্ছ*– আমার মতে সেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে সে অবিকলভাবে প্রকাশ করেছিলো, তার অচির-সমাপ্ত কবিজীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো!
>
> [বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৬-৭৭]

বুদ্ধদেব হেমচন্দ্রকে তাঁর বিশিষ্ট ও প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি একটি সানুরাগ প্রীতি তাঁর মনে সবসময়ই জাগ্রত ছিল। তাঁকে লেখা বুদ্ধদেবের চিঠিগুলো সবই সংক্ষিপ্ত ও কাজের কথায় পূর্ণ। কিন্তু এর ভেতরেও একধরনের আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হেমচন্দ্র মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তার অনেক আগেই কলকাতা ছেড়েছেন, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির জীর্ণ গৃহ হয়েছে তাঁর স্থায়ী আবাস। হেমচন্দ্রের জীবন কখনোই সচ্ছল ছিল না, দারিদ্র্যের প্রহারে জীবনের স্বপ্ন-সাধ বারবার চূর্ণ হয়েছে। মানসিক বৈকল্য আর অপরিসীম দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার কোনো উপায় জানা ছিল না তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের। সামান্য সরকারি সাহিত্যিক-ভাতা আর এর-ওর দান-অনুদানের অনুগ্রহে তাঁকে গ্লানিময় শেষজীবন কাটাতে হয়েছে। হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে কেউ তাঁর পাশে সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে দাঁড়ানো তো দূরে থাক, তাঁর খোঁজ-খবর নিয়েছেন এমন তথ্যও জানা যায় না। তাঁর এই বিপন্ন মুহূর্তে অস্তিত্বের সংকটের কালে একমাত্র বুদ্ধদেবই এগিয়ে এসেছিলেন, সাড়া দিয়েছিলেন আন্তরিক বন্ধুকৃত্য ও সাহিত্যিক কর্তব্যের বশে। *কবিতা* পত্রিকায়

হেমচন্দ্রের অসুস্থতার খবর জানিয়ে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত দু-একখানি বই বিক্রির অর্থ অসুস্থ কবির সাহায্যার্থে প্রেরণের আকাঙ্ক্ষার কথাও *'কবিতা'*য় প্রকাশিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্রের এই সার্বিক দুরবস্থার কালে সব জানিয়ে সরকারি ভাতা বৃদ্ধির জন্যে কৃষ্ণনগরের মোহিত রায় চিঠি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে। তার জবাবে হেমচন্দ্রের দুরবস্থার খবর শুনে 'বেদনা অনুভব'-এর কথা জানিয়ে বুদ্ধদেব ভাতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিলেন :

> যতদিন শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বাঙালি সাহিত্যিকদের জন্য চেষ্টার ক্রুটি করতেন না; বর্তমান পরিস্থিতি আমার কিছুই জানা নেই।

সরকারি বৃত্তি বৃদ্ধির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে বুদ্ধদেব যে সুপারিশপত্র লিখে দেন এক কথায় তা মর্মস্পর্শী এক আন্তরিক আবেদন। এই পত্রে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদ্যতার সম্পর্ক, ব্যাধিগ্রস্ত কবির অপরিসীম আর্থিক দুরবস্থা, মানবেতর যাপিত জীবনের ইঙ্গিত, দুর্দশাপীড়িত বন্ধুর প্রতি সহমর্মিতা, বৃত্তি-বৃদ্ধির জন্যে সরকারি কর্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমি তাঁর কবিতার বিশেষ অনুরক্ত, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিলো' এবং 'তাঁকে আমরা বিদগ্ধ ও নির্মল চরিত্রের মানুষ হিশেবেও ভালোবেসেছি'– হেমচন্দ্রের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে এই যে উক্তি, তাতে অতি-কথন নেই। বর্ধিত হারে সরকারি বৃত্তিলাভের ক্ষেত্রে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেছেন, 'কী সাহিত্যিক হিশেবে, কী দুরবস্থার বিচারে, তাঁর যোগ্যতা তর্কাতীত বলে আমার মনে হয়'। শেষে সরকার এই দুস্থ কবিকে উপযুক্ত সহায়তা করবেন এই প্রত্যাশা করেছেন, নইলে 'অদৃষ্ট তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে, তদুপরি যদি তাঁকে অর্ধাশন-ক্লেশ ভোগ করতে হয় সেটা বাংলাদেশের সুধীসমাজের পক্ষে নিদারুণ পরিতাপের বিষয় হবে' বলে আশঙ্কা করেছেন। এখানে এক ভিন্ন বুদ্ধদেবকে আমরা খুঁজে পাই। কবিবন্ধু হেমচন্দ্র বাগচীর চরম দুরবস্থা ও বিপন্নকালে সরকার সমীপে সহায়তার আবেদন ও সহানুভূতি জানিয়ে লেখা এই চিঠি বুদ্ধদেবের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি যেমন, তেমনি অতুলনীয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও তুলে ধরে। শিল্পী বুদ্ধদেবের কৃতি-কীর্তি ছাপিয়ে মানুষ বুদ্ধদেবের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে মুদ্রিত।

৫.

বুদ্ধদেবের চিঠিতে কখনো কখনো প্রায় প্রবচনতুল্য বাক্য বা মন্তব্যের সাক্ষাৎ মেলে। এ-রকম একটি প্রবচন-মন্তব্য (কায়সুল হককে লেখা চিঠি থেকে) উদ্ধৃত করে জন্মশতবর্ষে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁরই কিছু অগ্রন্থিত পত্র সাজিয়ে : 'দুঃখের বিষয়, অসীম সময় মানুষের জীবনে নিতান্তই সীমাবদ্ধ'।

অগ্রন্থিত পত্রগুচ্ছ

পত্র : ১ [হেমচন্দ্র বাগচীকে]

৭/৬/৪১

প্রিয় হেম,

তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি হলো, অপরাধ নিয়ো না। তোমাদের পত্রিকার জন্য এখন কোনো লেখা পাঠাতে পারলুম না, পরে দেবো। যে-ধরনের প্রবন্ধ চেয়েছ তার ফরমায়েস আরো আছে, কিন্তু আপাতত কোনো লেখাতেই হাত দিতে পারছি না।

তুমি কবে নাগাদ কলকাতায় ফিরবে? আমি মাঝে কয়েকদিন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এলুম। তুমি যে বিদেশী কাগজের নাম চেয়েছ সেরকম কোনো কাগজের নামই আমার জানা নেই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে কার কার ঠিকানা চাও জানালে নিশ্চয়ই পাঠাবো যতটা সাধ্য।

আশা করি তোমার শারীরিক কুশল।

[বুদ্ধদেব বসু]

পত্র : ২ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে]

১৩.৩.৪২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করে *কবিতার* জন্য একটি কবিতা পাঠিয়েছেন এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনার কবিতাটি পড়ে আমি উপভোগ করলুম, এবং এটি *কবিতার* কোনো পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করবার অনুমতি আপনার কাছে চাচ্ছি। কিন্তু আগামী সংখ্যার জন্য অন্য একটি ছোটো কবিতা (যা এক পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে) যদি দয়া করে পাঠান তাহলে খুব ভালো হয়– আশা কবি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না। বর্তমানে কাগজের দাম এত চড়তি যে বাধ্য হয়েই *কবিতার* পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় অর্ধেক করে দিতে হয়েছে, তার ওপর সমালোচনা বিভাগের জন্য অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে স্থানাভাবের জন্য নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। প্রতিবছর পুজোর সময় আমরা যে-বিশেষ সংখ্যাটি বের করি, আপনার এ-কবিতাটি তার জন্য রেখে দিতে চাই; আশা করি সেজন্য অপরাধ নেবেন না, এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আগামী সংখ্যার জন্য একটি স্বল্পায়তন কবিতা পাঠিয়ে সুখী করবেন।

প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ৩ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে]

১৭.৩.৪২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার দৈত্যপুরী কবিতাটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। ধন্যবাদ জানবেন।

পঙ্কজবাবু বলেছিলেন আপনার পূর্বপ্রেরিত গদ্যকবিতাটি আপনি পত্রান্তরে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে চেয়েছেন। এ-অবস্থায় আপনার ইচ্ছা অমান্য করতে পারলুম না, কিন্তু আমাদের পূজা সংখ্যার জন্য এর বদলে একটি কবিতা দিতে হবে এ-অনুরোধ অনেক আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।

আশা করি আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল। প্রীতি গ্রহণ করুন।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ৪ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে]

১৮.৭.৪৫

প্রীতিভাজনেষু

আষাঢ় সংখ্যা *কবিতার* আপনার কপি, ভাউচার কপি ও বিল পাঠালাম। চৈত্র সংখ্যার বিল এতদিনে পাস হয়ে গেছে নিশ্চয়ই (Bill No.686, dated 12.5.45)? পত্রবাহকের হাতে দয়া করে চেক পাঠালে সুখী হব।

'ছোটোগল্পে'র বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুগ্মসংখ্যায় আমার একটি বড় গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। এ-সংখ্যাটিতে আপনাদের একটি Casual insertion যদি দিতে পারেন, অত্যন্ত সুখী হই। এবার চারটি Ordinary page রাখছি, রেট কবিতার মতোই, পূর্ণ পৃষ্ঠা ২৫ [টাকা], অর্ধ-পৃষ্ঠা ১৫ [টাকা]–১২.৫% বাদ যাবে। আপনার অনুমতি পেলে আষাঢ়ে প্রকাশিত কপি দিয়ে দিতে পারি।

আশ্বিনের 'কবিতা' ১লা আশ্বিনে বের করবার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করছি। আপনার একটি কবিতা এই সপ্তাহের মধ্যেই দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন কি?

ধন্যবাদ ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ৫ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে]

২ বৈশাখ ১৩৫৩

প্রীতিভাজনেষু

নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ জানাই। আশা করি আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল।

এ-বছরে *বৈশাখী* বৈশাখের শেষে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা। এই সংখ্যায় আপনার একটি কবিতা পেলে সুখী হব। মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়েছে, একটু তাড়াতাড়ি পেলেই ভালো হয়।

বৈশাখীর বিজ্ঞাপন বিষয়ে আপনাদের দপ্তর থেকে কোনো নির্দেশ এখনো পাই নি। দয়া করে ব্যবস্থা করবেন? একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা?

প্রীতিবদ্ধ

বুদ্ধদেব বসু

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পত্র : ৬ [হেমচন্দ্র বাগচীকে]

১৪.৮.৪৬

প্রিয় হেম,

বৈশাখী কবিতা সবই তোমার পূর্বের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম, সবই খোওয়া গেল! আজ আবার পাঠাচ্ছি, আশা করি তোমার পড়ে ভালো লাগবে। যখন যেখানে থাকো, নতুন ঠিকানা সঙ্গে সঙ্গে জানালে ভালো হয়।

তোমার নতুন কবিতা শীঘ্র পাঠিয়ো, তাহলে *'কবিতা'*র আশ্বিন সংখ্যায় দিতে পারি। বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ছ শুনে সুখী হলাম। এখন কি দেশেই থাকবে?

বুদ্ধদেব

পত্র : ৭ [হেমচন্দ্র বাগচীকে]

৪.৯.৪৬

প্রিয় হেম,

কবিতায় প্রকাশিত রচনার জন্য আমরা অর্থমূল্য দিই না, দিতে পারি না। তোমার বিজ্ঞাপন আশ্বিন সংখ্যার *কবিতায়* দেব। নতুন কোনো কবিতা লিখলে পাঠিয়ো।

প্রীতি।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ৮ [সুরজিৎ দাশগুপ্তকে]

১৯.৯.৫০

কল্যাণীয়েষু,

আমার কবিতার বইয়ের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি নির্বাক। তোমরা পাঠক, তোমরা তার বিচার কোরো।

কবিতা উঠে যাবার আশঙ্কা খুবই আছে, তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তোমাদের অঞ্চলে *কবিতার* কিছু গ্রাহক হতে পারে কি? তোমার যখন এ-বিষয়ে আগ্রহ আছে, হয়তো তুমি চেষ্টা করবে?

আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন সংস্করণ শীঘ্র বেরোবার সম্ভাবনা দেখছি না। –'কবিতা' আষাঢ় সংখ্যা এখনো বেরোয়নি।

'Nine' অতিরিক্ত কোনো কপি আমার কাছে নেই। এ-দেশে কোথাও পাওয়া যায় বলেও জানি না।

আমার শুভকামনা তোমাকে জানাই।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ৯ [সুরজিৎ দাশগুপ্তকে]

১০ এপ্রিল ১৯৫১

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের পত্রিকায় 'আবছায়া'র পুনর্মুদ্রণ করতে চাও। কথাটা এই যে আমি সকলের কাছেই অর্থমূল্য নিয়ে থাকি, তোমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করলে অন্যদের প্রতি অন্যায় করা হয়।

অতএব তোমরা ওটি ছেপো না।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১০ [সুরজিৎ দাশগুপ্তকে]

১৫ মে ১৯৫১

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের পত্রিকায় আমার 'আবছায়া' গল্পটির পুনর্মুদ্রণ করতে পারো। বিশেষ অনুরোধ এই যে ছাপার ভুল কোরো না। নিম্নলিখিত স্বীকৃতিটুকু মুদ্রিত করতে ভুলো না–

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর
গল্পসংকলন গ্রন্থ থেকে লেখক
এবং প্রকাশকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১১ [সুরজিৎ দাশগুপ্তকে]

২৪ আগস্ট ১৯৫১

কল্যাণীয়েষু,

কবিতার পুনর্মুদ্রণ বিষয়ে জানতে চেয়েছো। 'এই সব'-এর জন্য দশ টাকা, এবং অন্য তিনটির প্রত্যেকটির জন্য কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। তোমরা যা স্থির করো সেই অনুসারে অর্থমূল্য একসঙ্গে অগ্রিম পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো।

কবিতার আষাঢ় সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। শুভকামনা জানাই।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১২ [কায়সুল হককে]

১৬.১২.৫১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার আঠারো টাকার মনি-অর্ডার পৌঁছেছে। তোমাকে পাঠানো হলো দ্রৌপদীর শাড়ি, সব পেয়েছির দেশে, উত্তরতিরিশ, দীনেশ দাশের কবিতা, নতুন দিন, সংকলিতা। (সম্রাট ছাপা নেই।) ১৩ টাকার বই, মাশুল ইত্যাদি-১=১৪। অতএব আর চার টাকার তোমার এখানে জমা থাকলো। এর বিনিময়ে কী বই চাই জানালে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

তোমার চিঠিতে অন্য যে-সব প্রশ্ন করেছো তার জবাব দেয়া সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয়, অসীম সময় মানুষের জীবনে নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বুদ্ধদেব বসু তোমার কবিতা পেয়েছি– তোমার লেখার হাত আছে সন্দেহ নেই। তবে অনুশীলনসাপেক্ষ।

পত্র : ১৩ [কায়সুল হককে]

২১.১০.৫২

কল্যাণীয়েষু,

পূর্ব বাংলায় *কবিতার* চাঁদা জমা দেবার কোনো ঠিকানা নেই; ভারতীয় ডাকঘর থেকে মঃ-অঃ করতে হবে, নয়তো ফরেন এক্সচেঞ্জে ব্যাংকের ড্রাফট পাঠালেও চলতে পারে।

আমি তোমাকে পূর্বেই জানিয়েছিলুম যে তোমাদের সঙ্কলনে দেবার মতো কোনো লেখা আমার বা প্রতিভা দেবীর নেই। আমাদের আর-একটা অসুবিধা এই যে রচনার জন্য অর্থমূল্য নিয়ে থাকি। দিতে পারলে খুশি হতুম বলাই বাহুল্য।

নজরুল ইসলামের চিঠিপত্র আমাদের কাছে কিছুই নেই।
আশা করি তোমার কুশল।

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১৪ [মোহিত রায়কে]

কবিতাভবন
পি-৩৬৪/১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৪৭
২৫/৭/৬৭

সবিনয় নিবেদন,

হেমচন্দ্র বাগচী বিষয়ে আপনার চিঠিখানা পেয়ে সুখী হয়েছি, সেই সঙ্গে বেদনাও অনুভব করলাম। সরকারি কার্যপ্রণালী বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর, তবু এ-ব্যাপারে আমার যা যথোচিত পদ্ধতি বলে মনে হয় তা জানাচ্ছি। হেমচন্দ্রের পত্নী যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বামীর অবস্থা জানিয়ে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানান। এই সঙ্গে আমি একটি পত্র পাঠাচ্ছি, অনুরূপ সমর্থনপত্র অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং সম্ভব হলে তারাশঙ্কর ও অন্য দু'একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে সংগ্রহ করে চিঠির সঙ্গে গ্রথিত করে দেবেন। চিঠিটা আপনি বা অন্য কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর সেক্রেটারির হাতে দিয়ে আসেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়, নচেৎ রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাবেন। যতদিন শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বাঙালি সাহিত্যিকদের জন্য চেষ্টায় ত্রুটি করতেন না; বর্তমান পরিস্থিতি আমার কিছুই জানা নেই। তবে এই আবেদন মঞ্জুর হবে বলেই আশা করছি।

হেমচন্দ্র ও পরিবারবর্গকে আমার ও প্রতিভা বসুর প্রীতি ও শুভকামনা জানালে বাধিত হবো।

নমস্কারান্তে,

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১৫ [পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে]

কবিতাভবন
পি-৩৬৪/১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৪৭

আমার যৌবনের সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে কবি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী অন্যতম। আমি তাঁর কবিতার বিশেষ অনুরক্ত, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিলো। আজ দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অচিকিৎস্য মানসিক ব্যাধিতে ক্লিষ্ট হয়ে বেঁচে আছেন। কোনো উপার্জন নেই, বিষয়-আশয় নেই বললেই চলে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে মাসিক পঁচাত্তর টাকার একটি বৃত্তিদান করেন; তাঁর ও তাঁর পত্নীর পক্ষে সেটিই প্রধান বা একমাত্র নির্ভর। কিন্তু বর্তমানে ঐ অর্থে দুজন মানুষের নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করাও দুঃসাধ্য। আমি তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আন্তরিক

অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে হেমচন্দ্রের বৃত্তির হার মাসিক অন্তত দেড়শো টাকায় উন্নীত করেন। কী সাহিত্যিক হিসেবে, কী দুরবস্থার বিচারে, তাঁর যোগ্যতা তর্কাতীত বলে আমার মনে হয়।

হেমচন্দ্র বাগচী সংস্কৃত সাহিত্যে এমএ পাস করেছিলেন এবং তাঁর ব্যাধির সূত্রপাতকালে ল্যান্সডাউন রোড-স্থিত পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন তাঁকে আমরা বিদগ্ধ ও নির্মল চরিত্রের মানুষ হিসেবেও ভালোবেসেছি। অদৃষ্ট তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে, তদুপরি যদি তাঁকে অর্ধাশন-ক্লেশ ভোগ করতে হয় সেটা বাংলাদেশের সুধীসমাজের পক্ষে নিদারুণ পরিতাপের বিষয় হবে। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই দুর্গতি থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন।

২৫.৭.৬৭

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১৬ [অন্নদাশঙ্কর রায়কে]

২৭.১২.৬৮

প্রিয়বরেষু,

আজ ডি.এম. লাইব্রেরি মারফৎ আপনার 'আর্ট' বইখানা পেলাম। এর অনেকখানি অংশ আমার পূর্বপরিচিত, কিন্তু হাতে পাওয়ামাত্র আবার স্বাদ নেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। উৎসর্গ-পত্রে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন; পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে দিয়েছেন নির্ভার ও স্বচ্ছন্দগামী গদ্য পড়ার বিশুদ্ধ সুখ। বাংলা সাহিত্যে বীরবলের সার্থকতম উত্তরসাধক আপনি; সরসতা ও কৌতুক মিশিয়ে জ্ঞানগর্ভ বিষয়কে এমনভাবে রমণীয় করে তুলতে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ– এক প্রমথ চৌধুরী ছাড়া। আমাদের সেই সব খোলামেলা দিন, যখন তর্কে ঝাঁজ ছিল না, সাহিত্যিকেরা অনম্যভাবে 'শিবিরে' বিভক্ত হয়ে যাননি– সেই লুপ্ত দিনগুলোর সৌরভ আপনার বইয়ে নতুন করে পাওয়া গেলো। এটি আপনার সমবয়সীদের পক্ষে একটি মূল্যবান উপহার।

আর-একবার, বইটিতে আমার প্রতি যে-ব্যক্তিগত প্রীতির নিদর্শন আছে, তার জন্য আর-একবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা না-জানিয়ে চিঠি শেষ করতে পারছি না। আর আমাদের উভয়ের প্রীতিনমস্কার আপনাদের উভয়কে–

বুদ্ধদেব বসু

পত্র : ১৭ [আবু জাফরকে]

কবিতাভবন
পি-৩৬৪/১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৪৭
১৪ মে, ১৯৬৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানাতে এক অস্থির ও সংবেদনশীল মনের স্পর্শ পেলাম। কিন্তু তোমার এই বেদনা, অস্থিরতা, পারিপার্শ্বিকের ওপর অসন্তোষ, নিজের বিষয়ে অসন্তোষ– এগুলি আমার খুব পরিচিত সামগ্রী, আমার মধ্যে, এই বয়সেও, তাদের বীজাণু নিত্য উপস্থিত। মৌলিকভাবে এগুলিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বললে ভুল হয় না (যদিও অনেক সময় তা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে থাকে); এ থেকেও কখনো-কখনো সঞ্চারিত হয় সেই শক্তি যাতে

আমরা জগৎকে না হোক, নিজেকে বদলাতে পারি। ইতিহাসে সংবাদপত্রে যাকে বিপ্লব বলেন, তাতে যে আমি বিশেষ আস্থাবান তা নয়; আমার মনে হয় চেতন মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে নিরপরাধ কাজ হলো নিজেকে বদলানো। কলেজের মাস্টারি ছেড়ে অকস্মাৎ দক্ষিণ বাংলার চটকলে মজদুরি দিলে তুমি বাইরের দিক থেকে তোমার জীবনে চমকপ্রদ পরিবর্তন আনতে পারো, কিন্তু শুধু সেটুকুতেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে এমন আশা মনে রেখো না। সত্যি বলতে, সমস্যা নিয়েই জীবন্ত থাকি আমরা, বেড়ে উঠি, চলিষ্ণু হই– সেগুলি থাকা ভালো; আমরা যদি নেহাৎই শূন্যে ভাসমান হয়ে দিন না কাটাই তাহলে সেগুলি কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তুমি সাহিত্য ভালোবাসো, সাহিত্যিক হতে চাও; তোমার জীবনের এই ভিত্তিটিকে যদি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারো তাহলে কোনো অবস্থাতেই নিজেকে দুঃসহভাবে পীড়িত মনে হবে না। সেইটিকে ভিত্তি করে তোমার জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। আজ তোমার মনে হচ্ছে তোমার আশাকে পুষ্টি দেবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ তোমার নেই, কিন্তু সেই বাঞ্ছিত পরিবেশ হয়তো তোমারই দ্বারা সৃষ্টি হবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই পৃথিবীতে কোথাও কোনো 'আদর্শ অবস্থা' নেই। আমরা যে যতটুকু রচনা করে নিতে পারি, সেটুকুতেই আমাদের সার্থকতা।

কবিতা এখন আর বেরোয় না, কয়েক বছর আগেই উঠে গেছে। সম্প্রতি আমার জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত *কলকাতা* নামে একটি মাসিকপত্র বের করেছে; সে নিজে গদ্যে পদ্যে অনেক লিখে থাকে, নতুন লেখকদের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। তোমার কবিতা দুটি আমি জ্যোতির্ময়কে দিয়েছি, অন্তত একটি খুব সম্ভব ছাপা হবে, তুমি ইচ্ছে করলে তাকে আরো লেখা পাঠাতে পারো– ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯– এই ঠিকানায়। লেখা ছাপা হলে উৎসাহ পাওয়া যায় তাতে সন্দেহ নেই, তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কেউ কাউকে হাতে ধরে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না; আমরা জীবন ভরে নানা লোকের সংস্পর্শে উদ্দীপিত ও উপকৃত হয়ে থাকি, কিন্তু আসল কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হয়, সেখানে আমরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ। তুমি যেন নিজেকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারো, এই শুভকামনা তোমাকে জানাই।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বাংলাদেশ

আমিনুর রহমান সুলতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাবকে এড়িয়ে নতুন ধারার বাংলা কবিতা লেখা নতুন প্রজন্মের কোনো কবির পক্ষে ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার। জীবনানন্দ দাশ *ঝরা পালক*–এ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম কাব্যসৃষ্টি স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মর্মবাণী*-র প্রেরণা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন,

> বুদ্ধদেবের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই।[১]

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কিংবা জীবনানন্দ দাশের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের পথটি খুঁজে নিতে এবং রবীন্দ্র-নজরুল বলয় অতিক্রম করতে মাত্র একটি করে কাব্যগ্রন্থের পথকে পাড়ি দিতে হয়েছিল।

ত্রিশের দশকেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎও হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নায়ন ঘটেছে বিষয়ের নতুনত্বে বাক্‌ব্যবহারে কথ্যভঙ্গির সহজ ও আটপৌরে এবং সমাসবদ্ধ শব্দের কৌশল অবলম্বন ও ক্রমাগত ভঙ্গিবদলে। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় বলা যায়,

> যৌবন, কাম, কবিতা, শিল্প– এইসব পরস্পর সংসক্ত
> বিষয়ের মধ্যেই বুদ্ধদেব সারাজীবন ক্রমাগত ক্লান্তিহীন
> সফর করেছেন।[২]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রেম, কাম, ব্যক্তি, প্রকৃতি, সংস্কৃতি, নাগরিক বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য নতুন ভাবনার ফসল হয়ে বাংলা কবিতার গোলা সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রেম ও কামের ভাবনা এজন্যেই নতুন যে, তাঁর প্রেম অতিন্দ্রীয় নয়, ইন্দ্রিয়ঘন ও বাস্তবলোকবাসী। আর কামেও তাই এবং কামে শরীরী উপস্থাপন ঘটেছে ঐশ্বরিক আপেক্ষিকতা উপেক্ষা করেই। কাম ও শরীর তাঁর জীবনকেই অনুসন্ধান করে। আর বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, নিঃসঙ্গতা কেবল পাশ্চাত্যপ্রভাবিত ফ্যাশন ছিল না তাঁর। বিশ্বজিৎ ঘোষ যথার্থই বলেছেন,

> বস্তুত, বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা–উভয় প্রবণতাই আমরা লক্ষ করি বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিকর্মে। তাঁর কাছে নিঃসঙ্গতা পলায়ন নয়, তা সত্য অবলোকন ও আত্মসম্প্রসারণের অন্তহীন প্রেরণা, সৃষ্টিশীলতার অনন্ত উৎস।[৩]

এছাড়াও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতও উঠে এসেছে। যদিও তা কোনো মতবাদে আস্থা রাখে নি। ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু কবিতা আছে যা নস্টালজিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। আর এই পর্যায়ের কবিতায় জায়গা পেয়েছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রিয়মুখসহ অন্যান্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, জনপদ, সংস্কৃতি, নদী ও প্রকৃতি প্রভৃতি। বাংলাদেশ

> প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় উঠে আসার কারণও রয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কবি মানস গঠন হয়েছে বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির প্রবল আকর্ষণ ও স্পর্শে। যদিও তার কবি প্রতিভার বিকাশ পর্ব ছিল রুদ্ধশ্বাস নাগরিকভূমি কলকাতার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিবেশ। যে কলকাতা তাঁর কাছে ছিল এক অতিবৃহৎ ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।[৪]
>
> বুদ্ধদেব বসুর পৈতৃক এবং মাতৃকুল দুয়েরই আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুর। তবে তিনি জন্মেছিলেন কুমিল্লায় তাঁর দাদা মশাইয়ের তৎকালীন কর্মস্থলে। বুদ্ধদেব বসুর জন্মের পরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রসবোত্তর ধনুস্টংকার রোগে তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে মাতামহ ও মাতামহীর ঘরেই মানুষ হয়েছিলেন। মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও মাতামহী স্বর্ণলতা তাঁর বাল্যজীবনকে পরিবৃত করে রেখেছিলেন।[৫]

মাতামহের সূত্রেই বুদ্ধদেবের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমপাদ কেটেছিল কুমিল্লা, নোয়াখালী আর ঢাকায়। বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো তাঁর বসবাসের অবস্থান ও তাঁর সাহিত্যজগতের প্রাথমিক স্তরের মানস গঠনের প্রেক্ষাপট বুঝবার জন্যে।

> কুমিল্লা আমার জন্মস্থান, কিন্তু আমার স্মৃতির শুরু নোয়াখালীতে। ... ততদিনে আমি এক ঝুড়ি ভর্তি কবিতা আর গল্প-প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি; 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার; ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'তোষিণী'তে আমার লেখা বেরিয়েছে, আর বর্জইস অক্ষরে কলকাতার 'অর্চনা'য় এমনকি শ্বেত-পীত মলাটধারী সম্ভ্রান্ত চেহারার 'নারায়ণে'ও। আমার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা নোয়াখালী শহরে। ... নোয়াখালী থেকে বারবার শহরে আর মাঝে মাঝে ঢাকা যাওয়ায় আমার জন্যে পূর্ববাংলার জনপথের সঙ্গে আমার খুব চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিল। ... এরপর পর্দা উঠলো ঢাকায়। আমার বয়স তখন তেরো পার। ... আমি ধারাবাহিকভাবে ঢাকায় ছিলাম মাত্র সাড়ে নয় বছর।[৬]

সাড়ে নয় বছর তিনি লেখাপড়া করেছেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি চলছিল সাহিত্যিক আড্ডা, সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ, সাহিত্য পত্রিকা প্রগতির প্রকাশনা।

যৌবনের পেছনের সময়, সাহিত্যজীবন গড়ে ওঠার কালপর্ব ফেলে ঢাকা ছেড়ে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন ১৯৩১ সাল থেকে। যাবার আগের বছরটা বুদ্ধদেব বসুর ভালোভাবে কাটে নি বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আমার যৌবন' লেখায়। তাছাড়া তাঁর ঢাকা জীবনের শেষ বছরটিতে তিনি যে জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাও জানান দিয়েছেন তিনি,

> ঢাকায় আমার শেষ বছরটা ভালো কাটেনি। 'প্রগতি' উঠে গেছে, কলাকাতায় কল্লোলও ম্রিয়মাণ – দীনেশরঞ্জন সাহিত্য ছেড়ে সিনেমা রচনায় লিপ্ত হয়েছেন, অচিন্ত্য ল'য়ের সঙ্গে লভ করেছে। ... স্থানীয় বন্ধুরাও বিচ্ছিন্ন– অনেকেই ঢাকায় নেই, কেউ কেউ কলেজ থেকে বেরিয়ে অর্থার্জনে সচেষ্ট, আমার নিজেরও সম্বল ফুরিয়ে এলো। এতদিন চলছিলো আমার দাদা মশায়ের জীবন বীমার সঞ্চয়ে। কিন্তু পত্রিকা চালিয়ে খামখেয়াল মিটিয়ে দিদিমার সেই তল্পি আমি ফুটো করে দিয়েছি, তাঁর সর্বশেষ দু-একটি স্বর্ণালংকারও আমার অপব্যয়ের খাতে তলিয়ে গেছে। আমি ধারাবাহিকভাবে বৃত্তি পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে, একবার পেয়েছিলাম প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আড়াই-শত টাকা পুরস্কার– তখনকার পক্ষে সংখ্যাটা বেশ ভারবান– আনুষঙ্গিক স্বর্ণপদকাদিও তৎক্ষণাৎ নগদ মূল্যে তর্জমা করে নিয়েছিলাম। এছাড়া অবশ্য অল্পস্বল্প লেখার উপার্জনও ছিলো। সেই সবই, আমার

> আত্মবিশ্বাসী যৌবনের জোরে, আমি সাবলীলভাবে দগ্ধ করেছি। আখেরে এমন অবস্থা দাঁড়ালো আমার এম.এ পরীক্ষায় ফি প্রায় জোটানো যাচ্ছে না– আমার দিদিমার ডাক্তার ভাই তা দান করেছিলেন। এদিকে তখন বহির্জগৎ অশান্ত। পশ্চিম উপকূলে গান্ধীজীর দণ্ডী-যাত্রা, ঘরের কাছে গুমরানো চাপা সন্ত্রাসবাদের প্রচণ্ড আগ্নেয় বিস্ফোরণ– যুগপৎ এই দুই ঘটনায় সারা দেশ উন্মথিত। ঢাকায় ঘটছে পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অথবা সেগুলোকে ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে বিভক্তি শাসন নীতি অনুসারে। অনেক চাঞ্চল্যকর বার্তা, আরো বেশি লোমহর্ষক সব জনরব– সর্বজনের সমস্যা ও বিক্ষোভ ও উত্তেজনা; এসবের পাশে ম্লান হয়ে যায় আমার সাহিত্যটা, আমার ব্যক্তিগত সংকল্প ও প্রয়াস। বন্ধুরা তর্ক চালায় রাজনীতি নিয়ে, আমি নিঃশব্দে শুনি অথবা শুনি না। ... যেমন দশ বছর আগে নোয়াখালীতে, তেমনি এখন ঢাকা শহরটাকেও আমার মনে হচ্ছে বড়ো সংকীর্ণ– যেন পুরানা পল্টনের উন্মুক্ত মাঠেও যথেষ্ট আলো-হাওয়া আর খেলছে না। ততদিনে আমার 'সাড়া', 'বন্দীর বন্দনা' বেরিয়ে গেছে। ... আমি দিন গুনি কবে আমার এম.এ. পরীক্ষার ফল বেরোবে, কবে চলে যেতে পারবো আমার স্বাদিত ও কাঙ্ক্ষিত মহানগরে, ... যেখানে বহু ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে বিকীর্ণ হচ্ছে মানুষের উদ্যম, রাস্তার ভিড়ে অনামীভাবে মিশে যাওয়া যায়, জীবনের স্রোত প্রখর এবং যেখানে সাহিত্যিকও তার মনমতো সংস্রব বেছে নিতে পারে। ১৯৩১ সালের এক ভাদ্রের দিনে আমি শেষবারের মতো ঢাকা ছাড়লাম।[৭]

পূর্ব বাংলার জনপদ, সংস্কৃতি, মানুষ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন সময়ে লেখা বেশ কটি কবিতা পাওয়া যায় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। পূর্ববাংলার দেশকাল বা পরিবেশের উপাদান হিসেবে কবিতাগুলোর গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতার বিষয়ের রস সৃষ্টি ও শিল্পগুণ নির্ধারণেও। কবিতাগুলোতে রয়েছে যেমন তথ্যের দিক, স্মৃতির জাগরণ, তেমনি রয়েছে রসের দিক, সৌন্দর্যের বিবেচনা।

ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিদের কবিতায় প্রকৃতির রূপায়ণ ঘটেছে নতুন উপলব্ধিতে, নতুন পর্যায়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও যন্ত্রসভ্যতার সম্পর্ক প্রকৃতির স্থবির চিত্রময় রূপ পাল্টে দিয়ে গতিশীল করেছে; সৌন্দর্যরূপও প্রাণ পেয়েছে সজীবতায়, চঞ্চলতায়।

বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাও এক্ষেত্রে অনন্য। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে ফেলেছেন নাগরিক ও বাংলাদেশের শ্যামল আবহে। তবে এ কথা সত্য তিনি যদিও নিজেই বলেছেন,

> নতুন বাঙালি লেখকদের মধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি শহরের দিকে ফিরেছে। তাদের মধ্যে আমি একজন। আমি শহর ভালোবাসি। আমি কলকাতাকে ভালোবাসি– মায়ের মতো করে না; বরং প্রিয়ার মতো করে।[৮]

তারপরও বলা যায়,

> বুদ্ধদেব বসু নিজে নাগরিক প্রকৃতির রূপায়ণ করলেও স্বস্তি অনুভব করেন উন্মুক্ত প্রাকৃতিক প্রতিবেশে– অবারিত আকাশ, জ্যোৎস্না ও বনভূমিতে।[৯]

অবশ্য এ ধরনের মনোভূমির স্থায়ী রূপ সৃষ্টির অন্তরালে কাজ করেছে বাল্যকালের নোয়াখালীর অবারিত সবুজ নিসর্গ, যৌবনের প্রারম্ভে পুরানা পল্টনের উন্মুক্ত মাঠ ও নির্জনতা এবং নদীপথে স্টিমারযোগে একাধিকবার যাতায়াত। সমর্থনে বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো,

> ক্ষুদ্র এক মফস্বল শহর নোয়াখালী। ... জীবন চলে মন্থর, বিশ-শতকী ব্যস্ততা থেকে সুদূর, দিনের পর দিন একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে। ... কয়েকটা মনোরম ছবিও চোখে আছে

> আমার। গাছপালা অজস্র। ... আছে রৌদ্রের জীব প্রজাপতি অনেক, অন্ধকারে ঝকঝকে সবুজ জোনাকির ঝাঁক। আছে আকাশ-জোড়া ঝিমঝিম জ্যোৎস্না, আর শীতের জ্যোৎস্নায় ঘন কুয়াশার আস্তরণ, যাতে চেনা জিনিস রহস্যময় হয়ে ওঠে। হঠাৎ তাকালে মানুষ বা মানুষের মতো আকৃতি দেখা যায়। ...
>
> আমি যখন আই.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি বা হবো হবো, তখন আমরা চলে এলাম পুরানা পল্টনে– যাকে তখন পর্যন্ত অনেকেই বলে সেগুনবাগান। আমার সেই সদ্য পেরোনো কৈশোর-সীমায়, অপর্যাপ্ত আলো হাওয়া আকাশের মধ্যে, ঐ স্থানটিকে আমি কত বিচিত্রভাবে দেখেছিলাম ও অনুভব করেছিলাম, আমার 'আমরা তিনজন' গল্পটায় তার নিদর্শন আছে।[১০]

'পদ্মা' কবিতাটি নস্টালজিয়া তাড়িত নয়। এই কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ নানা দৃষ্টিতে, রঙে বিস্তৃত পরিসরে রূপায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের আকাশের মেঘ আলো-ছায়ায় অফুরন্ত খামখেয়ালি খেলায় যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সে সৌন্দর্য। এ মেঘ কালিদাসের মেঘ নয়, নয় কোনো রূপান্তরিত বহুমাত্রিকতার রূপক বা প্রতীক।

আকাশে কে থেকে-থেকে গড়ে পাহাড়, রাজার বাড়ি, উঁচু মিনার,
...
একটু পরেই ভাঙে আবার ভাঙে পাহাড়, রাজার বাড়ি, যায় মিলিয়ে
উঁচু মিনার; খামখেয়ালি কোন খেলা এ।
...
মেঘের পাখার ঝাপটানিতে দূরের গ্রামে ছায়া নামে,
ঢেউয়ের শ্রেণী কালো বেণীর মতো জড়ায়। কেঁপে কেঁপে তীরে গড়ায়,
দিগন্তকে ঝাপসা ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি ঝরে।[১১]

আষাঢ়ের জলে ভরা পদ্মার রূপচ্ছবি দেখে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই প্রত্যক্ষ করেন কবি।

আধেক নদী কালো ছায়ায়, আধেক ঝলে আলোয়
ক্ষণেক দেখি মস্ত নদী রূপোর মতো জ্বলে
...
এই আষাঢ়ের উদ্দামতায় উদ্ধত উচ্ছল
বাংলাদেশের হৃদয়-জোড়া পদ্মানদীর জল।[১২]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কলকাতা শহরকে 'স্বর্গের অংশ' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কলকাতা কবির প্রিয় নগরী ও প্রিয়তমাসদৃশ। তারপরও শহরের পরিপার্শ্বের সুন্দর যেন ম্লান হয়ে যায় কবি যখন বাংলাদেশের পদ্মার পরিপার্শ্বের চিত্র আঁকেন। কবির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ–

...
মনে মনে ভাবতে, আহা, এখানে কি থাকা যায় না এসে!
আকাশ-ভরা এমন আলো, এমন স্বাধীন সুস্থ হাওয়া স্নিগ্ধ নরম মাটি,
তিনদিকে দিগন্ত ছুঁয়ে পদ্মানদীর জল
ঢলোঢলো লাবণ্যে উচ্ছল;
...
এমন স্বর্গ ছেড়ে কোথায় যাবো? কলকাতায় কী আছে।[১৩]

রাক্ষুসী পদ্মার সঙ্গে দুরন্ত কিশোরের সম্পর্ক যে সুনিবিড় এবং চাঞ্চল্যে বিস্ময়কর এমন চিত্রকল্পও নির্যাস করেছেন কবি 'পদ্মা' কবিতায়,

…
শোঁ শোঁ শব্দে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো
ছ-টা ছোট্ট কালো মাথা–বাস্‌রে ওদের সাহসটা কী!
এমন ঢেউয়েও হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি,
পদ্মা নিয়েই বুঝি ওদের খেলা।
ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জলের গলা,
এক দুরন্তে ছ-টি ছোট্ট দুরন্ত দেয় ডুব–
…
এ কি কাণ্ড! ঐ তো দেখি ভেসে উঠলো
হাঁড়ির তলার মতো কালো ছোট্ট মাথা,
হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো পাটের গোড়া,
হেঁচড়ে টেনে প'ড়ে রইলো পাটখেতের কাদায়
একটু পরেই লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে দৌড়–
শাবাশ ছেলে![১৪]

নাগরিক প্রকৃতির চাইতে নাগরিক জীবনবোধকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। তবে অন্যপক্ষে গ্রামীণ জীবনবোধের চাইতে বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত মানুষ, কৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে কবিতা লিখেছেন।

'ইলিশ' কবিতায় একদিকে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের চলমান রূপের ছবি যেমন আছে অন্যপক্ষে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য জীবনে বর্ষা ইলিশ উৎসব যে প্রভাব ফেলে তারও আনন্দময় রূপায়ণ প্রত্যক্ষ।

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
…
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধনগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।
রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।[১৫]

বুদ্ধদেব বসুর অনুভবের মধ্যে পূর্ববাংলার নারায়ণগঞ্জের বন্দর, রেল স্টেশন ও তার প্রতিবেশে ভিড়ের বাঙাল ভাষাও যে বরফওয়ালার হাঁক, কুলির কিচিরমিচিরে প্রাণময় ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তা তো বুদ্ধদেব বসুর দেশজতা এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। প্রিয়মুখের সান্নিধ্য লাভে ব্যর্থ কবির মনোলোকে বিরহের বেদনা জেগে উঠলেও নিঃসঙ্গতায় ডুবে যান নি। তিনি সহযাত্রী হয়েছেন ভিড়ের বাঙাল ভাষার সান্নিধ্যে এসে, নদীর জলে রোদের ঝিলিমিলি, দমকা হাওয়ায় ধুলো ওড়ার, হাওয়ায় ফুলে ওঠা নৌকার পালের, ইস্টিমারের ঢেউ দুলে ওঠা নৌকার।

নারানগঞ্জের ইস্টিমারে দুপুরবেলায়
তোমার মুখটি হারিয়ে গেল দূরে,
চোখের জলে ঝাপসা হ'লো কমলা রঙের শাড়ি,
এগিয়ে এলো পাটগুদামের লাল টিনের ছাদ।
ইস্টিমারের এঞ্জিনটার ধ্বকধ্বকধ্বক ছন্দে
কেঁপে উঠলো আকাশজোড়া বিরহী হৃৎপিণ্ড।
জলের বোল ঢেউয়ের রোল হাওয়ার তোলপাড়ে
ভাঙা গলার বাঙাল কথা রাঙালো প্রাণমন
নারানগঞ্জের ইস্টিমারে দুপুরবেলায়।[১৬]

'বন্ধু' কবিতাটিতে একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচ্ছেদ, যে তৃতীয় মাধ্যম শশাঙ্ক শেখর সেনের জন্যে ঘটে যায় সে গদ্য রূপ লাভ করলেও একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের বাংলাদেশের রাজনীতিক বাস্তবতা ও অন্যদিকে জীবননির্ভর ভূগোলের তথা সামাজিক সংস্কৃতির বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বাস্তবতা এবং সে রাজনীতিক বাস্তবতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত তরুণরা যে শিক্ষা ও সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে জগৎটির স্মৃতি ভেসে ওঠে।

কবির উচ্চারণ,

পরশু সকালে
ঠিক এলো শশাঙ্কশেখর।
সেদিন ছিলাম একা। তবু সে লজ্জায়
চোখ তুলে তাকাতে পারে না।
মৃদু স্বরে
দু-একটি কথা বলে চুপ করে থাকে,
নখে নখ ঘষে।
আমিই তখন
ছোটো-ছোটো প্রশ্ন ক'রে, চোখে-মুখে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে
কথা কওয়ালেম তাকে।

কলেজের ভাল ছাত্র ছিলো।
বি,এ পরীক্ষার বারে
চাটগাঁর বিপ্লবী ঝড়ে
শুকনো পাতার মতো উড়ে গেলো।
ছ বছর রাজবন্দী থেকে
এসেছে বেরিয়ে
মাস দুই আগে।[১৭]

[বন্ধু, দৌপদীর শাড়ি, কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ১৫১-১৫২]

শুধু তাই নয়, পূর্ববাংলা আর পশ্চিম বাংলার মানুষের বেশভূষা, কথাবার্তা, আবেগ-অনুভূতি তথা জীবনযাপনের সংস্কৃতির ঐতিহ্যও ধরা পড়ে এ কবিতায়–

ভাই শমী,
আজ কি তোমার মনে পড়ে
যে দিন আমার ঘরে শশাঙ্কশেখর
প্রথম উদিত হলো।
হলদে গায়ের রঙ, চেহারাটা চৈনিক ছাঁদের,
অতএব বাঙালির চোখে হাস্যকর।
কথা তার বলে দেয় সে পূর্বদেশী,
আমরা বাঙাল যারা আমাদের কানে
সেটা অতি লজ্জাকর ঠেকে।
ইতিমধ্যে শশাঙ্কশেখর
অনেক বদলে গেছে।
আপন শক্তির স্বাদ পেয়ে,
উপরন্তু কলকাতার জল-হাওয়ার গুণে
আড়ষ্ট সে নেই আর॥[১৮]
[পৃষ্ঠা ১৫০, ১৫৬]

'সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ' নামে অভিহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত বা পরিণত রূপ ছিল তখন ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তখন লেখক শিল্পীরা। ফলে অনেকেই সরাসরি রাজনৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে জনচেতনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন সুসংগঠিতভাবে। আবার অনেকেই স্বদেশপ্রেমকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে দেশাত্মবোধের চেতনাকে লালন করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন দ্বিতীয় দলভুক্ত প্রগতিবাদী কবি।

ফ্যাসিবাদী শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মানবিক সংকট সৃষ্টি করলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর মাতৃভূমি বাংলাকে উপলব্ধি করেছেন ধ্বংস নয় সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের আকর্ষণরূপে।

পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের মধ্যেও কবির মধ্যে যে ভালোবাসা তা মাতৃভূমি বাংলার কাছ থেকেই পাওয়া, অন্তঃশীল অমৃত ধরে রেখেছে বাংলা তাঁর, বিশ্বযুদ্ধের রক্তপাতের প্রেক্ষাপটেও দুর্মর আশা নিয়ে কবি তাই প্রেম দ্বারা, ভালোবাসা দ্বারা, মানবতা দ্বারা, বিশ্বকে বাঁচিয়ে রাখবেন, প্রেম দ্বারা জয়ী হবেন। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন 'যে, উন্মত্ত পিশাচ শক্তি মানবিক সংকটের জন্মদাতা, যারা ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত– বাংলার শ্যামলিমা তাদের কাছে যেন অজ্ঞাত।'

এই তো প্রথম
লভিলাম তোমারে আমার প্রাণে,
হে বাংলা, আমার বাংলা।
কত ভাগ্য তুমি যে আমার, আর আমি যে তোমার।
কত ভাগ্য এ প্রলয়ে
এখনো আমার বুকে রক্ত আছে, রক্তে আছে ভালোবাসা
...
আজ আমি চিনেছি তোমারে।
দশভুজা চামুন্দা তুমি তো নও,

...
তুমি যেন প্রাগার্য সাগরকন্যা,
শান্ত চোখে রেখেছো বাঁচায়ে,
পৃথিবীর প্রাণের আদিম শ্যামলিমা।
...
যদিও মাতাল শক্তি লিপ্ত আজ ধ্বংসের তাণ্ডবে,
তবু জানি তারই জয় হবে–
সে-আদিম, শ্যামল শান্তির।[২০]

ফ্যাসিবাদি-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম শহীদ গল্পকার কমিউনিস্ট কর্মী, ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম সংগঠক বাইশ বছরের যুবক সোমেন চন্দকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের কথাশিল্পী সোমেন চন্দ ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ঢাকার রেলশ্রমিকদের ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি ১৯৪০-৪১ সালের দিকে। ইউনিয়নের সমস্ত দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর কাঁধেই।

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করায় কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন। ইউনিয়নের কাজে শ্রমিকদের সঙ্গে লাইনে অফিসে বস্তিতে সংযোগ রাখবার ভার পড়েছিল সোমেন চন্দের ওপর।
>
> ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটি সন্ধিক্ষণে।...প্রস্তুতি পর্বে সোমেন চন্দ যেমন 'প্রগতি লেখক সংঘে'র গোড়াপত্তনে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠল, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলোর সবচেয়ে নিয়মিত উপস্থিত সদস্য। ... সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ লেখাই 'প্রগতি লেখক সংঘে'র বৈঠকে পড়া।... সঙ্ঘের বৈঠকে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া লেখা নিয়ে ১৯৪০ সালে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা অতিক্রমণের অর্থে নামকরণ হয় 'ক্রান্তি'। যথাসময়ে ক্রান্তি (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ঢাকার একটি ছাপাখানা থেকে। ছাপাখানা থেকে বই বের করে আমার ব্যাপারে সোমেন চন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে। সোমেনের 'বনস্পতি' গল্পটি এই 'ক্রান্তি'তেই প্রকাশিত হয়।[২১]

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি-রও একজন কর্মী ছিলেন সোমেন চন্দ। ঢাকায় সুতাকল শ্রমিকদের সহায়তায় ডাকা ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলনে যোগদানের জন্য রেলশ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে রাজনৈতিক বিরোধীরা সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের অল্পসময় পরেই অনেক কবিই সোমেন চন্দকে নিয়ে লিখেছেন কবিতা। বাংলাদেশের হিংসাত্মক রাজনীতির প্রতিবেশ, বিশ্বযুদ্ধের ঘৃণ্যতম বর্বরতা, সংকট মানবতার ও সভ্যতার, সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড বুদ্ধদেব বসুকে প্রবল আলোড়িত করে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় তাই উচ্চারিত হয়েছে

উদীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকের অস্ত্র যারা হানে,

মানুষের যে-মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত যাদের বিক্রম
তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আগ্নেয় ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি ওঠে ধিক্ ধিক্ আমার বীণায়
তবে ব্যর্থ কবিজন্ম– মনুষ্যত্ব, তাও তবে বৃথা,
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।[২২]

বুদ্ধদেব বসু কলকাতা মহানগরীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বিচিত্র বিষয় অভিজ্ঞতার আলোকে ও নিজেরই রূপান্তরিত অন্তর্জীবন বাক্‌ভঙ্গিমার অভিনবত্বে ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তারপরও বাংলাদেশের প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা বুদ্ধদেব বসু পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশকে প্রসঙ্গ করে কবিতা লিখতে ভুলে যান নি।

বাংলাদেশকে প্রসঙ্গ করে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখেছেন তিনি। অথচ কয়েকটি কবিতায় রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের রূপবৈচিত্র্য বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন জীবন ও প্রকৃতির অনুভব।

তথ্যপঞ্জি

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা পৃ
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'দশ দিগন্তের স্রষ্টা', বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৮৫
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (স), আজকাল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩.
৪. বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ-৪, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ.৪৩৫
৫. বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র (১), পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা একাডেমী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬-৭
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-২৮-৪১-৪৩
৭. প্রাগুক্ত, ৯৪, ৯৫
৮. বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ-৫, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪৩২
৯. মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৪২
১০. বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র (১), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৬-১৭-১৮
১১. বুদ্ধদেব বসু, 'পদ্মা', কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, (স) নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৯০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪
১৫. 'ইলিশ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
১৬. 'দুপুরবেলা বিদায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৭. 'বন্ধু', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২
১৮. বন্ধু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫৬

১৯. মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৭

২০. বুদ্ধদেব বসু, 'উপলব্ধি', কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, (স) নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.২৮-২৯

২১. গণেশ দাশগুপ্ত, 'সৌমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি', 'আগুনের অক্ষর সৌমেন চন্দ্র স্মারকগ্রন্থ'(স) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পবিত্র সরকার, সোমেন চন্দ ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ.৬৩-৬৭-৬৮

২২. বুদ্ধদেব বসু, 'প্রতিবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ-২৩২

কার কবি বুদ্ধদেব বসু

আলফ্রেড খোকন

বুদ্ধদেব বসুর প্রস্থানের এত বছর পর, তাকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার কলমের নিব থেমে গেল! কলমের নিব থামা মানে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া। তিনি কার কবি? সমকালীন না সমসময়ের, ব্যক্তির না গোষ্ঠীর, নাকি কবিদের কবি?

বুদ্ধদেবীয় ভাবনায় মগ্ন হওয়ার শুরুতে এই প্রশ্ন জাগলে, আরও একটি প্রশ্ন এসে মীমাংসা চায়– কবিকে কি কারও কবি হতে হবে, এমন দায় রয়েছে? কবি যদি নিজের কবি হতে চান, তবে?

নিজের কবি হতে চাইলে উপরের জিজ্ঞাসার উত্তর জরুরি হবে। কারণ কবি তার নিজের কবি হয়ে ওঠার মধ্যে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেন। এই স্তর অতিক্রমণের একটি আকাঙ্ক্ষা বা সরল সম্ভাবনা নিয়েই বলা যায়, কবিকে শেষপর্যন্ত নিজের কবি হয়ে উঠতে হয়। নিজের হয়ে উঠতে হলে তার পরিপার্শ্ব অর্থাৎ ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আসা সময়ের নির্যাস, তার যাপিত জীবনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিংড়ায়ে, অপ্রকাশের ভার বয়ে প্রকাশের উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠতে হয়। এই প্রতীক মানে ব্যক্তি আর গোষ্ঠী অর্থাৎ কোন ভূখণ্ড কিংবা কোন জনপদের জীবনধারার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠতে পারা। এসব স্তর অতিক্রমণের ভিতর দিয়েই একজন কবি সমকালীন হতে পারেন। সমসময়ের কিংবা সমকালীন প্রতীক হয়ে ওঠা একজন কবিকে আমার চিন্তায় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ কবি যদি সমকালীন হন, তবে সময়-ব্যক্তি-গোষ্ঠী কিংবা কবিদের কবির মধ্য দিয়েই এ স্তরে তিনি উপনীত হন। আর সমকালীন হতে পারা মানে কবি কবিদের কবি হয়ে ওঠেন, হন নিজের কবিও। সমকালের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং অপ্রকাশের প্রকাশ হয়ে উঠতে পারা মানে ওই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক, তাদের প্রেম-বিরহ-যৌনতা, দারিদ্র্য, দাহ, দ্রোহ এবং জীবনযাত্রার তাবৎ সংগ্রামের সম্পর্ক রচনা করতে না পারলে পরবর্তীকালের সাঁকো হওয়া সম্ভব নয়। যদিও বলা যাবে যে, সমকালে কোন প্রকৃত স্রষ্টাকে চিনতে নাও পারা যেতে পারে; এই কারণে আমরা লক্ষ করি, মৃত্যুর পরে কোন কবি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেন, কিন্তু জীবিতকালে তিনি অগোচরে থেকে যান। এ প্রসঙ্গে এও বলা উচিত হবে যে, জীবিতকালটা তার পুরোপুরি বুঝে নেয়ার সময় হিসেবে বিবেচনা করলে ক্ষতি কি? যদি তার লক্ষ্য জনপ্রিয়তা না হয়?

একজন কবিকে নিজের কবি হতে হলে তার ইতিহাস-সময়-ব্যক্তি-গোষ্ঠী কিংবা বিশ্বলোকের যে যাত্রা, সৃষ্টির এই যে ধারাবাহিকতা– এই ধাবমান যাত্রার অভিযাত্রী হতে হয়, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে হয়। কিভাবে এই অভিযাত্রী হতে হয়, কিভাবে এই প্রতীক হয়ে ওঠে?

তার থাকতে হবে রাজনৈতিক-দার্শনিক মতাদর্শ এবং কবির ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য স্বপ্ন সৃষ্টি করা, প্রবহমান স্বপ্নকে উত্তোলিত করা, জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের পথকে

প্রাণ দেয়া–যা মানবের মুক্তির প্রশ্নেও অপরিহার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজনের প্রশ্নে নিজেকে তার ভূখণ্ডের জনগণের কাছে অপরিহার্য করে তোলার মাধ্যমেই নিজের কবি হয়ে ওঠার অভিযাত্রা। যেখানে থাকে এই জীবনের ভুলের এপিটাফ, থাকে শুদ্ধতার চাষ। আরও বলা যায়, ভুল-শুদ্ধ'র যে যৌথ খামার, সেই খামারের সাথে শ্রমে-ঘামে-লবণে, স্বপ্ন-কল্পনা-ভাষার মিলিত এক জমিন। যে জমিন চাষ হবে, ফসল ফলবে, আবার বুননের অপেক্ষায় আসবে মৌসুম। নিজের কবি হওয়ার বিষয়টা আরও স্পষ্ট হতে পারে। একজন কবি কি তার নিজের কবিতা পাঠ করেন তার পাঠ্যতালিকায়? একজন কবি তো পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের পাঠ-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের নতুন চাষে সৃষ্টি করেন একটি নতুন কবিতা। যে কবি মরে গেছেন অথচ তার কবিতা এখনও আমাদের কাছে অপরিহার্য, সেই কবির কবিতার মতই পাঠ্য হয় কি একজন জীবিত কবির নিজের কাছে নিজের কবিতা? যদি হয়, তাহলে তো জীবিত কবি নিজেই নিজের কবি হয়ে উঠলেন। একজন স্রষ্টা, যিনি ইতিহাসের নির্যাস পান করে সৃষ্টি করে নতুন এক মানবভূমি, ইতিহাসের নির্যাস পানের মতই তিনি কি তার নিজের কবিতা/সৃষ্টির নির্যাস পান করেন; তবে তিনি নিজের কবি হতে পারেন বলে আমি বিবেচনা করি।

তাহলে বুদ্ধদেব বসু কি তার নিজের কবি হতে পারলেন? অথবা তিনি আরও দূরাগত সমকালীন কবি কিনা, সেসব বিষয়ের প্রসঙ্গও এসে যাবে যথাসঙ্গত। এসব প্রসঙ্গের ভিতরই আমরা আবিষ্কার করতে চাই একজন বুদ্ধদেব বসু কার কবি?

সংগঠক, অনুবাদক, সম্পাদক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং কবি পরিচয়ে একজন বুদ্ধদেব বসুর বিস্তার ব্যাপক। এমনকি ব্যক্তি ও তার কাজের প্রভাবও অস্বীকারের উপায় নেই। বুদ্ধদেব বসুর সময়কালকে বলা হয় ত্রিশের দশক। ত্রিশের পঞ্চপাণ্ডব বলে খ্যাত অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বা সৃষ্টিবলয় থেকে মুক্তির জন্য এরা যতটা সচেতন ছিলেন, এতটা সচেতন বাংলা সাহিত্যের আর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বেলায় এতটা উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। কিন্তু এই সচেতনতা যতটা ছিল আনুষ্ঠানিকতায়, ততটাই অচেতনভাবে ঢুকে পড়ে তাদের সৃষ্টিকর্মে। তার প্রভাব আমরা লক্ষ করব তাদের কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করলে। তবে এই পাঁচ অভিযাত্রীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁর আগের কাউকে নিয়ে এতটা মাথা ঘামিয়েছেন, এমন প্রমাণ মেলে না। জীবননান্দের কবিজীবনের সূচনায় সর্বোচ্চ কাব্যিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কারণ জীবনানন্দের *ঝরাপালক* কাব্যগ্রন্থের নিচে যদি কাজী নজরুল ইসলাম নামটি লিখে ছেপে দেয়া হয়, কোন নতুন পাঠক কোন মতেই সেখানে জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার করতে পারবেন না, সাহস করে একথা বলাই যায়! তো সে কথা আমাদের মুখ্য নয়। আমরা একথাও জানি যে, একজন কবি তাঁর কালে মরে থাকতে পারেন। অন্যের কালে তিনি আবার বেঁচে উঠতে পারেন। আবার বেঁচে থাকার কাল চলে গেলে মৃত্যুর সাথে সাথেও আমরা অনেক কবিকে মরে যেতে দেখেছি। আবার বেঁচে থাকতেও কত কবি মরে গেছেন কবিতায়, সে সব আখ্যান আমাদের অনেকেরই জানা। এই জানার মধ্যেও রয়েছে অজানার আখ্যান। তাতে আছে, যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রের আঁচড়। সেই আঁচড়ে আপাতত কাউকে মৃত বানিয়ে ছাড়ে, জোর করে আপাতত কাউকে জীবিত বানিয়ে ছাড়ে! কিন্তু প্রাণ থাকলে দেহ তো নড়ে উঠবেই।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমকালে কবি হিসেবে কেমন ছিলেন? আর এই কালে কবি হিসেবে তিনি আছেন কিনা, এরকম একটি বিবেচনায় অংশ নিলে অনেকটাই স্পষ্ট হবে

যে, তিনি কার কবি। এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, আমার এই বিবেচনা কেবল কবি বুদ্ধদেব বসুকে কেন্দ্র করে, তার সমগ্র মিলে নয়। আবার সমগ্র মিলে কবিই যদি ছাপিয়ে উঠে তবে তো তিনি তাই। আমরা তাকে (এমন কি অন্য কাউকে) জোর করে কবি বানাতে পারব না। আবার জোর করে অকবি বানাতেও পারব না।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থগুলোর শিরোনাম– মর্ম্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, একটি কথা, পৃথিবীর পথে, কঙ্কাবতী, নতুন পাতা, এক পয়সার একটি, দময়ন্তী, রূপান্তর, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা, যে-আঁধার আলোর অধিক, মরচে-পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি ইত্যাদি।

মর্ম্মবাণী কবিতার সম্ভবত প্রথম কবিতা *অরূপ*-এর দুই পঙ্‌ক্তি পড়ার পর যে কারোরই মনে হবে এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। উদাহরণ দিচ্ছি :

ভোরবেলাকার অরুণ-আলোয়
ফুল-ফোটা ঐ শিউলি-বনের ধারে,
প্রথম আমি দেখেছিলাম তারে।
গিরি-গুহার পাষাণ-বুকে চল-চপল ঝর্ণাধারার মত
কৌতুকে বিব্রত।
আরেকটি কবিতা– কালস্রোত
আমি হেথা বসে আছি–
ব'সে আছি শুধু,
স্তব্ধচিত্ত, মৌন, ভাষাহীন।
মোর পাশ দিয়া
কালের অধীর নদী অলক্ষিতে যেতেছে বহিয়া

এভাবে একটার পর একটা কবিতার উদাহরণ দেয়া যাবে, যা প্রভাবে রবীন্দ্রাক্রান্ত। আর যেন জোর করে চেপে ধরে প্রেম লাভ করার মত। কবিতায় তাকে সর্বত্রই যেন, *মোর পাশ দিয়া/ কালের অধীর নদী অলক্ষিতে যেতেছে বহিয়া* মনে হবে। তাঁর প্রায় সমগ্র কবিতা পাঠের পর পাঠককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বলুন তো একটি কবিতার দাগ? আমার তো মনে হয় না, কোন দাগ-ই আবিষ্কার করা যাবে। যে কবি রবীন্দ্রনাথ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন আবার শার্ল বোদলেয়ারে ডুবে ছিলেন, এই দ্বি-মাত্রিক জীবনবোধের দ্বন্দ্বে তিনি কি ধন্দে পড়ে হাবুডাবু খেয়েছিলেন? তাতে তার কবিজীবনের কি কোন অনভিপ্রেত ঘটেছিল? বুদ্ধদেব বসুর জন্মবর্ষ'র শতে এসে আজ এই সব প্রশ্ন কেন বারবার আসে? এর কারণ তো আছেই তার জীবনের ব্যাপ্তি তো আর সংকীর্ণ ছিল না। এই নানাবিধ ব্যাপ্তির ফলে কবিতার স্থান হয়তো সংকীর্ণ হয়ে থাকতে পারে, তা আমার আলোচ্য নয়। বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা *একখানা হাত* পড়ার পর আমার এই প্রশ্ন আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। যদিও *একখানা হাত* কবিতার ভাষা রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গোপনে ছটফট করে, তবুও এই একটি মাত্র কবিতার কারণে বলা যেতে পারে বুদ্ধদেব কার কবি। এই একটি মাত্র কবিতায় যেমন করে বুদ্ধদেব বসু আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠতে যান, এই একটি মাত্র কবিতায় বুদ্ধদেব ত্রিশীয় আধুনিকতাবাদের ফাঁদ থেকে সরল হয়ে ওঠেন জীবনবোধে। কিন্তু তার দৈর্ঘ্য সীমিত হয়ে পড়ে অন্য সর্বত্র। এই একটি মাত্র কবিতায় অধরা পৃথিবীর স্পর্শর অবগাহন আছে, এই একটি মাত্র কবিতায় তিনি শেষপর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কবি হয়ে উঠতে চান। এই একটি মাত্র কবিতায় যে আড়ালঘেরা স্বপ্ন-কল্পনা,

জীবনের যাপন ইতিহাসের জারণ আর ক্ষরণে দ্রবণ সৃষ্টি হয় তাতে আকাঙ্ক্ষা-বোধের উদ্বোধন ঘটতে চেয়েছিল, যেন সেই পাখিটি যে উড়তে উড়তে উড়তে চেয়েছিল।

ফলে এই সময়ের পাঠকের কাছে বুদ্ধদেবের কবিতার পাঠ নিছক সাহিত্যের ইতিহাসেরই পাঠ, আবার তার সময়েও বুদ্ধদেবের কবিতার প্রভাব ঠিক প্রভাবহীন এই সময়েরই মত নয় কি? এসময়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পাঠকের কাছে কোন আলোড়ন আনে না অনেক আলোড়ন ছাপিয়ে। এমনকি রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হওয়ার যে আরোপিত চেষ্টা আমরা তার কবিতায় লক্ষ করি, আরো লক্ষ করি ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদকে অন্ধের মত আঁকড়ে ধরার যে অনাকাঙ্ক্ষিত তেষ্টা, এর পেষণে পড়ে একজন বুদ্ধদেব বসু সেই একখানা হাতের মতই যেন–

এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।

আর একথা বলেই লেখাটাও শেষ হবে, বলুন তো সময়ের পাঠক, কার কবি বুদ্ধদেব বসু– আপনার না তার– কার?

উত্তর : তিনি একজন কবি মাত্র।

বুদ্ধদেব বসুর কিশোর কবিতা ও ছড়া সাহিত্য

আলম তালুকদার

বুদ্ধদেব বসু এই নামটিই এখন একটি কবিতার পঙ্ক্তি বা কোন গদ্যের উজ্জ্বল শব্দ। নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে বোদ্ধা পাঠকের মনের আয়নায় কত না কথা, কত না স্মৃতি, কত না উজ্জ্বল অন্ধকারের চড়াই উৎরাইয়ের এক চলমান রিল ভেসে উঠে তার কি হিসাব আছে? এই কারণে বলছিলাম বুদ্ধদেব বসু নামটাই একটি উজ্জ্বল সোনালি রোদে ঝলসানো ইলিশ গন্ধ মাখানো বুদ্ধিদীপ্ত বিনির্মাণে পুষ্ট কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও ছড়া প্রবন্ধ।

এপর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৫৩টি [সূত্র : জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত কলকাতা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা পৃ: ১৭৬)] এর মধ্যে শিশুতোষ গ্রন্থ সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তবু তিরিশের দশকে, মৌচাক, রামধনু ও রংমশাল এই তিন কিশোর পত্রিকাগুলো খুব আলোড়ন তুলেছিল। তিনি ঐসব পত্রিকার নিয়মিত বা অনুরোধ্য হয়ে লিখতেন, কবিতা, ছোট বড় নাটক, নাটিকা, ছোট হালকা কিন্তু স্পর্শকাতর প্রবন্ধ এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মিলে একসময়ে তিনি জীবজগৎ সম্বন্ধে একাধিক বইও প্রণয়ন করেছিলেন, 'আজগুবি জানোয়ার' 'সাগর রহস্য'। তিনি ছোটদের জন্য সবধরনের লেখাই কিছু না কিছু লিখেছেন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তার লেখা বুদ্ধদেব বসুর "ছোটদের লেখা" নিবন্ধে লিখেছেন, 'তাঁর যে কোনো লেখা সুপাঠ্য'। তিনি আরো বলেছেন, 'বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের লেখার একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তা বয়স্ক পাঠকদেরও নানারকমভাবে আকৃষ্ট করতে পারে। সব পাঠকের জন্যই তাতে কিছু না কিছু থেকে যায়। আর তাছাড়া একটা স্তরে গিয়ে হয়তো দেখা যায় যে, একেবারে শিশুসেব্য সাহিত্য বলে আসলে কিছু নেই। কিছু লেখা ছোটদের অভিজ্ঞতা বা চৌহদ্দির বাইরে পড়ে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় অস্বস্তি জাগায়, তাদের অভিনিবেশ বা অনুধাবন ক্ষমতাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু শেষ অবধি আমি অনেকদিন লক্ষ করে দেখেছি ছোটদের উদ্দিষ্ট যে সব লেখা বড়দের কিছু দেয়। তাই শেষ অবধি টেকসই হয়, পরের যুগের ছোটদের ভালোলাগে। চিরায়িত হয়ে যায়। সেদিক থেকে বলতেই হয় যে বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের লেখা দীর্ঘস্থায়ী হবার ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে"।

এবার দেখা যাক যে লেখক শিশুদের নিয়ে ভাবেন তিনি নিজেকে নিয়ে কী ভেবেছিলেন! নিজের ওপর ছড়া শিরোনামে যে ছড়া-কবিতা তিনি ২৮-২৯ আগস্ট ১৯৪৬ সালে যা লিখেছে তা পাঠকের সুবিধার্থে তুলে দিচ্ছি।

'গ্রহণে' বর্জনে বুদ্ধদেব

"বুদ্ধদেব বসু
যখন ছিলেন শিশু
রব তুলেছে ঘরে ঘরে
নানান ফিকির মিচির।
'আরে ছী, ছি ছী - ছি!

কেউ বলেছেন ফ্রেঞ্চো করে
এ কী ভীষণ শিশু!'
কেউ বলেছেন খাশ বাংলায়
"পশু! পশু! পশু!
'পশুই ভালো; বলেছিলো
তখন যারা শিশু।

বুদ্ধদেব বসু
এখন তবে অসুর ?
'আরে ছী, ছি, ছী - ছি!
আমরা মিছামিছি
চমকে ছিলাম; ও কিছুনা
কেবল হুশুরমশুর!
ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে, যারা
তখন ছিলো শিশু,
সেদিন হলো শ্বশুর।

বুদ্ধদেব বসু
তাহলে নন পশু?
"আরে ছী, ছি - ছী ছি।
তুললো চ্যাঁচামেচি
উচ্চ হাসির অট্টরোলে
এখন যারা শিশু
সত্যি বটে পশু।
তাই বলে কি সিংহ ভালুক
কিংবা ভীষণ শিশু?
মিটিং ডেকে ঠিক করেছি
ওটা একটা মেষু।
আরে ছী - ছি, ছী - ছি।
শুনছো না ওর চিঁ চিঁ ?
কেলেংকারির আর কী বাকী,
ভজন করে ঈশু
বুদ্ধদেব বসু!

এ লেখাটা পাঠ করলে বোঝা যায় এসব তাদের জন্য যারা চিরদিনই সবস্থানে আমৃত্যু শিশু। অনেক সময় যেখানে প্রবেশাধিকার নেই সেখানেও ঢুকে যায় তারা। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অন্য দশজনের মত নয়। তিনি একটু দূরের স্পর্শের বাইরে কিন্তু মনের ভিতরের।

বুদ্ধদেব বসু শিশুদের শিশুসাহিত্য নিয়ে বেশি না লিখলেও একেবারে কিন্তু কমও লিখেননি। তিনি 'বারো মাসের ছড়া কবিতার মুখবন্ধে লিখেছিলেন 'আমার ধারণা ছোটদের আমরা সাধারণত যেমন ভাবি তেমনি ছোট তারা নন"। শিশুরা বর্তমানে আরো অগ্রসরমান আরো স্মার্ট। সাহিত্য তাদের সাথে দৌড়ে পারছেনা বলে কখনো

কখনো মনে হয়তো হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু শিশুদের কিভাবে দেখতেন, কী ছিল তার মূল্যায়ন? বুদ্ধদেব বসু ভালোবেসেছিলেন এই ছেলেমানুষি মানে বাচ্চামো নয়; এই ছেলেমানুষি মানে দায়মুক্তি হওয়া; কল্পনাপ্রবণ হওয়া, দুঃখিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া এবং সবকিছুরই বিনা কারণে হওয়া। অবশ্য কারণে হলেও ক্ষতি নেই। তবে সেই ছেলেমানুষির ক্ষমতা প্রবল হওয়া উচিত। ছেলেমানুষ মানে সেই অনুভূতি যা শর্তহীনভাবে ভালো বা খারাপ লাগার। বুদ্ধদেব বসুর এমন অনেক কবিতা আছে যার মানে ছোটরা বুঝবেই না। এমনও অনেক কবিতা আছে যা বড়রা পড়লে বলবেন 'দুস্'। কিন্তু একথা হলফ করে বলতে পারি বুদ্ধদেবের প্রত্যেকটা কবিতা পড়লেই অন্য রকম লাগবে এবং কোনো না কোনো কবিতা পড়ে উদাস হতেই হবে। (সায়ন্তন ভট্টাচার্য, *একটু আলো একটু ছায়া*, অহর্নিশ, পৃ. ৩৪১এ। ব বসু) বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতার বই বারো মাসের ছড়ায় তিনি আরাম্ভটা করেছেন এমনভাবে;

> "তোমরা কি কেউ আমার এ বই পড়বে?
> বাজে কথা কাজের কথা নয়"।

কবিতাটি কী আরোপিত হয়েছে? পড়লে মনে হবে, ছেলে মানুষ হও। নইলেতো এই লেখা অনুভব করা যাবে না।

আর যাকে ভিতর থেকে অনুভব করা যায় না, সেটা তো ছাত্রদের শরৎকালের রচনা। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ দায়বদ্ধ, তাকে বিয়ে-থা করতে হবে, চাকরি করতে হবে। খেতে হবে, ঘুমাতে হবে, নিজের সন্তানকে দায়বদ্ধ তৈরি করতে হবে। আর যখন এই দায়বদ্ধতাই গলগ্রহ হয়ে বসবে?

> "ইচ্ছা করে মা গো আবার ছেলে মানুষ হই
> ঘরের কোণে চুপটি করে একলা বসে রই।
> আসলে আমি ঐটে ছাড়া কিছু তো আর নই
> ইচ্ছা করে, তাইতো আবার ছেলে মানুষ হই"।

"হ্যাঁ- এটাই চরম সত্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছুই না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দায়িত্ব, কর্তব্য, ভবিষ্যত নামক গুরুগম্ভীর শব্দগুলো আমাদের গায়ে পেঁয়াজের খোসার মত চেপে বসে। আর তার মধ্যেই কবে যেন হারিয়ে যায় ছেলেমানুষিগুলো। বাঁচিয়ে রাখে ছেলেমানুষিটা, তারাই আবিষ্কার করে বুদ্ধদেব বসুকে। বুদ্ধদেব বসু আসলে ছোটদের নিয়ে নয় ছেলেমানুষদের নিয়েই কবিতা লিখেছিলেন"।

প্রসঙ্গত অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন "শিশুসাহিত্য নাকি শিশু মনের সাহিত্য?" আসলে শিশুরাতো পড়তে পাড়েনা, বড়জোর দেখে। তাঁরা নিজেদের সবসময় বড় ভাবে। সে কারণে বাবার জুতো, মায়ের জুতো পরতে চায়। জামা-কাপড় নিজেরটা বাদে বড় ভাই-বোনদেরটা পড়তে চায়। শিশু মন বড় বিচিত্র।

৩

বুদ্ধদেব বসু তার রচিত অনেক কবিতাতেই ছোটদের জন্য এক মায়াময় জগত সৃষ্টি করেছেন। কিন্ত তাই বলে ন্যাকান্যাকা বাচ্চামো ধরা পড়বে না। তিনি কোথাও কোনো তুচ্ছ অথবা বড় বিষয়কে টার্গেট করে নিজের ছেলেবেলাকে খুঁচিয়ে আলাদা করে

দিয়েছেন। 'কাঁচা আম' কাসুন্দি মাখানো গন্ধ টের পাবেন। বুড়ো পাঠক গরমকালে ফিরে গিয়ে টক-টক ঝাল, মিশানো কাঁচা আমের গন্ধ সহসা পেয়ে যায়।

এরকম আরো একটি কবিতা আছে। কবিতাটির নাম 'রামধনু'। এখানে বীরু, বুলু, রবি, তিনু, মিলি, মনুরা যখন সাতরঙা রামধনু দেখে আনন্দে কুটি-কুটি তখন বাবা-মা, দাদা ন'দিরা একেবারে বেকুব। কারণ?

"বাবা-মা বলেন, কোথায়? কোথায়?
ন' দি এসে বলে, কই?
ছোড়্দা বলছে, কিছুতো দেখিনে,
আকাশ আকাশ কই।"

তা কীভাবে দেখবে ? দেখতে পারছে না কারণ বড়রা এতদিনে সংসারী হয়ে গেছে পাকা বাস্তববাদী হয়ে গেছে। এমন মনের আবিষ্কারক রামধনুর সাতরঙের বাহারি তামাশা কোনদিন দেখতে পারবে না।

সায়ন্তন ভট্টাচার্য তার লেখার মধ্যে একটি চমৎকার বিষয় উল্লেখ করেছেন, তিনি অনেকটা এভাবে বলেছেন,– আসুন একটা খেলা খেলা যাক। আপনি, ধরলাম আমার বাবার বয়সী মানুষ, আমার মত মাঝারি বয়সের একজন ছোকরাকে ধরুন। আবার একটা পুঁচকে (আমার ছাত্রের মত) বাচ্চাকে পাকড়ান। এবার প্রত্যেককে এক সাথে নিজের শৈশবের কথা ভাবুন আর ছেলেবেলা বলতেই যে শব্দগুলো মনে আসে সেগুলো একটা কাগজে টুকে রাখুন। এবারেই আসল মজা। শব্দগুলো লক্ষ করলেই হেকেলের বাস্ত-পিরামিডের ছবি চোখে ভেসে উঠবে। সবার প্রথমে আপনি প্রথম শ্রেণীর শিশু, তারপর সেই ছোকরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু আর সবশেষে পুঁচকেটি- সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিশু। শব্দরাশি ভালোভাবে খুঁজে দেখবেন ওপর থেকে নিচের দিকে ক্রমাগত অনুভূতি ব্যাপারটা কমছে আর যান্ত্রিকতা ব্যাপারটা বেড়ে যাচ্ছে। খেলাটা হয়তো সত্যি করে খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব এটাই। জীবন ক্রমেই এমন জটিল হয়ে চলছে। কিন্তু এর মধ্যেও কমন ব্যাপার একটাই– ছেলেমানুষি জিনিসটা রয়েই গেছে। যেমন রয়ে গেছে আনন্দ-দুঃখ ইত্যাদিরা। তবে একমাত্র ছেলেমানুষকেই বোধহয় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আপনি প্রচুর বয়স পেরিয়ে এসেও কখনো কখনো একাকিত্বে বেসুর গলায় গান গেয়ে উঠেন– এটা আপনার ছেলেমানুষি। মাঝেরটি সিগারেট ফুঁকতে গেলেই ধোঁয়ার রিং ছাড়ার ব্যর্থ চেষ্টায় উৎকট সব মুখভঙ্গি করে এটা তার ছেলেমানুষি। পুঁচকেটার কথা নয় ছেড়েই দিলাম। শৈশবে হাজার পরিবর্তন হলেও সে তো ছেলেমানুষই। অদ্ভুতভাবে এই প্রত্যেক রকমের ছেলেমানুষটাই খোলনলচে পাল্টে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়। শুধু তাদের খুঁজে পাওয়ার চোখটা চাই। বুদ্ধদেব বসু তাই লিখেছিলেন, 'সব বয়সের শিশুদের তরে আমার এ বই'।

৪

আগেই বলেছি কবি বুদ্ধদেব বসু শিশুদের জন্য ছড়া কবিতা খুব বেশি লেখেননি। যা লিখেছেন তা হাতেগোনা, যেমন : হিতোপদেশ, বাবার চিঠি, ইচ্ছে, পরি-মার কবিতা, চারটি ডলারের ছড়া, নদী-স্বপ্ন, প্রজাপতি, রামধনু, হাওয়ার গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেব বসুর পরি-মার পত্র রুমিকে পাঠ করলে শিশুজীবনের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরূপ চিত্র পাওয়া যায়। অনেক লেখকই হয়তো শিশুদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের আবদার খুনসুটি দুষ্টুমি বা শিশুটামির উদার দিগন্ত কার্যক্রম প্রকাশ করার চেষ্টা

করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর প্রকাশভঙ্গি একক অনবদ্য, অপরূপ ঝলমলে। তাঁর কবিতাগুলো হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত গভীর নয়। সুকুমার রায়ের মত তির্যক ব্যঙ্গাত্মক নয়। তবে তাঁর কবিতায় সব আছে কিন্তু সেইভাবে উপদেশ টুপদেশ বা বাণী নেই। তবে কী আছে? আছে শুধু স্বপ্ন, কল্পনার উদার দশ দিগন্ত আর সৌন্দর্যের অনাবিল আনন্দবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ।

নদী-স্বপ্ন কবিতাটি ১৯২৯ সালে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন থাকে মানুষের। কিন্তু কবি এখানে নদীর স্বপ্নের কথা বলেছেন। নদীরও যে বক্তব্য আছে তারও ভালো মন্দ সৌন্দর্যবোধ আছে তা কবিতাটি পাঠ করলেই পাঠকের সামনে খুব পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। নদী যেন জীবনের আরেক নাম। উচ্ছলতার অমিয় সুন্দর প্রতীক। নির্মলতার পীযূষধারার প্রতীক। শিশুরা? ওরাও তো তাই। কবিতায় দেখি নীল পৃথিবী রুপালি ইলিশ সোনার মত পদ্মার জল, বেগুনী-বাদামি লাল রঙের নায়ের পাল। কী অপরূপ দৃশ্যের অচিন্ত্যনীয় সাবলীল প্রকাশ। একটু নমুনা দেয়া যাক।

"ঈগলের মতো ডানা, এমন, ঘোড়া
লাল আর নীল
আগুনের মতো ডানা, এমন ঘোড়া
লাল আর নীল
বেগুনী সোনালি আর হলদে ঝিলিক
লাল আর নীল"।

এক বিচিত্র, নাকি মহা-বিচিত্র জগত সৃষ্টি করে কবিতা লিখেছেন অদ্ভুত শব্দ-বাসর নির্মাতা ব্যতিক্রমী শব্দকারিগর এই বুদ্ধদেব বসু। যতই ভিতরে যাই ততই মিঠা মিঠা, রকমারি মধু পাই।

একবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "তিনি ছোটদের বই লিখতে গিয়ে সকলের বই লিখে ফেলেছেন"– শিশুর বইয়ের ছল করে মানুষের বই লিখেছেন তিনি"। তো আমরাও তার কথার সুর ধরে তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে রস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই তিনি শিশু শিরোনামে আধুনিক স্বপ্নিল যিশুদের জন্য লিখেছেন। জীবনের স্বাভাবিক ছবি ও রবির কথা বলেছেন, গোটা মানবজীবনের কথা বলেছেন। তিনি একবার তার কন্যাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "ইতি তোমার হাত-পা বাঁধা বাবা"। কন্যা হয়তো তাঁর সীমাবদ্ধ বাবাকে অসহায় বাবাকে বাইরে দেখেছেন, কিন্তু কবির মনকে তো বাঁধার উপায় নেই। সেই শিকল এখনো আবিষ্কার হয়নি, হবেও না। তার স্বাক্ষর তার প্রতিটি কবিতার শব্দে প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি তার লেখার ওজন এক বসুর সমান নয়। দশ বসুর সমান। এখানেই কবি বুদ্ধদেব বসু অন্যদের সাথে থেকেও অনন্য এবং অসামান্য। এই মন্তব্যের সাথে একমত হয়ে বলা যায়,—

"কবি বুদ্ধদেব বসু
তোমার সৃষ্টিতে মুগ্ধ বসু।"

সহায়ক-গ্রন্থ

১. অহর্নিশ, দশম বর্ষ বিশেষ সংকলন - ১৪১৪
বুদ্ধদেব বসু জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ২০০৮/ সম্পাদক, শুভাশিস চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগনা।
২. কলকাতা : বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা : জোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত। প্রকাশকাল ২০০2

কবিদের কবি : বুদ্ধদেব বসু

আল মাহমুদ

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বাংলাদেশের তরুণ কবিরা একান্তভাবে চাইতাম বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় অন্তত একটি কবিতা ছাপা হোক। এ আশায় বুক বেঁধে একদা আমি বুদ্ধদেব বসুর কলকাতার ঠিকানা কবিতা ভবনে তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। দারুণ অপেক্ষার মধ্যে আমার একটি সপ্তাহ কেটে গেল, হঠাৎ একদিন দুপুরে কুয়োর পাড়ে স্নানের সময় পিয়ন এসে আমার হাতে একটি পোস্টকার্ড তুলে দিয়ে বলল আপনার চিঠি— আমি ভেজা হাতে থর থর কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটি হাতে তুলে নিলাম। চিঠির ভাষা...

প্রীতি ভাজনেষু,

তোমার একটি বা দুটি কবিতা ছাপা যাবে মনে হচ্ছে।

'বুদ্ধদেব বসু'

চিঠিটি পেয়ে আশা-নিরাশার জোয়ারে আমি একটি সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের তখনকার আড্ডাটা ছিল 'বিউটি রেস্তোরা', বাংলা বাজার। সেখানে গেলে আমার বন্ধু শহীদ কাদরীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে সদ্য প্রকাশিত কবিতা পত্রিকার চৈত্র সংখ্যাটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন এই নাও তোমার কবিতা ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি তুমি নিয়ে যেতে পারো। আমি এক ঝটকায় পত্রিকাটি হাতে তুলে নিয়ে দেখে নিলাম। জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর পরেই আমার কবিতা ছাপা হয়েছে। সম্ভবত ঐ সংখ্যায় শহীদ ওমর আলীর কবিতাও ছিল। আমার তিনটি কবিতা ছাপা হওয়াতে আমি আনন্দে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সেদিন থেকেই আমি ভেবে নিয়েছিলাম আমি কবি হবো। কবি ছাড়া আর কিছু না। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু আমাদের জীবণে এক মহান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সম্ভবত বুদ্ধদেব না থাকলে আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলন কবিদের মধ্যে অতটা জনপ্রিয় হতো না। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও কবিতা বিষয়ে সবসময় সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। বুদ্ধদেব তখন যাদের কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তাঁদের সবাই কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

বুদ্ধদেব ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার-এর অনুবাদ করে তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার দিকদর্শন বদলে দিয়েছিলেন। তিনি বোদলেয়ারকে অনুবাদ করেছিলেন ছন্দে, গন্ধে, স্পর্শকাতরতার অসাধারণ আকর্ষণ তৈরি করে। ফলে তৎকালীন বাংলা ভাষার তরুণ কবিরা প্রায় সকলেই ইউরোপীয় কবিতার সামগ্রিক আকর্ষণ অন্তত একবার হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। বুদ্ধদেব না থাকলে কবিতার আধুনিকতার উপাদান যে এমন বৈচিত্র্যময় হতে পারে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না।

বুদ্ধদেব অনেকদিন আগেই দেশভাগ হওয়ার সাথে সাথেই ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন কলকাতার প্রবাসী হলেও ঢাকাকে— এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে— পারতেন না।

রমনার সবুজ প্রান্তর ঘাসে ঢাকা মাঠ, বৃক্ষ, বিহঙ্গ সব কিছুই বুদ্ধদেবের নস্টাল দিক হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল। তিনি কখনো ঢাকার এসব পুরোনো অতীতকে হৃদয়ে ধরে রেখেছিল। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু ও ঢাকা রেন্টিং ইস্টিট এর মেয়ে ছিলেন। এঁদের কাছে ঢাকাই ছিল সবচেয়ে আনন্দমুখর নাগরিকতা। সাহিত্যের ইতিহাসে এসব কথা কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছে।

একবার শান্তিনিকেতন থেকে আমি বাসযোগে কলকাতা আসার সময় প্রতিভা বসু আমার সঙ্গিনী হয়েছিলেন। আমার পাশে বসে তিনি সর্বক্ষণ ঢাকার নানাকথা বলতে থাকলে আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম ইনিই তো সেই 'রানুসোম' অর্থাৎ প্রতিভা বসু যাকে কাজী নজরুল ইসলাম একদা গান শেখাতে রেন্টিং ইস্টিট এ আসতেন। এ নিয়ে বিপত্তিও হয়েছিল। তবে এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়।

পরবর্তীকালে সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেলে তিনি বলেছিলেন তুমিই আল মাহমুদ। আমাকে সম্ভবত বুদ্ধদেব আশীর্বাদ করেছিল। এই ঘটনাটা আমি আর কোনো কালেই ভুলতে পারি নি। বুদ্ধদেব যখন মারা যান তখন আমি ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে। তাঁর মৃত্যু আমাকে মূর্ছমান করেছিল। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার মহানায়ক। অনেকেই তাঁর সংস্পর্শে এসে কাব্য রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছে। তবে তিনি নিজে যথার্থ সম্মান পেয়েছিলেন এমন মনে হয় না। তবে শার্ল বোদলেয়ারের অনুবাদে তাঁর যে অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় তিনি রেখেগেছেন তা থেকে কখনো কবিতা প্রেমিকরা বিসৃত হতে পারবেন না।

অনুলিখন : ইসরাত জাহান পপী

পুরানা পল্টন থেকে কবিতা ভবন

আল মুজাহিদী

পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে কবি ছ'বছর কাটিয়েছিলেন। কলেজজীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায় যৌবনের প্রারম্ভ থেকে বিকাশ এ সময়টাই তার আত্মপ্রস্তুতির বেলাভূমিতে জীবনের সবচে' উজ্জ্বল অংশ। সঠিক প্রস্তুতি পর্ব থেকেই মানুষের ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। জীবনকে অভিজ্ঞতার অর্জন দিয়ে নানাভাবে ভরে তোলা যায়। গতিশীল জীবনের চাকাটা এসময়ে একবার ঘুরতে শুরু করলে ঘূর্ণায়মান থাকে জীবন অবধি। সম্ভবত পুরানা পল্টনের বাড়ি আর এ বাড়ির অবস্থান বুদ্ধদেব বসুকে সমাসীন করতে সমর্থ হয়েছিল এক সুন্দর উজ্জ্বল কান্তিবিভাময় অবস্থানে। আর সে অবস্থানটিই হলো শিল্পের অবস্থান।

বুদ্ধদেব বসু জন্মগতভাবে শিল্পের মানসতা নিয়ে সাহিত্যভুবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তার অদম্য অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি তাকে ক্রমাগত ভবিষ্যতের পথে এক স্বতন্ত্র সারথি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সেটাকে আমি বলবো বুদ্ধদেবীয় সোনালি সরণি। বুদ্ধদেব বসু শিল্পের জন্যই বেঁচে থাকার সার্থকতা সন্ধান করেছেন। তিনি শিল্পের জন্যই বাঁচতে চেয়েছেন নিরন্তর। অম্লান দত্ত কোথাও বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে এরকম বলেছেন, 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানেন যে বুদ্ধদেব ও আইয়ুবের ভেতর একটি অপ্রকাশিত তর্ক আছে। পত্রালাপে তর্ক। আমার পড়বার সুযোগ হয়নি; তবে দু-জনের মুখেই কিছু-কিছু শুনেছি। আইয়ুব প্রগতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ ধীরে-ধীরে জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, অগণিত অন্যায়কে অতিক্রম ক'রে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সমাজ বৃহত্তর ন্যায়ের অভিমুখে চলেছে। বুদ্ধদেবের মন এমন ধরনের আশাবাদে সায় দেয় না। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, মানুষের আয়ু বাড়ছে, ক্রীতদাস প্রথা আধুনিক কালে ধিকৃত ও মানুষের অধিকার অন্তত মৌলিকভাবেও স্বীকৃতির পথে, এসব কথা তিনিও জানেন। কিন্তু মানুষের মনে শান্তি কি বেড়েছে? তর্কের ভাষায় এ-কথা বলবার আগ্রহ নেই বুদ্ধদেবের। কবিতাই তার ভাষা।'

জীবনকে পরিমিত অবস্থান থেকে কোনো সম্পন্নতার দিকে নিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত কাজ। কোন্ সমতল থেকে উঠে এসে একজন কবি তার জীবন ও সংসারকে সমান্তরাল করতে পারেন সে কথাটি কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সম্যকভাবে। বুদ্ধদেব বসু প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের সব্যসাচী শিল্পী। তিনি গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণসাহিত্য, প্রবন্ধ, নাট্যকাব্য, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য, গীতিকবিতা-সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই আজীবন নতুন নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। সমকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, আর্তি ও আততিকে-এষণা ও প্রাণনাকে বুদ্ধদেব বসু জীবনে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন সর্বতোভাবে। এসবেরই বীজকণা প্রোথিত হয়েছিল পুরানা পল্টনের টিনের সেই বাড়িতে।

বুদ্ধবসু বলতেন, 'আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর কোন জায়গা, আমি অনায়াসে উত্তর দিই পুরানা পল্টন।' তার কথার পৃষ্ঠে এ কথাটা যোগ করাটা হয়তো অনেকটাই সংগত হবে যে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ'র কবিতা ভবন আর ঢাকার পুরানা পল্টন বুদ্ধদেব বসুর জীবনের এক সমমাত্রিক ও সমান্তরাল সহ-অবস্থান।

পুরানা পল্টন থেকেই বুদ্ধদেব বসুর যে জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল সেই জীবনযাত্রার তারুণ্য-পৌরুষ তাকে দিন দিন দেদীপ্যমান করে তুলতে থাকে। যে তারুণ্যময়তা ও পৌরুষেয়-প্রবল শক্তির আধার থেকে বুদ্ধদেব বসু জেগে উঠেছিলেন দিবালোকের মতো সে-ই দেদীপ্যমানতা তাকে যাবজ্জীবন জাজ্জ্বল্যমান রেখেছে। অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা বহির্জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন, 'সতের বছর বয়সে আমি পুরানা পল্টনের বাড়িতে আসি। পাড়াটা তখন সবে গ'ড়ে উঠছে; শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু'এক-খানা বাড়ি; পাকা রাস্তা নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই; সে-ই বড়ো রাস্তার মোড়ে একমাত্র জলের কল। ডাকবাংলোর পর থেকে রাস্তাতেও আলো ছিলোনা। অসুবিধে যতোদূর হ'তে হয়। প্রথম কয়েকদিন খুব বিশ্রী লাগলো; মনে হ'লো সভ্যতার এলাকার বাইরে নির্বাসিত হয়েছি। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর বোধ হয় খান দুই বাড়ি উঠেছে তখন–তারই একবাড়ির ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশিতার সূত্রে আমার পরিচয়, একই কলেজে পড়ার উপলক্ষে তা পরিণত হলো বন্ধুতায়। শেষপর্যন্ত আমরা যে–ক'টি বন্ধু একত্র হয়ে 'প্রগতি দল' ব'লে পরিচিত হলাম, তাতে প্রায় সকলের সঙ্গে সেই রকম সময়ে আমার আলাপের সূত্রপাত।'

পুরানা পল্টনের সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু নানা বিবরণ দিয়েছেন। দেখতে দেখতে চোখের সামনে মস্ত মস্ত বাড়ি উঠে গেছে। পাড়াটা ভরে গেছে লোকে লোকে। কতো গ্রীষ্মের দুপুর। ছাদ পেটানোর গানের সুর ভেসে উঠছে। পাকা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে বাড়ি বাড়ি। পুরানা পল্টন ভরে গেলো মানুষে মানুষে। ভদ্রলোকের আবাসস্থল হয়ে উঠলো। বুদ্ধদেব বসু বলছেন, 'এখন ভেবে দেখছি আগেকার সেসব দিনই ভালো ছিলো, যখন বড়ো রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে তারপর জল-কাদা পার হয়ে বাড়ি আসতে হ'তো; যখন বন্ধুরা মাঝে মাঝে সাইকেল ঘাড়ে ক'রে একহাঁটু কাদা ভেঙে আমার বাড়ি এসে পৌঁছুত; যখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে তারার আলোয় পথ দেখে আমি বাড়ি ফিরতুম, আর শুক্লপক্ষে আকাশ ভরে আলোর বান ডাকতো, তেমন জোছনা কতোকাল দেখিনা। সে-সময়টা আমি প্রায়ই রোজই বেশি রাত ক'রে বাড়ি ফিরতুম; নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে একা হেঁটে আসতে কী ভালোই লাগতো।'

সেই পুরানা পল্টনই খুব প্রিয় ছিলো ভালো ছিলো বুদ্ধবসুর কাছে। পুরানা পল্টন বাড়িটা দিনদিন সভ্যতার আলো পেয়ে সভ্য হয়ে উঠতে থাকলো আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতির উচ্ছলতা হ্রাস পেতে থাকলো। পুরানা পল্টনের স্মৃতিতে বুদ্ধবসু অনেক কথাই লিখেছেন। যে কথা তিনি কখনও বিস্তৃত হবেন না তা হচ্ছে বর্ষার রূপ। জীবনে তিনি আর কখনও দেখতে পাবেন না, 'অমন ধ্বনি বর্ণবহুল উচ্ছৃঙ্খল অজস্র বর্ষা। .... বৃষ্টি! বৃষ্টি! জানালা বন্ধ ক'রে দিতে হ'তো। তবু বেড়ার ফাঁক দিয়ে জল এসে মেঝেতে রীতিমতো স্রোত ব'য়ে গেছে। চালের ওপর বৃষ্টির অবিরাম গান–সে গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি কতোরাত্রে।

পুরানা পল্টনের বর্ষার রূপ কখনই ভুলবার নয়; সকাল বেলার ছেঁড়া মেঘের আকাশ, ভিজে হাওয়া, মাঠে জ'মে থাকা জল, মাঠ-ভরা নতুন সবুজ ঘাস, আমাদের উঠোনের তুলসী মঞ্চে-ঘন লতার আড়ালে ঘন-নীল অপরাজিতা, মাটির গন্ধ, বুনোফুলের গন্ধ। আকাশ-ভরা সে-ই নরম নীল মেঘ, সে-ই অশ্রান্ত, অজস্র বর্ষণ; বাইরে তাকালে মনে হ'তো সমস্ত সৃষ্টি যেনো ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; পৃথিবীর শেষসীমা এখানে।'

বুদ্ধদেব বসু তার নিজস্ব-আত্মিক-ভৌগোলিক রেখায় যে দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা নির্মাণ করেছিলেন সেখানেই তিনি বিপুল আবিষ্টতায় অনঙ্গ নির্জনতায় পরিভ্রমণ করেছেন। তার জীবন ও শিল্পের এই পরিক্রমা অনন্যপূর্ব।

পুরানা পল্টন থেকেই তিনি যাত্রা করেছিলেন কবিতা ভবনের দিকে। জীবনের মঞ্চটি আরেকভাবে সাজাতে তিনি সশরীরে হাজির হয়েছিলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ'র কবিতা ভবনে। কবিতার বয়ঃসন্ধির প্রভাবে নিজেকে ঘোর দুঃখী বলে কল্পনা করেছেন পুরানা পল্টনের বাড়িতে অবস্থানকালে। স্বগতোক্তি করে বলেছেন, 'রোজ রোজ দুটো তিনটি ক'রে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখছি। সংসার-সমাজের প্রতি সমস্ত মন তখন বিমুখ; বোহেমিয়ানিজমকে সার করেছি জীবনের। তার ফলে তিন মাসে একবার চুল ছাঁটি; স্নানাহার সম্বন্ধে অনিয়মকে ক'রে তুলেছি নিয়ম। দিনকে রাত্রির যে কোন সময়ে চায়ের দোকানে আড্ডাই ছিলো আমার স্বর্গ। ... কিন্তু নিয়ম করা উচ্ছৃঙ্খলতায় কিছুদিন পর ক্লান্তি আসে; সে-ঢেউ কেটে যেতে দেরী হলোনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম, তখন থেকে আমার মধ্যে যেন নতুন জীবন এলো।'

এই যে নতুন জীবন এলো এ জীবনপ্রবাহ বুদ্ধদেব বসুর নিয়ম করা উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভেঙে চুরমার করে দিলো। এর পর থেকে শুরু হলো তার এক ধরনের 'প্রগতি চিন্তা'। আর সে চিন্তা থেকে প্রগতি আন্দোলনের ধাপ। হাতে লেখা প্রগতি ছাপিয়ে বের করতে হবে। একশ টাকা হলে টেনেটুনে পত্রিকা বের করা চলে। দশজনে দশ টাকা করে দিয়ে শেষমেশ একদিন 'আষাঢ়ের এক শুভ দিনে পীত মলাটে ঊর্ধ্বমুখী নারীমুণ্ডের প্রতিকৃতি যুক্ত হ'য়ে সত্যি-সত্যি একদিন ছাপার অক্ষরে প্রগতি বের হলো।'

আর এ প্রগতি বের করা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একই সঙ্গে ঘটেছিল বুদ্ধদেব বসুর জীবনে। জীবন সংসার তার নিজস্ব নিয়মেই চলতে চায়। সে-মতো চলাই যেনো চলা। এতে কোনো ব্যত্যয়ও ঘটতে চায়না। জীবনের চাকাতো ঘুরতেই থাকে। মানুষের এই ঘূর্ণমান জীবনে নানা গতি আসে। আর গতি থেকে নানা বাঁক সৃষ্টি হয়। এতে করে বুদ্ধদেব বসুও দিনদিন শক্ত সামর্থ্য হয়ে উঠেছেন। সংসারে অন্যদের সঙ্গেও একধরনের স্বার্থবোধ জেগে উঠেছে। জীবনে যতোটা সুন্দর সচল সতেজ স্বচ্ছ রাখার ইচ্ছে থাক– কবি বলছেন, 'সংসারের চিহ্ন তাতে পড়বেই।'

কেউই জীবনকে এড়িয়ে চলতে পারেনা। জীবনকে এড়ানো সম্ভব নয়। কবির পক্ষেও সম্ভব নয়। জীবনের সঙ্গে জীবনকে ক্রমাগত যোজনা করতে হয়। এক অন্তহীন মাত্রায়। বাস্তবকে জেনে মেনে আরো অধিকতর বাস্তবিক অনুষঙ্গগুলো জীবনের ভেতরে জায়গা করে দিতে হয়। পুরানা পল্টনইতো বুদ্ধদেব বসুর জীবন যৌবনের উচ্ছ্বাস-উদ্দামতা এবং সৃজনশীলতার জন্ম দিয়েছিলো। পুরানা পল্টন তার মননশীলতা ও সৃজনশীলতার জন্মদাত্রী। এ কারণেই কবি পুরানা পল্টনকে মূল্যবান মনে করতেন। বুদ্ধদেবের জীবনের স্বয়ংকৃতি সুসিদ্ধির মুহূর্তগুলো পুরানা পল্টনের নেপথ্যের জাতক ও

নির্মিতি। সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে পুরানা পল্টনের অধ্যায়কে বিস্মৃত করা যাবেনা। কেননা পুরানা পল্টনের আনন্দ ও সৃষ্টির স্মৃতিকে বুদ্ধদেব বসুও কখনও বিস্রস্ত করতে চাননি। তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু এও জানি, সে-আনন্দ আর কখনো আর পাবো না, পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে যা পেয়েছিলাম। তখনকার জীবনকে আমি যেমন ক'রে ভালোবেসেছিলাম, কৃতি ও সম্মানিত পরবর্তী জীবনকে ঠিক সে-রকম ক'রে ভালোবাসতে পারবো কি? কে জানে।'

এটা সুবিদিত যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা কবিতায় নতুন গতিষ্মান দিকচিহ্নময় বৈশিষ্ট্য যোগ করে এসেছে। এটা ছিলো কবিতার কালের দর্পণ। 'কবিতা' পত্রিকায় অনেক প্রতিষ্ঠিতরাই লিখেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। এছাড়া নবদিগন্তের উদীয়মান প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনাময়রা তাদের উত্থান ও ইতিবাচক অভ্যুদয়কে চিহ্নিত করেছে। বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে 'কবিতা'র অবদানের মতো আর কি কিছু ঘটেছে কখনও? মীনাক্ষী দত্ত লিখেছেন, 'পঁচিশ বছর ধরে নিয়মিত, নির্ভুল নিরপেক্ষ ও অমোঘ যে কাজ ক'রে গেছেন তা সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে একটি চূড়া বিশেষ, একটি মেরু। পত্রিকার এমন এক মান 'কবিতা' স্থাপন করেছে যে পরবর্তী সমস্ত পত্রিকা, আভাঁগার্দ কি লিট্‌ল ম্যাগাজিন কি বড়ো ব্যবসায়িক পত্রিকা সবেরই বিচার হবে কবিতা পত্রিকার নিকষে।'

আমরা জানি কবিতা পত্রিকার মতন একটি মননশীল, সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা আজ অব্দি বাংলা ভাষাভাষী কারোর হাতে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশিত হতে পারেনি। সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসুর হাতেই। বুদ্ধদেব বসু কোনো গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা এসব মূর্খ স্থূলতার প্রশ্রয় দেননি। তিনি কোনো বাণিজ্যিক লক্ষ্যও চরিতার্থ করেননি। এটা অতি সত্য যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন মুক্তবুদ্ধিপ্রাণ এক মনীষী। তিনি রাজনৈতিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাদর্শী সম্পাদক। তিনি কাব্যান্দোলনের মধ্যদিয়ে নতুন মানব-সংস্কৃতির সংহতি রচনা করেছিলেন। সেই সাম্প্রতিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাষার বিশুদ্ধতা ও চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে। ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এখন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক ফলক। সাহিত্য ও সংস্কৃত হিতৈষণার আলোকস্তম্ভ। কবিতা ভবন আজ কি তেমন ব্যাখ্যার দাবি করে যে এখানেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জাতিস্মর স্মৃতিস্মর প্রতিভাবানেরা একদিন মনোজ্ঞ আড্ডা দিতেন। চিন্তা-চৈতন্যের আদান-প্রদান করতেন। মেলবন্ধন ঘটাতেন প্রাতিস্বিকতার। এখানেই রচিত হয়েছে মানব সংস্কৃতির নতুন নতুন অধ্যায়। জীবন-জগত, সমাজ-সংসারকে সংক্রমিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, আলোড়িত হয়েছেন, আন্দোলিত হয়েছেন কৃষ্টির প্রবল কল্লোলে। বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি যা ছিলো তার পত্রিকার দপ্তর, জীবনযাত্রা পদ্ধতিরও এক চলিষ্ণু চলচ্চিত্র। যদিও বুদ্ধদেবের হাতে ছিলোনা তেমন কোনো ধাতব সেলুলয়েডের ফিতা।

পুরানা পল্টন থেকে কবিতা ভবন এই যে— সেতুবন্ধটি রচিত হয়েছিল এর উত্থান ও অভ্যুদয় বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক আশ্চর্য বিভাব বিচ্ছুরিত করেছে আর সাহিত্যরথী সবার জীবনে স্বয়ংবদ্ধ করেছে বিপুল বৈভব।

পরিব্রাজক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য

আহমেদ মাওলা

বাঙালি ভ্রমণ-বিলাসী নয়, পরিব্রাজক হিসেবেও তার কোনো গৌরব জনক ইতিহাস চোখে পড়েনা। এক্ষেত্রেও একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ; তাঁর *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রী*, *জাপানযাত্রী*, *পশ্চিম যাত্রীর ডায়রী*, কিংবা *রাশিয়ার চিঠি*,-এর মধ্যে যে অন্তদৃষ্টি, ইতিহাসচেতনতা এবং সমাজবীক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়, সত্যি তা বিরল। অন্তত সে যুগের বাঙালিদের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠ ছিলো নতুন এক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথের পর একমাত্র বুদ্ধদেব বসুই নিষ্ঠার সঙ্গে ভ্রমণ-সাহিত্য রচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর ভ্রমণবিষয়ক রচনাগুলো, তাঁর অন্যান্য সাহিত্য-কর্ম থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায় ধারাবাহিকভাবে *আমি চঞ্চল হে* (১৯৩৭), *সমুদ্রতীর* (১৯৩৭), *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪৭) ও *দেশান্তর* (১৯৬৬) ইত্যাদি গ্রন্থ পড়লে ভাষার প্রাঞ্জলতা, সরস অনুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য স্ফূর্তি লাভ করেছে। আরোপিত কোনো তত্ত্ব বা রাসভারী পাণ্ডিত্যের বোঝা তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যে নেই; বরং তত্ত্বের বদলে আছে অভিজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং পাণ্ডিত্যের বদলে আছে প্রতিভার দেখা। ফলে ভ্রামণিক গদ্যের মধ্যও অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে, 'কবিতা' (যেমন *আমি চঞ্চল হে* গ্রন্থে গদ্যের পাশাপাশি কয়েকটি কবিতাও আছে, যা পরে *নতুন পাতা* (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।) 'চিঠি'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আপন ব্যক্তিকতাকে উহ্য রাখেননি তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যে। তাই দেখা যায়, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত আপন ব্যক্তিত্বের রুচি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নানাভাবে। রেলের কামরায়, সমুদ্রতীরে কিংবা বিদেশের কোনো রাস্তায় হাঁটাপথেও অনুক্ত থাকেনি ব্যক্তি বুদ্ধদেবের ভালো লাগা, মন্দ লাগার একান্ত অনুভূতিগুলো। তাঁর বর্ণনা ও বিবরণের মধ্যে, তুলনা ও উদাহরণের মধ্যে খুঁজে পাই আধুনিক, নগরমনস্ক এক কবি-ব্যক্তিত্বকে। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হই তাঁর ভ্রমণে আনন্দময় আবেগ আর অনুসন্ধানী চোখে নতুন জায়গার সৌন্দর্য আবিষ্কারে মনোমুগ্ধকর দৃষ্টির বৈভব দেখে। মানুষ টাকায় ধনী হয়, সবাই জানে; অভিজ্ঞতায়ও যে মানুষ ধনী হতে পারে, বুদ্ধদেব বসুর ভ্রমণ-সাহিত্য পড়লে তা বোঝা যায়। দশ মাইল পায়ে হাঁটায় আমরা যা দেখবার বা অনুভব ও গ্রহণ করবার সুযোগ পাই, তা কি পাওয়া যায় রেলগাড়িতে রাতারাতি একটা আস্ত দেশ পেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে? অদ্ভুত চেহারার একটা গাছ, পাখির হঠাৎ উড়ে যাওয়া, ছায়ায় শুয়ে একটা কুকুরের হাড় চিবানো দেখা— প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের এমন নিবিড়তা, পথ চলা তখন আপনাতে আপনি সার্থক হয়ে ওঠে। উপলক্ষটা যখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, অকারণ বেড়াবার আনন্দটা তখন উপভোগ্য হয়ে উঠে।

> সেদিন বিকেলে সমুদ্র ছিলো বার্ণিশ-করা কাঁসার মতো ঝকঝকে। ঢেউগুলো জ্বলন্ত রোদ দিয়ে মাজা। সূর্য হেলেছে পশ্চিমে, নেমেছে সোনার বন্যা তির্যক স্রোতে, চোখ ঝলসে যায়। (*আমি চঞ্চল হে*, পৃ. ৩২)

১৯৩৪ সালে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু উড়িষ্যা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। গন্তব্য ছিলো ভুবনেশ্বর, পুরী, চিল্কা ও কোনারক। পুরীতে সমুদ্র দেখতে গিয়ে লিখেছেন তাৎক্ষণিক কবিতা—

দ্যাখোনা সমুদ্র তোমার কী করে
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মতো হাওয়া।
যেমন শঙ্খ আর ঝকঝকে ঝিনুক
এই ঢেউয়েরা হাজার বছর ধরে আঁকে
কত অফুরন্ত রঙে, কত বিচিত্র নকশায়
বাদামি আর বেগনি আর অপরূপ মসৃণ
আর আঁকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো রেখায়
তেমনি তারা তৈরি করুক তোমার শরীর
শঙ্খের মতো মসৃণ তোমার শরীর
একবার নিজেকে দাও না সমুদ্রের কাছে
তারপর দ্যাখো সে তোমাকে নিয়ে কী করে।

কল্লোলিত সমুদ্রের মুখোমুখি বসে আপন সত্তায় শূন্য হয়ে যাওয়া মন নিয়ে লেখা একবিতা-অনুচ্চারণীয় অথচ শব্দময়, সমুদ্র যেন লাফিয়ে এসে অনঙ্গ রূপ ধারণ করেছে।

আমি চঞ্চল হে রচনায় বারবার ফিরে এসেছে কলকাতার বদ্ধ, অবরুদ্ধ জীবনের সঙ্গে পুরী কিংবা ভুবনেশ্বরের পরিপার্শ্বিকের তুলনা। টাটকা বর্ণনায় যেন সেই জায়গার গন্ধ নাকে এসে লাগে। চিল্কা, কোনারক, ভুবনেশ্বর বর্ণনার গুণে এমন হয়ে উঠেছে, যে পাঠক কখনো ওই জায়গায় যায়নি, তারাও বুদ্ধদেব বসুর চোখ দিয়ে দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন। *আমি চঞ্চল হে* গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন— 'আমরা এই রচনার রটনার অংশ অতি সামান্য। এতে হয়তো আমি শুধু নিজের কথাই বলেছি।' নিবিড় সংবেদন মুহূর্তের বিবরণ। যে মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনের চিহ্ন, সেগুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারি আমরা বেঁচে আছি। স্মৃতির কুয়াশায় তারা রঙিন। ভাবনার হাওয়ায় তারা চঞ্চল। পাখির উড়ে যাওয়ার মতো ধাবমান।

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত *সমুদ্রতীর* (১৯৩৭)। ১৯৩৬ সালে বুদ্ধদেব বসু স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ গোপালপুর, আন-সী ও ওয়ালটেয়ারে ভ্রমণ করেছিলেন পূজোর ছুটিতে। কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে শেষ রাতে ভুবেনেশ্বর তারপর বহরমপুর হয়ে গোপালপুর। সেখান থেকে মোটরে চড়ে দশ মাইল, তবে সমুদ্রের স্নিগ্ধতা। এখানে এসে প্রথমে একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ভাগ্যক্রমে একটা বাড়ি পাওয়া গেল। স্নানঘর, খাওয়ার ঘর বড় দেখে মনে আনন্দই হলো। আশ্রয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার অবসান হলে তিনি বেরিয়ে পড়েন জায়গাটি ভালো করে একবার দেখতে। সেই বর্ণনার কিছু অংশ— "চৌরাস্তার মোড়ে ডাকঘর, পাশাপাশি কয়েকটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর দোকান, বেশির ভাগই খাদ্য জাতীয়, তাছাড়া দেয়ালে-ঘেরা একটা জায়গায় হাট বসে তরকারি যথেষ্ট ও যথেষ্ট শস্তা; কিছু সমুদ্রের মাছ, ভেড়ার মাংস। ডিমের আর মুর্গির অভাব নেই। 'কেলা' আর 'কমলালেম্বু' ঘরে ঘরে ফিরি করছে। খুব মিষ্টি লেবু; কলাও চমৎকার; কলকাতার বাজারে এই দুই ফলেরই ওরকম উৎকর্ষ দুর্লভ।" (*সমুদ্রতীর* পৃ. ১৭)

ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীরে সাপ্তাহখানেক থাকতে গিয়েও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি সেখানকার হাট-বাজার আর বিভিন্ন দ্রব্যের সুলভ, প্রাচুর্যের দিকটি। মুহূর্তে কলকাতার সঙ্গে তার তুলনা করতেও তিনি ভোলেন না। নদীর তীরে, সমুদ্রতীরের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের কারণেই হয়ত সমুদ্রতীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও ভিন্নতর হয়। বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায় সেই ভিন্নতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> ..... আমরা নামি গিয়ে সমুদ্রে। এতক্ষণে বেলা বেড়েছে শাদা রোদে ঝলসাচ্ছে সমুদ্র, ভোরের সবুজ-সোনালি চেহারা নেই আর। আরো স্নানার্থী আসছে একটি দুটি করে; তবে পুরীর মতো গঙ্গাঘাটের ভিড় কখনোই হয়না। পুরীর তুলনায় গোপালপুরের সমুদ্র নেহাতই শান্ত। তেমন উৎরোল উচ্ছ্বাস একদিনও দেখলুম না। এ-সমুদ্রে নাওয়ার ক্লান্তি কম, কিন্তু উত্তেজনাও কম, ফূর্তিও কম। ছোটো ছোটো ঢেউ, তাও এক-একটার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। (*সমুদ্রতীর*, পৃ. ২০)

সমুদ্রতীর ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা*, শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাস, নজরুলের *সিন্ধু তরঙ্গ* ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর সমুদ্রতীর ভ্রমণ সেরকম কোনো লক্ষ্যে পরিচালিত নয়। বরং অবসর অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। তাই আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর উপভোগটাই প্রধান হয়ে উঠেছে তার মুহূর্তগুলো। যেমন—

> দুপুরবেলার দিকে মানবিকার দয়া হয়; তিনি ঘুমান। সেই সুযোগে মক্ষিরাণীও ঘুমিয়ে নেয়। আমি শুইয়ে বই পড়ি; ক্ষণে ক্ষণে জানালা দিয়ে চোখে পড়ে বিশাল উজ্জ্বল সমুদ্র, হঠাৎ চমকে উঠি, মনে হয় এই প্রথম সমুদ্র দেখলুম। (*সমুদ্রতীর*, পৃ. ৮০)

মুহূর্তকে এভাবে চমৎকার বর্ণনায় তুলে ধরা, অথচ নিছকই দৈনন্দিতার তুচ্ছ অনুষঙ্গে জড়িত মুহূর্ত। বুদ্ধদেব বসুর মন ও চোখ দুটোই অতিমাত্রায় সচেতন এবং ইন্দ্রীয় যথেষ্ট সক্রিয়। তাই দিয়ে যা তিনি দেখেছেন ও ছুঁয়েছেন, সেইটি হয়ে উঠেছে বর্ণনার রসে রসসিক্ত হালকা তুলির টানে হয়ে উঠেছে নিখুঁত চিত্র। এখানে বুদ্ধদেব বসু পূজার ছুটি উপভোগ করেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁর আনন্দের ভাগ আমাদেরও দিয়েছেন। সেই আনন্দ এতই নির্মল যে, আমাদের মনে হয় নিজেই যে বেড়িয়ে এসেছি। সমুদ্রের 'শান্ত' এবং 'রাক্ষুসে' দুই রূপই আমাদের চোখে ফুটে উঠেছে। বলা যায় 'সমুদ্রতীর' সেই ধরণের বই, যা একনিঃশ্বাসে পড়ে দেখা যায়।

সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১) উপলক্ষ ছিলো ১৯৪১ সালে গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্র-সান্নিধ্য। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড 'শান্তি নিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড 'রবীন্দ্রনাথ'। শান্তিনিকেতন অংশে একটা পূর্বস্মৃতিও আছে। যেখানে ১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন ও কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়সহ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার স্মৃতি বর্ণিত। এবার এসেছেন দুই শিশুকন্যাসহ বুদ্ধদেব ও জ্যেতির্ময় রায়। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় শান্তিনিকেতনের 'রতন কুঠিরে'। থাকার কথাছিলো দু'তিন দিন কিন্তু ভালো লাগার কারণে সেই থাকা হয়ে গেলো তের দিন। দীর্ঘ তের দিন শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ সকাল, রৌদ্রাক্ত দুপুর, জ্যোৎস্না স্নাতরাত কিংবা নববর্ষার জলেধোয়া প্রকৃতিকে অবলোকন করার দুর্লভ সুযোগ যেমন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য হয়ে উঠেছে মহার্ঘ। যদিও এসময়টা রবীন্দ্রনাথ প্রায় রোগজীর্ণ ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যখন শান্তিনিকেতনে পৌছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। কখনো সকালে, কখনো সন্ধায় কি বিকেলে রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে বসতেন বুদ্ধদেবও পাশে গিয়ে বসেছেন। এমনি বসায় আড্ডা

জমতো গল্প, কবিতা, ছবি কিংবা গান বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। কথা প্রধানত রবীন্দ্রনাথই বলতেন, বাকিরা ছিলেন শ্রোতা। সেই স্মৃতিগুলোকে বুদ্ধদেব বসু সাজিয়েছেন 'গীতময় ইন্দ্রধনু', ' হেমুতন', 'ছবি ও গান', 'জীবন সম্রাট', 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' ইত্যাদি শিরোনামে। বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায়–

> তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নূতন করে মনে হতো যে সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে গেলো। তাঁর কথা যেন বর্ণাঢ্য গীতনিঃস্বন, যেন গীতধ্বনিত ইন্দ্রধনু। তা যেমন শ্রুতিসুখকর তেমনি মনোবিমোহন। বাংলা ভাষার উপর তাঁর প্রভুত্ব যে কী অসীম তা তাঁর কথা শুনলে ঠিক ধারণা করা যায় না। তিনি হুবহু তাঁর শেষের দিককার গদ্য বইগুলোর মতো কথা বলেন। ...তাঁর মুখে শুনলে বাংলাকে অনেক বেশি জোরালো ও মধুর ভাষা বলে মনে হয়। (পৃ. ১৯৬)

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কয়েকটা দিনের সান্নিধ্যকে অমর করে রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর এ স্মৃতিকথায়। গ্রন্থটি শেষে 'প্রত্যাবর্তন' শিরোনামের অংশে তিনি এই বলে প্রবোধ টেনেছেন– "আমার অনেক ভাগ্য তাঁর দেশে জন্মাতে পেরেছি, অতি কনিষ্ঠ হয়েও তার সমসাময়িক হতে পেরেছি। ... চলে আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগশয্যায়। ভাবিনি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। ...বাইরে বিকেলের উজ্জ্বলতা থেকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজি-চেয়ারে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুজে চুপ। ...আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটি কথা বললেন।" তার কিছু দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন যাপনের যে অন্তরঙ্গ আনন্দ, তাকে এমন উজ্জ্বল ঝরঝরে ভাষায় প্রকাশ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। শান্তিনিকেতনে কবি নিজের চারিদিকে যে প্রতিবেশ রচনা করে তুলেছেন সেখানেই তাঁর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন এবং শান্তি নিকেতনের বিস্তীর্ণ অবকাশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তি। বুদ্ধদেব তাই শান্তি নিকেতনের পরিবেষ্টনীতেই চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনের জীবন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে কবির চিত্রও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

দেশান্তর (১৯৬৬) বুদ্ধদেব বসুর চতুর্থ ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ। রচনাকাল ১৯৫৩ ও ১৯৬১–৬৫ সাল। 'আকাশযাত্রী', 'জাপান ও হনলুলু' 'আমেরিকায়' এবং 'য়োরোপে ও মিশরে' শিরোনামে এর চারটি ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় অংশটি স্বতন্ত্র ও সচিত্র পুস্তক হিসাবে বেরিয়েছিল ১৯৬২ সালে *জাপান জার্নাল* নামে। ১৯৬১ সালে জানুয়ারি মাসে সপ্তাহখানেকের জন্য জাপান ভ্রমণ করে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। *জাপান জার্নাল* পড়তে মনে হলো এর নির্ভরতা ছিল মূলত জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু ইংরেজি বইয়ে পাঠ এবং ভ্রমণের সময় স্থানে স্থানে নেয়া কিছু শর্টনোট। প্রথম দিকের ডায়রিতে তিনি লিখেছেন– "যখন শুতে গেলুম, মনে হল জাপান আমাদের অনেক দিনের চেনা।" বোঝাই যাচ্ছে এ চেনা যতটা শারীরিক তারচেয়ে বেশি মানসিক। এক জায়গায় লিখেছেন– "জাপানি শিষ্টাচার অতিশয় সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত", সেই উচ্চাগ্রাসে পৌঁছাতে হলে শুধু আমরা কেন, অন্য যেকোনো মানবসম্প্রদায় হাঁপিয়ে পড়বে। জাপানে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের লোকদের জন্য একথা সত্য। শুধু তাই নয় দেশ হিসেবে জাপানের ঐশ্বর্য এবং তাদের উন্নতির মূলে যে তাদের শ্রমনিষ্ঠা রয়েছে, তাকে বুদ্ধদেব বসু শনাক্ত করেছেন এভাবে–

> বিশ্বাস করা সহজ নয় যে জাপান ও ভারতবর্ষ একই এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই দুই দেশে পদে পদে গরমিল ....কী মসৃণ ও সক্ষম এদের প্রতিটি যন্ত্র, কী নিখুঁত এদের সেবা কী

> প্রকাণ্ড এদের বাণিজ্যবল ছোটো-বড়ো সমস্ত কাজে কী নিঃশব্দ ও পূর্ণ এদের অভিনিবেশ, জগৎ-সংসারে কৃতি হতে হলে যেসব গুণ আবশ্যক; ...যেন জাপানিদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

১৩ জানুয়ারি (১৯৬১) থেকে ২২ জানুয়ারি এদেশ দিনের জাপান সফরকে তারিখ অনুযায়ী সাজিয়েছেন। এজন্য হয়ত বইটি প্রকাশের সময় *জাপান জার্নাল* নাম দিয়েছেন। এর মধ্যে আড়াই দিন হনলুলুতে ছিলেন তিনি। হনলুলুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> হনলুলুর স্থাপত্যে ও গৃহসজ্জায় অভিনবত্ব আছে। স্নানের পরে যে রেস্তোরায় আমরা খেতে গেলুম, সেটি বাঁশের তৈরি ...যাঁরা ফুল, উদ্ভিদ, অর্কিড ইত্যাদি ভালোবাসেন তাদের পক্ষে হনলুলু এক স্বর্গরাজ্য; ওসব শোভা এখানে স্বভাবতই প্রচুর বলে ঘরে ঘরে স্থান হয় তাদের; ... এর নিসর্গ ও ক্ষিতিজ সামগ্রী উষ্ণ মণ্ডলের সৃষ্টি, প্রধান প্রাকৃত সম্পদ আনারস, আদি ও মিশ্রিত অধিবাসীদের চেহারার ধরনটাও এশীয়, তবু একে এশিয়া বলে ভাবতে গেলেও মন ঠিক সম্মতি দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অথচ সমগ্র প্রজাসংখ্যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি জাপানি বংশোদ্ভূত।

রবীন্দ্রনাথের *জাপান-যাত্রীর* সঙ্গে তুলনা করলে বুদ্ধদেব বসুর *জাপান জার্নাল* বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টিতে অনন্য বলা যায়।

'আকাশযাত্রী' অংশটি ১৯৫৩ সালে আমেরিকার পিটার্সবার্গের পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন্স-এ এক বছরের জন্য অধ্যাপনা উপলক্ষে যাত্রার বিবরণ। 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে ভ্রমণ কথা লিখতে শুরু করেন তিনি। সেই সূত্রে এক একটি অধ্যায় লিখিত। সাগরময় ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব লিখেছেন— "এই পিটার্সবার্গ শহরের কলেজের জীবন কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, এই দেশের মধ্যে যখন যে রকম ভ্রমণ করবো সেইভাবে লিখে যাবো।" মোট পাঁচকিস্তিতে লিখেছিলেন সেই ভ্রমণকথা। অধিকাংশই প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা। তারপর আছে আমেরিকার রেলভ্রমণের কথা। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন— "ন্যুয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন দুটো রেল পথে যাওয়া যায়। আমি যেটিতে চলেছি তার ইস্টেশান ন্যুয়র্ক শহরের মধ্যে নয়, হাডসন নদী পেরিয়ে নিউ জার্সিতে। ...মার্কিন রেলগাড়ির নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনে চলে, গতি প্রবল, আওয়াজ কম, ধোঁয়া নেই। বসবার ব্যবস্থা এরোপ্লেনের মতো চেয়ারে, অনেক গাড়িতে একটা 'আরাম কামরা' থাকে। সুবিধের মধ্যে খাবার জলের কল যত্রতত্র, অসুবিধের মধ্যে ধূমপানের কামরা স্বতন্ত্র।" এথেকে বোঝা যায় আমেরিকা তিনি দেখছেন অনেকটা আবিষ্কারের চোখে। এ গ্রন্থে তৃতীয় খণ্ড 'আমেরিকায়'। ১৯৬১-৬২ সালে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় প্রবাসের স্মৃতি এখানে সংকলিত। প্রথম পাঁচটি অধ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে *মার্কিনী-জীবন* নামে প্রকাশিত। সপ্তম অধ্যায়টি 'বীটবংশ গ্রীনিচগ্রাম' শিরোনামে প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬১ সালে। বোঝাই যায়, এবার বুদ্ধদেব বসু তাকিয়েছেন প্রধান আমেরিকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতির দিকে। এক জায়গায় তিনি লিখছেন— "প্রসিদ্ধ এই ওয়াশিংটন স্কোয়ার পাড়া, মার্কিনী সংস্কৃতির এক আদিভূমি, সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতিময়। কিন্তু এখন এই সবই অনুভূতির বহির্ভূত। যে তথ্যটি এখন ইন্দ্রিয় ও মনের কাছে সবচেয়ে স্পষ্ট, তা হলো শীত। শহর যেন বরফে চাপা পড়ে আছে।" আমেরিকার সমাজ ও জীবনের দিকে তিনি তাকিয়েছেন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। নিঃসঙ্গ এদেশের মানুষ। সব মেয়ের স্বামী মেলে না, অনেক পুরুষ অবিবাহিত

থাকেন, আর তরুণদের মধ্য সম্প্রতি যদিও বাল্যবিবাহ ও প্রজননের প্রতি আসক্তি দেখা যাচ্ছে, প্রৌঢ় দম্পতিরা অনেকেই নিঃসন্তান। আমেরিকার সেই সময়ের জীবন ছিল সেরকমই, এখন অবশ্য অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বুদ্ধদেব বসু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন সমকালীন মার্কিনী জীবন।

দেশান্তর গ্রন্থের চতুর্থখণ্ড 'য়োরোপে ও মিশরে' মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইউরোপের এক বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

> মহানগর নয় কোপেনহেগেন; যদি না আপনি পুরাতত্ত্বে উৎসাহী হন তাহলে প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি একদিনেই দেখে নিতে পারবেন। আমাদের হোটেল থেকে পাঁট মিনিট হাঁটলে চিত্রশালা সেখানে অবাক হতে হয় রঁদার সংগ্রহ দেখে, ফরাশি ইম্প্রেশনিস্টরাও সদলে উপস্থিত; এডভার্ড মুঙ্ক-এর কয়েকটা মূল ছবি দেখতে পেয়ে আমার বহুকালের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো।
>
> ...কোপেনহেগেনে পা দিয়ে মাত্র আমার আন্ডারসেনকেই প্রথম মনে পড়লো। আর সত্যিও এই নগর যেন আন্ডারসেনের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি— মানে রূপ ও শৈলীর দিক থেকে তা-ই। যেমন সবই ধরা দিয়েছে তাঁর কাহিনীতে।

রূপকথার জনক হান্স আন্ডারসনের জন্ম শহর কোপেনহেগেন দেখা রঁদার চিত্রশালা দেখার মানসিক উত্তেজনা বুদ্ধদেব বসুর এ লেখাকে অনেক বেশি সজীবতা দান করেছে। এগুলোর মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের যে অন্তর্গত দ্যুতি রয়েছে, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তা উপলব্ধি করা যায়। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভাষার মোহনীয় কারুকাজ, তীক্ষ্ণ বোধের বিচক্ষণ বিশ্লেষণ আমাদের নতুন দিগন্তে উপনীত করে। তাঁর এই উস্‌বক দেয়া গদ্য দীক্ষিত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য বাসনা রঞ্জিত হৃদয়ের কথা। যা ভিন্ন ভূগোলের অচেনা দিগন্তকে স্তরে স্তরে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে।

বুদ্ধদেব বসুর স্বভাব ছিলো নিভৃতে গৃহকোণে অভ্যস্ত আরামের মধ্যে বসবাস করা। ঘরে যতক্ষণ থাকতেন, পাঠ কিংবা লেখায় মগ্ন থাকতেন। আড্ডা দিতে তিনি খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু সেটা অন্য কোথাও নয়, নিজে গৃহেই। 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ সূত্রে তাঁর রাসবিহারী এভিনিউ বাসভবনটি হয়ে উঠেছিল সমকালীন কবি–সাহিত্যিকদের প্রধান আড্ডার কেন্দ্র। কিন্ত্র যখনই তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দেশের ভেতরে কিংবা বিদেশে, তখন তাঁর সুদূরের পিয়াসীমন সত্যিকার পরিব্রাজকের মতোই পরিপার্শ্বকে অবলোকন করেছেন। ভ্রমণকালে পারিপার্শ্বিকের দৃশ্য ও জনজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে ধারণ করেছেন, তাকে লিখেছেন এক মোহনীয় গদ্য ভাষায়। যাতে একই সঙ্গে সৃজনশীলতা ও মননশীলতা সমন্বয় ঘটেছে। বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনী লেখার সূচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু সেই ভ্রমণসাহিত্যকে একটা সম্পন্নতা দান করেছেন।

বাঙালির আধুনিক সাহিত্যরুচির অন্যতম রূপকার বুদ্ধদেব বসু : কিছু প্রশ্ন

ইকবাল আজিজ

সৃজনশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় অনেকেই নিজ জীবনকে সমর্পণ করেন। নানা দেশে নানা ভাষার সাহিত্যে জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হওয়ার নজির নিতান্তই কম নয়; খুব গৌরব করে এদের বলা হয় 'শিল্পের শহীদ'। কিন্তু সাহিত্যে দায়িত্বশীল 'সামাজিক ভূমিকা' পালনকারী অতিশয় প্রতিভাবান শিল্পীর সাক্ষৎ লাভ পৃথিবীর সব ভাষার সাহিত্যেই একটি বিরল ঘটনা। শেক্সপিয়র, দস্তয়ভস্কি, রবীন্দ্রনাথ, বোদলেয়ার, নজরুল কিংবা জীবনানন্দ ছিলেন পুরোপুরি সৃষ্টিসুখের উল্লাস ও বেদনায় কেঁপে ওঠা ভীষণ নিঃস্ব পথের অভিযাত্রী। পৃথিবীর প্রায় সব সফল শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবনই এমন। কিন্তু ফ্লবেয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, টি এস এলিয়ট কিংবা বুদ্ধদেব বসুর মতো সাহিত্যিক পৃথিবীতে খুব সামান্যই আছেন যারা নিজ সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি একটি সময়ের কিংবা একটি যুগের গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যরুচিকে নির্মাণ করেন এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে আলোকিত ও সুসমৃদ্ধ করে তোলেন নিজস্ব চেতনার আলোকে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বুদ্ধদেব বসুর মতো এমন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিককে আমরা বাংলা সাহিত্যের তিরিশের দশকে লাভ করেছিলাম, যিনি নিজের ব্যক্তিগত সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি একটি আলোকিত সাহিত্যিক সমাজ গড়ে তুলেছেন এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সর্বাধুনিক সাহিত্যরুচি নির্মাণ করেছেন। বাস্তবিকই বাঙালির আধুনিক সাহিত্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব এতই ক্ষমতাশালী ও সুদূরপ্রসারী যে, কখনও কখনও মনে হয় একবিংশ শতকের সূচনায় বুদ্ধদেবীয় চোখ দিয়েই যেন আমরা এ নিখিল বিশ্বের প্রানীজগতের সকল লীলা অবলোকন করে চলেছি। তারই নেতৃত্বে রবীন্দ্র প্রভাবিত গীতিধর্মী, রোমান্টিক ও ভক্তিবাদী সাহিত্য থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের কাল শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই বুদ্ধদেবকে আধুনিক বাঙালির আধুনিক সাহিত্য যাত্রার প্রধান সারথী বলে মনে করেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বুদ্ধদেবের সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যরুচির প্রতি আমাদের ভক্তি ও সশ্রদ্ধ আনুগত্য আগের মতো আছে কি? ইতোঃপূর্বে আমরা ষাট দশক পর্যন্ত দেখেছি, বঙ্গদেশের সাহিত্যে বুদ্ধদেবীয় মত ও বোধের জয় জয়কার। একবিংশ শতকের প্রথম দশকেও সেই প্রভাব অস্তমিত হয় নি; তবে কিছুটা ম্লান হয়েছে এবং সেই সুযোগে কিছু প্রশ্নের অবতারণারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই আমরা কবি ও মানুষ বুদ্ধদেবের আধুনিকতার পটভূমি বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি। বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রজীবন একটি বিচিত্র ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বোধে এই বহুমুখী প্রতিভাবান সাহিত্যিককে আচ্ছন্ন করেছিল। তখন সারা দেশে বৃটিশ শাসন চলছে, ফরাসী সাহিত্যের প্রতীবাদী আন্দোলনের অনুসরণে ইংরেজি সাহিত্যে ইয়েটস, এলিয়ট ও এজরা পাউন্ড এক

অভিনব পরিবর্তন ও সংস্কারের সূচনা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য উপনিবেশ ভারতের পূবাষলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। প্রায় একই সময়ে তিনটি সাহিত্য পত্রিকা 'প্রগতি', 'কল্লোল' ও 'কালি কলম' আধুনিকতার প্রায় একই বোধ ও আদর্শ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে হাজির হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং 'প্রগতি' সম্পাদনা করতেন, 'কল্লোল' পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন তিনি, এছাড়া 'কালি কলম'-এর সাহিত্য আন্দোলনের সাথেও তিনি ছিলেন গভীরভাবে একাত্ম।

বুদ্ধদেব তাঁর আধুনিকতার বোধ দিয়ে চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বেশিরভাগ বাঙালি সাহিত্যিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। এক্ষেত্রে তার অনেক 'ভুল প্রচারণাও' পরবর্তী তিন দশকের কবি ও সাহিত্যিকদের বোধ ও রুচিকে প্রভাবিত করেছে। কবি ও কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষন করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এখন এসব লেখা পড়ে কেবলমাত্র স্তুতি, মুগ্ধতা ও বিস্ময় ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যর্থতা, ভুল ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে কিছুই অবগত হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সব মত কি গ্রহণযোগ্য?

বুদ্ধদেব বসু তার 'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শেলী কিটস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থেও প্রভাব আছে। একথা ভুললে চলবে না, রবীন্দ্রনাথকে তার তরুণ বয়সে বাংলা সাহিত্যেও শেলী বলা হতো। জানি না সাহিত্যেও মননশীল ও আধুনিক বিবেচনায়, বাঙালি কবির জন্যে এই উপাধি যথার্থই প্রশংসার ছিল কিনা। কারণ যুবক রবীন্দ্রনাথ তার সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয় সেবা কবিদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যদি বিগর্ত যুগের কোনো রোমান্টিক সাহিত্যিক দ্বারা প্রভাবিত হন, তবে আমরা নিঃসন্দেহে তাকে কিছুটা পিছিয়ে পড়া এবং সেকেলে ধরনের সাহিত্যবোধের অধিকারী লেকক হিসেবে অভিকি করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে তার সমকালীন বোদলেয়ার ভেয়লেন মালামে বা ইয়েটস দ্বারা তেমন প্রভাবিত ও প্রণোদিত হননি। এত হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ যুবক বয়সে বিশ্বসাহিত্যে তার সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনা তেমন পড়ার সুযোগ পাননি।

বিশ শতকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমবয়সী ও আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের প্রধান পুরুষ ডাবলু বি ইয়েটস-এর সাথে পরিচিত হন। এরপর লন্ডনে তাঁর ইয়েটস-এর সাথে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত ১৯১১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন ইয়েটস সম্পর্কে। এই প্রবন্ধে তিনি এই মহান আইরিশ কবির কবিতা ও কবিব্যক্তিরত্ব বিষয়ে কিছু ইতিবাচক প্রশংসার বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু কোনো অন্ধ রবীন্দ্রভক্তও বলতে পারবেন না, রবীন্দ্রনাথ কখনও ইয়েটস-এর কাব্য দ্বারা এতটুকু অনুপ্রানিত হয়েছেন। কার্ল বাদলেয়ার-এর 'ফ্লুখ দ্য মল' বা ক্লেদদ কুসুম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের চার বছর আগে ১৮৫৭ সালের। পরবর্তীকালে তা ইংরেজিসহ আরও কয়েকটি ভাষার অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু সমকালীন ইউরোপীয় আধুনিকতার সাথে তরুণ রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাকে নিঃসন্দেহে কবির একটি বড় ব্যর্থতা হিসেবে শনাক্ত করা যায়। বুদ্ধদেব বসু কখনও রবীন্দ্রকাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকের এই 'অনাধুনিক বাস্তবতা' বিষয়ে আলোকপাত করেন নি। বরং তিনি বহু পূর্বের জার্মান কবি গ্যোটের পাশাপাশি বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে একজন 'উদার মানবতাবাদী বিশ্বকবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অসুন্দর ও কুৎসিত বাস্তবতাকে তাঁর সাহিত্যে সর্বদা এড়িয়ে

গেছেন। তিনি রোমান্টিক যুগে ইংরেজ কবি কিটসের 'সত্যই সুন্দর, সুন্দর সত্য' (Truth is beauty, beauty truth) এই বাণীতে বিশ্বাস করে সাহিত্যের শিল্পবোধকে পরিপূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই 'জীবনবিমুখ ও মহাশূন্যেচারণা' বিষয়ে আলোচনা না করে বুদ্ধদেব তার পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের বাঙালি সাহিত্যিক ও পাঠককে দীর্ঘকাল বিভ্রান্তির অন্ধকূপে নিমজ্জিত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কিংবা বুদ্ধদেবের সাহিত্য সমালোচনার এ এক স্মরণীয় ব্যর্থতা।

তিরিশের সুধীন্দ্রনাথ ও বি দে যেমন নজরুলকে তাদের আলোচনার বাইরে রেখেছেন, বুদ্ধদেব বসু তেমনটি নন। বরং কিশোরবয়সে নোয়াখালিতে অবস্থানের সময় থেকে নজরুলের কবিতা তাঁর ভালো লেগেছিল। বুদ্ধদেব তাঁর 'বিদ্রোহী' ও অন্যান্য কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের কাছে নজরুলকে মনে হয়েছে 'উচ্চকণ্ঠ', মনে হয়েছে 'চিরকিশোর'। কবির বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মতো মহৎ বিষয়টি তাঁর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। নজরুলের মতো 'প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, উশৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের মধ্যে' বুদ্ধদেব বসু কখনো দেখেন নি। তিনি নজরুলের অদম্য স্বতঃস্ফূর্তিকে প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ বলে অতিহিত করেছেন। নজরুল বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, 'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তি জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হল না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তার কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না।' বুদ্ধদেবের এমন উক্তি চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট এমনকি তারও পরবর্তী দশকের কিছু কিছু কবিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। এরা বুদ্ধদেবের অনুসরণে নজরুলকে একজন আবেগপ্রবণ ও অপরিণত স্বভাবের উচ্চকণ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিদের মধ্যে নজরুল সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল খুব কম কবিরই সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা অনেকেই নজরুলকে 'অপরিশীলিত' সাহিত্যিক বলে মনে করেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি যখন বিদ্রোহী কবির মৃত্যু হয়, তখন আমি ঢাকায়। সে সময় একটি সাহিত্যের আড্ডায় দেখেছি, বাংলাদেশের একজন ষাট দশকের বিখ্যাত কবি বলছেন। নজরুলের একটি কবিতাও আমাদের কোনোদিন উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং কিছু গানই তার ভালো, ঠিক যেমনটি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন।' এখনও ষাট দশকের সেদিনের সেই তরুণ কবির দম্ভ ও স্বীকারোক্তির কথা আমার মনে পড়ে। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল। পরবর্তী দশকের কবিদের উপর বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের কী বিস্ময়কর প্রভাব, যাই হোক, বাংলাদেশে রফিকুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের নজরুলের পক্ষে নিরন্তর লেখা ও যথাযথ প্রচারণার কারণে নজরুল সাহিত্য বিষয়ে এখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে অশ্রদ্ধা অনেকখানি দূর হয়েছে।

অন্য একটি বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাছে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ঋনী; আর তা হলো, তিনিই নিভৃতচারী ও নির্জনতম জীবনানন্দ-র কবিতাকে সাধারণ পাঠকসমাজে পরিচিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯২৭ সালে ঢাকায় 'প্রগতি' পত্রিকার সূচনালগ্ন থেকে বুদ্ধদেব এ কাজটি করে এসেছেন অতিশয় নিষ্ঠার সাথে। একজন সমকালীন লেখকের যথাযথ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সৃজনশীল লেখক ও সম্পাদকের এমন আত্মত্যাগের ঘটনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। ভাবতে অবাক লাগে, বিশের দশকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্র-নজরুলের প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্যের যুগে যখন আর কোনো কবির পক্ষে নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না;

তখন বুদ্ধদেব নিজে উদ্যোগী হয়ে 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দর পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। পরবর্তীকালে যখন কোলকতা থেকে বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তা এক সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালির কাব্যবিকাশ ও কাব্যরুচিকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করে; তখনও জীবনানন্দ তাঁর আত্মবিকাশের সবচেয়ে বড় আশ্রয় লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেবের কাছে। 'বনলতা সেন' কবিতাটি যে তার মূল প্রেরণা এডগার এলেন পো-র 'টু হোলেন' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর –এ কথা বুদ্ধদেব তার লেখায় খুব জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন। নিজের সমকালীন একজন বাঙালি কবির কবিতা বিশ্বসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিকের একটি কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলার ঔদার্য যার আছে, তাকে অবশ্যই একজন বিস্ময়কর সাহিত্যসাধক ও সাহিত্যসংগঠক আখ্যা দেওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক কবিতার জনক শার্ল বোদলেয়ার সারাজীবন এডগার এলান পো-কে তার আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এলান পের কবিতা অনুবাদও করেছিলেন ফরাসি ভাষায়। সুতরাং এলান পেয়ে বিশ্বসাহিত্যে এক অতি-মর্যাদাবান কবি ও গদ্যকার –এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই; আর এই মার্কিন কিংবদন্তীর একটি কবিতার চেষ্টা জীবনান্দর কবিতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অবিহিত করে বুদ্ধদেব নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের মতো আমরাও প্রথম তারুণ্যে বুদ্ধদেবের এই সাহিত্যের 'ফতোয়া' বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন মেলাতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি 'বনলতা সেন' কবিতাটি কিছুতেই 'To Helen' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। অথচ বুদ্ধদেবীয় প্রচারণা আমার মতো অনেককেই হয়তো দীর্ঘদিন বিভ্রান্ত করে রেখেছিল।

বুদ্ধদেব তার জীবনের একটি দীর্ঘসময় শুধুমাত্র জীবনানন্দ-বন্দনাতেই নিমগ্ন থাকেন নি তিনি তার সমকালীন সম্পূর্ণ ভিন্ন-মাত্রার ও ভিন্নস্বার্থের কবি সুধীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিলেন অতি উচ্চস্থান। কবিতায় জ্ঞান, দর্শন, মননশীলতা ও শৃঙ্খলা যার প্রধান অবলম্বন, সেই সুধীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য ও বুদ্ধিবাদী কবিতার পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এদিকে সুধীন্দ্রনাথ কখনোই জীবনানন্দকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে মনে করেন নি। আমার ধারণা, বিষ্ণু দেও জীবনানন্দর কবিতাকে তেমন পছন্দ করেন নি।

অপরদিকে নানা ধরনের মত ও পথের কবির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জুড়ি বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যে কেউ নেই। কিন্তু তার কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের বিচলিত করে। যেমন নজরুলের *অগ্নি-বীণা* ও *বিষের বাঁশি* কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহের মানবতাবাদী দর্শন ও কাব্যসাফল্যকে অনুধাবন করতে বুদ্ধদেব বসু ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ বুদ্ধদেব পশ্চিম ইউরোপীয় অ্যাংলো স্যাক্সন আধুনিকতার দৃষ্টি দিয়ে নজরুলের উদার ইসলামী বিপ্লবী ও মানবতাবাদী কাব্যের দিকে তাকিয়েছেন ও তার কালজয়ী উৎকর্ষকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার ধারণা 'খেয়াপারের তরণী' কিংবা 'কামাল পাশা' কবিতার শ্রষ্টা যে বিশ্বকবিতার প্রধান কবিদের সমতুল্য, তা বুদ্ধদেব ও বুদ্ধদেবের অনুসারী 'সমালোচক অধ্যাপকদের' বুঝতে অনেক সময় লাগবে। একবিংশ শতকে নতুন প্রতভাবান বাঙালি সাহিত্যিকগণ তাদের গবেষণা ও পূনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে নজরুলকে হয়তো নতুনভাবে শনাক্ত করবেন এবং তাকে যথার্থ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে বরণ করে নেবেন। তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের মতো দায়িত্বশীল কবি ও সমালোচকের বিভ্রান্তিকর ভূমিকাটি আমার জন্য বেদনাদায়ক।

জসীমউদ্দীনের প্রতি বুদ্ধদেব বসু এক ধরনের নিস্পৃহ আচরণ করেছেন। অথচ ভাবতে বিস্ময় লাগে এবং অনেকেই হয়তো জানে না যে, জসীমউদ্দীনের কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব মুগ্ধও হয়েছিলেন এবং একদা ‘কল্লোল’ পত্রিকায় পল্লীকবির ‘কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মতো’ পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করে ‘কাল’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু পরে হয়তো তিনি বাবু সংস্কৃতির ধারক কোলকাতা নগরীর ‘তিরিশ দশকীয় আধুনিকতার’ দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়ে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যকে আলোচনার অযোগ্য বলে মনে করেছেন এবং বাস্তবিকই তিনি জসীমউদ্‌দীন বিষয়ে কোথাও এতটুকু আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। হয়তো কবিতায় ‘গ্রামজীবনকে লোকজ ঢঙে’ তুলে ধরা তার কাছে আধুনিক বলে মনে হয় নি। এছাড়া বুদ্ধদেব তার সম্পাদিত ‘আধুনিক কবিতা’য় নজরুল ও জসীমউদ্দনের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক কবিতা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। এটাও বুদ্ধদেবের চেতনার এক ধরনের সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা বলে আমরা মনে করতে পারি। এবং বুদ্ধদেবীয় এই সাহিত্যরুচি উভয় বঙ্গেই পরবর্তী চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট দশকীয় কবিদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং তাদের অনেকের কাছে বুদ্ধদেবীয় প্রবন্ধের বাণী ‘বেদবাক্য’ বলে বিবেচিত হয়েছে। কোলকাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কৃত্তিবাস’ এবং ঢাকায় সিকান্‌দার আবু জাফর সম্পাদিত ‘সমকাল’ ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত ‘কণ্ঠস্বর’ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যদর্শ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত ছিল।

চলচ্চিত্র বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর অনেক মন্তব্যই হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর। তিনি ছায়াছবিকে ‘শিল্পচর্চার অস্থায়ী মাধ্যম’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার এই মতামতকে নিদারুণ ভুল ও অনাধুনিক বলে চিহ্নিত করতে চাই। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ছায়াছবি বিষয়ে বুদ্ধদেবের এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পঞ্চাশ ও ষাট দশকে উভয়বঙ্গে অনেক কবি সাহিত্যিক প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সারাবিশ্বে অতিশয় নির্ভরযোগ্য ‘আর্কাইভ ব্যবস্থা’ গড়ে ওঠায় এখন আর কেউই চলচ্চিত্রকে একটি ‘ক্ষণস্থায়ী শিল্পমাধ্যম’ হিসেবে ভাবতে রাজী নন। এখন যে কেউ নিজ ঘরে বসে টেলিভিশনে প্রায় ৯০ বছর আগে নির্মিত চ্যাপলিনের ‘সিটিলাইট’ কিংবা জার্মান চলচ্চিত্রকার ফ্রিজ ল্যাং-এর ‘মেট্রোপলিস’ উপভোগ করতে পারেন এবং ছায়াছবির কালজয়ী শিল্পচেতনায় নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারেন। বুদ্ধদেব ও তার অনুসারী সাহিত্যিকদের ‘সিনেমা’ বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে আমার কাছে অনাধুনিক, অশিক্ষিত, গ্রাম্য ও রক্ষণাশীল বলে মনে হয়।

আমাদের কবিতাভবন’ গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বীকার করেছেন তার নিজে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য প্রকাশের অবাধ মাধ্যমে ছিল ‘কবিতা’ পত্রিকা ও তার প্রথম দশটি বছর। বাস্তবিকই ‘বুদ্ধদেবসহ’ তিরিশের যে পাঁচ কবির একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল তা এখন পর্যন্ত কবিতার পাঠকের কাছে সগৌরবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এই ‘পাঁচকবির’ ইমেজ বা ভাবমূর্তি নির্মাতা স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু। এক্ষেত্রে তার ঢাকা জীবনের ‘প্রগতি পর্বের’ সবচেয়ে পুরানো বন্ধু অজিত দত্ত বা টুনুকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং নজরুল— পরবর্তী বাংলা কবিতার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তার এই তিরিশ দশকীয় ‘পাঁচ কবির’ চক্রে ঢুকতে দেন নি। অথচ অর্জিত দত্ত তখনও ছিলেন বুদ্ধদেবের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী; ‘কবিতা’ পত্রিকার কার্যালয় ও বুদ্ধদেবের আবাসস্থল ২০২ রাসবিহারী এভিনিউর ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রথম পর্যায়ে

'কবিতা' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এ দুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় এতটুকু এগিয়ে আসেন নি। কন্যা মীনাক্ষী দত্তের লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি, ঢাকা থেকে কোলকাতায় যাওয়ার পর একই ভবনের দোতলা ও তেতলায় অবস্থানকারী দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে কোনো বন্ধুত্বই আর অবশিষ্ট ছিল না। অথচ দুটি পরিবারের গৃহকর্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মধ্যে অতি নিবিড় সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।

বুদ্ধদেব কি পরিকল্পিতভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিত দত্তকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন ? এক সময় এ নিয়ে আমার মনে কিছুটা সন্দেহ থাকলেও এখন নেই। আমার মনে হয় না, এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা কার্যকর ছিল। বুদ্ধদেব বসু মূলত তার সাহিত্যবোধ দ্বারাই নিজেকে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এক্ষেত্রে বন্ধু বা শত্রু বড় কথা নয়। হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অর্জিত দত্তের কবিতাকে বুদ্ধদেবের কাছে তিরিশের অন্য বিখ্যাত 'চার কবির' সমতুল্য মনে হয় নি শৈল্পিক উৎকর্ষের বিচারে। এ কারণেই তিনি তাদের কবিতার আলোচনা করেন নি। অপরদিকে নিরীহ, অসামাজিক, বন্ধুহীন জীবনানন্দর কবিতার প্রতিষ্ঠায় তিনি যে আত্মত্যাগ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় উপখ্যান।

একটি বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্য বুদ্ধদেবের কাছে গভীরভাবে ঋণী। আর তা হলো, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের সেরা কবিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শহীদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক, ওমর আলী প্রমুখ কবির 'কবিতা' পত্রিকায় নিজেদের কবিতা নিয়মিত- অনিয়মিতভাবে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকায় একশ্রেণীর কবি অধিক সংখ্যায় আরবি ফারসি শব্দ মিশিয়ে এক ধরনের 'পাকিস্তানী সাহিত্য' তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে শামসুর রাহমান তার বিখ্যাত কবিতা 'রুপালি স্নান' ঢাকার কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন, পত্রিকার সম্পাদক বলেছিলেন, কবিতার কিছু শব্দ বদলাতে হবে। শামসুর রাহমান কবিতাটি পাঠিয়ে দেন কোলকাতায় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। কবিতাটি সেখানে সসম্মানে প্রকাশিত হয়। তারপর ঢাকা ও কোলকাতায় একই সাথে শুরু হয় শামসুর রাহমানের অগ্রযাত্রা। এভাবেই রবীন্দ্র, নজরুল ও জীবনানন্দ— পরবর্তী প্রধান কবি শামসুর রহমানের প্রাথমিক আত্মবিকাশ শুরু হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর পৃষ্ঠপোষকতায় 'কবিতা' পত্রিকায়। বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের আধুনিক কবিরা একটি আধুনিক, উদার ও পরিশুদ্ধ কাব্যরুচি অর্জন করেছিলেন বুদ্ধদেবের মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসুই বাঙালির আধুনিক সাহিত্যরুচির প্রধান নির্মাতা। যদিও তার বেশ কিছু সাহিত্যবোধ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। সাহিত্যে গনতান্ত্রিক আলোচনায় কোনো কিছুই প্রশ্নের উর্ধ্বে না। তাই বুদ্ধদেব বসু বিষয়ক ইতিবাচক আলোচনার পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন ও সামালোচনাও এখানে উপস্থাপিত হলো।

উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

এজাজ ইউসুফী

প্রান্তস্থ মানুষের আত্ম-পরিচয়ের অধিকার ফিরে পাবার ভিত্তি রচনার জন্য বাংলাদেশে বিগত শতকের শেষের দশকে উত্তর আধুনিকতার চর্চা শুরু হয়। আমরা মনে করি উত্তর আধুনিকতা অনড় কিংবা জড় রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়। ফলে উত্তর আধুনিকতার রাজনৈতিক পরিসরটি যেমন বিস্তৃত–তেমনি এর নান্দনিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিও উর্বর ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে। ইউরো-আমেরিকান সাংস্কৃতিক হেজিমনিকে (Hegemony) চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজস্ব ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দুয়ার উন্মোচন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাধিকারতান্ত্রিক অবকাঠামোকে ভেঙে চিরস্থায়ী একটি সমৃদ্ধ অবকাঠামো তৈরিই আমাদের প্রত্যাশা।

উপর্যুক্ত কথাগুলো বলা সহজ কিন্তু এর করণীয় নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন কাজ। আধিপত্যবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদের স্থানচ্যুতি ঘটানো পৃথিবীর সবচেয়ে দুরূহতম কাজগুলোর একটি তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ তাঁর 'উত্তর আধুনিকতাবাদ ও মার্কসবাদ' লেখায় স্বীকার করেছেন, চিরায়ত পুঁজিবাদ ও চিরায়ত মার্কসবাদ দুটোই নবযুগের তরুণদের নৈকট্য পেতে ব্যর্থ। কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ওপর কাঠামোগত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং আজকের নবপ্রজন্ম একটি কাঠামোকে জানার আগেই বদলে যাচ্ছে তার চেহারা কিংবা ধরন-ধারণ, চিরায়ত কোনো কিছুর ওপরই আস্থা রাখা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, রেনেসাঁ-বিশ্ব যেসব META-NARRATIVE বা 'বৃহৎবাণী' তৈরি করেছিল যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবতা, যুক্তি ইত্যাদি আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অচল মুদ্রা বৈ কিছু নয়। কারণ, ক্ষমতা যার হাতে যুক্তি তার পক্ষে।

পশ্চিমা বিশ্বের হাতেই আজ জ্ঞান (N) এবং ক্ষমতা (P) দুটিই কুক্ষিগত। তাই বাকি বিশ্বকে শাসন করবার সুদর্শনচক্র তারা পেয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে তারা তাদের অদলে অবকাঠামো প্রস্তুত করেছে। ফলে, প্রতিটি দেশের বড় বড় অধ্যাপক-অর্থনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সমাজ বিশ্লেষকগণ তাদের বন্দনাগীতি গেয়েই চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের হেজিমনি মেনে নিয়ে আমাদের সর্বক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছে। তারা আমাদের ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির বাচ্চা দেয়–ডিম দেয় না। আজকে আমাদের বীজতলাও কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমাদের ভূ-প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের লোভে তারা শকুনের মতো ঠাণ্ডা মাথায় রক্তপাত ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের পথকে সহজ করে দিচ্ছে ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী জঙ্গী রগকাটা গোষ্ঠী। যারা টুপি, পৈতা আর ক্রস চিহ্ন নিয়ে ধর্মীয় বিভক্তি সৃষ্টি করে পশ্চিমাদের ইরাকে, নাইজেরিয়ায়, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি গড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে, হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের দেশ-কাল-ঐতিহ্য। আমাদের চির

লড়াকু ভূমিকাটুকু আজ এনজিও কিংবা ফড়িয়া দালালচক্রের হাতে পড়ে বিনষ্ট হতে বসেছে। এই ক্রান্তিকালে বিনির্মাণ প্রয়োজন।

পশ্চিমাদের সঙ্গে ক্ষমতা (P) এর ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে পাল্লা দেবার শক্তি-সামর্থ্য কারো নেই। আজ আইটি'র যুগে 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'–অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রটি ঐতিহাসিক কারণেই উন্মুক্ত করতে তারা বাধ্য হয়েছে। এবং সেখানেই তাদের বিরোধিতার বীজও রোপিত হয়েছে। আমরা এই জ্ঞান (N) কাণ্ডকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। পৃথিবীর ও সভ্যতার সঞ্চিত এতদিনকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ প্রবেশে তেমন বাধা নেই। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বিনা যুদ্ধে তাদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারি। আজকে প্রাচ্যের অনেক দার্শনিক-তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ পাশ্চাত্যে বসেই উত্তর উপনিবেশিক যুগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের মানবিক লেন্সেই ধরা পড়ছে উপনিবেশিত দেশগুলোর সত্যিকার করুণ চিত্র। তারাই আমাদের-ঐতিহ্যের ভিত্তিটুকুকে নতুন ঠিকানায় স্থাপন করতে পেরেছেন।

বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতের এই ঐতিহাসিক রূপান্তর এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নতুন নতুন সাংস্কৃতিক কাঠামো বিন্যাস আধুনিকতার প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করেছে। আধুনিকতা যে মানবিকতা ও যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানবমুক্তির পরমগাথা তৈরি করেছিল আজ তা অচল মুদ্রায় পর্যবসিত হয়েছে। তার রাজনৈতিক-সামাজিক-প্রাযুক্তিক-বৈজ্ঞানিক কোন উন্নয়নই বৃহৎ বিশ্বের অগুনতি মানুষের জীবনে কোন ফলপ্রসূ বার্তা বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার বিচ্ছিন্নতা আজ শিখরস্পর্শী। ফলে, বিপ্রতীপ কিন্তু সদর্থক চেতনা বাকি বিশ্বের মানুষের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আমরাও এই গঠন প্রবণতাকে আত্মায় উপলব্ধি করছি–এবং তাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছি। প্রদীপন দাশগুপ্তের মতে এই মুহূর্ত–"উত্তর আধুনিক মনন জগতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে যে রাজনৈতিক বীক্ষা, তার নাম 'আইডেনটিটি পলিটিকস' বা বিশেষ পরিচয়বাহী রাজনীতি। এই চিন্তাধারা অনেক বেশি কল্যাণকামী, মানবিক ও সদর্থক। স্থানিক ও সার্বিক উভয় পরিসরে সামাজিক আন্দোলন ও জোটবদ্ধতার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অস্তিত্বের অনুসন্ধান এবং সামগ্রিকভাবে তাকে বৃহত্তর প্রেক্ষায় প্রতিস্থাপন করা এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।" সুতরাং বাঙালির বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক মননে যে জাগরণ তৈরি হতে চলছে তাকে কোনো অস্ত্র কিংবা ক্ষমতার (P) শক্তিতে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কারণ, ভারতীয় হাজার বছরের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোটি বহুত্বকে ধারণ করে এখনো টিকে আছে সদর্পে। ভারত বর্ষের এই মহাস্বরূপকে আজকে বুঝবার এবং অন্যকে বোঝাবার প্রত্যয় তৈরি হয়েছে। উত্তর আধুনিককালের মানুষ বুঝে গেছে বাকি বিশ্বের মানুষের ওপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জোয়াল চালানোর জন্যই পশ্চিম শক্তিবর্গ কখনো গ্লোবালাইজেনশন তথা বৈশ্বিক গ্রামতত্ত্ব প্রচার করছে–কখনো বা গ্যাট, ন্যাফটা, ডব্লুটিও, সিটিবিটি করে আমাদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। এই বহুজাতিক ও বহুমাত্রিক সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতেই উত্তর আধুনিকতা জন্ম ও বিকাশ। কবিতায় প্রথমেই এই চেতনার বিনির্মাণ দেখতে পাই। এছাড়া অসংখ্য ঋদ্ধ গদ্যে–সংকল্পময় গল্পে কিংবা উত্তীর্ণ উপন্যাসে তাকে শনাক্ত করা যাবে অনায়াসেই। পশ্চিমবঙ্গের কবি অনুরাধা মহাপাত্র-এর একটি কবিতার স্মরণ নেয়া যাক–

"হে দরবেশ, একবিংশ শতকের আধুনিক হতে চেয়ে
হৃদয়কে চোখ ধার দিয়ে
আর নয় ...।
...   .
হে দরবেশ দোয়া এই–
আমাকে প্রাচীন করো, আনন্দিত করো।"

কিংবা–

আমিতো কলোনিয়াল ছেলে
নানাভাবে ফেঁসে গেছি মার্কসবাদের মৃত্তিকায়।
আগুন পোহানো লাল কীর্তি, দুখণ্ড পৃথিবী আর
স্থায়িত্বের প্রিয় শর্তে আদ্যপান্ত সামাজিক।
...   .
উত্তরণে সব ধারণা বদলে গেছে ক্রমাগত
নীলপথ রেখা বেয়ে।
শুরু হলো স্বপ্ন বপনের দিন, কলোনিয়াল ইন্টরনভিন।

(এজাজ ইউসুফী, বিনির্মাণ, স্বপ্নাদ্য মাদুলি)

২.

আজকে উত্তর আধুনিকতা বলতে সাধারণত সমসাময়িক এমন এক অভিজ্ঞানকে বোঝায় যা শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে কেবল নয়, সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এক সমৃদ্ধ অতীতকেও চিহ্নিত করে। উত্তর আধুনিকতা প্রচলিত সব জগদ্দল প্রথার বিরুদ্ধে একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। এতদিনকার ভাবোন্মত্ততা, সত্যাসত্য, ধড়িবাজ বিশ্বাস, কারণ, আইডেনটিটি, উদ্দেশ্য এবং সর্বোপরি মানবমুক্তির বিশাল সব তত্ত্বের প্রতিও সে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। ইতিহাসও আজ পুনর্বিবেচনার মুখোমুখি। পুঁজিবাদী রসায়নে সৃষ্ট আধুনিকতাকে কাটা চিহ্নের নিচে ফেলে আমাদের নিজ-অস্তিত্বের নতুন অভিসন্দর্ভ নির্মাণের প্রস্তুতি একে বলা চলে। পশ্চিমের জ্ঞানতত্ত্বের (EPISTEMOLOGY) বিপরীতে এটি আমাদের মননের-প্রজ্ঞার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টাও। তাছাড়া উপনিবেশিকতার শেকড়মূল আমাদের কত গভীরে প্রোথিত তাকে আজ ধনুর্ভঙ্গ পণ নিয়ে খনন করে দেখার সময়ও এসেছে বলে মনে করি। একে আমাদের জাতীয় সত্তা বিনির্মাণের রাজনীতিও বলা যাবে। রাজনীতি, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীবাদ, নিম্নবর্গীয় তথা দলিত শ্রেণীসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতার কার্যকারিতা প্রতিফলিত হতে পারে। উত্তর আধুনিকতা এদেশে বহুবিস্তারী অভিসন্দর্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্য কিন্তু একে সচেতন প্রয়াস বলা যেতে পারে। এর প্রভাব বাঙালি জাতির ওপর হবে সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-চিত্রকলার বিভিন্ন শাখায় এর চরিত্রলক্ষণ স্ফুটতর হতে শুরু করেছে। আধুনিকতার ধারণাটি আমাদের একরৈখিক এবং সৃজনমুখ বঞ্চিত, যন্ত্রপাতির দখলভুক্ত এবং একধরনের অবসাদগ্রস্ত চৈতন্যের নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিল এতদিন। বেহুদা নগ্নতা, অসংকল্প চিৎকার, বিকৃত যৌনতা, নির্বস্তুক নেতির প্রণোদনায় এক ভিন্ন বৈপরীত্যে আমরা নিজেদের

নিক্ষেপ করেছি। অন্যদিকে, নারী ও প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত করে চলেছি চরমভাবে ধর্ষণ। ঔচিত্যবোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির আয়োজনও চলছে সরবে-নীরবে। অশিষ্ট রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ধূম্রজালে মজ্জমান বাঙালি জীবনে এতটুকু আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কোথাও লক্ষণীয় নয়। বরঞ্চ সাম্যবাদের স্বপ্ন গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকায় তিরোহিত হবার পর ইতর ও দূষিত সংস্কৃতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছেই।

ঠিক এমনি এক নষ্ট-কালখণ্ডে উত্তর আধুনিকতা আমাদের লুপ্তপ্রায় প্রত্ন-স্মৃতিসমূহকে নতুন সংবীক্ষণে যশস্বিনী করতে চায়। কারণ, আধুনিকতার সার্বিক বিপন্নতার বিপ্রতীপে এ আমাদের এক সুখকর কালখণ্ড নির্মাণের প্রয়াস বৈ কিছু নয়। গোটা বিশ্বেও আজ আধুনিকতার অচলায়তন ও প্রাচীনের গণ্ডি ভেঙে ফেলার ডাক এসেছে পোস্টমডার্নিজম-এর তত্ত্বে। প্রতিদিনই শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং সমাজ-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হচ্ছে এর নব্য-সদর্থক চেহারা। আমরাও এর সঙ্গে সমমাত্রিক ও বিপরীত অভিঘাতে সম্মুখবর্তী।

৩.

বাংলা কবিতা উত্তর আধুনিকতার চরিত্রলক্ষণগুলো ভালভাবেই রপ্ত করতে পেরেছে। বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী কবিদের মধ্যে বিষয়টি কূটাভাস (PARADOX) তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় একরৈখিক উন্মার্গিতা, বিচ্ছিন্নতা (ALIENATION), যৌনতা, পাশবিক তাড়না, বোদলেয়ারি সংক্ষোভ, রোমান্টিক ভাবাবেগ, মাৎসর্য, রিরংসা ইত্যাদির প্রণোদনাই ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে ছুঁৎমার্গিতা অর্থাৎ এক ধরনের বানানো ভাষায় কবিতা তৈরি হতো। যেখানে সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষের আবেগকে বোঝা যেতো না। লোকসংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ছিল তীব্রতর। সমাজ-বিচ্ছিন্ন, ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন এক ঐন্দ্রজালিক মোহে বাংলা কবিতা ছিল ভারাক্রান্ত এবং পর্যুদস্ত। এই পর্যাবৃত্ত (PERIODIC) অনুসারে চলে আসা কবিতায় আমাদের চারপাশের জীবনে বহমান সময় ছিল অনুপস্থিত। আমাদের লোকধর্মে যে মহান ধর্ম-সমন্বয়ের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল তা এদের কাছে একেবারেই অবহেলিত। ছন্দ বিষয়ে কৃপণতা এদেরকে মূলত তিনটি ছন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। বিদেশী মিথ-উপকথার প্রতি তাদের দুর্মর টান আমাদের প্রত্ন-স্মৃতিগুলোকে অবহেলা এবং অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত করে। সুস্থিত কোন চিন্তার প্রকাশের অভাবে বাংলা আধুনিক কবিতা পাঠকক্ষেত্র থেকে বহু বহু দূরে সরে যেতে থাকে। বিট এবং সেড কবিদের ভিড়ে গোশালা ভরে গিয়েছিল। স্বার্থপর গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা তাদের সমাজবিচ্ছিন্ন জীবে পরিণত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে বলা যায় ত্রিশোত্তর কবিরা পাশ্চাত্যসৃজিত মডার্ন হতে গিয়ে আমাদের কালখণ্ডকে, ভূমিজ মানুষদের ভুলতে বসে। এরকম এক বিপর্যয়কর সময়ে দুই বাংলার সচেতন কবিকুলের মধ্যে নতুন বোধের উন্মোচন ঘটা শুরু হয় বিগত শতকের শেষ দু'দশকে। খুলে যায় এক সিংহদুয়ার। উত্তর আধুনিক কবিরা তাদের কবিতায় ভূমিজ মাটি ও মানুষের প্রাণ স্পন্দনকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়। ভাষার ভাবুক দুয়ার উন্মোচিত হয়ে প্রাণাবেগে ঢুকে পড়ে জাগরী জলোচ্ছ্বাস। আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়ান তাকে নিজ দেশ কিংবা ভিনদেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বন্ধনটিকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে। ছন্দমুক্তি ঘটে–বিলুপ্ত প্রায় পয়ার কিংবা লাচাড়ি ছন্দেও রচিত হতে শুরু করে কবিতা। মিথ নতুনভাবে বিনির্মিত হয়। অন্যদিকে, আমাদের আউল-বাউল-ফকির-ফিকিরীদের সহজিয়া মানুষ ভজনার বিষয়টি

গুরুত্ব পায়। ‘সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে’–এই মন্ত্রই মূল বাণী হয়ে ওঠে–যাকে মিসেল ফুকো বলছেন ‘Simple Men’. একটি চাবি পঙ্ক্তিকে ঘিরে ফেনায়িত বাংলা কবিতা পুনরাবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে হয়ে ওঠে সংহত–সুসংগঠিত। বহুদিনের অবহেলিত আমাদের লৌকিকধর্ম আবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। শুধু বস্তু নয়, আধ্যাত্মিক ও মরমিয়া সুরও ধ্বনিত হতে শুরু করে এ সময়। ডি-কলোনাইজড কবিতার জাগরূক সত্তার জলাবর্তে তৈরি হয় একটি সৌম্য-শান্তির বাতাবরণ। দেশজ মানবিক সম্ভোগ–চেতনা থেকে যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবকিছু একাকার হয়ে এক সর্বমানবিক বোধের উন্মোচন ঘটায় উত্তর আধুনিক কবিতা। ত্রিশের পাণ্ডবদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বুদ্ধদেব বসু (বু.ব.) রচিত অবক্ষয়ী আধুনিক কবিতা দ্রৌপদীর আঁচল ধরে বিগত শতকের ৮০ দশক পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও এদের সকলের মিলিত ফসল হচ্ছে জীবনের প্রতি ‘না’। কিন্তু এরপর অর্থাৎ ৯০-এর দশক থেকে বাংলা কবিতায় সংহতির যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে তা কেবলই জীবনের প্রতি ‘হ্যাঁ’।

৪.

ত্রিশোত্তর কবিদের আধুনিকতার ঝাণ্ডাতলে সমবেত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁরই প্রচেষ্টায় পশ্চিমা আধুনিকতার ধরনটি বাংলা কবিতায় প্রবেশ করে এতে সন্দেহ নেই। পশ্চিম অনুরক্ত এই কবি পশ্চাত্য সাহিত্যের মননের অনুরণনটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তাকে লালন করে বাংলার মাটিতে প্রোথিত করতে সক্ষম হন বলেই বাংলা কবিতার হাজার বছরের ধারাক্রমটি বিঘ্নিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুই ইউরোপের অনুকরণে বাংলা কবিতার দেহে নেতিবাদিতার নীল স্রোত বহমান করেছিলেন। হাতাশা, নিঃসঙ্গতার বোধ, বিমূর্ত উন্মার্গিতা, বিচ্ছিন্নতা (ALIENATION), নারীর অবমাননা, পিশাচের চোখে নারী অবলোকন, জৈবিক তাড়না, লিবিডো, বোদলেয়ারীয় সংক্ষোভ পাচার করেছিলেন। বোদলেয়ার পঙ্ককে অর্থাৎ আধুনিক মানুষের রোগ সিফিলিসকে নিজ দেহে ধারণ করে যে কষ্টকর ও বেদনাদায়ক বোধে উপনীত হয়ে ‘লা ফ্ল্যর দুমাল’ তথা পঙ্কজ কুসুম ফুটিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ। কিন্তু বু.ব. পদ্মাসনে বসে পঙ্ককে অহেতুক নিজের অস্তিত্বে টেনে নিয়েছিলেন। যা বিষম–বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল বাংলা কবিতায়। তিনি সব্যসাচী লেখক হয়েও মিথ-পুরাণ এর নেতিবাচক ব্যবহার করে অভিশপ্ত আর ক্ষরণের ইস্তেহার রচনা করে গেছেন। কখনো দেহজ কামানার মাৎসর্যে, কখনো পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে যাত্রা করেছেন। মরণোন্মুখ মানুষ নয়, নিজেই মর্তুকাম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন। এই বোধ মরীচিকাসম বাংলা কবিতাকে গ্রাস করে। ঢাকা-কলকাতার আত্মিক উষ্ণতাকে পেছনে ঠেলে ইংল্যান্ড কিংবা ফরাসি ঠাণ্ডার হিম শীত বয়ে আনেন বারবার।

তাঁর ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’ কবিতায় ‘মৃত্যু’ এক বিভীষিকা রূপ ধারণ করে। এতে কালিক পরিভ্রমণ আছে। কিন্তু ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ–সবই অন্ধকার–সবই আঁধি। সুতরাং মৃত্যু ছাড়া গন্তব্য নেই–গত্যন্তর নেই। এটাই মানুষের চিরঅভিজ্ঞান যেন। শীতে দৈন্য বাড়ে–শূন্যতায় যেন পূর্ণ হয় মানুষের জীবন–এ জীবন অসুখের উৎসব। অসুরের মচ্ছব। মাতৃ-জঠরের মতো এই মৃত্যু গূঢ়-গহ্বর। প্রতিবাদ কিংবা একে প্রতিরোধ করা দায়, চিরকাল কেবল এতেই সমর্পণ।

বু.ব.-এর বিচ্ছিন্নতা যতটা নাগরিক নয়, ততটা শৈল্পিক ও আন্তরিক হয়তো। আমরা যাকে বিচ্ছিন্নতা বলি তা আধুনিক সভ্যতায় অর্থনৈতিক-দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এটা কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তেমন প্রকট নয়। কারণ, বিগত শতকের

ত্রিশোত্তরকালে কলকাতা ছিল ব্যাপক অর্থে সামন্ত মানসিকতার। ১৯৯৩ সালে কলকাতায় গিয়ে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, কলকাতার আবহ ও উপরিকাঠামো এখনও তার সামন্ত ব্রিটিশ ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। স্থাপত্যে, দালানকোঠার আবর্তে, রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিশালতায় সেই পুরোনো প্রত্ন-স্মৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। বু.ব.-এর সময় কলকাতায় বিচ্ছিন্নতা তেমন বাসা বাঁধেনি। তবে নাগরিকতার প্রকাশ দেখা দিচ্ছিল। ট্রেন/ট্রাম-এর প্রচলন, মোটরযান কিংবা ব্রিটিশ কেতাদুরস্ত বেশ-ভূষায় তার প্রকাশ ঘটছিল। কিন্তু তিনি বোদলেয়ারে বুজে থাকা মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কাছেই ফেঁসে গিয়েছিলেন। অথচ সেই তিনিই শিল্পী যামিনী রায়-এর কলকাতার সেই স্যাঁতসেঁতে প্রাচীন গন্ধবাহী অঞ্চলটিকে পছন্দ করতেন। অর্থাৎ তাঁর লেখার মাধ্যমেই কলকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের প্রতি তাঁর প্রযত্ন ভালবাসার কথা আমরা জানতে পারি। তবে, তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। বাস্তুচ্যুত একটি মন-মানসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল। পূর্ব বাংলার পরম-প্রকৃতি আর তার সহজ-সরল পরিবেশ এবং মানুষের ঐকান্তিক মমত্ববোধ, ভালবাসার আগ্রহ সেখানে অনেকটাই অচল ছিল। সে অর্থে তাঁর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ কিছুটা উপ্ত ছিল বলা যায়। নৈঃসঙ্গ্যবোধ তাঁর কবিতায় বানানো এবং ফেনানো কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে চর্বিত-চর্বণ একারণে মনে হয় যে, তিনি ঢাকায় ছিলেন পারিবারিক মমতায় এবং পরবর্তীকালে লেখিকা ও সুগায়িকা, নজরুল স্নেহধন্যা প্রতিভা সোম তথা রানুর উষ্ণ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন আজীবন। এটাই তাঁর স্বোপার্জিত বৈপরীত্য। তবে, এটাও মানতে হয় সংসার মাঝেও শিল্পীর তৈরি হতে পারে একটি বিবাগী মন। বৈরাগী সত্তা তাকে এক বিচ্ছিন্ন শৈল্পিক সত্তায় উত্তীর্ণ করতে পারে।

বেনিয়া সভ্যতার লুণ্ঠনজীবী বিদ্যুজিহ্বা কিন্তু তখনও বাণিজ্য সভ্যতার রক্তলোলুপ জন্তু হয়ে ওঠেনি। কর্পোরেট সংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদী অহংও সে হয়ে ওঠেনি। এরকম এক আধা-সামন্ত, আধা-পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রাগলগ্নে বুদ্ধদেব সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ কিংবা বিভীষিকার ঘা এখানে তেমন না লাগলেও তার আঁচ ঠিকই লেগেছিল। যুদ্ধের ডামাডোলে সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ত্রিশোত্তর এবং ত্রিশ-পরবর্তী বু.ব.-এর কবিতা লক্ষ করলেই এই পার্থক্য বোঝা যায়। রাবীন্দ্রিক কাব্যভাষা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বুদ্ধদেবসহ অন্যান্য আধুনিক কবিরা নিজেদের জন্য ভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে নিচ্ছিলেন। এসময় কবিতার স্বরায়নেও খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধ ও মন্বন্তরজনিত এবং ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি পার্থিব সংকট–আধুনিক কবিতার সংকটেও পরিণত হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ, বেকারত্ব, মারি-মড়ক এবং নীতিনৈতিকতার ব্যাপক ধস তাদের সামাল দিতে হয়েছে। ফলে পরিবর্তনের দ্রুততায় অনেকে শামিল হতে পারেন নি। অনেক সম্ভাবনাময় কবি সে কারণে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও দল-উপদলীয় কোন্দল কবিতার চারণভূমিতেও সমান অভিঘাত ফেলছিল। তাই সে সময়ের আধুনিক কবিরা এই কয়েক দশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যেমন শেষতক রবীন্দ্রনাথে গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন নি, তেমনি তরুণতর কবিরাও বুদ্ধদেব বসুতে ঠিকানা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। এটি বু.ব.-এর মানস জগতে একটি বড় বেদনাবহ ঘটনারূপে আবির্ভূত হয়েছিল। বাস্তুচ্যুত একটি কবি মানসে এটা নিঃসন্দেহে নেতিবাচকতার জন্ম দিয়েছিল। তিনি লিখছেন–

> "ঢাকা থেকে কলকাতা আসার পর একটা ভদ্রগোছের চাকুরির জন্য কত দীর্ঘ অপেক্ষা, শুধু দুবেলা আহার্য যোগাবার জন্য দু'হাতে গল্প-উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য, কবিতা তো সারাক্ষণের সঙ্গী।"
>
> (আমার যৌবন)

তারপরও বলা যায় বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) জন্মের সময়েই মাকে হারিয়ে এবং বাবার পরিব্রজ্যা গ্রহণের পরও বাঙালি মাতামহ-মাতামহীর অসীম ভালবাসা আর স্নেহের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি নিজেই লিখছেন–

> "চিন্তাহরণ ও স্বর্ণলতা–এঁরাই আমার বাল্যজীবনকে পরিবৃত করে রেখেছিলেন। বিশেষত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে আমি এমন এক ধরনের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, যার বুনোনটা খুব ঘন, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই– পিতাপুত্রের সম্বন্ধের চেয়ে অনেকটাই বড় তার আয়তন।"
>
> (আমার ছেলেবেলা)

বাল্যকালের এই স্নেহের বন্ধনই মানুষকে জীবনে বেপরোয়া হতে দেয় না সাধারণত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবেই পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছে খুব ক্ষুদ্র একজন মাত্র।

বাঙালির সামষ্টিক জীবনবোধে তাঁর শুরু থেকেই অনীহা ছিল। রোমান্টিক ইংরেজি কবিদের প্রভাবেই হয়তো নিজের ব্যক্তিসত্তা বড় করে দেখতেন। চারপাশে তখন কলকাতায় জীবনযুদ্ধের যে মিছিল চলছিল তা তাঁকে আড়ষ্ট করেছিল, এক ধরনের উচ্চমন্যতার কারণেই হোক কিংবা শুদ্ধাচারী ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই হোক তিনি গণমানুষের প্রাণস্পন্দনকে কখনোই স্পর্শ করতে চাননি। জীবনের তাগিদে ছুটতে থাকা কলকাতার কেরানিকুলের প্রতি ছিল তাঁর চরম বিতৃষ্ণা। দিনের আলো অস্তমিত হওয়ার পর এবং গ্যাসবাতিগুলো জ্বলে ওঠার ফাঁকটাকে তাঁর মনে হতো ধূসর এবং মৃত। প্রেত-আলো গিয়ে পড়ছে শহরের কঙ্কালের ওপর। আর এত লোকের গিজগিজ শহরে রোমান্টিক হবার অবকাশই বা কোথায়? তিনি লিখছেন–

> "সম্মিলিত মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন-খারাপ হয়ে যায়। অনেক লোক যেখানে একত্র হয়, সেখানে আমি সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে, মানুষের মধ্যে– অন্তত কোনো কোনো মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের সুষমা, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণে উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়, যেখানে একই উদ্দেশ্য– কি একই উদ্দেশ্যহীনতায় অনেকে জড়ো হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে; সব মিলিয়ে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি মানব-মাংসের স্তূপ, তা থেকে যেন উঠছে জীবনের তিক্ত গন্ধ, সম্মোহনের মতো তার ঝাঁঝ।"
>
> (ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ, হঠাৎ আলোর ঝলকানি)

তাহলে বুদ্ধদেব বসু কি আধুনিক মানুষের মনোরোগ নিউরোসিস (Neurosis), ম্যানিয়া (Mania) নাকি ম্যালানকলিয়ায় (Melancholia) আক্রান্ত হয়েছিলেন? বোধ হয় তাই। একালের উত্তর আধুনিক দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তাঁর 'Madness and Civilization' গ্রন্থে বাতুলগ্রস্ততার একটি নয়া ইতিহাস রচনা করেছেন। সেখানে আধুনিক মানুষের উন্মার্গিতা, অবসাদ কিংবা মানুষের বিকারগ্রস্ততা সম্পর্কে যুগোপযোগী অভিসন্দর্ভ রচনা করে আধুনিক মানুষের অন্তর্জগতকে উন্মোচিত

করেছেন। তিনি মনোরোগ, ম্যানিয়া ও ম্যালানকলিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে লিখেছেন–

> 'The mind of the melancholic is entirely occupied by reflection, so that his imagination remains at leisure and in repose; the maniac's imagination, on the contrary, is occupied by a perpetual flux of impetuous thoughts. While the melancholic's mind is fixed on a single object, imposing unreasonable proportions upon it, but upon it alone, mania deforms all concepts and ideas; either they lose their congruence, or their representative value is falsified; in any case, the totality of thought is disturbed in its essential relation to truth. Melancholia, finally, is always accompanied by sadness and fear; on the contrary, in the maniac we find audacity and fury. Whether it is a question of mania or melancholia, the cause of the disease is always in the movement of the animal spirits. But this movement is quite particular in mania; it is continuous, violent, always capable of piercing new pores in the cerebral matter, and it creates, as the material basis of incoherent thoughts, explosive gestures, continuous words which betray mania.'

বুদ্ধদেব বসুর মধ্যেও আমরা উপর্যুক্ত মনোরোগের প্রবণতাগুলো লক্ষ করি। তিনি আধুনিকতার একটি অতল দেয়াল তৈরি করে তাতে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছিলেন। এবং বাংলা কবিতাকে সেই নিউরোসিসের বোরখায় আচ্ছাদিত করেছিলেন। ক্লাইভ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে তিনি যে বীভৎস মানুষদের আর মৃত চাঁদকে অবলোকন করেন–সেই তিনিই সাহিত্যে পল্লীর প্রভাব কমাতে নগরকে অন্ধের মতো অন্তরে ধারণ করেন বলেন, "পল্লী সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়, তা-ই খাঁটি আসল; আর শহর যেখানে বিষয়, সেখানেই আছে মেকি, এটা আমাদের একটা সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। কুসংস্কার, বলা উচিত।" এভাবেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে বৈপরীত্য ফুটে ওঠে। এখানেই তাঁর ইউরো-আমেরিকান ধাঁচে গড়া জীবন-দর্শনকে মেকি মনে হয়। তিনি সুদীর্ঘকালের ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, খেটে খাওয়া কৃষিজীবী কৌম-সমাজ ও তার সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ভরে দূরে ঠেলে দিয়ে আবার বলেন, "তোমাদের এই পল্লীপ্রেম স্যাঁতসেঁতে একটু ন্যাকামি ছাড়া আর কী?" এ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ইউরোপের প্রতিভাবান লেখকদের জীবন অনুসরণে–যেমন ডিকেন্সের লন্ডন, টলস্টয়ের মস্কো, উগো, বালজাক কিংবা আনাতোল ফ্রাঁসের প্যারিস মতো কলকাতাকে তাঁর নিজ শহর মনে করে প্রশস্তি করেন। এবং এর সুবাসকে বুকে ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এরকম–

> "এখন আমাদের আছে কলকাতা-রাজধানী, কেননা বাণিজ্যধানী। আজকের দিনের রাজা তো বণিকরাই। কলকাতা তার ঐশ্বর্য আর ধুলো, তার ক্লেদ আর আলোকমালা, তার রোগ হতাশা উন্মত্ততা উল্লাস ব্যভিচার নিয়ে। একটা তীব্র প্রাণ স্রোত, নিরবচ্ছিন্ন।"
>
> (কলকাতা)

এভাবেই তিনি স্বার্থের সংঘাতে, বিলাসের লাস্যে, দারিদ্র্যের ভয়াবহতায় কিংবা পিশাচ–প্রকৃতির অর্থগৃধ্নু মানুষের ভাঁড়ামিতে, বোকামিতে, হাস্যস্রোতে, নিষ্ঠুরতায় জীবনের অফুরন্ত লীলা খুঁজে পান। তিনি 'আফিম বিহ্বল' চোখে কলকাতাকে চেখে দেখেন। এবং তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে, সেই বিষ উগরে দেন এভাবে–

১. দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার
   – যৌবন আমার অভিশাপ।

…　　…　　…

'হে তরুণ, দস্যু নহো, পশু নহো, নহো তুচ্ছ কীট
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

(শাপভ্রষ্ট)

২. হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেন।

…　　…　　…

তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত–
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ– উন্মাদ।

(প্রেমিক)

৩. বাতাসে মুখে নৌকার মতো আধখানা চাঁদ
আকাশের বুকে ছুটতে থাকবে– চাঁদ উন্মাদ!
উন্মাদ চাঁদ– উন্মাদ-মন আমরা দু'জন।

(কবিতা)

৪. এবার তো দেখলে আমার চরম নগ্নতা–
কী হিংস্র আমি নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর!

…　　…　　…

এতে উন্মত্ততা, এতে সর্বনাশ। একি তোমার সইবে?

(দয়াময়ী মহিলা)

৫. কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী;
বিশ্বের জানালা বন্ধ; অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
পচা ডোবার মতো দিন, পুরোনো বিস্মৃত কুয়োর তলার-মতো
রাত্রি; আর নিঃসঙ্গতা, শেষহীন।

(বৃষ্টি আর ঝড়)

৬. তোমাকে বুকে ক'রে তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার মথিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়– যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী–
কোন উদ্যত খড়গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

(জন্ম)

৭. আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চসুর।
আজ কোনো ভয় নেই– বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

(ব্যাং)

৮. একদিন উন্মাদ-নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে সংকীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।

(দময়ন্তী)

৯. বিষণ্নতার নিঃসাড়তার নেশা
আমার বুকের নিঃশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিশ্বের ছবি মুছে দেয় মন থেকে।
(বর্ষার দিন)

১০. বাইরে বরফের রাত্রি, ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকেও কাগজের মতো টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংসুক
হাত ছড়িয়ে দেয় হিম; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।
(শীতরাত্রির প্রার্থনা)

১১. কঠিন হাতে নাবিক ধরে
আকাঙ্ক্ষার হাল,
কপট স্রোতে ভাসে আমার
মৃতদেহের ছাল।
(সমর্পণ)

১২. গাছে-গাছে ডাকিনীরা মুণ্ড নাড়ে, তাল দেয় শূলবিদ্ধ বিড়ালীর আর্তনাদে–
বৃষ্টির অস্পষ্ট রাতে ফুটপাতে পড়ে থাকে এক
ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড
স্বার্থময়, ক্রমশ বিদ্বান।
(ভিনদেশী)

১৩. বুকের মধ্যে দাঁত বসিয়ে ঘণ্টা বাজে, বেলা যায়, আমার গালে
গজিয়ে উঠলো দাড়ি, ফালি-ফালি ন্যাকড়া হ'লো
প্যান্টালুন, চমড়া, ফুঁড়ে লম্বা ঘাস বেরিয়ে এলো।
পালে-পালে ছাগল আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।
(একদিন : চিরদিন)

১৪. শুনতে পাই জীবিতের ভারে এই পৃথিবী অবসন্ন। কিন্তু
মনে হয় মৃতের সংখ্যা আরো বেশি।
(মৃতেরা)

জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র অবিশ্বাস–

১৫. অগত্যা সে স্বার্থপর। দুটি কাজ অত্যন্ত জরুরি;
দৈনন্দিন খেয়ে পড়ে মোটামুটি স্বাস্থ্য ভাল রাখা,
আর এই প্রবঞ্চক দেহ নিয়ে চঞ্চল সংসারে বেঁচে থাকা।
সব পণ্ড হবে, যদি মৃত্যু তাকে অকস্মাৎ করে নেয় চুরি।
(মাছ ধরা)

রিরংসার প্রবণতা–

১৬. তার সব সজলতা চেটে নেয় বিদগ্ধ আগুন,
ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি,

যে-সব গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোনো মত্ত নাগর নামেনি,
সেখানেও লালসায় খুঁটে খায় অবশিষ্ট নুন।
(বেশ্যার মৃত্যু)

১৭. কখনো বা দৃশ্য ফোটে–স্বরচিত; অশনাক্ত হ্লাদিনী ললনা
স্তন খুলে, বাহুমেলে, পরিশ্রুত লালসায় হাসে;
(বৃদ্ধি কবি)

মায়ের মৃত্যুকে ঘিরেও রিরংসার স্রোত বয়ে যায়। তাঁর জন্মের সময়েই বালিকা মাতার মৃত্যু ঘটে–তখন তাঁর মায়ের বয়স ছিল মাত্র ষোল। মাকে নিয়ে তাঁর নঞর্থক চেতনার উৎসার আমাদের ভাবিত করে। আমাদের ব্যথিত ও বিস্মিত করে। তাঁর এই রিরংসা কাম্য ছিল না।

১৮. প্রপিতামহের নাম জানি না। মাতার অশ্রুত নাম
অতিকষ্টে মনে পড়ে। (তিনি, বিবাহিত পত্নী, আসলে বালিকা),
আমার জন্মের জন্য কৃতকার্য প্রাণান্ত চেষ্টায়,
সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনতাপে গলে গিয়ে, বিলুপ্ত হয়েছিলেন–
... ...
মেয়েটি সম্পূর্ণ কিন্তু, সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনে কান্তিময়ী অতি সুকুমার–
অতি মৃদু আঙুলেও স্তনস্পর্শে,
অতি নম্র কঠিন ভঙ্গিতে
মূর্ছাবিষ্ট জীবন লিপ্সুকে দেয় অবশিষ্ট আবশ্যক প্রাণশক্তি,
(সন্ধিলগ্ন)

আমিত্ব বোধের নির্লজ্জ আবাহন–

১৯. আমি ঠিক জানি না। দেখিনি কোনো দেবতাকে। শুধু জানি;
এই দুই কুকুর
মাঝে-মাঝে আমার আমিত্ববোধে ক'রে দেয় লজ্জিত, বিধুর;
ধীর যেন হয় অনুমান
কবি আর মহাত্মার কোথায় দুস্তর ব্যবধান।
(দুই কুকুর)

ভারতীয় উচ্চমন্য আর্যত্বের অহংকারও তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করেন। 'আমি ছিলাম ভরতবংশীয় রাজা, রাজপিতা' কিন্তু আজ সেসব হারিয়ে গেছে। কেবল জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ সেই রাজত্ব আজ। ভারত মাতার বন্দনা করে বলেন, 'বসুন্ধরা, মাতা, পৃথিবী, শাশ্বতী,/লক্ষ যুগ ধ'রে ধর্ষিত হয়েও নিত্য যৌবনা-র কাছে ভিক্ষা মাগেন।' আধুনিক কুরুক্ষেত্রে অক্ষৌহিণী সেনানী আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার। কেবল অন্ধ, বৃদ্ধ, অক্ষম ও অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ। এই আর্যস্বপ্নের ঘোরে তাঁর উচ্চারণ–

২০. এমনকি আমার পিতৃত্ব
একটি মাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান।
তবু দ্যাখো–এখনো–
আমি হ'য়ে যাইনি উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি

আছি এখনো আর্য সচেতন ও মননশীল
পশুর মতো আর্তনাদ করি না, বাক্য বলে থাকি যুক্তিসঙ্গত।
(ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ)

উন্মূল এই চেতনা বুদ্ধদেব বসুকে ভারাক্রান্ত করে। সাদা চামড়ার বিদেশী বণিক সভ্যতাকেই নিজের হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা ভেবে বসেন। ভারতবর্ষসহ আফ্রিকা এবং অন্যান্য সভ্যতার সংস্কৃতিকে মনে করেন বর্বর এবং প্রাচীন ও নপুংসক। তাই তিনি জয়ধ্বনি দিয়ে আবাহন করেন তথাকথিত সভ্য ও পুঁজিবাদী বণিককে। যে এসে এই 'গণিকা মহাদেশ'টিকে ভব্যতার আলোকচ্ছটায় ভরিয়ে তুলেবে। কবি লিখেন–

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত–
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।
হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো, আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক, পূর্ণ হোক।
করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,
তার জয়ধ্বনি করে।
উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর পরে
বিদ্যুৎ চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।

করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরো থরো,
জয়ধ্বনি করো।
(ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা)

বুদ্ধদেব বসু হয়তো কবিতার নানা ছত্রে কিছুটা ব্যাজস্তুতি করেছেন। বণিক সভ্যতাকে 'স্থূলোদর' তাকে 'রক্ত-স্ফীত' বলছেন কিন্তু শেষতক তার মধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তির পূর্ণতাও লক্ষ করছেন। তাই কবি বলছেন, 'ঐ এলো প্রেমিক-বণিক বীর'–তার জয়ধ্বনি করো। আফ্রিকার নগ্ন কৌমার্যকে হরণ করুক বিকৃত জাতক তবুও তো আফ্রিকা হবে 'সভ্যতাসন্তানবতী'! এই গণিকা-মহাদেশটির শেষ অন্ধকারটুকু মুছে দেবে সভ্যতার বার্তাবাহী এসব সূর্যসৈনিক–আফ্রিকা হও গর্ভবতী! এক বিকৃত মানস-সম্ভূত এই চেতনা কতটা ক্ষতিকর তা আজকের আফ্রিকান লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা তুলে ধরছেন। তারা ফিরে যাচ্ছেন আফ্রিকীয় ঐতিহ্যের পানে।

বুদ্ধদেব সত্যিকার অর্থেই মর্বিড কবি ছিলেন। মেধাবী কবির সমস্ত গুণ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বড় সব্যসাচী লেখক এবং সে কারণেই তিনিই সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারী। কারণ, তিনি পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করেছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে। একজন সমালোচক লিখেছেন–

> "স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্য : 'আমি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রসাদ বঞ্চিত।' তিনি যথার্থই বলেছেন, কারণ তাঁর মানস চৈতন্য স্থায়ী ডেড়া গেড়ে বসেছিল প্রতীচ্য সাহিত্যালোকে। শার্ল বোদলেয়ার, রাইনার মারিয়া রিল্কে, ডি.এইচ. লরেন্স, হেল্ডারলীন, হাক্সলি, এমনকি মরগ্যান, সিগমুন্ড ফ্রয়েড আর এলিসের ভাবনা ও চেতনা জগতে বিচরণ করে কায়োমনে তাঁদের বিশ্বাস ভূমির স্থায়ী নাগরিকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।"
>
> (অনাবিল কাব্য প্রতিভূ : বুদ্ধদেব বসু, মুশাররফ করিম, মৃতন্দ্র)

বুদ্ধদেব বসু ক্রমাগতভাবে রাষ্ট্র-সমাজ-ঐতিহ্য ও নিজ সংস্কৃতিবঞ্চিত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার এক জটিল বৃত্তে বাঁধা পড়েছিলেন। চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী তরুণ প্রজন্ম তাঁকে 'জনগণের ঘৃণ্যতম শত্রু' হিসেবেও চিহ্নিত করতে কুণ্ঠিত হননি। অন্যদিকে, কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা তাঁকে দেখেছেন 'দুর্বিনীত দেবশিশু' হিসেবে।

উত্তর আধুনিকতারকালে আমরা অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। কারণ, সুদীর্ঘকালের ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিক জড়তাকে তিনি আঘাত করতে পেরেছিলেন। তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবেরা (অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ) আধুনিক সভ্যতার কৃতির সঙ্গে তাদের মারি-মড়কও আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। কবিতার প্রকরণ, ছন্দ নির্মাণ, গঠনপদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা এক একজন কিন্তু কিংবদন্তিতুল্য। 'শিল্পের জন্য শিল্পের' প্রবক্তা হিসেবে তাঁদের রচনা উত্তীর্ণ এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে আধুনিকতার প্রতি এই মুগ্ধতা আজকে কাটিয়ে ওঠার দিন এসেছে। পূর্বজদের অস্বীকার করে নয়, হাজার বছরের বাংলা কবিতার একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে মেনে নিয়েই আজকের উত্তর আধুনিক তরুণ কবিরা নিজেদের জন্য একটি প্রশস্ত ও দ্যুতিময় হাইওয়ে নির্মাণ করতে ব্যস্ত। সৃষ্টিশীলতার এই আন্দোলনে ইতিমধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা গেছে। স্পর্ধাজাগানিয়া শক্তি নিয়েই তরুণ কবিরা সম্মুখপানে অগ্রবর্তী। এদের কবিতায় আজ ফুটে উঠছে বাংলাদেশের সত্যিকার আদল। মাটিবর্তী হয়েছেন কবিরা। তাদের কবিতায় আজ ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মা-মাটি-

মানুষের সুর। ব-দ্বীপের স্মৃতির সঙ্গে আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়ানসূত্রে সর্বভারতীয় মিথ-পুরাণ-লোককথা-উপকথা ইত্যাদিরও সংযোগ ঘটছে। বিশ্ব সংস্কৃতির সঠিক উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত নয় এসব কবিতার ভাষা। প্রতিটি কবিতা থেকে পাওয়া যায় মাটির সোঁদা ঘ্রাণ আর প্রাণ-অফুরান। আধ্যাত্মিকতাও বিনির্মিত হচ্ছে নতুন ব্যঞ্জনায়। ভাষা ও ছন্দের দুয়ার গেছে খুলে। একটা ফল্গু হাওয়ায় দুলছে বেতশ লতা কিংবা ডাহুকের মনহরণকারী আর্তনাদের মোহন চিত্রও লিপিবদ্ধ হচ্ছে আজকাল। এর কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক–

১. আমি তো ওরাং জাতি, বৃক্ষবাসী
বৃক্ষের পাতায় লেগে আছে
পৌরাণিক ঘ্রাণ আমার জন্মের।
(অলকা, নন্দিতা, প্রত্নজীব)

২. বড়শি ও জালে জলে তরতাজা ফুলকার রঙ লাল,
খেয়াঘাটে দাঙ্গা লড়ে শুঁটকি আর নুনের দালাল।
(আসিফ নূর, বঙ্গোপসাগর)

৩. অশোক কাননে কাঁদে সতীবিবি সীতা।
মোহের বারুদে খাক্ আমাদের পিতা।
(মারুফুল আলম, প্রলাপ গাথা-৩)

৪. কবি নেই, পড়ে আছে মলিন কবিতা
ময়ূর শব্দাবলি, দলবৃত্ত-শ্বাস,
প্রণয়-ঐশ্বর্যে বাড়া মনুসংহিতা
একান্তে ঠোকরায় দ্যাখো মৃত্যু-রাজহাঁস।
(শাহিদ আনোয়ার, মৃত্যু)

৫. বেহেশতে নারীর কী লাভ?
সতীসাধ্বী সম্মুখীন সত্তরটা সতীনের
আমার মায়ের তবু জায়নামাজে বিরক্তি নেই
পিতার কপালে নাচে ইবাদত ক্ষত
রোশনাই ছড়াবে কোন জান্নাতের ঘাসে।
(জিললুর রহমান, দ্যুলোক)

৬. শ্যাম-রূপ রাধা-রূপ ধরিতে দু'জনে
ছুটিল মিলিল দূরে ও অদূরে শূন্যে ধরাতলে
ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া উড়িল পুড়িল নভোকোণ
অধিবিদ্যার ময়ূর নাচিয়া আকুল হইল আজি
বস্তুর নিভৃত প্রাণে
(শিবলি সাদিক, অধিবিদ্যার ময়ূর)

৭. দুস্থ বটগাছের পীড়া নিয়ে কথা কইছে এক পাখি
জামিনদার
মিড়কি-লাগা কবুতরের জল-দর্শনেচ্ছা দেখেও কইতে পারছি না
ডাঙার নাগর আমি, বেলা বয়ে যায়।
(মোস্তাক আহমদ দীন, বোবার শত্রু আছে)

৮. আমার মায়ের কণ্ঠস্বর হারায় জলের শরীরে
সে ভাষা কেবল বোঝে বোয়াল, রুই, সরপুঁটি আর মৎস্যকন্যা
শানবাঁধানো পুকুরঘাট
পশ্চিম পাড়ে উর্ধ্বমুখী ডালপালাহীন তাল গাছটির শিখরে
মাঘী পূর্ণিমার রাতে পেত্নীর আসর বসতো কোনো এককালে
আজিকার শিশু অবাক বিস্ময়ে সেই কাহিনী শুনে
মোনাজাত তৃতীয় নয়নে
গাঁও-গেরামে খুঁজে ফিরে রূপকথার ডাইনী।
(সাজিদুল হক, আমার মায়ের কণ্ঠস্বর)

৯. মহাবালিপুরমের ভগ্নস্তূপ মন্দিরের কোটরে পেয়েছি কৃষ্ণার
নিঃসঙ্গ লজ্জা, মোহন পাথরের গায়ে আঁকা তার ধুন্দল নিতম্বে
হাত। কোন কুমারের স্বপ্নগুচ্ছ চোখের ছোঁয়ায় পড়েছিল
রৌদ্রছায়া কারুময় সুডৌল যুগ্মস্তনে। এটি দু'হাজার বছর আগের
আঁকা যাদুকরের সুনিপুণ অনুভূতি। আমার বিশ্বাস হয় না কোনো
পর্যটকের চোখ পড়েছিল ওখানে।
(রিজোয়ান মাহমুদ, মহাবালিপুরাম)

১০. এখন পড়ছো তুমি কাদের টিনের চালে
দুই করতলে ছায়া দুই চোখে জমে জল,
কাদের বাগানে ফোটো লাল ফুল বাজো মল
এখন কাদের সাথে তুমি রাতকে কাঁপালে?
মাঝে মাঝে আসো বসো হাসো কাঁদো লাল ঠোঁটে
চোখের ইশারা দাও ওগো রাইবিনোদিনী,
অনুজেরো হাত ধরো তুমি সাপিনী-কামিনী
চরম দহনে ঘুম থেকে শিশু জেগে ওঠে।
(আহমেদ রায়হান, চোখের ইশারা দাও)

১১. ছুঁয়ে দেখলে চেনা দায়
চিনলে স্পর্শাতীত।
কতটা লালন হলে
পৃথিবীর দুইখণ্ড দুই কাঁধে নিয়ে
বাস করে তৃতীয় ভূগোল যোজন যোজন দূরে।
(পুলক পাল, মানচিত্রে লীন)

এরকম অসংখ্য তরুণ কবির কবিতার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পরিসরের কথা ভেবে এটি সীমিত করতে হয়েছে। সচেতন পাঠক, বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে এর পার্থক্য সহজেই বোঝা যাবে। বু. ব.-এর কবিতা যেখানে একরৈখিক ও শিল্পকারুমণ্ডিত সেখানে উত্তর আধুনিক কবিতায় কারুময়তা কিছুটা ভিন্ন হলেও তা বিচিত্র-বৈভবে সমৃদ্ধ। এটি নেতিবাচক কবিতা-স্বরের বিপ্রতীপে ইতিবাচকতার অনুগামী এবং প্রতিটি কবিতার মধ্যেই এ মাটি ও মানুষের চর্চিত জীবনাভিজ্ঞতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। ম্যানিয়াগ্রস্ততার বিরুদ্ধে এসব কবিতা জীবনের প্রতি সদর্থকতার ঘোষণা। বাঙালি মাতা বসুন্ধরা আর অধরা নেই— তার

পিননের ভাঁজ খুলে খুলে এগিয়েছেন তরুণ কবিকুল। মাটির সোঁদা ঘ্রাণে আকুল হয়ে ওঠে মন-প্রাণ। এই মহাপ্রত্যাবর্তনে সঙ্গী হয়েছে আমাদের অতীতের হীরকখণ্ডগুলো এবং তা নির্মাণ করেছে বর্তমানকে। এই ইতিবাচক প্রত্নকথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারে পৌছাবে আবারও এক উজ্জ্বল অতীত নিয়ে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়েই এই রচনাটি শেষ করতে চাই–

সে কি নারী? সে কি কোনো নারী? সে কি কোনো
চিরন্তনী–রঙ্গিনী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়,
অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয়?
নাকি সে কবিতা? কবিতার জ্বলন্ত কল্পনা, ছন্দের দারুণ
উন্মাদনা? বাণীর আগুন
অঙ্গে–অঙ্গে, রন্ধ্রে–রন্ধ্রে রক্তের অণুতে–অণুতে?
(মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে)

অন্ত্যজগাথা, মানবিকবোধের প্রগাঢ় সুরভি

ওবায়েদ আকাশ

বনের পাখি, নদীর জল, কিংবা আকাশের তারা, ফসলের মাঠের উদাস হাওয়া– এরা সবাই যখন কবিতা লেখে তখন কবি বলতে যাকে আমরা অনুভব করি, তা আমাদের চারপাশের চেনা পরিবেশ, আর তার সাথে আমাদের অদেখা ভাবনাজগতের অজস্র অনুভূতির সংকলন। অঝোর ধারায় ঝরে যাওয়া বৃষ্টির গভীরে আমরা কবিতা খুঁজে পাই, একাকী জীবনের মৃত্যুময় যন্ত্রণায় আমরা কবিতা খুঁজে পাই, আবার প্রেম রোমান্স বিরহ বিষাদ বিপ্লব সংহতিতেও আমরা কবিতা খুঁজে পাই। আর জীবনের এইসব নানা অনুষঙ্গ কেবল যে মানুষকে ঘিরেই বসবাস করে সে রকম ধারণার কোনো যৌক্তিকতা নেই। মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের কিংবা তার চারপাশের সঙ্গে মানুষের যে স্বভাব-সম্পর্ক তাকে ভাষা দিতে পারার ক্ষমতাকে মনে করি শিল্পীর ক্ষমতা। তেমনি করে একজন কবি শিল্পী হয়ে ওঠেন শব্দের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে তার ও চারপাশের সম্পর্ককে ভাষা দিয়ে। এভাবে মানুষের বাইরে অন্য সব প্রজাতিতেও আছে কত না কবি কত না শিল্পী! যেমন একটি বাবুই পাখি তার অবর্ণনীয় পরিশ্রমের মাধ্যমে তিলে তিলে যে চমৎকার বাসাটি তৈরি করে, তা তো কখনো কখনো মানবসৃষ্ট শিল্পকেও হার মানায়। আর এই চকৎকার শিল্পের গভীরে যে উপমা চিত্রকল্প উৎপ্রেক্ষা ভাষা শব্দের ব্যবহার তারো নান্দনিক দিকগুলো একদিন আবিষ্কার করবে কেউ। আবার আকাশের রঙধনু কিংবা গোধূলির আকাশে নানা বর্ণের মেঘের সংকলনে যে চমৎকার চিত্রের জন্ম হয়, কখনো কখনো তো তাকেই অনুসরণ করে শিল্পী হয়ে ওঠে কোনো কোনো মানুষ। প্রকৃতি জগতের অ-মানব শিল্পীকে যেমন আমরা সহজে আবিষ্কার করতে পারি না, তেমনি এর বিপরীতে বসে আমরা খুব সহজেই আবিষ্কার করে ফেলি একজন কবি বা শিল্পীকে। আমরা সামান্য একটি ছবিই বুঝতে পারি না, আর তার আবিষ্কর্তা জলজ্যান্ত একজন মানুষকে কত না সহজেই বুঝে ফেলি আমরা– এরকম একটি খেদোক্তিই করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যিনি কবিতা লেখেন তাকেই আমরা কবি বলি, আবার ছবি আঁকলে বলি চিত্রশিল্পী। এই যে আমাদের কবি বা শিল্পীর আবিষ্কার– কালের ধোঁয়ায় তাই আবার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো আবিষ্কার যে ক্রমশই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে– তেমনি কিংবদন্তি কবি-শিল্পীর পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হয় উত্তর প্রজন্ম। তাদের তির্যক রশ্মি যখন আমাদের এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়, তখন আমরা তার গুরুত্ব অনুভব করি। তাকে আমরা মূল্যায়ন করতে শুরু করি। জরুরি হয়ে পড়ে। নিজের মতো করে তাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে বিস্মিত হই। আর ঠিক সেভাবেই যে অসামান্য প্রতিভাধর কবি বুদ্ধদেব বসু আমাদের তাড়িত করেন, আজকের প্রজন্ম তা অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করে।

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-বলয়মুক্ত যে আধুনিকতার নবপর্যায়ের আবিষ্কার, সেই আবিষ্কারের মধ্যমণি পঞ্চকবির একজন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার

করে নয়, তাকে মহীরুহ ভেবে তারই অসামান্য নির্মাণের পাশে অত্যাধুনিক কবিতার সৌধ নির্মাণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুরা। শুধু কবিতা নয়, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ জার্নাল অনুবাদ– সবক্ষেত্রেই অনন্য স্বাক্ষর রেখেছিলেন এই পাঁচ কবি। কিন্তু সব্যসাচিত্বে যিনি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রসর তিনি বুদ্ধদেব বসু।

সবকিছুর পরেও বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত একজন কবি হিসেবেই পরিচিত সমধিক। তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন, লিখতে লিখতে অনেক নিরীক্ষা করেছেন, ভাঙচুর করেছেন, নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করেছেন। তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিককার কবিতা যে রবীন্দ্র-বলয় ভেঙে খুব দূর এগিয়েছিল তা মনে করা যায় না। বরং নিজস্ব ভাষায় কবিতা লিখতে তাকে শুরু থেকে অনেকটা পথই সামনে এগুতে হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু অনেক বেশি আধুনিক হয়ে উঠেছেন তার শেষের দিকের কবিতায়। স্বাবলম্বী ও সম্পূর্ণ হয়েছেন ক্রমশ তিনি জীবন সায়াহ্নের কবিকৃতিতে। এরকম ঘটনা অধিকাংশ শিল্পীর ক্ষেত্রে খুব একটা ঘটে না। কিন্তু বসুর বেলায় যে ঘটেছে, এটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত। আর সে রকম ধারণায় ভর করেই এ আলোচনায় বসুর শেষের দিকের একটি কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায়' (যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে) থেকে কয়েকটি ভালোলাগা কবিতা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত পাঠানুভূতি ছাড়া অন্য কিছুই নয় আমার এ সামান্য লেখাটি।

কবি বুদ্ধদেব বসু যে তার কবিতার ফসল ঘরে তুলেছেন তা কোনো স্বভাব কৃষকের মতো নয়, একজন ঘর্মাক্ত পরিশ্রমী কর্মঠ কৃষকের মতো। তিনি আগাছাময় মাঠে আমন ধান রুয়ে এসে প্রকৃতির কাছে তার ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে পাকা ফসল ঘরে তুলে আনেন নি, তিনি ঠিক মতো অনুকূল আবহাওয়ায় জমি চাষ করে, তাতে বীজ বুনে সময় মতো আগাছা পরিষ্কার করে গোলায় তুলেছেন কাঙ্ক্ষিত ফসল। তার কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায়'-এর নামকরণ থেকে বিষয় নির্বাচন ও বক্তব্য উপস্থাপনে তিনি সে স্বাক্ষর রেখেছেন। 'বিদায়' শব্দটিকে আমরা নানা ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে থাকি। শব্দটি যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি করুণ ও অশ্রুসিক্ত মানবিক হৃদয়ের এক নিবিড় দ্যোতনা। বসুর এ গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই এত বেশি হৃদয়স্পর্শী ও মানবিক হয়ে উঠেছে যে, এ থেকে অনুমান করা যায় কবি তার জীবন সায়াহ্নে এসে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভাবিত হয়ে পড়েন এবং তখন যে কোনো প্রকার মৃত্যুই তাকে আলোড়িত করে তাকে কাঁদিয়েছে এবং অতি মানবিক বোধে তাড়িত করেছে। এ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই ঘুরেফিরে মৃত্যু বা বিদায়ের প্রসঙ্গ অনুরণিত হয়েছে। গ্রন্থের 'মাছ ধরা' কবিতায় বসু বলেন, 'কিন্তু মাছ ধরা শক্ত কাজ। দেয় হানা রাক্ষস ভোঁদড়।/মাঝে মাঝে আজন্মা বছর যায়। কখনো বা বাতে সে অক্ষম।…/অগত্যা সে স্বার্থপর। দুটি কাজ অত্যন্ত জরুরি;/দৈনন্দিন খেয়ে পরে মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালো রাখা,/আর এই প্রবঞ্চক দেহ নিয়ে চঞ্চল সংসারে বেঁচে থাকা।/–সব পণ্ড হবে, যদি মৃত্যু তাকে অকস্মাৎ ক'রে নেয় চুরি।' এখানে যেমন একজন অন্ত্যজ মানুষের কেবলমাত্র খেয়েপরে বেঁচে থাকার বিষয়টিকে তার জীবনের *সকল সাধ-আহ্লাদ* করে তুলে ধরা হয়েছে; তেমনি তাকেও অনিশ্চিত দেখানো হয়েছে মৃত্যু আতঙ্কের কাছে।

আবার প্রান্তিক বা অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্য এক মানবী, যাকে আমরা *বেশ্যা* বলে সম্বোধন করি, যিনি সমাজ-বঞ্চিত অথচ সমাজেরই *নামীদামি ভদ্র মানুষেরা* গোপনে তার ঘরে যায় খানিটা আনন্দ-আহ্লাদ-সুখের আশায়, তেমনি একজন বেশ্যার যখন মৃত্যু হয়, সমাজ তাকে অচ্ছুৎ জ্ঞান করে। তার লাশটি বয়ে আনার জন্য সমাজের

ঐসব *গোপন সুখসন্ধানী* মানুষগুলোকে আর পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসু তার 'বেশ্যার মৃত্যু' কবিতায় বলেন, 'তারই বোন-সতিনেরা কাঁধে করে নিয়ে এলো তাকে;' এবং তারাই তার মুখাগ্নি করে, আগুনে পোড়ায় সেই অঙ্গগুলোকে যে অঙ্গগুলো এই সমাজই একদিন ব্যবহার করেছে মহাআমোদে। তার এই দগ্ধ হওয়াও যেন এই সামাজিক লালসার চোখে মহাউৎসবের। বসু বলেন, 'তার সব সজলতা চেটে নেয় বিদগ্ধ আগুন,/ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি;/যে-সব গোপন রন্ধ্রে কোনো মত্ত নাগর নামেনি,/সেখানেও লালসায় খুঁটে খায় অবশিষ্ট নুন।' 'বেশ্যার মৃত্যু' কবিতায় কবি বুদ্ধদেব বসু বেশ্যাদের নিজের ভগিনী ভেবেছেন, ক্ষুধার অনলে দগ্ধ হয়ে যে ভগিনীরা এ পথে নেমেছেন, তাদের জন্য কবির মানবিকতা যেন আকাশস্পর্শী হয়ে, সমাজের তথাকথিত ভদ্রতাকে উপহাস করেছে।

'এক অপরিচিতা মৃতার স্মরণে' কবিতায় প্রায় একই রকম বিষয়কে কবি উপস্থাপন করেছেন। সমাজকে কী তীব্রভাবেই না ভর্ৎসনা করেছেন! রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ব্যস্ত নাগরিকতায় যখন এই মৃতাকে দেখে নগরবাসী এবং তাকে যারা বয়ে নিয়ে যায় তারা *সৌম্য, যেন আলোকলক্ষণ* তাকে বারবনিতা ভেবে। এই পরিচয়হীন মৃত মানবীকে কবি সমাজের চোখে এভাবে দেখেছেন : 'আর আমি লেখা ছেড়ে বারান্দায় শব্দের সন্ধানী,/তাকে দেখেছিলাম মিনিট দুই– মানিনি, সে মৃতা;/মৃতা নয়– যৌবনপ্রতিমা, নারী হৃদয়প্লাবিনী,/যেন স্বপ্নে দেখা কোনো চিরন্তনী সম্ভাব্য বনিতা।' এভাবে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা ও মানবিক প্রতিবেদনে নির্মিত 'স্বাগত বিদায়' কাব্যগ্রন্থে কবি বুদ্ধদেব বসু হয়ে ওঠেন প্রান্তিক বা অন্ত্যজ মানুষের কবি।

এ গ্রন্থের 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় তার মায়ের মৃত্যু তাকে বিচলিত করেছে। কবিমাতা, যাকে কবি বলেছেন *বিবাহিত পত্নী, আসলে বালিকা*– তার কাছে কবি তার সমস্ত আশা হতাশা আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি এ জগতে যা কিছুই করেছেন, তার সবকিছুর মূলেই তার মাকে জড়িয়ে নিয়েছেন। কবির চাওয়া-পাওয়াও তার এই মায়ের কাছেই সমর্পিত হয়েছে। কবির জাগতিক পাপপুণ্যির জন্যও তার মাকে অভিযুক্ত করে ব্যক্ত করেছেন তার নানা অভিলাষ। তারপর কবি মায়ের কাছে তার শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এভাবে : 'জানি তুমি অনভিজ্ঞা, নিতান্ত বালিকা।/কিন্তু তুমি মৃতা, আর মৃতের ব্যাপার/আমি এত অল্প জানি, কল্পনাও সেখানে পাণ্ডুর।/তাই বলে, কোনোমতে যদি বা সম্ভব হয়, একবার এসো না, তোমাকে দেখি;' এ কবিতায় কবির এ অপূর্ণ ইচ্ছা ব্যক্ত করার ভেতর দিয়ে মায়ের জন্য ব্যাকুলহৃদয় এক কবিকে আমরা আবিষ্কার করি।

এভাবে কবি বুদ্ধদেব বসুর 'স্বাগত বিদায়'-এর প্রতিটি কবিতার ব্যবচ্ছেদ করলে যা বেরিয়ে আসে তাতে কবির প্রগাঢ় মৃত্যুচেতনাবোধ ও মানবিক সাড়ায় জাগ্রত সত্যের কাছে নিরাপোসকামী সত্যিকারের কবিমানসকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে কবির ভাষা ব্যবহার থেকে বিষয় বর্ণনা, চিত্রকল্পের ব্যবহার, অন্ত্যজ চরিত্রের আবিষ্কার– সবকিছুতে চমৎকার সম্পূর্ণতা এসেছে নিঃসন্দেহে।

বুদ্ধদেব বসুর চোখে
রামায়ণ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক

ওমর কায়সার

আটারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি রবির প্রেমে মজেছিলেন। খুব ছোটবেলায় কোনো এক আত্মীয়ের কাছ থেকে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' হাতে পান। বুদ্ধদেব লিখলেন, 'সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম নবীন মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্কপাঠ্য বাংলা কবিতা আমি পড়েছিলাম, তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝ'রে পড়ে গেল।' সেই যে প্রথম মুগ্ধতা– তা সারা জীবন রয়েই গেল। মূলত রবীন্দ্রনাথের ছায়া বুদ্ধদেব বসুর জীবনজুড়ে ছিল। বুদ্ধদেব বসুসহ তিরিশের কবিদের রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কাব্যে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু তাতে তাদের রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিলনা। আপাত দৃষ্টিতে কারো কারো তা রবীন্দ্রবিরোধিতা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তর থাকলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ছিল তাদের শেষ আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকার সময় 'বাংলাকাব্যপরিচয়' বের করার প্রচেষ্টাকালে উভয়ের মতান্তর ঘটেছিল। বুদ্ধদেব বসু এই সংকলনটি প্রকাশ হবার পর গভীর হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের মধ্যেই সেই সংকলনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে ব্যথিত হয়েছিলেন নানা ঘটনা ও রটনায়। একবার রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘের এক অধিবেশনে বুদ্ধদেব বসু নাকি বলেছিলেন 'দ্য এজ অব রবীন্দ্রনাথ ইজ ওভার'। রবীন্দ্রনাথকে একথা বড় আহত করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার এই ভুল রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তির মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বিনা তার এক দণ্ড চলে না।' সেই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব কী ধারণা পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রতিটি খণ্ড নিয়ে তাই তিনি আলোচনা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা না হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য' বইয়ের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'আশা ছিল কবিতা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রচনাবলীর এক একটি খণ্ডের সমালোচনা লিখে যাবো। নিজের অবসরের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার আয়তনগত বৈষম্য লক্ষ ক'রে, কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর আমি আলোচনার জন্য শুধু কথাসাহিত্যকে বেছে নিলাম।' কথাসাহিত্য সম্পর্কে লিখলেও বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রভাব সম্পর্কে তুলে ধরেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তরসাধক' প্রবন্ধে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রবন্ধটি একটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সাহিত্য চর্চা' নামে এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে

প্রবন্ধের জন্য একটি উজ্জ্বল মাইলফলক এবং বাংলাসাহিত্যের পর পর বহু প্রজন্মের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করছে। বইটির তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে তিনটি প্রবন্ধ— 'রামায়ণ', 'মাইকেল' ও 'বাংলা শিশুসাহিত্য'। দ্বিতীয় অংশে 'বাংলা ছন্দ', 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক', 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা'। তৃতীয় অংশের প্রথম প্রবন্ধের নাম 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য', দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। আমরা 'সাহিত্য চর্চা' বইটির দ্বিতীয় অংশে পরিভ্রমণ করবো প্রথমেই যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরেছেন। এরপর আরো দুটো বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত প্রবন্ধকে আমার আলোচনায় টানবো।

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করলেন, 'আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের– দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন করে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয়। তারপরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেননি; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে— ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা, তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকা চাই।'— এই অমোঘ উচ্চারণের ভেতর এক প্রবল নির্মোহ ইঙ্গিত বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রোত্তর কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি দিয়েছেন। আর এই ইঙ্গিতই রবির সৃষ্টির বন্যায় ভেসে যাওয়া উত্তরসাধকদের জন্য ধ্রুবতারার মতো কাজ করেছে। কারণ বুদ্ধদেব বসু বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ ক'রে তার সৃষ্টির অমোঘ প্রভাব থেকে সরে আসার জন্য নতুন প্রজন্মকে এমন একটা কিছু করতে হবে যা রবীন্দ্রনাথ করেন নি। এই উক্তিটি বাংলা সাহিত্যের একটি মাইলফলক। যে মাইলফলকের সাথে সংলগ্ন রয়েছে এমন একটা তীরচিহ্ন যা নির্দেশ করছে গন্তব্য কোন্ দিকে। রবীন্দ্রপরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের জন্য এই গন্তব্যটি নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে অন্তত কথাসাহিত্যের জন্য আরো দীর্ঘকাল অপরিহার্য হয়ে থাকবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী অনেক কবি সেটি ধরতে পারলেন না বলে বুদ্ধদেব বসু বড় কঠিনভাবে উচ্চারণ করেছেন তাদের নাম। রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা লেখার যে কাজটি বুদ্ধদেব বসু কঠিন মনে করছেন সেটি কিভাবে যেন অনেকেই সহজ মনে করলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন— 'আর এখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হয়ে গেল। ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্র রকমের স্তবক বিন্যাসের নমুনা— সব তৈরি আছে, আর- কিছু ভাবতে হবে না, অন্য দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। ... রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তাই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিল তাঁদের।' অথচ রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের করার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথ যা করেন নি তাই। এই জন্যেই বুদ্ধদেব বসু চোয়াল শক্ত করে তাদের সম্পর্কে উচ্চারণ করলেন, 'বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, *কিরণানিধান*, কিরণধন এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাদের কুলপ্রদীপ, যারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদগত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন— তাদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা করে চেনা যায় না।' একটা ভিড়ের ভেতর থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে আলাদা করেও শেষ পর্যন্ত বললেন তিনিও শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হয়ে থাকলেন। কেননা বুদ্ধদেব বসুর মতে তাদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। যাদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর চিত্রা, চিত্রার পর কথা ও কাহিনী; আর তার পরে কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি— সেই মায়ায় না মজে উপায় ছিল না তাদের। আধুনিক প্রাবন্ধিক ভাষার অনন্য রূপকার বুদ্ধদেব বসু এভাবেই অপরিবর্তনীয় এবং অবিকল্প বাক্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের নিয়তির কথা উচ্চারণ করলেন।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের কবিদের রবির আলোয় আত্মাহুতির পটভূমি উচ্চারিত হলো বুদ্ধদেবের কণ্ঠে। কিন্তু এর পর? সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেই কি শেষ হয়ে গেল বাংলা কবিতা? এদের পরে আর যারা এসেছিলেন বাংলা কবিতার হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় তাদের নিয়তি কী? রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী উত্থানের বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কিংবা ঘোর কাটিয়ে উঠতে কতদিন সময় লেগেছে বাংলা কবিতার? বুদ্ধদেবের ভাষায় সেই ঘোর অনেকদিন ছিল 'যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙল।' এ যেন এক অসাধ্য সাধন। তিনি যেন এক নতুন যুগের শুভ সূচনা করলেন। নজরুলের লেখার ভেতর যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে তা কিভাবে পরবর্তীতে কল্লোল যুগে সাহিত্যিক বিদ্রোহে পরিণত হল তার অনুপুঙ্খ বিবরণ, বিশ্লেষণ পাওয়া গেল প্রবন্ধটিতে। তিনি লিখলেন, 'কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো'। কিভাবে সেই ঘণ্টা বাজলো ? তারও উত্তর পাই। বুদ্ধদেব বসু বললেন, এরা নতুনের স্বাদ এনেছেন। রবীন্দ্রোত্তর এসব কবি এমন কিছু দিলেন যা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না। 'এদের লেখায় যে-রকমের যা কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে সে-জিনিশটি পাই না।' মনন প্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হার্দ্য গুণের প্রেমেন্দ্র মিত্রের, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ এরা সকলে মিলে বাংলা কবিতায় সংহতি দিল, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা দিল এবং বিষয় ও শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত দিল। নজরুল থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশের কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হওয়ার এবং এক বিশাল উত্তরণের জমজমাট ইতিহাস যেন একটানে এঁকে ফেললেন বুদ্ধদেব বসু বিকল্পহীন গদ্যে।

সাহিত্য চর্চার আরেকটি প্রধান বিষয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মাইকেল'। ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক কারণে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি বিরাট স্থান রয়েছে। মধ্যযুগের দেব-দেবী অধ্যুষিত বাংলা কাব্য— অতঃপর— রায়গুনাকর, ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কাব্যসাহিত্যকে এক চরম অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করলেন কবি মধুসূদন। তাঁর অতি সীমিত জীবনের সাহিত্যকীর্তি এখনো অসামান্য বলে বিবেচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' পত্রকাব্য 'রঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশকবিতাবলী', সার্থক মহাকাব্য।

'মেঘনাদবধ', প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ইত্যাদি রচনা এবং বাংলা ছন্দে বৈপ্লবিক অবদান অমিত্রাক্ষর ছন্দের কারণে বাংলা

সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেই মাইকেল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর কি ধারণা আমরা এবার তলিয়ে দেখব।

১৯৪৬ সালে ৩৮ বছর বয়সে লেখা এই প্রবন্ধটির মধ্যে বুদ্ধদেব মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন এবং তা আজীবন পোষণ করেছেন। কোনো পরিবর্তন হয় নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্পর্কে তার মতামত পাল্টেছেন। ২১ বছর বয়সে 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন।' কিন্তু ৪৬ বছর বয়সে মাইকেল সম্পর্কিত মন্তব্য ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।' রবীন্দ্রনাথের প্রবল অনুসারী হয়েও বুদ্ধদেব বসু মাইকেল সম্পর্কে তার মতামত পাল্টাননি। মাইকেল সম্পর্কে তার মন্তব্য কঠোর, অনেকটা অবিনয়ী— 'তাঁর নাটকাবলী অপাঠ্য এবং যে কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিত লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। ভাবতে অবাক লাগে যে মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলিতে প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য দেখি, তার সংক্রমণ প্রহসন দু'টিতে ছাড়া আর কোনো রচনাতে নেই।' যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর জন্য মাইকেলের খ্যাতি সেই কাব্যকে বুদ্ধদেব বললেন নিষ্প্রাণ। এমন একটি নিষ্প্রাণ কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের স্বরূপ দেখেছেন তাতে বুদ্ধদেব সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম বয়সে মাইকেলের সমালোচনায় মুখর ছিলেন তাতে বুদ্ধদেব খুশি হলেও পরবর্তীতে মাইকেল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত পাল্টানোটা তাঁর পছন্দ হয় নি। কারণ মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকরণের অভিনবত্ব থাকলেও বিদ্রোহের কোনো স্বরূপ বুদ্ধদেবের চোখে পড়েনি। মাইকেলকে যে মহাকবি বলা হয়, এবং তাকে যে বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা বলা হয় তার জন্যে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি স্পষ্টতই লিখেছেন 'মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি, দুর্মরতম কুসংস্কার।'

বুদ্ধদেবের মতে মাইকেল বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি নন, রবীন্দ্রনাথই প্রথম। এর কারণ হিসেব তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন 'আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব যে বলতে গেলে শূন্য, এমনকি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হয়েই রইল, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধনায় তাঁর ব্যর্থতার এটাই প্রমাণ। বললে হয়ত কালাপাহাড়ী শোনায়, কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাব মাইকেল আনতে পারে নি। এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'

সত্যিকার অর্থে মাইকেল সম্পর্কে বুদ্ধদেবের অভিযোগের যেন অন্ত নেই। এর মধ্যে প্রধান অভিযোগ হলো তিনি শব্দের তাৎপর্য অনুভব করতেন না। শব্দের ধ্বনিগত দিকটাতেই তার নজর ছিল বেশি। যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সকল রহস্য অভিধানের পাতা উল্টালেই শেষ। তিনি এখানে মহাসমারোহে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। অবশ্য মাইকেল সম্পর্কে এমন অভিযোগ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব

মাইকেলের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশংসা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল ধ্বনির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যে আধুনিকতার স্বর্ণ দুয়ার খুলেছিলেন তারও প্রশংসা করেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে আমাদের মনে হয়, মাইকেল সম্পর্কে বুদ্ধদেব হয়তো স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'প্রবহমানতার' প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ছন্দে প্রবহমানতার জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতস্মরণীয়'। অর্থাৎ মাইকেল তার পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করেছেন। এছাড়া বুদ্ধদেবের মতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের একঘেয়েমি তাড়িয়েছিল। বুদ্ধদেব আরো স্বীকার করেছেন, মাইকেল শুধু বাংলা ছন্দের যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের আবিষ্কর্তা নন, বাংলা স্বরব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। পাশাপাশি মাইকেলের দুটো প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সম্পর্কে উদার মন্তব্য করেছেন। এখানকার গদ্য সংলাপগুলোর মধ্যে তিনি মাইকেলের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন। এছাড়াও মাইকেলের অন্যান্য লেখায় তিনি সৌকুমার্যের স্বরূপও উদ্ধার করে বলেছেন 'যেদিকে তার সহজাত ক্ষমতা সেদিকে তার যথোচিত মনোযোগ নেই।'

জীবনাচরণ এবং প্রথম জীবনে ইংরেজি প্রীতি ও অস্থিরতায় মাইকেল সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে অথবা প্রতিভার যথাযথ পরিচয় দিতে পারেন নি বলে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সাহিত্য রচনার উপযুক্ত উপকরণ হাতে পেয়েও তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে মনোযোগী ছিলেন না। মাইকেল সম্পর্কে তাই তার খেদোক্তি– 'যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয় তবু একথাও সত্য যে অনুজ যা কিছু করেছেন তার কোনো কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও সাধিত হতে পারতো, যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন।' এত কিছুর পরেও বুদ্ধদেব জীবনের শেষ দিনে পর্যন্ত মাইকেল সম্পর্কে বলেছেন, মাইকেল তাঁকে ভাবান না, যতখানি ভাবান রবীন্দ্রনাথ।

প্রবন্ধটির মাধ্যমে বুদ্ধদেব মাইকেলকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে গেলে আমরা এই প্রবন্ধে একজন সমজদার সমালোচককে পাই যিনি মূলত মাইকেলের সাহিত্যকৃতিরই সমালোচনা করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু তার প্রবন্ধগুলো এমনভাবে লেখেন পাঠক তাতে মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়েন। একটা ঘোরের মধ্যে তিনি তার মতামতগুলো তুলে ধরেন। যাতে পাঠকের মনে হয় এটাই শেষ কথা। প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি বাক্য মন্ত্রের মতো অপরিবর্তনীয়। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বোধ-বৈদগ্ধ-বিচ্ছুরণের এক বিরল সমন্বয় ঘটেছে তাঁর প্রতিটি বাক্যে, অলৌকিক উদ্ভাসে উত্তীর্ণ হচ্ছে তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের গদ্য আমি যতই পড়েছি ততই বিশ্বাস হয়েছে আমার, এ গদ্য তাঁর ভাবনাভঙ্গির, তাঁর মানস গঠনের সন্দেহাতীত অবদান। তার স্টাইলের মধ্যে কোনোও সচেতন রোপণ নেই, নেই কোনও কৃত্রিম প্রচেষ্টা। সহজতাই তাঁর শৈলীর অভিজ্ঞান, তাঁর গদ্যের নিজস্ব সাবলীলতায়। তিনি জোর করে কোন শব্দ তৈরি করেন না, তাঁর বাক্যের গঠন গড়ে ওঠে না আরোপিত বিন্যাসের শাসনে। তাঁর গদ্য ক্লান্তিহীন চর্চার ফসল হয়েও অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে প্রচেষ্টার চিহ্ন।' আর এজন্যেই পাঠককে তিনি এক ঘোরের মধ্যে ফেলতে পারেন।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক প্রবন্ধটি বারবার পড়েছি এবং প্রতিবারই এক ঘোরের মধ্যে সময় কাটিয়েছি। এখন আমরা চোখ ফেরাব 'রামায়ণ' এর দিকে। বুদ্ধদেব বসুর আরেক অসাধারণ সৃষ্টি 'রামায়ণ'। এটি এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ দিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ' এর মাধ্যমে তিনি ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জেনেছিলেন। এই রামায়ণ তার মানসপটে বিরাট এক ছায়া ফেলেছে— 'কী ভালো লাগতো সেসব নদী, বন, পাহাড়— পঞ্চবটী, চিত্রকূট— ছবির মতো এক একটি নাম— ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাথে তার পরিচয় ছোট্ট রামায়ণের পরে। বয়স যখন তার কৈশোরের কাছাকাছি তখন 'একখানা মূল বাল্মীকি' তিনি উপহার পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি না পড়তে পারার আক্ষেপ তিনি করেছেন এই ভাবে— 'অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি পড়ে দেখবো— অন্তত চেখে দেখবো— কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হয়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে।' তবে তিনি কখনো কৃত্তিবাসে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মনে করতেন 'কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তার কাব্যে রাম লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেবদানব রাক্ষসেরা সুদ্ধ বাঙালি চরিত্র, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ কাব্য বাঙালির মনের মতো হতে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব'লেও গণ্য হতে পারে।' অর্থাৎ কৃত্তিবাসের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তিনি রামায়ণ লিখতে গিয়ে মূলানুগমন করেন নি। রামায়ণকে তিনি নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। এতে করে মূল রামায়ণ বাংলায় এসে পাল্টে গেছে। তার মতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের চাইতে বাল্মীকি পড়া অনেক ভাল। কারণ তার মতে 'বিশ্ববাসী বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালি মাত্র, শুধু বাঙালি; অর্থাৎ বাঙাল।' তিনি প্রকৃত রামায়ণের সাধ পেতে জোর দিয়ে বলেছেন, 'আদিকবিদের চরিত্রলক্ষণ জানতে হ'লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ'তে হবে। কেউ যদি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে আদিকবির লেখা সেই মহাকাব্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে চান তবে মারাত্মক ভুল করবেন বলেও মন্তব্য করেন। অর্থাৎ যুগের পর যুগ ধরে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির মনে দোলা দিয়েছে তাকে এক কথায় উড়িয়ে দিলেন বুদ্ধদেব বসু। কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করতে গিয়ে বাঙালির মানস গঠন ও নানা ঐতিহাসিক কারণে অনেক কিছু বর্জন করেছেন, (যেমন : রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণের উক্তি, বনবাসের উদ্যোগের সময় সীতার উদ্দেশে রামের উক্তি, লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতার উক্তি, রাম লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেত না এমনকি অমাংসভোজনকে তারা বলতেন উপবাস, রাম নিজের হাতে সীতাকে মদ্যপান করাচ্ছেন... ইত্যাদি ইত্যাদি) সেই বর্জনগুলো অনেকের কাছে প্রশংসনীয় হলেও বুদ্ধদেব বসু তা সম্পর্কে বলেছেন, 'এই বর্জনে সেই আদিকবির আত্মা যে উবে গেল তাতে সন্দেহ নেই।' বোঝা যায় এই বর্জন বুদ্ধদেব বসু মেনে নিতে পারেন নি। তিনি রাজশেখর বসুকৃত বাল্মীকির অনুবাদ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখিয়েছেন কিভাবে মহাকাব্যের রস থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করেছেন কৃত্তিবাস। তার মতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্মম বাস্তবতা যা পৃথিবীর আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য— তা একমাত্র রামায়ণেই। এ প্রসঙ্গে তিনি মহাভারতের প্রসঙ্গে টেনে বললেন ব্যাপ্তিতে রামায়ণ অনেকটা ছোট হলেও কাব্য

হিসেবে এবং কাহিনী হিসেবেও তাতে ঐক্য বেশি— 'আমরা যাকে কবিতা বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। কিন্তু এটি বাল্মীকিরই রামায়ণ, মোটেও কৃত্তিবাসের নয়।' বাল্মীকির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন অন্যান্য চরিত্রের প্রতি তিনি উদাসীন, তার সমস্ত চিন্তার মূলে আছেন রামচন্দ্র। অন্য চরিত্রের প্রতি এই যে উদাসীনতা তা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন তার 'কাব্যে উপেক্ষিতা' নামে একটি রচনায়। এখানে লক্ষ্মণ ও তার স্ত্রী উর্মিলার উদাহরণ টেনে আনা যায়— লক্ষ্মণ তার অগ্রজের সেবা করতে বনে গেলেন, পরিত্যাগ করে গেলেন তাঁর সদ্যপরিণীতা স্ত্রী উর্মিলাকে। বিনা দোষে অযৌক্তিকভাবে সদ্যপরিণীতা যে স্ত্রী স্বামীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হল, সেই সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা রমণীটি চৌদ্দ বছর অন্যায়-বিরহের শিকার হবার পর মধ্যবয়সে যখন স্বামীর প্রত্যাগমনের খবর শোনে তখন কি সে শরীরে ও মানসিকতায় সেই নবপরিণয়ের রোমাঞ্চবিহ্বল নারীটিই থাকে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এমন গভীর অনুভব আমাদের বিচলিত না করে পারে না। কিন্তু বাল্মীকি তার প্রতি এতটুকু করুণা দেখালেন না' কিন্তু এই অভিযোগ অনেকটা খণ্ডন করে বাল্মীকির পক্ষে যুক্তি দিলেন বুদ্ধদেব বসু— 'রামচন্দ্রের প্রতি বেশি মনোযোগ থাকায় এসব খেয়াল করার দরকার হয়নি বাল্মীকির।'

অপরদিকে 'রামায়ণ' প্রবন্ধেও আমরা কিছু স্ববিরোধিতা দেখতে পাই যেমনটি পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল ও অন্যান্য প্রসঙ্গে। বাল্মীকির প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি কৃত্তিবাসকে খাটো করেছেন। আবার মাঝে মাঝে বাল্মীকিকেও ছি ছি করতে দেখি। সীতা লঙ্কাপুরী থেকে ফিরে আসার পর রামচন্দ্র তাঁকে কী বলেছিলেন সেটা বুদ্ধদেব বসু তার প্রবন্ধে রাজশেখর বসুর অনুবাদ থেকে তুলে ধরেন— 'তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও। আমি মতি স্থির করে বলছি লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাকে ইচ্ছা কর তাঁর সঙ্গে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি কর। সীতা তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিকাল ধৈর্যাবলম্বন করেনি' এই অংশ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মন্তব্য— 'ছী ছী— আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল করে বলে ওঠে ছী ছী! বিশেষ করে ওই শেষের কথাটা— লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও— কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী করে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন; আর তাই সীতা যখন উচ্চারণ করেন 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে' এতো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলের মনের কথা।' এরকম বলে বুদ্ধদেব তাঁর ক্ষোভ মেটালেন। আদিকাব্যের সত্যকে 'নিরঞ্জন প্রশান্তি' বলে প্রশংসা করলেও এখানে সত্যকে মেনে নিতে পারেননি বুদ্ধদেব বসু। এখানেই তাঁর স্ববিরোধিতা।

সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব সবসময়ই ছিল নেতিবাচক। তিনি এই সাহিত্যকে প্রাণহীন ও কৃত্রিম অনুশাসনে বাধা বলে অনুযোগ করলেও বাল্মীকির রামায়ণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন— কৃত্তিবাসের রামায়ণের চাইতে বাল্মীকির রামায়ণ উৎকৃষ্ট। এখানেও একধরনের স্ববিরোধিতা রয়েছে। এই স্ববিরোধিতা শুধু 'সাহিত্য চর্চায়' নয়। প্রায় সব সাহিত্য সমালোচনায় তিনি এরকম ভূমিকা রেখেছেন। এটিকে আমরা স্ববিরোধিতা না বলে বহুমুখী আলোচনা বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে কখনো একমুখী ছিলেন না। ভাল-মন্দ যাই তাঁর মনে হয়েছে তাই তিনি তুলে ধরেছেন। এরকমভাবে শুধু মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ কিংবা রামায়ণ নয়, বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন প্রবন্ধে চমকে দেয়া দুঃসাহসী মন্তব্য করেছেন। অতি সম্প্রতি

হীরেন চট্টোপাধ্যায় তার 'সমালোচনায় সেরা চমক বুদ্ধদেব বসু' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের যৌবনকালে আমরা রোমাঞ্চিত থাকতাম এমন চমকিত সব মন্তব্যের জন্য— চমকিত, এবং কোনও কোনও সময় স্ববিরোধে পীড়িত।' এর পরেও প্রবন্ধটির শেষে এসে তিনি লিখেছেন— 'আগ্রহী পাঠক গোটা লেখাটা পড়লেই বুঝতে পারবেন, শুধু চমকে দেবার জন্যেই তিনি লেখেননি, সেই মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো, অর্থাৎ নিজেকে ও পাঠককে প্রতারিত করার চেষ্টা তিনি করেননি। তাছাড়াও, বুদ্ধদেব বসুর পরিচিত পাঠক জানেন, তার রমণীয় গদ্যভঙ্গির একটা উত্তেজক আহ্বান আছে। সেই কারণেও তার সাহিত্য সমালোচনাগুলি আকর্ষণীয়।'

আধুনিকতার নান্দীপাঠ

কামরুল হাসান

বুদ্ধদেব বসু। তিরিশের পাঁচ মহৎ আধুনিক কবির একজন। তাকে বলা হয় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার ধাত্রী বা পরিচর্যাকারী। তিনি শুধু নিজেই কবিতা লিখেছেন তাই নয়, কবিদের সংঘবদ্ধ রেখেছেন, কবিতা লিখতে তাদের করেছেন অনুপ্রাণিত। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার চাতালে জড়ো হয়েছিল তখনকার নবীণ, প্রবীণ– সকল প্রতিশ্রুতিশীল কবিই। তিনিই শনাক্ত করেছিলেন জীবনানন্দ দাশের প্রতিভা, বরিশালের অজপাড়াগাঁ থেকে তাঁর কবিতা তুলে এনেছিলেন কলকাতার আলোঝলোমলো পৃষ্ঠায়। পাকা জহুরীর মতই তিনি চিনতেন কবিতার সোনাদানা। ১৯৫৪ সালে তিনি সম্পাদনা করেন *আধুনিক বাংলা কবিতা* নামক গ্রন্থ।

বাংলা কবিতার এটিই প্রথম সংকলন নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁরই তত্ত্বাবধানে কয়েকবারই *বাংলা কাব্য পরিচয়* নামে সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তার কোনটি প্রকাশিত হয়েছিল, কোনটি প্রকাশিত হয়নি, তবে সবগুলোই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল। লক্ষণীয় যে এসব সংকলনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেমের কবিতাকে এড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আধুনিক কবিতার একটি প্রবণতা হল, নর-নারীর দৈহিক ও মানসিক প্রেমকে অগ্রাহ্য করা। এছাড়া আর যে সব সংকলন বেরিয়েছিল, সেগুলো বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর শোভা বাড়ানো বা বিবাহবার্ষিকীতে উপহারযোগ্য হলেও, সিরিয়াস পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে নি।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সংকলনও এটি নয়। এর আগে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুবের যৌথ সম্পাদনায় বেরিয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সংকলন, সেই ১৯৪০ সালে। সেটি বুদ্ধদেব বসুর পছন্দ হয় নি বলেই নিজ উদ্যোগে সম্পাদনা করেছিলেন এই বই। দুটি গ্রন্থের মাঝে রুচির প্রভেদের কথা বলেছেন তিনি, বলেছেন শুধু আনন্দের জন্যই কাব্যচয়নে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজনের কথাও। আর সে কথা যে মিথ্যে নয়, তা প্রমাণিত হয় এই বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র নজরে পড়ে যায় সকল সচেতন পাঠকের, দ্রুতই শেষ হতে থাকে বিভিন্ন সংস্করণগুলো, কালক্রমে বইটি হয়ে ওঠে প্রায় কিংবদন্তিতুল্য। এর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার অজস্র সংকলন প্রকাশিত হলেও কোনটিই এতটা জনপ্রিয় ও প্রভাবসঞ্চারী হয়ে ওঠে নি।

নিজের কবিতার মতই এই সম্পাদিত গ্রন্থেরও অজস্র কাটাকুটি, পরিমার্জনা তিনি করেছেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই বেরিয়েছিল এর পাঁচটি সংস্করণ, কখনোই তুষ্ট হতে পারেন নি। যে বইটির আলোচনা এখানে করছি সেটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা*–র পঞ্চম সংস্করণের (যা প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে) তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ (জুলাই ১৯৯৮)। পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বইটির বিপুল

চাহিদা ও কাটতির নির্দেশক। বস্তুত আধুনিক বাংলা কবিতার অন্বিষ্ট পাঠক, সন্দিগ্ধ গবেষক সকলেই বারবার ছুটে গেছেন এই পুস্তকের কাছে।

বইটির প্রথম সংস্করণ বের হয়েছিল সেই ১৯৫৪ সালে, এর মাত্র দু'বছর পরেই বেরোয় দ্বিতীয় সংস্করণ। এতেই বোঝা যায় বইটি সাড়া ফেলেছিল, দ্রুতই শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথম সংস্করণ। এরও তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে বেরোয় তৃতীয় সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, আর আগেই বলেছি পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে। পরিশ্রমী এক জীবনের অনেক কাজ তখনো বাকি, অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল কত উদ্ভাসিত পরিকল্পনা। উর্ধ্বশ্বাস সময়ের সাথে পাল্লা দিয়েই প্রতিভার এক প্রজ্বলন ঘটেছিল জীবনের শেষ ক'টি বছরে যখন আরো অনেক কাজের ভিড়েও তিনি এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন ঘটিয়েছিলেন। জীবদ্দশায় এই পাঁচটি সংস্করণের সম্পাদনা তাঁর হাতেই হয়েছিল। এরপর যা বেরিয়েছে তা ঐ শেষ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ।

দ্বিতীয় সংস্করণেই অনেক পরিবর্তন আনেন তিনি, সংযোজন করেন ছয়জন নতুন কবিকে। এছাড়া প্রথম সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত কোন কোন কবির নতুন কবিতা নির্বাচিত করেছিলেন। প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ৪৯ কবির ১৭৬টি কবিতার বদলে এবার স্থান পেল ৫৫ জন কবির ১৯৬টি কবিতা, অর্থাৎ কলেবর বৃদ্ধি ঘটল বইটির। তৃতীয় সংস্করণে যোগ দিলেন আরো দু'জন নতুন কবি আর যোগ হল জীবনানন্দ দাশের আরো দুটি কবিতা ('বোধ' ও 'আদিম দেবতারা')। এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন নতুন কবিদের রচনার দিকে। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত এ গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলামের যে পাঁচটি কবিতা সংকলিত ছিল, দুঃখজনকভাবে চতুর্থ সংস্করণে সেসবের চারটিকে বর্জন করা হয়। এটা ঘটেছিল কোন সাহিত্যিক বিবেচনায় নয়, বরং আইনগত কারণে। নজরুলের রচনার গ্রন্থস্বত্ব যাদের দখলে ছিল, তারা অনুমতি না দেয়ায় সম্পাদক বাধ্য হয়েই ঐ কবিতা চতুষ্টয়কে বিদায় দিয়েছিলেন, পরিবর্তে সংযোজন করেছিলেন নজরুলের নতুন কবিতা। চতুর্থ সংস্করণে ছয়জন কবির– মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ কুমার সরকার, নরেশ গুহ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর– কবিতা সংখ্যা বাড়ানো হয়। পঞ্চম সংস্করণে যুক্ত হলেন দশজন নতুন কবি। এরা হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তারাপদ রায়, জ্যোর্তিময় দত্ত, প্রনবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া এ সংস্করণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা সংখ্যা বাড়ানো হয়। চতুর্থ সংস্করণে যে আইনগত কারণে নজরুলের কবিতা বাদ দেয়া হয়েছিল পঞ্চম সংস্করণে একই কারণে অর্থাৎ কবির অনুমতি না মেলায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা বাদ দেয়া হয়, পরিবর্তে নেয়া হয় তাঁর অন্য কবিতা।

আধুনিকতার উদ্ভব ইউরোপে, আরো বিশেষভাবে বললে, ফ্রান্সে। বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা ঐ ইউরোপীয় মনীষার ফসল। বাংলা কবিতায় আধুনিকতা তাই আরোপিত, আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ধরেই কৃত্রিম। জীবনানন্দ ছাড়া পঞ্চকবির কবিতা যতখানি মেধাকে উদ্দীপ্ত করে, হৃদয়কে ততখানি করে না। দার্শনিক কূটাভাষের ভেতর হারিয়ে গেছে কবিতার প্রাণ। ইউরোপে আধুনিকতা যেমন শিল্পের সকল মাধ্যম– কবিতা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতে প্রসারিত, বাংলায় তা হয় নি, বাংলায় যেটুকু আধুনিকতা তার বেশিরভাগটাই ঘটেছে কবিতায়, বাকিটুকু চিত্রকলায়।

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বিংশ শতাব্দী যেমন বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাফল্য দেখিয়েছে, তেমনি দেখিয়েছে অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। মানবসভ্যতার এই কঠিন সময়ে কবিকে হতে হয় জটিল মানসিকতার অধিকারী, আড়ালসম্পন্ন, অপ্রত্যক্ষ ও 'সমগ্র'-র ধারণাযুক্ত। আর এসব লক্ষণ আধুনিকতারই লক্ষণ। ইউরোপে আধুনিকতার উদ্ভব হয়েছিল একটি কালিক ও যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে, কিন্তু বাংলা কবিতায় তা হঠাৎই উদ্ভূত হয়, তাই আধুনিকতার অন্যান্য সকল লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এটা প্রধানত বিপর্যয়কারী বৈশিষ্ট্যের।

রোমান্টিকতা গুরুত্ব দেয় imagination বা কল্পনার ওপর। ব্লেক বলেছিলেন The True Vine of Eternity, The Human Imagination'। রোমান্টিকরা মনে করতেন কল্পনা ও কবিত্ব সমার্থক। আধুনিক কবিতার শুরু রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাই আধুনিক কবিতায় দেখা গেল প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতি যেহেতু মানবচৈতন্যের সৃষ্টি নয়, তাই আধুনিক কবিরা একে গুরুত্ব দেন নি। ইউরোপের একজন আধুনিক কবি রিলকে বলেছেন 'Art is a movement contrary to nature'- তাই বাঙালি আধুনিক কবি পরামর্শ দিয়েছেন 'প্রান্তরে কিছু নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে'। রোমান্টিকরা ছিলেন প্রেরণাবাদী, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'জীবনদেবতা'। 'আধুনিকেরা ঐশী প্রেরণাতে বিশ্বাসী নন, দৈববর্জনই তাদের সংকল্প'। নেতির গহ্বরে হারিয়ে গেছেন আধুনিক কবিরা। রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে পারেন নি, কল্পনা ছাড়া, প্রেরণা ছাড়া কী করে সম্ভব কাব্যরচনা? আশ্চর্য নয় যে এই গ্রন্থের সম্পাদক নিজে ঐশী প্রেরণায় বিশ্বাস করতেন।

কবিতা বিচারে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য, চিহ্ন ও উপকরণের ওপরই প্রথমত জোর দিয়েছেন। সংকলনের শিরোনামের দিকে তাকালে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এরপর তাকে টেনেছে বিষয় বৈচিত্র্য ও কাব্যভাষার নতুনত্ব; এ সংকলনে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলো কবিতা হিসেবে গৌণ, কম শিল্পিত বা আবেদনহীন, কিন্তু আঙ্গিকে বা কাব্যভাষায় স্বতন্ত্র। কবিতা হিসেবে না উৎরালেও সেগুলোর আছে অভিনব প্রকাশভঙ্গি। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেন 'আমাদের সাম্প্রতিক কবিরা কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল। এই বৈচিত্র্যের ওপর আমি একটু জোর দিতে চাই।'

আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রথম সংস্করণে লিখেন "এই আধুনিক কবিতা এমন কোন পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করা যায় ... একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মাঝে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।" কিন্তু প্রশ্ন হল আধুনিক কবি বিশ্ববিধানে আস্থাবান কিনা, কেননা ইউরোপে আধুনিকতার উন্মেষের কালে প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন শিল্পী ও কবিরা, তাদের কাছে ঈশ্বর ছিলেন মৃত। যে আধুনিকতা সংশয়ের, ক্লান্তির ও বিষাদের, তা আবার বিস্ময়ের, আনন্দের হয় কী করে? আধুনিকতার প্রবক্তা এভাবেই তৈরি করেন দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির।

কবিদের জন্মসাল অর্থাৎ বয়ঃক্রম অনুসারেই সাজানো হয়েছে এই গ্রন্থের সূচি। ফলে শুরুতেই আছেন, সবার মাথার উপরে আছেন যিনি, অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে রবীন্দ্রনাথকে পর্যাপ্ত আধুনিক নন বলে তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' গ্রন্থে ঠাঁই দেন নি হুমায়ুন আজাদ, তাকে দিয়েই শুরু এ জাতীয় সংকলনের

পথপ্রদর্শক বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থখানি। ১৮৬১ সালে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর এ সংকলনের তরুণতম কবি প্রনবেন্দু দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৩৭ সালে।

একটি সংকলনে গৃহীত কবি ও কবিতা সম্পাদকের কাব্যরুচী, মতাদর্শ ও সাহিত্যিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীল। কবিতারও রয়েছে অনেক প্রকারভেদ। সে হিসেবে কোন কবিতা তিনি কেন নির্বাচন করলেন সে প্রশ্ন তোলা হয়ত অবান্তর, তবু জনসমক্ষে প্রকাশিত যে কোন শিল্পকর্মই সমালোচনার যোগ্য। আমরা কেবল বলতে পারি একজন বিদগ্ধ গবেষক ও পণ্ডিত হিসেবে তিনি তার সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা তুলে আনতে চেয়েছেন, যে কবিতা আধুনিকতার শর্ত পূরণ করে। আধুনিক ফরাসি কবিতার জনক বোদলেয়ারের রচনা গভীরভাবে পাঠ ও সফলভাবে অনুবাদ বুদ্ধদেব বসুকে আধুনিকতার একনিষ্ঠ শিষ্য বানিয়ে ফেলে। তিনি আধুনিকতাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করে ফেলেন। ফলে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় তাকে কোন বেগ পেতে হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলো এখানে সংকলিত সেগুলো কবিগুরুর শেষ বয়সের রচনা। রোমান্টিকতার দীর্ঘ অধ্যায় পেরিয়ে আধুনিকতার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে তাঁর রচনা, তিনি অনুধাবন করছেন গীতিধর্মিতা ছেড়ে নতুন কবিতার প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ করছেন তরুণতর কবিদের বাঁকবদলের উন্মেষকাল। গ্রন্থটি শুরুই হয়েছে যে বইকে বলা হয় রোমান্টিকতার দীর্ঘ অধ্যায় শেষে কবিগুরুর নতুন জন্মের সাক্ষী, সেই 'লিপিকা'র টানা গদ্যে লেখা দুটি কবিতা 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' এবং 'একটি দিন' দিয়ে। যে গদ্য কবিতা নিয়ে আজকের তরুণ কবিরা হৈ-চৈ করছেন তার শুরুও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতেই, যিনি আধুনিকতার মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন অনেক ক্লাসিকাল সদ্‌গুণ। নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে দেখার ধরনকে তাঁর মনে হয়েছিল 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'। রোমান্টিক যুগের কাব্যের সাথে আধুনিক কবিতার তুলনা করতে গিয়ে তিনি একটি বাক্যে পার্থক্য নিরূপণ করে লিখেছিলেন, 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা'। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অরুণ মিত্রের 'অমরতার কথা' টানা গদ্যে লেখা।

যে কোন সংকলনে কবিতাসংখ্যা কবির গুরুত্বের সমার্থবাহী। সে হিসেবে সর্বাধিক ১৯টি কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতার পুরোধা কবি জীবনানন্দ দাশের। এরপরই ১৬টি কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমিয় চক্রবর্তীর। সম্পাদক হিসেবে নিজের কবিতার প্রতি দুর্বলতা এড়াতে পারেন নি কবি বুদ্ধদেব বসু। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৪টি কবিতা তাঁর নিজের (শেষ সংস্করণে ভুলবশত একটি লেখা বাদ না পড়লে তা ১৫ হতো)। কবি হিসেবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার প্রতি বুদ্ধদেব বসুর দুর্বলতা ছিল প্রকট। অবশ্য সে সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা বড় কবিসুলভ ভাবমূর্তি ছিল। কবির অনুমতি না মেলায় পূর্ববর্তী (অর্থাৎ প্রথম পছন্দের) কবিতা বাদ দিয়েও তিনি যে দ্বিতীয় পছন্দের তালিকা সাজিয়েছেন সেখানেও নিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ১০টি কবিতা। সমর সেন সময়ের বাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেও স্বল্পপ্রজ কবি, যিনি দ্রুতই লেখালেখি ছেড়ে দেন। একথা সত্যি, সমর সেন যে কোন আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনেরই অপরিহার্য কবি, কিন্তু তাঁর পুরো কাব্যকৃতির দিকে তাকিয়ে ১৩টি কবিতা নির্বাচন একটু বেশিই মনে হয়। সময়ের বিচারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতই তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছেন সমর সেন, কেননা কবিতা কেবল ভঙ্গির নয়, এর থাকা চাই দেহ ও

আত্মা। তবে আধুনিক কবিতার যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিথকথন, তা পুরোমাত্রায় ছিল সমর সেনের কবিতায়।

বন্ধুপ্রীতিও তাকে বিভ্রান্ত করেছে। তবে তিনি নিজেও এই পক্ষপাতিত্বের প্রতি সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন সে কথা। লিখেছেন 'সকলের রুচি একরকম নয়, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে।' অগুরুত্বপূর্ণ অথচ ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি অজিত দত্তের কবিতা নিয়েছেন ৮টি। মজার ব্যাপার হলো কল্লোল-পরবর্তী তিরিশের দশকের পঞ্চপাণ্ডবদের দু'জন ও বাংলা কবিতার দুই মহারথী সুধীন দত্ত ও বিষ্ণু দের কবিতাও রয়েছে ৮টি করে। সংখ্যার বিচারে অজিত দত্তকে তাঁদের সমান গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে মনে হতে পারে। অজিত দত্তের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন 'প্রগতি' পত্রিকা। অন্য বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা আছে ৫টি, আর তার প্রিয় শিষ্য নরেশ গুহর কবিতা আছে ৪টি। বস্তুত তাঁর কবিতার আড্ডায়, কবিতা পত্রিকার অফিসে ও বাড়িতে তখনকার প্রায় সব কবিই আসতেন, ফলে কবিতা বাছাই করতে তাকে তেমন বেগ পেতে হয় নি। বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ মিলে বিরাট এক আসরের মধ্যমণি ছিলেন তিনি। রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে তাঁর বাড়ি 'কবিতা ভবনে' চলত কবিদের জমজমাট আড্ডা।

এ সংকলনে নবীন কবিরা বেশ উপেক্ষিতই থেকেছেন। তাদের অনেকেরই কেবল একটি বা বড়জোর দুটি লেখা নেয়া হয়েছে। জীবনানন্দ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিমান চার কবির একজন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নেয়া হয়েছে মাত্র তিনটি, বিনয় মজুমদারের একটি (অবশ্য এ সিরিজ কবিতাটির পাঁচটি পর্ব আছে) আর উৎপল কুমার বসুর কোন কবিতাই নেয়া হয় নি। এমন নয় যে সে সময়ে লোকচক্ষুর আঁড়ালে ছিল উৎপল কুমার বসুর কবিতা। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'চৈত্রে রচিত কবিতা', ১৯৬৪ সালে 'পুরী সিরিজ'। অবশ্য তখনো কাব্যাঙ্গনে পরিস্ফুট হন নি জয় গোস্বামী। অন্যান্য শক্তিমান কবিদের মাঝে শঙ্খ ঘোষের তিনটি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ৪টি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৩টি করে কবিতা রয়েছে।

এ সংকলনে বিস্ময়কর ও দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত বাঙালি মুসলমান কবিরা। কাজী নজরুল ইসলাম, ও জসীমউদ্‌দীন ছাড়া আর কোন বাঙালি মুসলমান কবির কবিতা এতে নেই। অন্য ও একমাত্র মুসলমান কবি হলেন হুমায়ুন কবির (ভারতের)। সে সময়ে অর্থাৎ প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়ে অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাঙালি মুসলমান কবি ছিলেন না, কিন্তু তখনো দ্যুতিময় ছিলেন আবুল হোসেন, যিনি চল্লিশের দশকেই লিখে ফেলেছেন 'ডি এইচ. রেলওয়ে' বা 'ব্যাংককে বৃষ্টি'র মত কবিতা। ছিলেন আহসান হাবীব, ফররুখ আহমেদ প্রমুখ মনেপ্রাণে আধুনিক কবিরা। আরো দুঃখজনক হলো ৬৭ জন কবির এ সংকলনে একজনও বাংলাদেশের কবি নেই। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে যখন এ গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত, ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে পঞ্চাশ ও ষাটের দুটো উজ্জ্বল দশক। পঞ্চাশের দশকের তিন শক্তিমান আধুনিক কবি শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী ও আল মাহমুদ যে কোন বিচারেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন বাংলাদেশের ষাটের বেশ ক'জন শক্তিমান কবি, যারা মতাদর্শে ও রচনায় পুরোপুরি আধুনিক। হতে পারে তিনি বাংলাদেশের কবিদের রচনাকৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু একজন সুযোগ্য সম্পাদক হিসেবে স্বাধীন ও পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের একই ভাষার লেখালেখির খবর তিনি রাখবেন না এটা ভাবা দুঃসাধ্য। সে হিসেবে এই

সংকলন পূর্ণতা পায়নি, হয়ে ওঠে নি বাংলা ভাষার কবিদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন। একই বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ করি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা কবিতা সমুচ্চয় ২ গ্রন্থে (১৯৯৩-এ প্রকাশিত)। বাংলা কবিতা সমুচ্চয় দুটি খণ্ডে প্রকাশিত। এর প্রথম খণ্ডটি মধ্যযুগ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। এ খণ্ডের সম্পাদনা করেছেন সুকুমার সেন। দ্বিতীয় খণ্ড, যেটি সম্পাদনা করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তা আধুনিক কবিতারই সংকলন, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে কনিষ্ঠতম ঈশিতা ভাদুরী (জন্ম ১৯৬১) পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত। এখানেও একজন বাংলাদেশের কবিও নেই। বাংলা কবিতা যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কবিতা নয়, তা বোঝা উচিত যে কোন সম্পাদকের।

সাধারণত এ ধরনের সংকলনে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমানো বা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না করার তাগিদে কবিদের অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের লেখা নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে এটা ঘটে নি। সম্পাদক যে কবিতাকে উপর্যুক্ত মনে করেছেন সে কবিতাই নিয়েছেন, কবিতার দৈর্ঘ্যের দিকে তাকান নি (অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতাটির অংশবিশেষ বা সংক্ষেপিত রূপ নেয়া হয়েছে)। গদ্যছন্দে লেখা নিরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ' থেকে নেয়া রবিঠাকুরের দুটো কবিতাই ('বাঁশি' ও 'সাধারণ মেয়ে') দীর্ঘ, দশপর্বে রচিত 'শিশুতীর্থ'-র দশটি পর্বই তিনি রেখেছেন। মোহিতলাল মজুমদারের দীর্ঘ কবিতা 'পান্থ' থেকে নিয়েছেন পনেরটি পর্ব। দীর্ঘ কবিতার এ তালিকায় আছে সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'সংবর্ত' ও 'যযাতি' (অংশ), তাঁর নিজের 'বন্দীর বন্দনা' থেকে অংশবিশেষ, 'শীতরাত্রির প্রার্থনা', নিশিকান্তের 'পণ্ডিচেরির ঈশানকোণের প্রান্তর', বিষ্ণু দের 'টপ্পা-ঠুংরি', 'ক্রেসিডা' ও 'পদধ্বনি', কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের দীর্ঘ কবিতা 'দিনযাপন'-র অংশবিশেষ।

এ সংকলনে অনেক গৌণ কবি আছেন আর সে তালিকাটি হ্রস্ব নয়। আছেন সুধীরকুমার রায়চৌধুরী, রাধারানী দেবী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিরাম মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ। সংকলনে ঠাঁই পেলেও বাংলা কবিতার প্রবাহে হারিয়ে গেছেন তারা অনেকেই, তবে যে সময়ে বুদ্ধদেব বসু এই কাব্য সংকলন তৈরি করছিলেন তখন এই কবিরা সচল ছিলেন, ছিলেন আলোচিত আর একজন সম্পাদকের পক্ষে ভবিষ্যৎ বলে দেয়া সম্ভব নয়। এমনও হয়েছে যাদের তিনি পঙ্‌ক্তিযোগ্য ভাবেন নি, তাদের অনেকেই উঠে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয় আর পঙ্‌ক্তিযোগ্যরা হারিয়ে গেছেন কালের নিষ্ঠুর আঁধারে। তবে কেবলমাত্র এই সংকলনে ঠাঁই পাবার কারণেই তারা অনেকেই আজো আলোচনার ভেতর রয়ে গেছেন. হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের অংশ। এই বই তো এখন ইতিহাসই। এখানে স্মতর্ব্য যে, কল্লোল-পরবর্তী পাঁচ কবির কাব্যকৃতি নিয়ে দীপ্তি ত্রিপাঠী যে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তার পি এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য, যা পরে বই আকারে (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়) প্রকাশিত হয়ে মনোযোগ টেনেছিল সকল অনুসন্ধিৎসু ও সিরিয়াস পাঠকের, যা এখন প্রায় একটি ঐতিহাসিক দলিল, তেমনি সৌভাগ্য অর্জন করেছে বুদ্ধদেব বসুর এই বই।

এটা আশ্চর্যকর যে ছড়া ও কবিতার ভেতর বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি এ গ্রন্থে সুকুমার রায়ের ৫টি বিখ্যাত ছড়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ছড়া হিসেবে এগুলো যে কালোত্তীর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিতা হিসেবে? ছড়াগুলো পাঠ করলে এদের কাব্যগুণ ধরা পড়ে সত্যি, তবু প্রশ্ন থেকে যায় ছড়াকে কবিতার মর্যাদা দেয়া যায়

কি না এবং আধুনিক কবিতার একটি সংকলনে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তি যৌক্তিক কিনা। একইভাবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত ছড়া 'খুকু ও খোকা' এবং 'কাঁদুনি' নিয়েছেন। অভিনব কিছুর প্রতি দুর্মর আকর্ষণ ছিল বুদ্ধদেব বসুর। তাইতো বইয়ের উৎসর্গপত্রে রচিত অভিনব চার পঙ্‌ক্তিও তিনি অবলীলায় তুলে এনেছেন এ বইতে।

তবে আধুনিকতার যে সংজ্ঞা বুদ্ধদেব বসু এই বইয়ের ভূমিকায় দিয়েছেন তা তিনি নিজেই রক্ষা করেন নি। করলে এ গ্রন্থে ঠাঁই পেতেন না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও জসীমউদ্‌দীন। এ নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। আধুনিকতার কাব্যসংকলনে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ। আর পল্লীকবি খ্যাত জসীমউদ্‌দীন সে অর্থে আধুনিক কবিই নন। যে যুক্তিতে বুদ্ধদেব বসু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত বইটিকে পাশ কাটিয়ে যান, সে যুক্তিতে তাঁর বইও কাটা পড়ে অনেকখানি। সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথ মূলত ও প্রবলভাবে রোমান্টিক কবি, আধুনিক কবি নন। যদিও তাঁর শেষ বয়সের কবিতা আধুনিকতার দিকে ক্রমশ ঝুঁকছিল, তবুও এই যুক্তিতে তাঁকে বাদ দিয়েই নিজের সংকলনটি সাজিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ। তিনি আধুনিকতার সংজ্ঞাকে সংকুচিত করেছেন, ভেবেছেন এটি একটি আঁটোসাঁটো কামরা, যার ভেতরে এমনকি রবীন্দ্রনাথও আঁটেন না। অপরদিকে বুদ্ধদেব বসুর আধুনিকতার সংজ্ঞা বেশ প্রসারিত, তিনি একে কোন আঁটোসাঁটো কামরা মনে করেন নি। তাই তিনি কিছুটা রোমান্টিক, কিছুটা আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছেন আধুনিকতা হিসেবেই। বুদ্ধদেব বসু নিজেও অনেকখানি রোমান্টিক ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কবি হিসেবে তার খ্যাতি ছিল, ছিল পলায়নবাদী হিসেবে বদনাম, যিনি বিষ্ণু দে বা তৎকালীন বেশিরভাগ বামঘেঁষা বুদ্ধিজীবীর মত কখনো মার্কস্‌বাদ বা সমাজতন্ত্রের রাস্তায় হাঁটেন নি। তার আধুনিকতার ভেতরে প্রেমের ও প্রকৃতির কবিতাও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে।

কল্লোল-পরবর্তী বাংলা কবিতার যে দুটো প্রধান ধারা– একদিকে সুধীন দত্তের মেদহীন বুদ্ধিদীপ্ত কবিতার ঝলক, অন্যদিকে জীবনানন্দের কিছুটা পৃথুলা হৃদয়গ্রাহী কবিতার আবেদন– দুটোর প্রতিই বুদ্ধদেব বসু আগ্রহী ও বিশ্বস্ত থেকেছেন। তিনি ছিলেন এ দুই মেরুর মাঝে এক অনিবার্য সেতুবন্ধের মত। সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতা যেমন তাকে টেনেছে, তেমনি জীবনানন্দের দৃশ্যগন্ধময় নির্জন কান্তারেও তিনি আনন্দে বিচরণ করেছেন। বিষ্ণু দে-র মিতবাক যেমন তাকে মুগ্ধ করেছিল, তেমনি মুগ্ধ করেছিল অমিয় চক্রবর্তীর নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ। গীতধর্মিতার সংকোচনের কারণে যাঁর কাছে ঠিক আগের সংকলনটিকে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল, তিনি যে গীতধর্মিতাকে জুড়ে দিবেন তাঁর সংকলনে তা আর আশ্চর্য কী? সংকলনে পাঁচ কবির প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাই তিনি নিয়েছেন । তবে যে সকল কবিদের মাত্র একটি বা দুটি লেখা নিয়েছেন তাদের অন্য গুরুত্বপূর্ণ লেখা বাদ পড়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত গ্রন্থটিকে আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সংকলন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েও হুমায়ুন আজাদ বলেছেন এটি এমনকি কাজ করেছে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধেও। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তিকে এক ভ্রান্তি হিসেবেই দেখছেন তিনি। কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি বিরোধিতা করেছেন প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীনের অন্তর্ভুক্তিরও। এঁদের আধুনিক কবি বলতে তিনি নারাজ। তার মতে উপরোল্লিখিত কবিরা বিশ শতকে

লেখালেখি করলেও আধুনিক হতে পারেন নি। হুমায়ুন আজাদের মতে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আনয়ন করেন কল্লোল-পরবর্তী বাংলা ভাষার পাঁচ মহান কবি। নিজের সম্পাদিত সংকলনটি তিনি কেবল এই পাঁচ কবিকে উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই পাঁচজনের যত কবিতা নিয়েছেন (১০০টি) অন্য ৩৯জন কবির সবাইকে মিলে নিয়েছেন এর চেয়ে মাত্র ২৯টি বেশি কবিতা। তাঁর সংকলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল. তিনি দু'বাংলা থেকেই কবিতা নিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসুর সংকলনটির মত একপেশে হয়ে পরে নি তার সংকলন। তবে এই দুই সম্পাদকের কবিতা নির্বাচন বেশ মিলে যায়। আর যেহেতু বুদ্ধদেব বসুর সংকলনটি হুমায়ুন আজাদের সংকলনের ঢের আগে প্রকাশিত, তাই কে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা বোঝাই যায়। বা হয়ত হন নি, অর্থাৎ আধুনিক বাংলা কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা ঐ কবিতাগুলোই। মূলত বাংলা কবিতার একটি উৎকৃষ্ট সংকলন তৈরি করতে গিয়ে তাঁর এমন উপলব্ধিও হয় যে, বাংলা কবিতা মাঝারি ও নিম্নমাঝারি মাপের, যেখানে কবিতার চেয়ে অকবিতাই বেশি।

হুমায়ুন আজাদের মতে, বুদ্ধদেব বসুর এই সংকলনটির দুটি প্রধান ত্রুটি হল ১. এটি মিশ্রণ ঘটিয়েছে আধুনিক ও প্রথাগত কবিতার, ২. এতে সন্নিবেশিত হয়েছেন অনেক অকবি। আমি তাদের অকবি বলব না, বলব প্রথাগত বা দুর্বল কবি। মিশ্রণ ঘটেছে এ কথা সত্যি, তবে তা সামান্যই, আধুনিকতার সম্প্রসারিত সংজ্ঞার ফলেই। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে সময়ের সাথে পাল্টে যান একজন কবি ও তার কবিতা। যিনি প্রথাগত কবিতা লিখে চিহ্নিত হয়েছেন, তিনিও লিখতে পারেন আধুনিক কবিতা, এবং তাই হয়েছে। আধুনিকতার লক্ষণ ও চিহ্ন ছাড়া বুদ্ধদেব বসু কারো কবিতা নিয়েছেন বলে মনে হয়নি।

একথা সত্যি যে আধুনিকতা কোন কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়, 'কালের মাপকাঠি দিয়ে আধুনিক কবি ও কবিতার সুষ্ঠু বিচার হয় না।' এ সংশয় নিরসনে পশ্চিমের কাব্যসমালোচকেরা আধুনিক কবিদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১. আধুনিক কবি (মডার্ন পোয়েট) এবং ২. আধুনিকতার কবি (মডার্নিস্ট পোয়েট)। প্রথমটির সাথে ঐতিহাসিক কালের সম্পর্ক, দ্বিতীয়টির সাথে নব্য মানসিকতার সম্পর্ক। অথচ হুমায়ুন আজাদও এসে থেমেছেন তাঁর নিজের দশক ষাটে, যেন আধুনিক কবিতা কালের ফ্রেমে বন্দী এক চাকা, যা আর ঘুরবে না। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ষাট পর্যন্ত চলল আধুনিকতার বিজয়রথ, এরপরে, তাঁর মতে, তা মুখ থুবড়ে পড়ল (বা আটকে গেল ষাটের কাদায়)। তাঁর মতে শত বছরের বাংলা কবিতা যে সোনা ফলাতে পারে নি, তা ফলিয়েছে বিংশ শতাবদীর প্রথম সাড়ে ছয় দশক। আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ একে বহুমাত্রিক, আন্তর্জাতিক, একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, বিমানবিক (অমানবিক অর্থে নয়) উল্লম্ফনবাদী, অভিনব, এমনকি বিপর্যয়কারী বলেছেন। হুমায়ুন আজাদের সংকলনটির সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তিনটি। ১. আধুনিকতাকে অনেক সঙ্কুচিত অর্থে দেখা, ২. কবিতা নয়, কবিকে বিচার করে কবিতা নির্বাচন ৩. নিজ দশকের প্রতি পক্ষপাত। বুদ্ধদেব বসুর মত তিনিও সংকলিত করেন নি উৎপল কুমার বসুকে।

আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছি, পাকা জহুরীর মতই তিনি চিনতেন কবিতার সোনা। তার সম্পাদিত 'কবিতা' ও অন্যান্য পত্রিকার পাতাগুলো সাক্ষ্য দেয় একথার। কিন্তু এ সংকলনে কবিতা সন্নিবেশিত করতে গিয়ে তিনি তাঁকে ঘিরে থাকা বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের প্রভাব, মাথার উপরে থাকা রবীন্দ্রনাথ এবং সেসময়ে বড় কবির

ভাবমূর্তিধরা সিনিয়র কবিদের এড়াতে পারেন নি। পারেন নি প্রচলিত কবিতার প্রভাববলয় ভেঙে নির্মম হতে বা নবীন রচনার প্রতি আরো সাহসী হাত বাড়াতে। প্রথম সংস্করণে নবীন প্রতিভাবান কবিদের কবিতা সংকলিত করা না গেলেও পঞ্চম সংস্করণে তা সম্ভব ছিল, তিনি অংশত তা করেছেনও।

এই কাব্যসংকলনের পাঁচটি সংস্করণ ও সুপ্রচুর পুনর্মুদ্রণ এ কথাই বলে দেয়, যে পাঠক আধুনিক কবিতার পাঠ নিতে চেয়েছেন তিনিই দ্বারস্থ হয়েছেন এ গ্রন্থের। কালক্রমে এটি হয়ে উঠেছে আধুনিক কবিতার বাইবেলের মত। বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতা এরপর অনেকদূর এগিয়েছে। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সংগঠক, সম্পাদক– বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদক পরিচয়টি ঐতিহাসিক ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থ তার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্যবাহী।

তথ্যসূত্র

১. আধুনিক বাংলা কবিতা, সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু, পঞ্চম সংস্করণ (পরিবর্ধিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।
২. আধুনিক বাঙলা কবিতা, সম্পাদনা হুমায়ুন আজাদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭।
৩. বাংলা কবিতা সমুচ্চয়, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩।
৪. বাংলা আধুনিক কবিতা, সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায়, সাহিত্যম, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯২।
৫. আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, অশ্রুকুমার সিকদার, তৃতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বাংলা ১৩৯২।
৬. বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা নরেশ গুহ, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮০।

আত্মতার বন্দীই মূলত

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় [১] নামের দীপ্তি ত্রিপাঠি-রচিত প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। বুদ্ধদেব বসু-র বয়স তখন পঞ্চাশ, তাঁর কাব্যখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত; পুনরপি *বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*[২] নামের প্রবলপ্রতাপী ও প্রভাবক অনুবাদগ্রন্থ, যেটি অচিরেই উভয় বাংলার তরুণদের 'আঁখি হতে ঘুম' হরণ করে নেবে, প্রস্তুয়মান, এবং তাঁর সামনে 'পথ রুধি' কোনো 'রবীন্দ্র ঠাকুর' বর্তমান নেই। সেই ঘটনার পর আরও পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে; শতাব্দী-ক্রান্তির অন্য আলোয় বুদ্ধদেব বসুকে শুধু নয়, সমগ্র আধুনিক কাব্যমণ্ডলকে পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয় দূরপ্রেক্ষা আমরা অর্জন করতে পেরেছি বলে আমার ধারণা।

ত্রিপাঠি তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার নাম দিয়েছেন আধুনিক বাংলা কাব্য। এরও পাঁচ বছর আগে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং তাঁর *আধুনিক বাংলা কবিতা সংগ্রহ*-র ভূমিকায় আধুনিক কবিতার সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা করেছেন এভাবে : "... এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"[৩] এই সংজ্ঞায়ন যে দ্বিধাগ্রস্ত মাধবীর মতো দোলাচলে দীর্ণ তা বেশ বোঝা যায়। ত্রিপাঠি, বুদ্ধদেবের অনুরাগিণী গবেষক, তাঁর বইতে এই দোলাচলকে ঢাকতে চেয়েছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধদেবের মন সহজে বুঝতে পারি। ইউরোপীয় আধুনিকবাদ (আধুনিকবাদ শব্দটি বুদ্ধদেব বা ত্রিপাঠি কেউই ব্যবহার করেন নি) কবিতার যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করেছে সেখানে "বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ" প্রভৃত থাকলেও, "বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি" রয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। বিশ্ববিধানে, এবং এর নিয়ন্তার অস্তিত্বে আস্থাকে ভূমিহীন করার মধ্য দিয়েই অথবা এর ভূমিহীন হওয়ার কারণেই আধুনিক কবিতা তাঁর স্থান করে নিয়েছে নৈরাশ্য আর সংশয়ের পোড়োজমিতে। "আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ" দেখে "বিস্ময়ে" যাঁর প্রাণ জেগেছিল তিনি তো "প্রাগাধুনিক" মানুষ রবীন্দ্রনাথ, যাঁর চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করার মধ্যেই তো ছিল বুদ্ধদেব বসুদের বিদ্রোহ। দীপ্তি ত্রিপাঠি আধুনিক কবিতার যে-লক্ষণসংহিতা রচনা করেছেন সেই দ্বাদশ লক্ষণের মধ্যে "বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি" নেই, বরং আছে "ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস"। বুদ্ধদেব বসুকৃত আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এক আলোচক লিখেছেন, "নিজের হাতে যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু

সে আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় তিরিশ বছর পরে (১৯৫৩) তাঁর এই দায়সারা উক্তি কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে। তবে কি তিনি নিজেও সংশয়মুক্ত ছিলেন না তাঁর কালিক ভূমিকা সম্পর্কেও। লক্ষ করার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব আধুনিক কবিতাকে 'সামাজিক জীবন সংগ্রাম আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা' বলেও বর্ণনা করেছেন। তাহলে কি তাঁর আধুনিকতায় 'আধুনিক আমি ও ভোলতেয়ারীয় আমি'র সমন্বয় ঘটেছিল?"[৪] এর সাথে আমরা যুক্ত করতে পারি আমাদের সংশয়। একদা তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিকবাদকে আবাহন করতে গিয়ে কবিতার যে-অন্বিষ্ট স্থির করেছিলেন, তাতে প্রাধান্য ছিল নন্দনবাদিতার, কবির আত্মতার সগর্ব প্রতিষ্ঠা এবং কবিতাকে সমাজপ্রসঙ্গ, নৈতিকতা ও উপযোগিতাবাদ থেকে মুক্ত করে আনন্দের সাহিত্যের আয়োজন। সেখানে "বিদ্রোহের, প্রতিবাদের" কোনো স্থান ছিল না। বুদ্ধদেবের কবিতায় "সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের" চিহ্ন নেই; প্রেমের অসংবৃত উচ্ছ্বাসে আবিল তাঁর প্রথম যৌবনের কবিতা। (স্মর্তব্য, 'সেরেনাদ', 'কঙ্কাবতী' প্রভৃতি কবিতায় "কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী গো" ধরনের আর্তনাদ। বস্তুত, বুদ্ধদেব যে নজরুলের কবিতা সম্পর্কে *কালের পুতুলে* মন্তব্য করেছিলেন, "একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল"[৫], তা তাঁর নিজের প্রেমের কবিতা সম্পর্কেও অনেকটা প্রযোজ্য।) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সহজ-শনাক্তিচিহ্নাভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে, সশ্রদ্ধ বিনয় সত্ত্বেও, এরকম লিখেছেন :

> "সুধীন্দ্রনাথ বললেই যেমন অনিবার্য মনে পড়ে 'উটপাখি', জীবনানন্দের সঙ্গেই যেভাবে গ্রথিত হয়ে আছে 'বনলতা সেন' বা 'আট বছর আগের একদিন', বিষ্ণু দে বলতেই যেমন 'ঘোড়সওয়ার' সাধারণ পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে উত্তাল– ঠিক সে রকম কোনো একক কবিতাকে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিনিধি বলা যায় কিনা– 'বন্দীর বন্দনা' বা 'দময়ন্তী' স্মরণে রেখেই বলছি – সন্দেহ। আবার সুধীন্দ্রনাথের মতো বাণী বিন্যাস, অমিয় চক্রবর্তীর মতো নব ছন্দ বুদ্ধদেব আয়ত্ত করার জন্য আগ্রহী ছিলেন না। এবং আরো দেখি, সুধীন্দ্রনাথের ছদ্ম-বিবিক্ততার গুরুভার তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, বিষ্ণু দে-র মণীষা-দীপ্ত বিশ্ব-সংস্কৃতি পর্যটনের সঙ্গে তার পরিক্রমার কোনো মিল হল না, জীবনানন্দের আত্মনিমগ্নতা কখনো কখনো তাঁকে ছুঁয়েছে বটে, কিন্তু কোনো পরাবাস্তবের গহনে তিনি ডুব দেন নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ করেছেন যদিও অমিয় চক্রবর্তীর উত্তরাধিকৃত ও অর্জিত আস্তিক্য, কিন্তু তিনি তাতে দীক্ষা নেন নি। এক বিনম্র আত্মস্থতা তাঁর চরিত্রের এবং কবিত্বের অভিজ্ঞান। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও।"[৬]

এহেন বুদ্ধদেব যখন *আধুনিক বাংলা কবিতা সংগ্রহ* সম্পাদনা করছিলেন, তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন এক বিপুল আয়রনির মধ্যে। তাঁর নিজস্ব আধুনিকতার ধারণার সাথে তাঁর সহযাত্রী-অনুগামীদের মিল নেই, এবং তাঁর আত্মতা ও অহংনির্ভর কলাকৈবল্যবাদ কোনো পরিসর পায় নি বাংলা আধুনিক কবিতায়। ঐ সংকলনটির সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্বের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হলেও এক-অর্থে তাঁর নিজের কাব্য-ethos-এর মর্মান্তিক পরাজয়ের স্মারকও বটে। না হলে, কিমাশ্চর্যম, তিনি জসীমউদ্‌দীনের কবিতাকেও তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন! তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছিলেন যে, আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁর প্রকল্পিত অতি-নান্দনিকতার পথে মোটেই এগোয় নি, বরং বহু বিরুদ্ধপ্রবণতার প্রবল সংঘাতে ও মিথষ্ক্রিয়ায় এক আশ্চর্য জটিল রসায়ন হয়ে উঠেছে– যার অংশভাক্ হওয়ার সাধ্য তাঁর আর ততদিনে অবশিষ্ট নেই।

বুদ্ধদেব বসুর সংজ্ঞায়নে বরং ফিরে যাই। বুদ্ধদেব তাঁর সংকলনে আধুনিক কবিতার সংজ্ঞাকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন সমকালীন প্রায় সব কবিকে এক চাদরের নিচে নিয়ে আসার জন্য। না হলে অমিয় চক্রবর্তীর মতো পরম আস্তিক, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'-এর মতো আশাবাদে বিশ্বাসী অদ্বৈতবাদীকে, তাঁর সকল ভাষিক লক্ষণ, স্প্রাঙ রিদমের মতো শেষ-ভিক্টোরীয় ছন্দকৌশলসহ এবং সত্ত্বেও, আধুনিক কবিতার প্রতিভূ হিসাবে সামনে আনা কঠিন হতো। মডার্নিস্ট কবিতার বিশ্বপ্রেক্ষাপটের সাথে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা যে কিছুটা অসামঞ্জস একথা দীপ্তি ত্রিপাঠিও বলেছেন।

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতাকে ও সেইসঙ্গে আধুনিক কবিদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এরকম একটি সযত্নরচিত মিথ প্রবল হয়েছে দীপ্তি ত্রিপাঠি-র গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রায় ধর্মগ্রন্থের মতো এই বইটি পাঠ করে। তাঁদের চিন্তায় অনপনেয় মুদ্রিত হয়ে যায় একজন কাব্য-ক্রুসেডারের ছবি, যিনি বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের 'কুপ্রভাব' থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিকতার আঙিনায় মেলে দিয়েছেন; যেন তিনি সেই অপেক্ষিত ভাগীরথ, যার অবর্তমানে বাংলা কবিতার স্রোতস্বিনী শুকনো চড়ায় আটকে যেত। "প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রগতি পত্রিকায় তিনি আধুনিক কাব্য-যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন এবং বাধাবিঘ্ন সত্ত্বে আজও নৈষ্ঠিক ঋত্বিকের মতো সে-অগ্নি রক্ষা করে চলেছেন। অজস্র কবিতা তিনি রচনা করেছেন, একমাত্র কবিতার জন্যই বিশ বছরের অধিক কাল পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন, কাব্য আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক বহু কবিকেই রসিকসমাজে পরিচিত করেছেন এবং সহৃদয়ীসংবাদী পাঠকগোষ্ঠী সৃজন করেছেন।"[৭] অনস্বীকার্য : বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবি ও কবিতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর রচনাবলীর বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যও তাঁর বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর। কিন্তু সেইজন্য তাঁকে তিরিশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা যায় না। তাঁর নিজের কবিতায় আধুনিকবাদের যে-রূপটি তিনি ধারণ করেছেন সেটি তিরিশের অন্য কবিদের থেকে আলাদা। আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রার্থিতও বটে, কিন্তু যে ব্যাপারটি বিস্ময়কর সেটি হলো অন্য সকল কবির কাব্যাদর্শ, ভাষা ও আঙ্গিক ক্রমবিবর্তমান হলেও এবং শৈল্পিক পরিণতির দিকে অগ্রসরমান হলেও বুদ্ধদেবকে মনে হয় এক জায়গায় স্থির; তাঁর কোনো বিবর্তন নেই। একই প্রগল্ভ উচ্ছ্বাস *বন্দীর বন্দনা* থেকে *মরচে পড়া পেরেকের গান* পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত মানসিক দ্বন্দ্ব যা আধুনিকবাদী কবিতার একটি মৌল লক্ষণ। জীবন ও ভালোবাসার অদ্বৈতে বিশ্বাসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছেন শরীরী প্রেমের কবি, নারী ও বাণীরে তাঁর এক মনে হয়েছে সারা জীবন। কিন্তু জীবন মানেই নারী অথবা নারীর প্রেম, এটি একটি বিষম সমীকরণ, একটি একদেশদর্শিতা। জীবনের আরো বহুতল আছে, আছে মানুষের নানাবিধ আস্তিত্বিক-সামাজিক সংকট। তিরিশের অন্য কবিরা, এমনকি সুধীন্দ্রনাথের মতো নিবিষ্ট প্রেমের কবিও সেইসব প্রস্তাবনাকে কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর *বেলা অবেলা কালবেলা* ও *সাতটি তারার তিমির* পর্যায়ে মহাপৃথিবী ও মহাকালের অনুধ্যান করেছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রেমের কবিই থেকে গেছেন আজীবন– ব্যাপারটি এক অর্থে সংবর্ধনাযোগ্য হলেও সামূহিক বিচারে মনে হয় বুদ্ধদেবের মতো বিরলপ্রতিভ মানুষের জন্য এক বিরাট অপচয়, এবং বাংলা কবিতার ক্ষতি। এর একটি কারণ প্রেমের কবিতাতে তিনি নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেন নি, আনতে পারেন নি

এমন কোনো সুর যা আমরা রবীন্দ্রনাথে শুনি নি, কেবল রিরংসা ও দেহবাদিতার ফ্রয়েডবাহিত অনুষঙ্গটি ছাড়া। অবশ্য সেটিও কল্লোলের কবিকুল তথা মোহিতলালের কবিতায় প্রবলভাবেই মূর্ত হয়েছিল। এক সমালোচকের ভাষায়, "বুদ্ধদেব, আবাল্য আধুনিকতার পুরোহিত সামাজিকতাকে পরিত্যাজ্য ভাবেন, ফলে কবিতার জগৎ এসে সীমিত হয়ে পড়ে 'প্রেম' নামক বিশেষ একটি চিত্তবৃত্তির বৃত্তে, তারও অভিনবত্ব মোহিতলালের দেহবন্দনামূলক 'বিস্মরণী'র কবিতায় পূর্বাহ্নে আমরা দেখে নিয়েছি, তার স্বাদ ভাওয়ালের স্বভাবকবির কবিতা থেকে ইতিমধ্যেই চেখে নিয়েছি আমরা।"[৮] এলিয়ট-প্রেমী বুদ্ধদেব তাঁর গুরুর কাছাকাছিও আসতে পারেন নি আধুনিক চৈতন্যের দ্বিধাসংকট চিত্রায়ণে : এলিয়টের প্রুফ্রক যে-দ্বিধার করাতে দ্বিখণ্ডিত, যে ক্ষণিক উৎসাহ এবং পরক্ষণের অনিবার্য নির্বেদ ও নৈরাশ্যের কাঁটায় "কলে-পড়া জন্তুর মতো অসহায়"[৯] মোচড়ায় সে ("Do I dare/Disturb he universe?/In a minute there is time/For decisions and revisions which a minute will reverse.") [১০] তা বুদ্ধদেবের প্রেমিক-কথকের চিন্তার বাইরে। এমনকি জীবনানন্দের লোকেন বোস-ও প্রুফ্রকের মতো সময়ের দ্বিরাচারে দীর্ণ :

সুজাতাকে ভালবাসতাম আমি–
এখনো কি ভালোবাসি?
সেটা অবসরে ভাববার কথা
অবসর তবু নেই
...
সে-ও কি আমায় – সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিলো?
আজো ভালোবাসে না কি?
ইলেক্ট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে? [১১]

কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রেমিকের মনে এরকম কোনো "overwhelming questions" [১২] উত্থিত হয় না; তাঁর নির্দ্বিধ স্বস্তিবোধ আধুনিক মানসতার সূচক মনে হয় না, মনে হয় যেন এক প্রশ্নহীন কিশোরসুলভ মুগ্ধবোধের উচ্চারণ : "কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;... তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,/ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।/গাড়ি চ'লে গেলো! – কী ভালো তোমাকে বাসি, কেমন ক'রে বলি।" ('চিল্কায় সকাল') [১৩] সারা জীবনের কাব্যসাধনাকে তিনি যথার্থই, এবং সততার সঙ্গে, বর্ণনা করেছেন এভাবে :

যা কিছু লিখেছি আমি – হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক না –
যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,
... ...
                    আজ যদি ভাবি মনে হয়
নারীরে, বাণীরে এক মনে হয়। মনে হয় আমার তনুর তন্তুর সীবনে
যে-কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে মনে নারীরে মৃণাল ক'রে;
... ...

আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমার
মনে হয়,
নেই,
ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই,
কিছু নেই – কিছু নেই –
শুধু এই ভালোবাসা,
শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া,
আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া!
('মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে', *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*) [১৪]

অনেক সমালোচকই এমন প্রেম-সর্বস্ব বুদ্ধদেব বসুকে ছেড়ে কথা বলেন নি। একজনের মূল্যায়ন এমন : "(বুদ্ধদেব বসুর) নারী-চেতনাও মুখ্যত প্রেম-নির্ভর, এবং সে-প্রেমও আবার সর্বাত্মক যৌনতা-নির্ভর। ...কিন্তু প্রেম ছাড়া জগতের আর কিছু সম্পর্কে অন্ধতা, কিংবা নারীর পরিচয় একমাত্র প্রেমে, এবং প্রেমের পরিচয় একমাত্র যৌনতায় লুটোপুটি খাওয়ায়, একি আধুনিক মনের জগৎ সম্পর্কে তদ্গত দৃষ্টিভঙ্গি? বুদ্ধদেব অত্যন্ত শক্তিশালী কবি, তাঁর কবিতা কবিত্বের দিক দিয়ে অতুলনীয়ভাবে সার্থক; তাঁর চিত্রকল্প, শব্দসম্ভার, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, কাব্যরীতি মৌলিক, আত্মপ্রতিষ্ঠ, অভিনব, অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কিন্তু সব সত্ত্বেও জীবনের আরও বিভিন্ন দিকের বিচিত্র লীলা ও বিবিধ প্রকাশকে উপেক্ষা করা– এ কি আধুনিক সচেতন নিরাসক্ত মানসের পরিচয়বহ?"[১৫] (বারীন্দ্র বসু, *কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা*, রত্নাবলী, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ. ৭৯-৮০) কৌতুকের ও স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বুদ্ধদেবের কবিতা তখনই শাণিত ও আধুনিকমননস্পর্শী হয়েছে যখন তিনি প্রেম ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর স্মরণীয় কবিতা 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা', 'ব্যাং', 'ইলিশ', 'টাইগার হিলে সূর্যোদয়','মাছ ধরা', 'ইকারুস', 'বেশ্যার মৃত্যু', ইত্যাদির বিষয় প্রেম-রিরংসার বাইরে।

২.

প্রায় অন্যায়ভাবে, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর প্রথম প্রক্ষেপণটি পড়েছে বুদ্ধদেব বসুর ওপর। তথ্যের খাতিরে একথা স্বীকার করা উচিত যে, জীবনানন্দ দাশ কালগতভাবে বুদ্ধদেবের কিছুটা প্রাগ্বর্তী, এবং বসুর প্রথম আধুনিকতাচিহ্নিত কাব্যগ্রন্থ *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) প্রকাশের আগেই জীবনানন্দ দাশ তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাব্যভাষা এবং অপরূপ ভাবসৌন্দর্য নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতাঙ্গনে সমুপস্থিত। 'কল্লোল' পত্রিকা তাঁকে প্রথম ধারণ করেছিল, বুদ্ধদেবের 'প্রগতি' নয়। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়ের* প্রথম আলোচ্য কবি হওয়া উচিত ছিল জীবনানন্দ দাশ। *কালের পুতুলে* বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কবিতাপাঠের মুগ্ধতার কথা লিখেছেন : "কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিল যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারি নি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটার পর একটা পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম– এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-

সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ– যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।"[১৬] বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক শ্রম দিয়েছেন সত্য, তবে জীবনানন্দের বিকাশ-প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী ও অনিরুদ্ধ ছিল। বস্তুত, বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখালেখি ও পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে, এবং তাঁর প্রবাদপ্রতিম শিষ্যায়নক্ষমতার মাধ্যমে আধুনিক কবিদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করতে চেয়েছেন নিজের কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা, যে-কাব্যাদর্শ মডার্নিজমের একটি বিশেষ, সংকুচিত রূপ। ইংল্যান্ডের প্রি-র‍্যাফায়েলাইট-কবিকুলবাহিত, ওয়াল্টার-পেটারের ইস্থেটিসিজমের আদর্শে পরিপুষ্ট নান্দনিকবাদ বা কলাকৈবল্যবাদ যার নাম। তাঁর সমস্ত কাব্যকর্মে অমোচনীয় লেগে আছে তাঁর অনড় নান্দনিকতত্ত্ব : তিনি যে-আনন্দবাদী সাহিত্যের সাধনা করেছেন সেখান থেকে সমাজ-সংসার প্রায় নির্বাসিত– শুধু জেগে আছে তাঁর প্রবলপ্রতাপান্বিত একমেবাদ্বিতীয়ম অহং। অস্মিতাভাবনাকে এতটা তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া একমাত্র বুদ্ধদেবের মতো পাশ্চাত্যকলাভাবিত, পড়ুয়া, বিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর এই ব্যক্তিগত, গবাক্ষহীন ঘরে ("প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে")[১৭] শুধু তাঁর প্রিয়তমা কঙ্কা'র অধিবাস, যেখানে আসঙ্গপিপাসু-রূপবুভুক্ষু একজন ডেকাডেন্ট তাঁর হাতের তালুতে নিয়ে আঘ্রাণ করেন ইন্দ্রিয়ঘনত্বের সুগন্ধি। বোঝা যায় কীটস তাঁর আরাধ্য, কিন্তু কীটসের চেতনার পশ্চাৎভূমিতে যে-বাস্তব পৃথিবীর অবভাস ("Where men sit and hear each other groan;/ where palsy shakes a few sad grey hairs, /Where to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs/ where Beauty cannot keep her lustrous eyes /Or new Love pine at them beyond them tomorrow.")[১৮] বুদ্ধদেবের তা নেই।

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,
সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি–
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।
('উৎসর্গপত্র', দময়ন্তী)[১৯]

সংঘহীন একাকিত্বের আদিম জ্যামিতি জীবনানন্দেরও অনুধ্যেয় ছিল, কিন্তু জীবনানন্দের কথিত 'নির্জনতা'র সাথে বুদ্ধদেবের আত্মাপসারণের পার্থক্য রয়েছে। জীবনানন্দ নিজের স্বভাবদোষে আলাদা হয়েছেন[২০]; তাঁর আত্মখীনতা তাঁর স্বভাবজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। বুদ্ধদেব, শিষ্যপরিবেষ্টিত, নবসাহিত্যান্দোলনের বৈতালিক বসু, সচেতনভাবে, কৌশল হিসাবে বেছে নিলেন, অন্তত কবিতায়, সমাজরিক্ততার, অনঘ আত্মতার পথ।

ফ্রান্সে সিম্বলিজমের সমসময়ে এবং পাশাপাশি একটি আন্দোলন চলছিল, যার নাম ডেকাডেন্স বা অবক্ষয়বাদ। বলা বাহুল্য, নামটি প্রশংসাসূচক ছিল না আদিতে, কিন্তু অচিরকালের মধ্যে এই আন্দোলনের অনুগামীরা ডেকাডেন্ট উপাধিটি সগর্বপরিধেয় করে তোলেন। এঁরা ছিলেন আর্ট ফর আর্টস সেক (*L'art pour l'art*)-এ বিশ্বাসী। (এমনকি বহু পূর্বে, অষ্টাদশ শতকেও 'ডেকাডেন্ট' শব্দটি নিন্দার্থে রোমান্টিকদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ভিক্টর হুগোকে বলা হয়েছে ডেকাডেন্ট।) বোদলেয়ার, তেয়োফিল গোতিয়ে (Théophile Gautier) প্রমুখ শেষ-উনিশ শতকী ফরাসি লেখক

কলাকৈবল্যবাদের পরহেজগার ছিলেন অলজ্জভাবেই। ১৮৮০-এর দশকে একদল ফরাসি লেখক খোলাখুলি নিজেদের 'ডেকাডেন্ট গ্রুপ' নামে অভিহিত করেন। এই গ্রুপের সদস্য য়রিস-কার্ল হুইসম্যান্স (Joris-Karl Huysmans)-এর উপন্যাস *Against Nature*-কে প্রথম ডেকাডেন্ট রচনার শিরোপা দেয়া হয়ে থাকে। সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই অভিধায় পরিচিত হতে আপত্তি করেন নি, যেমন আর্তুর র‍্যাবোঁ, জেরার দ্য নেরভাল ও পল ভেরলেন। কিন্তু অনেকে, যেমন মালার্মে ও জঁ মরেয়া, এটিকে অস্বীকার করেন। সিম্বলিজম ও ডেকাডেন্সের মধ্যে চেতনাগত অনেক মিল থাকলেও দুটিকে পৃথক আন্দোলন হিসেবে ভেবে থাকেন প্রায় সবাই। ইতালিতে ডেকাডেন্ট আন্দোলনকে বলা হতো 'ডেকাডেন্টিসমো'। বৃটেনে ডেকাডেন্ট আন্দোলনের নাম হয় কলাকৈবল্যবাদ অথবা নান্দনিকবাদ (Aestheticism)। এর গুরু ওয়াল্টার পেটার– অক্সফোর্ডে অস্কার ওয়াইল্ডের শিক্ষক, নন্দনতাত্ত্বিক ও গদ্যকার। ইংল্যান্ডের মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রি-র‍্যাফায়েলাইট কবিরা ছিল তাঁর বন্ধু। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল শিল্পের জন্য শিল্প : শিল্পের সাথে সমাজতত্ত্ব বা নৈতিকতার কোনো যোগ নেই। বিশুদ্ধ আনন্দ, ইন্দ্রিয়জ ও কামজ, শিল্পীর অনুধ্যেয় বস্তু। সন্দেহ কি, অর্ধ-শতাব্দী আগের পরমরোমান্টিক কবি কীট্‌সের সাথে তাঁর চিন্তার মিল : কীট্‌স বলেছিলেন, "Beauty is Truth, Truth Beauty, that is all/Ye know on earth, and all ye need to know."[২১]

ইংল্যান্ডে কলাকৈবল্যবাদের প্রধান উদ্গাতা হয়ে ওঠেন অস্কার ওয়াইল্ড। ছাত্রজীবনে তিনি যেমন একদিকে পেটারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি অ্যাডগার অ্যালান পো ও অ্যালগারনন চার্লস সুইনবার্ন তাঁকে প্রভাবিত করেন। বোদলেয়ারের মতো ওয়াইল্ডও ছিলেন পরম ড্যান্ডি, সকল প্রথাগত নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বোধ অস্বীকারকারী ও ভিক্টোরীয় উপযোগিতাবাদের কট্টর বিরোধী। তাঁর বর্ণিল জীবনকে তিনি মনে করতেন তাঁর সৃষ্টির চেয়ে মহত্তর– যে কোনো শিল্পীই তাঁর কীর্তির চেয়ে মহান– আর আর্ট প্রকৃতির চেয়ে উৎকৃষ্টতর, কেননা প্রকৃতিতে আর্টের শীলন ও সুমিতি নেই। সত্যিকারের 'ইস্থেট' একজন নির্বচিত সন্ত, পার্থিব নৈতিক মানদণ্ড তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। 'The Decay of Lying' প্রবন্ধে তিনি বলেন, সৃজনধর্মী কর্ম হিসেবে আর্ট এবং খুনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। শিল্পী কখনো পরবেন মুখোশ, কিন্তু তাঁর মুখোশ হবে মুখশ্রীর চেয়ে অধিকতর প্রকাশক্ষম।

বাংলাদেশে পেটারের উত্তরসূরি কলাকৈবল্যবাদী একজনই আছেন মুখ্যত : বুদ্ধদেব বসু। পেটার ছাড়া আর যিনি তাঁকে নান্দনিকবাদে উদ্দীপ্ত করেছিলেন তিনি বোদলেয়ার। কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় পঙ্ক ঘাঁটার বিবিক্তি, উৎকণ্ঠ নাটকীয়তা ও আশ্লেষ আছে, বুদ্ধদেবে তাও নেই। প্যারিসের পরম ড্যান্ডি যে-দুঃখের, শরীরী ও মানসিক, নরকপরিব্রাজন করেছিলেন, বুদ্ধদেবের সে-অভিজ্ঞতা হয় নি– ঈশ্বর এবং শয়তানের প্রমত্ত লড়াইয়ে রক্তাক্ত হয় নি তাঁর হৃদয় ("দুর্মর পাপ, অনুতাপ সন্ত্রস্ত,/ঘৃতান্নভোজে পণের মূল্য মানি,/পচা কান্নায় ধুয়ে যাবে সব গ্লানি –এই ভেবে, হেসে ফের হই পঙ্কস্থ।" বোদলেয়ার : পাঠকের প্রতি)[22] কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের নিভৃতিতে, এবং পথের কাদা বাঁচিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি আর রজকলালিতপরিচ্ছদ-পরিহিত অধ্যাপক বুদ্ধদেব, বোদলেয়ার থেকে মেরুদূর। তবু কখনোও কখনোও বুদ্ধদেবকে মনে হয় পরাক্রমী, হায়, শুধু অল্প কিছু কবিতায়। যেমন অসামান্য, বোদলেয়ারপ্রভাবিত, 'বেশ্যার মৃত্যু' কবিতাটি ।

তার বোন-সতিনেরা কাঁধে ক'রে নিয়ে এলো তাকে;
মাথা হেঁট, চোখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, দুর্বল পা ফেলে,
গুটি কয় গম্ভীর বালিকা যেন, অকস্মাৎ ভুলে গেছে খেলা –
ঈষৎ বিব্রত হলো আকাশ আর লোকজন দেখে।

দিনের বিশাল রৌদ্র বদলে দিলো তাদের চেহারা :
সব মুখ এক যেন, সব দেহ বাতাসে বিব্রত;
অচেনা, অস্বস্তিকর, আশাতীত লজ্জায় আবৃত,
পরস্পরে ভর দিয়ে কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে গেলো তারা; –
হারালো অস্তিত্ব এই ভিন্ন দেশে, নিঃস্ব হলো নারীত্ব, যৌবন,
যেহেতু কোথাও আর নেই যেন কামুক পুরুষ।
এক বোবা নিশ্চল দুপুর শুধু; আর যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহুঁশ,
অনাক্রমণীয় ঘুমে মগ্ন একজন।

তার সব সজলতা চেটে নেয় বিদগ্ধ আগুন,
ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি;
যে-সব গোপন রন্ধ্রে কোনো ত্ত নাগর নামেনি,
সেখানেও লালসায় খুঁটে খায় অবশিষ্ট নুন।
এদিকে শহরে সন্ধ্যা, অন্য ক-টি ঘরে ফিরে চলে,
চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট, গলির গন্ধ উৎসাহ বাড়ায়;
পায়ে শক্ত মাটি পেয়ে ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়
দগ্ধ হ'তে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে।[২৩]

দীপ্তি ত্রিপাঠি লিখেছেন, "বুদ্ধদেব ব্যক্তিজীবনে বিশ্বাসী। বিষ্ণু দে-র মতো বিরাট সামাজিক জীবন তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেনি। যে দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি কবিতা রচনা করেছেন সে তিরিশ বছর বাংলা তথা ভারতবর্ষের পটভূমিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুহুর্মুহু কম্পিত হয়েছে। তবুও কবি রাজনীতি প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন, এমনকি সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো অনাস্থাও প্রকাশ করেননি। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে এস্কেপিস্ট বা জীবন-পলাতক অপবাদ দিয়েছিলেন।" দীপ্তি ত্রিপাঠি এই 'অপবাদ' থেকে বুদ্ধদেবকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন – "সব থেকে কম পরিবর্তিত হয়েছেন বুদ্ধদেব। বিশুদ্ধ কাব্যরচনায় বুদ্ধদেব বসু এখনো বিশ্বাসী ... বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীও পরিবর্তিত হয়েছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে। দু-জনেই কল্যাণকামী সমাজে বিশ্বাসী। ... আবেগ বা উচ্ছ্বাসকে বর্জন ক'রে, পরবর্তীকালের রিলকের (later Rilke) মতো দৃষ্টিকে বাইরে থেকে ভিতরে সংহত ক'রে (শুধু ভিতর থেকে বাইরে ব্যাপ্ত ক'রে নয়) একজন নিয়েছেন ধ্যানের পথ; আর-একজন বিশুদ্ধ মননের উচ্চ শিখর থেকে সহজিয়া সুরের সাধনায় নেমে এসেছেন লোরকার মতো, আবেগে কম্পিত হয়েছেন এলুয়ার ও আরাগঁর মতো, চলেছেন সর্বাঙ্গসুন্দর সাম্যবাদের সঙ্গমে।"[২৪] শুধু পরিবর্তিত হতে পারেন নি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর অনড় বিশুদ্ধতার ধারণা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে আত্মপরতার বৃত্তে। 'সমাজ', 'সমাজসেবা', 'রাজনীতি' এই শব্দগুলোকে তিনি ছুৎমার্গী বামুনের মতো এড়িয়ে চলতেন। এক্ষেত্রে গুরু এলিয়টের চেয়েও একধাপ এগিয়ে ছিলেন তিনি। মার্কস ও

ফ্রয়েড বিশশতকের তিরিশের দশকের লেখকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল– অডেন, ডে-লুইস প্রভৃতিরা সাম্যবাদের আদর্শকে, মনেপ্রাণে না হোক, অন্তত কবিতার বহিরঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এলিয়ট আর পাউন্ড ছিলেন অস্পৃষ্ট : বরং এলিয়ট খ্রিষ্টধর্ম ও রাজতন্ত্রের ("I am Classicist in literature, Royalist in politics and Anglo-Catholic in religion") এবং পাউন্ড ফ্যাসিবাদের পরহেজগার হয়ে ওঠেন। বুদ্ধদেব বসু ধর্মে নাস্তিক্যবাদী হলেও চিন্তাচেতনায় অনুদার ও ঘোর সাম্যবাদবিরোধী ছিলেন। তাঁর স্বল্পকালীন ফ্যাসিবাদবিরোধী সংঘে যোগদান তাঁর চরিত্রবিরুদ্ধ ছিল, এবং তিনি দ্রুতই নিজেকে বিশ্লিষ্ট করেন তার থেকে। মার্কিনপন্থী বলে তাঁর যে দুর্নাম তাঁকে নিয়ত তাড়া করে ফিরত তাঁর জন্য শুধু ঈর্ষাপরায়ণ নিন্দুক আর মার্কসবাদীরা দায়ী নয়। স্টিম এঞ্জিন বা টাইপিস্ট মেয়ের প্রসঙ্গ বর্ণনায় নাকি এলিয়টের নাসিকা কুঞ্চিত হতো; বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কঙ্কাবতী-দময়ন্তীদের মতো কল্পনারঙ্গিনী-পৌরাণিকীদের দেখা হামেশা মিললেও সাধারণ, আটপৌরে নারীদের দেখা পাওয়া কষ্টকর। জীবন-জীবিকা-জনতার ত্র্যহস্পর্শে কলঙ্কিত, ঘেমো শরীরের বাস্তব নারী-পুরুষ বুদ্ধদেবের কবিতায় দেখা যায় না। 'এলা দি' নামের কবিতায়[২৫] জনৈক সুন্দরী এলাদি-র বর্ণনা আছে, যিনি উচ্চ মধ্যবিত্ত , "সম্ভোগের আভাসে ভরপুর" পরিমণ্ডলে বাস করেন, আর

> "কুশান-আঁটা শিঙাপুরি বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসেন
> ... শান্তিনিকেতনি চামড়ায় বাঁধানো মোড়ায় পা রেখে।
> পাৎলা তাঁর পা দুটি, তার মুখের চেয়েও ফর্শা,
> নীলচে সরু শিরায় আরো সুন্দর; তাঁকে দেখার আগে
> আমি কখনো ভাবিনি মানুষের পায়েরও এত রূপ হতে পারে।
> আমি তাকিয়ে থাকি সেই পায়ের দিকে, যেখানে লুটিয়ে পড়ে
> তাঁর শাড়ির পাড় ময়ূরের বুকের মতো নীল,
> তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সিগারেট ধরান।"

রূপমুগ্ধ, লিবিডো-তাড়িত প্রুফ্রকের মতো বুদ্ধদেবও সেই মোহময়ীর সামনে বসে থাকেন : "আমার মাথা/ ঝিমঝিম করে ওঠে– নিজেকে এত হালকা মনে হয়/ যেন আমি পাখির মতো উড়ে যেতে পারি।" এরই পাশাপাশি কবির মনে পড়ে বিসদৃশ, কুশ্রী, বিগতযৌবনা, শ্রমপরায়ণা বা শ্রমজীবী নারীদের কথা, তাঁর কাকিমা, "এঁদো গলির একতলায় যার বাসা, যার দিনের মধ্যে ছয় ঘণ্টা কাটে রান্নাঘরে", এবং ঠিকে-ঝি হরিমতি– "সকাল থেকে সন্ধ্যা/ যে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, যার মুখের মধ্যে/ দুটোমাত্র দাঁত আছে এখন, আর সে-দুটো ঝুলে-পড়া প্রকাণ্ড/ আর নোংরা হলুদ।" নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বর্ণনা; তার বিপরীতে, এলা দির ছবি–

> "বাড়ি সাজানো, শরীর সাজানো, বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেক ঘুম,
> সপ্তাহে পাঁচ ছ'টা পার্টি, নানা দেশের ধনী মানী বন্ধু,
> মাঝে মাঝে গ্যাংটকে বা কলম্বোতে বা বার্সেলোনায়
> বেড়াতে যাওয়া।"

এহেন এলা দি-কে নন্দনসারবাদী বুদ্ধদেবের পরামর্শ আমাদের অবাক না করলেও ক্ষুব্ধ করে কিছুটা, এবং জানান দেয় কতটা সমাজবিবিক্ত, এলিটিস্ট ও স্বার্থপর হলে, লীলাচ্ছলেও এরকম পরামর্শ দিতে পারেন :

“তবু বলি এলা-দি, তুমি এমনি থেকে চিরকাল;
কখনো কোনো সমিতির নামে সমাজ-সেবা কোরো না,
চাঁদা দিয়ো না উদ্ধারকারীদের, হঠাৎ কোনো বিবেকপীড়ায়
রুক্ষ হয়ে যেয়ো না। এমনি থেকো– এমনি সুখী ও বিশ্রান্ত,
সুন্দর ও সুগন্ধি, আর এমনি নিষ্প্রয়োজন।”

‘পাকিজা’ নামের হিন্দী সিনেমার প্রথম দৃশ্যে ট্রেনের ভেতর ঘুমন্ত মীনাকুমারীর পদযুগল দেখে মুগ্ধ নায়ক যেমন বলেছিল, “ইতনি হাসীন পাও যমিন পর মৎ রাখখিয়ে গা– মৈলি হো যায়েগি।”

বুদ্ধদেব বসুর ইস্থেটিসিজম প্রমাণের জন্য আর কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় না; তবু তাঁর ‘রাত তিনটের সনেট : ১’-এর উদ্ধৃতি দিই।। কবির প্রশ্ন, “যীশু কি পরোপকারী ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির/ মাননীয় বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির/ মোহগ্রস্ত সভাপতি?” সুতরাং কবির পরামর্শ, “জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;/ হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।/ যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,/ আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।”[২৬] বিশুদ্ধ আনন্দের পূজারী বুদ্ধদেব ‘পুলকে বধির’ ছিলেন, কালের সমূহ কলাপ কিংবা ক্রন্দন তাঁর কানে পৌঁছায় নি; তিনি থেকে গেছেন নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ রূপসাধক। তবে কালও কম রগড়প্রিয় নয় : বোধ করি ঈষৎ মুচকি হেসে তাঁকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, যে-লক্ষণ ইতোমধ্যে পরিস্ফুট। জীবনানন্দ দাশ, যদি তুলনা করি, তাঁর “সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ” সেই সাথে প্রখর স্বকালভাবনা ও ভবিষ্যবোধসহ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন; আর নন্দনগর্বী, একদেশদর্শী, ও সীমিত কাব্যচেতনার স্বরচিত বৃত্তে বন্দী, বুদ্ধদেব পড়ে থাকছেন পথপাশে, ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের মতো।

উল্লেখপঞ্জি

১ দীপ্তি ত্রিপাঠি, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৮

২ বুদ্ধদেব বসু, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, এম সি সরকার, কলকাতা, ১৯৫৪

৩. ঐ, পৃ.

৪. মুহম্মদ নূরুল হুদা, ‘আধুনিকতার স্বরূপ’, সমীরণ মজুমদার সং *আধুনিকতা শিল্প ও সাহিত্যে*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ১৯৯৬, পৃ. ৭০

৫ বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১২৯

৬ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬,

৭ বারীন্দ্র বসু, *কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৯-৮০

৮ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব’, কমল মুখোপাধ্যায় সং *শিলীন্ধ্র*, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ. ৯

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাঁশি’, বুদ্ধদেব বসু সং *আধুনিক বাংলা কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১০ T. S. Eliot, “Lovesong of J Alfred Prufrock’, *T. S. Eliot Collected Poems 1909-1962*, Harcourt, Brace & World, Inc, New York, 1963, পৃ. 8

১১ জীবনানন্দ দাশ, ‘লোকেন বোসের জার্নাল’, আবদুল মান্নান সৈয়দ সং *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত জীবনানন্দ কবিতাসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩১৫-৩১৬

১২ T. S. Eliot, “Lovesong of J Alfred Prufrock’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

১৩ বুদ্ধদেব বসু, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আজকাল, ঢাকা, পৃ.৬৫

১৪ ঐ, পৃ. ৯৭

১৫ বারীন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

১৬ বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১৭ বুদ্ধদেব বসু, 'আটচল্লিশের শীতের জন্য-২', (যে-আঁধার আলোর অধিক) *কবিতাসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,১৯৯৩, পৃ. ৯৫

১৮ John Keats, Ode to a Nightingale,

১৯ উদ্ধৃত, দীপ্তি ত্রিপাঠি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

২০ জীবনানন্দ দাশ, 'বোধ', পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯

২১ John Keats, Ode to the Grecian Urn

২২ বুদ্ধদেব বসু, *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩৫

২৩ বুদ্ধদেব বসু, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

২৪ দীপ্তি ত্রিপাঠি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

২৫ বুদ্ধদেব বসু, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

২৬ ঐ, পৃ. ১১৬

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নির্মাণ-শিল্প

গাউসুর রহমান

উপন্যাসে নির্মাণ-শিল্পের তাৎপর্য গভীর। এই নির্মাণ-বিনির্মাণের জন্যে দরকার বিষয়বস্তু উপস্থাপনে দুর্দান্ত প্রকরণকুশলতা এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রাণময়তা ও সজীবতা। যে প্রাণময়তা ও সজীবতা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে রয়েছে। পাঠকের কাছে উপন্যাসের আবেদন অনেকটাই জীবনের অনুরূপ। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর 'কালো হাওয়া', 'অদর্শনা', 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি', 'নীলাঞ্জনের খাতা', 'পাতাল থেকে আলাপ', 'রাতভরে বৃষ্টি', ' গোলাপ কেন কালো', 'বিপন্ন বিস্ময়' ইত্যাদি উপন্যাসে জীবনপ্রতিম বর্ণনার স্বাক্ষর রেখেছেন 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষম প্রজ্ঞা' বা প্রতিভা দিয়ে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উপন্যাস জীবনের ইমেজ। কিন্তু জীবনের আক্ষরিক অবিকল প্রতিলিপি নয়।

জীবনকে নিয়েই রচিত হয় উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিই পারে সেই জীবনকে উপন্যাসের কাঠামোয় যথাযথভাবে স্থাপন করতে। এ সম্পর্কে সেন্টসবেরির মন্তব্য হচ্ছে : 'Technique will be of little use to you and no little danger'[১]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যে দৃষ্টিকোণ, সময়, স্থানগত পরিবেশ, কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ ও ভাষাবিন্যাস করেছেন; এর ফলে তিনি উপন্যাসে সৃজন পদ্ধতির (Creative Process) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত শিল্পরীতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন সামনের পানে। তাঁর উপন্যাসগুলোকে ঠিক 'Novel of Character', 'Novel of action' কিংবা 'Dramatic Novel' বলার সুযোগ নেই। তাঁর উপন্যাসের 'Well-made' অবয়ব সাহিত্যতত্ত্বের গজ-ফিতা মেনে অগ্রসর হয় নি। বুদ্ধদেব বসুর 'Creative impulse' এক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিনিয়ত নবীভূত ও স্ব-চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তিনি ব্যক্তির গূঢ় সত্তার গভীর উদ্ভাসনের মাধ্যমে সমগ্র ব্যক্তিত্বের ক্রম উন্মোচন চেয়েছেন।

উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু যথার্থ দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ ঔপন্যাসিকের জীবনসংক্রান্ত মূল্যচেতনার সঙ্গে দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে দৃষ্টিকোণের বিচিত্র বিন্যাস চোখে পড়ে। 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের 'হৈমন্তী' চরিত্রের সত্তাবিচ্ছিন্নতা, আচরণের সামূহিক বিপর্যয়, ভাবনার অসংলগ্নতা, মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ ঔপন্যাসিকের সার্থক দৃষ্টিকোণের প্রয়োগকে নিশ্চিত করেছে :

'এরা আবার কারা? এত লোক কেন বাড়িতে? ... খোকা, বল না ওদের চলে যেতে। তোরও একটু বুদ্ধি নেই, রাজ্যের লোক ডেকে আনলি।... আমার দিকে ও রকম করে তাকাচ্ছিস কেন রে? আমি কিছু করি নি, আমি কিছু জানি না। ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি— আরে! নিয়ে চলে গেছে! কোথায় গেলো? কোথায় গেলো? বুঝেছি, বুঝেছি। সবই ঐ খোকার কারসাজি। হতভাগ্য শয়তান। টাকার লোভে তুই বাপকে মারবি।'[২]

অরিন্দমের স্ত্রী 'হৈমন্তী'কে বুদ্ধদেব বসু 'কালো হাওয়া' উপন্যাসে অস্বাভাবিক চরিত্র হিসেবে দৃষ্টিকোণের তির্যকতায় উপস্থাপন করেছেন। হৈমন্তীর নৈঃসঙ্গ্য উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছতা, দাম্পত্য জীবন-যাপনের প্রতি হৈমন্তীর অনীহা, অনাগ্রহ, চরিত্রের অসঙ্গতিকে ভাষা দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ প্রমাণ করে যে উপন্যাসের নির্মাণ বিনির্মাণে তিনি কতটা শিল্পকুশলী।

দৃষ্টিকোণের সার্থক প্রয়োগ করতে পারলেই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতাও প্রকাশ পায়। যে গভীরতা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে সহজলভ্য। উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিকোণের সার্থক প্রয়োগ জরুরি। বুদ্ধদেব বসুর উপস্থাপনে আমরা লক্ষ করি যে, ঔপন্যাসিকের বিবৃতিও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কাহিনীকে দৃশ্যে (Scene) এবং পরিস্থিতি (Situation) রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। দৃষ্টিকোণের সার্থক প্রয়োগের কারণেই আমরা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে 'authorial silence' রক্ষিত হতে দেখি–

'আমি কি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি না? মিলির প্রেত কি এখনো ক্ষমা করবে না আমাকে? অনেক, অনেক ত্যাগ করেছি বলেই কি সব কিছু ত্যাগ করতে হবে? আর তাপসী– জীবনের কোনো এক মুহূর্তে সবচেয়ে তীব্রভাবে সে যা চেয়েছিলো, যা পায়নি বলে সারাজীবন সে অন্য কিছু চাইতেই পারলো না– আজ যদি তার হাতের কাছে তা এসে থাকে, যদি অবশেষে একটা মিরাকল ঘটেই, দু-দিক থেকে বঞ্চনা ছুটে এসে হঠাৎ পূর্ণ হয়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে— তাহলে স্বার্থের দেবতারা কি ক্ষুব্ধ হবেন?'[৩]

প্রথম যৌবনের তাপসীর প্রতি নীলাঞ্জনের এই অভিব্যক্তি 'নীলাঞ্জনের খাতা' উপন্যাসে authorial silence' রক্ষা করেছে। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক ঘটনা সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলও জাগিয়ে রাখার পক্ষপাতী উপন্যাসে। এজন্যে তিনি মাঝে-মধ্যে সীমিত ও পরিবর্তনশীল (Shifting) দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টিকোণের কাঠামোর মধ্যেই 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের অরিন্দম, হৈমন্তী; 'অদর্শনা' উপন্যাসের মানসকুমার, স্বাতী; 'নির্জন স্বাক্ষর' উপন্যাসের সোমেন দত্ত ও মালতী সেন; 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বর গুপ্ত ও মৌলিনাথ; 'নীলাঞ্জনের খাতা' উপন্যাসের নীলাঞ্জন ও তাপসী চরিত্রের বিশেষ 'সিচুয়েশন' বা চরিত্রকে দেখানোর প্রয়াস পাঠক লক্ষ করেন।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে 'অবজেকটিভ' ঘটনাবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রাখেন নি। বরং দূরসঞ্চারী দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। টিলফো (জুনিয়র) যে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন, তা 'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাস সম্পর্কেও কিছুটা হলেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন :

'Anyone would find it impossible to recast 'war and peace' in the first person : the action is too complex, the important characters are too, the science is too vast for the story to be told by a single character.'[৪]

'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাসে আধুনিক যুবমানসের অন্তহীন শূন্যতা, অর্থহীন প্রেমবিলাস, হৃদয়বৃত্তির রিক্ততার ছবি এবং অতল অনন্বয়ই প্রকাশিত হয় নি; বরং 'জীবন' নামক যুদ্ধে যুদ্ধোত্তর সমাজ-প্রতিবেশে আধুনিক যুবমানসের অন্তসারশূন্য, ভঙ্গি-সর্বস্ব, হৃদয়হীন প্রেম চর্চার স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক শ্রীপতি ভদ্র, সকল প্রকার বন্ধন থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে। সে বন্ধন হতে

পারে দাম্পত্যবন্ধন, পারিবারিক বন্ধন কিংবা সমাজবন্ধন। তবে সে আন্তঃমানবিক সম্পর্কের প্রতি আস্থাশীল। স্ত্রী আরতীর প্রতিও তার আসক্তি দূরে থাক, আগ্রহও নেই। স্ত্রী আরতিকে তাই সে বলে :

'ভুল, আরতি, তুমি ভুল করছো : আমি তোমাকে বলছি, শোনো : স্ত্রী, সন্তান, সংসার, এ-সব আমার জন্য নয়। আমি কিছুই করি নি, শুধু রাশি রাশি বই গিলেছি আর কথা বলেছি। তুমি হয়তো ভাবো আমি অন্যদের চাইতে আলাদা (আমিও তা-ই ভাবি মনে, মনে), কিন্তু তার কোনো প্রমাণ এখনো দিতে পারিনি– অন্যদের কাছে না, নিজের কাছেও না। তুমিতো জানো আমি কী-রকম উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, তুমিতো জানো যে– কোনোরকম বাঁধন আমার অসহ্য।'[৫]

বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন উপন্যাসে কোনো কোনো চরিত্রের উত্তম পুরুষের ভঙ্গিটা প্রথমে 'generalised' হলেও উপন্যাসের কাহিনীতে প্রবেশ করতে করতে 'specified' হয়ে যায়। প্রথমে চরিত্র ভূমিকা নেয় পর্যবেক্ষকের, পরে সে-ই হয়ে ওঠে সক্রিয়। এ ধরনের ভূমিকা আসলে 'fringe narrator'-এর।

'আয়নার মধ্যে একা' উপন্যাসের চরিত্র কমলা উপন্যাসের শুরুতে তার অস্তিত্বশূন্যতার কথা জানায় পর্যবেক্ষকের ভঙ্গিতে। এরপর দেশবিভাগের সময় পূর্ববাংলার মাদারীপুর শহর থেকে শরণার্থী শিবিরে এসে পিতার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। তারপর সে পড়ে যায় অস্তিত্বশূন্যতার মধ্যে। কমলার ভাষ্য : 'অন্য মেয়েদের বিয়ে হয় বাপের বাড়িতে, ও-সব দান-সামগ্রীও মা-বাবাই দেন, কিন্তু আমার তো সবই উল্টো ব্যাপার, এটাই-বা কেন ঠিকমতো হবে। আমার কোনো বাপের বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা কোথায় হারিয়ে গেলেন, জানি না– পার্টিশনে ভণ্ডুল হয়ে গেছে সব।'[৬]

বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন উপন্যাসে এ ধরনের আত্মকথনরীতির প্রয়োগ দেখা যায়। মনোলগের এই প্রাচুর্য ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকটের গভীরতা তুলে ধরে। উইলিয়াম ফক্‌নারের 'As I lay dying' উপন্যাসেও আত্মকথনের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। তাঁর উপন্যাসের উনিশটি চরিত্রের মনের কথা উনষাটটি অংশে আত্মকথন রীতিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'আয়নার মধ্যে একা' উপন্যাসের স্তরে স্তরে সাজানো আত্মকথনরীতির প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের নির্মাণ-বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করেছে।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রয়োজনে পরিবর্তমান দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে চরিত্রসমূহের ভূমিকা কখনো কখনো পর্যবেক্ষকের (onlooker),আবার কখনোবা সক্রিয় সংবেদনশীলতা প্রকাশের। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ঘটনার 'showing' বা 'telling it self'-ও অবাধ এবং নিরঙ্কুশ। 'নির্জন স্বাক্ষর', 'আয়নার মধ্যে একা', 'বিপন্ন বিস্ময়', 'কালো হাওয়া' ইত্যাদি উপন্যাস সম্পর্কে এ সত্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে যেখানে নিজে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ– সেখানেও ঔপন্যাসিক নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে 'Psychic distance' থেকে ঘটনা ও চরিত্রকে যথাসম্ভব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে দিয়েছেন। তারপরও উপন্যাসে 'স্বপ্নদৃশ্য', 'সুররিয়ালিস্ট পরিচর্যা', 'মগ্নচৈতন্যপ্রবাহ রীতি' প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা সংকট তৈরি হয় নি :

'ঝিমুনি এলো কমলার, একলা বসে চুপচাপ দুপুরে; জেগে উঠে বুঝলো ঐ আলো ঘুমে, কয়েক মিনিটের মধ্যে, সে একটি স্বপ্ন দেখে উঠেছে। মেঘলা দিন, টিপটিপ বৃষ্টি ম্যুজিয়মের কাছে বাস থেকে নামলো, হাঁটছে, বাড়ির গায়ে নম্বর দেখে দেখে। স্বপ্ন, না

সত্যি? উঠে এলেন দোতলায়, ঢুকেই একটা সুগন্ধ পেলো ঝাপসা, কেমন ঠাণ্ডা– কী আরামের, কীকরে এতো হলো হঠাৎ উজ্জ্বল ঘর, উত্তরে সারি সারি বরফের মতো ঝকঝকে কাচ, মাথার ওপরে ঢাকনা-পরানো লম্বা–লম্বা টিউবের বাতি যেন রোদের আড্ডা, কোনো শান্ত নরম সকালের পরে সময় আর নড়েনি।'[৭]

একজন সফল ঔপন্যাসিকের জন্য সময়ের বিন্যাস জরুরি। এ সত্যটি বুদ্ধদেব বসু ভালো করেই জানতেন। উপন্যাসে সময় ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চরিত্রের নিভৃত অন্তর্লোকে প্রবেশ করে। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে তাই 'Life-in-values' প্রকাশিত হয়েছে 'Life-in-time'-এর মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি : 'It is never possible for a novelist to deny time inside the fabric of his novel.'[৮]

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে পরিবেশ-বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই নৈঃসঙ্গ্যচেতনার মধ্যে রয়েছে সমাজবিচ্ছিন্নতাজনিত নিঃসঙ্গতা, প্রেমবিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা, প্রকৃতি ও মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসে আন্তঃমানবিক সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের গূঢ় রহস্য নিহিত। পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ব চেতনা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সক্রিয়তা কি তাহলে জীবনবিমুখতা? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। জীবনজিজ্ঞাসা যদি জীবনবিমুখতা না হয়, তাহলে এই বিচ্ছিন্নতাও যে জীবনবিমুখতা নয়– তা বলাই বাহুল্য। জীবনকে আকণ্ঠ পান করতে না পেরেই চরিত্রসমূহ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রসমূহ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চায়। অনবরত 'floating fear'-এর কারণেই এমনটি হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসে পরিবেশ বা 'setting'-কে 'expression of human will' বা Massive determinant' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পটভূমির গুরুত্বকে উপন্যাসে তিনি কখনোই খাটো করে দেখেন নি। চরিত্রের সত্যিকারের বিকাশের জন্যে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রসমূহকে স্থানগত পরিবেশে সংস্থাপিত করেছেন।

ব্যক্তিসত্তার ক্রম-উন্মোচনই বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রসমূহের আত্মগত চেতনা ও অনুভূতি প্রকাশের অবলম্বনরূপে বিবেচিত। তাঁর উপন্যাসের মূল 'মোটিফ' হলো চরিত্রের স্বরূপ সন্ধান। আর তাই উপন্যাসে তখন পরিবেশের মূল্য কেবল 'objective' নয়; বরং 'objective correlative'

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে কাহিনীবিন্যাসের গুরুত্বও যথেষ্ট। কারণ কাহিনীই উপন্যাসের মূল আশ্রয়। চরিত্রসমূহের ব্যক্তিত্বের উন্মোচন তাঁর উপন্যাসে অন্যতম লক্ষ্য হলেও কাহিনীর আকর্ষণকে উপন্যাস থেকে মুছে ফেলার পক্ষপাতী তিনি নন। উপন্যাসে কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কাহিনীর সঙ্গে নাটকীয়তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে কাহিনীগত সামঞ্জস্য, সংহতি ও সমগ্রতাকে সযত্নে রক্ষা করেছেন।

উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ, সময়চেতনা, পরিবেশবিন্যাস, কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণের সফল নিদর্শন রেখে বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসগুলোর নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। ফলে উপন্যাসের ভাবসম্পদ ও ভাষাসম্পদ একই মোহনায় এসে মিলিত হয়ে উপন্যাসের সাহিত্যমূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ।

তথ্যনির্দেশ

১. William Van O'conor রচিত ('The novel in our time' প্রবন্ধ, দ্র. *Forms of modern fiction*) সংকলন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত
২. বুদ্ধদেব বসু : *কালো হাওয়া*, পৃ. ১৯১
৩. প্রাগুক্ত : *নীলাঞ্জনের খাতা*
৪. John E. Tilford : 'Point of view in the novel' - critical approaches to fiction (ed. S.K. Kumar and Mckean, p. 307)
৫. বুদ্ধদেব বসু : *বিপন্ন বিস্ময়*, পৃ. ১৮৬
৬. প্রাগুক্ত : *আয়নার মধ্যে একা*, পৃ. ৯
৭. প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬, ৯৭
৮. E. M. Forster : *Aspects of the novel* (penguin, 1963) p. 37

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বুদ্ধদেবচর্চা

তপন বাগচী

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তিরিশি আধুনিকতার অন্যতম উদ্গাতা। কবি, সমালোচক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, অধ্যাপক তিনি কীর্তিমান। রচনার প্রাচুর্যে এবং বহুমুখীনতায় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রায় সকল শাখায় প্রবল প্রভাব সঞ্চারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরেই তাঁর অবস্থান হতে পারে। সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি যথেষ্ট পরিচিতি হলেও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা-সমালোচনা হয়নি। এদেশে রবীন্দ্রনাথের পরে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বুদ্ধদেবের জন্ম, শিক্ষা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন এই বাংলাদেশেই অতিবাহিত হলেও বুদ্ধদেবচর্চায় আমাদের অবদান মানে যা-ই হোক, সংখ্যায় ন্যূন।

গবেষণা কিংবা আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর নাম উল্লেখ, তাঁর রচনার উদ্ধৃতি ব্যবহার, তাঁর রচনার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠন, তাঁর কবিতার আবৃত্তি কিংবা তাঁর নাটকের মঞ্চায়নকে বুদ্ধদেবচর্চা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু এই সীমিত পরিসরে বুদ্ধদেবচর্চার সকল নজির তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। আমরা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বুদ্ধদেবচর্চা নিয়ে কথা বলতে পারি।

বুদ্ধদেবচর্চা শুরু হয়েছে কবে থেকে তা নির্ণয় করা একটু কঠিন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন, তাতে বুদ্ধদেবের সম্পাদনা-কর্ম সম্পর্কে এবং সমকালীন কবিতা সম্পর্কে মূল্যায়ন রয়েছে। রবীন্দ্রপত্রকেও বুদ্ধদেবচর্চার একটি নজির হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> 'তোমাদের কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে।[১]

বুদ্ধদেবের প্রথম গ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী'র প্রকাশক গঙ্গাচরণ দাসকেও বুদ্ধেদেবচর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ২৬ বাংলাবাজার থেকে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে তিনি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই বুদ্ধদেবের কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে বলেই বুদ্ধদেব আজ কবি কবি বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেবের সমকালেই বুদ্ধদেবচর্চার নজির রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল বার্ষিকী 'বাসন্তিকা'র অষ্টম বর্ষ (১৯৩১) সংখ্যায় বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'শান্তি' পত্রিকায় (বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ১৯৩১) 'মল্লিনাথ'

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পত্র, তারিখ ৩ অক্টোবর, ১৯৩৫ [উদ্ধৃত, ভূঁইয়া ইকবাল, 'বুদ্ধদেব বসু', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৭]

ছদ্মনামে। এই লেখায় কেবল বুদ্ধদেবের কবিতা নিয়ে নেতিবাচক উক্তি রয়েছে। ‘বাসন্তিকার কর্তৃপক্ষ কি না পড়িয়াই কবিতা ছাপিতে দেন? আমাদের মনে হয় সম্পাদক মহাশয়েরও এ বিষয়ে একটু দায়িত্ব আছে।’– এরকম মন্তব্যের মাধ্যমে সম্পাদক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও ‘জ্ঞান’ দেয়া হয়েছে। আর ‘শনিবারের চিঠি’ তো তাঁর ও তাঁর সময়ের কবিতার বিরুদ্ধে নিয়মিত আক্রমণ পরিচালনা করত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি পর্যায়ে দুটি গবেষণা হয়েছে বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে। ‘বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ’ শিরোনামে পিএইচডি করেছেন মোঃ নুরুল আমিন খান। মাহবুব সাদিক নামে তিনি ষাটের দশকের কবি হিসেবে খ্যাতিমান। মাহবুব সাদিকের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন। আর ‘বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ’ শিরোনামে গবেষণা করেছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধান করেছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এছাড়া আরো কিছু গবেষণা-অভিসন্দর্ভে বুদ্ধদেব বসু যোগ্য মর্যাদায় আলোচিত। যেমন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে ‘তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার’ নামে সৈকত আসগরের গবেষণায় এবং প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ‘তিরিশোত্তর কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা’ নামে সৌভিক রেজার গবেষণায় তিরিশের পাঁচকবির অন্যতম হিসেবে বুদ্ধদেব বসু মূল্যায়িত হয়েছেন। এই চারটি গবেষণা-অভিসন্দর্ভই বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বুদ্ধদেবচর্চায় বাংলা একাডেমীই সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বুদ্ধদেব বসুর জীবনী প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছে এই প্রতিষ্ঠান। প্রফেসর ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল জীবনী রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে বাংলা একাডেমী এর চেয়েও গুরুদায়িত্ব পালন করেছে বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর (১৮ মার্চ ১৯৭৪) পরে ‘উত্তরাধিকার’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে।

‘বাংলা একাডেমীর একটি সৃষ্টিশীল সাহিত্যপত্রিকা’ এই মাসিক ‘উত্তরাধিকার’-এর দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা-ই (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪/অগ্রাণ-পৌষ ১৩৮১) বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত এই সংখ্যার সহ-সম্পাদক ছিলেন রফিক আজাদ ও রশীদ হায়দার। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে সম্পাদক হিসেবে নীলিমা ইব্রাহিমের নাম ব্যবহৃত হলেও এই সংখ্যার মূল কৃতিত্ব যে রফিক আজাদ ও রশীদ হায়দারের, তা বলাই বাহুল্য। এই সংখ্যার দুই রঙা প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের পরিচালক ফজলে রাব্বী ছিলেন এই সংখ্যার প্রকাশক।

এই সংখ্যার লেখকক্রমের দিকে তাকালেই আয়োজনের নিষ্ঠা ও বিশালতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আবদুল কাদির, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীলিমা ইব্রাহিম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী, রশীদ করিম, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আবুল হাসনাত, আবু জাফর, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, আরশাদ আজিজ, সিকদার আমিনুল হক, অসীম সাহা, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও স্বপন মজুমদার। আর নিবেদিত কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, রাজীব আহসান চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জাহিদুল হক, শিহাব সরকার, জাহাঙ্গীরুল ইসলাম ও আবিদ আজাদ। ২৩টি প্রবন্ধ আর ১০টি কবিতা দিয়ে সাজানো এই সংখ্যাটি

বুদ্ধদেবচর্চার আকর হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে। এরপরে বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ ও স্মারকপত্রিকা প্রকাশিত হলেও তাঁর অন্তর্ধানের পরে এতটা দায়িত্ব নিয়ে ২৫৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছে। বুদ্ধদেবের ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির। তিনি মন্তব্য করেছেন–

> 'আধুনিককালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের পরে যে ক'জন শক্তিমান কবি বাংলা ছন্দ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।'[২]

বুদ্ধদেব বসুর পুরাণচর্চা এবং তাঁর সাহিত্যে পুরাণের ব্যবহারের কৃতিত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। তাঁর মহাভারতচর্চা নিয়ে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবন্ধ লিখেছেন ওই সংখ্যায়। তাঁর সপ্রশংস উক্তি–

> বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সমতল ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর এই 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থখানি এমন এক আশ্চর্য তুঙ্গতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, তাঁর প্রতি আমাদের তাকাতে হয় মাথা তুলে এবং সশ্রদ্ধ ও সবিস্ময় দৃষ্টি মেলে।'[৩]

প্রফেসর ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বুদ্ধদেব বসুর। ব্যক্তিস্মৃতি ও সাহিত্য-মূল্যায়নের ভাষায় তিনি লিখেছেন–

> 'খর্বদেহ, অমিততেজ মানুষটির ভেতর যে দাহিকাশক্তি ছিল তাতে আগুন জ্বলেছে কিন্তু সৃষ্টিকে না পুড়িয়ে জগতের সৌন্দর্যকে নতুন করে আলোকিত করেছে, ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে, দীপ্তি ও প্রভা, মধ্যগগনের রবির আলোকে উদ্ভাসিত তরুণ পৃথক রশ্মি জ্বেলেও রবির কিরণে স্নাত হয়েছেন। এ এক পরামাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।'[৪]

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের অবদান ও অবস্থান বেশ শীর্ষে। সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন–

> 'ম্যাথু আর্নল্ডের মতই তিনি, শুধু সমালোচক নন, সমালোচনার প্রবক্তাও তিনি, সমালোচনা যে আবশ্যক এই মতের প্রচারকও তিনি।'[৫]

কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিতাগিত রচনায় কবির অধিক সম্মান দেখাতে গিয়ে সমালোচকসত্তার কথাই জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তুল্যমূল্য বিচারে বুদ্ধদেবের অবস্থান তিনি চিহ্নিত করেছেন–

> 'রবীন্দ্রনাথের পর, রবীন্দ্রসাহিত্যের নির্ভরযোগ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও আবু সয়ীদ আইয়ুব।'[৬]

বুদ্ধদেবের সাহিত্যভাষা বিশেষত প্রবন্ধের ভাষার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ রয়েছে কবি অসীম সাহার প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন–

---

[২] আবদুল কাদির, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ, [উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭]

[৩] প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলায় মহাভারতচর্চা, [উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫]

[৪] নীলিমা ইব্রাহিম, চিত্তসত্তায় বুদ্ধদেব বসু, [উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬]

[৫] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, [উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫]

[৬] আসাদ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, [উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯]

> ‘ভাষাকে ভেঙেচুরে, টুকরো-টুকরো করে, শব্দের স্বাভাবিক ব্যবহারে ক্রিয়াপদকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে খেলিয়ে তিনি, বুদ্ধদেব বসু যে বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাকে প্রায় তুলনাহীন বলা চলে।’[৭]

‘উত্তরাধিকার’ পত্রিকার এই সংখ্যাটি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে মূল্য পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এর প্রভাব অজ্ঞাত কোনো কারণে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধদেব যতটা পাঠ্য, তাঁকে নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র তেমন বিস্তৃত হয়নি। তাঁর জন্মশতবর্ষ ঘিরে তেমন কোনো তোড়জোড় নেই সাহিত্য-সাময়িকপত্রমহলে। তাঁর চেয়ে গৌণ কবি-লেখককে নিয়ে ক্রোড়পত্র কিংবা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কৃতিত্ব আমাদের থাকলেও বুদ্ধদেব বসু কোনো কারণে অন্তরালে থেকে গেছেন।

সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত ‘নান্দীপাঠ’ (সংখ্যা ২, এপ্রিল ২০০২) বুদ্ধদেব বসুর ‘কঙ্কাবতী’ কাব্য নিয়ে শিমুল মাহমুদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। সন্‌জীদা খাতুন সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ পত্রিকায় প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৪১৫) বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটক সম্পর্কে শাহজাহান হাফিজের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা থেকে মিয়া মান্নান ও অরবিন্দ চক্রবর্তী সম্পাদিত লিটলম্যাগ ‘কাব্যকথা’র প্রথম সংখ্যা (আগস্ট ২০০৮) বুদ্ধদেব বসুর ওপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাঁর জন্মশতবর্ষের সম্মান জানিয়েছে। ময়মনসিংহের ফরিদ আহমদ দুলাল সম্পাদিত ছোটকাগজ ‘স্বাতন্ত্র্য’ বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন বলে জেনেছি। ঢাকার ‘কালি ও কলম’ পত্রিকা বুদ্ধদেব বসুর ওপর ক্রোড়পত্র প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে। তবে ওই পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় বুদ্ধদেবের ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকে পতিতাকে প্রেমিকা হওয়ার যোগ্য করে তুলেছেন নাট্যকার। পুরুষরঞ্জনের পেশাকে পায়ে দলে তরঙ্গিণী হয়ে উঠেছে যথার্থ প্রেমিকা। ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হয়েও হয়ে উঠেছেন আধুনিক যুবক। তিনি পিতার আহ্বান ফিরিয়ে দিতে পারেন। ‘বিবাহ’ নামের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানকে তিনি অবলীলায় অস্বীকার করতে পারেন। তপস্যা ছেড়ে তিনি নারীর প্রেমে মত্ত হয়েছেন। কামে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু তরঙ্গিণীকে পেয়েও কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেননি। আবার ছেড়ে আসা আশ্রমেও তিনি ফিরে যাননি। তিনি যাত্রা করেছেন নৈঃসঙ্গ্যের পথে, অনন্তের পথে। যে পথের প্রান্তে আছে কেবলি শূন্যতা আর রিক্ততা। এভাবে পুরাকালের তপস্বী আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন আধুনিক পুরুষপ্রবর। বুদ্ধদেব এভাবেই পুরাণের নবজন্ম দেন। পুরাণের কাহিনী ধারণ করেও ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ হয়ে ওঠে বুদ্ধদেব বসুর রূপায়ণে এক আধুনিক নাটক।[৮]

ভারতের কলকাতা থেকে ডক্টর উত্তম দাশ সম্পাদিত ‘মহাদিগন্ত’ পত্রিকার ২৬ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৭) বেরিয়েছে বুদ্ধদেব সংখ্যা হিসেবে। ওই সংখ্যায় অমিয় ভট্টাচার্য, উত্তম দাশ, মঞ্জুভাষ মিত্র, সুমিতা চক্রবর্তী, তারক লাহিড়ী, অর্ণব সেন, কমলেশ চক্রবর্তী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ ঘোষহাজরা, প্রভাতকুমার দাস, সুশান্ত চক্রবর্তী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহমুরারী দে, মেঘনাদ ঘোষাল ও

---

[৭] অসীম সাহা, বুদ্ধদেব বসুর বৈচিত্র্যমুখিতা, তাঁর প্রবন্ধের ভাষা, [উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫]

[৮] আবুল হাসনাত (সম্পা.), কালি ও কলম, পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ২৯

সন্দীপ দত্তের প্রবন্ধের পাশাপাশি বাংলাদেশের তিন প্রাবন্ধিক মাহমুদ কামাল, তপন বাগচী ও অনুপম হাসানের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মাহমুদ কামাল লিখেছেন উপন্যাস 'তিথিডোর' (পৃ. ১০৪-১০৭) নিয়ে, তপন বাগচী লিখেছেন নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (পৃ. ১২৯-১৩৬) নিয়ে এবং অনুপম হাসান লিখেছেন কাব্যনাট্য নিয়ে (পৃ. ১৩৭-১৫৯)। পত্রিকার প্রকাশস্থান কলকাতা হলেও এই প্রবন্ধত্রয় বাংলাদেশে বুদ্ধদেবচর্চারই নিদর্শন। সম্প্রতি বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকা বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ স্মারক সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি আগের সেই কীর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখবে বলে অগ্রিম ধারণা করা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বুদ্ধদেবচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ষাটের দশকের কবি ও প্রাবন্ধিক ডক্টর মাহবুব সাদিক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিন বছর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এই গবেষণা ১৯৯১ সালে বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে বাংলাদেশে গ্রন্থ রচনার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর। 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ' গ্রন্থে বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়েছে 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'সমাজ ও সময়ধারণা', 'বিচ্ছিন্নতা' ও 'মৃত্যুচেতনা'। আর প্রকরণ হিসেবে আলোচিত হয়েছে 'গঠনবৈশিষ্ট্য', 'শব্দ : গদ্য-পদ্যের মিথস্ক্রিয়া', 'অলঙ্কার', 'চিত্রকল্প', 'প্রতীক', 'পুরাণ' ও 'ছন্দ'। বাংলাদেশের বুদ্ধদেবচর্চায় এটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাচ্ছে। কেবল বুদ্ধদেব-সম্পর্কিত আলোচনার জন্য নয়, 'বিষয় ও প্রকরণ' কিংবা 'শিল্পরূপ বিচার'-জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই গবেষণাকর্ম আদর্শ হিসেবে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মন্তব্য–

> 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিবেচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তিনি শুধু কাব্যের বিষয়েই মনোযোগী ছিলেন না, কাব্যের প্রবরণকলা বিষয়েও তাঁর মনোযোগ ছিল অখণ্ড। মানস-চৈতন্যেও সপ্রেম পরিচর্যায় তাঁর কাব্যবিষয় যথার্থ প্রকরণের সন্নিপাতে শিল্পরূপ পেয়েছে। ... বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।'[৯]

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে বুদ্ধদেব বসুর জীবনীগ্রন্থ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র আদলে বাংলা একাডেমী যে জীবনীগ্রন্থমালা প্রকল্প চালু করেছিল, 'বুদ্ধদেব বসু' নামের জীবনীগ্রন্থ তারই প্রকাশনা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল রচিত এই গ্রন্থে বাংলা একাডমী-নির্ধারিত রূপরেখা অনুযায়ী 'জীবনকথা', 'শিক্ষাজীবন', 'কর্মজীবন', 'সংসার-জীবন', 'সাহিত্য-জীবন', 'সাময়িকপত্র-সম্পাদনা', 'শেষজীবন ও মৃত্যু', 'সমকালীন প্রতিক্রিয়া', 'রচনার নিদর্শন', 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা-তালিকা' এবং 'গ্রন্থপঞ্জি' এই ১১টি অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এই জীবনীগ্রন্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র বুদ্ধদেব বসুর অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার গৌরবজনক ফলের টেবুলেশন শিট উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে। ভূঁইয়া ইকবালের গ্রন্থ থেকে আমরা সেটি হুবহু তুলে ধরছি।

ভূঁইয়া ইকবাল বিভিন্ন প্রাথমিক সূত্র থেকেও বুদ্ধদেবের জীবনতথ্য উদ্ধার করেছেন। গ্রন্থমালার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গবেষকের মূল্যায়নের সুযোগ না থাকলেও ব্যাপক তথ্য সন্নিবেশ করে পরবর্তী গবেষণার দ্বার উন্মোচনের কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য।

---

[৯] মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৬২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষের পিএইচডি গবেষণাকর্মে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ বিশ্লিষ্ট হয়েছে। কেবল উপন্যাস বিশ্লেষণ নয়, বুদ্ধদেবের সাহিত্যমানস আবিষ্কারের কাজটিও গবেষক করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যে মূলত কবি, তাঁর উপন্যাসের আলোচনার সময়ে তা বিস্মৃত হননি ডক্টর ঘোষ। তাঁর কবিতা ও পুরাণচেতনার উৎসও খুঁজে পেয়েছেন তিনি–

> উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোট্ট রামায়ণ'-ও তাকে উদ্বুদ্ধ করে দারুণভাবে; 'ছোট্ট রামায়ণে'র অনুসরণে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে ওই কিশোর বয়সেই তিনি লিখে ফেলেন গোটা এক 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'। 'ছোট্ট রামায়ণ' থেকেই তিনি পেয়েছেন 'ছন্দের আনন্দ আর কবিতার উন্মাদনা'র স্বাদ।[১০]

এই গবেষণা ছাড়াও প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ বুদ্ধদেব সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন, যা তাঁর নিয়মিত বুদ্ধদেবভাবনার সম্প্রসারিত রূপ। 'বুদ্ধদেবের উপন্যাসে ঢাকা শহর' নামের এক গবেষণায় উদ্ধৃতি-সহযোগে বুদ্ধদেবের স্মৃতিময় ঢাকার চিত্র এঁকেছেন। বুদ্ধদেবপাঠে গবেষকের ধারণা হলো–'পুরোনো কোনো শহরের ইতিহাস পুনর্গঠনে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে ওই শহরের যে-সব ছবি পাওয়া যায়, তা হতে পারে অমূল্য উপকরণ-উৎস। ঢাকা শহর নিয়েও সৃষ্টিশীল লেখকরা ভালোবাসায়-আবেগে-অনুরাগে অনেক শব্দভাষ্য নির্মাণ করেছেন, যেমন করেছেন বুদ্ধদেব।'[১১]

পঞ্চাশের কবি-গীতিকার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (বাংলা একাডেমী, ২য় সং ১৯৮২), 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), 'আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা যথাগুরুত্বে আলোচিত ও বিশ্লেষিত। তাঁর তত্ত্বাবধানে সৈকত আসগর রচনা করেছেন 'তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ। 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার' এবং 'বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক' নামে দুটি পৃথক গ্রন্থে ওই অভিসন্দর্ভ মুদ্রিত হয়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার' গ্রন্থে ডক্টর সৈকত আসগর তিরিশের পঞ্চপাণ্ডব জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৪০৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থেও আনুষঙ্গিক আলোচনার বাইরে মূল আলোচনা প্রায় ৩শ' পৃষ্ঠার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু রয়েছে ৬১ পৃষ্ঠা জুড়ে। এর মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার ভাব ও ভাষা নিয়ে ৩১ পৃষ্ঠা, অলঙ্কার নিয়ে ১২ পৃষ্ঠা, চিত্রকল্প নিয়ে ৪ পৃষ্ঠা, প্রতীক নিয়ে ৫ পৃষ্ঠা ও ছন্দ নিয়ে ৯ পৃষ্ঠার নিবিড় আলোচনা।[১২] বুদ্ধদেবকে গবেষক 'আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপ্রবাহ, শক্তিমান কবিপুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৩]

ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে প্রণীত 'তিরিশোত্তর কবিতায় আধ্যাত্মচেতনা' শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভে গবেষক সৌভিক রেজা বুদ্ধদেব বসুর কবিমানস ও আধ্যাত্মচেতনা নামে পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

---

[১০] ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৬

[১১] ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪৬

[১২] এই নিবন্ধের জন্য ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

[১৩] সৈকত আসগর, 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৯

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সফিকুননবী সামাদীর তত্ত্বাবধানে প্রণীত 'বাংলাদেশের কাব্যনাটক : আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্য' শীর্ষক এমফিল অভিসন্দর্ভে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক আলোচিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে গবেষক তাঁর নিজস্ব কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন এ-গবেষণায়। যেমন বুদ্ধদেবের কাব্যনাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে তিনি কাব্যনাটক বলতে নারাজ। তাঁর ভাষায়–

> 'কাব্যের গভীর ভাবৈশ্বর্য ও শব্দের-বাক্যের শিল্পিত বিন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুখ্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' সম্পূর্ণ-অর্থে কাব্যনাটক হয়ে ওঠেনি'।[১৪]

'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে' সোয়া পৃষ্ঠা জুড়ে বুদ্ধদেবের পরিচিতি ও মূল্যায়ন মুদ্রিত হয়েছে। প্রায় ৭০০ শব্দে রচিত ওই ভুক্তিতে তাঁকে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক' অভিহিত করে বলা হয়েছে–

> 'রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। গদ্যশিল্পী হিসেবে সমধিক সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় প্রদান। পরিমার্জিত সঙ্গীতময়তা ও পরিশীলিত সাহিত্যচনায়ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান।'[১৫]

এই ভুক্তিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে বলা হয়েছে–

> ১৯৪২-এ ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের আন্দোলনে যোগদান। পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির একজন সমর্থক হিসেব পরিচিত।'[১৬]

এই মন্তব্যের মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী অবস্থান চিহ্নিত করে বুদ্ধদেবকে প্রকারান্তরে ফ্যাসিবাদের সমর্থক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের শামিল। এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়ায় বুদ্ধদেবের জন্য বরাদ্দ রয়েছে চারশ' শব্দ। এই সীমিত পরিসরে ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদা লিখেছেন–

> শুধু কবিতা নয়, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বুদ্ধদেবের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। তিনি রোমান্টিক কবিচেতনার অধিকারী ছিলেন; তবে পরবর্তীকালে তিনি আবেগ অপেক্ষা মননশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মননশীল প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে আছে ব্যক্তিত্বের ছাপ।[১৭]

বুদ্ধদেব বসুর অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী। তাঁর সংগ্রহ ও সম্পাদনায় লীলা রায়কে লেখা কয়েকটি ইংরেজি চিঠি এই নিবন্ধকারের অনুবাদে প্রকাশিতও হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য আরো কিছু চিঠি তাঁর সংগ্রহে রয়েছে।

বুদ্ধদেবচর্চা কেবল বুদ্ধদেবের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার মধ্যেই সীমিত নয়। বুদ্ধদেবের নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে নর্থব্রুক হল লালকুঠি মঞ্চে। এটি ছিল তাঁর একটি গল্পের প্রতিভা বসুর রূপান্তর। বুদ্ধদেব তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

[১৪] অনুপম হাসান, 'বাংলাদেশের কাব্যনাটক : আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্য', অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ, ২০০৫, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃ. ৮৪

[১৫] সেলিনা হোসেন ও নূরু ইসলাম (সম্পা.), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ২য় সং, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৩

[১৬] সেলিনা হোসেন ও নূরু ইসলাম, প্রাগুক্ত

[১৭] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, সিডি সংস্করণ, ২০০৬

ছাত্র। সাম্প্রতিক প্রয়োজনা হিসেবে কণ্ঠশীলনের আবৃত্তি 'প্রথম পার্থ' ছাড়াও পুনর্মিলন, তপস্বী ও তরঙ্গিণী ইত্যাদি নাটক ঢাকার মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে।

বুদ্ধদেবের পৈতৃকবাস ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলায়। মুন্সীগঞ্জ জেলার কিছু উদ্যমী তরুণ www.munshigaonj.com নামের ওয়েবসাইটে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কিত রচনা সংকলন করেছেন। এতে প্রতিভা বসু, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মুশাররফ করিম, মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের প্রমুখের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এই উদ্যোগ বুদ্ধদেবচর্চার সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচ্য।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে ঢাকা শহর

তারেক রেজা

বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই আকাশ স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। শৈশব-কৈশোর-যৌবনের উদ্দাম দিনগুলো তিনি অতিক্রম করেছেন কুমিল্লা-নোয়াখালী-ঢাকার নানা জায়গায়। জন্মস্থান হিসেবে কুমিল্লা তাঁর কাছে ছিল তীর্থ, নোয়াখালীর স্মৃতি তাঁর স্বপ্নে মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে, কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখতে শিখেছেন ঢাকা শহরে, পুরানা পল্টনে অতিক্রান্ত ছয় বছরের নানা রঙের দিনগুলোতে, যদিও তিনি সর্বসাকুল্যে ঢাকায় কাটিয়েছেন সাড়ে ন'বছর। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দুই বছর সময়ের মধ্যে তাঁর মন 'আশায় সাহসে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো'। এই নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া বুদ্ধদেবের বাকি জীবনের বর্ণিল অভিজ্ঞতা এই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত রূপকেই কেবল গাঢ়তর করেছে। সঙ্গত কারণেই বুদ্ধদেব বসুর মানসচৈতন্যে এই উন্মেষ-আত্মপ্রস্তুতি-আত্মপ্রকাশের সময়টির অম্লান স্বাক্ষর অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁর সৃজনভুবনে ঢাকা শহরের জল-মাটি-মানুষের উপস্থিতি অনিবার্য।

বুদ্ধদেব বসুর শিল্পকর্মে ঢাকা শহরের প্রকৃতি-প্রতিকৃতি অনুসন্ধানের আগে আমরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মৌল প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই ব্যক্তিত্বচিহ্নিত বুদ্ধদেবের উপস্থিতি প্রবল। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে : 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস মূলত তাঁর মর্মকোষ উৎসারিত অভিজ্ঞানের শিল্পভাষ্য। আত্মজৈবনিক উপাদানে গড়ে-ওঠা বুদ্ধদেবের উপন্যাসভুবন, বস্তুত তাঁর ব্যক্তিচেতনারই শিল্পিত প্রতিভাস। তাঁর উপন্যাসে যে-সব নায়কের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাদের সকলের অবয়বেই বিম্বিত হয় ব্যক্তি-বুদ্ধদেবের ছবি, তাদের কণ্ঠে শোনা যায় বুদ্ধদেবের আত্ম-অনুভূতির স্বরগ্রাম।' [বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'উপসংহার' / *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*]। সমালোচকের এই মন্তব্য বুদ্ধদেবের ছোটগল্প, কবিতা– এমনকি প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে সগর্ভ ও প্রভাবশীল' সময় ঢাকায় কেটেছে। ফলে তাঁর সাহিত্য স্বপ্ন ও স্মৃতির শহর ঢাকার ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নানা আয়োজন-উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর চিত্রল উপস্থাপনায় শিল্পসাহিত্যে ঢাকার দিনগুলো বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়েছে। এতে তাঁর অভিজ্ঞতার নানা প্রান্ত যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি কবিকল্পনার বর্ণিল ছটায় ঢাকা হয়ে উঠেছে রোমান্টিক স্বপ্নশহর। বর্তমান নিবন্ধে আমরা বুদ্ধদেব বসুর শিল্পসাহিত্যের ভেতর থেকে ঢাকা শহরের নিজস্ব চারিত্র্য অনুসন্ধানের প্রয়াস পাবো।

বুদ্ধদেব বসু উনিশশো তেইশ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন, তার টুকরো স্মৃতি ছড়িয়ে আছে *আমার*

ছেলেবেলা গ্রন্থে। তবে বুদ্ধদেবের ঢাকা শহরের শুরু বলতে আমরা এই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময়টিকে ধরে নিতে চাই। তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাস ছয়েক আগে তাঁর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহের মৃত্যু হলে তিনি দিদিমা স্বর্ণলতার মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে আশ্রয় নেন। 'তিনিও (নগেন্দ্রনাথ) পুলিশ বিভাগে কর্ম করেন, থাকেন নগরপ্রান্তিক লালবাগে একটি সুন্দর বাড়িতে, পুলিশ-লাইনের ময়দানের মুখোমুখি'। এখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ চুকোলেন তিনি। পরীক্ষার পর 'লম্বা গ্রীষ্মের ছুটিতে দু-একমাস কাটলো আর্মানিটোলায়'। লালবাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নেই বুদ্ধদেবের রচনায়, কিন্তু আর্মানিটোলার পিকচার-হাউস– যা ছিল সেই সময়ের ঢাকা শহরের একমাত্র ছবিঘর– এর বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরান ঢাকার বাসিন্দা 'ঢাকাইয়া কুট্টি' সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, 'পিকচার-হাউসের ভিতরটার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে এই 'কুট্টি'-সম্প্রদায়কে– লুঙ্গি আর রঙিন গেঞ্জি পরনে, মুখে রসিকতার ফুলঝুরি, শপথ-বুলিতে চ্যাম্পিয়ন, ভাঙা-উর্দু আর খাস ঢাকাই বাংলা মেশানো যাদের মুখের ভাষা গাড়োয়ানের হাতে চাবুকের মতোই কনকনে...।' [আমার ছেলেবেলা]। ছবিঘরের ইট-কাঠ-তক্তাপোশসহ এর আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কেই কেবল নয়, ছবির 'বিজ্ঞাপনের রগরগে বিশেষণগুলো' পর্যন্ত বিবৃত করেন তিনি। ছবিঘরের লম্বা টুলে ঘেঁষাঘেঁষি বসে কিংবা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'বীর এডি পলো, বলবান এল্মো লিঙ্কন, আর অবশ্য অরণ্যবাসী মহান টার্জান– এদের হাজার-বিজয়ী রোমাঞ্চ-সিরিজ' উপভোগ করতে করতে বুদ্ধদেব তাঁর চারপাশের মানুষজনকেও নিবিড়ভাবে পাঠ করেন। তাঁর ভাষায়–

> আমার কানে অর্গ্যান আর বেহালার বাজনা, আমার নাকে বিড়ির ধোঁয়ার ঘন গন্ধ– যার উৎস আমার চার-আনা-মহলের প্রতিবেশীরা, ঢাকার চলতি ভাষায় যাদের বলা হয় 'কুট্টি'– গাড়োয়ান, ফেরিওলা, বাখরখানিওলা, রাজমিস্ত্রি, এমনি সব। তারা ইংরেজি অক্ষর চেনে না, জানে না কোথায় আফ্রিকা বা আমেরিকা, কিন্তু সবচেয়ে সহৃদয় আর সরব দর্শক তারাই– ঠিক বুঝে নেয় কোথায় কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে; সারাক্ষণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ফিল্মের লোকগুলোর দিকে, সময় বুঝে 'আবে! মার্দিস!' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে, যৌথভাবে হাততালি দেয়, নায়কের শত্রুপক্ষীয় ষণ্ডাগুলোর মুণ্ডপাত করে...।
>
> [*আমার ছেলেবেলা*]

মৌলিনাথ উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টন অনেকটা ছবির মতোই বিচিত্র-বর্ণিল-বিহ্বল রূপকল্পে উদ্ভাসিত। মৌলিনাথের উন্মেষ থেকে বিকাশ, আত্মপ্রস্তুতি থেকে আত্মপ্রকাশের নানা ধাপের সঙ্গে নির্মীয়মাণ মহানগরীকে সমীকৃত করেছেন তিনি। মৌলির বসতি শহরের বাইরে। শহরে পৌঁছতে তাকে অতিক্রম করতে হয় প্রায় এক মাইল, রেললাইনের ঘুন্টি-গেট পেরিয়ে তবেই 'গন্ধে আর গোলমালে ভরা ঢাকা শহর, যার বিখ্যাত ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার খুরে ঐতিহাসিক ধুলো উড়ছে, হাওয়ায় যার প্রাদেশিক ভাষার লয়দার আলস্য ছড়ানো, আর তারই সঙ্গে বকনি বুলির প্রখর সুর–বণিকশ্রেণীর কড়া অথচ মিষ্টি টান, আর তার চেয়েও বিশিষ্ট, আশ্চর্য, একেবারেই স্থানীয় এবং স্বতন্ত্র, উর্দু-ভাষার তিনমিশেলি রবোল্লাস– আর যার, সেই পুরোনো এবং পরিতৃপ্ত শহরের, শাঁখা শাড়ি বাকরখানির অলি-গলি এঁকে-বেঁকে শেষ হয়েছে বিশীর্ণ বুড়িগঙ্গার ধারে নবাববাড়ির লাল পাথরের সূর্যাস্তচ্ছটায়'। এভাবেই বুদ্ধদেবের বর্ণনায় পুরান ঢাকার জীবন-জীবিকা-ইতিহাস-ঐতিহ্য পাঠকের চোখে অবয়বপ্রাপ্ত হয়। মৌলিনাথের স্বপ্নময়তার সঙ্গে বর্ধিষ্ণু শহরের এসব আয়োজন যুক্ত হয়ে তাঁর

চিত্তচাঞ্চল্যকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। বুদ্ধদেবের ঢাকার বর্ণনায় কখনো কখনো গৌরবদীপ্ত অতিশয়োক্তির আভাস পাঠকের চোখে পড়বে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর কবিকল্পনাজাত এসব উচ্চারণ আমাদের বোধে-বিশ্বাসে কোনো বিরোধ রচনা করে না। বিদগ্ধ ভাষায় এবং বিহ্বল ভালোবাসায় এই ঢাকা আমাদেরও স্বপ্ন-শহর হয়ে ওঠে–

> এই ঢাকা, যা লক্ষণযুক্ত, চিহ্নিত, সময়ের স্বাক্ষরে প্রামাণ্য এবং জীর্ণতাস্পৃষ্ট, তার সঙ্গে আড়ি ক'রে, রেষারেষি ক'রে, অথচ অস্তিত্বের জন্য তারই উপর নির্ভর ক'রে স্ফুট হয়েছে উত্তরবর্তী অভিনব রমনা, বাতিল হওয়া বঙ্গভঙ্গের সুখস্মৃতিবহ উপনগর– কিংবা উপবন– বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন, জ্ঞানী, গুণী, ছাত্রছাত্রী–মহিলামুক্তির বিহারভূমি, আধুনিকতার পীঠস্থান।
>
> এই রমনারই পূর্ব প্রান্তে, আকাশে-বাতাসে তারই সমান অংশীদার, কিন্তু গৌরবের ভারে গম্ভীর নয়, অপরিণত, সদ্য আরব্ধ, জায়মান পুরানা পল্টন। দক্ষিণে তার মাইল-ছড়ানো মাঠ, দূরের দিকে ফুটবল খেলার জনতালোভন প্রাঙ্গণ, কিন্তু কাছে এলে শুধুই প্রান্তর–হাওয়া আর আলো ছাড়া কিছুই খেলে না সেখানে;–আর প্রান্তর-পাড়ার সীমান্তরেখাও স্পষ্ট হতো না, যদি না দাঁড়াতো, দাঁড়িয়ে থাকতো, ম্যুনিসিপালিটির কাঁচা রাস্তায় শুকনো পাতার বংশাবলী ঝরিয়ে, আকাশ ভ'রে অবিরল মর্মরধ্বনি তুলে, অচল-চঞ্চলের মিলন তোরণের মতো উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান একটা বটগাছ।
>
> [*মৌলিনাথ*]

প্রাবন্ধিক-সমালোচক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ *মৌলিনাথ* উপন্যাসে এই উন্নত-প্রশস্ত-বলিষ্ঠ বটগাছের ভেতরে মৌলিনাথের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। তাঁর মতে 'নির্মীয়মাণ শহরের বুকে বিশাল বটগাছের একাকিত্ব মৌলিনাথের প্রাতিস্বিকতার রূপক ব্যঞ্জনা। বুদ্ধদেব বসু শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় এই বটগাছের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মৌলিনাথের নৈঃসঙ্গ্যকে সমীকৃত করেছেন। বটগাছের দিগন্তবিস্তার মৌলিনাথের কাছে আপন অস্তিত্ববিস্তারের অনুপ্রাণনা হয়ে দেখা দিয়েছে' ['বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে ঢাকা শহর'/ *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*]। এই গাছের অস্তিত্বহীনতার আশঙ্কায় মৌলিনাথের অস্থিরতা সমালোচকের উপর্যুক্ত মন্তব্যকে অর্থবহ এবং অনিবার্য করে তোলে। ঝড়-বৃষ্টি-বাজের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে যে গাছ আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে, জ্যোৎস্নাস্নাত রাতকে সবুজ পাতার স্নেহজড়ানো লক্ষ লক্ষ জলের টপটপ বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দিয়েছে, সেই গাছের সঙ্গে মৌলির প্রগাঢ় বন্ধনকে বুদ্ধদেব চিত্রিত করেন এভাবে : 'এই গাছ কেটে ফেলবে ওরা; বোবা হয়ে যাবে মাঠ, বিধবা হবে দৃষ্টি, বর্ষার তানপুরোর তার ছিঁড়ে যাবে। একটা নিঃশ্বাস ওঠে এলো মৌলির বুকের ভেতর থেকে। আমি– আমিও থাকবো না'। রমনার এই বটগাছটি বুদ্ধদেব বসুর মানসভূমিতে এমন প্রগাঢ়ভাবে শেকড় বিস্তার করেছিল যে, পুরানা পল্টন বিষয়ক যে কোনো আলোচনায়, মুহূর্তের জন্য হলেও, তিনি এই গাছটির ছায়ায় এসে বসেছেন। *আমার ছেলেবেলা*-য় তিনি একাধিকবার এই বটবৃক্ষের আবেগঘন বর্ণনা দিয়েছেন। লেখকের দিদিমা, ইটের পাঁচিলে ঘেরা ঘর, আর এই বটগাছটি কী অভিনব ব্যঞ্জনায় আমাদের অনুভূতিকে আলোড়িত করে : 'খোলা মাঠের মধ্যে একলা সেই টিনের ঘরটা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে উনুন হ'য়ে ওঠে, আর মাঘের রাত্রে বরফের বাক্স– দিদিমা দেয়ালগুলোতে খবর-কাগজ এঁটে কিঞ্চিত শীত ঠেকিয়েছেন। ঘরে ব'সে শুনি শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে ঝর্ঝর, কোনো স্তব্ধ রাতে আঁতুড়ের শিশুর গলায় কান্না– বটগাছে কোনো পক্ষীশাবক ডেকে উঠলো'। তাঁর 'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধে অবশ্য দুইটি বটগাছের

কথা জানা যায়। একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে তিনি এই গাছ দুটির ছবি এঁকেছেন। তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডে এখনো অবিকল–অবিরল এই এই গাছ দুটোর নানা আচরণ-পরিবর্তন-পরিবর্ধন, নতুন পাতা গজানো, পাতা ঝরে পড়া, জট-বাঁধা প্রকাণ্ড বুনো শরীর, উতল হাওয়ায় এর অশান্ত, অশ্রান্ত মর্মর ধ্বনি– বুদ্ধদেবের ঢাকা-যাপনকে অভিষিক্ত করেছিল। এই বৃক্ষের প্রতি কবির অনুভব আবেগঘন কাব্যময়তায় পরিস্ফুট হয়েছে। বটবৃক্ষের শেকড়ে পুষ্টি জুগিয়েছে যে মাটি, সেই মাটির প্রতি কবির টানই এর রূপকল্পে অবয়বপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য–

> ঘন অন্ধকারে সমস্ত মাঠ যখন হারিয়ে গেছে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে গাছ দুটোর পরিচিত বিশাল আকার ফুটে উঠেছে আমার চোখের সামনে– মনে ভারি আরাম পেয়েছি। শেষের দিকে একটা গাছে একপাল শকুন বাসা বেঁধেছিলো; বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে তাদের পাখা-ঝাপটানি আর শকুন-ছানার মানুষের মতো ডাক শুনে ভয় পেতে ভালোবাসতুম। চ'লে আসবার কয়েকদিন আগে শুনেছিলুম পাড়ার সব প্রবীণরা মিলে একত্র হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন গাছ দুটো কেটে ফেলার জন্য; তাঁদের ধারণা হয়েছে, ঐ শকুনদের জন্য পাড়ায় নানা রকম ব্যাধি ছড়াচ্ছে। আমার কপাল ভালো; পুরানা পল্টনের উপর সভ্যতার এই শেষ আঘাত অনুষ্ঠিত হবার আগেই আমি ও-পাড়া ছাড়তে পেরেছিলুম।
>
> ['পুরানা পল্টন' / *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*]

পুরানা পল্টনের টিনের ঘরে কাটানো বুদ্ধদেবের ছ-বছর নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এখানেই তিনি সমস্ত কলেজজীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায় এবং যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করেছেন। বুদ্ধদেবের বিবেচনায় 'এ-সময়ে মন আশ্চর্য দ্রুত গতিতে গড়ে ও'ঠে; এক বছরে মানুষ পাঁচ বছর বাড়ে। মনের তখন সবে পাখা গজিয়েছে; সে দূর থেকে আরো দূরে উড়ে-উড়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করে; জীবন সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতায় প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করে নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি।' বুদ্ধদেব তাঁর মনের ভিত রচনার এই সময়টিকে বিভিন্ন রচনার ভেতর দিয়ে উদ্‌যাপন করেছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোতে পুরানা পল্টনের রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ লেগে আছে :

> ক. [১৯৩২]
>
> এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিলো তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশনে পাওয়া সাব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছেন এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেলো, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হলো না।
>
> আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিলো, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিলো পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিলো এবড়োথেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হল্‌দে-হল্‌দে-সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর!
>
> ['আমরা তিনজন' / *এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে*]
>
> খ. [১৯৩২]

পুরানা পল্টন– অনেক দিন আগে যে-মেয়েকে ভালোবাসতাম, হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলো। এককালে যে নিতান্ত আপন ছিলো, তার নাম আজ কানে ঠেকছে নতুন। অবাক হতে হয়– তার সঙ্গে অতদিনের ঘনিষ্ঠতা– তা কি সত্যি? সেদিন হয়তো তাকে ইচ্ছে ক'রেই ছেড়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তার নামের শব্দে মধুরতা, বিষাদ। পুরানা পল্টন যেদিন শেষবারের মতো ছেড়ে এলুম সেই স্থানবিশেষের জন্য সেদিন আমার মনে একটুও দুঃখ হয়নি। বরং ঢাকা ছাড়তে পেরে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।...আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কোন জায়গা, আমি অনায়াসে উত্তর দিই : পুরানা পল্টন।

['পুরানা পল্টন' / *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*]

গ. [১৯৭২]

আমরা প্রথম যখন পুরানা পল্টনে এলাম তথন এবড়োখেবড়ো মাঠের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো তিনটি মাত্র বাড়ি উঠেছে, আরো দু-একটা নির্মীয়মাণ। সবগুলোই পশ্চিম বাংলার ভাষায় কোঠাবাড়ি– পূর্ববাংলায় বলে দালান– শুধু আমাদেরটাই নয়। উত্তরে অনেকখানি জমি ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ ঘেঁষে লম্বা একটি টিনের ঘর তুলেছেন দিদিমা, ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

[*আমার ছেলেবেলা*]

পুরানা পল্টন বিষয়ে বুদ্ধদেবের আবেগ-উচ্ছ্বাস অনাস্বাদিত কবিত্বময়তায় মুদ্রিত হয়েছে। 'মেঘের খেলা, চাঁদের ভাঙা গড়া, রোদ্দুরের রং-বদল, আর স্বপ্ন, কিছু'– এইসব নিয়ে পুরানা পল্টনে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণের সময়ও তাঁর অনাবিল চিত্রময়তায় আমাদের মনে পড়ে কবি-প্রাবন্ধিক-গবেষক হুমায়ুন আজাদের উজ্জ্বল উক্তি : 'তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্যের সকল সড়কে, কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের মতোই, কবি।' ['কালের পুতুল-এর কালপুরুষ' / *আধার ও আধেয়*]। পুরানা পল্টনের বর্ষার বর্ণনায় বুদ্ধদেবের বিহ্বল-ভাবনা পাঠকের চিন্তার আঙিনায়ও এক পশলা বৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়।

নীলাঞ্জনের খাতা উপন্যাসে ঢাকা শহরের খণ্ড খণ্ড চিত্র এঁকেছেন বুদ্ধদেব। বরিশালের লঞ্চে হুতোমগঞ্জের গিরিজা মজুমদারের সঙ্গে নীলাঞ্জনের কথোপকথনের নানা পর্যায়ে ঢাকার প্রসঙ্গ এসেছে। পরিচয়ের পরপরই গিরিজা-নীলাঞ্জনের আলোচনা ঢাকায় এসে পৌছেছে, 'আজকাল ঢাকায় থাকি আমরা।' গিরিজাবাবু বলেন, 'তোমার বাবা এখন ঢাকা পোস্টেড? বাঃ, আমিও যে সেখানে। ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে এসেছিলাম। তা পৃথ্বীশবাবু নতুন এসেছেন বোধ হয় ঢাকায়– নয়তো আমি কি আর না জানতাম!'। গিরিজাবাবুর কন্যা মিলির সঙ্গে নীলুর প্রথম দিনের আলাপের বিষয়ও ঢাকা। বিশেষ করে ঢাকার টিকাটুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে মিলির উচ্ছ্বাস যেন ঝর্ণার মতো বেজে ওঠে।

'কোথায় থাকো তোমরা ঢাকায়?'

'টিকাটুলিতে।'

'সত্যি ও মা শুনেছো, নীলুরাও টিকাটুলিতে থাকে! আমাদের কাছেই হবে– না?'

[*নীলাঞ্জনের খাতা*]

পরের দিন সকালে দু'জনের আলাপচারিতায় পুরান ঢাকার অলিগলির একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। পুরান ঢাকার এই বর্ণিল পথে চলতে চলতে মিলির অন্তর্জগতে প্রবেশের পথটিও রচনা করে নেয় নীলাঞ্জন।

'কোথায় বলো তো তোমাদের বাড়িটা? গোলাপবাগিচার কাছে?'

'না, ওদিকে না। রামকৃষ্ণ মিশন চেনো?'

'তা আর কে না চেনে।'

'সেটা ছাড়িয়ে একটা আমবাগান আছে। তার পরে।'

'তা'হলে আর এমন দূর কী। আমাদের বাড়ির নাম গগন-কুটির।'

'লাল রঙের?'

'ঠিক! লাল রঙের। তুমি চেনো তা'হলে! রেল-লাইনের ধারে। দোতলায় মস্ত বারান্দা আছে। আর ছাদে মন্দিরের মতো চমৎকার চিলেকোঠা।'

[*নীলাঞ্জনের খাতা*]

বুদ্ধদেব বসু পুরান ঢাকার পথঘাটের এমন বর্ণনা দেন যার সঙ্গে বালজাকের প্যারিস-বর্ণনার তুলনা হতে পারে। বালজাক সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন, 'বালজাক তাঁর প্যারিসকে এতই ভালোবাসতেন যে তাঁর কোনো চরিত্র বাড়ি ছেড়ে বেরুলে সে কোন-কোন রাস্তা দিয়ে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে– কোথায় ডানদিকে মোড় নেবে আর কোথায় বাঁ দিকে– তা বিশদভাবে উল্লেখ করবার মায়া পর্যন্ত তিনি কাটাতে পারতেন না।' ['কলকাতা' / *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*]। বুদ্ধদেবের টিকাটুলি-নারিন্দা-রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকার যে ছবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি তার সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক মূল্যও কম নয়। নিচের দৃষ্টান্তটি অনুধাবনযোগ্য–

> ডেপুটি মুন্সেফ চাকুরের পাড়া টিকাটুলি; তার একটা মুখ রেল-লাইন পেরিয়ে, কবরখানার পাশ দিয়ে আধা-গরিব নারিন্দার দিকে চলে গেছে, আর-একদিকে শেষ সীমা রামকৃষ্ণ মিশন। সেই সীমা ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি, সত্যি বলতে গ্রামের মধ্যে।
>
> [*নীলাঞ্জনের খাতা*]

পুরান ঢাকা সম্পর্কে আবেগবিহ্বল বর্ণনা রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর নানা রচনায়। *গোলাপ কেন কালো* উপন্যাসের নায়ক রণজিৎ দত্তের বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতার ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে বারবার ঢাকার প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সময়ের ঢাকা শহরের রক্ষণশীল পরিবেশ যেমন এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, তেমনি রণজিতের মানসচারিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অনিবার্যভাবে তার ঢাকার দিনগুলোর শরণ নেয়া হয়েছে। নায়কের আত্মচরিত চিত্রণে ধরা পড়েছে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছবি : 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি লাজুক ছিলুম তখন– মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড লাজুক, মনে-মনে এখনো আছি। না, শুধু আমার বয়স বা সময়ের জন্য নয়, ঢাকা শহরের বাঁধাবাঁধি আবহাওয়ার জন্যও নয়– আমার স্বভাবই ঐ। আমি চিন্তাশীল আমি দ্বিধান্বিত; জগতের সঙ্গে আমার ব্যবহারেও তাই স্বাচ্ছন্দ্য নেই...'। রণজিতের রাজনীতিবিচ্ছিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায় তার শৈশবের ঢাকার অনুষঙ্গে : 'না মশাই, আমি স্বদেশীওলা ছিলুম না কোনোদিন। সমস্ত ছেলেবেলাটা ঢাকায় কাটিয়েও কোনো দাদার দলে ভিড়িনি, মহাত্মা গান্ধীর চ্যালা হ'য়ে খদ্দরও পরিনি কখনো'। আবার প্রৌঢ় রণজিতের স্মৃতিচারণেও ঢাকায় ফেরার আকুলতা প্রকাশ পায়, 'আসুন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকায় ফিরে যাই। আমার আপনার যৌবনের দিনে'। বিশ-তিরিশ দশকের ঢাকা শহর দাঙ্গা, 'সন্ত্রাসবাদ'সহ নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অস্থির ছিল। এই অস্থিরতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। বিপন্ন সময়ের অনুষঙ্গে ঢাকার কথা মনে পড়ে রণজিতের, 'য়ুনিভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে, শহর অচল, রোজ রাত্রে যুদ্ধের হুংকার, আর্তের চিৎকার,

আগুনের উল্লাস, ঘুম নেই। আমরা ঢাকার ছেলে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নতুন নয় আমাদের কাছে, কিন্তু আগে যাকে মনে হতো শুধু উপদ্রব, বিশ্রী একটা অসুবিধের ব্যাপার, এবারে তা রীতিমতো যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে…'। পুরানো ঢাকার শাঁখারিবাজার সম্পর্কে একটি নিখুঁত ছবি আছে এই উপন্যাসে। এখানকার সরু গলিগুলোর ভেতরে শাঁখা-শিল্পীদের জীবন-জীবিকার একটি ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বাণীবদ্ধ হয়েছে–

> তুমি হয়তো হাসবে শুনে, তবু বলি। বুলবুল, কোনো চৈত্রমাসের দুপুরবেলায় শাঁখারিবাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটেছো কোনো দিন? কী আশ্চর্য সেই সরু, ছোট্ট, পুরানো গলিটি, দু-দিকে গায়ে-গা-ঠেকানো তেতলা-চারতলা চক-মিলানো বাড়িগুলি, রোদ ঢুকতে পায় না সেই গলিতে– পা দেয়া মাত্র কেমন একটা সোঁদা ভ্যাপসা, স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ, শাঁখের করাতের ধারালো আওয়াজ সব সময়, হয়তো দু-শো বা তিনশো বছর ধ'রে এই একই শাঁখা-তৈরির কাজ ক'রে যাচ্ছে এরা, রোদের অভাবে শিটিয়ে শাদা হ'য়ে গেছে গায়ের রং, ঐ একটি গলির মধ্যে চলছে তাদের বংশানুক্রমে সমস্ত জীবন-জীবিকা-অস্তিত্ব।
>
> [*গোলাপ কেন কালো*]

বুদ্ধদেব বসুর *লাল মেঘ* উপন্যাসের নায়িকা শোভনার হাতে অবিনাশের দেয়া এই ঢাকাই শাঁখা কী গভীরতর তাৎপর্যে অবিনাশ-সন্ধ্যামণি-শোভনার ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, বিশেষ করে শোভনার ব্যর্থ-পরাজিত জীবনের দীর্ঘশ্বাসকে ধারণ করে আছে। কাঁধ পর্যন্ত উঁচু বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকা শোভার পায়ের কাছে রোদ এসে পড়েছে। শরীরের সমস্ত সৌন্দর্য ঝরে পড়লেও তার কিছু কিছু চিহ্ন যেন টের পায় সে। ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়া নাকের সৌন্দর্যের কথা ভাবে, মাংসহীন ঢিলে মুখ মনে করে দীর্ঘশ্বাস-ভারাক্রান্ত হয়। শীর্ণ হাতের খোঁচা খোঁচা হাড়কে চুড়ির ভার থেকে মুক্তি দিয়েছে সে নিজেই–

> একটা প্রমাণ তবু রইলো, বাঁ হাতে তার শাঁখা, তার এয়োতির চিহ্ন, সূক্ষ্ম কাজ-করা ঢাকাই শাঁখা। জিনিসটা ছোট্ট আর সুন্দর, কিন্তু এখন তা দেখায় যেন প্রকাণ্ড শাদা একটা চাকা দাঁত বের করে রয়েছে। সেটা শোভা ছাড়বে না। যদি সে মরে, সেই শাঁখা আর কপালময় সিঁদুর নিয়ে মরবে, সধবার পরম গৌরব নিয়ে। মরতে-মরতেও সে ছাড়বে না তার স্ত্রীর-অধিকার। মরতে-মরতেও সে স্বামীকে বেঁধে রাখবে তার হাতে, ঐ শাঁখার শাদা চাকার মধ্যে– শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্ত্রীত্বের সগৌরব বিজ্ঞাপন। মৃত্যুতেই কি এর সমাপ্তি– এ যে জন্ম-জন্মান্তরের।
>
> [*লাল মেঘ*]

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে এভাবেই পুরান ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। এসব খণ্ডচিত্রকে সূত্রবদ্ধ করে বিশ-তিরিশ দশকের বর্ধিষ্ণু ঢাকা শহরের একটি ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করা সম্ভব। বুদ্ধদেব যে সময়টা ঢাকায় কাটিয়েছেন, তখন তাঁর আক্ষরিক অর্থেই স্বপ্নে দেখার বয়স। ফলে এক অসাধারণ স্বপ্নময়তায় নিমজ্জিত বুদ্ধদেবের ঢাকা শহরকেই আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাঠ করি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'তাঁর স্মৃতির ঢাকা মূলত আবেগশাসিত এক কবির হার্দ্য আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত রোমান্টিকতার প্রলেপ-জড়ানো এক নগর মাত্র। নগরের রুক্ষতা-কোলাহল-চিৎকার আর অলি-গলি-ফুটপাত বুদ্ধদেবকে কখনো আকর্ষণ করেনি, বরং তিনি সন্ধান করেছেন করেছেন শহরের বহির্প্রান্তে ক্রমে বেড়ে-ওঠা গ্রামশোভন প্রকৃতিনিষ্ঠ নির্মীয়মাণ

এক শহরের আত্মিক-সৌরভ।' [বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে ঢাকা শহর'/ *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*]। ফলে তাঁর দেখা ঢাকা শহরে মস্তিষ্কপ্রসূত দু'চারটি অলিগলি-খানাখন্দ-মাঠপ্রান্তর যুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঢাকার জনজীবনে তাঁর সেই স্বপ্নগুলো সত্যে পরিণত হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। তাঁর ঢাকা কবিকল্পনায় অধরা আনন্দের আবির ছড়ালেও তা পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক জীবনবৃত্তান্ত ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোতে ঢাকার রমনা, মগবাজার, ওয়ারির র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট, লক্ষ্মীবাজার, ভিক্টোরিয়া পার্ক, নবাবপুর প্রভৃতি স্থানের টুকরো স্মৃতি বিধৃত হয়েছে :

> ক. [১৯৩১]
>
> বাস্তবিক, কী-সুন্দর এই রমনা, রাতের রমনা!... তাদের বাড়িটি রমনার একেবারে শেষ সীমান্তে– এর পেছনে আর ভদ্রপল্লী নেই, পাকা সড়ক একটু এগিয়েই শেষ হ'য়ে গেছে; তারপরে একটা শুকনো খাল, এবং সেই খালের ওপারেই খাঁটি পাড়া-গাঁ আরম্ভ হলো (বস্তি নয় ভাগ্যিশ!)– মগের মুলুক– না, না, মগবাজার। মগবাজার– কী অদ্ভুত নাম।
>
> [*অকর্মণ্য*]

> খ. [১৯৭২]
>
> আমার ঢাকায় আসার পরে একমাসও কাটেনি। আছি ওয়ারিতে তেইশ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে– পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডওলা পরিচ্ছন্ন একটি এক তলায়। একদিন বেলা দশটা নাগাদ বাইরে কড়া ন'ড়ে উঠলো; আমি দরজা খুলে দেখি, একটি অচেনা যুবক সাইকেলের হাতল ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।... দু-একটি কথার পরে বোঝা গেলো তিনি (প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা, বুদ্ধদেবের 'বুদ্ধু-দা') আমারই কাছে এসেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নিবিড় হ'য়ে উঠলো যোগাযোগ। প্রায়ই যাই লক্ষ্মীবাজারে তাঁদের বাড়িতে– আমার জীবনে আড্ডার স্বাদ সেখানেই প্রথম।
>
> [*আমার ছেলেবেলা*]

> গ. [১৯৩২]
>
> ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলটি অনেক নামজাদা– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমল থেকেই মর্যাদাবান। দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার প্রধান নাগরিক অঞ্চলে সগৌরবে, গোল মোটা রোমক-থামওলা উন্নতশির অট্টালিকা– পূর্বযুগে এটাই ছিলো ঢাকা কলেজ। সামনে ভিক্টোরিয়া পার্ক, আশে-পাশে অনেকগুলো বড়ো রাস্তার মোড়, এক মিনিট দূরে সুন্দর গড়নের হলুদ-রঙা একটি গির্জে, ... সিঁড়ি, মেঝে, বারান্দা সব তকতকে পরিষ্কার; ক্লাশ-ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া প্রচুর খেলে, কিন্তু কম্পাউন্ড পেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ লেশমাত্র পৌঁছায় না।
>
> [*আমার ছেলেবেলা*]

> ঘ. [১৯৭৩]
>
> শুনতে পাই, ঢাকা আজকাল বিলকুল বদলে গিয়েছে; তাই যে-শহরের পথে-পথে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, তার কিঞ্চিত বিবরণ লিখতে লুব্ধ হচ্ছি। আরম্ভ করা যাক রমনাসীমান্ত লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে : এতক্ষণ বিকেল ছিলো জ্বলজ্বলে, কিন্তু নবাবপুর ধরে চলতে-চলতে ছায়া করে এলো, আমার দু'দিকে বাড়ি, দোকান, ঘেঁষাঘেঁষি; আমার ডাইনে রইলো পাঠ্যবই-বিক্রেতা প্রসাধনহীন অ্যালবার্ট লাইব্রেরি, যেখানে এক শ্মশ্রুমান সমর্থ বৃদ্ধ বসে থাকেন অর্ধদগ্ধ চুরুট মুখে নিয়ে সারাদিন; আমার বাঁয়ে পড়লো বিলেতি মদের ঝকঝকে দোকান রায় কোম্পানি, যেখানে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমি

আমার সদ্যস্বাদিত সুপ্রিয় চকোলেট কিনতাম মাঝে-মাঝে– সেই ছেলেমানুষি দিন কত দূরে মনে হয় এখন।

[*আমার যৌবন*]

এভাবে ঢাকার বিভিন্ন অলিগলি-পথঘাট-সিঁড়িবাড়ি-অট্টালিকা-স্কুলকলেজ-গির্জামন্দির-দোকানপাট বুদ্ধদেবের নানা রচনায় বিস্তৃত হয়ে আছে। বিশেষ করে নবাবপুরের শ্মশ্রুমান সমর্থ বৃদ্ধ বই-বিক্রেতার হাতের অর্ধদগ্ধ চুরুটের ছবিটিই কেবল আমরা দেখি না, এর গন্ধটিও টের পাই।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক পবিত্র-প্রোজ্জ্বল-গৌরবদীপ্ত পীঠস্থান। গল্পে-উপন্যাসে-স্মৃতিকথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোকে তিনি চিত্রিত করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে কোথাও বর্ণিত হয়েছে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে ঢাকা শহরের চালচিত্র, যা বুদ্ধদেবের ভাষায় 'বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদ'। শৈশব-যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'রুশীয় বিপ্লবের ঢেউ ততদিনে ভারতের তট ছুঁয়েছে– এবং ঢাকাও সেই সময়ে ছিলো বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদের রাজধানী। কিন্তু প্রভুচরণকে বিপ্লবঘেঁষা মানুষ বলেও মনে হয় না– তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ প্রকাশ্যতা ও প্রফুল্লতা, তাঁর চিত্তবৃত্তি রসগ্রাহী ও নান্দনিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পড়ছেন তিনি, কলেজি গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে তাঁর আগ্রহ নানা দিকে বিস্তীর্ণ।' [*আমার ছেলেবেলা*]। 'সবিতা দেবী' গল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ওঠার সময়টিকে চিত্রিত করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু ইতিহাসের নানা উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। বাদশাহী অবকাঠামো কীভাবে বিদ্যায়তনে পরিণত হলো, তার একটি মনোজ্ঞ শব্দচিত্র অঙ্কন করছেন তিনি। বুদ্ধদেবের বিশ্ববিদ্যালয়-ভাবনার ভেতর দিয়ে সেই সময়ের ঢাকা শহরকে আমরা উপলব্ধি করি। 'বন্ধুতা স্থাপন করার, অন্তর্জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করার, রুচি ও অভ্যাস গঠন করার এই সময়' তাঁর রচনায় বিধৃত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন; ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং প্রতিবেশ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি সেই সময়ের নারীদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। সহশিক্ষা চালু থাকলেও মেয়েদের সংকুচিত-সংবৃত অবস্থার বর্ণনায় বুদ্ধদেবের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। *আমার যৌবন* গ্রন্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে, তারা 'যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পৃথক্‌কৃত ও সুরক্ষিত এবং অতি সুকুমার উপবংশ, তাঁরা অবকাশের প্রতিটি মিনিট যাপন করেন তাঁদের পর্দায়িত বিশ্রাম-কক্ষে, অধ্যাপকদের নেতৃত্বে ছাড়া সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হন না। প্রতি ঘণ্টার শুরুতে এবং শেষে করিডরগুলি বিভিন্নমুখী মিছিলে ভ'রে যায় : মহিলাগুচ্ছকে পশ্চাদ্‌বর্তী ক'রে চলেছেন এক-একজন অধ্যাপক, পুনশ্চ নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের কমনরুমের দোরগোড়া পর্যন্ত। ক্লাশে তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা আলাদা, আমাদের বেঞ্চিগুলো থেকে দূরে বসানো চেয়ার : সেখানে তাঁরা চক্ষু নত রাখেন পুঁথির উপর, কোনো প্রশ্ন করেন না অধ্যাপককে, পাঠ্য বিষয়ে হাসির কথা থাকলেও তাঁদের গাম্ভীর্যে টোল পড়ে না।' [*আমার যৌবন*]। ঠিক এই অভিজ্ঞতারই প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর *গোলাপ কেন কালো* উপন্যাসের নায়ক রণজিতের মন্তব্যে। এ-প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো প্রণিধানযোগ্য :

ক. [১৯২৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল বাদশাহি ধরনের। লর্ড কর্জন যখন বাংলাকে দু'টুকরো করেছিলেন তখন ঢাকা শহরকে গবর্মেন্টের একটি পীঠস্থানরূপে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো;

সেই প্রস্তুতির নামই রমনা। বঙ্গ-ভঙ্গ নাকচ হ'য়ে যাবার পর প্রায় সমস্ত রমনাটাকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাস করে বসলো। সেক্রেটারিএটের ঘরগুলি বিদ্বজ্জনের বক্তৃতায় গুমগুম করতে লাগলো, লাটের নাচঘরে পরীক্ষার আপিশ, দরবার-ভবনে ল্যাবরেটরি এবং সরকারি স্বর্গের কেষ্ট-বিষ্টুদের জন্য যেসব বিলেতি ছাঁদের বাসভবন তৈরি করা হয়েছিলো, সেগুলিতে জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন দিক্‌পালেরা বিরাজ করতে লাগলেন। রমনার উত্তর-প্রান্তে দু'চারঘর জজ-মাজিস্টরও রইলেন, একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও শ্বেতাঙ্গদের ক্লাবঘরও রইলো, কিন্তু সেগুলি রমনার অলংকার মাত্র। ছাত্র ও ছাত্রী; প্রোফেসার, ডীন; রীডর ও লেকচারার– এরাই রমনার রক্তমাংস।

['সবিতা দেবী' / *গল্পগুচ্ছ*]

খ. [১৯৩২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম, তখন থেকে আমার মধ্যে যেন নতুন জীবন এলো। আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ দলটি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র– এবং দু-একজন ছাড়া সকলেই জগন্নাথ হল-এ সংলগ্ন। ... বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিধি এবং নানা বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতায় প্রথমটায় একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। লেখা, পড়া, হাসি, গল্প, আড্ডা– প্রাণশক্তি খরস্রোতে ব'য়ে চললো নানাদিকে। প্রতি মুহূর্ত সজাগ, প্রতি মুহূর্ত মধুর। বাড়িতে আড্ডা, বিশ্ববিদ্যালয়ও আর-একটা আড্ডার জায়গা ছাড়া কিছু নয়।

['পুরানা পল্টন' / *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*]

গ. [১৯৬০]

'বাঃ, ঢাকার দ্রষ্টব্য সবই তো দেখেছি। ঢাকেশ্বরী বাড়ি, রমনার কালীবাড়ি, গোলাপ বাগিচা, লোহার পুল'–

'যত বাজে–! আমাদের ইউনিভার্সিটির দিকে যাওনি কখনো– গিয়েছো?'

'রমনার কালীবাড়ি যেতে পথে পড়ে তো।'

'সে আর কতটুকু! একদিন যাবে আমার সঙ্গে? গান-বাজনা নাটক হয় মাঝে-মাঝে– নাকি তোমার ও-সব ভালো লাগে না?'

[*নীলাঞ্জনের খাতা*]

ঘ. [১৯৬৮]

আপনার সময়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীসংখ্যা কী-রকম ছিলো? মাপ করবেন, আমি ভুলে যাচ্ছিলাম আপনি আমরই বয়সী, একই সময়ে ছিলুম আমরা ঢাকায়। মনে আছে হস্টেলের মেয়েদের চাল-চলন, সাজগোজ? আধখানা মাথা আঁচলে ঢাকা, সারবন্দী হয়ে হস্টেল থেকে কলেজে আসে, সৈনিকের মতো সমান তালে পা ফেলে, সামনে-পেছনে দু-তিন সারিতে বিভক্ত হয়ে– ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকায় না। জন পনেরো মেয়ে, তরুণী, ছাত্রী, কিন্তু দেখায় বয়স্ক ও গম্ভীর, ধরনটা প্রায় খ্রিষ্টান নান্‌দের মতো; এমনভাবে তারা আবৃত, সংবৃত, যূথচারী– যেন কোনো মঠ থেকে নির্গত হয়েছে এই শুভ্রবসনা সারস্বত ভগিনীরা, কয়েক ঘণ্টা মন্দিরে ঘণ্টা নেড়ে ফিরে যাবে বিকেলে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না-তাকিয়ে।

[*গোলাপ কেন কালো*]

এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু ঢাকা শহরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে চিত্রিত করেছেন। বিশেষ করে সেই সময়ে মেয়েদের অবস্থা তাঁর বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে। ১৯৩৩ সালে লেখা একটি উপন্যাসে বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'মা-র সঙ্গে বেরোচ্ছে বলে– অতশী জুতোটা একবার পায়ে দিয়েও আবার ছেড়ে এলো। মা-র সঙ্গে চলবার সময় জুতো পরতে সে অত্যন্ত সংকোচ বোধ

করতো।' [হে *বিজয়ী বীর*]। এই উপন্যাসের 'গিন্নীরা হিশেবের খাতা না-মিলিয়ে কখনো শুতে যান না, আর মেয়েরা ব্লাউজের হাতা আরো আধ ইঞ্চি তোলার জন্য তাকিয়ে থাকে কলকাতার মুখের দিকে'। বুদ্ধদেবের এই বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে অনেক। সাহিত্যের ভেতরে ইতিহাসের উপাদান-উপকরণ সন্নিবেশে বুদ্ধদেব বসুর নিপুণতা তাঁর রচনার শৈল্পিক ঋদ্ধিতে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে কি-না সেটা ভিন্ন বিবেচনার বিষয়, কিন্তু তাঁর রচনা থেকে পুরান ঢাকার পুনরুদ্ধার সম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়।

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা-প্রবন্ধ-কথাসাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার এসেছে রবীন্দ্রনাথের কথা। আমরা বুদ্ধদেবের ঢাকা শহরেই তাঁর রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম আবিষ্কার করি। আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত বুদ্ধদেব এই ঢাকাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ পান। তাঁর বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথকে দেখার সেই দুর্লভ মুহূর্তটিকে তিনি অত্যন্ত আবেগ-বিহ্বল ভাষায় মুদ্রিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঢাকার নাগরিকদের মতবিরোধের বিষয়টিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে নিম্নের উদ্ধৃতি দুটি লক্ষ করি :

ক. [১৯৭২]

রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম চোখে দেখেছিলাম বুড়িগঙ্গার উপর নোঙর–ফেলা একটি স্টিম-লঞ্চে, যেখানে, নিমন্ত্রণকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি ক'রে, ঢাকার নাগরিকেরা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপরের ডেক্-এ ইজিচেয়ারে বসে আছেন তিনি, ঠিক তাঁর ফটোগ্রাফগুলোর মতোই জোব্বা-পাজামা পরনে– আরো কেউ কেউ উপস্থিত ও সঞ্চরমাণ, রেলিঙে হেলান দিয়ে আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।

[*ছেলেবেলা*]

খ. [১৯৬০]

'রবিবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?'

'রবিবাবু? রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন? তার সঙ্গে আমার আলাপ কবে কেমন করে'

'সে এমন অসম্ভব কী। হতে পারে তিনি 'গীতাঞ্জলি' লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু আপনার আমার মতো একজন মানুষই তো! তাঁকে চোখেও দ্যাখেননি?'

'দেখেছি– ঢাকায় এসেছিলেন গেলো বছর। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করলেন।'

'কাছে যাননি?'

'কাছে যাবো কেন? আর গিয়ে বলবোই বা কী?'

[*নীলাঞ্জনের খাতা*]

বুদ্ধদেবে বসুর কবিতায় ঢাকার উপস্থিতি শোচনীয়ভাবে কম। অধিকাংশ গদ্যরচনার মতো কবিতায়ও বুদ্ধদেবের প্রবল আমিত্ববোধ, ব্যক্তিসত্তা বিস্তৃত হলেও শৈশব-যৌবনের উত্তাল স্মৃতির উজ্জ্বল স্মারক ঢাকা বিষয়ে কবিতায় তাঁর এই নিস্পৃহতা-নীরবতা আমাদের ভাবিত করে। এর আড়ালে বিশেষ কোনো অভিমান লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। 'ঢাকা শহরের প্রতি আমার বিশেষ কোনো প্রীতি নেই; বরং তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে'– গদ্যে তাঁর এই নঞর্থক স্বীকৃতির মধ্যেও ঢাকার প্রতি তাঁর প্রবল প্রীতির পরিচয় বিধৃত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মর্ম্মবাণী* (১৯২৪) কিংবা তাঁর *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) পুরান ঢাকার মাটি-জল-হাওয়ায় পুষ্ট হলেও গ্রন্থদ্বয়ে

কোনো স্থানিক-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। যৌবনের ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিয়ে বন্ধুদের সহযোগে ঢাকার নানাস্থানের একটি অনুপম মালা গেঁথেছিলেন বুদ্ধদেব, যেখানে পুরান ঢাকার জলহাওয়া ও জনজীবন মুদ্রিত না-হলেও তা সেই সময়ের ঢাকার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। 'ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে, / ঠুন্‌কো ঠাঠের 'ঠাঁঠারিবাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক, / ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে, / সৎ 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।'– এর মধ্যে যে ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা যায় তা সন্দেহাতীতভাবেই ঢাকাইয়া, এবং ঢাকার নানা স্থানের নামকরণের মধ্যে যে মধু লুক্কায়িত, বুদ্ধদেবদের রসবোধে তা প্রাণবন্ত-পরিপূর্ণ-প্লাবিত। কিন্তু বুদ্ধদেবের পরিণত বয়সের কবিতার বিস্তৃত অরণ্যে পুরানা পল্টন কিংবা ঢাকার অন্যান্য স্থানের গাছপালা-লতাগুল্ম সেইভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে ওঠেনি। অবশ্য *একদিন : চিরদিন* (১৯৭১) কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় 'আমার চেষ্টা বটগাছের মতো / বেড়ে ওঠে, হাতের মধ্যে পাথর আমার ধৈর্য'– এই পঙ্‌ক্তির বটগাছটির সঙ্গে পুরানা পল্টনের বটবৃক্ষের বিশালতা অঙ্গীকৃত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। তাঁর কবিতায় কলকাতার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য, বিদেশের বিভিন্ন শহর-বন্দরের নাম বাড়াবাড়ি রকমের বেশি, কিন্তু ঢাকার প্রশ্নেই অবিচলিত মৌনতায় নিমজ্জিত হলেন– বাংলাদেশের বুদ্ধদেব-ভক্তদের কাছ এ-এক বিস্ময় হয়েই রইল। *স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১) গ্রন্থের 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় লেখক তাঁর 'অপরিচিতা, অ-দৃষ্টা' মাতা বিনয়কুমারীর প্রতি ঋণ-স্বীকারের অনুষঙ্গে তাঁর আত্মচরিত ও ব্যক্তিচৈতন্যের নানা প্রান্ত উন্মোচন করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে এই বাংলার কথাও বলেছেন : 'এপারে বা ওপারেও বাসিন্দা না-হ'য়ে, শুধু / ভ্রমণেও বিনিময়ে খুঁজে ফেরে অবৈধ কিমিয়া', কিন্তু ঢাকার দিনকাল বিষয়ে যার-পর-নাই নীরব থেকেছেন। এই গ্রন্থের একটি কবিতায় বুদ্ধদেবের অভিমানের বরফ গলে ঝর্ণার মতো গান গেয়ে উঠেছে, শৈশব-যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছেন এবং বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ঢাকা শহরের লতাগুল্ম ও পাউরুটির বর্ণ-গন্ধ তাঁর চেতনার নানা প্রান্তে পল্লবিত হয়েছে। উদ্ধৃতি দুটি বিবেচনা করা যাক :

ক. [১৯২৭]
পাষণ্ড ঐ 'মৈশুণ্ডীর' মুণ্ডে গণ্ডগোল,
'সূত্রাপুরের' সূত্রধর পুত্রেরা কাৎরায়,
'লালবাগে' লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা-লোল,
'জিন্দাবাহার' বৃন্দাবনের নিন্দিছে সন্ধ্যায়।

'বক্সীবাজারে' বাক্সে নক্সা মক্স এক্‌শোবার,
রমা রমণীরা 'রম্‌নায়' রমে রম্যা রম্ভাসম,
'একরামপুরে' বিক্রী মাক্‌ড়ি লাক্‌রি শুক্রবার,
গন্ধে অন্ধ 'নারিন্দ্যা' যেন বিন্দু ইন্দুপম।

চর্ম্মে ঘর্ম্মে 'আর্ম্মেনীটোলা কর্ম্মে বর্ম্মা দেশ,
টাকে-টিকটিক-টিকি 'টিকাটুলি' টিকার টিকীট্ কাটে,
'তাঁতীবাজারের' তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিত্যেস,
'গ্যাণ্ডারিয়ার' ভণ্ড গুণ্ডা চণ্ড চঞ্চু চাটে।

['ঢাকা-ঢিক্কি' / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং অজিতকুমার দত্ত সহযোগে রচিত]

খ. [১৯৭১]

তখনও শিখিনি ভাষা, কিন্তু অনুভব ছিল– তীব্র, সদ্য-জাগরিত,
বিচ্ছুরিত সর্বত্র– কাঁথার স্পর্শে শ্যাওলার বিস্ময়ে,
শব্দের আদরে মাখা অফুরান ছোট্ট রামায়ণে,
আর এই বৃষ্টিও আমারই জন্য লক্ষ্য তার আমারই পুলক,
তার শব্দ শুনে-শুনে আমি যেন নিঃশব্দ ছাড়িয়ে যাই নিজের চিহ্নিত গণ্ডি,
পাই বিনা চেষ্টায় কুড়িয়ে
এমনই আবিষ্ট ভোর– অন্যত্র– অনেক বার,
রমনার বিস্তীর্ণ ঘাসে, ...
মনে পড়ে দোকানে পা দেয়ামাত্র
টাটকা পাউরুটির উন্মন গন্ধ– সূক্ষ্ম, মোদো, কী যেন বলতে চায়–
অন্য কিছু– আমাদের বোধগম্য নয়?
আর বাইরে দেয়ালে আইভিলতা পর্যাপ্ত সবুজ,
শান্ত ও নির্জন পথ, ধীরে বুড়িগঙ্গা বয়ে যায়,
তার সন্ধ্যা নম্র ও রঙিন হ'য়ে
কানে কানে কী যেন বলতে চায়– আমাদের বোধগম্য নয়?

[স্বাগতবিদায় / *স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা*]

বুদ্ধদেবের অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তি-আক্ষেপ-আর্তনাদের বিস্তৃত কাব্যপ্রান্তরে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' লাগা এই ঢাকা যেন এক উচ্ছল-উজ্জ্বল–অবিরল স্রোতস্বিনী। এভাবে তাঁর কবিতায় ঢাকা শহরের যে সৌরভ ছড়িয়ে আছে, তার গৌরবও কম নয়।

বুদ্ধদেব বসুর ঢাকা শহর কবির চোখে দেখা বিশ-তিরিশ দশকের নির্মীয়মাণ মহানগরী। যৌবনের উত্তাল-উদ্বেল প্রহরগুলোকে প্রাণবন্ত করতে গিয়ে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীকেই ঢাকা শহরে পাঠিয়েছেন। স্মৃতিকথায়-প্রবন্ধে বারবার নিজের শৈশব-যৌবনকে নেড়েচেড়ে দেখেছেন তিনি। এই দেখা ও লেখার ভেতর দিয়ে বুদ্ধদেবের ঢাকা শহর বর্ণিল বিভায় মুদ্রিত হয়েছে। *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি* গ্রন্থের 'কলকাতা' শীর্ষক রচনায় 'ভিক্তর উগো সারা প্যারিসকে পকেটে ভ'রে নিয়ে বেড়াতেন' কিংবা 'আনাতোল ফ্রাঁস মাঝে-মাঝে কয়েকটি ছোটো-ছোটো তীক্ষ্ণ কথায় প্যারিসের রূপ যেন পাথরে খোদাই করে রেখে গেছেন'– বুদ্ধদেবের এসব উক্তির আড়ালে প্যারিসের প্রকৃত-প্রাকৃত সৌন্দর্যকে শিল্পসাহিত্যে অন্বেষণ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের একটি বিশেষ বয়সের বিচিত্র ভাব-বৈভবকেও আমরা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে চিত্রিত হতে দেখি।

বুদ্ধদেব বসুর ভালো-মন্দ

নির্মলেন্দু গুণ

কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, সম্পাদক ও বাংলাভাষায় ভিন্নভাষায় রচিত সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক–; –কী নন তিনি? বাংলা সাহিত্যের কোন শাখাটি সমৃদ্ধ হয়নি তাঁর হাতে? তিনি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাভাষার সবচেয়ে সফল সব্যসাচী লেখক। অনেকের মতো আমারও খুব প্রিয় লেখকদের একজন তিনি। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমি তাঁকে নিয়ে বিশেষভাবে গর্বিত এ জন্য যে, অব্যাখ্যাত নিয়তিনির্বন্ধে তিনি বাংলাদেশের জাতক। তাঁর পৈতৃকবাটি বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামে হলেও, ১৯০৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়; এবং ১৯৭৪ সালে তিনি মৃত্যুগ্রহণ করেন কলকাতায়। মাঝখানের ৬৬ বছর, তাঁর জীবৎকাল, যার প্রতিটি মুহূর্ত সফল-সাহিত্যসাধনায় ব্যয় করে বাংলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডকে বিচিত্র এবং বিপুল ফসলে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে জানাই তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাঁর মাকে হারান। প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক লেখক জাঁ জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর মিল আছে। রুশোও জন্মের দিনই তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন এবং তাঁর জীবৎকালও ছিলো, কী আশ্চর্য ৬৬ বছর। জন্মদিনে মাতৃহারা হওয়ার পর থেকে বুদ্ধদেব বসু অতঃপর তাঁর মাতামহ ও মাতামহীর কাছে লালিত-পালিত হন। তাঁর মাতামহ ছিলেন দারোগা। তাই তাঁর মাতামহের কর্মস্থল, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে শেষ দিকে ঢাকায় এসে কিছুদিনের জন্য থিতু হন এবং তাঁর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কাটে ঢাকায়। ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ঢাকার পাট চুকিয়ে দিয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেই তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। তাঁর রচিত ‘আমার ছেলেবেলা’ গ্রন্থে তাঁর পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে নোয়াখালী ও ঢাকায় কাটানো শৈশব ও কৈশোরের- চুম্বক-অভিজ্ঞতার কথা খুব চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। ১৯২৭-২৯, এই তিন বছর ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তিনি কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যৌথসম্পাদনায় ‘প্রগতি’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ১৯ বছর। আমি নিজে দেখিনি যদিও, তবে বিশ্বস্তজনের মুখে শুনেছি, পত্রিকাটি সম্পাদকদ্বয়ের বয়সের তুলনায় বেশ ভারী ছিলো। তারপর ১৯৩৫ সালে কলকাতা থেকে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যৌথসম্পাদনায় তিনি প্রকাশ করেন বাংলাভাষার সর্বকালের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাপত্র ‘কবিতা’। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত চরিতাভিধানের মতে

"আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি, প্রসার ও কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে 'কবিতা'র অবদান অনস্বীকার্য।"

১৯৩৮ সালে তিনি হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। মাঝখানে কিছুদিনের বিরতির পর, ১৯৪০ সাল থেকে 'কবিতা' পত্রিকাটি তিনি একাই দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করেছিলেন। যার কারণে কবিতা পত্রিকা ও তাঁর যোগ্যতর সম্পাদকের হাত ধরে, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বাংলাভাষার বহু গুরুত্বপূর্ণ কবির নবজন্ম হয়েছিল। 'সম্মিলিত তিরিশের কবি'দের পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি শামসুর রাহমানের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

চলতি খ্রিষ্টীয় বর্ষটি হচ্ছে বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ। এ কারণে বাংলা একাডেমীর সাহিত্যপত্র 'উত্তরাধিকার' বুদ্ধদেব বসুর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বুদ্ধদেব বসুর মতো বহুপ্রজ, সব্যসাচী লেখকরচিত রচনাসমূহের মূল্য নির্ণয়ের যোগ্যতা আমি রাখি না। তাঁকে তেমন বিস্তারিতভাবে আমি পাঠও করিনি। বুদ্ধদেবের জন্য এই তথ্যটি বিশেষভাবে অমর্যাদাকর হবে না এজন্য যে, তুলনামূলকভাবে বুদ্ধদেব তবু ভাগ্যবান। আমার না-পাঠের তালিকায় বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার অনেক বড় লেখকরাও রয়েছেন। সাহিত্যের যে ক্ষেত্রটিতে বিশ্বের বড় লেখকরা তাদের রচিত স্তম্ভের গর্জনে প্রতিপক্ষকে স্তম্ভিত করেন, পরাভূত করেন- দুর্জোধনের অরক্ষিত উরুর মতোই আমার দেখছি ঠিক সেই জায়গাটাতেই বড়-দুর্বলতা। তাই পাণ্ডিত্য প্রমাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শেষে জামানত হারোনোর ঝুঁকি না নিয়ে, আমি বরং তাঁর অনূদিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য কালিদাসের 'মেঘদূত' বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবি, আর্তুর র‍্যাবোর ভাষায় 'কবিদের রাজা' 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'– এই গ্রন্থ-দু'টির প্রতি আমার সাহিত্য-জীবনের অপরিশোধ্য এবং অশেষ ঋণ স্বীকার করেই বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষে বাংলাভাষার এই মহান পণ্ডিত-কবি-অনুবাদকের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তের ভালোবাসা নিবেদন করছি।

একইসঙ্গে স্মরণ করছি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সুখস্মৃতি, তাঁকে ঘিরে আমার, যা আমি না বললে অন্য কেউ কোনোদিনই বলবেন না। ঘটনাটি বিস্মৃতিপ্রিয় মহাকালের অতলগর্ভে চিরকালের জন্যই হারিয়ে যাবে। ১৯৭১ সাল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। পাকাবাহিনীর তাড়া খেয়ে, আমিও অন্য অনেকের মতো প্রাণ বাঁচাতে শরণার্থী হয়ে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় নগরী কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছি। কলকাতার লেখক-শিল্পীরা বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানাভাবে সাহায্য করে চলেছেন। মাসটির নাম মনে নেই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে কলকাতার ফাইন আর্টস একাডেমি মিলনায়তনে একটি কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়েছে। আমার প্রথম কবিতার বই 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে পুনর্মুদ্রিত হলেও- সেখানে তখনও আমার বিশেষ কোনো কবিখ্যাতি জোটেনি। তখনও জীবিত তিরিশের দুই কবি বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গেও নয়। বড় কবি বলতে তখনও আমার দৌড় নীরেন চক্রবর্তী, শক্তি-সুনীল বা খুব টেনেটুনে সুভাষ মুখুজ্যে পর্যন্ত। খুব সম্ভবত আমার কলকাতার কবিবন্ধু কবি দীনেশ দাশের পুত্র গঙ্গোত্রী-সম্পাদক কবি শান্তনু দাশের সঙ্গে বা আর কারও সঙ্গেও হতে পারে– আমি ঐ

কবিতাসন্ধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হই। আমার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো কবিবন্ধু তখন ছিলেন কি না, মনে করতে পারছি না। গিয়ে দেখি, ফাইন আর্টস একাডেমির মঞ্চ আলোকিত করে আমার স্বপ্নের কবিরা বসে আছেন। কবিতা পাঠ চলছে। অনুষ্ঠানের ঘোষক ছিলেন সম্ভবত অমিয় চট্টোপাধ্যায়। নাকি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়? সঠিক মনে পড়ছে না। শুভ্রকান্তির কবি বিষ্ণু দে ছিলেন সামনের সারিতে। আমি জানতে চাইলাম, বুদ্ধদেব বসু আসেন নি? তখন কে যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, পেছনের সারিতে মাথা নিচু করে বসে থাকা ঐ যে ছোট্ট মানুষটাকে দেখছেন, উনিই বুদ্ধদেব।

বিষ্ণু দের কবিতা পাঠ হয়ে গেল। কী কবিতা পড়েছিলেন মনে নেই। তবে মনে আছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো কবিতাই ছিল সেটি। তারপরই ঘোষিত হল বুদ্ধদেবের নাম। প্রথম প্রচেষ্টায় বুদ্ধদেব উঠতে গিয়েও পারলেন না। তখন পাশের দুজন তাঁকে দুদিক থেকে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তিনি এসে দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। তারপর কবিতার নাম না বলেই, আচমকা শুরু করলেন তাঁর কবিতাপাঠ।

..আজ রাতে বালিশ ফেলে দাও,
শয়ন করো পরস্পরের বাহুতে।
আজ কোনো যুদ্ধ নয়। ...

তিনি তাঁর কবিতাটি মুখস্থ বলে গেলেন। তাঁর দৃঢ়-ঋজু কণ্ঠের উচ্চারণ অন্য সকল কবির চেয়ে পৃথক হয়ে বাজল দর্শকদের কানে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় কামনা করে সেই কাব্যসন্ধ্যায় কলকাতার অন্য কবিরা যখন তাঁদের কবিতা পাঠ করছিলেন, সুখের বিষয়, বুদ্ধদেবের কামোদ্দীপক এবং যুদ্ধবিরোধী ঐ কবিতাটিকে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা সেদিন নীরবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কামোদ্দীপক কবিতা আমার প্রিয়প্রসঙ্গ হলেও, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আয়োজিত কোনো কাব্যসভায় ঐরকম একটি কবিতা পাঠ করাটাকে আমিও সমর্থন করতে পারলাম না। চীন-মার্কিন সমর্থিত বর্বর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের অনিবার্য জয়ের মুখে আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি তখনও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারই পূর্বাভাস। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তিরিশের দুই প্রধান কবিকে কয়েক গজের মধ্যে পেয়েও আমি যে, সেদিন তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগটি গ্রহণ করিনি, তার জন্য হয়তো কিছুটা দায়ী ছিলো আমার লাজুক স্বভাব, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী ছিলো মার্কিন-চীন-সৌদি আরব সমর্থিত পাকবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে কলকাতায় আয়োজিত কবিতাসন্ধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর পাঠ করা ঐ কবিতাটি। কবিতাটি ভালো, কিন্তু তাঁর নির্বাচিত কবিতাটি ছিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের শামিল।

পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির একজন সমর্থক ছিলেন তিনি। আমি মনে করি না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালের যুদ্ধবাজ আমেরিকার নীতিকে সমর্থন করার মতো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ পৃথিবীর কোনো কবির থাকতে পারে।

বুদ্ধদেব বসু : নিভৃতির ছায়ায় উজ্জ্বল বাতিঘর

ফরিদ আহমদ দুলাল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে ক'জন সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে অনন্য করে তুলেছেন তাঁদেরই অন্যতম বুদ্ধদেব বসু। কোন্ অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করা যায়, এ প্রশ্নের উত্তরে যে কোন বিদগ্ধজন দ্বিধান্বিত হতে বাধ্য। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার নতুন বাঁক নির্মাণের প্রধান অনুঘটক বুদ্ধদেব বসু। তিরিশের কবিতা আন্দোলনের প্রধান পুরুষও তিনি। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা প্রবল রবীন্দ্র-বলয় ভাঙার স্পর্ধা দেখিয়েছিলো। আর তিরিশের প্রাবল্য এতটাই বিস্তৃত যে আজো বাংলা কবিতা ত্রিশোত্তর কাব্যধারার প্রবল আবর্তে নিমজ্জিত বলা যায়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বাঙালির জীবন-পরিপার্শ্বকে ঋজু ও প্রাণবন্ত ভাষায় উপস্থাপন করে স্বাতন্ত্রের অধিকারী হয়েছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণ এবং চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, কাহিনী বুনন ও পরিবেশ বর্ণনা পাঠককে ভিন্ন স্বাদ আস্বাদনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তিরিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবহমান অগ্রযাত্রায় প্রধান অভিভাবক বুদ্ধদেব বসু তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের বিকশিত হতে কেবল সহযোগিতাই করেন নি, বরং তাঁদের জন্য প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করে দিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ কাব্য সমুদ্রের উত্তাল বাত্যাঘাতে বিপর্যস্ত কাব্যযশ প্রার্থী তরুণ কবিদের জন্য বুদ্ধদেব বসু দাঁড়িয়ে আছেন সুউচ্চ বাতিঘর হয়ে। তাঁর অনুবাদ কর্মের কৃতি একদিকে যেমন বিশ্বসাহিত্যের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে অনুবাদ প্রকরণে দিয়েছে নতুন মাত্রা। কবিতা সংঘটন কবিতার বিকাশ ও কবি মননে কাব্য আবহ তৈরিতে সমালোচনা সাহিত্যকে বুদ্ধদেব বসুই অনিবার্য করে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যে। প্রবন্ধ ও নাট্য রচনায়ও নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন বারবার। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য বাংলা গদ্য সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি এবং দুর্লভ সম্পদ হিসাবে সর্বমহলেই স্বীকৃত। সর্বোপরি সাহিত্য সংগঠনে যিনি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাহিত্য ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন তিনি বুদ্ধদেব বসু।

বাংলা সাহিত্যে এত বিপুল কৃতি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারো ভাগে সঞ্চিত নেই; কিন্তু এত বিপুল কৃতি ও অবদানের পরও আমরা কি সে অর্থে তাঁকে মূল্যায়ন করেছি। আমরা কি স্মরণ করছি তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায়। এসব প্রশ্ন এসেছে বারবার। বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে যখন তিনি কিছুটা আনুষ্ঠানিক আলোচনায় এসেছেন তখনো কি আমাদের একবারও মনে হয় নি বুদ্ধদেব বসু অনেকটাই অবহেলিত? একথা তো ঠিক বুদ্ধদেব বসুকে নতুন করে সম্মানিত করার সুযোগ নেই। তিনি কারো স্বীকৃতির অপেক্ষায়ও থাকেন না; কিন্তু নিজেদের বিশাল গৌরবের পর্বতটিকে পেছনে রেখে আমরা যখন শূন্যতার মরীচিকায় দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে

ধুধু প্রান্তরের হাহাকার প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অসহায় মনে করছি, তেমন দুঃসময়ে বুদ্ধদেব-শৃঙ্গের যে কোন ঝর্ণায় অবগাহন করে নিজেকে যদি পরিশুদ্ধ—পবিত্র ও ঋদ্ধ করে নিতে পারতাম; এমন আক্ষেপ অসংগত নয় মোটেই।

মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন প্রশ্নটি আসছে কেন তা নির্ধারণ করা প্রথম জরুরি। বাংলা সাহিত্যের দুই প্রবল পুরুষ রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল তাঁদের নিত্য স্মরণের যে পথ নিজেরাই তৈরি করে গেছেন তাঁদের গীত-সঙ্গীতে সে ব্যবস্থা স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু করে যাননি অথবা যেতে পারেন নি। বর্তমান মিডিয়াশাসিত সময়ে মিডিয়া নিজেদের স্বার্থেই রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে স্মরণ করছে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়। সাধারণ মানুষ নিজেদের আনন্দ-বেদনা, মান-অভিমান, সম্মিলন একাকিত্বে শরণাপন্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কাছে; সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাণীর গভীরতা আর নজরুল সঙ্গীতের সুর বৈচিত্র্যের অনুরণন গুরুত্ববহ আবশ্যই তবে সচেতনতা সংশ্লিষ্ট নয় সবসময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা এবং মূল্যায়নের বিষয়টি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ, বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে তা হয়তোবা সঙ্গতিপূর্ণ নয় সত্যি, কিন্তু বাংলা কবিতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। এ আবশ্যিকতা বুদ্ধদেব বসুর স্বার্থে নয় বাংলা কবিতা এবং নতুন প্রজন্মের কবিতা কর্মীদের স্বার্থেই জরুরি। বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বিবরমুক্ত হবার পথ অনুসন্ধানই বর্তমান নিবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে রচনার স্ফীতি বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে যাকে জায়গা দেয়া যায় তিনি বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যে মেধা মনন দূরদর্শিতা আর আধুনিকতার সমন্বয় বিচারে বুদ্ধদেব বসুর অবস্থান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও আগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ততা-গীতসম্ভার আর দার্শনিকতার ব্যাপ্তি এতটাই বিস্তৃত তাকে অতিক্রমণের সাধ্যের সীমায় আজো কেউ পৌঁছতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভুবনবিস্তারী ব্যাপ্তির পাশে অন্য কাউকে দাঁড় করানো না গেলেও যার যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু দিতে অসুবিধা কোথায়! এক ধরনের অনির্বচনীয় অলীক শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ আদায় করে নিয়েছেন শিষ্ট বাঙালির কাছ থেকে। যে শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে এক ধরনের মগ্নতা আর অর্ঘ্য নিবেদনের প্রবণতাও লক্ষণীয়। আর অর্ঘ্য নিবেদনে এক ধরনের মোহান্ধতার বিষয় আছে জেনেই রবীন্দ্রনাথের পাশে কাউকে জায়গা দেবার স্পর্ধা দেখাতে চাই না। অথচ বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় বুদ্ধদেব বসুর যে বিপুল অবদান তাকে অবজ্ঞা করাও সাহিত্য ইতিহাস চর্চার স্বার্থের সম্ভব নয় বিবেচনা করেই বর্তমান রচনার উদ্যোগ।

বুদ্ধদেব বসু কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নয়, সৃষ্টিশীলতার অঙ্গনেও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তার কিশোর বয়সেই। বুদ্ধদেব বসুকে বুঝতে হলে যে ক'টি কথা বিবেচনায় রাখা আবশ্যক তা হলো- বুদ্ধদেব বসু বিকশিত হয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর; বুদ্ধদেব বসু প্রথম যৌবনে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং যৌবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাস্তুহারাদের ঢল; দেখেছেন দেশ বিভাগ। যে জীবন বুদ্ধদেব বসু শুরু করেছিলেন পূর্ববঙ্গে সে জীবনের ধারাবাহিকতা ভেঙেছে দেশ বিভাগের পর। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য জীবনও শুরু করেছিলেন পূর্ববঙ্গে। সাহিত্য জীবনের সূচনাতেই বুদ্ধদেব বসু উপলব্ধি করেছিলেন তার সাহিত্যকর্মের সামনে বিশাল মহীরুহ হয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুদ্ধদেব বসু উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথকে পাশকেটে যেতে না পারলে তার

সময়কে রবীন্দ্রনাথেই বিলীন হয়ে যেতে হবে; তাই তিনি অস্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। বুদ্ধদেব বসু কখনো চান নি সাহিত্য রাজনীতিতে বিলীন হয়ে যাক। রাজনীতির বিস্তার শিল্প-সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলুক তা বুদ্ধদেব বসু মেনে নিতে পারেন নি কখনোই। বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় পৌঁছে দেবার স্বপ্ন বুদ্ধদেব বসুর ভেতর ছিলো প্রবলভাবে। ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর সাথে বিশ্বসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো এবং সর্বোপরি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সাহিত্যে পূর্ণ নিবেদিত একজন আধুনিক মানুষ।

সমাজে বুদ্ধদেব-বিরোধিতার কিছু অনুষঙ্গ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়ে কোন দিক দিয়ে শুরু করা যায় যে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও নিজস্ব ধারণাকে উপস্থাপন করে প্রচলিত বিশ্বাসের পাশে দাঁড়াতে চাই, প্রচলিত ধারণার সাথে নিজের ধারণা মিলে মিশে গেলে অসুবিধা নেই, আর যদি মিলে না যায় তাহলে যে বিপর্যয় ঘটবে তার সামনে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিতেও অসুবিধা দেখিনা।

প্রথমত রবীন্দ্র বিরোধিতা। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করেছিলেন যখন রবীন্দ্রনাথের অবিচল উপস্থিতি। কেবল সাহিত্যাঙ্গনে নয় সামাজিকভাবেও রবীন্দ্রনাথ প্রবল পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক এবং মহর্ষি। যে কোন নতুন কথা–নতুন বিশ্বাস আমাদের সমাজ সহজে মেনে নিতে পারে না–পারেনি। রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধিতা হয়েছিল তার যৌবনে। যে সময় এবং প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলেন সেটি আমাদের সাহিত্যের অগ্রযাত্রার স্বার্থে খুবই জরুরি ছিলো। আজ এ কথা সহজেই বলা যায়, সেদিন বুদ্ধদেব বসু যদি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার না করাতেন তাহলে বাংলা কবিতা সেদিনের অবস্থান পেরিয়ে নতুন বাঁকে–নতুন গতিতে কবে নতুন পথের দিশা পেতো তা বলা যায় না। যদিও রবীন্দ্রনাথের পর কাজী নজরুল ভিন্ন মেজাজে কাব্য রচনা শুরু করছিলেন কিন্তু নজরুল ছিলেন সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্রোত; যা বিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব ছন্দে স্বতন্ত্র ধারায় বয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে থামেননি, বরং রবীন্দ্র-বিরোধকে আন্দোলন হিসেবে নিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-বিরোধের কারণে রবীন্দ্রভক্তদের বিরোধ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর ওপর। অথচ রবীন্দ্রভক্তরা যদি উপলব্ধি করতেন- তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করায় বাংলা কবিতার যেমন পালাবদল হয়েছে, তেমনি বাংলা কবিতায় এসেছে নতুন প্রাণের জোয়ার। যে জোয়ারে স্নাত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের ত্রিশোত্তর কালের কবিতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে রবীন্দ্র-কাব্যের বাঁক পরিবর্তনের এই দ্যুতি সহজেই চোখে পড়বে। আর বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-বিরোধ যে কবিতার কল্যাণেই জরুরি ছিলো সে কথা জেনে নিতে আমরা বুদ্ধদেব বসুর শরণাপন্ন হতে পারি। রবীন্দ্র-বিরোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু 'আমার যৌবন' গ্রন্থে পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা প্রথম করেছিলাম। বোঝাপড়া মানে, এমন কোন ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিল রবীন্দ্র বিদ্রোহ...' (আমার যৌবন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-২৪)। এ প্রসঙ্গে প্রগতি প্রত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য প্রতিবেদনের সামান্য ক'টি লাইন স্মরণ করবো। প্রগতি পত্রিকাটি টিকেছিলো দু'বছর তিন মাস। প্রগতিতে মাসিকী নামে একটি বিভাগ থাকতো। যেখানে বুদ্ধদেব বসু মাঝে মাঝেই নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করতেন।

প্রগতির জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন– 'অধুনা বাংলা সাহিত্যের একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব Movement' শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব রসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করাবার ভার প্রগতি নিয়েছে।' একথা সত্যি বুদ্ধদেব বসুরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সে বিরোধে কবিতার প্রতি অঙ্গীকার থাকলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর শ্রদ্ধার বিষয়টি জেনে নিতে দেখবো রবীন্দ্রনাথের মহা-প্রয়াণের পর প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বসুদেব লিখেছেন–

'আজ পর্যন্ত আমরা যারা বাংলা ভাষায় সামান্য রচনার প্রয়াসী, আমাদেরও স্রষ্টা তিনি। শুধু যে সাহিত্য রচনার কলাকৌশল তাঁর কাছে শিখেছি তা নয়, আমাদের সমস্ত জীবন তাঁর হাতে গড়া, আমাদের প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে, হৃদয়াবেগের প্রতি স্পন্দনে তিনি আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা প্রেম কি বাৎসল্য কি ঋতুরঙ্গ কিছুই উপভোগ করতে পারিনি। এমন-কি তাঁর গান না হলে আমাদের দুঃখের অনুভূতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না, মানুষের সঙ্গে, শিশু ও পশু-পাখির সঙ্গে, স্বদেশের বিশ্বের কি জড় প্রকৃতির সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে যাই তার মূলে আছে তার প্রেরণা আর তার সার্থকতায় (যদি সার্থক হই) তাঁরই বাণীর বন্দনা। তিনি আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছেন যে তাঁর ব্যাপ্তি উপলব্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবু জীবনে বারবার চকিত কোন মুহূর্তে সহসা বুঝেছি যে তিনিই আমাদের সর্বস্ব। (কবিতা, আশ্বিন-১৩৪৮ সংখ্যা)।

বুদ্ধদেব বসুর এ সম্পাদকীয় নিবন্ধকে যদি কেউ রবীন্দ্র-বিয়োগের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি বলে উল্লেখ করতে চান তাহলে বলবো রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর অসংখ্য রচনা পড়ে নিতে। আমি কেবল নিচের ক'টি পঙ্ক্তি উচ্চারণ করে বলবো, বুদ্ধদেব বসুকে আর যাই হোক রবীন্দ্র-বিরোধের জন্য অবহেলা করা যায় না।

'রবীন্দ্রঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে
কবিরূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের বৃদ্ধের যৌবন ঋতু;
সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।'

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-বিরোধকে কবিতার স্বার্থে সৃজনশীল বিরোধ হিসাবে বিবেচনা করা গেলে অন্তত এ অপরাধে যাঁরা বুদ্ধদেব বসু থেকে মুখ ফিরিয়েছেন তাদের সিদ্ধান্ত বদল হতেও পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নজরুল প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের পর যিনি বাংলা সাহিত্যের লোকপ্রিয় শিল্পী তিনি নজরুল। লোকপ্রিয়তার বিচারে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নজরুলের অবস্থান রবীন্দ্রনাথের আগেও হতে পারে। সাধারণ্যে অভিযোগ আছে বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে কবিই মনে করতেন না। অন্তত নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য যে নজরুল ভক্তদের জন্য সুখপ্রদ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেব বসু নজরুলের কবিতাকে আধুনিক কবিতা পদবাচ্য করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথকেও বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। বাংলা কবিতার মূলধারা ব্যাখ্যায়

নজরুল গবেষক যতীন সরকারের বর্ণনানুযায়ী ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিরা প্রায় সবাই বাংলা লোকায়ত ধারা থেকে বিচ্যুত। সে বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার কবি লালন, হাসন, রাধারমণ, জালাল খাঁ; কবি নজরুল সেই ধারারই প্রতিভূ আর বিচ্ছিন্ন ধারার কবি জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমানরা; বুদ্ধদেব বসু যখন আধুনিক বাংলা কবিতাকে ধ্যানের-সাধনার বিষয় জ্ঞান করেছেন, বাংলা সাহিত্যের বিশুদ্ধ শিল্পকর্মী হিসাবে বুদ্ধদেব বসু যখন অতন্দ্র সময় কাটাচ্ছেন কবিতায় মনন-মনীষা ও প্রকরণ-সমন্বয় গবেষণায়; তখন নজরুল সম্পর্কে তাঁর বিবেচনাকে কেউ খাটো করে দেখলে তা তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। মূল কথা হচ্ছে নানান বিবেচনায় নজরুল এবং বুদ্ধদেব ছিলেন দুই দিগন্তের কবি। বুদ্ধদেব কবিতাকে রাজনীতি প্রভাবিত হতে দিতে চাইতেন না; অন্যদিকে নজরুল সরাসরি রাজনৈতিক কর্মী না হয়েও তাঁর কবিতা ছিলো রাজনীতি প্রভাবিত। নজরুলের কবিতায় গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ-রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-ধর্মনিরপেক্ষতা-অসাম্প্রদায়িক চেতনা রেনেসাঁ ইত্যাদি হয়ে উঠেছিলো প্রবল ধারা। এই মৌলিক বিরোধের কারণে দু’জন ভিন্ন অবস্থানে থাকাটাই সঙ্গত। ফারাকটা সেখানে, বুদ্ধদেব কবিতার বিষয় অনুষঙ্গ এবং প্রকরণ বিষয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রচারে ছিলেন তন্দ্রাহীন-নিদ্রাহীন এবং আলস্যহীন আর নজরুল ছিলেন নির্বিকার। নজরুল ছিলেন ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ মাতাল।

নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অশ্রদ্ধা ছিলনা কখনো। নজরুল বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার কিছুদিন পর বুদ্ধদেব বসু ‘কবিতা’র বিশেষ সংখ্যা ‘নজরুল সংখ্যা’ হিসাবে প্রকাশ করেন। (কার্তিক পৌষ ১৩৫১ ॥ ১৯৪৪)। নজরুল সংখ্যায় ‘নজরুল ইসলাম’ শিরোনামে বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ধারণা করা হয় নজরুল সম্পর্কে এটিই বুদ্ধদেব বসুর প্রথম মূল্যায়ন। বুদ্ধদেব বসুর এ রচনাটিই পরবর্তীকালে তাঁর ‘কালের পুতুল’ (১৯৪৬) গ্রন্থে কোন পরিবর্তন ছাড়াই সংকলিত হয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- ‘বাংলাদেশে নজরুল ইসলাম সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এই অনভিপ্রেত সাময়িক উত্তেজনার প্রথম শিকার হয়েছেন। তাতে তাঁর সাহিত্য মার খেয়েছে, সাহিত্যের আবেদন যে চিরকালের মানুষের হৃদয়, যে হৃদয় দখল করতে পারে কেবল বিশুদ্ধ শিল্প, সেই বিশুদ্ধ শিল্পের উচ্চ মঞ্চ থেকে তাঁর পদস্খলন হয়েছে। সময়টা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উন্মত্ততায় অস্থির।’ বুদ্ধদেব বলেছেন– ‘আজকাল যে সব রচনা রাজনৈতিক কবিতা বলে আমাদের কাছে ধরা হয়, তার ধূসর নীরবতার সঙ্গে নজরুলের উদ্দীপ্ত আনন্দের প্রতিতুলনা সহজেই মনে জাগে।... আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তার প্রথম উদ্গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি। তা থেকে বের করেছেন সুর-ঝংকার এবং সেটাই তো কবির কাজ। ...দুর্দিনের চরমেও সকল দেশেই এমন কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই থাকবেন যাঁরা সাময়িক উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে শিল্পকলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপন আপন কাজ করে যাবেন, দেশের সর্বব্যাপী অসুস্থতার মধ্যে সত্যের শিখাটুকু তাঁরই জ্বালিয়ে রাখবেন আপন প্রাণ দিয়ে, দুর্দিনের অবসানে দেখা যাবে যে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তারাই।’ নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর শ্রদ্ধাবোধের সন্ধান পাই যখন বুদ্ধদেব বসু তাঁর (নজরুলের) বিরুদ্ধ মতবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েও লেখেন ‘নজরুল সম্পর্কে বিশেষভাবে বলার কথা এইটেই যে তিনি একই সাথে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি-তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ

সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে সঙ্গে সর্বসাধারণের হাততালি পায়, ভালো লেখার ভালত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে। ... গেলো পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই অজস্র কাব্য ও সঙ্গীত বাঙালির মনে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। আমরা যারা তাঁর সমসাময়িক, আমরা তাঁর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি, আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।' একজনের বিশ্বাসের সাথে অন্যের বিশ্বাস মিলতেই হবে অন্যথায় তাকে বাতিল করে দিতে হবে এমন ধারণা আধুনিক নয়। নজরুলের সাথে বুদ্ধদেবের বিশ্বাসের ফারাক ছিলো কিন্তু সে কারণে কখনোই শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি পড়েনি। মতান্তর ঘটলে মনান্তর হতে হবে এমন ধারণা ঠিক নয় কিছুতেই।

তৃতীয় পর্যায়ে সাহিত্যের শুদ্ধতা ও নৈতিকতাবোধ প্রসঙ্গে। কেউ কেউ মনে করেন বাঙালি পাঠকের কবিতাবিমুখ হবার ক্ষেত্রে কবিতায় অতিমাত্রায় যৌনতা ও নারীর শরীরী উপস্থিতিই দায়ী। রবীন্দ্র কাব্যের অতিন্দ্রীয় প্রেমের উপস্থাপন কলা ভেঙে বুদ্ধদেব বসুই বাংলা কবিতায় শরীরী প্রেমকে উপস্থাপন করেন, যার প্রভাব পরবর্তী দীর্ঘকাল অব্যাহত আছে। বোদলেয়ার অনুবাদ করে যে ক্লেদজ কুসুম ফুটিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু তা-ই পরবর্তীকালে মঙ্গলাশ্রয়ী বাংলা কবিতার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিদগ্ধজনের বিবেচনায় বুদ্ধদেব বসু অনূদিত শার্ল বোদলেয়ার বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে সব সময়ই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে কিন্তু বুদ্ধদেব কৃত অনুবাদকর্মের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের অঙ্গুলি ওঠেনি। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা তো তাঁর 'দুর্বিনীত দেবশিশু' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'বুদ্ধদেব বসু যদি শার্ল বোদলেয়ারকে ভিত্তি করে স্ব-সৃষ্ট এ গ্রন্থটি ছাড়া জীবনে আর কিছু নাও লিখতেন, তবু তিনি আমার কাছে আজকের মতোই সমান তাৎপর্যময় হয়ে থাকতেন। এটিই আমার বিবেচনায় তাঁর মাস্টার পিস বা তুঙ্গীয় গ্রন্থ।' বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ার অনুবাদ করে আমাদেরকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন সমৃদ্ধ ফরাসি সাহিত্যের সাথে; অবশ্য তিনি বোদলেয়ার ছাড়াও কালিদাস, রিলকে, হোল্ডারলিন প্রমুখের কবিতার সফল অনুবাদ করেছেন, কিন্তু বোদলেয়ার অনুবাদে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রবল হয়ে উঠেছে তাহলো কাম, শরীর, যার অন্য নাম নির্বেদ। এখানেই সংস্কারবিরোধী সনাতনপন্থীদের কাছে অগ্রহণীয় হয়ে আছেন কবি বুদ্ধদেব বসু। প্রচলিত অর্থে বুদ্ধদেব বসুকে 'বোহেমিয়ান কবি' আখ্যা দেয়া যাবে না কিন্তু তাঁর অন্তর্জগতে সমাজ সংঘবিমুখতা এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর দৌর্দণ্ড প্রতাপের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে দিয়েছিলেন বেদে শ্রেণীর উন্মুলপনাকে। প্রচণ্ড আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা এবং পরিপার্শ্বের দেউলিয়াত্ব তাঁর ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে যৌক্তিক অহংকারবোধ। আর অহংসর্বস্ব স্বাধীন চেতনা মানুষকে প্রায়শই সমাজবিমুখ করে তোলে, বুদ্ধদেব বসুকেও তাই করেছে। এক পর্যায়ে তাই তিনি নিজেকে ভেবেছেন নির্বাসিত রাজ্যচ্যুত কর্মভারে বিপর্যস্ত। তাঁর কবিতায় দেখি–

'আমি কবি! ...শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত... নির্বাসিত! অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতিমুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? [অন্য প্রভু ॥ দ্রৌপদীর শাড়ি]'

ত্রিশোত্তর প্রধান কবিদের অধিকাংশের মধ্যেই সমাজ ও সমষ্টি বিচ্ছিন্নতা লক্ষণীয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন লেখন– 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।' অথবা 'সহেনা

সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালি।' তখন তাঁর জন্য বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকে না। জীবনানন্দ দাশ তো নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত কবি হিসাবেই সর্বমহলে পরিচিত। বুদ্ধদেব বসু আকৈশোর নিঃসঙ্গ এবং আত্মমগ্ন এক সব্যসাচী লেখক। ব্যক্তিজীবনেও তিনি জনসংযোগ প্রত্যাশী ছিলেন না। জনসংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লেখেন– 'সম্মিলিত মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক লোক যেখানে একত্র হয় সেখানে আমি সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারিনা। ... গায়ে গায়েঘেঁষা ঘেঁষি মানব মাংসের স্তূপ, পা থেকে যেন উঠছে জীবনের তিক্ত গন্ধ, সম্মোহনের মতো তার ঝাঁঝ। তার রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া পাথরের মতো ভারি হ'য়ে আত্মাকে আচ্ছাদন করে; সেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বহুলতা তালপাকানো, প্রাণ সেখানে বাঁচেনা। (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ-৫, পৃষ্ঠা-৪২৫)। আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি গ্রন্থে শুদ্ধস্বর বসুও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে আগাগোড়া নিঃসঙ্গতার বেদনা এবং বিচ্ছিন্নতা বোধ অবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু পলায়নপর ছিলেন না। পরিপার্শ্বের অসঙ্গতি, অনাচার, দুর্বৃত্তায়ন থেকে আত্মরক্ষার্থে রচনা করেন নিজস্ব ভুবন–স্বরচিত স্বর্গ।

'বেঁচে থাকার ভীষণ ভারে
আমার বাঁচা পিষে যায়।
……………………………
তাই মনে হয় পৃথিবীতে
যা হচ্ছে তা হোগগে,
ঘুম না-এল ল্যাম্পো জ্বেলে
বসি লেখার মঞ্চে;
বাঁচতে হলে বাঁচি আমার
মন-বানানো স্বর্গে।' [স্বর্গমর্ত্য ॥ দ্রৌপদীর শাড়ি]

যখন সমাজ সংসারবিমুখ করে কবিকে সেখানেও কবি নিজের মধ্যেই রচনা করে নিতে চান অন্তর্জগতের অলৌকিক কথোপকথন। এ অন্তর্জগত বিচরণে অভিমান থাকতেই পারে কিন্তু তারই পাশাপাশি খুঁজে পাই কবির নিষ্ঠা, মগ্নতা ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতি।

'হৃদয় মধ্যে বাঁধো ঘর;
অবরোধ, বরফ, কুয়াশা,
স্তব্ধ মন, শব্দহীন ভাষা
অগ্নিকুণ্ড, দীর্ঘ অবসর;–
আর দুই মুগ্ধ অন্তর্যামী–
আমি–আর মুখোমুখি আমি।'
[আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩ ॥ যে আঁধার আলোর অধিক]

'বরিস প্যাস্টেরনাক প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা খোলা চিঠি' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন– 'আপনি যোগ দিয়েছেন মিছিলে, আর আমি স্বভাবত বিবরবাসী; আপনি ঘোষণা করেছেন মিলন, আর আমি বিচ্ছেদবেদ সন্তপ্ত;' আধুনিক বাণিজ্য সভ্যতার প্রভাব যে ব্যক্তির অবস্থানকে কতটা অসহায় করে তুলেছিলো সে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সচেতন। সচেতন মানুষের এ অসহায়ত্ব উপলব্ধি করেই তিনি লিখেছেন- 'আজকালকার দিনে আমাদের প্রত্যেককেই দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছে বণিক রাজকে,

তা থেকে কারো মুক্তি নেই, যতোই প্রকারান্তরে, যতোই সূক্ষ্মভাবে হোক–সবারই উপরে চরম প্রভুত্ব করছে ক্লাইভ স্ট্রিট (বাণিজ্য কেন্দ্র)। ...আমার পক্ষেও ক্লাইভ স্ট্রিটকে এড়ানো অসম্ভব। (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ-৫ ॥ পৃষ্ঠা-৪২৯) রাজনীতি প্রভাবিত কবি না হলেও সমাজ পরিপার্শ্ব উপেক্ষিত থাকেনি বুদ্ধদেব বসুর রচনায়।

'কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী;
বিশ্বের জানালা বন্ধ; অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
পচা ডোবার মতো দিন; পুরোনো বিস্মৃত কুয়োর তলার মতো
রাত্রি আর নিঃসঙ্গতা, শেষ হীন।' [বৃষ্টি আর ঝড়]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় সমাজ সভ্যতা-জীবনের রূপায়ণ যে অনুপস্থিত থাকেনি তা প্রত্যক্ষ করি উদ্বাস্তু কবিতায়। যেখানে কলকাতার বালিগঞ্জ নিবাসী নায়ক সতীকান্ত কলকাতার পথে নিরন্ন কঙ্কালসার উদ্বাস্তু নারীকে দেখে নিজের সাথে সম্পর্ক অনুভব করে–

কেমন করে,
অস্পষ্টভাবে ঘটে গেছে তার
একটু সংযোগ,
কষ্টের অনুকম্পা,
জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র [উদ্বাস্তু ॥ দৌপদীর শাড়ি]

অতি সাধারণের পাঠ্যসূচিতে বুদ্ধদেব বসুর নাম থাকার কারণ নেই। বিদগ্ধজনের লেখক বুদ্ধদেব। কিন্তু বিদগ্ধজনেরাও কখনো কখনো সাধারণের ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষত বর্তমান মিডিয়াশাসিত সময়ে, যে মিডিয়া আর ক্লাইভ স্ট্রিটের নিয়ন্ত্রণাধীন, জ্ঞানপাপীদের বিশাল অংশ বুদ্ধদেব বসু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। বুদ্ধদেব বসু সব্যসাচী সন্দেহ নেই।

সাহিত্যের সব শাখায়ই তিনি অবদান রেখেছেন–নিজের অস্তিত্বকে অনিবার্য করে তুলেছেন, কিন্তু গীত রচনায় সামান্য উদ্যোগও নেননি। কেন বুদ্ধদেব বসু গীত রচনায় মনোনিবেশ করেননি সে প্রশ্নের মীমাংসা আজো হয়নি, যদিও বুদ্ধদেব বসুর প্রেমিকা রানু সোম (পরবর্তী সময়ে তিনি বুদ্ধদেবের স্ত্রী প্রতিভা বসু) ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী। অন্যদিকে সাহিত্যে নিত্য আরাধ্যদের প্রত্যেকেই সঙ্গীত ক্ষেত্রে অনিবার্য। বুদ্ধদেবের যেখানে বিশাল শূন্যতা।

চতুর্থত, আলোচনার এ পর্যায়ে রাজনীতি প্রসঙ্গ। যদিও একাধিকবার বলা হয়েছে বুদ্ধদেব বসু সরাসরি রাজনীতি প্রভাবিত হতে চাইতেন না। রাজনীতি-সংশ্লিষ্টও হতে চাইতেন না। রাজনীতি প্রসঙ্গে এড়িয়ে যেতেন জনসমক্ষে। কখনো কি বুদ্ধদেব বসু রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ হন নি? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবো ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। ১৯৩০ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয় তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে। ১৯৩৪ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পার্টির কর্মীরা প্রগতি লেখক সংঘকে সামনে রেখে পার্টির কর্মকাণ্ড চালানোর কৌশল অবলম্বন করে। এছাড়াও সমমনা বিভিন্ন মোর্চায় নিজেদের নীতি-আদর্শ প্রচারের উদ্যোগ চালায়। ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যাসিবিরোধী ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ। ১৯৩৭-এ প্রগতি লেখক সংঘের আদলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়ার।' লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত

প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি নির্ধারিত হয়েছিলেন মুনশী প্রেমচন্দ আর 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়ার এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কিন্তু সংঘের ইস্তেহারে যখন লেখা হলো–'we belive that the new literature of India must deal with the basic problems of hunger and proverty, social backwardness and political subjective.' তখন মুনশী প্রেম চাঁদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'জনের একজনও লেখকদের ওপর এ জাতীয় নির্দেশনা মেনে নিতে পারেন নি। ফলশ্রুতিতে লেখকরা কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে শিল্পীর অধিকারের প্রসঙ্গটি উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্তভাবে চালিত এ কথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি কিছুই নই–কেবলমাত্র কবি। যেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক; আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনা পুঞ্জের দ্বারা জলাবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক আমার সেই কাব্য স্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়।... সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু... সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এ উপকরণ তাকে তৈরি করে না। (২৪ মে ১৯৪১ ॥ উদয়ন)

১৯৪২ এর গোড়ায় গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এ শিল্পী সংঘের সদস্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। মনে রাখতে হবে ১৯৪২-এ ফ্যাসিস্টদের হাতে ঢাকায় খুন হয়ে ছিলেন সোমেন চন্দ। যে বুদ্ধদেব বসু কমিউনিস্টদের মোটেই পছন্দ করতেন না সেই বুদ্ধদেব বসু ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন– 'শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের উন্নতি সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যারা মুক্তির আদর্শ মানেন, যারা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।

বুদ্ধদেব বসুর 'পুনর্মিলন' নাটকে সার্ত্রের ছায়া

ফেরদৌস মাহমুদ

Adieu, adieu, Delony House dear,
We leave you because the sea is near,
And the sea will swallow you, we fear.
Adiu, adieu.

কবিতার লাইনগুলো কোনো বিদেশী কবির কবিতা নয়। ত্রিশের বাংলা কবিতার পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব বুদ্ধদেব বসুর লেখা জীবনের প্রথম কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমেই মাত্র ন-দশ বছর বয়সে তিনি পরিবার থেকে প্রথম কবি-স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন।

একজন প্রথম সারির বাঙালি কবি কেন তাঁর কবিতা লেখার শুরুটা ইংরেজি কবিতা দিয়ে করলেন, এই প্রশ্নটা হয়ত অনেকের মনেই উদয় হতে পারে। সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে ভিন্ন একটি প্রশ্ন মাথায় নিয়ে বাংলা ভাষা কিংবা বাংলা সাহিত্যের বিষয়েও– বিশ্বের হাজারো ভাষা আর সাহিত্যের ভিড়ে কোথায় অবস্থান আমাদের?

মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা। তিনি চেয়েছিলেন জন মিলটনের মতো কবি হতে, বাংলা বাদ দিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে; স্বধর্ম আর স্বদেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন বিদেশে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর আবার বাংলা ভাষাতেই প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং আমরা লক্ষ করি বাংলা কবিতা তাঁর হাত ধরে মধ্যযুগ থেকে বের হয়ে মোড় নেয় আন্তর্জাতিকতার নতুন বাঁকের দিকে। প্রথমবারের মতো বাংলা কবিতায় আবির্ভাব ঘটে 'সনেটে'র। এই মধুসূদনের হাত ধরেই আমরা পাই বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। অবাক ব্যাপার হলো, শেষপর্যন্ত মধুসূদন আর 'জন মিলটন' হননি, হয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত'।

বুদ্ধদেব বসুর শুরুতেই ইংরেজি কবিতা লেখার পেছনের কারণ কী ওইরকমই কোনো কিছু? নিশ্চয়ই না, কেননা ওই বয়সে ওইভাবে ভাবার মতো চিন্তাশক্তি হয়ত তাঁর ছিল না! তার ইংরেজি কবিতা লেখার মূল কারণ সম্ভবত ওই সময়ে হেম-নবীন-মধুসূদনের পাশাপাশি ইংরেজি কবিতা সংকলন 'ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান জেমস অব ইংলিশ পোয়েট্রি' পাঠ। সত্যি বলতে কি এরপর তিনি মূলত বাংলাতেই লিখেছেন। কবিতার বিষয় হিসেবে নদী, সন্ধ্যা, প্রভাত কিংবা সূর্যাস্তকে বেছে নিয়ে বিভিন্ন ছন্দে কবিতা লিখতেন তিনি।

শৈশবেই তাঁর মনে প্রিয় কবির জায়গা করে নিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি পড়তেন 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। এমনকি মাত্র বারো-তেরো বছর বয়সে তাঁর লেখা

প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকায়। সময়ের অভ্যাসবশত রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বারা তিনি অনেকখানি প্রভাবিতও হয়েছিলেন সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকে।

১৯২৪ সালে বের হওয়া বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী'র কবিতাগুলো পাঠ করলেই বিষয়টা টের পাওয়া যায়। এমনকি ওই বইয়ের কোনো কোনো কবিতার শিরোনামও সরাসরি যেন রবীন্দ্রনাথ থেকেই নেয়া, যেমন– 'জীবন দেবতা', 'অরূপ', 'যাত্রী', 'শঙ্খ' ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথম বই বের হওয়ার তিন চার বছরের মধ্যেই চিন্তায় ও চেতনায় পরিবর্তন ঘটে যায় বুদ্ধদেব বসুর। উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রবলয় থেকে বের হয়ে নতুন ধরনের কবিতা লেখার তাগিদ। খুঁজতে থাকেন একান্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বর। কেননা– ততদিনে তাঁর পাঠের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমের পাশাপাশি যোগ হয়ে গেছে– ডিকেন্স, বার্নাড শ, শেলি, বায়রন, কিটস, ব্রাউনিং, চেকভ, তুর্গেনিভ, ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, গোর্কি, অস্কার ওয়াইল্ডসহ বিভিন্ন ক্লাসিক সাহিত্যিক এবং ওই সময়ের বিশ্বসাহিত্যের অনেকেরই নাম।

২.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই পশ্চিমা বিশ্বে প্রবাহিত হতে থাকে পরিবর্তনের হাওয়া। জন্ম হয় রোমান্টিক ধারার বিপক্ষে আধুনিক সাহিত্যের। এই হাওয়ায় নতুনের প্রত্যাশীরা হয়ে ওঠে বিভোর আর পুরোনোপন্থীরা আহত। বুদ্ধদেব বসু ওই নতুনের হাওয়ায় আলোড়িত হন। ১৯২৭ সালে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে শুরু করেন 'প্রগতি' পত্রিকা। ওই পত্রিকায় দেশী সাহিত্যের পাশাপাশি বিদেশী সাহিত্যের প্রকাশ ছিল লক্ষ করার মতো। ওখানকার তরুণদের লেখার নতুনত্ব নানানভাবে মুখোমুখি হয় সমালোচনার। ১৯৩১ সালে বুদ্ধদেবের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কলকাতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে। একে একে পরিচয় ঘটে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেনের সঙ্গে। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'কবিতা' পত্রিকা। ১৯১২ সালে শিকাগো শহরে কবি হ্যারিয়েট মনরো বের করেন কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা 'পোয়েট্রি'। সম্ভবত এই 'পোয়েট্রি'র অনুপ্রেরণাতেই বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেন তার 'কবিতা' পত্রিকাটি। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যার লেখক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিত কুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী।

পরবর্তীকালে এই 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় এক দল তরুণ কবির আধুনিক কবিতার অগ্রযাত্রা। বুঝতে পারেন রবীন্দ্রনাথের যুগ আর তাদের যুগ এক নয়। নিজেদের কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুখোমুখি হন হাজারো বাধার। বারবার সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তৎকালীন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার। এক্ষেত্রে সমকালীন নতুন ধারার কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সবচেয়ে বেশি কলম চালিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। 'জীবনানন্দ দাশকে' শীর্ষে রেখে দু'হাতে লিখেছেন আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রু পক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদের গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম।'

১৯৩০ সালে বের হয় তার প্রথম রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা'। যেখানে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন– 'মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান'। এই নবজন্মের পর তাকে আধুনিকতা বিরোধীদের বিপক্ষে লড়াই করতে হয়েছে কিন্তু কখনও পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি একে একে লিখে ফেলেন– 'একটি কথা', 'পৃথিবীর পথে', 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান', 'দময়ন্তী'সহ বহু কবিতার বই। শুরু থেকেই তিনি কবিতা ছাড়াও লিখতেন সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখায়ই। বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো অনুবাদ করেছেন– বোদলেয়ার ও রিলকের কবিতা। লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটদের সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্যনাট্য ও নাটক।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা নাটকগুলো হচ্ছে– তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), তুমি কেমন আছো (গল্প ও নাটিকা ১৯৬৭), কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮), কালসন্ধ্যা (কাব্যনাট্য–১৯৬৯), পুনর্মিলন (১৯৭০), অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (১৯৭০), সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত : ইক্কাকু সেন্নিন (কাব্যনাট্য–১৯৭৩)।

বুদ্ধদেব বসু মূলত সিরিয়াসলি নাটক লিখতে শুরু করেন বেশি বয়সে এসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রায় সব নাটকই লিখিত হয় শেষ আট বছরের মধ্যে। এখানে আলোচনা করা হবে 'পুনর্মিলন' নাটকটি নিয়ে। অনেকের ধারণা বাংলা নাটকের উৎপত্তি মূলত 'যাত্রাপালা' থেকে। বিষয়টা আসলে ঠিক নয়। বাংলা নাটকের উৎপত্তি মূলত পাশ্চাত্য নাটকের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতেই। ১৭৯৫ সালে হেরোসিম লেবেডক সর্বপ্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি করেন। 'love is the best doctor' এবং 'disguise' এর বাংলা অনুবাদ দিয়ে সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলা নাটকের প্রথম ভাগে বেশ কিছু সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক ও প্রহসনের অনুবাদ করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে : তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস', নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে লেখেন 'শর্মিষ্ঠা'। বলা চলে এটিই বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাটক। মধুসূদনের কাল থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসুর 'পুনর্মিলন' পর্যন্ত বাংলা নাটকে দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশাররফ হোসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি এল রায়), ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.

'নাটক' শব্দটি শুনলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে নাট্য-অভিনয়ের দৃশ্য। নাটক পাঠের চেয়ে দেখার ভাবনাটাই আসে সবার আগে এবং প্রায়ই নাটক পড়তে ভালো লাগে না। সংস্কৃতি আলঙ্করিকগণ নাটককে বলেছেন প্রধানত দৃশ্যকাব্য। নাটক হচ্ছে তাই-ই যা রঙ্গমঞ্চে মানবজীবনের কোনো কাহিনীকে রক্তমাংসের মানুষের অভিনয়ে মূর্ত করে তোলে। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে সেই মাধ্যম যার সাথে দৃশ্যায়ন ও পারফর্মিং আর্টের সম্পর্কই বেশি। এ বিষয়ে ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.'

কিন্তু এরপরও নাটক মঞ্চরূপ পেলে যেমন তাকে শিল্পকলার স্বীকৃতি দেয়া হয়, তেমনি কোনো নাটকের কাব্যরস থাকলে তাকে সাহিত্যের মূল্যও দিতে হয়। যেমন শেকসপিয়ারের নাটক। চারশ বছর পেরিয়ে এসেও তার বহতা প্রভাব আজও পৃথিবীজুড়ে। যেমন রবীন্দ্রনাথের নাটক। একশ' বছর পরেও যা আধুনিক। তাঁদের নাটক করে বা দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পড়েও তেমনি মজতে হয়। শেকসপিয়ার বা রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী হয়েছেন শুধু এই কারণেই নয় যে, তাঁরা মঞ্চযোগ্য নাটক লিখেছেন। এর মূল কারণ আসলে নাটকের সাহিত্যরসই।

এখন প্রশ্ন হলো নাটকের কাছে আমরা কী চাই? নিশ্চয় বিশুদ্ধ আনন্দ, পরিচ্ছন্ন উপভোগ। চাই নাটক আমাদের ভাবিয়ে তুলুক; নাটক এই সমাজ-সংসারের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের দায়িত্ব নিক; হোক মানুষের উদ্ধারের মন্ত্র। কেউ বা চাই নাটকে জীবনকে খুঁজে পেতে কিংবা নাটকে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন। অপর দিকে নাটকের কাছে এই বিচিত্র প্রত্যাশার মধ্যেও কেউ আবার মনে করেন রাজনীতি ও সমাজের ছবি তোলা নাটকের কাজ নয়। নাটক হলো সাহিত্য, তার লক্ষ্য দর্শন। আসলে বিষয়টা হলো, নাট্যকার কীভাবে জীবনকে গ্রহণ করছেন, কীভাবে তার ভাবনা উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন সেটিই মূল কথা।

সাধারণভাবে একটি নাটক যে নাটক, তা চেনার প্রধান লক্ষণ তার সংলাপ। এর সঙ্গে যুক্ত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া, দ্রুত গতি, দ্বন্দ্ব, আকস্মিকতা ও নাট্যকারের নির্লিপ্ততা। কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকার জড়াবেন না। নাটকের একটি বড় গুণ উৎকণ্ঠা। দর্শককে নাটক উৎকণ্ঠিত করে রাখবে এরপর কী হলো, কী হলো। এক্ষেত্রে নিশ্চয় 'পুনর্মিলন' নাটকটি অনেকখানিই সার্থক।

'পুনর্মিলন' নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালে। পরে অনেক পরিশোধন ও নতুন অংশ যোগ করে এটি বই আকারে বের হয় ১৯৭০ সালে। এই নাটকে কোনো অঙ্ক বিভাগ করা হয়নি। নাটকটি শুরুই হয় কোনো এক শীতরাতের পুরোনো এক স্টিমার ঘাটের যাত্রীরুমে স্টিমারের অপেক্ষায় থাকা চারজন যাত্রীর বেঞ্চে শুয়ে-বসে থাকার বর্ণনা দিয়ে। চার চরিত্র যথাক্রমে– নীলকণ্ঠ, জয়া, শিবু (শিবেন্দু) ও মদন পাল। নীলকণ্ঠ চৌধুরীর বয়স চল্লিশ বা দু-এক বছর বেশি, সুদর্শন। জয়ার বয়স ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ। শিবেন্দু সদ্য যুবক, সতেরো বছর বয়সী। মদন পাল লম্বা চেহারা, ঠোঁটের উপর সরু, শৌখিন গোঁফ আর দেহে বিলিতি টুইডের ঝকঝকে স্যুট।

পরে যোগ হয় অরুণা ও এক বৃদ্ধ চা-ওলা। অরুণার বয়সও বেশি নয়। অর্থাৎ নাটকটিতে মোট চরিত্র রয়েছে ছয়টি। 'পুনর্মিলন' নাটকে বুদ্ধদেব বসুর উজ্জ্বল পরিচয় এর সংলাপগুণ, ভাষাশক্তি। স্বল্পদৈর্ঘ্য বাক্যে, কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, তির্যক অভিব্যক্তিতে, সরস কৌতুকে এর ভাষা-সংলাপ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চরিত্রানুগ। নাটকটির শুরুতেই চারটি চরিত্রের কাছ থেকে যে সংলাপ পাওয়া যায় তা হলো–

নীলকণ্ঠ : (ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠে, বিড়বিড় করে)। শীত... কী শীত।

মদন পাল : (হঠাৎ মাথা সোজা করে, চোখ মেলে তাকিয়ে)। ড্যামিট। রাত কি আর ভোর হবে না? (তার মাথা আবার ঢলে পড়লো।)

[একটু চুপচাপ। একটা ভেঁপুর শব্দ–লম্বা, একটানা– ক্ষীণ হয়ে ভেসে এলো।]

নীলকণ্ঠ : (ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে) কিসের শব্দ? চাপা কান্নার মতো?

মদন পাল : (আধো ঘুমে, মাথা না-তুলে) আমার নীলরঙের অস্টিন... গ্রা- ট্রাঙ্ক রোড...

জয়া : (চমকে জেগে উঠে, মুখ তুলে, ভেঁপুর শব্দে কান পেতে) ঐ যে! এলো মনে হচ্ছে। (শিবুর মুখের উপর ঝুঁকে) শিবু শিবু।

[ভেঁপুর শব্দ ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গলো।]

শিবু : (ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে)। মস্ত বড় আকাশের তলায়... হঠাৎ...

জয়া : (শিবুর কাঁধে ঠেলা দিয়ে)। শিবু, ওঠ।

এখানে চা-ওলার চরিত্রটি বাদ দিলে বলা চলে প্রত্যেকেই মৃত। এই চরিত্ররা সকলে মৃত্যুর পর এই স্টিমার ঘাটের ওয়েটিং রুমে এসে মিলিত হয়েছে। মৃত পাঁচটি চরিত্রই একে-অপরের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত ও পূর্বপরিচিত। যেমন– নীলকণ্ঠ চৌধুরীর পুরোনো প্রেমিকা জয়া; শিবেন্দু হচ্ছে জয়া ও নীলকণ্ঠের ছেলে। অপরদিকে মদন পাল এক লাম্পট্য মাখা চরিত্র– জয়ার অফিসের বস, যার স্ত্রীর নাম অরুণা। অরুণার সঙ্গে আমরা দেখি জয়ার সদ্য যুবক ছেলের ইঙ্গিতময় সম্পর্ক, অপর দিকে জয়ার সাথে অফিসের বস মদন পালের।

নাটকটির সংক্ষেপে গল্পটা হচ্ছে– নীলকণ্ঠদের বাড়িতে শৈশব থেকেই আশ্রিতা জয়া। জয়া হচ্ছে নীলকণ্ঠদের বাড়ির রাঁধুনি বামুন-দিদির মেয়ে। বামুন দিদি মারা গেলে জয়াকে নীলকণ্ঠে পরিবার মেয়ের মতো লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে। কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যেই নীলকণ্ঠ ও জয়া যৌবনে একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু এই প্রেমের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের কথা বিবেচনা করে সন্তান-সম্ভবা জয়া একসময় পালিয়ে যায় ওই পরিবার থেকে। সে আশ্রয় তার মায়ের বৃদ্ধ বাবার কাছে। তার এক ছেলে সন্তান হয়, তাকে নিয়েই চলে জয়ার সংগ্রাম। একসময় সে অন্য এক শহরে চাকরি করতে যায়। সেখানে অফিসের বস হিসেবে দেখা পায় মদন পালের। ততদিনে তার ছেলে সন্তানটি কিছুটা বড় হয়ে গেছে। নাম শিবেন্দু, মাকে সে মা হিসেবে নয়, জানে মাসি হিসেবে। বাবার পরিচয় সে জানে না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই শিবেন্দুর কাছে গোপন রাখে জয়া। এদিকে একদিন শিবেন্দু অসুস্থ হয়ে পড়লে, এই রোগ সারানোর জন্য টাকার প্রয়োজনে ভিন্ন এক সম্পর্কে জয়া জড়িয়ে পড়ে মদন পালের সঙ্গে। বিনিময়ে মদন পাল শিবেন্দুর পড়াশোনারও খরচ বহন করে। একসময় সদ্য যৌবনে পা দেয়া শিবেন্দু যখন মদন পালের বাসায় যাতায়াত করে সে দেখা পায় মদন পালের কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনে অবহেলিত অরুণার। অরুণাকে সে ডাকে কাকি বলে। কিন্তু তারপরেও বয়সের অসমতা সত্ত্বেও অন্য এক সম্পর্ক হয় অরুণা ও শিবেন্দুর। ঘটনা মোড় নেয় নাটকীয়তার দিকে। মদন পাল বিষয়টা জানতে পেরে কৌশলে হত্যা করে অরুণাকে। শিবেন্দুকে লেলিয়ে দেয় নেশার দিকে। অপরদিকে কোনো এক ট্রেন জার্নির সময় নাটকীয়ভাবে মুখোমুখি হয় নীলকণ্ঠ ও জয়া। ওই ট্রেনে ছিল মদন পাল ও শিবেন্দুও। ওই খানেই শিবেন্দু জেনে ফেলে নীলকণ্ঠ তার বাবা। কিন্তু জানলে কী হবে তার সমানেই ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায় নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের এই মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না জয়া ও শিবেন্দু। বিষয়টা ভালো চোখে দেখে না মদন পাল। এক সময় শিবেন্দু চলে যায় যুদ্ধে। ছেলের খবরের প্রতীক্ষায় থাকা জয়া যখন জানতে পারে যুদ্ধে মারা গেছে শিবেন্দু; সন্তানের শোকে তখন এক শিশি পিল খেয়ে আত্মহত্যা করে জয়া। অপরদিকে মদন পালের মৃত্যু হয় নিজ-গাড়ি চালানোর সময় রোড অ্যাক্সিডেন্টে।

৪.

'পুনর্মিলন' নাটকটির চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গেলে আমরা দেখবো কিছুটা খোলামেলাভাবেই তিনি নাটকটিতে এনেছেন নারী-পুরুষ সম্পর্কের শরীরী উপস্থিতিটাকে। এখানে প্রেম এসেছে অনেকটাই আদিম কামনা ও ভোগতৃষ্ণা হয়ে। এক্ষেত্রে নাটকটির বিষয় নির্বাচনে তিনি বাংলা নাটকে তার পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ না করে যেন তাকিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের দিকেই। তিনি যেন কবিতা বা উপন্যাসের মতো নাটকেও হয়ে ওঠেন কথাসাহিত্যিক ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) কিংবা অল্ডাস হাক্সলির (১৮৯৪-১৯৬৩) অনুসারী। আমরা দেখি নীলকণ্ঠের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে গর্ভবতী হন জয়া। কিন্তু নীলকণ্ঠের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে পালিয়ে যায় জয়া। অথচ পরে নীলকণ্ঠের সন্তানকেই রক্ষার জন্য জয়া জড়িয়ে পড়ে লম্পট মদন পালের সঙ্গে। এই সম্পর্ক দুটির প্রথমটিতে যোগ হয় অশরীরী প্রেম ও শরীরী প্রেম একসাথে। অপরদিকে দ্বিতীয়টি কেবল বেঁচে থাকার প্রয়োজন ও প্রেমহীন এক বাধ্যতামূলক প্রেমের সম্পর্ক।

এছাড়া নাটকটিতে আমরা পাই অসম সম্পর্কের মধ্যেও লুকানো যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত। তেমনই একটি সম্পর্ক হচ্ছে মদন পালের স্ত্রী অরুণার সঙ্গে জয়ার সতের বছরের ছেলে শিবুর। যেমন–

শিবু : (ভারি গলায়)। তোমার চুল খুব সুন্দর, অরু-কাকি।
অরুণা : তা-ই নাকি?
শিবু : তুমি জানো না?
অরুণা : কী করে জানবো। নিজের পিঠ কি কেউ দেখতে পায়?
শিবু : কেউ বলেনি তোমাকে? (অরুণার এক গোছা চুল নিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঙুলে জড়াতে লাগলো।)
অরুণা : (চিরুনি নামিয়ে রেখে)। চুলে টান দিয়ো না। লাগে।
শিবু : (চুল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে)। তোমার চোখ খুব সুন্দর অরু-কাকি।
অরুণা : তা-ই নাকি?
শিবু : তুমি জানো না?
অরুণা : কী করে জানবো? নিজের চোখ কি কেউ দেখতে পায়?
শিবু (ঢোঁক গিলে)। তুমি খুব সুন্দর।

[একটু চুপচাপ। শিবু সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলো অরুণার দিকে, অরুণার চোখ বুজে গেলো, তার একটি হাত শিবুর কাঁধে এসে পড়লো। শিবু দুই হাতে কাছে টেনে আনলো অরুণাকে, দু-জনের ঠোঁট চুম্বনে মিলিত হলো।]

'পুনর্মিলন' একটি দ্বন্দ্বমুখর নাটক। কিন্তু নাটকটির মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্কের এই দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের মধ্যেও কোনো কোনো সংলাপে আমরা দেখি কিছু জীবন্ত ও নিত্য ঘটা অনিয়মকে নিয়ে স্যাটায়ার করার প্রবণতা। তেমনই কিছু চিত্র চিত্রিত হয়েছে স্টিমার ঘাটে মদন পাল ও শিবুর কিংবা চা-ওলা ও মদন পালের সংলাপের মধ্যে। যেমন–

শিবু : (নোটিস থেকে পড়ে)। 'ধূমপান করিবেন না।'
মদন পাল : তাই তো সারা মেঝেতে বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো। চমৎকার।
শিবু : (নোটিস থেকে পড়ে) 'শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন করিবেন না।'

মদন পাল : শৌচাগার। কথার ঘটা আছে! (হাসিতে ফেটে পড়ে) আমার একবার দরকার হয়েছিল রাত্রে– দুর্গন্ধে মাথা ফেটে যাবার জোগাড়। এই নিয়ে আবার নিয়মাবলি লটকানো! উঃহু! (পেটে হাত চাপা দিয়ে, হাসি থামিয়ে) কিন্তু আসল রগড় এর পরে আসছে। পড়ো, শিবু।

শিবু : (নোটিসটার দিকে তাকিয়ে নীরব)

কিংবা,

চা-ওলা : আজ্ঞে আমিই এখানকার স্টেশন-মাস্টার।
মদন পাল : (কৌতুক আর অবিশ্বাস মেশানো সুরে)। তা-ই নাকি? তুমিই স্টেশন-মাস্টার? আরে সেজন্যেই জায়গাটার এই হতচ্ছাড়া হাল? এই ঘরটাতে যেখানে দু-চারজন ভদ্রলোক এসে বসেন মাঝে মাঝে– সেটাতে ঝাঁটপাট পর্যন্ত পড়ে না! ঝাড়ুদার-টাড়ুদার নেই বুঝি? না কি সেই সরকারি টাকাটা– (ট্যাকে গোঁজার ভঙ্গি করে, চোখ টিপে) কেমন, ঠিক ধরেছি তো?
চা-ওলা : (কানে হাত রেখে)। কী বললেন, কত্তাবাবু?
মদন পাল : থাক, আর ভড়ং দেখাতে হবে না। সরকারি টাকার যে মা-বাবা নেই তা কি আমি জানি না, ভাবছো? এখনো এই পকেটে– (বুক-পকেটের উপর একবার চাপ দিয়ে) তা ঝাড়ুদার থাকলে পাঠিয়ে দিয়ো এক্ষুনি– (হঠাৎ হিন্দিতে, উপরিওলা ধরনে) আভি ভেজ দেও, বকশিশ মিল জায়গা।
চা-ওলা : আজ্ঞে আমিই এখানকার ঝাড়ুদার।
মদন পাল (সহাস্যে) : ও, ঝাড়ুদারও তুমি? আর-কিছু না?
চা-ওলা : ঝাড়ুদার, চায়ের ভাণ্ডার, পানি পাড়ে, স্টেশন-মাস্টার– সব আমি। আমাকেই চালাতে হয় সব।

৫.

নাটকটি পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রত্যেকটি চরিত্রের মৃত্যুর পর এখানে মুখোমুখি হওয়াটাকে সামনে রেখেই নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে 'পুনর্মিলন'। এই যে মৃত্যুর পর একটি পুরোনো স্টিমার ঘাটের ওয়েটিং রুমে সকলেই মুখোমুখি হয়, এই ঘটনাটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ফরাসি লেখক ও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের ১৯৪৪ সালে লেখা দ্বিতীয় নাটক 'উই ক্লো' (Huis Clos) এর কথা। এই নাটকটির ইংরেজি নাম হচ্ছে 'No Exit'। 'কপাট' নামে ১৯৪৮ সালে এটি অনুবাদ করেন নরেশ গুহ। নাটকটিতে মোট চারটি চরিত্র রয়েছে, যাদের মধ্যে মৃত্যুর পরের জগতে পৃথিবীর তিনটি চরিত্র– গার্স্যাঁ, ইনিয়েজ ও এস্তেল মুখোমুখি হয় একটি কক্ষে। ওই কক্ষটাই একসময় আবিষ্কৃত হয় 'নরক' বলে। প্রচলিত অর্থে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে আমরা যে নরকের শাস্তির বর্ণনা পাই, এ নরকের সাথে তার কোনো মিল নেই। ওখানকার শাস্তির প্রক্রিয়া যেন বারবার নিজের কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি হয়ে আত্ম-অনুশোচনার মধ্যে বসবাস। ওখানে তিনটি চরিত্র অনন্তকালের মধ্যে আটকে গিয়ে কখনই মুক্তি পায় না, এমনকি তাদের কক্ষের দরজা খুলে গেলেও তার বেরুতে সাহস পায় না।

প্রতীকী অর্থে আমরা বুদ্ধদেব বসুর স্টিমারের প্রতীক্ষায় থাকা কক্ষটিকে কিংবা সম্পূর্ণ স্টিমার ঘাটটিকেও একধরনের নরক বলে আখ্যা দিতে পারি। এখানে সময়ের কোনো শেষ নেই। চরিত্রগুলো বারবার ঘুরপাক খায় নিজস্ব জীবন-যাপনের গোপন

করে রাখা বিষয়ের স্বীকারোক্তি কিংবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা জীবনের পুনরাবৃত্তিতে। এখান থেকে মুক্তি মিললেও তা কখন মিলবে কেউ বলতে পারে না। 'পুনর্মিলন' নাটকে স্টিমারের প্রতীক্ষায় থাকা যাত্রীদের মধ্যে অরুণা ছাড়া কেউই হঠাৎ একটি স্টিমারের হুইসেল শুনেও সেটাতে উঠতে পারে না। একসময় তারা তীব্রভাবে অনুভব করে, তারা মারা গেছে।

জয়া : তুমি কষ্ট পাচ্ছো, নিলু। মরে গেলে কি আর কষ্ট থাকে?
নীলকণ্ঠ : আমি কী করে বলবো। এমনও তো হতে পারে আমরা মরে গিয়েছি কিন্তু জানি না? এমনও তো হতে আমরা মরে ছিলাম, কিন্তু জানতাম না?
জয়া (নিচু গলায়) : নীলু, একটা কথা। তুমি নিশ্চয় বুঝেছো– তবু আমি মুখ ফুটে বলছি– ঐ যে লোকটা, মদন পাল– আমি তার কাছে–তার সঙ্গে–
নীলকণ্ঠ (উদাস ভাবে) : তাতে কিছু এসে যায় না।
জয়া (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে) : আমি তোমাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে পারিনি, নীলু– এখন চাই– চাই তোমাকে ভালোবাসতে।
নীলকণ্ঠ (হতাশার সুরে) : তাতেও কিছু এসে যায় না।
জয়া (বড় নিঃশ্বাস নিয়ে) : এসে যায় না? (নীলকণ্ঠ কাচের মতো চোখে তাকিয়ে রইলো, জয়া তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিলো।) নীলু, নীলু! কী ভাবছো তুমি? তোমার হয়েছে কী?
নীলকণ্ঠ (যেন আপন মনে) : আরম্ভ– আবার আরম্ভ। তেতলার ঘর– তুমি আর আমি– আর নিচের ঘর– নিচের ঘরে– (যন্ত্রণার সুরে) ঝাঁপি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে আরম্ভ করতে বোলো না।
মদন পাল : না, না, আরম্ভ না! কেউ যেন আরম্ভ না কওে কখনো। আরম্ভ হলে আর শেষ হবে না। লক্ষের পরে কোটি, কোটির পরে অর্বুদ, অর্বুদের পরে শঙ্খ, শঙ্খের পরে পদ্ম– আরো, আরো, আরো! ওঃ, কী ভীষণ!

'পুনর্মিলন' নাটকে বুদ্ধদেব বসু জীবনের অর্থহীনতা, উদ্ভট হাস্যকর অসঙ্গতিসমূহ ও শূন্যতা, আদর্শবাদ এবং জীবনের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার অবক্ষয়কে স্বচ্ছ ভাষায় ও ভঙ্গিতে, পারম্পর্য রক্ষা করে, সুন্দর যুক্তির মালা সাজিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর নাটকটির মধ্যে সমস্ত আঞ্চলিকতা এড়িয়ে যেন এক বিশ্বভাবনার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যা অনেকটাই যেন জিরাদু, আন্যুই, সালক্রু, সার্ত্রে বা কাম্যুর মতো বিশ্ব মানের নাট্যকারদের সাথে সম্পর্কিত!

তথ্যনির্দেশ

১. পুনর্মিলন– বুদ্ধদেব বসু
২. কপাট– জাঁ পল সার্ত্র, অনুবাদ : নরেশ গুহ
৩. অ্যাবসার্ড নাটক– কবীর চৌধুরী
৪. বুদ্ধদেব বসু– সুদক্ষিণা ঘোষ
৫. কেন নাটক– অন্জন্ দাশগুপ্ত
৬. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়– দীপ্তি ত্রিপাঠী
৭. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বিষয় ও প্রকরণ– মাহবুব সাদিক
৮. কাকে বলে নাট্যকলা– শম্ভু মিত্র
৯. দিদৃক্ষা– শাঁওলী মিত্র

বুদ্ধদেব বসু : শতবার্ষিক অবলোকন

বিশ্বজিৎ ঘোষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ-বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়ো-জমি'-তে 'ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) দীপ্র আবির্ভাব। যুগধর্মের বৈনাশিকতায় বুদ্ধদেব বসুর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ জীবনসন্দিগ্ধ শিকড়-উন্মূলিত বিশ্বাসবিচ্যুত— কখনোবা সত্তাছিন্ন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত জটিল আবর্তময় সংকটদীর্ণ সময়ের অন্তঃসারকে অন্তরে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর প্রাতিস্বিক জীবনবোধ। আধুনিক মানবচৈতন্যের সমুদ্রবিস্তৃতি ও তার বিভঙ্গতা, প্রবহমাণ জীবন ও ক্রমভঙ্গুর মূল্যবোধ, সভ্যতার বৈনাশিক তাণ্ডব ও জাগতিক বিপন্নতা— এইসব প্রবণতা প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধদেব বসু কৈশোর থেকেই এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। দুই মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগসংক্ষোভ ও বৈশ্বিক বিপন্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর দ্বৈরথচৈতন্যময় জীবন। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধপীড়িত অস্থির পৃথিবীর পরিবর্তমান মূল্যবোধে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁর প্রবংশের (generation) আরো অনেক কবি-শিল্পী-কথাকার। বৈনাশিক যুগধর্মের প্রভাবে তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব বসু সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধে বিশ্বাস হারিয়েছেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের' প্রতি রাখতে পারেন নি আস্থা, আন্তঃমানবিক সংযুক্তিতে হয়ে পড়েছেন সন্দিহান। স্বৈরবৃত্তকাল আর পরিবর্তমান সময়ের প্রভাবে যাবতীয় মানবিক প্রত্যয় আর প্রমূল্য থেকে উন্মূলিত হয়ে তিনি নিমগ্ন হয়েছেন আধুনিক জীবনের নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্য-সংশয়-সন্দেহ-ক্লান্তি-হতাশা এবং বিতৃষ্ণা-বিবমিষার তমস-পঙ্কিল জগতে। ভারতীর শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্য জীবনভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি ক্রমশ সমর-উত্তর খণ্ডিত-বিচূর্ণিত জীবনভাবনায় হয়ে উঠেছেন বিশ্বাসী— সংশয়-নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্যের ভেলায় ভেসে তিনি উপনীত হয়েছেন যুদ্ধোত্তর নতুন মানস-ভূগোলে, নেতি আর নাস্তি আর শূন্যতাই যার প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধ ও শিল্পিসত্তার মৌল পরিচয় তাঁর প্রবাদপ্রতিম আমিত্ব, আত্মতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিহিত। আত্মতা এবং আমিত্বই বুদ্ধদেবের সাহিত্যকর্মের মুখ্য উপজীব্য; বস্তুত, তাঁর অনেক সৃষ্টিই আত্মজৈবনিক রচনা। কোনো নির্দিষ্ট মৃত্তিকার মর্মমূলে তিনি শিকড় সঞ্চারিত করতে পারেন নি, বিশিষ্ট কোনো দার্শনিক বিশ্বাসে হতে পারেন নি স্থিতপ্রাজ্ঞ। সীমাহীন একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যবোধ তাঁর মানসভূমিতে ছিল আমূল প্রোথিত। একটি নির্দিষ্ট পরিবার বলয়ের মধ্যে প্রায় নির্বাসিতভাবে বেড়ে ওঠার কারণে বুদ্ধদেব বসুর মানসলোকে শৈশবেই উপ্ত হয়েছিল নিঃসঙ্গতার জায়মান বীজ। পরিবার-সমাজ-স্বজনের সঙ্গে অল্প বয়স থেকেই তিনি কোনো অর্থময় যোগসূত্রের কারণ খুঁজে পান নি। বৈরী ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশ এবং বিরূপ

ঘটনাধারা তাঁকে ক্রমশই করে তুলেছিল আত্মসমাহিত, নিভৃতচারী ও অন্তর্মুখী এবং এভাবে তার মনোলোকে দেখা দিয়েছিল সীমাহীন একাকিত্ববোধ ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনা। বুদ্ধদেব বসুর জীবনাদর্শে প্রোথিত বীতমূলচেতনা, একাকিত্ববোধ এবং নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি আমৃত্যু ছিল বহমান।

বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের যন্ত্রণায় জীবনভর বেদনার্ত ছিলেন বুদ্ধদেব। আত্মজৈবনিক এই বেদনার প্রতিভাস তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাকর্মে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলিতে। ব্যক্তিগত পত্রাবলিতে ফুটে উঠেছে নৈঃসঙ্গ্যের বেদনায় পীড়িত একাকী বুদ্ধদেবের অকৃত্রিম পরিচয়। তবে এরই পাশাপাশি তাঁর রচনায় নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্য আর কালগত বৈনাশিকতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ধ্বনিত হয়েছে— কখনো ব্যক্তিগত পত্রে, কখনো কবিতায়, আবার কখনো-বা নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্পের কোনো চরিত্রভাষ্যে। বস্তুত, বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা— উভয় প্রবণতাই আমরা লক্ষ করি বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিকর্মে। তাঁর কাছে নিঃসঙ্গতা পলায়ন নয়, তা সত্য-অবলোকন ও আত্ম-সম্প্রসারণের অন্তহীন প্রেরণা, সৃষ্টিশীলতার অনন্ত উৎস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং প্রত্যয়-প্রমূল্যহীন নিখিল-নির্বেদের সমাজপটে আবির্ভূত বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধ, তাঁর সমকালীনদের মতোই ছিল পীড়িত ও আর্ত ও সন্দিগ্ধ। বস্তুত, ত্রিশোত্তর কালের নঞর্থক ও পরিবর্তমান সমাজ-প্রবণতাই বুদ্ধদেবের মনোভূমে উপ্ত করেছে প্রাতিস্বিক জীবনবোধের ভবিষ্যবিস্তারী বীজ। শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবনে যে উন্মূল ও নিঃসঙ্গ মানসচারিত্র্য বুদ্ধদেবের মাঝে লক্ষ করা গেছে, উত্তরজীবনে তা-ই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনবোধের অন্তর্গত কুললক্ষণ। এই উন্মূল নিঃসঙ্গ এবং আর্ত-পীড়িত-সন্দিগ্ধ জীবনবোধের প্রভাব পড়েছে বুদ্ধদেবের সাহিত্যচিন্তায়, তার শিল্পভাবনায়। প্রতিবেশপীড়িত জীবন ও ব্যক্তিক জীবনবোধের প্রভাবে তার সাহিত্যচিন্তায় এসেছে অবক্ষয়রিক্ত যন্ত্রণাজর্জর অসহায় মানুষের নিবিড় নৈঃসঙ্গ্য ও দুর্মর একাকিত্ববোধের বেদনার্ত অনুভূতি।

রবীন্দ্রবৃত্ত অতিক্রমের বাসনা নিয়ে ত্রিশোত্তর কবি-শিল্পীরা সচেতনভাবে অবগাহন করেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যে। সমরউত্তর বিপন্নতা ও বিচ্যুতি ও নতুন জীবন বাস্তবতার শব্দরূপ নির্মাণে পাশ্চাত্য সাহিত্যই তাদের কাছে হয়ে উঠলো প্রধান প্রেরণাউৎস— বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্য। সমসাময়িক জীবনপ্রবাহ ও সমাজবাস্তবতা অবলম্বন করেই রচিত হয় সাহিত্যকর্ম; কিন্তু মহৎ সাহিত্যপ্রতিভার জাদুস্পর্শে এই সমকালীনতাই উত্তীর্ণ হয় চিরকালীনতার। বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন— কাল থেকে কালান্তরে গিয়ে চিরন্তনতার মহিমাপ্রাপ্তিই যে কোনো মহৎ সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ।

সাহিত্য-শিল্পকলা সমকালীন সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হলেও তার পরম অন্বিষ্ট চিরকালীন মহিমা লাভ। তাই উপযোগিতামূলক সাহিত্যকে বুদ্ধদেব কখনোই উঁচুমানের সাহিত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে করেন, মানবত্মার মুক্তি কামনা এবং আন্তঃমানবিক সমন্বয় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে সাহিত্য-শিল্পকলার অন্তিম অন্বিষ্ট। বুদ্ধদেবের মতে, যে কোন মহৎ শিল্পী প্রথাবদ্ধ জীবনভাবনা পরিত্যাগ করে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের অনুগামী হয়ে ওঠেন— এ পথেই তিনি পেতে চান

শাশ্বতের স্পর্শ। এই শাশ্বতের স্পর্শই হচ্ছে আন্তঃমানবিক সামঞ্জস্য স্থাপনের মৌল সত্য। বহুমাত্রিক জটিলতার কারণে সভ্যতা যে সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে, বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, একমাত্র সাহিত্য-শিল্পকলার মাধ্যমেই স্থাপিত হতে পারে প্রত্যাশিত সেই সামঞ্জস্য ও সুরসঙ্গীত। তাই সুস্পষ্টভাবে তিনি বলেন—

> শৃঙ্খলা— তা সংসারজীবনে কোথাও যদি নাও থাকে, তবু আছে ছন্দোবদ্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্যবাক্যে, সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে— আছে, এবং থাকতেই হবে— স্বরের সঙ্গে স্বরের ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সঙ্গতি, এক অংশের সঙ্গে অন্য সব অংশের ভারসাম্য ও মৈত্রী, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সহযোগিতা, ধারণা ও রূপকরণের পূর্ণ সমন্বয়, বাগর্থের অর্ধ-নারীশ্বরমিলন। সেই একমাত্র স্থান, যেখানে বেসুরোকেও মিলিয়ে দেওয়া যায় সুরের মধ্যে, পৃথিবীর সব ছেঁড়া তার থেকে বেরিয়ে আসে মনোলীন এক সিম্ফনী। *(কবিতার শত্রু ও মিত্র)*

বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন, সাহিত্য-শিল্পকলার সামাজিক কোনো উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না; কেননা, সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে এ কালের শিল্পীর। যে কোনো মহৎ শিল্পীই, তাঁর মতে, একালে বরণ করে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন। বুদ্ধদেবের ভাষায় — 'যে মধ্য-উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে উপযোগবাদের অভ্যুদয় হলো, সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন যে কবি কোনো 'কাজে লাগেন' না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার করে নিতে হয়, অতএব, একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন।' *(শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা)*

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির এই বিচ্ছেদ ও স্বেচ্ছা-নির্বাসন বুদ্ধদেব বসুর জীবনচর্চা এবং সৃজনভুবন উভয় প্রান্তেই আমরা লক্ষ করি। বুদ্ধদেব বসুর জীবনাদর্শে প্রোথিত বীতমূলচেতনা, একাকিত্ববোধ ও নৈঃসঙ্গ্যানুভূতিই ছিল তাঁর শিল্পি-মানসের মৌল নিয়ন্ত্রক শক্তি। কোনো নির্দিষ্ট মৃত্তিকার মর্মমূলে তিনি শিকড়ায়িত হতে পারেন নি এবং কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ভাবতে পারেন নি একান্ত আপন বলে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠে আবাল্য অনুরাগ, শৈশব-কৈশোরের অনিকেত স্বভাব ও উন্মূল চারিত্র্য, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা এবং সমাজ-সংগঠন ও মানব অস্তিত্বের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও ঐক্য-বিষয়ক উপলব্ধি— এসবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর প্রাতিস্বিক জীবনদর্শন ও সাহিত্যভাবনা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাহিত্যচর্চায় কোনো বিশ্বাস ছিল না বুদ্ধদেব বসুর। তিনি মনে করতেন দলবেঁধে সাহিত্যচর্চা সম্ভব নয়। কিন্তু ফ্যাসিস্ট হিটলার-মুসোলিনি চক্রের বিরুদ্ধে, ১৯৩৫ সালের পর থেকে, পৃথিবীর দেশে-দেশে যখন ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক সঙ্ঘ গঠিত হয়, বুদ্ধদেব বসু তখন এই সঙ্ঘের ভারতীয় শাখার কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। ১৯৩৮ সালে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে যে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়, বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। ঢাকায়, ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ, ফ্যাসিবাদবিরোধী মিছিল করতে গিয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) নিহত হলে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধদেব বসু এই সঙ্ঘের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের ১৯-২০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের তৃতীয় সম্মেলনেও তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ওই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি যা বলেন, তাতে তাঁর রাজনীতি-সচেতনতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

> শিল্পীর যেটা সত্য পরিচয় সেটা কখনোই নঞর্থক হতে পারে না; তিনি যে শুধু অন্যায়ের বিরোধী এ-কথা বললে অনেকটা ছোট করে দেখা হয়; তিনি যে প্রেমিক, তিনি যে বিশ্বমানবিক, তিনি যে দেশকালের সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে, তিনি যে মনুষ্যধর্মের পুরোহিত এটাই তাঁর সম্বন্ধে আসল কথা।... আমরা জানি এ আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি রাতারাতি হবে না, আরো অনেক দুঃখ এর জন্য মাথা পেতে নিতে হবে— কিন্তু এছাড়া আমাদের আর পথ নেই, এমন কি দাঁড়াবার আর জায়গা নেই তা মনে মনে যখনোই জানবো তখনই আমাদের সংকল্প হবে অবিচল। আর যে মেদস্ফীত মদাপ্লুত অন্যায় পশুশক্তির বীভৎস মাৎলামিতে আজ পৃথিবী ভরে ছারখার করে বেড়াচ্ছে তাকে আমরা বলবো : তুমি সব পারো কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব কাড়তে পারো না— তুমি যা করছো আমাদের দিয়ে তা করাতে পারবে না— তাই তুমি পরাজিত আর আমরাই জয়ী। ('ফ্যাসিবাদ, শিল্প ও বিশ্বমানব')

রাজনীতিকে কখনোই সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন নি বুদ্ধদেব বসু। তবে, ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পৃক্তির ফলে বুদ্ধদেবের রচনায়, সাময়িক হলেও, রাজনীতি ও সমাজসচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর *সভ্যতা ও ফ্যাসিজম* (১৯৪২) শীর্ষক গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন— 'অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ছিল সাম্যবাদী রাশিয়া— রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়েছিলুম। জারের আমলে যে দেশ ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে-দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম। ফরাশি বিপ্লবের পরে মানুষের ইতিহাসে এতবসড় ঘটনা আর ঘটে নি।' সূচনাসূত্রে আমরা ব্যক্ত করেছিলাম যে বুদ্ধদেব বসু প্রধানত আত্মমগ্ন শিল্পী— সম্মিলিত মানবস্রোতে তার সম্পৃক্তি ততটা প্রবল নয়। কিন্তু কখনো কখনো তিনি দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাশে, ফ্যাসিবাদের উন্মত্ততার সময়ে ঘোষণা করেছেন মানবতার অপরাজেয় বিজয়গাথা—

> ...জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক মমত্ববোধ, আমি কোনো রকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে কোনো অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা ক'রে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমার একলার নয়, সকলেরই স্বার্থ। আমি আমার সেই ভালো চাই যাতে অন্য সকলেরই ভালো। আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ, তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। ('সভ্যতা ও ফ্যাসিজম')

বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন সদর্থক সংস্কৃতিই হচ্ছে মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। সংস্কৃতি মানুষের অন্তর্গত একাকিত্বকে দূর করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধন ঘটায়, সংস্কৃতির স্পর্শে মানুষ পবিত্র হয়। সংস্কৃতি মানুষকে মানবপ্রেমিক করে– এই-ই বুদ্ধদেবের পরম বিশ্বাস। তাই প্রথম যৌবনের রক্তক্ষরণ পেরিয়ে উত্তরকালে তিনি রচনা করেছেন মানবমুক্তির এক অমরাবতী। রচনায়, তাঁর কবিতা-উপন্যাস-কাব্যনাটকে, বুদ্ধদেব বসু মানব-মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন মানবচিত্তে সংস্কৃতিবোধ জাগরণের প্রত্যয় নিয়ে। সংস্কৃতি বিশ্বনাগরিকতা বোধ সৃষ্টিতেও পালন করে দূরসঞ্চারী ভূমিকা। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বনাগরিকতাবোধ-সম্পন্ন সংস্কৃতিই মানব প্রগতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার বলে মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। 'স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্য এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> সংস্কৃতির স্তর যত নিচু, ততই নিজ-নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ঝোঁক, বিদেশী-বিদ্বেষ বর্বরতারই লক্ষণ। যাঁর মন যত বেশি উদ্বুদ্ধ, দেশে-বিদেশে অনুরূপ মনের সঙ্গে তাঁর ততই সহজ ও গভীর সংযোগ। সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই মানুষের মনে-মনে বিশ্বমানবিকতার আবহাওয়া রচনা করতে হবে, তবে যদি সভ্যতাকে বাঁচানো যায়। এ কাজে আমরা তাঁদেরই পাবো যাঁরা ধূর্ত গণপতি কি দাম্ভিক ধনপতি নন, যাঁরা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা জীবনসাধনায় অগ্রণী— তাঁরা কবি তাঁরা শিল্পী তাঁরা প্রেমিক। নতুন জগৎ রচনার ভার আসলে তাঁদেরই হাতে, কারণ প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ শুধু তাঁরাই। স্বজাতিবোধ যদি মানুষের মন থেকে উচ্ছিন্ন না হয়, যদি প্রত্যেক মানুষই বিশ্বমানবিকতার প্রীতিপূর্ণ উদার আনন্দে দীক্ষিত না হয়, তাহলে কুড়ি বছর পর-পর 'বৈজ্ঞানিক' যুদ্ধের জগৎব্যাপী পৈশাচিকতায় সভ্যতার টিকে থাকবার আশা কম। স্বজাতিবোধের বদলে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের চেতনা জাগলে যুদ্ধের মূল কারণ না হোক, মূল প্রেরণা দূর হয়ে যায়।
>
> ('স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা')

বুদ্ধদেব বসুর কর্ম ও সাহিত্যজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত; বস্তুত, এর একটি থেকে অপরটিকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁর সকল কর্মের পশ্চাতেই সর্বদা সক্রিয় ছিল বিশুদ্ধ সাহিত্যসাধনার আন্তরগরজ। তাঁর কর্মজীবন কখনোই সুখের ছিল না, ছিল না কুসুমাস্তীর্ণ। পত্রিকা অফিসে চাকরি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, ইউনেস্কোর দায়িত্বপালন— নানা পেশার সঙ্গে জড়িত হলেও বুদ্ধদেব বসু লেখাটাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পেশা ও কাজ বলে মনে করতেন। বস্তুত, বুদ্ধদেবই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পেশাজীবী লেখক। চাকরিগত অনিশ্চয়তা, বৈরী প্রতিবেশ এবং পৌনঃপুনিক বিড়ম্বনা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু জীবনভর নিভৃতমনে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বস্তুত, তাঁর সমগ্র জীবনকেই, বৃহৎ অর্থে, সাহিত্যজীবন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বাংলা কবিতায় যুদ্ধোত্তর আধুনিকতা আনয়নে বুদ্ধদেব বসু পালন করেন ধাত্রীমাতার ভূমিকা। বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্ত-সম্পাদিত হাতে-লেখা 'প্রগতি' প্রথম ছাপার আক্ষরে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে। আই. এ. পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা সম্বল করেই এই দুঃসাহসী কাজে নেমেছিলেন বুদ্ধদেব। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে লেখা এক চিঠিতে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন তাঁর এই দুঃসাহসের কথা— "অচিন্ত্যবাবু, আষাঢ় মাস থেকে আমরা 'প্রগতি' ছেপে বের করচি। মস্ত দুঃসাহসের কাজ, না? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেলো। এখন আর ফেরা যায় না। একবার ভালো করেই চেষ্টা করে দেখি না কি হয়।" 'প্রগতি' প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মিলেছিলেন অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু, পরিমল রায় প্রমুখ। প্রগতির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন প্রভু গুহ-ঠাকুরতা, পরিমল রায়, মনীশ ঘটক, অজিত দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতে 'প্রগতি'র সদর্থক ভূমিকা আজ ইতিহাস-স্বীকৃত।

'প্রগতি'র পর 'কবিতা' পত্রিকা বের করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আনয়নে বুদ্ধদেব বসু পালন করেন পথিকৃতের ভূমিকা। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৯৩৫ সালের ১লা অক্টোবর, কলকাতা থেকে। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা উঠে এসেছেন, অনেকেই পেয়েছেন সোজা-হয়ে-দাঁড়াবার প্রথম মৃত্তিকা। 'কবিতা'র জন্য বুদ্ধদেবের সংগ্রাম আর বাংলা কবিতার আধুনিকতা প্রায় সমার্থক। দীর্ঘ

প্রায় পঁচিশ বছরে অনবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত 'কবিতা'র রচনাপুঞ্জ থেকে বাংলা কবিতার আধুনিক হয়ে ওঠার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পাঠটিকে সচেতন পাঠক সহজেই আবিষ্কার করে নিতে পারবেন। বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পালন করেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর অর্ধ-শতাব্দীর সাহিত্যজীবনে একশ ষাটের অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন; পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে এখনো ছড়িয়ে আছে তাঁর অগ্রন্থিত অনেক রচনা। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর মতো সব্যসাচী প্রতিভা আর কেউ আসেন নি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় রোমান্টিক মানসচারিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতিমুগ্ধতা, বিষাদময় প্রেমচেতনা, মানুষী ভালোবাসা, নিঃসঙ্গতা-নির্বেদ— এইসব প্রবণতা নিয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু আর তাঁর কবিতা। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনপদের ছায়াপাত ঘটেছে বুদ্ধদেবের কবিতায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষুব্ধ মানবচেতনা বুদ্ধদেবের কবিতায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। বিষয়ের পাশাপাশি কবিতার আঙ্গিকেও তিনি রেখেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। বুদ্ধদেবের উপন্যাস ও ছোটগল্প তাঁর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ববোধ, মধ্যবিত্ত জীবনের নানামাত্রিক সঙ্কট বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে শিল্পিতা পেয়েছে। উপন্যাসের ভাষা ও পরিচর্যায় বুদ্ধদেব যে নতুন মাত্রা সংযোজন করছেন, বাংলা সাহিত্যের ধারায় তা এক ঋদ্ধ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নাটক এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের কীর্তি কিংবদন্তিতুল্য। রবীন্দ্রনাথের পর কাব্যনাটকের ধারায় বুদ্ধদেবের তুল্য কৃতিত্ব অন্য কোনো লেখকের ভাগ্যে জোটে নি। প্রবন্ধ, ভ্রমণসাহিত্য ও স্মৃতিকথার ধারাতেও বুদ্ধদেবের অর্জন প্রাতিস্বিকতা-চিহ্নিত।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ। এমন নিটোল, গীতময়, ধ্বনিমুখর আকর্ষণীয় গদ্য বাংলা সাহিত্যে তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে না। উত্তরকালীন লেখকদের উপর বুদ্ধদেব বসুর যে প্রভাব, তার অনেকটাই এই গদ্যরীতিজাত। বিশেষ্যকে অনায়াসে বুদ্ধদেব পরিণত করেন বিশেষণে, এক বাক্যের সঙ্গে অবলীলায় তিনি মিলিয়ে দেন এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য সচেতন পাঠকের কাছে আরামের আশ্রয়। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর অবদানের অনেক প্রান্তের এক প্রান্ত তাঁর এই হৃদয়গ্রাহী গদ্য।

বাংলা সমালোচনার ইতিহাসেও বুদ্ধদেবের কীর্তি অসামান্য। কত বিচিত্র বিষয়ে যে তিনি লিখেছেন, তার হিসাব করাটাও দুরূহ। বাংলা সাহিত্যের তিনিই পথিকৃৎ শিল্পী, যিনি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণের দিকেও সমান মনোযোগ দিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচনায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজস্ব এক আদর্শ। সমালোচনা বলতে তিনি কী বুঝতেন, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় তাঁর নিম্নোক্ত ভাষ্যে— 'সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূলসূত্র উদঘাটন করা এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ কাজ যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে স্বীকৃত, এবং তাঁদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে পরবর্তীযুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ণ গৃহীত না হলেও শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাঁদের রাজত্ব নষ্ট হয় নি। অর্থাৎ সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য করে তুলেছিলেন। এইটেই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই সমালোচক।'

('কবিতা', আষাঢ় ১৩৫০)

একথা অনস্বীকার্য যে বুদ্ধদেব বসুর রচনায় সমাজ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উপস্থিতি অতি সামান্য। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তিনি সতর্কভাবেই পরিহার করেছেন তাঁর রচনায়। ১৯৪২ সালে সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে অল্প সময়ের জন্য তিনি শামিল হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সেই ভূমিকা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এমনকি, ১৯৭১ সালে তাঁর জন্মভূমি যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে লণ্ড-ভণ্ড, তখনও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। এ কারণে রাজনৈতিকভাবে তিনি কখনো কখনো নিগ্রহেরও শিকার হয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েই আবর্তিত ছিল তাঁর লেখার জগৎ। বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, নিম্নবর্গের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের কোন ছায়াপাত নেই বুদ্ধদেবের রচনায়। একথা বোধ করি অনস্বীকার্য, তিনি ছিলেন 'শিল্প শিল্পের জন্য'— এই তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী।

বুদ্ধদেব বসু, আগেই ব্যক্ত হয়েছে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার ধাত্রীমাতা। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি কেবল নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নি, সমকালীন অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠার জন্যও নিরলস সংগ্রাম করেছেন। শত প্রতিকূলতা, আর্থিক বিপর্যয়, চাকরিগত অনিশ্চয়তা এবং বৈরী প্রতিবেশ অতিক্রম করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় এভাবে তিনি হয়ে উঠেছন জ্যোতির্ময় এক প্রতিষ্ঠান।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতার শত্রু ও মিত্র : একটি খোলা চিঠি'র উত্তর

বেগম আকতার কামাল

আপনার জন্মশতবর্ষে আমরা যারা বেঁচে আছি— এই একুশ শতকের পাঠকরা, পড়ছি আপনার বন্ধুকে লেখা একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি। এটি আপনি লিখেছিলেন ১৯৭১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে, প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকার ১৩৭৮ সংখ্যায়। চিঠির পাতার পর পাতা জুড়ে কবিতার শত্রু ও মিত্র সন্ধানে ও সনাক্তকরণে আপনার ভাষা ঝলকে উঠেছে অনন্য গদ্যশৈলীর পরাকাষ্ঠা ঘটিয়ে। আমরা বিমোহিত, আবার প্রতিহতও। কী অসাধারণ আপনার যুক্তিজাল ছড়ানো বাক্-বৈদগ্ধ্য, কী ব্যাপক আপনার পঠনপাঠন, আর কতই না প্রবল পক্ষপাতিত্ব কবিতার মিত্রদের প্রতি, আর নির্মম আক্রমণ শত্রুদের প্রতি! সারাজীবন নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যা ভেবেছেন, যেভাবে নিরলস কাজ করেছেন সেসবের পুঞ্জীভূত প্রকাশ ঘটেছে এই চিঠির প্রতিটি বাক্যে-শব্দে। এটি পড়তে পড়তে আমাদের ভেতর-মহলে দিব্য ভাবানুভূতি জাগে যা নান্দনিক অর্থে আধ্যাত্মিক বোধিতুল্য, যা মোহ ছড়ায় চেতনার পরতে পরতে। আপনিতো শিল্পকে একান্ত আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপার বলেই ভাবেন— সেই ১৯৩৩-এ লেখা 'কিসের জন্য আর্ট' থেকে শুরু করে যে ভাবনা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৫৮-তে শার্ল বোদলোয়ারকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, এই অধ্যাত্মবোধি ধর্মীয় অর্থে নয়, চৈতন্যর উর্ধ্বতম সূক্ষ্মস্তর হিসেবে ধর্তব্য। কিন্তু বিশ্লেষণের চোখে তাকালে বুঝতে পারি প্রশান্ত দিব্যতা নয়, বরং চিঠিতে ছলকে উঠছে শিল্পপ্রণয়ীর অন্তর্দাহ, নির্গলিত হচ্ছে অভিমান-অভিযোগের চাপা-পড়া বাষ্প, নিপুণ হাতে কবিতার ঐতিহাসিক শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দশর। আমরা বেদনাহত হয়ে দেখি আপনার হৃদয়ের শোণিতপাত, ফোঁটাফোঁটা রক্তবিন্দু-ঝরা। অথচ কী আশ্চর্য, তা শারীরিক, মানসিক, জাগতিক জীবনযুদ্ধ নিয়ে নয়, শুধুই কবিতার পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের দহন নিয়ে। কবিবরেষু, বাংলা 'আধুনিক' কবিতার সুরম্য সৌধের হে স্থপতি ও সংরক্ষণকামী, আমরা চিঠির জবাবে এখন একে-একে নিজেরাও শত্রু ও মিত্র হতে যাচ্ছি— আপনার ও কবিতার।

১

শুরুতেই আপনি কেন বলেন 'এক পরিপ্রেক্ষিতের কথা' যা আপনাকে তাগিদ দিচ্ছে কবিতার শত্রুদের খুঁজে বার করতে! এক 'অন্ধ ঐতিহাসিক শক্তি'-কে আপনি ১৯৭১-এ দেখতে পান আপনার চারপাশে— অত্যন্ত ক্রূর শক্তি নিয়ে যে আঘাত করছে মানুষের জীবনকে— আপনার মতে যা দুর্বোধ্য, দুর্বার, যা আপনার নিশ্চিন্ত একান্ত বসবাসের জগৎকে করে তুলছে অনির্ণেয়, সংশয়াপন্ন। এ সময়েই কেন আপনি কবিতার পক্ষবিপক্ষ নিয়ে বন্ধুকে তথা পাঠককে এই চিঠি লিখছেন? ইতিহাস কি নিছক 'অন্ধ শক্তি'? না মানুষের শ্রমে-ঘামে-সংগ্রামে চৈতন্যে বিনির্মিত শক্তি? আপনি কেন ১৯৭১-

এর বিষাদময় বিশৃঙ্খল কলকাতায় থেকেও— যে কলকাতায় তখন সংঘটিত হচ্ছে নক্শাল সংগ্রাম ও তা দমনের নামে অজস্র রক্তপাত, কিংবা আপনার ছেড়ে-যাওয়া জন্মভূমি এই বাংলাদেশ যখন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে জমায়েত হতে যাচ্ছে, গর্জে উঠছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের নিষ্পেষিত মানুষজন, এসব সংঘটনা এড়িয়ে মনে মনে কেন ভাবেন মনোহর রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল, গুঞ্জনময় আকাশের কথা! এ কী বস্তুজগতের সংঘাতজটিল যন্ত্রণা-বেদনার পরিসর ছাড়িয়ে ধ্বনিগুঞ্জরিত কল্পনা-আবহের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নয়! আপনার সেইসব মোহন শব্দময় কাব্যপঙ্ক্তির ধ্বনিময়তার কথা মনে পড়ছে, যেখানে আপনার কবিতা-সৃষ্টিপন্থাটি এভাবেই বস্তুসংসার থেকে সরে গিয়ে সমর্পিত ও উৎসারিত হত শব্দভাষার গর্ভ থেকে। এক echo-word চর্চার প্রবলতা আপনাকে দখল করে রাখত, সেই যে *কঙ্কাবতীর* (১৯৩৭) আবেগাশ্রয়ী, উল্লসিত ধ্বন্যুক্তিসমূহ—

রাতের ঘুমের নীরব সময় মুখর তোমার নামের গানে,
প্রতি মুহূর্তে ফুটে ঝরে যায়, ফেটে মরে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝরে যায় তোমার নামে;
রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে;
কাজের জোয়ারে; ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে —
কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী!
কঙ্কাবতী গো!

বাংলা কবিতা তো আদিকাল থেকে ধ্বনি-আশ্রয়ী; এমনকি আপনার সতীর্থ কবি স্থানবর্ণিমার চিত্রকল্প-রচনাকারী জীবনানন্দেও অনিদ্র সুরের অনুরণন বয়ে যায় স্রোতের মতো অবিরল হয়ে। আধুনিক সময়ের অন্ধতমসার টানে যদিও দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল তাঁর চেতনার ভূভাগ, আর তিনি হেঁটেছিলেন অবচেতনার কুহকী রহস্যময় 'পথে', তবু বিষণ্ন সুরই তাঁর মূল সংবেদন হয়ে রইল। আর আপনি তো ধন্যুক্তিকেই চিত্রোক্তি করে তোলার নিপুণ কারুকর্মী।

এরপর, চিঠিতে আপনি 'আস্থার' প্রসঙ্গ তোলেন— যেমন করে সভ্যতার সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এ মানবসভ্যতার উপর আস্থা হারিয়ে তবুও মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার আস্থা নিজের ওপর ও অবচেতনভাবে জগৎসংসারের ওপর। কেন শুধুই নিজের ওপর এবং তা অবচেতনভাবে? কেন নয় সচেতনভাবে? এ কি নয় অন্তর্মুখী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা? জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির নিঃসঙ্গ অবস্থান? জগতের মুখোমুখি হওয়া নয়, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক লিপ্ততা নয়। মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার স্থায়িত্বের ওপর আপনার গভীর আস্থার কথাও অবশ্য স্মরণ করেন। কিন্তু আপনার বক্তব্য এরকম কেন যে, নিজের চিন্তাচেতনা ও চিত্তবেদনায় যেন অন্যরাও স্পৃষ্ট হয়, সাড়া দেয়, সেসবের অংশীদার হয়? কেন বলেন না আপনি তাদের/অপরের (other অর্থে যদিও এই 'অপরতা' নেই আপনার কবিতায়) চিত্তবেদনা ও শূন্যতার অংশীদার হবেন; কবিবর, আপনি তো সেই সময়জাত ব্যক্তি যখন এদেশে— বিস্তৃত উপনিবেশ বিস্তারের পটেও একটি উন্মূল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সঙ্গত কারণেই সমর্থন পেয়েছিল এই বঙ্গদেশে এই কলকাতায়— শুধুই মননজীবী কাব্যচর্চাকারী হয়ে বেঁচেবর্তে থাকার

বাস্তবতাটা তৈরি হয়েছিল? ঘটনাটাকে ব্যক্তির দিক থেকে উৎসারিত না ভেবে শাসক-স্বার্থ ও সমাজভিত্তির উৎসারণ বলে ভাবলে বোধকরি সত্যের কাছাকাছি থাকা যেত। জীবনকে যা অর্থ দেয়, মূল্যবহ করে সেইসব গভীরতর জানাবোঝা, দেখাশোনা কি শুধু সুস্থ, স্বস্থ নিষ্কুলষ পরিপার্শ্ব (যা আসলে কখনোই নেই, বাস্তবে থাকেওনা) থেকে আসে? না কি, আসতে পারে জগতের ন্যায়-অন্যায়, নির্মমতা-নৈরাশ্য ও মনুষ্যত্ব-বিরোধী ভয়াবহ দৃশ্যকাণ্ড থেকেও? দান্তের ইনফার্নোর আগুন ও নরকভোগ কি পারাদিজোর চেয়ে বেশি সত্য নয়? এ তর্ক তুলেছিলেন জীবনানন্দ। বড় মহৎ সাহিত্যমাত্রে শান্তি বচন; serenity-র বার্তাবহ— রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের বিপক্ষে তিনি ১৯৩০-এ এক চিঠিতে বলেছিলেন, যে বড় জাতের লেখায় অনেক জায়গাতেই প্রশান্তি বা serenity নেই। দান্তে-শেলী-বিটোভেনের রচনায় ছড়িয়ে আছে অশান্তির আগুন (দ্রষ্টব্য *জীবনানন্দের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, ১৯৮৬), রামায়ণ মহাভারতও যুদ্ধ-ধ্বংস-হারানোর মধ্য দিয়েই শান্তিপর্ব রচনা করতে পেরেছিল— যা আসলে শান্তি নয়— মৃত্যু, জীবনপলাতক, ছল করে মহাপ্রস্থান বা অলীক স্বর্ণসীতার কল্পনা তো আত্মপ্রতারণা মাত্র। হে কবি, আপনার মহাভারতীয় মিথনাট্যগুলোতেও তো হিংসা-যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড-ধ্বংসের ইতিহাস পেরিয়ে নির্বেদের সাধনায় উত্তরণের পরিকল্প রচিত হয়েছে। কাজেই পরিপার্শ্বের মানুষ যখন দগ্ধ, হতাশ-বিপন্ন তখন কেন নিজের নিরাপদ ভুবনে কল্পনামুগ্ধতা নিয়ে থাকতে চান! এক 'শিল্পিত বাস্তবের' জন্য হাহাকার করেন! মনুষ্যচিত্ত সর্বদাই শিল্পিত বাস্তবের জন্ম দিতে চায়— নানা পন্থায়, বিচিত্র পথে। আপনিও তো এই কাজেরই শ্রমী, কিন্তু লক্ষ করি তা হয়ে ওঠে aesthetic elaboration of the self, মধ্যবয়সে বোদলেয়ারকে (১৯৬১) নিয়ে সেই নান্দনিক আত্মপ্রসার ও সম্প্রসারণের অনন্য ব্যাখ্যা তো আজও বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল অনুপম সম্পদ।

এরপর, প্রশ্ন তোলেন শিল্পকলা, গান-কবিতার উপযোগিতা নিয়ে। এই সেই বহু-বিতর্কিত, অমীমাংসিত প্রসঙ্গ। মানবরচিত শিল্পকলার চিরস্থায়ী সকল সম্পৎ-রিলকে-মান-প্রুস্ত-রঁদা-বত্তিচেল্লি, খাজুরাহো-অজন্তা-ইলোরা, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদির সারিবদ্ধ উল্লেখ করেন; আপনার মতে, এসব হচ্ছে সৌন্দর্যের আভা, আনন্দের শিহরন, চিত্তমুক্তির আস্বাদ, অন্তর্লোকের উদ্ভাসন, সর্বোপরি জ্যোতির্বিদ্ধ রহস্যময়তা— এইসব কী কাজে লাগে? জরুরিতম সংসারের প্রধানতম চাহিদা তো এরা মেটায় না। বলেন, আজকের বাংলাদেশে যেখানে অসংখ্যের জীবন নিয়ে সংগ্রাম চলছে সেখানে এসবই অক্ষম। তাই কি? রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা কি' ৭১-এর উদ্দীপক প্রেরণা ছিল না? কিংবা নজরুলের ভাঙার গানগুলো অথবা জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' (আসলে 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' বলাই ঠিক) কী সংগ্রামে সাহস ও দুঃস্থ স্বদেশের প্রতি গাঢ় প্রেম সঞ্চার করেনি, বিবেককে প্রতিরোধের ভাষা যোগায়নি! এঁদের গান-কবিতা কি আপনার ভাষায় 'আমাদের সন্নিকট দায়িত্বগুলোকে ঝাপসা করে দিয়েছিল'? বাস্তবতা ও বিবেকবোধ থেকে বিচ্যুত করেছিল? কল্পনার জাল বিস্তার করে ছেঁকে নিয়েছিল জীবনের সুকঠিন সংগ্রাম-সমুদ্র থেকে? হে কবিবর, আপনার চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় আপনি কেন ও কোন অভিযোগে নিন্দিত ও সমালোচিত হতেন? সেইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অসহযোগের রাজনীতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, শ্রমজীবীদের লড়াই, ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও পুনর্গঠনের খপ্পর ইত্যাকার চলমান/ঘটমান বাস্তবতায় কি কি কটূক্তি শুনতেন আপনি? না— 'কবিতা লিখে কি হয়— দেশের কাজ করো, গান বন্ধ হোক, এখন যুদ্ধ।' 'কবি সমাজশোধনের যন্ত্রী না

হন, তাহলে তাদের চাইনা আমরা;' এরকম কথাবার্তাই তো আপনার(?) বিরুদ্ধে বলা হত। প্রত্যুত্তরে আপনি কী বলেন? —'যেন কবিতা বিনষ্ট হলেই অধিক শস্য উৎপন্ন হয়।'

মাননীয় বুদ্ধদেব, অভিযোগটা কি ছিল কবিতা লেখা বন্ধ করা নিয়ে, না এরকম ছিল যে, কবিতার ধ্বনিচিত্রে আসুক শোষিত-প্রতারিতদের বঞ্চনার কথা, আসুক ধানখেত কলকারখানার শ্রমস্বেদবিন্দু ও তজ্জাত সৌন্দর্য? ধানখেত কবিতায় এলে উৎপাদনক্রিয়া-কর্মের সংস্কৃতি ও ভাষা আসে, পূর্ণিমার চাঁদ বদলে যায় শান দেয়া কাস্তেতে, আসে জনজীবনের ছন্দ, সমূহের ভাবাভাব, অপরতার সৃজনশীল ভূমিকার দাবি ইত্যাদি ইত্যাদি— যা লক্ষ্যযোগ্য নয় আপনার রচিত শিল্পজগতে। সমস্যাটা বোধকরি এখানে যে শিল্পচর্চা কীসের চর্চা করবে? ১৩৪৩-৪৪-এ 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—

> ক. আমার (কি আশা করি সমর সেনের) বলবার কথা কখনোই এ নয় যে, মানব সমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত বলে কবি তার নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবে না। সমস্তই নির্ভর করে কবির দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মুষ্টিমেয় প্রতাপশালী দ্বারা বৃহৎ সমাজের শোষণ এ পর্যন্ত পৃথিবীতে চিরকালই চলে এসেছে। মধ্যযুগে তার রূপ হয়ত আরও ভয়াবহ ছিল। কিন্তু প্রায় সকল যুগেই এমন কবি দেখা দিয়েছেন যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্য দেখেছেন, স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি।
>
> খ. ভালো আর্ট আর কিছু নিয়ে আসে না, নিজেকেই শুধু আনে, তার মধ্যে আর কিছু নেই যা বাইরের, যা প্রাসঙ্গিক কি সাময়িক। ভালো আর্ট বিশুদ্ধ কল্পনার সৃষ্টি, গভীরতম হৃদয়াবেগ তার টানাপোড়েন এবং আমাদের বিশুদ্ধতম হৃদয়াবেগই তা স্পর্শ করে, জাগ্রত করে। ('কবিতা', সম্পাদকীয়, ১৩৪২)

ভারহীন, সর্বদায়িত্বমুক্ত, স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনাউর্ধ্ব এই *সাহিত্যাদর্শ* আপনার 'কবিতা বিষয়ক' কবিতায় দৃপ্ত দর্প নিয়ে আত্মঘোষণা করে—

> আমার ভাবার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
> ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামীকল্যে
> আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে। (প্রৌঢ় প্রেম, *দময়ন্তী*)

'সুদূর আগামীকল্যে' বেঁচে থাকার প্রার্থনা তো পূরণ হয় কবিতায় জীবনার্থের মহত্তম প্রকাশের মধ্যে, কেবল ছন্দ-ভাষার স্বপ্নময়তায় নয়। 'কবিতা' পত্রিকা (১৩৪২) প্রকাশ করে আপনি সারাজীবন বহুতর্কই করেছেন শিল্পের সার্বভৌমত্বের পক্ষ-বিপক্ষ দাঁড় করিয়ে। এ চিঠিতেও লক্ষ করি দুটি দল— একদিকে কবিতার মিত্র, অপরদলে আছেন কবিতার শত্রুবর্গ— যাঁদের সংখ্যা এখানে বেশি। আশ্চর্য, আপনি রাষ্ট্রশাসক, নেতা বা শিল্পবিরোধী বা সেসব ক্ষমতাবর্গের বিরুদ্ধে কিছু বলেন না— যারা শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ করে, যারা কবিতাচর্চার পরিপার্শ্বকে তছনছ করে, প্রতিভাকে রুদ্ধ রাখে, দলিত করে মানুষের সুকুমার বৃত্তিচর্চার নিরুদ্বিগ্ন সহজ পরিবেশকে, তাদেরকে উদ্ব্যস্ত রাখে উদয়াস্ত খেটে-খাওয়ার চক্করে, মনোহীন জীবনযাপনে।

আপনি মনোজাগতিক জীবনযাপনের শর্ত হিসেবে যে নিরুদ্বিগ্ন বস্তুজগৎ ও আনন্দিত পরিবেশ দাবি করেন তা সত্যের আরেক পিঠে আলো ফেলে। বিশ শতকের

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গদেশের কলকাতায় উপনিবেশ প্রভুদের প্রতিপালিত, জ্ঞাননির্ভর প্রতিষ্ঠানাদিতে জীবিকা নির্বাহের অধিকারী সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের একটি ক্ষুদ্রশ্রেণী গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারায় স্বনির্ভর ও উন্নাসিক মননজীবী সম্প্রদায় গড়তে পেরেছিল। তারা অনেকেই বিশৃঙ্খল বৃহত্তর স্বদেশের সঙ্গে বিযুক্ত থেকে, বিপর্যস্ত বিশ্বপৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে, কোনোরকম সক্রিয়তা না দেখিয়ে দ্বীপজীবন যাপন করতে পারছিল, অন্তত ভালোভাবেই পারতে সক্ষম হচ্ছিল। কবিবর, আপনার/আপনাদের এরকম মননজীবী হয়ে মনোজাগতিক বসবাসের এই যে স্বর্গীয় জীবন তা কি ঐ উত্তাল সময়-সমাজই তৈরি করে দেয়নি? তার শ্রমেঘামে উৎপাদিত সম্পদের উদ্বৃত্তভোগী কি আপনারা নন? অত বেশি পঠনপাঠন, নান্দনিক চর্যা, মস্তিষ্কের ব্যায়াম, তাবৎ বৈশ্বিক চিন্তাচেতনার আত্তীকরণ— এসবই তো সম্ভব করেছিল এই দুঃস্থ সমাজ-শক্তি। সেই শ্রেণীর ক্ষমতাবান একজন ব্যক্তি হিসেবে তাই আপনি চিঠিতে লেখেন একজন অদৃশ্য কবিতাদেবীর কথা যাকে নিয়ে বর্তমানের কলকাতা নয়, প্রাচীন কাল থেকেই বহু পক্ষ/বিপক্ষ শত্রুতা করে আসছে। এ সূত্রে আপনি সঙ্গত কারণেই চলে যান শিল্পেতিহাসের টেক্সটে, কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে, জীবনেতিহাসের ধরন-ধারণকে এড়িয়ে চলে আপনার ইতিহাসের মাটি খোঁড়াখুঁড়ি। চলে বিরামহীন ডায়ালগ— উচ্চবর্গীয়, রুচিশীল, সৃষ্টিশীল শিল্পীদের পক্ষে ও বিপক্ষে। অর্থাৎ জীবনের দ্বান্দ্বিক ইতিহাস থেকে আলাদা করে ফেলেন কবিতার ইতিহাসকে। ১৯৫১-তে লেখা 'চাই— আনন্দের সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিতায় নৈরাশ্য-হতাশার বিপরীতে ইতিবাচক জীবনার্থ প্রকাশের দায় স্বীকার করে বলেন' বিশশতকের অন্তিম লগ্নে সাহিত্যের গতি হবে 'সরলতার, স্বীকৃতির ও সদর্থক অঙ্গীকারের দিকে', পরপরই আবার বলেন, অন্তত 'তা কোনো কাল্পনিক স্বর্গলাভের আশায় রাষ্ট্র কিংবা মন্দিরের যুগে আত্মবলির পরামর্শ দেবে না, মানুষের কানে হয়তো বা সবচেয়ে দুঃসাহসী কথাটি উচ্চারণ করবে, বাঁচো, ভালবাসো, হও।'

২

আপনার প্রথম বিপক্ষ প্লেটো, তাঁর গুরু সক্রেটিসকে কবিতার মিত্রপক্ষে স্থান দেন। প্লেটো (৪২৭/২৮–৩৪৭ খ্রি.পূ.) আড়াই হাজার বছর আগে কবিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, এ দলে আছেন পরবর্তী কালের সেন্ট অগাস্টিন, রুশো, টলস্টয়, অর্থাৎ বিপক্ষদলে আছেন দার্শনিক-ধর্মবিদ সাহিত্যিকরা। এটি তাৎপর্যবহ যে, কবিতা জীবনের ব্যাপ্ত এলাকা বিচরণকারী এমন এক সৃষ্টি তা দর্শনধর্ম, রাজনীতিরও আধেয় বিষয়। আর এই সূত্রই আপনার তর্কবিতর্কের মোক্ষম অস্ত্র। প্লেটো দর্শনের দিক থেকে কবিতাকে বিচার করেছেন, তৎকালীন সমাজাদর্শ মাফিক সুনীতি ও সরলতার প্রশ্নও তাতে জড়িত ছিল বলে হয়তো এমন ধারণা হচ্ছে, যে তিনি কবিদের আদর্শ রাষ্ট্রে স্থান দিতে চাননি। হে কবি, ধর্ম ও দর্শন তো রাজনীতির বাইরে নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে যুক্ত জ্ঞানকাণ্ড, দর্শনহীন রাষ্ট্রনীতিও তো একধরনের পাল্টা রাজনৈতিকতা, দর্শনহীন বিশুদ্ধ কবিতাও তাই, অন্তত আপনার ঘোষিত 'শিল্পের জন্য শিল্প'ও তাই, কারণ তা অবশেষে 'নিজের জন্য শিল্প'— এই সীমাবদ্ধতায় অবসিত হয়। আপনার সমালোচনাতত্ত্বে (বাংলা সাহিত্য সামালোচনার অন্যতম প্রধান স্থপতি আপনি) সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন সমালোচনারও একটি উদ্দেশ্যবাদ আছে। তা হল, পাঠকের বিমুখ উদাসীন ও অক্ষম মনকে জাগ্রত করা এবং বাঁচা ও ভালোবাসার কথা বলা, রুচিশীল

সংস্কৃতিমনস্ক কবিতাপ্রাণিত পাঠক সম্প্রদায়ের পরিসর বাড়ানো। আপনি এমনও বলেন—

> কবিতা ভালোবাসতে হলে শরীর ও মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সর্বাগ্রে দরকার। ... এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সমাজ কবিকে অপরিহার্য মনে করতে পারে। ('কবি ও তার সমাজ', 'কবিতা' পত্রিকা, ১৩৪৪-৪৫)

অর্থাৎ mass বা সমাজের সঙ্গে বিযুক্তি নয়,— কবিতার স্বার্থেই সংযোগ চান আপনিও। শুধু তাই নয়, আপনি কবিরও সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার দাবি তোলেন সাদামাটা ভাষায়। বাজার অর্থনীতির পণ্যনির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আপনার বচন এরকম–

> মুচি যেমন জুতো তৈরি করে বাজারে বেচে, আমারাও তেমনি কবিতা তৈরি করে বাজারে বেচতে চাই। প্রত্যেক মানুষই খাটবে এই যদি সমাজের মূলগত নীতি হয় তবে কবি নিজেই যে যথেষ্ট খাটছে সেটা অকুণ্ঠ স্বীকার করা হোক। সমাজকে সে যা দিচ্ছে তা অন্তত জুতো কি রাজনৈতিক বক্তৃতার মতই মূল্যবান, সুতরাং তার বিনিময়ে সমাজ তাকে পোষণ করতে বাধ্য। ('কবি ও তার সমাজ')

আমরা আবার প্লেটোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তাঁর রাষ্ট্রে কবিদের পোষণ তো দূরের কথা, জায়গাই দিতে চাননি বলে আমরা যে প্রচার চালাই তা কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে? প্লেটো কি আদৌ কবিতা-বিরোধী, না কবিদের ভাবোন্মত্ততা, স্বপ্নময়তার বিরোধী? তাঁর মতে, শিল্প হচ্ছে 'জাগর চৈতন্যের স্বপ্ন'— এ তো আপনারও ভাবাদর্শ। তৎকালীন গ্রীসের রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর চিন্তা-মতাদর্শের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ঘটেছে; তিনি সে ব্যবস্থাদির সমর্থক, সংরক্ষক ও নির্ধারকও। তাঁর abstract idea/absolute beauty তত্ত্ব, অনুকরণের অনুকরণ মতবাদ ইত্যাদি তো শিল্পসাহিত্যের ভাববাদী ধারণারই পোষকতা করছে, শক্তি যোগাচ্ছে আজ পর্যন্ত। তিনি কবিতার সেই মূল তর্ক তুলেছিলেন যে, কবিতা কি হবে শুধুই আনন্দ ও ব্যক্তিমনের ভাবাবেগের প্রকাশ! কবিরা বিপুল বহির্জগতের দ্রষ্টা হন না কারণ তারা নকল করেন মাত্র ঈশ্বরের জগতকে। আদর্শ রাষ্ট্রে কবিকে জায়গা না দেওয়ার অর্থ কি এটাই নয় যে, কবিরা এর বাইরে থাকুন? এইসব রাষ্ট্রীয় কাঠামো, স্তরবৈষম্য, ক্ষমতা-মতাদর্শের টানাপোড়েন, দার্শনিক তর্কাতর্কি ও ধ্যানচিন্তাপ্রসূত জীবনযাত্রা থেকে দূরে থাকুন? অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘটানোই প্লেটোর লক্ষ্য ছিল। আপনি তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়েও জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, এই তত্ত্ব 'সত্য ও প্রজ্ঞার বহিরবয়ব' মাত্র। এসঙ্গে রুশোর (১৭১২–১৭৭৮) আনন্দবাদের প্রসঙ্গ নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন, তার বক্তব্যের সারবস্তুকে এ বাক্য লিখে— 'আনন্দ আসে প্রকৃতির সঙ্গে সহমর্মিতার সূত্রে বা তাতে নিমজ্জিত হয়ে।' এ থেকে ওঠে দ্বিতীয় প্রশ্ন— কবিতা কি আবহমান প্রকৃতির অনুকরণ না নির্দিষ্ট শ্রেণীবর্গের— যাকে গ্রামসি বলেন হেজিমনি— উচ্চস্তরিক চেতনাবোধের দক্ষতায় শানিয়ে তোলা সংস্কৃতির উৎসারণ? প্রকৃতিবস্তু থেকে উত্থিত নিত্যনতুন সৌন্দর্যচেতনা, না সৃষ্ট শিল্পকাজের ক্রমাগত উৎকর্ষ ঘটানোর ধারাবাহিকতায় পুনরুৎপাদনের অন্তহীন খেলায় ব্যস্ত থাকাটাই কাম্য? কোন পথটি হবে কবিতার নির্দেশনা? একটি তো উপাদান— কাঁচামাল, আরেকটি উৎপাদন, এবং আপনি সঙ্গতকারণেই উৎপাদককে দেখেন না, দেখেন উৎপাদিত বস্তুটিকে। প্লেটো-রুশো দুজনেই এই রচিত শিল্পবস্তু-অনুকৃত সৌন্দর্য থেকে দূরে ছিলেন, সেসবের প্রতি ছিলেন সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট ও

বৈরীভাবাপন্ন। প্লেটো যে সরল সংগীত ও প্রশংসাবাচক কবিতাকে গ্রহণ করে বাকি সব রচনাকে বাদ দিলেন— হোমার, হেসিয়দকে, রেটরিক বাগ্‌বিদ্যাকে, সে ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখা হবে? প্লেটো-রুশো দুজনেই এই অলংকৃত বাগ্‌বিদ্যাকে বলেছেন দুষ্ট সরস্বতী, তার পেছনে ধাওয়া করা সত্যান্বেষীর যোগ্যকাজ নয়। প্রশ্ন ওঠে, লিখিত অলংকৃত ভাষা (কথা লিখিত হলেই অলংকৃত রূপ পাবে) বনাম মৌখিক বাক্যের পার্থক্য, একের ওপর অন্যের আধিপত্য আছে কী? প্লেটো শ্রুতিনির্ভরতায় বিশ্বাসী নন, লিখিত বাক্যে বিশ্বাসী— একথা বিশ শতকের আধুনিকতাবাদীরাও তো বলছে, আপনার অত প্রবল কাব্যধ্বনিও তো পাঠকরা একান্তমনে লিখিতরূপে পাঠ করেই আনন্দিত হয়। এই লিখন-প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্প আরও বেশি জোর পাচ্ছে আজকের উত্তরাধুনিক মতাদর্শে (এরাও সমাজের এক ক্ষুদ্র মনোজীবী সম্প্রদায়, আধুনিকতার সম্প্রসারণ), তাদের কথা যা-কিছু লিখিত, পুনরুৎপাদিত তাই সৃষ্টিশীল রচনা, text-ই আরেক text-এর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে– বিরামহীনভাবে। এ তর্ক বারান্তরে।

কবিবর, আপনি বিরোধটা দেখেন এইখানে, যে প্লেটো সত্য ও প্রজ্ঞাকে সুন্দর বলেছেন – ভাবালুতা বা আবেগকে নয়। আর রুশো আনন্দ খোঁজেন 'নির্বোধ প্রকৃতিতে', চলমান space-এ— যেথায় রেনেসাঁসের প্রাণপাখি ডানা ঝাপটায় অংকুর মেলে দিয়ে আকাশে ওড়ার জন্য। এ দুজনের ভাবনায় তো তবু জড়িত আছে প্রজ্ঞা ও প্রকৃতি; space এখানে বড় জায়গা পাচ্ছে, এতে wisdom ও earth-কে মেলানোর টানাপড়েন আছে, আছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরিতাস্পর্শ (আমরা নারীকে earth বলছি কারণ সে সৃস্টিশীল আধার— এই পৃথিবীর মতোই)। বিপরীতে, আপনি তো কেবল সৌন্দর্য/আনন্দ দেখেন রচিত শিল্পকার্যে, অলংকৃত বাক্যধ্বনিতে, প্রান্তরের দিকে না তাকানোর জন্যে জানালায় পর্দা টেনে দেন। আনন্দ বা সৌন্দর্য কি শিল্পেই আছে যা শুধু শিল্পবোদ্ধাদের কাছেই ধরা দেয়? জ্ঞানে নেই, বিপুল কর্মযজ্ঞে নেই? জ্ঞান ও কর্মকে বিচ্ছিন্ন ভাবার সংকট থেকেই তো উদ্‌গত হয়েছে সেই বিভাজন ও বৈষম্য, কবিতা ভোগের ক্ষেত্রে সেই গণ্ডির দাগ টেনে দেওয়া! আমরা এখানে প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের (৩৮৪–৩২২ খ্রি. পূ.) মতাদর্শ ব্যাখ্যা করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে পারি যিনি দাসপ্রধান গ্রীক সমাজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জ্ঞানকে বস্তুজগতের বাস্তবভিত্তিতে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বস্তু থেকে গুণকে— সত্তাকে বিচ্ছিন্ন না করে বিশেষকে (particular) প্রাধান্য দেওয়ার ফলে নির্বিশেষ আর বিমূর্ত ও অধরা থাকেনি। শিল্পসাহিত্য বিবেচনায় তাঁর 'সন্দর্ভ ও স্বল্পবাক' *পোয়েটিকস* পুস্তিকাটির বিষয়ই হল তাই নির্বিশেষ, নীতিতত্ত্ব নয়, কাব্যের রূপশিল্প, এমনকি তাঁর ক্যাথারসিস তত্ত্বে চিত্তশুদ্ধির যে ব্যাখ্যা তাতো বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির বা প্রত্যেকের চেতনায় শিল্পের শুভ প্রভাবকেই নির্দেশ করে। চিত্তশুদ্ধি আবেগের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে পবিত্রতাবোধের জন্ম দেয়, আর এই কাজ যদি কবিতা করে থাকে তবে তো তার কল্যাণকর ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। এবং কাব্যভোগের পরিধিকে প্রান্তিক জীবন পর্যন্ত টেনে নেওয়ার নানামাত্রিক তাৎপর্যও তৈরি হয়। শিল্পচর্চার অধিকারহীন সেইসব ক্ষুধার্ত মনোহীন মানুষ— যারা এই সভ্যতায়— সংস্কৃতি-জ্ঞানের পিদিমের নিচের অন্ধকার তাদের সৌন্দর্যভোগ ও আনন্দবোধকে, তাদের ক্যাথারসিসকে, চিত্তশুদ্ধিকে কেন কবিতা পরিচর্যা করবে না? হে কবি, তাদের জন্য কি ব্যবস্থাপত্র দেবেন আপনি? কারণ আপনিও তো mass বা জনসমাজের সঙ্গে বিযুক্তি চান না, কবিতার অস্তিত্বের স্বার্থেই সংযুক্তি চান, এমনকি মুচির কাজের সমধর্মী হওয়ার দাবিও তোলেন। আপনি

৭

আরিস্টটলের শুভবোধকে সীমিত করে বলেন যে, তাঁর ঐ চিত্তশুদ্ধির তত্ত্বটি শুধু ট্র্যাজেডি কাব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— সর্বক্ষেত্রে নয়। *ওভিদ* বা *মেঘদূত* পাঠে ত্রাস ও করুণার মোক্ষণে চিত্তশুদ্ধি ঘটে কি! না ঘটলেও আমরা পাই সৌন্দর্যানুভূতি, তাতেও আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ কাব্যসৌন্দর্যও চিত্তশুদ্ধ করে, পবিত্রতাবোধের সঞ্চার ঘটায়। এ অর্থে আপনি কিছুটা স্বীকৃতি দেন আরিস্টটলকে। কিন্তু রাগ করেন সেন্ট অগাস্টিনের ওপর, আপনার বাগ্‌জালে তিনি অভিযুক্ত হন নানা ক্ষেত্রে। অগাস্টিন (৩৫৪–৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) তো একজন রহস্যবাদী আধ্যাত্মিক-দার্শনিক যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন প্রবলভাবে ভোগবাদী ও প্যাগান বা প্রকৃতিবাদী। তিনি সন্ত হওয়ার পর কবিতার ভাষাকে বলেন, 'ভ্রান্তমদিরার মূল্যবান পাত্রস্বরূপ'— একথাই আপনার মতে— 'ভ্রষ্টবীজ'— যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মান্ধতা ও কর্তৃত্বতন্ত্র, সব সেন্সরশিপ, শিল্পনিরোধক আইনকানুন, পীড়নযন্ত্র। আপনার বলবার কথা কি এটাই যে, দার্শনিক ধর্মবিদরা কবিতার বিরুদ্ধে কথা বলেন বলে রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ও অন্ধতা জাঁকিয়ে বসে কবিতাকে বাধা দেয়, কবিকে রুদ্ধ করে? যুক্তি অকাট্য— গ্রামসির হেজিমনিক দৃষ্টিকোণে, কিন্তু যুক্তির মধ্যে পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ নেই, ইতিহাসচেতনা নেই।

অগাস্টিন তাঁর 'ঈশ্বরের জগতে' (*City of God*–তের বছর ধরে রচিত) বিশ্বাসকে জ্ঞানের উৎস বলেছেন, এবং পুণ্য ও পাপ, সৎ ও অসৎ দ্বন্দ্বময় রাজ্য কল্পনা করেছেন। তাঁকে কবিতার বিপক্ষে দাঁড় করানো কতখানি যুক্তিসঙ্গত? জগৎ সম্পর্কে তাঁর যে নিয়তিবাদী ধারণা তা তো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশ্বাসেরই ব্যাপারস্যাপার। তিনি তো ঈশ্বরতত্ত্ব তৈরি করতে গিয়ে পরোক্ষে অ্যাসথেটিকস নিয়ে ভেবেছেন; তীব্র জ্ঞানস্পৃহা ও সব বিষয়ে কৌতূহলের বশে সৌন্দর্য সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে মতাদর্শ প্রচার করেছেন। কাজেই তাঁর কবিতাবিরোধী অবস্থান স্বাধীন নয়— ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এসূত্রে নিরপেক্ষ যেমন নন, তেমনি তাঁকে বিরোধীপক্ষ বলাও কোনো কাজের কথা নয়। অগাস্টিন কথা বলেছেন অভিনেতাদের বিপক্ষেও, কারণ তারা অন্যের সত্তায় প্রবিষ্ট হয়। 'তারা কাঁদে (দর্শকও কাঁদে) প্রণয়মুগ্ধা দিদোর মৃত্যুতে, কিন্তু কাঁদে না সে নিজে মৃত বলে।' এই যে সমানুভূতি— যা আমাদের বৈষ্ণব প্রেমদর্শনের 'রাধাভাবে ভাবিত' তত্ত্বেরই ব্যাপার তা অস্বীকার করে অগাস্টিন ব্যক্তিকেই তার পাপচেতনা-মুক্তির দায়িত্ব নিতে বলেন— শিল্পসাহিত্যের ক্যাথারসিস-এ অবিশ্বাসী হয়ে। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতেই পারে, কারণ তাঁর তত্ত্ব আমাদের বড়জোর রহস্যবাদের কাছে নিয়ে যায়, ব্যক্তির জন্য সমষ্টির সেইসব আদিপুরাণ কাঠামোকে ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু, আপনার চিঠির কোথাও ব্রেশটের কথা নেই যিনি শিল্পতত্ত্বে সমানুভূতির পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির (alienation effect) মতবাদটি খাড়া করেছেন, শিল্পভাঙার শিল্প তৈরি করেছেন, মুচির কাজের মতোই শিল্পকাজকে জরুরি শ্রম হিসেবে দেখেছেন, হাতিয়ার করে তুলেছেন সমাজ নির্মাণের, চেতনা প্রসারণের।

৩

এভাবে রুশো ও টলস্টয়ও (১৮২৮-১৯১০) ঈশ্বরভাবনা-যুক্ততার জন্য নয়, ভিন্ন কারণে আপনার শিল্প ও কবিতার শত্রু হয়ে ওঠেন। যদিও দুজনেই প্লেটোর বিমূর্ত ঈশ্বর বা অগাস্টিনের 'সর্বজনের পুণ্যের জন্য ঈশ্বরের' পরিবর্তে ব্যক্তিহৃদয়লব্ধ, একজন অনুভূত ঈশ্বরের কথা বলেন— অভিজ্ঞতায় ও জীবনবেদনার সারণি বেয়ে যিনি আবির্ভূত হন। ব্যক্তিগত ঈশ্বর ধারণাটি রেনেসাঁসের ফসল যা দেখি আমাদের

রবীন্দ্রনাথেও। রুশো তো রেনেসাঁসের দূত, মুক্তবুদ্ধির পথিকৃৎ, ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রেরণাদাতা। আপনার মতে, এঁরা মানুষের কল্যাণকামী হলেও তাঁদের শুভবোধ ও মহান আদর্শের মধ্যে শিল্পকলাকে স্থান দিতে পারেন নি। অর্থাৎ শুভ ও সৌন্দর্য, সদাচার ও আনন্দের মধ্যে বিরোধ আছে। আমরা এসে গেলাম আদিতর্কে— শুভ ও সৌন্দর্যের পৃথক অবস্থানের মধ্যে। আসলে কি এভাবে দুটোকে পৃথক করা যায়? দুটোই তো উৎপাদন কাঠামো, শ্রম ও চেতনার উৎসারণ ও তা আপেক্ষিক। বস্তুজগৎকে আয়ত্ত করা, তাকে জীবনের জন্য রূপান্তরিত করে কল্যাণকামী সমাজজীবন গড়ে তোলার জন্য, এই পার্থিব জীবনানন্দের জন্য, রেনেসাঁসের যে অত্যুগ্র তৃষ্ণা-উদ্যম-সফলতা তা তো শিল্পকেই সবচেয়ে বেশি বদলে ফেলে বিকশিত করেছে, অথচ রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রুশোর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ তীব্র, আর টলস্টয়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক।

রুশোর জীবন কাহিনীর ভয়ংকর(!) ঘটনা-তথ্য তুলে ধরে আপনি তাঁর নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন অর্থাৎ লেখকের জীবনযাপন আর সাহিত্যদর্শকে এক পাল্লায় মাপছেন। মনে রাখতে হবে আপনি জীবন কাটিয়েছেন জন্ম ও শিক্ষাসূত্রে পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায়, সবুজ আঞ্চলিক এলাকায়, শহরের পল্টন-আবেষ্টনীতে— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকিত পরিবেশে; জীবিকা ও সাহিত্যচর্চা সূত্রে কলকাতার বিদগ্ধ মহলে, গোটা সমাজবিচ্ছিন্ন মেট্রোপলিস সোসাইটিতে, আর রুশোও কাটিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সের প্যারিসে কঠিন জীবন, বিচিত্র জীবিকা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনই তাঁর সঞ্চয়। তাঁর টেক্সট *কনফেশন* পাঠে আমরা সে জীবনের পরিচয় পাই। রুশোর জীবনতৃষ্ণা ও দিগ্‌দর্শন আর আপনার রূপরসধ্বনি-তৃষ্ণা এক নয়। তিনি সেইসব প্রাকৃতিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চান যেসব অবস্থা মানুষের মধ্যে সহমর্মিতার ও সহানুভূতির প্রবলতা তৈরি করেছিল— দূর অতীতকালে— যা এখন সভ্যতার অগ্রগতির নামে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি তো শোষক সামন্তব্যবস্থার তীব্র সমালোচক। শ্রেণীবৈষম্যের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে নতুন যে বিপ্লবীচেতনা তখন দেশের ধনিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হচ্ছিল— সেই বুর্জোয়া বিপ্লবের অগ্রবর্তী চিন্তাধারাকে রুশো সমর্থন করে ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছিলেন। আপনি তাঁর এই ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন না, শুধু দেখেন তাঁর অমানবিক জীবনঘটনা— বিরোধিতার দৃষ্টিকোণে। রুশো তাঁর অবৈধ সন্তানদের এতিমখানায় রেখেছিলেন। তারা যে তথাকথিত ভদ্রলোক না হয়ে কৃষক বা শ্রমজীবীর কঠোর জীবন বেছে নেয়— এসব আপনার মতে চরম নিষ্ঠুরতা। এই জীবনতথ্যে শিল্পচর্চার বিরোধিতা খুঁজে পান, দেখেন না রুশোর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা, সমাজবদলের সদিচ্ছা আর ঈশ্বরভাবনা সত্ত্বেও বস্তুবাদিতা ও সৌন্দর্যবোধের সারল্য; স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তিমানুষের জন্য আকাঙ্ক্ষা। জীবনাভিজ্ঞতাতোই তো শিল্পের পথ তৈরি করে, শিল্প তো শিল্পের পথ গড়ে দেয় না। শিল্প থেকে শিল্প শুধু পুনরুৎপাদিত হতে পারে।

টলস্টয়কে নিয়ে আপনার নালিশের তালিকা দীর্ঘ। তাঁর সাহিত্যজীবনের যে অংশটা প্রবন্ধগত চিন্তাচর্চার— যেমন *On Art* (১৮৯৫–৯৭), *What is Art* (১৮৯৮) গ্রন্থসহ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ, সে অংশটা নিয়ে আপনার যত বেদনা ও দহন। আপনার অভিযোগ— টলস্টয়ের শিল্পকাজ ও শিল্পবিষয়ক রচনা আলাদা মেরুর। শিল্পে তিনি 'প্রকৃত' আর প্রবন্ধে 'অপ্রকৃতস্থ'। কী কারণে? টলস্টয় নিজের রচিত প্রথম

পর্যায়ের শিল্পকাজকে 'কুশিল্প' বলেছেন সেই গল্পটি ছাড়া— 'ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা, কিন্তু আপেক্ষমাণ',— 'ককেশাসের বন্দী' দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প। টলস্টয়ের বক্তব্যকে আপনি বলেন ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জন— 'সব শিল্পকলা লুপ্ত হয়ে যাক তাও ভালো, তবু কোনো চরিত্রনাশক শিল্প যেন না থাকে।'— এমন শব্দাবলি তিনি কেন ব্যবহার করেন? তাঁর গভীর জীবনানুগত্যের কারণে তাঁর শিল্পাদর্শ এরকম ভিন্নমার্গীয় জীবনাদর্শের বাণীবহ হতে চেয়েছে। তাঁর শিল্পাদর্শ জীবনাদর্শের প্রতিভূ, এটা ঘটেছে তিন কারণে : এক. সৌন্দর্যবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে, দুই. নিজের ব্যক্তিগত জীবনসন্ধিৎসায় মোহ ও মুক্তির দ্বন্দ্বের জন্য, তিন. ভাবালু রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে। প্রথম জীবনে আঁকতে চেয়েছিলেন নগ্ন সত্য, মোহমুক্ত দৃষ্টিতে, যার ফলে তাঁর সংসার ভেঙেছে, স্ত্রীর সঙ্গে সুদীর্ঘ আত্মবিচ্ছেদ ঘটেছে। জীবন অপরাহ্ণে এই সত্যের সন্ধানেই গৃহত্যাগ করেছেন যার শোচনীয় পরিণাম অখ্যাত রেলস্টেশনে মৃত্যুবরণ। সত্যনিষ্ঠা জীবনদৃষ্টিকে প্রজ্ঞাবান করে, কিন্তু সাহিত্যদৃষ্টিকে কী দেয়? ঐ সত্য অবশ্য স্বোদ্‌ভাবিত বা স্বকপোলকল্পিত, তাঁর দ্বিভাজিত জীবনে তিনি নিজের সত্যকেই দ্বিধাদীর্ণ করে ফেলেছিলেন, যন্ত্রণাদগ্ধতা বরণ করেছিলেন, শেষপর্যন্ত রেহাই পেতে স্বকীয় পথও খুঁজে পেয়েছিলেন আদি খ্রিস্টীয় জীবনাদর্শে, অহিংসা-করুণা-মৈত্রী-প্রেম ও মানবকল্যাণের বাণীতে। 'টলস্টয় ইয়োরোপের প্রতীক'— তিনি যেন গ্রীক দেবতা টাইটান, অ্যাটলাস, আন্তেউস— একইসঙ্গে এবং ইয়োরোপের নাড়ি ধরে টান দিতে পেরেছিলেন— তাঁর সম্পর্কে টমাস মানের এই বিবেচনা যথার্থ। কবিতার শত্রুতা করার উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে মুখ্য নয়, তিনি অভিজ্ঞতা ও সাধনার মধ্য দিয়ে সত্যজীবন সন্ধানেই তৎপর ছিলেন, তাই তিনি নিছক শিল্পী নন– জীবনশিল্পী। হে বুদ্ধদেব বসু, তিনি তো আপনার মতোই জীবনসাধনা ও শিল্পসাধনাকে পৃথক করেননি। তবে কেন এই তীব্র বিরোধিতা? আমাদের প্রশ্ন জাগে লেনিন যে টলস্টয়কে mirror of Revolution বলেন সেদিকে আপনার দৃষ্টি পড়ে না কেন! তিনি তো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এমন কিছু বলেছেন যা আজও দিকনির্দেশক। বিশেষ করে যখন তিনি বলেন, যে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত শ্রম অপচয়িত হয় কিন্তু যাদের শ্রমে তা হয় তারা সেটি বোঝে না, উপভোগও করতে পারে না। যেমন, অপেরা অনুষ্ঠানটি সম্ভব হয় যাদের অর্থে-শ্রমে-ঘামে তারা তো অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারেই থেকে যায়। শিল্প অবসরভোগী শ্রেণীর বিলাসব্যসনময় জীবনযাপনের জন্যই তো নিয়োজিত বা রচিত। সৌন্দর্য সম্পর্কেও তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন কল্যাণধর্মের সঙ্গে জড়িত। শীতার্তকে গায়ের কোট দান করার কাজটি উত্তম ও মঙ্গলজনক, অতএব তা সুন্দর কারণ কোট দেখতে সুন্দর হলেও শীতার্তের কাছে সেটি মুখ্য নয়। তখনই সেটি সুন্দর যখন তা উপযোগিতা তৈরি করে অর্থাৎ কল্যাণ ও করুণার সঙ্গে যুক্ত হল। কাজেই অধরা, অবিশ্লেষণীয় অমীমাংসিত সৌন্দর্যের প্রহেলিকা টলস্টয়ের শিল্পদর্শন থেকে বাদ গেছে। তাঁর মতে art is a human activity, তাঁর এই মতাদর্শ আধুনিক বস্তুবাদী চিন্তাদর্শের বীজগর্ভ। তিনি যে শ্রমজীবী জনগণের অনাবিল জীবন ও ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতাকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎস বলেন তাও ঐ মতের কাছাকাছি। তবু শেষ কথা, এই বাস্তববাদী, সত্যবাদী, ধর্মবাদী জীবনশিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনাবলিতে ধরা পড়েছে তৎকালীন কৃষিপ্রধান রাশিয়ার জনজীবনে সূচিত বিপুল পরিবর্তন-চিত্র, রচিত হয়েছে নবজীবনের গভীর ব্যথায় সমাজদেহের সর্বাঙ্গে যে ব্যাপক পালাবদল ঘটছিল তার যথাযথ আখ্যান। হ্যাঁ, আমরা টলস্টয়ের নীতিবত্তার সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করি যখন তিনি হোমারের সঙ্গে তুলনা করে শেকসপিয়রকে শিল্পীই

বলতে চাননি। বিপরীতে এ কথা বলা আবশ্যক, শিল্পের বিভিন্ন উপায় ও উপকরণকে পৃথকভাবে না দেখে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন সামগ্রিক ও মানবিক জীবনদৃষ্টিতে নিজের মতো করে। অর্থাৎ মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ও তাদের সামাজিক অস্তিত্বের তথ্য তুলে ধরে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতির সঙ্গে শিল্পকে অন্বিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই চাওয়া বাস্তবের কোনো শিল্পরচনায় দেখতে পান নি বলেই ক্ষুব্ধ হয়ে টলস্টয় কিছু শিল্পবিরোধী কথাবার্তা বলেন, স্ববিরোধ পোষণ করেন। তাঁর শিল্পচিন্তায় ঈষৎ উৎকেন্দ্রিকতাও লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব আপনি যে বলেন, 'কবিতা জীবনের মুকুর মাত্র না হয়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি' হবে, বলেন, 'আমি যা লিখেছি আমার কাছে তা সত্য এবং অন্যের মনেও সেটা সত্য বলে প্রতিভাত হোক, এই ইচ্ছা, প্রেরণা না থাকলে লেখাই বা কেন?' (*কোলের পুতুল*, ১৯৩৫-৪৫)। এই ধারণা তো 'সঞ্চারবাদ' – যা টলস্টয়ও স্বীকার করেন। পার্থক্য এই, টলস্টয়ের মতে, এই সঞ্চারণের জন্য শিল্পকে সরল, স্পষ্ট বা প্রাঞ্জল হতে হবে, আর আপনি বলেন, 'কবিতায় কাছে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা এই যে তার একটা অংশ হবে অন্ধকার obscure যাকে আমরা কখনও বুঝে উঠতে পারব না বলেই যাতে আমাদের আনন্দ কখনো নিঃশেষ হবে না।' (*মেঘদূত*-এর ভূমিকা, ১৩৬৩)। টলস্টয়ের কাছে জীবনই শিল্প আর আপনার কাছে শিল্পই জীবন, তিনি শিল্পকাজকে দেখেন 'মানবিক ক্রিয়াকর্ম হিসেবে' আপনার কাছে তা একান্তই ব্যক্তির স্বরায়ণ। অনথ্যায়, তিনিও আপনার মতোই মহৎ ও সর্বজনীন শিল্পের জন্য কাতর ছিলেন।

৪

এ পর্যায়ে আপনার চিঠিতে কবিতার মিত্রশক্তি হয়ে এসে যান ফরাসি প্রতীকবাদী শিল্পীগোষ্ঠীরা— আধুনিকতার সেইসব দেবদূত, যাঁদের কাছে কবিতা নিরঞ্জন, স্বনির্ভর, স্বাধীন, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কবিত্বশক্তির নিকষোপম নিদর্শন। সুনীতির শিকল থেকে বোদলেয়ার-মালার্মে কবিতাকে মুক্ত করে দিলেন। বুদ্ধদেব, আপনি এঁদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, এঁদের জীবনের দ্বারা মধ্যপর্বে গভীরভাবে প্রাণিত। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনুবাদ করেন বোদলেয়ারকে যাঁর প্রভাবে বাংলা কবিতার ও কাব্যসমালোচনার গতিপথ অনেকটাই নির্ধারিত হয়েছিল এবং আপনার শিল্পচেতনাও কূল খুঁজে পেয়েছিল। আপনি একজন সুদক্ষ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক-গোয়েন্দার মতোই উদ্দেশ্যহীন শিল্পবাদী অস্কার ওয়াইল্ডের মধ্যে আবিষ্কার করেন কাব্যবিরোধিতার চিহ্ন। ওয়াইল্ড যেহেতু বলেন 'শিল্পকলা কোনো কাজে লাগে না।'— তাঁর এই ঘোষণা আপনার মতে, কবিতাবিরোধীদের জোটবদ্ধ হতে সাহায্যই করে, বিশুদ্ধ শিল্পতাত্ত্বিক ওয়াইল্ড নৈতিক ঔচিত্য থেকে নান্দনিক ঔচিত্যকে আলাদা করে দেন। 'শিল্প কোনোই কাজে লাগে না', এই কথায় আপনার অনুযোগ তীব্র হয়ে ওঠে— 'কোনোই কাজে লাগে না? ... তার মানে তোমরাই বলছো নিষ্প্রয়োজনীয়, আর শিল্পী এক পরাশ্রিত জীব?' —এটা কূটতর্ক, আপনি এর নিহিতার্থ বোঝেন বলেই তাঁকে শেষপর্যন্ত সমর্থন করেন না, যেমন করেন না আধুনিক প্রতীকবাদীদের বা রূপবাদীদের নিরঞ্জন শব্দসাধনা ও নিছক ফর্মের আত্যন্তিক পরিচর্যার পোশাক নিজের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিতে। তাঁদের কাব্যধারা থেকে সরে দাঁড়িয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্য খুঁজে নেন, চলমান জীবনের ফর্ম গ্রহণ না করলেও মিথের শাশ্বত অভিজ্ঞানের ছাঁচে প্রবেশ করেন। সবই কবিতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার লক্ষ্যতাড়িত, কারণ আপনি কবিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক জীব বলেই ভাবেন— নিষ্প্রয়োজনীয় না

ভেবে, সর্বোপরি বলেন 'কবিতা সামাজিক কমোডিটি'। এ-সূত্রে আপনাকে কেন বলা হবে art for art's sake-এর প্রবক্তা (দ্রষ্টব্য, *কিসের জন্য আর্ট?* ৫ম খণ্ড, রচনাবলী)? আজকের দিনে, প্রযুক্তি ও পণ্যের রমরমায় যেখানে প্রতিভার ব্যক্তিত্ব নাশের দর্শন তৈরি হয় death of the auther-এর প্যারাডাইমে সেখানে অণুসদৃশ নিরবলম্ব ব্যক্তির প্রতিভাকে, আত্মস্বাতন্ত্র্যকে রক্ষার ঘোষণা ও মানুষের সৃজনী ক্ষমতাকে মহৎ শ্রম হিসেবে দাঁড় করানোর এই বুদ্ধদেবীয় চেষ্টাকে বরং art's for my sake বলাই সঙ্গত এবং শিল্পের জন্য তা ভিন্নমাত্রিক তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়। আত্মপ্রকাশের ও সৃষ্টির দুঃসহ যন্ত্রণায় না লিখে উপায় নেই বলেই তো সম্ভব হয় অজস্র সৃষ্টিকাজ –

ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছাও নেই, এতে আছে আবশ্যিক
অঙ্গীকার, মৃত্তিকায় প্রতিশ্রুত কৃষক যেমন।
(*দময়ন্তী*, 'কবিজীবনী')

এই অঙ্গীকার নিজের কাছে, আর কৃষকের অঙ্গীকার সমাজের কাছে, কিন্তু কবির সৃষ্টিও তো উত্তরপুরুষের ভাণ্ডারে রেখে-যাওয়া আনন্দের বিপুল সঞ্চয়। অবসরভোগী কায়িক শ্রমহীন গোষ্ঠীর মানুষ হয়েও এভাবে নিজেকে কৃষিকর্মী হিসেবে তুলে ধরার সূত্রে মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃপ্তঘোষণা— লেখক মাত্রে 'কলমপেষা মজুর'। যদিও তা কলকারখানায় জড়ো-হওয়া মজুরদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সংস্কৃতির বার্তাবহ, আপনার ক্ষেত্রে যা সাদৃশ্যবাচক অলংকার মাত্র।

চিঠি এখানেও শেষ নয়, আপনি তাকান ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে। আনন্দবর্ধন-অভিনব গুপ্তকে প্রশংসা করেন কারণ তাঁরা কবিতা ও ভোক্তার যোগাযোগ-রহস্য (সহৃদয়হৃদয়সংবেদী) আবিষ্কারক, নীতি-দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেননি। আপনার মতে, কবিতা বিষয়ে এঁদের সারকথা বিশুদ্ধ সোহংবাদ হল ইয়োরোপীয় কলাকৈবল্যবাদের কাছাকাছি। এসূত্রে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার প্রতিতুলনা করেন (কেন বলেন হিন্দু সভ্যতা, নয় কেন ভারতীয় সভ্যতা?)। তবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে এও বলেন, ইয়োরোপে নন্দনবিদ্যা ও সমাজচিন্তার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি— ব্যতিক্রম উনিশ শতকের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া ('প্রতীকবাদী আন্দোলন'), কিন্তু ভারতে রসতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যা ছিল ভিন্ন কোটিতে। আপনার ঐতিহ্যপ্রীতি— যা আপনার রচনায় প্রগাঢ়ভাবে প্রবিষ্ট, দ্বিতীয় জীবনে রচিত *মহাভারতে*র কথায় আর সেইসব পৌরাণিক কাব্যনাটকে সেসবের পক্ষ নিয়ে বলেন যে, ভারতীয় জীবনে মানুষে মানুষে অধিকারভেদ স্বীকৃত (অর্থাৎ শ্রেণীবিভেদ আছে), অর্থকাম সম্মানিত, কামসূত্রের প্রণেতা ব্যাৎসায়নকে যেদেশে মহর্ষি বলা হয়েছে, মানুষের প্রীতি ও সৃষ্টিরচনার মূলে খোঁজা হয়েছে ঔপনিষদিক আনন্দ, সেখানে কট্টর নীতিবাদ দ্বারা শিল্পদর্শন পীড়িত হতে পারেনি। আপনার ওকালতিতে খণ্ডিত হয় ভারতীয় মায়াবাদ যেটি প্লেটোর গুহাবন্দির রূপকের মতো হলেও সদৃশ নয়, দুইয়ের পার্থক্য গুহাবন্দির দেখার দৃষ্টিতে। কিন্তু প্লেটোর গুহাবন্দিরা ছায়া দেখে মাত্র, সে ছায়া সত্যের নয়, সত্যের অনুকরণের তথা পুত্তলির। তবে তো পুত্তলিকে অনুকরণকারী কবিরা নকলনবিশ মাত্র— প্লেটোর এই তীব্র তিরস্কার আপনি আবারও বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেন। আর ভারতীয় মায়াবাদ? কোনো স্তরভেদ নেই; idea, পুত্তলি, ছায়া ইত্যাকার প্রভেদের বদলে এক ঝটকায় 'নিখিল প্রপঞ্চকেই অন্তর্হিত করে দেয়।' চমৎকার বাক্যে যুক্তি সাজান—

জগৎ এবং মানবচিত্তে জগতের প্রতিফলন দুটোই— যখন সমভাবে মিথ্যা বা মায়া আর সত্যব্রহ্ম যখন নির্গুণ, তখন কেই বা কার অনুকরণ করছে। আর কবিতাকে বিশেষভাবে মিথ্যা বলার সার্থকতা-ইবা কী?। (*কবিতার শত্রু ও মিত্র*)।

এদেশের সাহিত্যে নীতিবাক্য প্রবল নয় 'রস' চিন্তার কারণে। ভারতীয়দের নন্দনদর্শন অনুসারে কাব্যের উৎস বা ফলশ্রুতি আবেগ নয়, নিছক লৌকিক ভাব নয়, সেই ভাবের দ্রবণ থেকে উৎপন্ন একটি অনুভূতি বা আত্মার একটি বিশেষ অবস্থা। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ঐ তর্কটির ভূমি তখন প্রস্তুত ছিল না একারণে যে, এখানে শিল্পসংগীত, ধর্মীয় আচার— সবকিছুই এতে গ্রহণযোগ্য; দেবতার কামলীলাও তাই শিল্প অর্থাৎ সবই একতলিক। ফলে এ শিল্পে দ্বন্দ্বসংঘাত নেই, দ্বন্দ্বক্রিয়ার অভাবে নেই নাট্যময়তা ও ট্র্যাজিক বেদনাবোধও। সে শূন্যতা আপনি পূরণ করতে চেয়েছেন পৌরাণিক কাব্যনাট্য রচনা করে, তাতে দ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজিক বোধের সঞ্চার ঘটিয়ে। এ কারণে এগারো শতকের পরে এদেশে সাহিত্যতত্ত্ব আর এগোয় নি— আপনার এরকম সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে, কবিতা ও সমাজের সম্পর্কদ্বন্দ্বের আলোচনা-তর্ক ও প্যারাডাইম কবিতার প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখে, দ্বন্দ্বময়তার গুণে গতিশীল রাখে।

সম্পর্কদ্বন্দ্বের ভাবনায় এরপর অবধারিত হয়ে ওঠে উনিশ শতকের জটিল ইতিহাস— সেইসব মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কথা, ইতিহাসে যাঁরা সমাজ ও শিল্পের সম্পর্ক নিয়ে সংস্কারবাদী ও বিনির্মাণবাদী ভূমিকা পালন করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুরোধা ও মহীরূহ। এখন আপনার ভ্রমণ চলতে থাকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, মনে রাখেন কবি হিসেবে তাঁর ভূমিকা, আবার ধর্মোপদেষ্টাও বলেন তাঁকে, ভাবেন— 'গুরুভারাক্রান্ত' এদেশের একজন গুরুদেব হিসেবেও।

৫

টলস্টয়ের মতোই অনেকটা স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত ও জীবনে বেড়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে বিবর্তিত, রূপান্তরিত (যদিও উভয়ের জীবনাভিজ্ঞতা এক নয়) রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের কয়েকটি ধাপ আছে। এ নিয়ে আপনি চমৎকার ডায়ালগ উত্থাপন করেন। তাঁকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন, তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে রচনাকাজের পার্থক্য কি ও কোথায়-কোথায় তা ধরিয়েও দেন। রবীন্দ্রনাথ আপনার সমালোচনাতত্ত্বের সবচেয়ে বড় আদর্শ ও ক্ষেত্রস্থল। প্রথম রোমান্টিক কাব্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় সুনীতিও সৌন্দর্যের সমীকরণ ঘটান। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলে সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই উপকারী। কিন্তু এ জীবনেই রচিত 'পাগল' প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় তিনি সংসারী মানুষ ও শিল্পরসিকদের পৃথক করছেন এবং প্রণত হয়েছেন দিওনিসিয় উদ্দামতার কাছে যা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়-অতিক্রান্ত ও লৌকিক নীতিবোধের অতীত। দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত করলেন সংযম, তাঁর মতে সৌন্দর্য ভালো, কেননা তা 'সংযমের দিকে আকর্ষণ করে' আমাদের , তা সত্যকে জানার উপায়। এ পর্যায়ে 'সত্য' শব্দটি বারবার প্রয়োগ করেন, গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। এ সূত্রে হে কবি, আপনি একটি অজানা তথ্য দেন আমাদের,— 'সত্যম্‌শিবম্ সুন্দরম্'— এই শব্দাবলি উপনিষদের কোথাও নেই। এর উৎস ব্রাহ্মসমাজের রচনা— ইয়োরোপীয় বিদ্যা থেকে আগত— Le bon, le vrai, le beau : the good, the true, the beautiful -এর সংস্কৃত অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই বচন কখনো ব্যবহার করেননি, করেছেন ভক্ত

সমালোচকরা, তবে এই শব্দযোজনাই তাঁর কাব্যচিন্তার সারাৎসারবাহী। অর্থাৎ উপনিষদ নয়, ইয়োরোপের নন্দনবিদ্যা থেকেই রবীন্দ্রচেতনায় সুনীতি-সত্য-মঙ্গলকে কবিতার সৌন্দর্যের সঙ্গে মোকাবেলা/যুক্ত করার ঝামেলা তৈরি হয়েছে— এটাই আপনার অভিমত। সঙ্গতভাবেই বলেন যে, শিল্প সত্যচর্চা করলে তা নীতিজ্ঞানীকে বা টলস্টয়-পন্থাকে বা ঈশ্বরভক্তকে আনন্দিত করেনা, করে শিল্পরসিকেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সত্য স্থির নয়, জঙ্গম, বিবর্তিত— 'প্রসঙ্গভেদে বহুবিধ ব্যঞ্জনায়' ভরা। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করে একথাও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সত্যকে ঔচিত্য অর্থে ব্যবহার করেন। এই ঔচিত্য 'রসের সৃষ্টিকারক', সত্যকে জানতে হলে সৌন্দর্যকে উপায় হিসেবে নিতে হবে— রবীন্দ্রনাথের এই মত তথাকথিত truth নয়। তা হল ঔপনিষদিক অস্তিতা— যা কিছু আছে তা-ই। একটু আগে আপনি ইয়োরোপীয় নন্দনবিদ্যার ট্রুথের যে অস্তিত্ব দেখান— যা এসেছে ভারতে, তার বিপরীতে এখন বলছেন যে তা ঔপনিষদিক 'অস্তিমানতা'র সদৃশ ধারণা। আপনি খুশি হন ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ সুনীতি, সংযম ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বললেও কখনো তাঁর আনন্দবাদ ত্যাগ করেননি— মন যাতে আনন্দিত হয় তাঁর মতে তাই সুন্দর। জীবনের প্রান্তবয়সে রবীন্দ্রনাথ কেন বলেন যে এলিয়টের কবিতা বিশ্বের প্রতি কুৎসাজনিত চিত্তবিকার? —এবং তাঁর আজন্ম সাধনধন সৌন্দর্যের সার্বভৌমত্ব মানতে পারেন না বলে আপনি আরও ক্ষুব্ধ হন। আসলে তিরিশের কাব্যান্দোলনের আবহে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে একালের নৈর্ব্যক্তিক শিল্পতত্ত্ব, বস্তুবাদিতা ইত্যাদি নতুন নতুন আদর্শকে কখনো মেনেছেন, কখনো মানেননি। তিনি একদিকে ইন্দ্রিয়প্রেমিক অথচ শুচিতাবোধে সংকুচিত ব্যক্তিত্বনির্ভর কবি, অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধে দৃঢ় বলে আপনি তাঁকে দ্বিধাবিভক্ত শিল্পতাত্ত্বিক রূপেই দেখেন। শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ তাই আপনাকে খুব আশাহত করে। অথচ আপনি প্রবলভাবে এসময় রবীন্দ্রভক্তও বটে। তাই যুক্তি খোঁজেন, বলেন, কেন রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা আশা করব সুসম্পূর্ণ— 'সুসংহত একটি কাব্যদর্শন, বা কোনো নৈয়ায়িক পদ্ধতি? তিনি তো দার্শনিক নন, কবি— কবিতার বিশ্লেষক নন, আস্বাদনকারী, তাঁর বহুমুখী চিত্তের ভাবপরম্পরা প্রকাশ সবই তাঁর যথাযোগ্য কাজ,'। —আমরা আপনার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানি না, কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার জন্য নন্দনতত্ত্ব হাজির করেছেন, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করেছেন, যেন মজা করেই আপনি বলেন যে এসব স্ববিরোধতা ও কবিতা-বিরোধিতার কারণে কবিতাই লাভবান হয়েছে। কারণ প্লেটো-অগাস্টিনসহ্ সব বিরোধীদের হাতেই তো রচিত হয়েছে কাব্যসমালোচনার রেটরিক ও 'আবেগস্পন্দিত কবিতাপ্রবণ গদ্যভাষা' আর এ ভাষা আমাদের absolute ideaর কাছে বা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না, দুষ্ট সরস্বতীর কাছেই ফিরিয়ে আনে । প্রবল বিপক্ষ টলস্টয়ও এই উৎকৃষ্ট গদ্যভাষার প্রশ্নেই আপনার কাছে স্বীকৃতি পান, 'তিন সন্ন্যাসী' গল্পটিকে বাহবা দেন, এমনকি রুশোকেও অভিনন্দন জানান তাঁর পরস্পরবিরোধী ভাবনার সমাবেশ সত্ত্বেও রচনাশৈলীর সৌষ্ঠবসাধনে তৎপরতার জন্য; আর তাঁর মনোভাব থেকেই তো জন্ম নিয়েছে আন্তর্জাতিক কবিগোষ্ঠী যারা তাঁর অবৈধ পুত্রদের মতো চাষবাস করেননি, কলকারখানায় কাজ করেনি, কলম নিষ্পেষক হয়েছেন মাত্র। রুশো শিখিয়েছেন সভ্যতালগ্ন প্রকৃতির জন্য পিপাসিত হতে, ভাবুক হতে ও সুখদায়ক বিষাদবোধ পেতে অর্থাৎ রোমান্টিক শিল্পদর্শন গড়ে তুলতে। এটি প্যারাডক্স যে রুশোর সঙ্গে কবিদের সংযোগই বেশি অথচ তিনি নাকি শিল্পকলার বিরোধী।

হঠাৎ করে চিঠির শেষ প্রান্তে এসে আপনি সক্রেটিসের নাম স্মরণ করেন। এই সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকের জেলে বসে কবিতাচর্চার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের উদাহরণ থেকে আপনি তাঁকে নিজ দলে টেনে আনেন। সক্রেটিসও আজীবন গান রচনার প্রেরণাদীপ্তই ছিলেন; কিন্তু এই প্রেরণা জ্ঞানচর্চায় প্রযুক্ত হয়েছে, জ্ঞানের চেয়ে মহত্তর সংগীত আর কিছু নেই বলে তাঁর যে ধারণা ছিল তাতে আপনি পুরোটা নিশ্চিত হন না। খুঁজে-পেতে বের করেন সক্রেটিসের কবিতাপ্রীতি ও রচনার আকাঙ্ক্ষাকে। মোহিনী কবিতা ও প্রবন্ধ— এদুটো ভাগেই কি বিভক্ত ছিল না তাঁর *ফিডো* গ্রন্থের ডায়ালগ? তাঁর স্বীকারোক্তিতে একটি তথ্য খুঁজে নেন— একবার বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন যে, মাঝে মাঝে তিনিও পান দৈবনির্দেশ, কিন্তু সেগুলো শুধু নিষেধাজ্ঞা প্রেরণা–প্ররোচনা নয়, বরং প্ররোচনাটি ছিল সারাজীবন ধরে— 'গান রচনা করো'। তাঁর এই দৈবাদেশে আপনি খুঁজে পান সক্রেটিসের গোপন কবিতাপ্রেম, তিনি যেন একজন গোপন প্রেমিক। এবং তাঁকে দেখেন প্রেমের দেবতা— লাম্পট্যই যার খ্যাতি সেই প্যানের কাছে প্রার্থনারত হতে। কেন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন? বিপরীতকে জানার মধ্যেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাধক সক্রেটিস মোহিনী কবিতার, গীতবিদ্যার বন্দনাকারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। আপনি জোরের সঙ্গে বলেন 'সক্রেটিস যেন ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছেন সংগীতও আমাদের অন্তরাত্মাকে সুন্দর করে তুলতে পারে, আর গীতস্রষ্টা নীতিচ্যুত হলেও তাঁকে অর্ঘ্যদান আমাদের কর্তব্য': কাজেই তাঁর শিষ্য প্লেটো কবিকে মধুর পবিত্র সত্তা বলেও যে নগররাষ্ট্রের গেট থেকে বিদায় করে দেন তা গ্রীক সমাজ মানেনি, মানলে প্লেটোও নির্বাসিত হতেন তাঁর কাব্যধর্মী রচনার জন্য আর বিদায় হলে' তাঁর হাতে থাকত হোমার— যাঁকে তিনি 'মহত্তম কবি'রূপে স্বীকার করে নীতিকথার উদাহরণ হিসেবে তাঁর পঙ্‌ক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন।'

হে কবি, আপনার নিপুণ বাক্যজাল দিয়ে কবিতার এইসব শত্রুদের ছেঁকে তোলেন, টেনে আনেন নিজের দলে— কবিতার মিত্র হিসেবে। কারণ তাঁরা প্রকারান্তরে শিল্পকলা সম্পর্কে এত বাদানুবাদ করে তার গৌরব ঘোষণাই করে গেছেন–তির্যকভাবে, ব্যাজস্তুতির মতো। তাঁদের বৈরিতা 'সৌহার্দ্যেরই ছদ্মবেশ'— বলেন আপনি, এর ফলে ভিত্তিহীন হয়ে যায় কবিতার বিরুদ্ধে ফরিয়াদিদের মামলা।

৬

পরক্ষণেই আপনার উল্লাসধ্বনি প্রশ্নকণ্টকিত হয়— এঁরা সকলেই তো শিল্পকলাকে স্বভাবদুষ্ট সামগ্রীই বলেছেন, কবিদের দণ্ডিতই করেছেন। তবে? অর্থাৎ এবার এল কঠিন সমস্যা, কবিতা কি নীতিগ্রস্ত করে মানুষকে? যদিও কান্ট বলেন সৌন্দর্য দেয় বাসনাহীন আনন্দ, তা সর্বদা সমানভাবে দেয় না বলেই তো মনে হয়। আপনি ট্রয় কাহিনীতে দিদো-ঈনিয়সের নীতিভ্রষ্ট প্রেম, বা দান্তের কাব্যে পাওলো-ফ্রানচেস্কার অবৈধ প্রণয়ের উদ্রেককারী হিসেবে শিল্পসাহিত্যের ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিংবা বলেন 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরানীর বঞ্চিত জীবনের কথা যে সব বঞ্চনা ভুলে যায় উচ্চস্তরিক গান শুনে। অর্থাৎ কাব্যকাহিনী ও ইতিহাস থেকে এসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেন না, পরিবর্তে বলেন, এসব কুতর্ক ছেড়ে একটু খোলা-স্নিগ্ধ হাওয়ায় গিয়ে বসে থাকতে। চিরকালের অভিযোগ, আক্রমণ ও দণ্ড মাথায় নিয়েই আপনি জিতিয়ে দিতে চান কবিতার মিত্রদলকে।

হে কবি, এখানে এসে আবার আপনি স্মরণ করছেন রক্তাক্ত ও অপঘাত-ধ্বস্ত কলকাতার প্রতিবেশকে, মানুষের মুখে লেপ্টে থাকা সন্ত্রাস, আক্রোশ ও হতাশাকে। এবং ভাবেন এসবের মধ্যে কোথায় কেমন করে স্থান পাবে কোনো সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয়ের মর্মরধ্বনি? আজকের বাজার অর্থনীতির চাপে পিষ্ট মানুষের জীবনে কোনো লড়াই আছে কি? নাকি শুধু হাসফাঁসই সার? কায়দা করে প্রশ্নের মোড় ঘুড়িয়ে দেন আপনি। বলেন, প্রশ্নটা স্থান কোথায়?— এরকম নয়, প্রশ্নটা হবে স্থান কেমন করে হতে পারল? অর্থাৎ বাস্তব বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কবিতা কেমন করে জায়গা পেয়ে যায়? সমাজে আদিসভ্যতা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই জায়গাটি রয়ে গেছে, এখানে একটি মূল তর্ক ওঠান। সাংসারিক প্রয়োজনে শিল্পকলা প্রথমে রচিত হলেও কালে কালে সেই প্রয়োজন থেকে সেটি বারবার স্খলিত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে জীবনের গভীরে। তবে কি সংসার ও জীবন আলাদা কোনো ব্যাপার? আপনার জবাব, না, প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্প কল্পনার দূরযাত্রী হল— জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়! যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রয়োজন, ধর্ম, সংসার— এসবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্রমে শিল্পকলাকে যেভাবে কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত করছে (আসলে তাই কি?) তাতে প্রমাণ হয়, যে এর প্রয়োজন মানবজীবনের জন্য মৌলিক ও অন্নজলের মতোই অপরিহার্য। আপনি সকল ধরনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে শিল্পকলাকে মুক্ত করে নিঙ্প্রয়োজনের এলাকায় দাঁড় করিয়ে দেন। আর তাতে কবিতার ব্যাপ্ত তাৎপর্য যেমন কমে যায় তেমনি আপনি নিজেও তার বিরোধী পক্ষ হয়ে ওঠেন। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আপনি বোঝাতে চাইছেন যে সাহিত্যিক জীবনধারণের জন্য বা আদর্শ প্রচারের জন্য শিল্পসাহিত্য রচনা করলেও রচিত শিল্পটি তথা টেক্সটটি তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অসীম ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কেন থাকে না? কারণ তা কিছু না-কিছু অন্যতর উদ্বৃত্ত ধারণ করে, বর্ণিত বিষয় বা বক্তব্যকে যা ছাড়িয়ে যায়, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা বা সামাজিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট বা নিবেদিত থাকে না। তাই কি? এই উচ্ছলন, উদ্বৃত্ত, আশাতীত অনুভূতি তথা শিল্পসম্ভোগ কি সামাজিক নয়! অথচ এ কথাও বলেন, যে

> শিল্পকলার কাছে আমরা যা পাই; তার সঙ্গে আমাদের বিনিময় চলে, বোঝাপড়া চলে, তা নিয়ে কিছু করতেও হয় আমাদের, তাহলে কেমন করে বলা যায় শিল্পকলা আলস্যজীবীর বিলাসিতা, বা উচ্চাঙ্গের কোনো আমোদ-প্রমোদ? (পৃ. ৩৮, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*)।

প্রত্যুত্তরে আমরা বলব- যে কোনো প্রত্যাদেশ— শাসক, ধর্মগুরু বা অন্য কারোর নির্দেশে রচিত হলেও শিল্পী তাঁর কাজে সৃষ্টি করেন অজ্ঞাত লুকানো বাস্তবতাকে ও সত্যকে, আমরা সেভাবেই কবিতা পাঠ করে থাকি। এই কাজটি পাঠকই করে থাকে তার নিজের আত্মিক বিকাশের জন্য, দেহমন-প্রাণের সমবায়ে গড়া সত্তার জন্য— রহস্যময় অবিচ্ছেদ্য এক প্রয়োজনের লক্ষ্যে। কবিবর, আপনি এখানে একটি প্রধান সূত্র বাদ দেন, তা হল মানুষের সামাজিক সত্তার জন্য। বিরোধটা বোধহয় এখানেই।

দ্বিতীয়ত, এ সূত্রে আপনার বক্তব্যে এসে যায় শিল্পবিষয়ের প্রসঙ্গটি, দেখা দেয় সেই প্রতীকবাদের প্ররোচনা যে শিল্পকলা প্রকৃতির সরলতা অনুসরণ করবে না, করবে সংস্কৃতির উচ্চমানকে অর্থাৎ কবিপ্রতিভার দুরবগাহ রহস্যরশ্মিপাতে বর্ণিল চেতনাকে ও আহৃত জ্ঞানকে যা কাব্যকলাকে দুর্বোধ্য অভিধা দিয়ে থাকে। টলস্টয় দুর্বোধ্যতাকে দুর্নীতি বলেন এ কারণে যে তা শ্রমজীবীরা বুঝতে পারে না। শ্রমজীবীর বোধ্য করে

তুলতে হবে কবিতাকে— তাঁর এ প্রচারকে আপনি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন, যুক্তি দেন যারা উচ্চজীবী তারাও সবসময় বোঝেন না 'ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পকলা' কি একটা প্রতীকী কবিতা, অর্থাৎ যেমনতেমন বোঝার প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে শিল্পকলার বিচার করা যাবে না। যা রচিত হচ্ছে, হয়ে গেছে তা বোঝার জন্য শিল্পবোদ্ধা তৈরি করতে হবে, শিল্পবোধের দীক্ষা নিতে হবে, শ্রমজীবীকে টেনে তুলতে হবে উচ্চস্তরে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতো বাড়ছে ভারতে, তাতে কি শ্রমজীবীর বঞ্চনা কমেছে? হে কবি, শ্রেণীব্যাখ্যার এই সরলীকরণ এক্ষেত্রে কোনো তাৎপর্যই তৈরি করছে না। আপনি স্বীকার করেন যে ব্যক্তিভেদে চৈতন্যবিকাশের তারতম্য আছে কিন্তু শিল্পের ধর্ম হল কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রতিভূ করে তার মধ্য দিয়ে মানুষের চিৎপ্রকৃতিকে প্রকাশ করা। তাই সরল আদিম প্রাকৃতিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের চেয়ে সভ্যতার জটিল জঙ্গম চিৎপ্রকৃতির যন্ত্রণাদগ্ধতায় পুড়ে মরাই ভাল। আমরা আপনার এ মত সমর্থন করি এবং চৈতন্যের উর্ধ্বায়নের জন্যই সভ্যতাকে ও সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই। সভ্যতা স্বয়ং ন্যায়বিধানকারী নয়, মানবমুক্তির পতাকাবাহী নয়, তারও আছে অন্যায়ের সহস্র হিংস্র, নৃশংসতার বিরাট খতিয়ান, দুষ্ক্রিয়ার অসংখ্য তথ্য, ব্যভিচার। আর বিজ্ঞান? (আপনি অনেকখানি বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিরোধী— রোমান্টিকদের মতোই) সে তো মানবজাতির ধ্বংসমুখী প্রবণতারই পরিপোষক। আপনি খুব অভিমান করেন যখন এসব দৃষ্টান্তে দেখেন যে, আঙ্কল টমস কেবিন দাসপ্রথা দূরীকরণে ভূমিকা রাখে কিন্তু 'তরুণ হেবার্টের দুঃখ' কোনো কাজে লাগে না, তাতে কবিতা যে হোরাসের মতে 'মনোহারিণী শিক্ষয়িত্রী' এই মত মানার চেয়ে প্লেটোর নির্বাসনদণ্ডই মেনে নেয়া সম্মানজনক ও উত্তম বলে মনে হয় আপনার। হে কবি, আপনি কোনোভাবেই কবিতাকে শিক্ষামূলক ভূমিকা দিতে রাজি নন।

এর কারণ? আপনার মতে, কারণ হল, কবিতা যুগমানসে কাজ করেনা, তার প্রভাব ব্যক্তিমানসে অর্থাৎ সেই চিরাচরিত দ্বন্দ্ব— ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব। ধর্মবিশ্বাস বা রাষ্ট্রনীতি যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উন্মাদ বা হিংস্র করে কবিতা সেভাবে কিছুই করে না। আর এটাই তার শক্তি যে সে তা করেনা, সে একান্তই বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম। কবিবর, আপনি একটা ভিন্ন কথা বলেন— ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞানের জ্ঞান, সমাজনীতি, সুবিচার ও সংযমের আদর্শ প্রয়োগ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত মানুষ শুধু নির্লজ্জ পাপাচারই করেছে। তাই কি? কোনো ধর্মবিদ, বিজ্ঞানবিদ, সমাজবিদ কি পুণ্য করেননি, আত্মত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের মধ্য দিয়ে কি জীবনকে মুক্ত ও শুদ্ধ করার সাধনা করেননি? অর্থাৎ সমাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রেই আপনার আপত্তি— যা শিল্পকলা করবে না বা করে না, নিষ্কলুষ অবস্থানে টিকে থাকে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। কবিতাকে এই অর্থেই আপনি বলেন কম নিষ্ক্রমণপ্রবণ এবং এটা নিষ্ফলতা নয়, কবিতার গৌরব।

সংঘবদ্ধ মানব সমাজে বা সৈনিক শিবিরে যেখানেই হোক নীতিবান সাধু ব্যক্তিকে সেখানে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় একা কোনো গুহায় বা পর্বত কন্দরে। অর্থাৎ নীতিপ্রচারকেরাও যেহেতু একা, কবিতাও যেহেতু একা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে সেহেতু কবিতার সঙ্গে সুনীতির একটা সম্বন্ধ আছে। এই সুনীতি ধর্ম,আইন, শাসনের সুনীতি নয় যা কঠোরহস্ত, এই সুনীতি স্নিগ্ধ যা উন্মীলিত করে আমাদের চিত্তকে, স্বভাবকে দেয় আনন্দ ও মুক্তি, উদাসীন মনকে করে জাগ্রত। আপনি আপনার অনুপম গদ্যের সংবেদনশীল ভাষায় বলতে থাকেন–

> শিল্পের অভিজ্ঞতাও বিস্তীর্ণ ও সম্প্রসারিত করে আমাদের; তার মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করি–করেছি অনেকবার জগতের সঙ্গে আকস্মিক বা সমানুকম্পন, এক পবিত্র বেদনাবোধ, কোনো ইন্দ্রিয়াতীত উদ্ভাস, কখনো যেন ক্ষণিকের সঙ্গে শাশ্বতের মিলনস্বার্থ। (পৃ. ৪৩, ঐ)

রাবীন্দ্রিক শিল্পতত্ত্বেরই অনুরূপ এই বচন হলেও কবিতার নৈতিক ফলাফল এতে প্রমাণিত হয় না। কাজেই এ প্রশ্ন বাদ দিয়েই শত্রু-মিত্র নিয়ে ভাবতে হবে। সত্য বা সৌন্দর্যবোধের পাল্লায় অনেক কিছু মাপার কথা বলেন, সব বৈপরীত্যকে স্থান দেন শিল্পসৌন্দর্যে— গোলাপের পাশে কুমড়ো ফুলকে, বালিকার হাসির পাশে দন্তিল গণিকাকে ইত্যাদি। মনে পড়ে তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতার বিষয় নিয়ে সেইসব বিতর্কের কথা। আর শিল্পলব্ধ জ্ঞান— যদি কিছু থাকে, আছে বলেই আপনার বিশ্বাস তা জীবনের মধ্য দিয়ে ঘোষণীয় বা বিশ্লেষণযোগ্য নয়, তা প্রকাশিত হয় নতুন আরেকটি শিল্পরচনায়। কথাটি আমরা আগেও বলেছি যে আপনার অভিমত হচ্ছে শিল্প থেকে শিল্পের পুনরুৎপাদন ঘটে, জীবনের মধ্যে নয়। তাই কি? জীবন কি স্বয়ং একটি শিল্প নয়? নয় এই পৃথিবী একটি art এবং প্রতি ধূলিকণায়, বৃক্ষে-নদীতে-সমুদ্রে, প্রাণীজগতের সর্বত্র কি ছড়ানো নেই শিল্পরূপের উপাদান-গঠনকলা? আমরা কি নিজের আশ্চর্য জীবন ও চিত্তকে শিল্পের ধরনে সাজাই না? নইলে বাজারে গিয়ে কেন ফুললতা-শোভিত চায়ের কাপ কিনি? যেকোনো সাদামাটা কাপ কিনলেই তো কাজ চলে যায়। আপনি রহস্যবাদীদের মতো কেন এই কথাটি এড়িয়ে গিয়ে বারংবার শিল্পের অন্যকোনো গভীরতম প্রয়োজনকে নির্দেশ করে জিতে যেতে চান? অথচ তা মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে অবিচলভাবে কাঙ্ক্ষনীয় বলে স্বীকার করেন, এই মনুষ্যত্ব কি সুনীতির বাইরে অবস্থান করে? আপনার মূল জিজ্ঞাসা আসলে শিল্পকলার কাছে আমরা কী পাই?

আমরা পেতে চাই সামঞ্জস্য–সমতা যে লক্ষ্যে ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজবিজ্ঞান বিরামহীন চেষ্টা করে যাচ্ছে। মানবসম্বন্ধ, প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য— এসবের অর্থ কী? কীভাবে তা আসে? তা কি নয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে বিকাশশীল এক অনন্তরঙ্গ? বুদ্ধদেব, আপনি জ্ঞান ও জীবনকে ক্রমরূপান্তরিত ক্রমাগ্রগতির রৈখিকতায় দেখেন না বলেই এই দ্বান্দ্বিকতা চোখে পড়ে না। সামঞ্জস্য কখনোতো স্থির নয়, তা অর্জিত হয়নি বা হয় না বরং সর্বত্রই অসামঞ্জস্য বিরাজমান আর এতেই জগৎ সচল। কিন্তু আপনি এই সামঞ্জস্যকে সত্য ও অস্তিমান দেখেন শিল্পকলার মধ্যে; শিল্পকলা অবিকলভাবে সুসমঞ্জস—এর অর্থ যদি symmetry হয় তবে ঠিক আছে, কারণ শিল্পকলায় জীবনের বিভিন্ন উপাদান ও উপায়ের মিথস্ক্রিয়ায় ও অন্তর্বয়নের ফলেই আমরা তা পাই, কিন্তু যদি কথাটা হয় সিনথেসিস তবে তো তাকে থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের ক্রম পেরিয়েই আসতে হবে, আর যেহেতু সিনথেসিসও পরমুহূর্তেই হয়ে যায় থিসিস তখন তাতো অ্যান্টিথিসিস-এর গর্ভে ঢুকে যাচ্ছে। আপনি চিঠিতে কোথাও বিশ শতকের বঙ্গীয় শিল্পসাহিত্যের চিন্তাচেতনায় মার্কসের দ্বান্দ্বিক সাহিত্যতত্ত্বের ধাপটি নিয়ে তর্ক করছেন না, যদিও তার বিরোধিতা অনেকভাবেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আপনার মতাদর্শে। মার্কস শিল্পীর কাছে যুগধর্ম ও ইতিহাসচেতনা প্রত্যাশা করেও তো বলেছিলেন, যে শিল্পেরও আছে নিজস্ব পুরাণ সুন্দরভাবে সংহরণ করে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আন্তরধর্ম— যেমনটি করেছে গ্রীক কবিতা। যুগের জমিন থেকে অন্তত একটা প্রাতিভাসিক ব্যবধান তাকে মেনে চলতেই হয়। তাইতো বায়রনের ইতিহাসবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীলতার পাশেই

ঐকালের কবি শেলীর মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আন্তরিক বিপ্লব, বালজাঁকের মধ্যে দেখেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম শ্রেণীদ্বন্দ্বের অজান্তে প্রকাশ। যাঁদের শিল্পসাহিত্যে এই দ্বান্দ্বিকতা অস্ফুট তাঁদের কাজে ইতিহাসের সত্য অন্তঃশীল, তাঁরা অনেকখানি সামাজিক দায় প্রতিপালন করেন আপনা-আপনিই, এই বিশ্লেষণ ও এ ন্যায় মেনে-জেনে নিলে তর্কটি বাতিল হয়ে যায়। আপনি অন্যদিক থেকেও তর্কটিকে বলীয়ান করেন। সংসার মাত্রে বিশৃঙ্খল (আমরা বলবো দ্বান্দ্বিক), শৃঙ্খলা আছে শুধু ছন্দোবদ্ধ কোনো কাব্যপঙ্ক্তিতে, কোনো সুচারু গদ্যবাক্যে, সুর বা রেখার বিন্যাসে, স্বরের সঙ্গে স্বর বা ব্যঞ্জনের বাচ্যার্থের সঙ্গে ধ্বনির মিলনে ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি এসে থামেন শিল্পকলার রূপশৈলীর মধ্যে—রূপনির্মিতির মধ্যে, সর্বোপরি আর্টের সুমিতিবাদের মধ্যে। সুনীতির প্রশ্নটি এভাবেই তর্কের জাল ফাঁক করে বেরিয়ে যায়।

চিঠির শেষে লিখতে থাকেন বিমূঢ় অবচেতনার হাত ধরে সেই অনন্য গদ্যবাক্য— কীভাবে আপনাকে প্রকৃতি-প্রতিবেশ স্নিগ্ধতা দেয়, ‘জানালার বাইরে এক ফালি নীলচে আকাশ, পাশের বাড়ির জামরুল-ডালের ফাঁক দিয়ে টুকরো চাঁদ চমকে দেয় আপনাকে।’ সেই আপনাকে— যিনি প্রকৃতিদৃশ্যকে এককালে বাদ দিতে বলেছিলেন— হে কবি, আপনিও তো এ সময়ে অনেক রূপান্তরিত এক সত্তা হয়ে গেছেন, যিনি বলেন—জগতের যত সমুদ্র-নদী-শহর, মানবপ্রীতির সংস্পর্শ পেয়েছেন সেসবই হৃদয়ের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে ভাষাগত হওয়ার জন্য, রূপের মধ্যে আকারিত প্রাণ পাওয়ার জন্য। আপনিও তো স্মৃতির শাসন মানেন, মানেন বহির্জগতের অভিজ্ঞতার প্রেরণা, ব্যাপ্ত জীবনের দৃশ্যপরম্পরার নিবিড়তায় আপনিও তো কম মগ্ন নন। আপনার চিঠি শেষ হয় এই আশায় যে, ক্রমশ তুমুল বিপুল স্মৃতিতরঙ্গ শিরায় যোগাবে ফোঁটাফোঁটা নতুন যৌবন, আর সেই যৌবনশক্তি রূপ নেবে কোনো নাট্যরচনায় বা গল্পের অবয়বে অর্থাৎ শিল্পের ধ্বনিময়তায়। হে কবি, আমাদের মনে পড়ে *বন্দীর বন্দনা* কাব্যের সেই অন্তর্বেদনা ও আর্তচিৎকারের কথা— যৌবনের কান্নার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। কবিতা রচনার জন্য আপনার যৌবন প্রার্থনার আকুলিবিকুলি; প্রেমে-পড়া মানুষের মতো নবনব উদ্দীপনায় কলম হাতে বেঁচে থাকার এই প্রত্যাশাটি আমাদের কৃতজ্ঞ করে ও আমাদের মাথা নত করে দেয় আপনার সামনে। এই জন্মশতবর্ষে আমাদের আপনি জড়ো করে দাঁড় করিয়ে দেন আপনার এই যৌবনঋদ্ধ জীবনযাপনের ঋতুকাল শৈল্পিক বসন্তের কাছে। তাহলে তো আপনি শেষপর্যন্ত একজন সামাজিক মানুষই যিনি কবিতাকে ‘সামাজিক কমোডিটি’ করে তোলার উদ্দেশ্যে কখনোই আপস করেননি, নিজের কাব্যাদর্শের সঙ্গেও না। এই কারয়িত্রী ভূমিকার জন্যই কবিতার বিশ্বে বসন্তঋতু নিয়ে বিরাজমান এই আপনি,আপনার ভাষা,শব্দাবলি, একাকিত্ব—সকল কিছুই আমাদের ক্লান্ত ধ্বস্ত জীবনের শিরায় শিরায় যৌবনের সঞ্চার করতে পারছে আজও, ভবিষ্যতেও করবে বলেই বিশ্বাস করি। আমরা তাই আপনার মিত্র। শতবর্ষে আপনাকে আমাদের যৌবনের ও চেতনার গভীর থেকে উত্থিত শিল্পিত ভালোবাসার মাল্য অর্পণ করি।

অক্টোবর ২০০৮

বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যের কষ্টিপাথর

বেলাল চৌধুরী

সেই সুদূর বাল্যকাল থেকে বুদ্ধদেব বসুর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আমার বাবার কল্যাণে তাঁর সংগ্রহ থেকে পেয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর *হঠাৎ আলোর ঝলকানি* আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের *প্রথমা*। প্রথমটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আর দ্বিতীয়টি কবিতার। তখন কি আর অত বুঝবার বয়স হয়েছে। তবে যেহেতু বাড়িতে বইপত্র পড়ার চল ছিল সেহেতু বুঝি আর না বুঝি বই পেলেই গোগ্রাসে গেলা। কবিতা না গল্প-উপন্যাস না একেবারে প্রথমে *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*র মতো একটা ভারীভাত্তিক বই। প্রথম প্রথম কিছুটা হোঁচট খেলেও স্বাদু ভাষার টানে শেষ অবধি পড়ে গেলাম।

এরপরেই কৌতূহলী হাতে এসে গেল *সব পেয়েছির দেশে*। ব্যস নেশা ধরে গেল। এরপর বুদ্ধদেব খুঁজতে খুঁজতে তৎকালে নানা জনপ্রিয় সিরিজের জন্য খ্যাত প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত ছোটদের গল্পের বই *রঙিন কাচ* ও উপন্যাস *ছায়া কালো-কালো*। যে বই নিয়ে একদা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে 'চন্দ্ররেণু'র অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য সেসব অনেক পরে জেনেছি। আসলে বুদ্ধদেব বসুর মতো পড়ুয়া এবং সেই সঙ্গে প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন লেখক বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা গেছে।

এভাবে খুঁজতে খুঁজতে একের পর এক তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ, ছড়া, স্মৃতিকথা, বড়দের-ছোটদের সবই, যত পড়া হতে থাকে ততই মুগ্ধতার ঘোরও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে। সেই সঙ্গে আমার জীবনও নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যখন সমস্ত নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছি তখন ভাগ্যচক্রে পৌঁছলাম কলকাতা শহরে। এর অব্যবহিত আগে ঢাকার শ্রীদাস লেনের বিউটি বোর্ডিং-এর আড্ডায় 'কবিতা' পত্রিকা নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি দেখি।

ঢাকার শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, ওমর আলীদের কবিতা ছাপা হয়েছে, হচ্ছে। শামসুর তখন বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছেন। পূর্ণোদ্যমে। বুক চিতিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আধুনিক কবিতার।

এদের সবার সঙ্গে আমার জানাচেনা ছিল। জমাট আড্ডা বসতো তখন। শামসুর রাহমান-এর কাছে বুদ্ধদেব বসুর চিঠি দেখলাম। পরে বুঝলাম চিঠির ব্যাপারে ইনি রবীন্দ্র-অনুসারী। 'কবিতা'য় পাঠানো কবিতা সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও অনন্ত একটি পোস্ট কার্ড লিখবেন।

তরুণ ওমর আলী 'সাহস' নামে চার লাইনের একটা ছোট্ট কবিতা পাঠিয়েছিল বুদ্ধদেব সমীপে। সম্পাদনা কাকে বলে সেটা দেখলাম। মাত্র চার লাইনের কবিতাটিকে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে একটি স্থায়ী কবিতার রূপ দিয়েছেন। তখন আমি নিজে লেখালেখি না করলেও পড়তাম প্রচুর। আর বন্ধু-বান্ধবদের বেশির ভাগই ছিল লেখক কিংবা কবি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কলকাতায় গিয়ে যখন রাসবিহারী রোড অতিক্রম করছিলাম তখন ভেতরে ভেতরে ২০২ নম্বরটি খুঁজেছিলাম নিজের অজান্তেই। এর মধ্যে প্রতিভা বসুর বইও পড়া হয়ে গেছে। ঢাকার পটভূমিতে 'সমুদ্র হৃদয়' নামে একটা উপন্যাসসহ আরো বেশ কিছু লেখা পড়েছি। তিনিও যে ঢাকার মানুষ এবং বনগ্রাম রোডে থাকতেন সেসবও জেনে গিয়েছিলাম ঐসব সাহিত্য আড্ডা থেকে। প্রতিভা বসু তখন ছিলেন রানু সোম। অসাধারণ গাইয়ে। স্বয়ং নজরুল ইসলাম গান শেখাতেন। এসব নিয়ে কত্ত গল্প। প্রতিভা বসু আর বুদ্ধদেব বসুকে আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় দুজন দুজনার। এরকম সুখী দম্পতি বিরল। অবশ্য শেষ জীবনে সব হিসেবে কেমন যেন পালটে গিয়েছিল। হয়তো জীবন এরকমই।

কলকাতায় আমার 'প্রথম' অনেক কিছুর মধ্যে আড্ডা আবিষ্কার করলাম কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে। প্রথম আলাপ হল' কুয়োতলা', 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' খ্যাত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শক্তির তখন একচ্ছত্র আধিপত্য। কয়েকদিনের মধ্যে 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র উৎপলকুমার বসু, 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 'তোমার প্রতিমা'র তারাপদ রায়সহ আরো অনেক কবির সঙ্গে জমে গেল। ধীরে ধীরে পরিচয় হতে লাগল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধায় তখনই বিলেত ফেরৎ এবং একটা তেল কোম্পানির বড় চাকুরে। কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন নমিতা মুখোপাধ্যায়, সে ছাড়াও বহু তরুণ যারা পরে হারিয়ে যায়।

এদের কাছেই জানা গেল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমেরিকায়। আরো জানা গেল বুদ্ধদেব বসুরাও সব আমেরিকায়।

এর অব্যবহিত আগে ভারত ঘুরে গেছেন মার্কিন বীট কবি অ্যালেন গিন্সবার্গরা। তাদের বিষয়েও 'দেশ' সাপ্তাহিকীতে বুদ্ধদেব বসুর একটি আন্তরিক স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ লেখা পড়েছিলাম। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবেও তখন বীট জেনারেশন কবি-লেখকদের রমরমা অবস্থা। গিন্সবার্গরা কলকাতার প্রেমে এমনভাবে মজেছিলেন যে কলকাতার সঙ্গে তার কবি-লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে এমন একান্ত হয়ে উঠেছিলেন যে পরবর্তীকালে এদের প্রভাব তরুণ লেখকদের ওপর দারুণভাবে বিস্তার করেছিল।

এদিকে বুদ্ধদেব বসু প্রবর্তিত যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কম্পারেটিভ লিটারেচারের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শক্তির সুবাদে কল্যাণ চৌধুরী, সমীর সেনগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, অমিয় দেব, কমলেশ চক্রবর্তী প্রমুখসহ আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তখন কলকাতার আধুনিক সাহিত্য মহলে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ, কালিদাসের 'মেঘদূত' -এর অনুবাদ, রিলকে আর হোল্ডারলিন-এর কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি বাংলা কবিতার ধারাকেই পাল্টে দিয়েছে। শুধুই কি অনুবাদ, প্রতিটি গ্রন্থের বিপুল শ্রমলব্ধ ভূমিকা ও টীকা, বিচার ও বিশ্লেষণ যত্নশীল পাঠকদের কতটা শিক্ষিত এবং অনায়াস পাঠযোগ্য করে তুলেছিলেন তা এককথায় তুলনারহিত। আসলে এই সময় থেকেই সত্যিকারের আধুনিকতার পাঠ শুরু হয় বলা যায়।

এছাড়া দীর্ঘকাল ধরে 'কবিতা' পত্রিকা 'বৈশাখী' অভিনব 'এক পয়সা একটি' সিরিজ বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার জগতে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এমনকি ছাপার কাজেও তাঁর সজাগ ও সর্তক পারিপাট্য ছিল শিক্ষণীয়।

এর মধ্যে একদিন কফি হাউস সূত্রে চাক্ষুষ পরিচিত কিংবদন্তীর পথে এগিয়ে চলা কবি বিনয় মজুমদারের আমন্ত্রণে তাঁর তৎকালীন আশ্রয়স্থল জ্যোতির্ময় দত্তের ব্রড স্ট্রীটের বাড়িতে গেলাম অন্তত বুদ্ধদেব বসুর কন্যা জামাতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবো এই আশায়। আগের দিন কফি হাউসে বিনয়দা বললেন, 'কাল তুমি অবশ্যই আমার ওখানে এসো একবার। জ্যোতিবাবু বলেছেন আমার একজন বন্ধুকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে পারি। কি যেন একটা উপলক্ষ ছিল। বিনয় মজুমদারের সাদর আমন্ত্রণে খানিকটা কৌতূহলবশতই দ্বিধাভরে যাওয়া হল পরদিন সকালে। গিয়ে বিনয়বাবুর কথা বলতেই ভৃত্য জাতীয় একজন অবহেলা ভরে ইশারায় তাঁর মেজেনিন ফ্লোরটি দেখিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চলে গেল।

আমি দরোজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বিনয় বললেন, বেলাল এসেছো, দরোজা খোলাই আছে ঢুকে পড়ো। দেখি মেঝের ওপর একটা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় কি যেন করছেন। বালিশ ছিঁড়ে ঘরময় তুলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ওই অবস্থা থেকেই কাকে যেন ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর এলো না। তারপর এক সময় নিজেই উঠে আমাকে বাড়ির একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে জ্যোর্তিময় দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জ্যোতির্ময় তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি হেসে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে একজনকে নির্দেশ দিলেন বাবুর বন্ধু, এসেছেন। তাকে খাবার দাও। এদিকে বাড়ি ভর্তি লোকজনের হৈ চৈ-কোলাহল। একটি রূপসী কিশোরীকে দেখলাম এক ঝলক। তারপর ভৃত্য জাতীয় লোকটি তাচ্ছিল্য ভরে বাটি ভর্তি মুড়ি আর কাঁঠাল দিয়ে গেল। ভাবখানা বাবু নিজেই পাগলা তাঁর আবার বন্ধু, কত বড় পাগলা কে জানে।

যাই হোক, মীনাক্ষী দত্তকে দেখার সৌভাগ্য সেদিন আমার আর হয় নি। জ্যোতির্ময় দত্ত তখন স্টেটসম্যান-এ চাকরি করেন। চলনে-বলনে পাক্কা সাহেব। সাপ্তাহিক কলাম ক্যালকাটা নোটবুকে বিনয়কে নিয়ে শুধু লেখেনইনি বিনয়ের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের বাড়িতে এনে তুলেছেন। এনিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে অম্লমধুর কথান্তর হওয়ার কথা পরে মীনাক্ষী দত্তের লেখায় পড়েছি। আসলে প্রতিভাবান বিনয়ের মধ্যে ছিল নানারকম জটিল ও বদ্ধমূল আচ্ছন্নতা। ব্যস ঐ পর্যন্ত।

এখানে বিনয় সম্পর্কে আগে থেকে কিছু না বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না। বিনয় মজুমদার মানুষটি দেখতে ছোটোখাটো হলে কি হবে তার সম্পর্কে এত সব চমকপ্রদ গল্প শুনেছি যে প্রথম দেখার পর থেকেই তিনি আমার কাছে পরম বিস্ময় হয়ে উঠেছেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তুখোড় ছাত্র। গণিত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। কবিতা লেখে। সারাক্ষণই আপন মনে বিড়বিড় করছে। কখনও হাসছে। রুশ ভাষা জানেন। মূল রুশ থেকে অনূদিত বেশ ক'টি বই খ্যাতি কুড়িয়েছে। চোখে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন সংশয়, অস্থির, চঞ্চল।

কিন্তু কিছুতেই নারী-আবেশ কাটছে না।

পরে একদিন শুনলাম বুদ্ধদেব বসু ফিরে এসেছেন ২০২তে। একদিন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে বুদ্ধদেব দর্শনে যাওয়া হল। প্রতিভা বসুকেও দেখলাম। আমি ঢাকার ছেলে শুনে খানিকটা কথাবার্তাও বললেন। এরপর আরেকদিন গেলাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাঙ্গাপীড়িত কবি সেবাব্রত চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল। বুদ্ধদেব এবং প্রতিভা বসু দুজনেই দুসম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানির খবরে যারপরনাই ব্যথিত হলেন।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎই ঢাকা থেকে আগত শ্রীমতী পূরবী বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর সঙ্গে দেখা। তাদের নিয়ে গিয়েছিলাম প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু সমীপে। তাঁদের আগ্রহে সে দিনও ঢাকা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। প্রতিভা বসু নিজেকে বলতেন আমি তো ঢাকারই মেয়ে। আর বুদ্ধদেব তখনকার সাংস্কৃতিক রাজধানী শহর কলকাতার প্রতি ছিলেন দুর্মরভাবে আসক্ত। ঢাকা তখন তাঁর কাছে মফঃস্বল হয়ে উঠেছে। তারপরও ঢাকার মানুষজন দেখলে ঢাকার খোঁজখবর নিতেন। ২০২-তে ফিরে এসেছেন আর বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কলকাতার উপকণ্ঠে নাকতলায় নবনির্মিত বাড়িতে উঠে গেছেন। বুদ্ধদেব বসু এবং প্রতিভা বসুকে তাঁদের বন্ধুতুল্য ছাত্র এবং অনুসারীরা দাদা এবং দিদির পরিবর্তে বু.র এবং প্র.ব বলে সম্বোধন করতেন। বুদ্ধদেবের উপস্থিতি মানে দেশবিদেশের সাহিত্য নিয়ে প্রবল তর্কবিতর্কের ঝড়। তুমুল হাসির তুফান।

কফি হাউসের আড্ডায় একদিন পরিচয় হয়ে হেল তাঁদের একমাত্র পুত্র সন্তান শুদ্ধশীল বসু পাপ্পার সঙ্গে। সেই পরিচয়ের সূত্রেই একদিন দেখলাম আমিও কখন যে তাঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি। আমার নিজের তেমন কোনও বলবার মতো পরিচয় না থাকলেও পাপ্পার বন্ধু হিসেবে নাকতলাতে আমার মতো ছন্নছাড়ারও একটা জায়গা হয়ে গেল। প্রতিভা বসুর অপত্য স্নেহের বশেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞ।

তাঁদের কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে নিয়ে বুদ্ধদেব পরিবারের স্নেহধন্য কবি নরেশ গুহর অবিস্মরণীয় কবিতাটি এককালে আমাদের মুখে মুখে ঘুরত। বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'পরি-মার পত্র' রুমিকে— এমনকি বিষ্ণুদের 'রুমিকে' কবিতাটি পড়ে মনের ভেতরে রুমির অবয়বের একটা আবছা আদল গড়ে উঠেছিল। এছাড়া পাপ্পার মুখে তার ছোড়দির কথা শুনে আমি তার অনুরাগী হয়ে উঠি। রুমিও তখন আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। কিছুদিন বাদে রুমিকেও দেখলাম নবজাত ছেলে বুয়ানসহ নাকতলার বাড়িতে। নাকতলার বাড়ি তখন আনন্দের জোয়ারে ভাসমান। রুমিকে দেখে মনে হল সত্যিকারের পরি।

বুদ্ধদেব বসুর ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে 'বৈদগ্ধ্য' প্রকাশনা উপলক্ষে শামসুর রাহমানকে কলকাতায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন দময়ন্তী বসু সিং। রুমির আগ্রহে আমাকেও কবির সঙ্গী হতে হয়েছিল।

আমাদের বেশ খাতির-যত্ন করে পার্ক সার্কাসের একটি বাড়িতে রাখা হয়েছিল। পরদিন তাজ বেঙ্গলে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিভা বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উর্দু কবি জাভেদ আখতারের সঙ্গে ভারতের সাহিত্য ও শিল্প জগতের বহু গণ্যমান্য। মূল বক্তা ছিলেন শামসুর রাহমান ও প্রতিভা বসু। প্রতিভা বসু মঞ্চে দাঁড়িয়েই প্রভূত আশীর্বাদ করেছিলেন দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানকে। বুদ্ধদেবের বহুমাত্রিক প্রতিভার উপর বক্তব্য রেখেছিলেন শামসুর রাহমান। এ উপলক্ষে শেখর বসু রায়ের সম্পাদনা আর অতিথি সম্পাদক দময়ন্তী বসু সিংয়ের সম্পাদনায় 'বৈদগ্ধ্য' নামের একটি মূল্যবান স্বমুদ্রিত বুদ্ধদেব সংখ্যা বেরিয়েছিল। সূচিপত্রে প্রতিভা বসু, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, নরেশ গুহ, শামসুর রাহমান, শঙ্খ ঘোষ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন সহ প্রবীণ ও নবীন লেখকরা বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি করে দিয়েছিলেন সমীর সেনগুপ্ত। পত্রিকাটিতে কবিজীবনের বেশ কিছু দুর্লভস্মৃতি সহ আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছিল।

আজ পাপ্পাও নেই, প্রতিভা বসুও নেই, কিন্তু রয়ে গেছে বুদ্ধদেব বসু নামের প্রতিষ্ঠানটির ছেষট্টি বছরের ফসলের সম্ভার। যা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন বিরল যে, বলার অপেক্ষা রাখে না। সৃজনশীল রচনাকর্ম থেকে ট্যুইশানি, দেশ-বিদেশে শিক্ষকতা, বক্তা, খণ্ডকালীন সাংবাদিকতা, ভ্রমণে পরিপূর্ণ এক মহাজীবন। তাঁর জীবিতকালের ছেষট্টি বছরের মধ্যে কয়েকটি অনিবার্য কারণ ছাড়া এমন একটি বছর খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সময় তিনি কোনও না কোনও লেখালিখির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন না। আসলে বুদ্ধদেব বসু মানুষটি ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী। তিনি মনে করতেন খাটুনি ছাড়া কোনও সৎ কাজ সম্ভব নয়। সে বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিই হোক, লেখকের টেবিলই হোক তাকে অক্লান্তভাবে মুখ গুঁজে খেটে যেতে হবে।

এছাড়া বাংলা ভাষা নিয়েও তাঁর খেদ ছিল। রাজনৈতিক কারণে বাংলার পূর্বাংশ তখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন। হাওড়া থেকে খড়গপুর পেরুলে কেউ বাংলা ভাষা বোঝে না। তখন যদি ইবসেনের মতো প্রতিভাসম্পন্ন কেউ বাংলা ভাষায় জন্মাতো তবু তাঁর লেখা কে পড়ত। অথচ ইবসেনের একটি বই বেরুলেই অন্তত স্ক্যান্ডেনিভিয়ান দেশগুলির তিন তিনটি দেশে তা পড়বেই বা তাঁর নাটক অভিনীত হচ্ছে। এই আক্ষেপ তাঁর আমৃত্যু গিয়েছিল কিনা সন্দেহ।

একটা সময় নাকতলা বাড়িটি হয়ে উঠেছিল আমাদের চারণক্ষেত্র। পাপ্পার আতিশয্যে বহুদিন ঐ বাড়িতে সময় নেই, অসময় নেই আমাকে কাটাতে হয়েছে। একদিন তো ঐ দেড়তলার বাড়িতে অষ্টপ্রহর আড্ডার ফাঁকে দুপুর বেলায় আবার প্রবল কৌতূহল সৃষ্টিকারী ফ্লোরটিতে গুটি গুটি পায়ে গিয়ে দেখি বুদ্ধদেব বসুর কাছে আসা দেশ-বিদেশের বইপত্র, সাময়িকী– কত ধরনের পত্র পত্রিকা। বিশেষ করে গ্রোভ প্রেসের বই এবং এভারগ্রিন রিভিয়ুর প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাল। ওখানেই আমি প্রথম 'আ.এম কিউরিয়াস ইয়েলো', 'ওহ কালকুত্তা' বইগুলো দেখতে পাই। সেইসঙ্গে হেনরি মিলার, জ্যাক কেরুয়াক, আঁলা রবগ্রিয়ে, নবোকভ, মিশেল বুতর, নাথালি সারোৎদের বইপত্র পড়ে থাকতে দেখলাম। এভারগ্রিন রিভিয়ুতে দুষ্টু খাট্টা মিঠা সচিত্র লেখালেখি ছাপা হতো। এসবের প্রতি ছিল আমার বয়সোচিত দুর্বার টান।

তা সেদিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়েই তিনটি চৌকোনা বইয়ের দিকে নজর গেল। হুমড়ি খেয়ে বই তিনটি হাতে তুলে নিতেই অবাক বিস্ময়ে আমার চোখ ছানাবড়া হবার জোগার। বই তিনটি হচ্ছে শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা', আল মাহমুদের 'কালের কলস' আর শহীদ কাদরীর 'উত্তরাধিকার'। চট্টগ্রামের বইঘর থেকে প্রকাশিত। বই তিনটি দেখে তো আমার আনন্দ আর ধরে না। উল্টেপাল্টে দেখি আর বুক ভরে ঘ্রাণ নেই। শামসুর রাহমানের প্রথম বই না হলেও অন্য দুজনের তো প্রথম বই এবং যেহেতু বিউটি বোর্ডিং-এর সূত্র ধরে শহীদের বেশিরভাগ কবিতাই আমার আগে পড়া। শহীদ এমনিতে ধীরগতিসম্পন্ন অলস প্রকৃতির লেখক। তারপরও যে তাঁর বই বেরিয়েছে সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হলো আমার কাছে। শহীদের সূত্র ধরে আল মাহমুদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল বিলক্ষণ।

এরপর খাবার টেবিলে এঁদের কবিতা সম্পর্কে সরাসরি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করলে কেন জানি না বুদ্ধদেব খুব বেশি একটা উৎসাহ দেখালেন না। হতে পারে সেই মুহূর্তে তিনি প্রসন্ন মেজাজে ছিলেন না। কারণ এদের তিনজনেরই কবিতার সঙ্গে বিলক্ষণ তাঁর পরিচয় ছিল। তারপরেও বুদ্ধদেবের মতো নিবিষ্ট বাংলা ভাষাপ্রেমী কি কখনো বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অবজ্ঞা দেখাতে পারেন ?

কলকাতার ২০২ রাসবিহারি এভিনিউ-র ফ্ল্যাট বাড়িটি বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি ও সৃষ্টির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিল। যার জন্য নাকতলায় নিজের বাড়িতে উঠেও বুদ্ধদেব কিছুটা নির্বাসিত হয়ে পড়েছিলেন হয়তো মনের দিক থেকে। ২০২-তে তিনি জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নাকতলায় ঠাঁই নিয়ে সে স্বস্তি কতটুকু পেয়েছিলেন এক কথায় তা বলা অসম্ভব। তবে আত্মজন ও নিকট বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লেখা তাঁর অসংখ্য চিঠিতে তাঁর জীবনে এসব ঘটনা অনুপুঙ্খরূপে বিধৃত হয়ে আছে।

'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হবার সময় থেকে একবছর ধরে পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়ত মাতৃহারা কন্যা ইন্দিরাকে লেখা বাবা পণ্ডিত জওয়াহার লাল নেহেরুর লেখা কন্যার নিকট পিতার পত্র। বাবা জওয়াহার লাল আর ইন্দিরা ছিলেন রাজনীতির লোক। আর বাবা বুদ্ধদেব ও রুমি ছিলেন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে।

চিঠি লেখাতে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অক্লান্ত। শুধু কন্যা রুমি নয় বড় মেয়ে মীনাক্ষী, জামাতা জ্যোতির্ময় এঁদের কাছেও তিনি অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। এছাড়া বন্ধু, প্রিয়জন এবং কবিতা পত্রিকার সূত্রে অসংখ্য লিখে গেছেন। পোস্টকার্ড থেকে রাইটিং প্যাডে চিঠি লিখে গেছেন। সবগুলোই কাজের এবং মূলতঃ সাহিত্য, শিল্প এবং তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনা চিন্তা পঠন পাঠন বিষয়ে ভরা থাকত। একবার খুব সম্ভবত জ্যোতির্ময় দত্তকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন 'এ কথাগুলিই যদি একটু আলাদা করে লেখা যেত তাহলে হয়তো একটা প্রবন্ধই হয়ে ছাপানো গেলে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমও হতে পারতো'।

এতেই বোঝা যায় দেশ, সমাজ নিয়ে তাঁর চিঠিপত্রগুলোর মধ্যে একটা চিন্তাশীলতা, মন ও মননশীলতা কাজ করত। চিঠি প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলোর কথা মনে পরে। বাংলা সাহিত্যে 'ছিন্নপত্রের' মূল্য অনস্বীকার্য। এতে লোকোত্তর কবি-মনের অনেক অন্ধি-সন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বের পত্র সাহিত্যে এগুলোর মূল্য আমাদের মতে অনবশেষ।

আগেই বলেছি, পাপ্পার সূত্র ধরে নাকতলায় এক সময় যখন আমরা বলতে গেলে দিবারাত্তি যাপন করছি তখন আমাদের আর এক বন্ধু যামিনী রায়ের সুতাত্মজা দেবব্রত রায়, একদা পাপ্পার স্ত্রী স্বাতীকে বিবাহ করে পরম সুখে কালাতিপাত করছে। পাপ্পার ছেলেটিকে যদিও কখনো চাক্ষুষ দেখি নি, দ্বৈপায়ন নামকরণ (মহাভারত নিয়ে ব্যস্ত) বুদ্ধদেব বসুর বলাবাহুল্য– শুনেছি এখন পরিপূর্ণ যুবক।

জ্যোতিদা সপরিবারে আমেরিকা থেকে আসার পর আমাদের নাকতলার আড্ডা আরও জমাট হয়ে উঠল। ততদিনে মীনাক্ষী আমার দিদি হয়ে গেছেন। তাঁর কন্যা তিতির বা কঙ্কাবতী দত্ত এবং মৌলিনাথ অর্থাৎ গোগোদের সঙ্গী হয়ে জ্যোতিদার নেতৃত্বে যখন অগ্রসর নামের একটি নিশি নৌকোর চেবণ এক অভিযানে বেরিয়ে গুমতি নদী হয়ে বঙ্গোপোসাগরের এক চিলতে পেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পটভূমির পর্যন্ত, এক রোমাঞ্চকর পাড়ি জমিয়েছিলাম। হয়েছিলাম চেপে। এ সময় আর এক মার্কিন যুবক ক্লিনটন বুথ সিলি তখন জীবননান্দ দাশের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত। বংশীবাদক আর এক ফরাসি যুবতী মিশেল বনে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখালেখি নিয়ে তরজমায় ব্যস্ত ছিল। দিনের পর দিন রাতের পর রাত কত আড্ডা, তর্ক-বিতর্ক, গালগল্প— সময় যে কিভাবে কেটে গেছে টের পাই নি। একদিন সব

কিছুরই শেষ আছে। যথা নিয়মে আমাদের আসর-বাসর সাঙ্গ হয়ে এলো। যে যার ঘরে ফিরে গেল বা কলকাতা ছাড়ল। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের কবিতার একটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি আমার বারবার মনে পড়ে যায়।

"কলকাতায় ক্রিসমাস/দিল্লিতে উল্লাস/মেলা খেলা সারাবেলা/শান্তি নিকেতনে"।

সবশেষে বুদ্ধদেব বসুর উত্তম ভোজনবিলাস-এর কথা না বললেই নয়। তাঁর তিথিডোর কিংবা গোলাপ কেন কালো উপন্যাসে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্ভেজাল বাঙ্গালি খাদ্যাখাদ্য ও ব্যঞ্জনের বিবরণ দিয়েছেন তা প্রকৃত পানভোজনরশিক ব্যতিরেকে কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। ইংরেজিতে এ বিষয়ে একটি অতিশয় উপাদেয় লেখাও লিখেছিলেন যদ্দুর মনে পড়ে। খাবার টেবিলেও দেখেছি তিনি 'গঙ্গামনি' বলে হাঁক পাড়তে পাড়তে খাবার টেবিলে এসে বসেছেন। আর যেন জন্মজন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য রানুর রন্ধনকুশলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। পরিবেশিত প্রতিটি খাবারের গুণাগুণ বর্ণনায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত। খাবার টেবিল ছিল তাঁর কাছে এক আনন্দময় উদ্‌যাপন। আর ছিল কার্তিক ও গণেশ জানার কাছ থেকে কলেজ স্ট্রীট বইয়ের বাজারের খবরাখবরের গল্পগাছা।

সার কথা বুদ্ধদেব বসুর জীবনটাই ছিল সাহিত্যমনস্কতায় অনন্য, সফল, পরিপূর্ণ।

বুড়িগঙ্গার তীরের ঢাকা বেশ প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর। ঢাকেশ্বরী মন্দির, সাতরওজার মসজিদ, আরমানিটোলা গির্জা, হুসেনী দালান, লালবাগ দুর্গ, কালে খাঁর কামান, পর্তুগিজ ও ইসলামী স্থাপত্যের মিশ্র পদ্ধতিতে নির্মিত নওয়াব বাড়ি, কার্জন হল, আহসান মঞ্জিল, বলধা গার্ডেন প্রভৃতি উপরিল্লিখিত উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দ আগে পর্যন্ত ঢাকা শহর এতটা বিস্তৃতি লাভ করে নি। আজ মতিঝিল বা দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকার আকাশ আঁচড়া সৌধমালার সারি কিংবা কমলাপুরের অত্যাধুনিক রেল স্টেশন, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ফ্লাইওভার, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মীরপুর, নিকুঞ্জ, গুলশান, বনানী, বারিধারার আবাসিক এলাকাসমূহ বা মার্কিন স্থপতি ল্যুই কান পরিকল্পিত আলো আঁধারির মায়াজাল ঘেরা প্রাচীন দুর্গের মতো দগদগে লাল রঙের শেরে বাংলা উপনগরী বা সেকেন্ড ক্যাপিট্যাল, প্রশস্ত ও সুরম্য এয়ারপোর্ট রোড, মানিক মিয়া এভেন্যু, বিজয় সরণী, পান্থপথ, শাহবাগ এভেন্যু, গ্রীন রোড প্রভৃতি অসংখ্য রাজপথ বা লালমাটিয়া, হাজারিবাগ, মাদারটেক, রামপুরা, বসুন্ধরা, দক্ষিণখান, কুর্মিটোলা এমন কি ওল্ড ডিওএইচএস পেরিয়ে বিশাল বিস্তৃত উপনগরী উত্তরা ছাড়িয়ে তুরাগ নদীর পাড়ে টঙ্গী পর্যন্ত কিংবা পশ্চিমে আশুলিয়া ও তার আশপাশ নিয়ে এখন বৃহত্তম ঢাকা শহরের অঙ্গীভূত হয়ে মৌমাছির চাকের মতো গুঞ্জরিত।

নানারকমের বিশেষ খাদ্য দ্রব্যের সুখ্যাতি ছাড়াও পুরনো ঢাকার আর একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল শিক্ষা নগরী হিসেবে। পোগোজ স্কুল, নবকুমার ইনস্টিটিউশন, ঢাকা, জগন্নাথ ও ইডেন কলেজ, নারী শিক্ষা মন্দির আর সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রমনার বিস্তৃত শ্যামল সবুজের চার পাশে তৈরি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, কার্জন হল, বিভিন্ন ছাত্রাবাস, সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, জগন্নাথ হল, অধ্যাপক ও কর্মচারীদের জন্য বেইলি রোড মিন্টো রোডের পোড়া ইটরঙা বাড়ি ঘর। আর এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন। অবশ্য এসব বিভাগপূর্ব কালের কথা।

ঢাকাতে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের শুরু হয়েছিল কবে ? বোধ করি বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, পরিমল রায়, অমলেন্দু বসুদের আমলে। এরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তারকামণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ছান্দসিক কবি আবদুল কাদিরও এঁদের সমসাময়িক। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'প্রগতি'। তারও আগে স্কুলের ছাত্র বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় 'ক্ষণিকা'। কলকাতাকেন্দ্রিক অজিত দত্ত ছিল তাঁর ভাতৃপ্রতিম বন্ধু। নিজে যখন কলকাতার রাসবিহার এভেন্যুর ২০২ নম্বর সুপরিসর ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে এলেন তখন তিনিই বন্ধু অজিত দত্তকে তিনতলার ফ্ল্যাটে এনে তুলেছিলেন। অজিত দত্ত বা টুনু সম্পর্কে তিনি বলতেন Once he was tall and hansome. তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের জগতে ঢাকা থেকে 'প্রগতি'র প্রকাশ রীতিমত দুঃসাহসিক। তুমুল শোরগোল তুলেছিলেন সেদিন প্রগতির নবীন লেখকরা। আধুনিক বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের স্থান বোধ হয় আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। দুজনেরই এখন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কি আশ্চর্য, এই 'প্রগতি' থেকেই রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার একটি প্রধান ধারা এবং যার উৎপত্তি এই ঢাকা শহর থেকেই। কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এটা কিন্তু কম কথা নয়। বুদ্ধদেব বসুর অসংখ্য লেখায় ঢাকার পুরানা পল্টন, রমনা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বহু সজীব বর্ণনা আজও কেমন অম্লান ও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে রচিত *আমার ছেলেবেলা* এবং *আমার যৌবন*– এই দুটি গ্রন্থেও ঢাকার বহু স্মৃতিচারণা তিনি করে গেছেন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার এক দৈনিকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' এই শিরোনামে একটি অনবদ্য আন্তরিক উপলব্ধির মর্মস্পর্শী কবিতাও লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। বিগত শতকের প্রথম দশকে ১৯০৮ ইঙ্গাব্দে ৩০ নভেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ১৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি লাল হরফ দিন। ওইদিন ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লায় পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু, মা বিনয় কুমারীর ঔরসে জন্ম হলেও মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মাতৃহারা হয়ে বুদ্ধদেব নামটি অর্জন করেন। এরপর থেকে প্রতিপালিত হয়েছিলেন মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও মাতামহী স্বর্ণলতার সন্তানপ্রতিম পরিচর্যায়। আদি বাড়ি ঢাকার অদূরে মালখানগরে হলেও শৈশব-কৈশোর কেটেছে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকায়। কুমিল্লায় জন্মালেও শৈশবে নোয়াখালী থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর স্মৃতির শুরু নোয়াখালী থেকেই। তাঁর বাল্যজীবন পরিবৃত করে রাখা দাদামশাই বা 'দা' আর দিদিমা শুধু মুখেই 'মা' বলা নয় তাকে 'মা' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। অল্প বয়সেই জেনে গিয়েছিলেন তার 'আসল মা' মরে গেছেন আর বাবার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ যা হওয়ার হয়ে গেছে।

শিক্ষাদীক্ষা যা বা যতটুকু পেয়েছিলেন তার সবটুকু উৎস ছিলেন দাদামশাই। তাঁর সঙ্গে এমন এক অচ্ছেদ্য স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যার মধ্যে কোনো ফাঁকফোঁকর ছিল না। অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অল্প বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করান নি বলে। প্রয়োজনীয় যা কিছু শিক্ষা শিখিয়েছিলেন তিনিই। যার জন্য দাদামশায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী'– চাকরির সময়টুকু বাদ দিয়ে তিনি তাকেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যে যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন যার কোনো তুলনা হয় না। অষ্টপ্রহর পরমাদরের শিশু সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ফলে প্রায় বালক বুদ্ধদেব হঠাৎ একদিন একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন তাও আবার ইংরেজিতে। ইংরেজিতে কেন? এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই ইংরেজি পদ্য লেখাটাকে তিনি বিশুদ্ধ দৈব ঘটনা বলে আখ্যায়িত

করেছেন। সে সঙ্গে 'দা'র কলোনিয়েল মনোভাবের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য অন্য এক জায়গায় বলেছেন, নোয়াখালীর মেঘনার মত হতশ্রী নদী তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখেন নি। তারপরও প্রথম যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন তা এই নদীর সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তিনি আরো বলেছেন, 'প্রথম পাপটি করে ফেলার পর, আমি কবিতাকে আর ছাড়তে পারলাম না অথবা কবিতাই আর নিস্তার দিল না আমাকে– কিন্তু এরপর থেকে যা কিছু লিখি, সবই বাংলায়। কেন ইংরেজি ছেড়ে বাংলা ধরলাম সেটাও আমি বলতে পারব না– কেউ আমাকে পরামর্শ দেয় নি, বলে দেন নি বাংলায় লিখতে আর ভেবে-চিন্তে বেছে নেবার মতো বুদ্ধি যে আমার তখনো হয় নি, তা অবশ্য না বললেও চলে'।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাঁর অভ্যস্ত অনলস সৃষ্টি কাজের মধ্যেই আকস্মিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ মাত্র ৬৬ বছর বয়সে তিনি চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েন। কাকতালীয়ভাবে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতার বই বন্দীর বন্দনা প্রথম উপন্যাস *সাড়া*, প্রথম গল্পের বইও বেরিয়েছিল ১৯৩০ সালে। প্রবন্ধ অনেক লিখে থাকলেও গ্রন্থিত হয়ে বেরুতে অনেক দেরি হয়েছে। এখানে তাঁর মর্মসঙ্গিনী প্রতিভা বসু বা রানুর একটি হৃদয়স্পর্শী লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'একাদিক্রমে ১৯৩০ সালে তাঁর বাইশ বছর বয়সে ওই বিখ্যাত বই তিনটি বের হবার পর থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত একদিনের জন্যও কলম থেমে থাকে নি। যেদিন তিনি গেলেন, সেদিনও টেবিলের ওপর তার অর্ধ সমাপ্ত লেখাটি সমাপ্ত হবার আশায় পড়ে ছিল। সকালবেলা যথা নিয়মে সাড়ে ৮টার সময় স্নান করে এসে প্রাতরাশের টেবিলে বসে বলেছিলেন, সাগরবাবুর ('দেশে'র সম্পাদক সাগরময় ঘোষ) লেখাটি এবার খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমাকে। বাইরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীটা বড় সুন্দর, কে যেতে চায় এই পৃথিবী ছেড়ে' ? আরো একটি কথা বলেছিলেন, 'ধ্যাৎ যা দেখছি নিজের শ্রাদ্ধের চিঠিটা নিজেকেই লিখে যেতে হবে।' আসলে সেই সময়ে ডাক এসেছিল, অন্যান্য চিঠির মধ্যে একটা শ্রাদ্ধের চিঠিও ছিল। সেটা পড়েই এই প্রতিক্রিয়া। আমি বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন'? চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'দেখছ না, কী বিশ্রী বাংলা– ইহকাল পরকাল– একেবারেই যাচ্ছে তাই'। বুদ্ধদেব বাংলা ভাষার ব্যাপারে বিষম স্পষ্টবাদী ছিলেন। তরুণদের প্রতি, তারুণ্যের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তরুণদের মাত্রাহীনতা তাঁকে খুবই ব্যথিত করত। একবার এক লিটল ম্যাগে 'যোনি' বানানের ভুল দেখে কাগজটি প্রায় হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনি আরো অন্তত ১০ বছর বেঁচে থেকে পরিকল্পিত লেখাগুলো শেষ করে যেতে চেয়েছিলেন। শুধু তাঁর জন্যই নয়, বুদ্ধদেব ভক্তদের পক্ষেও তাঁর অকাল প্রয়াণ যেন মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। অবশ্য পরিণত বয়সে চলে গেলেও আমাদের কাছে আক্ষেপ সমানই থেকে যেত।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনে ঢাকার ভূমিকার কথা তিনি নিজেই যতবার এত জায়গায় বিশদে লিখে গেছেন যে, তার ওপর নতুন করে কিছু বলাবাহুল্য। তবে যেটুকু বলার থাকে ঢাকাকে তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসনের অধিকারী করে গেছেন। 'পুরানা পল্টন'-এর ওপর লেখাটি তো রীতিমতো ঘোর জাগানো লেখা। পরে, অনেক পরে নানা ধরনের লেখালিখি পড়তে গিয়ে টের পেয়েছি বুদ্ধদেব বসুর বিশেষত্ব কোথায়? তাঁর অননুকরণীয় ভাষাশৈলী পাঠককে শেষ অবধি টেনে নিয়ে এমন একটা বশ্যতার মধ্যে বেঁধে ফেলে, তখন মনে হয় এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায়

নেই। কী কবিতা, কী গল্প উপন্যাস, কী প্রবন্ধ অনুবাদ, স্মৃতিকথা, সব কিছুতেই তাঁর সোপার্জিত স্বাক্ষর। এক ধরনের নেশার মধ্যে পড়ে যাওয়া। তাঁকে পড়তে গেলে আর সব কিছুই বিস্বাদ লাগে। অমন ঝরঝরে তরতরে ভাষা পড়তে কি যে আরাম। ক্রিয়াপদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাঁর ভাষাকে করে তোলে স্বচ্ছ, সাবলীল ও গতিময়।

বুদ্ধদেব বসুর শতবর্ষে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কোনো অবস্থাতেই তাঁকে যেন ঢাকা ভুলে না যায়। বুদ্ধদেব বসুর ৬৬ বছর বয়ঃক্রমের মধ্যে ছাত্র জীবন ও সাহিত্য চর্চার উন্মেষের কাল থেকে শোকে দুঃখে, আনন্দ উল্লাসে, মেধার স্ফুরণ ও সহনশীলতা, সৃজনশীলতায় দীর্ঘ আট-নবছর, তাঁর ঢাকাবাসের জীবনকে স্মরণীয় করে রেখেছে। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে তাঁর ঢাকায় প্রথম আগমন। আর সর্বশেষ ১৯৩১ সালে ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে যাওয়া। এর মধ্যে কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, পুরানা পল্টন তাঁর জীবনের সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল তা তাঁর বিস্তর লেখালিখিতে সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যাতে তাঁর হাত পড়ে সমৃদ্ধ হয় নি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, অনুবাদ, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, হাতে লেখা পত্রিকা থেকে ছাপার অক্ষরের মুদ্রিত পত্রিকা, সম্পাদনা সব কিছুই তাঁর স্পর্শমণিতে ধন্য, সমুজ্জ্বল।

সব কথার সার কথা, একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিককে তাঁর জন্মতিথিতে, আর এবার তো জন্মশতবার্ষিকীর বছর তাঁর কর্মকৃতির ওপর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে হয় তাহলে সেটা যে একান্তভাবে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনাবলির সম্ভার হতে হবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর মানুষটি যখন বুদ্ধদেব বসুর মতো বহুমাত্রিক রচনার স্রষ্টা তখন এর কোনো বিকল্প হতে পারে না। সেই সঙ্গে চাই বুদ্ধদেব বসুর মতোই অক্লান্ত ভাবে নিরন্তর বুদ্ধদেবচর্চা।

১৯৭৪ সালে তাঁর চলে যাওয়ার অব্যবহিত পর ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে নীলিমা ইব্রাহিমের সম্পাদনায় পত্রিকা উত্তরাধিকারের যে বুদ্ধদেব সংখ্যাটি বেরিয়েছিল তাতে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি বাংলা দেশের কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে স্মৃতিতর্পন অর্পণ করেছিলেন তার কোনো তুলনা হয় না। এরই মধ্যে সংখ্যাটির দুষ্প্রাপ্যতাই প্রমাণ করে সংখ্যাটি গুণেমানে কতটা সমৃদ্ধ আর তথ্যবহুল ছিল। এখানে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর উল্লেখ না করলেই নয়। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি বিশ্ব-পর্যটক। বাংলা সাহিত্যে কবিদের নিয়ে তাঁর মতো সম্পন্ন আলোচনা আর কেউ করেছে কিনা আমাদের জানা নেই। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সবাইকে নিয়ে মান্নানের বিশদ বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের সম্পদ। এছাড়াও বাংলা একাডেমী থেকে বেরিয়েছে ভূঁইয়া ইকবালের *বুদ্ধদেব বসু* নামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ, মাহবুব সাদিকের *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ* এবং বিশ্বজিৎ ঘোষের *বৃদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* শীর্ষক গ্রন্থ। অবশ্য এরই সঙ্গে বেশ কিছু যেমন আমাদের কবিজ্যেষ্ঠ শামসুর রাহমান থাকলে বুদ্ধদেব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন দ্বিগুণ আনন্দের হতো।

বুদ্ধদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষর': মৃত্যু ও স্তব্ধতার কথামালা

ভীষ্মদেব চৌধুরী

ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রথম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর' জীবনানন্দ অনুরাগী সচেতন পাঠকের বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিতেও কবিতাটি জাগরূক থাকা স্বাভাবিক ও বাস্তবিক। নবীন জীবনানন্দ অসাধারণ কবিতামুহূর্তগুলো যখন সৃজন করে চলেছেন, তখন নবীনতর বুদ্ধদেবই তো ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক! আমরাও কি বিস্মৃত হতে পারি ওই অসামান্য পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ, যেখানে এক 'অনাম্নী অঙ্গনা'কে উপলক্ষ করে বিমূঢ়-বিস্ময়াহত কবির হৃদয়-খোড়া বেদনার জাগরণ ঘটে–

রয়েছি সবুজ মাঠে– ঘাসে–
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে!– সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা– আকাশেও নাই তার স্থল–
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল!
রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে!–
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে!

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থের পরিশিষ্টে জানিয়ে দিচ্ছেন 'নির্জন স্বাক্ষর' (আষাঢ় ১৩৩৬) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার 'প্রগতি' পত্রিকায়। আমরা জানি 'প্রগতি'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তুমুল যৌবনযজ্ঞের কবি বুদ্ধদেব। তাঁর *আমার যৌবন* গ্রন্থের স্তরে স্তরে এবং *মৌলিনাথ, নীলাঞ্জনের খাতা* উপন্যাসসহ আরও নানা রচনায় ঢাকার ওই কবিতানিহিত যৌবন-যাপনার কথকতা মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে। সেই বুদ্ধদেব বসুই উল্লিখিত কবিতা প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর পর ঢাকার স্মৃতিময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিণীতে যে মৃত্যুযাপিত উপন্যাসটি লিখলেন তার নামকরণ করলেন *নির্জন স্বাক্ষর* (১৯৫১)। তাঁর আরও কিছু উপন্যাস, যেমন– *ধূসর গোধূলি, রূপালি পাখি, শেষ পাণ্ডুলিপি, বিপন্ন বিস্ময়* ইত্যাদির মধ্যে জীবনানন্দীয় পদবন্ধ ও প্রতিমার দ্যুতি যে আলোক ফেলেছে, এমনটি না ভেবে উপায় থাকে না। প্রসঙ্গত চকিতে মনে পড়ে যায় শামসুর রাহমানের *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসটির কথাও। এমনকি হাসান আজিজুল হকের 'অন্তর্গত নিষাদ' গল্পটির হয়তো নাম নয়, কনটেন্ট-এর কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে ।

তবে, শুরুতেই জানিয়ে রাখি, আমার এই দ্রুতলিখনের প্রতিপাদ্য বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে জীবনানন্দের প্রভাব শনাক্তকরণ নয়। বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিপ্রতিভা, লেখককে যদি সৈনিক কল্পনা করে 'সব্যসাচী' অভিধায় ভূষিত করা যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পরে, তিনিই যে ওই অভিধার অবিকল্প যোগ্যনাম, তা বলাই বাহুল্য। তবু, লক্ষ করার বিষয়, বুদ্ধদেবের চেতনায় জীবনানন্দের কিছু কবিতার কনটেন্ট, প্রতিমা, পঙ্‌ক্তি দীর্ঘকালীন অদ্ভুত এক মানসক্রিয়ার বিষয় হয়ে থেকেছে। ওই অদ্ভুত মানসক্রিয়াই প্রলম্বিত সময়-ব্যবধানে ব্যক্তিগত জীবনের পুঞ্জিত *অভিজ্ঞতার* সংশ্লেষে *নির্জন স্বাক্ষর* নামের উপন্যাসটির জন্মকে আহ্বান করেছে বলে মনে হয়। একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর নানা কবিতার আবেশ আরেকজন সৃজনসমর্থ শিল্পীর উপন্যাসে কীভাবে শিল্পিত অনুরণন সৃষ্টি করে তার দুর্লভ দৃষ্টান্ত হতে পারে *নির্জন স্বাক্ষর* উপন্যাস। লক্ষণীয় পৌষ ১৩৪২ এবং চৈত্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বনলতা সেন' এবং 'আট বছর আগের এক দিন' (*মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) কবিতা-দুটির ভাব, প্রতিমা ও বিষয়গত নানা অনুষঙ্গ *নির্জন স্বাক্ষর* উপন্যাসের ভাঁজে ভাঁজে তুমুল আলোড়ন ও রসায়ন সৃষ্টি করেছে। অজস্র কবিতার মতোই জীবনানন্দের ওই দুটি প্রাতিস্বিক সৃষ্টি বুদ্ধদেব সম্পাদিত 'কবিতা'র পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে প্রথম। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,/ আমারে দুদ শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।' 'অতিদূর সমুদ্রের পর/ হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা/ সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,/ তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায়/ ছিলেন?'/ পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' এবং 'সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;/ থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'– এই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছের প্রতিমার গভীরে নিহিত রয়েছে যে অপার প্রাপ্তি ও আশ্রয়, সবিশেষ নারীকে উপলক্ষ করে ওই মানবীয় অর্জনের মাহাত্ম্য দীর্ঘকালব্যাপী কী অসামান্য অনুরণন তুলেছে বুদ্ধদেবের চেতনায়, তার শিল্পিত সাক্ষ্য রয়েছে *নির্জন স্বাক্ষরের* প্রতিরূপিণী নারী মালতী সেনের নীড়কল্প চোখের তারায়! অন্যদিকে 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতায় 'লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার'-যে, 'মরিবার হল তার সাধ।' কিন্তু কী ছিল না তার?–

বধূ শুয়ে ছিল পাশে– শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল– জ্যোৎস্নায়– তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয় নি ঘুম বহুকাল– লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

তবু, কবি জীবনানন্দ জানিয়ে দেন সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কথা, কূল নেই কিনার নেই সেই অপার-অকারণ বিস্ময়ের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন–

জানি– তবু জানি
নারীর হৃদয়– প্রেম– শিশু– গৃহ– নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
ক্লান্ত– ক্লান্ত করে;

লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকা ব্যক্তি, যাকে কবি চিহ্নিত করেছেন, 'তার', এই সর্বনামীয় পরিচয়ে, যার জীবনটি শেষ অবধি স্বেচ্ছানির্বাচিত মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত, তার অচরিতার্থ জীবনান্তের অনিঃশেষ বিষাদই কবিতাটির শীর্ষ সংবেদ। 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের' তার দেখা পেল না লোকটি কোনোদিন। 'দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ'-জাগানো জীবন-যাপনা স্বপ্নই থেকে গেল তার। 'উটের গ্রীবার মতো' অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা অদ্ভুত আঁধারে এখন জানিয়ে যায়– 'কোনো দিন জাগিবে না আর/ জানিবার গাঢ় বেদনার/ অবিরাম– অবিরাম ভার/ সহিবে না আর–'। '–গুমোটে/ থ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে' লাশকাটা ঘরের এই অধিবাস কি হৃদয়ভারকে লাঘব করে? কবি জানিয়ে দেন– 'তবু এ মৃতের গল্প;/– কোনো/ নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;'। তাহলে কী এই জীবনের রহস্য? 'উত্তমপুরুষ' কবি প্রবাদপ্রতিম ভাষ্যে বলেন আধুনিকতার সেই মহাসংকটের কথা। বলেন– '...এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/ খেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে/ ক্লান্ত– ক্লান্ত করে;'। 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতার মর্গে শুয়ে থাকা ওই লোকটির অপার অবসাদ ও বিপন্ন বিস্ময়ই অনুরণিত হয়েছে *নির্জন স্বাক্ষর* উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র সোমেন দত্তের জীবনকথায়, পরিণামী জীবনের শূন্যতায়।

দুই

সোমেন দত্তের ছিল এক যৌবনঋদ্ধ অতীত। সে জীবন ঢাকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের। বুদ্ধদেবেরও যৌবনের শীর্ষ সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে ঢাকায়; ঢাকার পুরানা পল্টন, রমনা, নীলক্ষেত আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মিলে তাঁর কবিতানিহিত জীবনের কথকতা বুদ্ধদেব উৎসাহী মাত্রই জানেন। শুধু কবিতাই-বা কেনো, মেধাবী ছাত্র হিসেবে নতুন জন্ম নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১) যে লিজেন্ড তৈরি করেছিলেন বুদ্ধদেব সেও তো তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলেন বুদ্ধদেব ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে, আর দু-বছরের মাথায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অর্জন করে ফেললেন পঞ্চম স্থান। আইএ পরীক্ষায় ঘটল আরো উন্নতি। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ওই পরীক্ষায় লাভ করলেন দ্বিতীয় স্থান। অতঃপর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং এমএ উভয় পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'ভালো ছাত্রে'র মডেল হয়ে রইলেন বুদ্ধদেব। ফলে এমন প্রশ্ন ওঠাই সংগত যে, তাহলে কি সোমেনের জীবনকথায় বুদ্ধদেবের আত্মজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে? প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস প্রসঙ্গে সাধারণীকৃত একটি সূত্র উল্লেখ করতে চাই। সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন যে, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কই স্বভাবে-অনুভবে ও গোত্রে অনেকটা অভিন্ন মানুষ। এরা হয় কবি, না-হয় সাহিত্যের অধ্যাপক কিংবা অনুবাদক, নতুবা বিজ্ঞাপন সংস্থার কপিরাইটার বা সচিব। এদের অনুভবময়তায় রয়েছে আশ্চর্য সাদৃশ্য। এরা কেউ কোনো ঋদ্ধ জীবনবোধে প্রাণিত নয়। ব্যতিক্রম মৌলিনাথকে বাদ দিলে, এদের জীবনে কোনো উত্তরণ ঘটে না, এরা বিষাদ-বেদনার, সুসুপ্তির কিংবা অতল তলাশ্রয়ী নির্জন

মৃত্যুলোকের অধিবাসী। শূন্যতা-নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-নির্বেদ এদের স্বধর্ম। *নির্জন স্বাক্ষরে* তাঁর আত্মজৈবনিক উপাদান নিশ্চয়ই আছে, তবে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, উপন্যাসটি ওই অর্থে তা নয়। উপন্যাসটির পরিণতি বা সোমেনের স্বেচ্ছানিয়তিই বলে দিচ্ছে সোমেন এবং তার স্রষ্টা বুদ্ধদেবের জীবন এক নয়। তবে আত্মজীবনের পুঞ্জিত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান আর জীবনানন্দীয় কবিতার আবেশের অনুরণন যে এক শৈল্পিক রসায়ন তৈরি করেছে *নির্জন স্বাক্ষর* উপন্যাসে, এমন প্রত্যয়ে পৌঁছাতেই হয়।

নির্জন স্বাক্ষর উপন্যাসের পট উন্মোচিত হয়েছে ওই অতীত থেকে অনেক দূরে, মহাযুদ্ধ ও দেশভাগ-উত্তর কলকাতায়। কার্তিকের কোনো এক শনিবারের বিকেলে এ্যাসপ্লানেডের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা 'না-যুবক না-প্রৌঢ়' সোমেনকে আমরা প্রথম দেখব। 'ইস্ত্রিভাঙা জিন্সের প্যান্ট'-পরা মুখে 'ক্লান্তির কালো'-মাখানো ট্রামের জন্য অপেক্ষমাণ জনতার একজন। পথচারী আগন্তুকের কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তরে সোমেনের মুখ থেকেই আমরা জেনে নিই তার সাম্প্রতিক ও নিকট-অতীতের চালচিত্র। যখন প্রোফেসারি ছিল, তখন সোমেন লিখত প্রচুর। কিন্তু শিক্ষকতার চাকরিতে ইতি টানতে হল তার। অধুনা বিজ্ঞাপন সংস্থার বাঁধা সময়ের চাকুরে, সেক্রেটারি; নিয়ত অসুখী স্ত্রী মীরাকে খুশি রাখার চেষ্টায় গলদঘর্ম। এখন হাতের মুঠোয় ধরা দুই পুঁটুলিতে শায়া, শেমিজ, বালিশের ওয়াড়, এবং একখানা শাড়িও। কিন্তু পয়সা খরচ করে কি শান্তি কেনা সম্ভব? ইকারুসের মতো তার 'পাখা মেলে আকাশে উড়তে ইচ্ছা করে, নীল নিষ্পাপ আকাশে; আর সত্যি-তো সে এই কারখানা-বাজার-ব্যাংক-রেডিওর চ্যাঁচামেচির খাঁচার মধ্যে বন্দী, আর তাই-তো তার কিছুই ভালো লাগে না।...না,কিছুই ভালো লাগে না; বাড়িতে না, রাস্তায় না– কোনোখানেই না।' সোমেন ভাবে সাত-আট বছর কবিতা লেখা হয় না তার। যুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অস্তিত্বের টানাপড়েন,– ভিড়ের মধ্যকার নিঃসঙ্গ পথচারী সোমেনের এইসব নানা ভাবনার গভীর থেকেই হঠাৎ ফুটে ওঠে মালতী সেনের পোর্ট্রেট।

সোমেনের নিস্তরঙ্গ জীবনে নাটক অনুপ্রবেশ করে তখনই, যখন উপন্যাসের পটে অনেকটা 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' মালতী সেনের ঘটে অভ্যুদয়। আটপৌরে, নিঃসহায় উদ্বাস্তু মালতী সেন কী অসামান্য এক মহিমায় যেন গভীর সমুদ্রে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের কাছে জেগে ওঠা সবুজ দ্বীপের মতো সোমেনের কাছে মহামূল্যে আবিষ্কৃত হয়। পাল্টে যায় সোমেনের জীবন-যাপনের ধরন, মূল্যমান, স্বপ্ন ও স্বপ্নচারিতা। কে এই মালতী সেন? কলকাতার এঁদো গলির ভাড়া করা জরাজীর্ণ একটি ঘরের বাসিন্দা সামান্যা পুত্রবতী বিধবার ওই ঐন্দ্রজালিক শক্তির উৎস কোথায়? কোন শক্তিতে এই নারী সোমেনের মতো লেখক ও ক্রমে বাঁধা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ব্যক্তির নিস্তরঙ্গ জীবনে তুফান তোলে, ওলট-পালট করে দেয় দাম্পত্যের ব্যাকরণ, আকর্ষণ করে স্বর্গীয় তপস্যার এক ইহজাগতিক সংবেদ!

তিন

ইতোমধ্যে দেশ-বিভাজন সম্পন্ন হয়েছে; সহিংস মৃত্যু ঘটেছে অহিংস গান্ধীর। সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষক্রিয়ায় পূর্ববাংলার নিরন্ন উদ্বাস্তু জনতার ঢল নেমেছে পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে। রাস্তার পাশে, পতিত জমিতে গড়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর বস্তি। মালতী সেন ওই বাস্তুহারা জনতারই একজন। সামান্য কিছু সঞ্চয় নিয়ে সপুত্র সীমান্ত

পাড়ি দিয়ে আসা মালতী চল্লিশ টাকা ভাড়া একটি ঘরের বাসিন্দা। ফল্গু ও অংশু এই দুই ছেলে নিয়ে মালতীর কষ্টের সংসার। কলকাতার এঁদো গলির ওই জরাজীর্ণ ঘরেই সোমেনের প্রাতিস্বিক আবিষ্কারে পঙ্কজের মতো ফুটে উঠল দুই পুত্রের জননী মালতী-কুসুম!

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে দেশকালের পরিপ্রেক্ষণী ততো জোরালো হয়ে ওঠে না। আর্থনীতিক বাস্তবতা, রাজনীতির কুটিল অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তির সামূহিক সংকট তাঁকে আকর্ষণ করে না, আমরা জানি। আবার ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। *তিথিডোর*-এর মধ্যস্তরে রয়েছে সংক্ষুব্ধ মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি-মজুদদারির ঘনঘটা। কিন্তু এগুলো বাহ্য। রবীন্দ্র-প্রয়াণ দিবসের বিষাদান্তিক পটভূমিকায় সত্যেন-স্বাতীর কবিতাময় জীবনই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠে। তিথিমিলনের অ্যান্টি-থিসিস রাজেনবাবুর পঞ্চেন্দ্রিয়-সচকিত সজ্ঞায় প্রভাব ফেললেও এবং মঘা-অশেশ্লষার সংকেত পরিণামে নিহিত রইলেও *তিথিডোর* বুদ্ধদেবের কবিতা-যাপনারই কথকতা। *নির্জন স্বাক্ষরেও* রয়েছে পূর্বে উল্লিখিত দেশকালগত পরিপ্রেক্ষণী। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে একদিকে সোমেনের চেতনায় বনলতা সেনেরই প্রতিরূপিণী হয়ে উঠল মালতী সেন, অন্যদিকে কর্তব্যবিমূঢ় সোমেন 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা' করা বিস্ময় ও অনন্যোপায় বিষাদের সংঘর্ষে উদ্‌যাপিত ইচ্ছামৃত্যুর নিয়তিকেই বেছে নিতে বাধ্য হল। ফলত, সমষ্টি নয়, ব্যষ্টির উপায়হীন সংকট এবং পরিত্রাণহীন-প্রতিকারহীন শূন্যতাই উপন্যাসে 'নির্জন স্বাক্ষর' হয়ে রইল।

সোমেনের সহপাঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম সেনের বিধবা স্ত্রী মালতী সেন। গৌতম ছুটিতে কলকাতায় এলে সোমেনের সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা করেছে, যেতেও বলেছে ঢাকায়। বলেছে : নীলক্ষেতে বাড়ি পেয়েছি, ডক্টর সাহা যেটায় ছিলেন— মনে আছে? মনে আছে। নীলক্ষেতের আকাশখোলা বাগানওলা বাংলোর বাসিন্দা হওয়াই তো তাদের ছাত্রজীবনের চরম উচ্চাশা ছিল। তা গেলে হয় একবার। কিন্তু হয়নি অবশ্য, যাওয়া হয়নি; আর কার মুখে যেন হঠাৎ একদিন শুনেছিল গৌতম সেন মারা গেছে।' জানা যাচ্ছে, মালতী অপরিচিত নয় সোমেনের কাছে। কলকাতার এঁদো গলিতে মালতীর ভাড়া করা জীর্ণ ঘরের তাকে 'মালতী ও গৌতম সেন নাম লিখে' বিয়েতে উপহার দেওয়া নিজের লেখা বইও দেখেছে সোমেন। কিন্তু পূর্ব-পরিচয় নতুন আবিষ্কারের কোনো সূত্র রচনা করেনি এ উপন্যাসে। গৌতমের মৃত্যুর 'আট বছর' পরে কলকাতায় এই নিরুপায় সাক্ষাৎ মালতীর দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল গানের শিক্ষয়িত্রীর একটা কাজ খুঁজে দিতে সোমেনকে অনুরোধ মাত্র। সোমেন ভাবে— 'এই কলকাতায়— যুদ্ধের পরের, বাংলাদেশ ভাগ হবার পরের চরিত্রহীন কলকাতায়— সে কি পারবে যুঝতে ? এখনো তার মুখে মফস্বলের শ্যাওলা মোছেনি; এখনো সে ভিতু-ভিতু, বাধো-বাধো; এখনো সে নিচু গলায় কথা বলে। সেজন্যই ভালো লাগে।' নতুন সংযোগে এই ভালোলাগাই সোমেনের চেতনায় ক্রমে ক্রমে নতুন আবিষ্কারের বীজ বপন করে দেয়।

মুখ্যত আত্মকথন ও ডায়েরির আঙ্গিকে গড়ে ওঠা এ উপন্যাস সোমেনেরই আত্মহননের কথকতা। আপাতভাবে মনে হবে, মালতী সেন বুঝি উপন্যাসটির সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। ছকবাঁধা উপন্যাসের নিরিখে মালতীকে নিষ্ক্রিয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মালতীর নিষ্ক্রিয়তাই সোমেনের চেতনায় তুফান তুলেছে। নিষ্ক্রিয়তার এমন সচল প্রতিক্রিয়া উপন্যাসটির ভিন্নমাত্রার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকাংশে। নিষ্ক্রিয়তার

ওই প্রতিক্রিয়াতেই সোমেনের নিদ্রিত কবিসত্তারও জাগরণ ঘটেছে ক্রমে ক্রমে। রিলকের চিঠিপত্র ও জীবনকথা আচ্ছন্ন করে রাখে তাঁর চেতনা। বোধের গভীর থেকে উঠে আসেন এজরা পাউন্ড। শুরু হয়ে যায় কবিতা ও জীবনের খেলা।

ইতোমধ্যে মালতীর গচ্ছিত আটশ' টাকা সমেত ফেল করে গণেশ ব্যাংক। স্ত্রী মীরার 'নির্ভুল ইনস্টিংক্ট' উপেক্ষা করে সোমেন গোপন করে মালতীর সঙ্গে তার পুনর্সাক্ষাতের কথা। যাদবপুর ছাড়িয়ে দক্ষিণে 'ঘুঘুডাঙা'য় পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'গান্ধীগ্রাম' নাম দিয়ে পূর্ববাংলার রিফিউজিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। প্লট বন্দোবস্ত আর বরাদ্দের উৎসব চলছে সেখানে। মীরার দাদা শ্রীপতি বাবু চারটি প্লট বাগিয়ে নিয়েছেন। পাঁচ'শ টাকা সেলামিতে মীরার জন্যও ব্যবস্থা হয়েছে একটি কর্নার প্লস্নটের। মীরার কাছে মালতী সেনের জন্য এক খণ্ড জমি সংগ্রহের তদবির করেও ব্যর্থ হতে হয় সোমেনকে। মীরার প্রস্তাবিত প্লটে গড়ে উঠবে যে মেটো ঘর, সেখানে মালতীর থাকার প্রস্তাবটিও নাকচ করে দেয় মীরা। বলে– 'যুদ্ধ গেলো, দাঙ্গা গেলো, এবার রিফিউজির ঠেলা! কলকাতা থই-থই! আর কি জায়গা নেই বাংলাদেশে?' উত্তরে সোমেন বলে– 'বাংলাদেশ তো আর নেই। এখন তো পশ্চিমবঙ্গ।' মীরা বলে : 'আমরা যারা পূর্ববঙ্গের, আমরা সকলেই রিফিউজি।... দ্যাখো গিয়ে কারা সব জমি নিয়েছে ওখানে! ... ব্যারিস্টার, ডিস্ট্রিক্ট জজ, এঞ্জিনিয়ার। কত মোটর জিপ দাঁড়াচ্ছে দু-বেলা।' অন্য একদিন সোমেন বলে, 'আমরা কি রিফিউজি?' নিবিড় নিচু গলায় মীরা উত্তর দেয়– 'কেনো নই? তোমার দেশ ঢাকায় না?...দেশ তো ঢাকায়। পাকিস্তানে। তার মানে– তুমিও একজন পাকিস্তানি বাস্তুহারা।'

আর এক দিন 'শেষের কথাটায় একটানে কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজ তুলে' মীরা সাফ বলে দেয়– 'ফেলে দাও বই; মাটি খোঁড়ো মাথা খোঁড়ো, গলায় রক্ত তোলো– যেখান থেকে পারো, যেমন করে পারো, নিয়ে এসো টাকা! টাকা আমার চা-ই!' 'অস্বাভাবিক মোটা গলায় সোমেন নিজেকে বলতে শুনলো, 'আমি পারবো না'।' ফলে ঘরে স্তব্ধতা নামে; 'অদ্ভুত এই স্তব্ধতা : ব্যাপ্ত, অব্যবহিত, গভীর।'–

'সব শব্দ লুপ্ত হয়, ফুরায় এ-পৃথিবীর সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

'কে বনলতা সেন? কেউ না। যদি সে কেউ হতো, তবে সে কবিতা হতো না।'–সোমেনের ভাবনা এবং স্রষ্টা বুদ্ধদেবের জীবনানন্দীয় সংবেদনা একীভূত হয়ে যায় এভাবেই। আর এর মধ্য দিয়েই মালতী সেনের অনুষঙ্গে বনলতা সনের আদল উপন্যাসের গভীর থেকে জায়মান হয়ে ওঠে।

মীরার জমির পাঁচশ' টাকা জোগান দেওয়ার দায় বর্তায় শেষ পর্যন্ত সোমেনেরই ওপর। অন্যদিকে আসামে ছোট বোনের বিয়ে উপলক্ষে সঞ্চিত গয়না বিক্রির দায়িত্বটি মালতীর কাছ থেকে নিতে হয় সোমেনকে। পরিণাম না ভেবে জমির টাকা সংগ্রহে ব্যর্থ সোমেন মালতীর গয়না বিক্রির পাঁচশ' টাকা বাধ্য হয়েই মীরার হাতে তুলে দেয়। এরপর থেকেই শুরু হয় সোমেনের অন্তর্গত টানাপড়েন। 'কালো চামড়ার বাঁধানো খাতা'য় নানা বিরতিতে লেখা হয়ে চলে ওই বিপন্নতার, অন্তর্গত টানাপড়েনের এবং 'হৃদয়বৃন্তে' ফুটে ওঠা মালতীর কথা ও কবিতা। ফিল্মের গল্প লেখার লোভনীয় প্রস্তাব পায় সোমেন। নষ্ট হওয়ার নানা প্রলোভন ফাঁদ; লেখকসত্তার আত্মবিনাশের রসদ। ফিল্মি গল্পের নামজাদা লেখক হিসেবে পকেটভর্তি টাকার স্বপ্নেও আচ্ছন্ন হয় কখনো।

খরচের হিসেবও আগাম মনে মনে কষে নেয়। মীরাকে লুকিয়ে বিপন্ন মালতীর জন্যও বরাদ্দ থাকে কিছু। আবার এও ভাবে– 'কতটুকু চেনো তুমি তাকে? কী জানো তার কথা? আত্মীয়স্বজন আছে না তার?– তারা দেখবে। আর দেখুক বা না দেখুক, তাতে তোমার তো কিছু না!' আবার শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্কথা। হৃদয়মূল থেকেই উঠে আসে উত্তর : 'আমি যে তাকে দেখেছি। আমি যে তার চোখের বিষণ্ণতা দেখেছি।... মালতী সেনকে আমি বাঁচাবো।' মীরার চোখ এড়িয়ে মালতীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে সোমেন। 'কেমন আছেন?'– প্রশ্ন করলে মালতীর নিরুত্তর চাহনিতে সোমেন ভাবে,– 'জবাব দিতে হয় না, লক্ষ কোটি মুখে-মুখে নিত্যবলা এমন মামুলি আর কোনো কথা, যখন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলছে সে কেমন আছেন?' আর এতেই 'কবিতার আঘাতে' কেঁপে ওঠে সমগ্র সোমেন। তার চেতনায় বনলতা সেনের প্রতিরূপিণী হয়ে ওঠে সাময়িক রোগক্লান্ত মালতী সেন। যেমন :

> '... কেনো, কিসের আকর্ষণে? কথা না , হাসি না, সুখের এতটুকু হাওয়া সেখানে বয় না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে, কখনো জল খেতে মাথা তোলে, দু-একটা কথা হয়তো এক-আধবার। কিন্তু এ-ই তো অনেক, এর বেশি আর কী চাই আমার? যখন পাশ ফিরে থাকে, তখনো তো চুলের তলায় গালের বাঁকা রেখাটুকু দেখতে পাই। আর-কিছু না, আর-কিছু মনে হয় যেন বড্ড বেশি; শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কাটাতে পারি।'
>
> 'সুন্দরী নয়, কোনো অর্থেই দেখতে কিছু ভালো না। কিন্তু আমার চোখে সুন্দর। গভীর তার চোখ, মায়াবী তার চুল, তার ঠোঁটে অস্ফুট হাসির তুলনা নেই। সবাই যা দ্যাখে আমিও তাই দেখি; আমি যা দেখি আর-কেউ তা দ্যাখে না। কী এই রহস্য? কিসের এই শক্তি যা আমাকে এই দিব্য চোখ দিলো? তারই নাম ভালোবাসা।'

অতঃপর 'কালো চামড়ার বাঁধানো খাতা'য় লেখা হতে থাকে বিপন্ন উপলব্ধিমালার নির্যাস। আত্মসংকটের এই পর্যায় থেকেই সোমেনের চৈতন্যে বদ্ধমূল হয়ে যান আর এক কবি, আর্তুর র‍্যাবোর ভাষায় 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'– শার্ল বোদলেয়ার।

চার

১৯৬১-এর জানুয়ারিতে বুদ্ধদেবের সম্মোহনী অনুবাদ ও দীর্ঘ অসামান্য ভূমিকা-সমেত প্রকাশিত হয়েছিল *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* নামের সেই বই, যা পাল্টে দিয়েছিল সমকালীন বাংলা কবিতার ধরন ও ধারা। ওই অনুবাদকর্মের সূচনা যে হয়েছিল অন্তত দশ বছর আগে, *নির্জন স্বাক্ষর* সৃজনপর্বের সমকালে, উপন্যাসটিতে এর সাক্ষ্য বর্তমান। আত্মসংকটের চরম স্তরে ভাসমান সোমেন অনুবাদ করে ফেলে সেই অসামান্য কবিতাটি–

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার–
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।
ছড়ায় সে আমার জীবনে
লবণাক্ত বাতাসের ধার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে
সংগোপনে, কোন ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে;–
কেমনে, অজ্ঞেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের অন্তরে আমার!

সে উত্তমা, সুন্দরীতমারে–
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার–
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার![১]

---

[1] বুদ্ধদেব বসুর *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* গ্রন্থের 'আরো কবিতা' অংশে অনূদিত এ-কবিতার সামান্য পরিবর্তিত রূপ 'স্তোত্র' নামে মুদ্রিত হয়েছে। 'স্তোত্র' কবিতার পাঠ নিম্নরূপ :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;
সংগোপনে, কোন ভুলে-যাওয়া

ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে।
কেমনে, অজ্ঞেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের গহ্বরে আমার!

সে উত্তমা, সুন্দরীতমারে,
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

কবিতাটি অনুবাদের সময় সোমেনের যে ভাবনা, তাতে মূর্ত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর প্রাতিস্বিক অনুবাদতত্ত্বও। বাঁধাই করা খাতায় সোমেন লিখেছে– 'আমি, আমিও আজ স্বাদ নিলাম, সন্ধে থেকে বসে- বসে এতক্ষণ, পরোক্ষে, পরের মুখে, তবু সন্দেহ নেই অমৃতেরই আস্বাদ।... পড়ে আর তৃপ্তি হয় না যখন বার-বার আবৃত্তি করেও মনের তাপ মিটতে চায় না, অথচ ঠিক স্বাধীনতারও সাহস নেই, তখনই অনুবাদের লগ্ন;– এমন কবিতা, যা আমার মনের কোনো-এক আশ্চর্য নীরবতায় আশ্চর্যতর সুর তোলে, যেন আর-একটু হলে আমিই লিখতাম, কেমন করে না লিখে পেরে-ছিলাম তা-ই ভেবে অবাক লাগে প্রায়, আর লিখিনি বলে অনন্ত-কালের আক্ষেপ জুড়োবে না মনে হয়– তেমনি কোনো হঠাৎ-পাওয়া অন্য ভাষার কবিতা, তাকে যদি নিজের, তাকে যদি নিজের ভাষায় মনমতো গড়তে পারি– তবে তাকে পাওয়া আমার পূর্ণ হলো, কবিতাটি আমার হ'লো এতক্ষণে– অন্তত এই অর্থে আমার যে রচনার পরিশ্রমের মূল্যে আমি তাকে উপার্জন করলাম...হয়তো-শুধু তাকেই নয়... হয়তো ... কবিতাকেও– কবিতাকেই।' কবিতাকে হয়তো উপার্জন করে ফেলে সোমেন কিন্তু মালতীর গয়না বিক্রির অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য কোনোভাবেই অর্জন করতে পারে না সে। ফিল্মের গল্প লেখার প্রলোভনের ফাঁদে পা রেখে অনেক অনেক রাত জেগে যে লেখা তৈরি করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা পণ্ডশ্রমই হয়। 'ক্যালকাটা পিকচার্সে'র সাথে কথা বলে বুঝল পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারটি নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি ভার নেমে যায় সোমেনের। কিন্তু মালতীর দেনার পাষাণভার কোথায় সরাবে সে? কোথায় শান্তি, কোথায় আশ্বাস, জীবনীশক্তি? কাঁকুলিয়ার এঁদো গলিতেও লোকনিন্দা ঝড় তুলতে প্রস্তত। 'না, ভালো দেখায় না। সন্ধেবেলা যে আসে তাকে ভালো দেখায় না। শেষ পর্যন্ত আমি তার এই করলাম!'– এ অনন্যোপায় অবস্থায় একমাত্র নিশ্ছিদ্র ঘুমই প্রশমিত করতে পারে সোমেনের পাষাণভার। সোমেন প্রার্থনা করে সুসুপ্তির। এই প্রার্থনাই চিত্ররূপময় হয়ে ওঠে ঘুমের প্রতিমায়। বুদ্ধদেব বসুর অননুকরণীয় ঔপন্যাসিক ভাষারও আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে, এই অংশটি : 'টলে পড়ে গেলো বিছানায় : ঘুম, ঘুম, ঘুমুবে। ভুলে যাও, ভুলে থাকো, সব ভুলে যাও; ... আর মালতী সেনের মায়াবী করুণ ঠোঁটের রেখা তাও, তাও ভোলো, সব ভোলো। বিমাতার মতো দিন, জেগে-জেগে খরচ হবার জীবন, তার মুঠি থেকে কত ভাগ্যে আমরা মায়ের কোলে খসে পড়ি,– আদিম মাতা, তমস্বিনী, প্রাণিনী, দৃষ্টিহীনা, তৃপ্তির চেতনাতীত আধার– ফিরে যাই নীল নির্জন মাতৃযোনিতে, উৎসে, সেই অনাক্রমণীয় অন্ধকারে, যেখানে আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সত্তার বুভুক্ষিত উৎপীড়ন যে-অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না।'

কিন্তু নিদ্রারও পরিশেষ আছে। আবার জাগরণ, আবারও পাষাণভার! ফলত অবিকল্প মৃত্যুর দার্শনিকতায় উপনীত হয় সোমেন। ভাবে : '... কাকে বলে বাঁচা? বাঁচছো এই কথাটাই ভুল, প্রতি মুহূর্তে মরছো জানো না, জানো না সেই তিলে-তিলে মরে যাওয়ার সমাপ্তিরই নাম দিয়েছো মৃত্যু? জন্মের মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু বসে আছে তোমার মধ্যে, দিনে-দিনে বাড়ছে, ফুটে উঠছে– স্ফীত-হওয়া ধমনীতে, শ্লথ হওয়া হৃৎপিণ্ডে– ফলিয়ে তুলছে পরিপক্ক ফল;– তাকে এড়াও, ঠকাও, যতদিন পারো ঠকিয়ে রাখো– জানো না এই চতুর খেলারই নাম দিয়েছো বাঁচা, বেঁচে থাকা, জীবন? কিন্তু সত্যি যদি ঠেকাতে চাও তবে তো তোমায় ডাকতে হয় তাকেই, বেরিয়ে প'ড়ে খুঁজতে হয় তাকে, ছুটতে হয় তোমাকেই তার পিছনে;– যদি কোনোরকমে তাকে ধরে ফেলতে পারো, তবে তো তখনই তার কাজ থামলো, আর তো মরে যাওয়া নেই, নেই তিলে

তিলে হারিয়ে ফেলা, ফুরিয়ে যাওয়া;– আর তুমি খরচ হবে না, শুধু মৃত্যুতেই আর তোমাকে খরচ হতে হবে না।' ফলে আট বছর আগের একদিন কবিতার 'তার' মতোই স্ত্রী মীরা এবং পুত্র-কন্যা বান্টি আর বুলবুলকে নিয়ে গড়ে ওঠা সংসার শূন্য হয়ে যায় সোমেনের ঘুণে ধরা চেতনায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরোত্তর মানুষের অনির্ণেয় মহা-সংকটের শূন্যতার তামসী-গহ্বর গ্রাস করে তাকে। আত্মহননের বিকল্পহীন সিদ্ধান্তেপৌঁছে যায় সে। তবে, দড়ির গাছা কিংবা অশ্বত্থ গাছের আশ্রয় নয়, মধ্যবর্তী মহাযুদ্ধের সময়-ব্যবধান মৃত্যু-যাপনার ধরনকেও পাল্টে দিয়েছে ইতোমধ্যে। সোমেন বেছে নেয় পরিশীলিত মৃত্যু-যাপনার এক অভিনব উপায়। মীরা, বুলবুল আর বান্টির আসানসোলে বেড়াতে যাওয়াকে নিরাপদ সুযোগ বলেই মনে হয় সোমেনের। নেমে পড়ে ফুটপাতে। ফুটপাত ধরে একের পর এক চেনা ও অচেনা ওষুধের দোকান থেকে বিচিত্র কৌশলে নানা ব্র্যান্ডের ঘুমের-বড়ি সংগ্রহ করে নেয় সোমেন। ভাবে, 'ঘুম, ঘুম, ঘুমের গন্ধমাদন নিয়ে যাবে আজ।' এলোমেলো আরো নানা কথার ঝিলিক খেলে যায় ভাবনায়, চেতনায়। '... কেন, কেন, কেন তার দেখা হলো আমার সঙ্গে, কেন আমি কখনো তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, কেন আমি চিৎকার করে কাঁদতে পারি না?' অবশেষে বাড়ি ফেরে সোমেন। অতঃপর মেতে ওঠে আত্মবিনাশের উৎসবে। সোমেনের মৃত্যুযাপনার মহামুহূর্তকে কবিতাস্নিগ্ধ বিশেষিত গদ্যে আকার দিয়েছেন বুদ্ধদেব এভাবে–

> উঠে দাঁড়ালো, গেলাশ তুললো ঠোঁটের কাছে। একটু কাঁপলো হাত, নামিয়ে রাখলো। এক হাতে টেবিলটাকে চেপে ধরে অন্য হাতে আবার তুললো, চুমুক দিলো লাল রঙের জলে। মিষ্টি– তেতো– বিশ্রী কিন্তু ঠোঁট থেকে নামালো না, আর-একটু ... একটু... শেষ। গ্লাস নামিয়ে বিছানায় শুতে গেলো, কিন্তু দুরন্ত হাওয়া উঠলো হঠাৎ, পৃথিবীর সব হাওয়া একসঙ্গে, শোঁ-ও-ও বয়ে গেলো কানের মধ্যে, ঝড়, তুফান, ঢেউ– সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্র, পৃথিবীর সব সমুদ্র আর সমস্ত হাওয়া একসঙ্গে উদ্দাম ঝাঁপিয়ে পড়লো, নিয়ে চললো প্রচণ্ড বেগে তাকে ভাসিয়ে। সোমেন বিছানায় পৌঁছতে পারলো না, তার আগেই মেঝের উপর পড়ে গেলো।

সোমেনের কথকতা এখানেই শেষ, এবং উপন্যাসেরও শেষ হতে পারতো এখানেই। কিন্তু বুদ্ধদেব প্রখর নীরবতার পরিচর্যায় দুই নারীর শূন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে মুখর করে তুললেন উপান্তে। মৃত্যু-নাটকের যবনিকার পর মীরা ও মালতী সেন, এই দুই নারীকে মুখোমুখি বসিয়ে দিলেন এপাশে-ওপাশে। মীরাই প্রথম চোখ তুলে তাকায় মালতীর দিকে– 'এই সেই মুখ, শুধু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারতো– সে। দ্যাখো সেই মুখ তোমার সামনে, মন দিয়ে দ্যাখো, আবিষ্কার করো কী আছে ওখানে, কোন সুখ, শান্তি, কোন আশ্চর্য আশ্রয়।' আবার ভাবে– 'এ-ই মালতী সেন যার কাছে একটুখানি শান্তি পেয়েছিলো– সে। ভালোবেসেছিলো। তাকে ভালোবেসেছিলো মালতী? কিন্তু কেমন, এ কেমন তোমাদের ভালোবাসা– তাও বাঁচাতে পারলো না, তুমিও তাকে বাঁচাতে পারলে না, মালতী সেন!' মীরা মালতীর হাতে তুলে দেয় ফিরিয়ে আনা গয়নার 'কালো বাক্স' এবং 'কালো চামড়ার বাঁধানো খাতা', যেখানে দিনলিপি আকারে লেখা আছে সোমেন-মালতী আখ্যানের বিশদ, সোমেনের অন্তর্গত বিষাদ, বিস্ময় ও বিপন্নতার পুঞ্জিত অনুভব ও আখ্যান। মালতী উঠতে চায়, কিন্তু মীরার নিষেধে ওঠা হয় না তার। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে মীরা-মালতীর নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতাকে এক প্রগাঢ় ইশারায় বহুমুখী করে তুললেন বুদ্ধদেব–

'অনেকক্ষণ বসে থাকলো দুজনে, দুজন মেয়ে, চুপ করে অনেকক্ষণ মীরার চোখ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল নামলো নিঃশব্দে, দুই চোখ জলে ভরে গেলো মালতীর। কান্না থামলো, কিন্তু কেউ উঠলো না। বেলা বাড়লো রোদ সরে গেলো, কিন্তু কেউ উঠলো না। কোনো কথাও বললো না, কেই তাকালো না কারো দিকে, শুধু নিঃশব্দে বসে থাকলো দুজনে, যেন একজনের অন্য জন ছাড়া এখন আর কেউ নেই।'

পরিশেষ

নির্জন স্বাক্ষর কবিতাস্নিগ্ধ উপন্যাস এবং কবিরই লেখা উপন্যাস। বুদ্ধদেব বসুর ঔপন্যাসিক পরিচয় গৌণ নয়, লিখেছেনও অনেক। সব হয়তো তুল্যমূল্যে সমান নয়। তবু, মুখ্য পরিচয় কবি বলেই *নির্জন স্বাক্ষরের* মতো উপন্যাস সৃজন সম্ভব হয়েছে তাঁর। বুদ্ধদেবের ঔপন্যাসিক ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এ উপন্যাস। হয়তো *মৌলিনাথের* দাবিও প্রসঙ্গত উঠবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, মৌলির যে উত্তরণ ঘটেছে উপন্যাসের শেষে তা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে মেলে না এবং তাঁর জীবনবোধের সঙ্গেও খাপ খায় না। বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে প্রধানত আধুনিক মানুষের বোধের, বিশ্বাসের সংকট এবং উপায়হীন বিষাদ ও বিমূঢ় বিপন্নতার কথাকে শিল্পিত করেছেন। এজন্যেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই মূলত একটি বৃহৎ উপন্যাসের অংশ হয়ে উঠেছে। নামে, অবয়বে ভিন্ন হলেও, স্বভাবে-অনুভবে, চলনে-বলনে, কাজে ও পেশায় তাঁর নায়কেরা প্রায় অভিন্ন। এই অভিন্নতা বুদ্ধদেবের স্বকীয়তাও। নিজের একান্ত অভিজ্ঞতার জগৎ বুদ্ধদেব অতিক্রম করে যান না কখনো। *নির্জন স্বাক্ষর* উপন্যাসে নিজের ওই কবিতানিষ্ঠ জীবন ও বোধই ছায়া ফেলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক মানুষের সংকট, তার আস্থাহীনতা ও বিশ্বাসহীনতা। বর্তমান লিখনের সূচনায় উল্লিখিত জীবনানন্দ দাশের ওই দুটি ভিন্নমুখী ভাবধারার কবিতা, আস্থা এবং অনাস্থার সংবেদ ও প্রতিমা, তাঁর চৈতন্যে যে প্রতীতি সৃষ্টি করেছিল দীর্ঘকাল ধরে, *নির্জন স্বাক্ষরে* আধুনিক জীবনের শতমুখ সংকটের কথামালায় তারই শিল্পিত অনুরণন লক্ষণীয় হয়ে উঠল। কবিতার সংকেত ও প্রতিমা উপন্যস্ত (novelize) হওয়ার এক অসামান্য শিল্পসাক্ষ্য *নির্জন স্বাক্ষর*।

বুদ্ধদেব বসুর গল্প : রোমান্টিক চেতনার চালচিত্র

মহি মুহাম্মদ

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এক অবিস্মরণীয় নাম। আধুনিক ছোটগল্পের ধারায় তাঁর অবদান মানতেই হয়। শুধু গল্পে নয়, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণকাহিনী রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। সমকালে তাঁর মতো ঋদ্ধ কথকবিদ, সাহিত্যসমালোচক বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি নিজেই শুধু রচনা করেননি, বাঙালি পাঠকের কাছে অন্যান্য সাহিত্যিকদেরও তুলে ধরেছেন। সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলের নাম বুদ্ধদেব বসু। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৯১৯) বাঙালি সমাজের সুললিত আধুনিক গদ্য ভাষ্যকার বুদ্ধদেব বসু। যুদ্ধ-পরবর্তী জীবনের হতাশা, বিবমিষা, স্বপ্ন, প্রেম-ভালোবাসা ও বেদনার যথার্থ চিত্রায়ন ঘটেছে তাঁর রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) বিশাল সাহিত্য সম্ভারের কাছাকাছি তাঁর সৃষ্টিকর্ম। চুয়াল্লিশটি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণকাহিনী।

কবির গদ্য ও গদ্যকারের গদ্যের স্বাদে ভিন্নতা বিদ্যমান। কবির গদ্যে আত্মভাব নিহিত থাকে। সেই গদ্যে গীতিময়তা, সুর-লহরি বীণার ঝংকারে ঝংকৃত হয়। বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন আরেক বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর একটি গল্পের প্রারম্ভ লক্ষ করি।

> মাঠের ঘাসের ভিতর শালিখের কোলাহল যেন দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ করে দিনের মাঝখানেই কেমন যেন দিন ফুরিয়ে গেল— কার্তিকের দিন (?) না জানি কোন চিন্তা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম দেখিনি আমি কিন্তু তবুও মনে হলে কাকের করুণ পাখার সঙ্গে সঙ্গে এই কিছুক্ষণ আগেই যেন সে চলে গেলে কোন দূর ফিরোজা কিনার দিয়ে জাফরান রঙের ডানা বাড়িয়ে হীরকের মতো ঝলমল পিছল নদীর জলকে বেতের ফলের মতো নীল নিস্তব্ধ করে দিয়ে কার্তিকের দিন, দিনের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল।[১]

এরকম উদাহরণ আরো দু'চার দশটা উপস্থাপন করা কঠিন নয়। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের চরিত্রগুলো নিঃসঙ্গ ব-দ্বীপের মতো। তারা নিজেরাই নিজের মধ্যে প্রোথিত। আত্মবিচ্ছিন্ন ও আত্মীয় বিচ্ছিন্ন চরিত্রসমূহ যেন বুদ্ধদেবের জীবনের জলছবি। আর বুদ্ধদেবও জন্মের পর মাকে হারিয়েছেন। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত বুদ্ধদেব মানুষ হয়েছেন মাতামহের কাছে। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের একাকিত্বের অনুভূতি তাঁর নিঃসঙ্গতার অনুরণন তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহের মানস গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

এই আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু গবেষক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প* গ্রন্থ থেকে গল্পগুলো নির্বাচিত হয়েছে। যেসব গল্প এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো— 'রজনী হ'লো উতলা', 'এমিলায়ার প্রেম', 'আমরা তিনজন', 'সুপ্রতিম মিত্র', 'মা-বোন-ভাই', 'একটি লাল গোলাপ', 'একটি কি দুটি পাখি', 'জয়জয়ন্তী', 'একটি লাল গোলাপ', 'তুমি কেমন

আছো', ও 'আবছায়া'। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলো হলো— *অভিনয় অভিনয় নয়* (১৯৩০), *রেখাচিত্র* (১৯৩১), *এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে* (১৯৩২), *অদৃশ্য শত্রু* (১৯৩৩), *মিসেস গুপ্ত* (১৯৩৪), *প্রেমের বিচিত্র গতি* (১৯৩৪), *শ্বেতপত্র* (১৯৩৪), *অসামান্য মেয়ে* (১৯৩৪), *ঘরেতে ভ্রমর এলো* (১৯৩৫), *নতুন নেশ* (১৯৩৬), *ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৪১), *খাতার শেষ পাতা* (১৯৪৩), *হাওয়া বদল* (১৯৪৪), *একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা* (১৯৪৫), *একটি কি দুটি পাখী* (১৯৪৬), *চারদৃশ্য* (১৩৬২ ব.) *একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু* (১৯৬০), *হৃদয়ের জাগরণ* (১৩৬৮ ব.), *প্রেমপত্র* (১৯৭২) ইত্যাদি। বুদ্ধবেদ বসু তরুণ বয়সেই কবিতার পাশাপাশি গল্প লিখতে শুরু করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে একটি গল্প 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'রজনী হ'লো উতলা।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে লিখেছেন,

> বুদ্ধদেবকে দেখি প্রথম কল্লোল অফিসে। ছোটখাটো মানুষটি খুব সিগারেট খায় আর মুক্ত মনে হাসে। হাসে সংসারের বাইরে দাঁড়িয়ে কোনো বিধি বাঁধা নেই। তাই এক নিশ্বাসেই মিশে যেতে পারল 'কল্লোলের' সঙ্গে এক— কালস্রোতে! চোখে মুখে তার যে একটি সলজ্জতার ভাব সেটি তার অন্তরের পবিত্রতার ছায়া, অকপট স্ফটিক স্বচ্ছতা! বড় ভাল লাগল বুদ্ধদেবকে। তার অনতিবর্ধ শরীরে কোথায় যেন একটা বজ্রকঠোর দার্ঢ্য লেখা রয়েছে, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, অপ্রমেয় অধ্যবসায়। যখন শুনলাম ভবানীপুরেই উঠেছে, এক সঙ্গে এক বাস-এ ফিরবো, তখন মনে মনে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। বল্লাম, "গল্প লেখা আছে আপনার কাছে?"[২]

এই গল্পটিই ছিল 'রজনী হ'লো উতলা' প্রকাশের পর গল্পটি চারদিকে হৈ-চৈ ফেলে দেয়। যৌনতায় ছোয়ায় অভিষিক্ত গল্পটি নিন্দার ঝড় তোলে। বুদ্ধদেব সানন্দচিত্তে সবকিছু গ্রহণ করেন। এরপর তিনি গল্প রচনায় আরো বেশি নিবিষ্ট হন। বলা হয়ে থাকে, D. H. Lawrence এবং Aldous Huxleyর ভাবনায় বুদ্ধদেব উদ্বোধিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নগ্ন সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠরূপকার, পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Michel angelo-র সৃষ্টির সৌন্দর্য লোকে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'রজনী হ'লো উতলা' গল্পে নায়ক আত্মজৈবনিক উপাদানে গড়ে তুলেছে তার ভুবন। নায়কের যে উপলব্ধি তা গল্পকারের ব্যক্তিচেতনারই শিল্পীতে প্রতিভাস। নায়কের একাকিত্ব গল্পচ্ছলে প্রকাশ পেয়েছে। যৌবন ধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে যে নারীর সৌন্দর্যে মশগুল। রমণীর সামান্য চাহনি, হাসি, চুড়ির রিনিঝিনি এমনকি একটু আঁচলের খসখস আওয়াজ তার জীবনকে অন্ধভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। নায়কের অতীত স্মৃতি-মুগ্ধতার কাহিনীই এ গল্পের মূল বিষয়। গল্পের শেষে দুটি চরিত্রের বিচ্ছিন্নতা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। আবার গল্পের পরিণতিতে লেখক একটু ভিন্ন ইংগিত দেন– "আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।"[৩]

অন্ধকারের কাহিনী নায়ক নীলিমাকে শুনিয়েছে। সেই অন্ধকারের পাদপ্রদীপ থেকে নীলিমা কি আলোতে এসে পৌঁছলো? নাকি অন্ধকারের? এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা মনে থেকে যায়। সম্পূর্ণ গল্পটিতে একটি সুরের আবহ বেষ্টিত ছিল। গল্পের শুরুটা লক্ষ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> মেঘনার ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে, তার পাশের জল উঠছে, পড়ছে, দুলছে– তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, জলকন্যার নগ্নদেহের মতো শুভ্র, দ্রাক্ষা

> রসের মতো স্বচ্ছ। একদিকে তরু পল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা, অন্যদিকে দূরদিগন্ত রেখার অস্পষ্ট নীলিমা! খুব জোরে বাতাস বইছে, কোন দিক থেকে ঠিক করতে পারছিনে। এখানে ওখানে ছোট ছোট নৌকাগুলি তীরবেগে ছুটে চলছে; ওরা সব পাল তুলে দিয়েছে– বাউলের গাত্রবাসের মতো নানা রঙের তালি দেওয়া পাল। আমাদের স্টিমার এদের মধ্যে পরিচারিকা বেষ্টিত। রানীর মতো চলছে, সামনের দিকে চলছে।[৪]

গল্পটিতে প্রধানত দুটি চরিত্র। নায়ক ও নীলিমা। স্টিমার যাত্রায় প্রেমিক নীলিমাকে তার জীবনের এক রহস্যময়ী নারীর গল্প শুনিয়েছে। যদিও গৃহস্বামীর ওখানে নায়কের সঙ্গে বারোটি তেরটি মেয়ের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তারা নায়ককে একা পেয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। গল্পটির রহস্য এখানেই– অনেকগুলো রাত একসঙ্গে কাটিয়েও নায়ক রমণীটির পরিচয় উদ্ধার করতে পারেনি। এখানে অন্য আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। কথক যে রহস্যময়ীর লীলায় লিপ্ত হয়েছিল সে কি সত্যি মানবী! মানবী যদি হতো নায়ক অনেকগুলো রাত কাটিয়ে কেন তার পরিচয় উদ্ধার করতে পারলো না?

‘এমিলিয়ার প্রেম’ গল্পটিতে একনিষ্ঠ প্রেমের আড়ালে যৌন অন্ধতা ও ঈর্ষাজনিত এক চরম অভিপ্রয়াস চিত্রিত হয়েছে। গল্পটির প্রথম নাম ছিল ‘ওথেলো’। চিত্রশিল্পী ভাস্কর এবং এককালের ‘আগুন’ এমিলিয়ার দেহ বিলগ্ন অন্ধ প্রেমের ছবি আঁকা হয়েছে এ গল্পে। ভাস্কর বারো বছর শিক্ষানবিশী করে ফিরেছে ইউরোপ থেকে, অনেক পুরুষের কামনার ধন এমিলিয়া তখন যৌবনের উপান্তে। বয়স তার ঊনত্রিশ, বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ। নিঃসঙ্গ লিপ্সায় এমিলিয়া টেনে নিল ভাস্করকে আসঙ্গলিপ্সা উভয়ের দেহের অভ্যন্তরে মর্মান্তিক শিহরণ তুললো। কিন্তু ভাস্করের উত্তপ্ত, সদা উন্মুখ অন্ধ তৃষ্ণা তীব্র হোঁচট খেল একদিন। ঈর্ষা আর সন্দেহের ঘোর আবর্তে ভাস্কর জ্বলে উঠলো। প্রদোষের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল এমিলিয়ার। আজো সে এমিলিয়াকে ‘এমিলি’ বলে ডাকতে পারে। অসহ্য বোধহয় ভাস্করের। অবশেষে এক গভীর রাতে এমিলিকে তাড়িয়ে দিল ভাস্কর। তারপর অবসন্ন, নেশাগ্রস্ত, বিহ্বলের মতো ঘুমিয়ে পড়লো ভাস্কর। গভীর রাতে ঘুম ভাঙে অন্ধকারে। এমিলিয়া ঝুঁকে আছে মুখের ওপর মুখ রেখে। স্বপ্ন নয়, সত্যি।

> কত ঘুমোবে? ওঠো! এমিলিয়া হাত রাখলো তার কপালে। দুই হাত বাড়িয়ে ভাস্কর তাকে টেনে নিলো বুকের উপর। ‘তুমি এসেছো!’ এমিলিয়া বললো, ভাস্করের পাশে বালিশে মাথা রেখে: ‘না-এসে পারলাম না-পারি-না!’ ‘এমিলি! গাঢ় স্বরে ডাকলো ভাস্কর। তারপর অন্ধকার। তারপর স্তব্ধতা। তারপর রক্তের সমুদ্রের বিশ্ব মুছে নেয়া বন্যা।[৫]

রক্তের সে উদ্দামতা থেমে গেলে পরম স্বস্তি নিয়ে এমিলিয়া ভাস্করের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভাস্করের চোখে ঘুম নেই। এই পরমতম প্রাপ্তির লগ্নে চরম অবিশ্বাস, চরম ঈর্ষা, নিদারুণ হিংসা ও নির্মম সংশয় উন্মত্ত করে তোলে তাকে–

> এমিলিয়ার নিশ্বাসের ওঠা পড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো ভাস্কর। ... ভাস্করের দুই হাত এমিলিয়ার গলার উপর নামলো। প্রিয় স্পর্শে হাসি ফুটলো এমিলিয়ার ঘুমন্ত মুখে, এত ভালোবাসা কোনখানে ধরবে? এই শরীরে? না, রক্তমাংস শুধু বাধা দেয়, অসীমকে শৃঙ্খলে বাঁধতে চায় এত তার স্পর্ধা! ছিঁড়ুক সেই শৃঙ্খল। আস্তে আস্তে, অতি গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেলো এমিলিয়ার গলায়। ফুটে উঠলো নীল শিরা। এতক্ষণে পরিপূর্ণতা।[৬]

গল্পটির সর্বাঙ্গ ঘিরে এমন একটি কাব্যিক পরিমণ্ডল রয়েছে, যা গল্পটির নগ্নতা ও উগ্রতাকে বাড়তে দেয়নি। এই কাব্যিকতা শুধু ভাষা বা বর্ণনায় নয়, সমস্ত গল্পের

শৈলীর অন্তরালেও বিরাজমান ভাস্কর প্রেমিকা এমিলিয়াকে অন্য কারো হতে দিতে চাইনা তাই এমিলিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত হলে সে স্বগতোক্তি করে "আর ভয় নেই। এখন সে চিরকাল আমার।"

কাব্যময়তা বুদ্ধদেবের ছোটগল্পের শরীরকে ছুঁয়ে আছে। 'লুসিললিতা' কবিতার সুগন্ধি জড়ানো আরেকটি গল্প। 'আমরা তিনজন' গল্পে পুরনো দিনের স্মৃতিকাতরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পের ভাষা নিপাট, নিভাঁজ। কাহিনী সহজ-সরল একরৈখিক গতিতে এগিয়েছে। ঢাকার স্মৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে এ গল্পে। অসিত, হিতাংসু ও বিকাশ মধ্যবিত্ত পরিবারের তিন তরুণ। তাদের তিনজনের ভালোবাসার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছে মোনালিসা ওরফে তরুর প্রতি। মোনালিসার কাছে কাছে থাকা, তার পরিবারের ফাই– ফরমাশ খাটা এসবই তিন তরুণের আত্মতৃপ্তির কারণ, অসিত ও হিতাংসুর তুলনায় বিকাশ একটু অন্যরকম। অবশ্য তার মুখেই এ গল্পের কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে। তরুকে নিয়ে তিন তরুণের ভাবনা, কল্পনা রঙিন ফানুস স্বপ্নের আকাশে শুধু ভেসে বেরিয়েছে, তারা কখনই সাহস করে মনের কথাটি মুখ ফুটে তরুর কাছে বলেনি। কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা তিন তরুণ তরুর কাছাকাছি থাকতেই যেন বেশি ভালোবাসে। বিকাশের শারীরিক বর্ণনা ও কবিতা লিখার বিষয় কিংবা তার চিন্তাচেতনায় সবই যেন লেখকের প্রতিচ্ছায়া। বিকাশ চরিত্রে অনায়াসে লেখকের ব্যক্তিসত্তা প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পটির মোট চরিত্র সাতটি। তিন বন্ধু তরু, তার মা-বাবা এবং তরুর স্বামী হীরেন বাবু। সাতটি চরিত্রের মধ্যে দুজন মারা গিয়েছে। তরুর এবং অসিত। আর দু'বন্ধুর মধ্যে একজন হিতাংসু এস. এস. সি পাশ করে জার্মানিতে পড়তে গিয়েছে। সেখানে বিয়ে করে আর ফিরে আসেনি, আর বিকাশ? তার জবানিতেই শোনা যাক–

> আর আমি– আমি এখনো আছি, ঢাকার নয়, পুরানা পল্টনের নয়, উনিশ শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া– সেই মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ ঢাকা দুপুর। সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি সেই তুমি! মোনালিসা আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে।[৭]

আবেগতাড়িত, বিহ্বল ভাষাগুচ্ছের শেষাংশ কবিতার শরীর। 'আমরা তিনজন' গল্প হিসেবে– অনন্য। পুরনো পল্টনের স্মৃতি নস্টালজিয়া এই গল্পে সার্থক। আবেগতাড়িত তিন তরুণ সমকালের তরুণদের মানসছায়া। সে সময় তরুণ-তরুণীদের ফ্রি মেলা-মেশায় সুযোগ কমছিল। যার ফলে তারা কল্পনাপ্রবল ছিল। ভাবনা-চিন্তা-কল্পনায় তারা সুখছবি অংকন করতো। 'আমরা তিনজন' গল্পের তিন তরুণ সমকালের তরুণদের প্রতিনিধি। বর্তমান কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের : (১৮৩৮-১৮৯৪) যুগের তরুণদের সঙ্গে এর তুলনা করলে বুদ্ধদেব বসুর নায়কদের প্রতি অবিচার করা হবে।

'সুপ্রতিম মিত্র' দুই অধ্যাপকের গল্প। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে উচ্চবিত্ত জীবনের হাতছানি দিয়েছিল কথককে। তার বন্ধু সুপ্রতিম মিত্র।

> সমকালীনদের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠতা নিঃসংশয়, ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও শিল্পী, বিরল প্রতিভার অধিকারী, সে কিনা আজ একটা ফিরিঙ্গি ভিখিরির মতো দারজিলিং এর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।[৮]

সুপ্রতিম হতে পারতো নামজাদা অধ্যাপক। হতে পারতো খ্যাতিমান সাহিত্যিক, হতে পারতো নাট্যকার কিন্তু কোনো কিছুই সে হলো না। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়

করা সুপ্রতিম কোনো কিছুতেই থিতু হলো না। এদিক-ওদিক অধ্যাপনা করে প্রেসিডেন্সি কলেজেরও সে অধ্যাপক হয়েছিল কিন্তু তাও বেশিদিন করেনি ছেড়ে দিয়েছে অবশেষে ইলার সৌন্দর্যে ডুব দিয়েছে। বিয়ে হয়েছে ওদের। কিন্তু ইলার আশা পূর্ণ করতে পারেনি সুপ্রতিম। লেখালেখির জগতে ডুব দিয়ে ইলাকে বুঝি অবহেলাই করলো সে। ইলা নিরাশায় ডুব দিয়েছে। আশাভঙ্গ ইলা এরপর খুঁজে পেয়েছে বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার কাঞ্চনকে। ইলা সুপ্রতিমকে ছেড়ে চলে গেছে কাঞ্চনের কাছে। সুপ্রতিম বাধা দেয়নি। কলকাতা ছেড়ে সুপ্রতিম চলে এসেছে দারজিলিং-এ। এখানে এসে স্বামীহারা কাঞ্চীকে পেয়েছে সে। ভাষাবিদ পণ্ডিত বহু প্রতিভার অধিকারী সুপ্রতিম বন্ধুর কাছে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে তার সৃষ্টিকর্ম তুলে দিয়েছে। এমনি এমনি বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নেয়নি সে। অসাধারণ সে সৃষ্টিকর্ম বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে সে প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়েছে। সব মিলিয়ে গল্পটির পাঁচটি চরিত্র তন্মধ্যে দু'জন অধ্যাপক। মধ্যবিত্ত রোমান্টিক মনের অধিকারী সুপ্রতিম উজ্জ্বল চরিত্র। তার চরিত্রের দৃঢ়তা এখানে নিষ্প্রভ।

'মা-বোন-ভাই' গল্পটি মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপোড়েনের কাহিনী; স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দুর্ভর বেদনায় নিমজ্জিত আত্মার অদৃশ্য রোদন গল্পটি। বারীন চরিত্রটিকে মহান করেছেন লেখক। মা-বাবা-ভাই-বোন নিয়ে বারীনদের সংসার। বাবা মারা যাওয়ায় বারীনের ওপর সংসার চালানোর দায়িত্ব পড়ে। ইংরেজিতে অনার্স পরীক্ষা শেষ করে বারীন স্কুলে মাস্টারি করে। শুধু মাস্টারি নয় সঙ্গে সঙ্গে সে আরো অনেক কাজ করে। সংসারের চাকা সচল রাখতে সে টিউশনি করে। রাত ১০টা-১১টা ফেরা বারীনের জন্য প্রথম প্রথম বোন অরুন্ধতী খাবার নিয়ে বসে থাকতো। পরে তা আর হয় না। বারীন আস্তে আস্তে মধ্যবিত্ত পরিবারটির কলুর বলদ হতে থাকে। সব ঝামেলা মাথায় নিয়ে সে বোনটির বিয়ে দেয়। নিজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পর্যন্ত নেই। নিঃসঙ্গ ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বারীন মা-বোনের এবং ভাইদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না সবকিছুর ভার বহন করেছে বারীন। শেষ পর্যন্ত সে বোনের বিয়ে দেয়। বোনের জন্য অনেক কিছুই করে সে। কিন্তু বোনটিও শেষ পর্যন্ত তাকে আঘাত করে। ভগ্নিপতি ভূপতি তাসের জুয়াতে দেড়শ টাকা হারে। এই টাকা মুখজ্যে মশাইয়ের কাছ থেকে যোগাড় করে এনে দেয় বারীন। সেই টাকার জন্য মুখজ্যে মশাই বাড়িতে এলে মা-বোন বারীনকে ভুল বোঝে। তারপর বোন অরুন্ধতী জেনে যায় ঐ টাকা তার স্বামীর জন্য এনেছিল ভাই বারীন। এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। কারণ বারীন টাকার জন্য তাগাদা দিয়ে ভূপতিকে চিঠি লিখেছে। অরুন্ধতী এটিই মানতে পারে না। তাই অরুন্ধতী ভাইয়ের দেনা শোধ করতে নিজের গলায় সোনার হার খুলে ছুঁড়ে ফেলে।

> সঙ্গে সঙ্গে বারীনের কোনো কষ্টের চেতনা আর রইলোনা, সে কে, সে কোথায় কী হচ্ছিলো এতক্ষণ সব যেন ভুলে গেলো, মুছে গেলো ঘর, ঘরের দেয়াল। বইয়ের সারি মুছে গেলো দরজার বাইরে রাস্তা, পাড়া শহর চোখের সামনে কিছু রইলো না, শুধু ফণা তুলে বেঁকে রইলো সেই সোনার হার। চকচকে সাপের মতো আর তার গায়ে সাপের চোখের মতো দুটি চকচকে সবুজ পাথর।[৯]

বুদ্ধদেব বসুর গল্প সম্পর্কে সমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য—

> বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রতিভাসিত হয়েছে আধুনিক মানবচৈতন্যের পীড়িত সত্তার সঙ্কট, মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক যন্ত্রণা এবং মানুষের চিত্ত জাগতিক বিপন্নতা। ....অংকন করেছেন দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভর বেদনা, আত্মদহনের তীক্ষ্ণমুখ

জ্বালা, বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার আত্মমুখী এক স্বপ্নলোক। বুদ্ধদেব বসু মূলত ঢাকা এবং কোলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তবে তাঁর গল্পে নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম-সংক্ষোভের ছবি নেই, আছে নাগরিক মধ্যবিত্তের রোমান্টিক প্রেম। সূক্ষ্ম পরিশীলিত অন্তর্জীবন আর হার্দিক রক্তক্ষরণের বহুবর্ণিল প্রান্তর। আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতায় বদ্ধ বুদ্ধদেবের গল্পজগৎ। বুদ্ধদেবের গল্প, বস্তুত, তাঁর কবি-আত্মার নির্জন শব্দ স্বাক্ষর। অতীত স্মৃতিমুগ্ধতা নস্টালজিয়া এবং কৈশোর প্রথম যৌবনের ঢাকা জীবন বুদ্ধদেবের গল্প-সাহিত্যের প্রধান অনুষঙ্গ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়কই তরুণ কবি। কখনো বা কথাসাহিত্যিক। কিংবা অধ্যাপক। এঁইসব চরিত্রের উপর বুদ্ধদেব প্রায় এঁকে দেন আপন ব্যক্তি প্রক্ষেপে আল্পনা। অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে বুদ্ধদেব কখনো লিখতে চাননি কোনো গল্প— ফলে তাঁর গল্পে যতটা আছে পল্লবিত বর্ণনা আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ততটা নেই কাহিনী বা ভাবের বিস্তার ও বৈচিত্র্য।[১০]

'একটি লাল গোলাপ' গল্পটিও প্রেমের। প্রতাপের প্রেমানুভূতি তার চিন্তাধারা এবং কল্পনা বর্ণনালাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্পই প্রেমের। দাম্পত্য সম্পর্কের গল্পও রয়েছে। দাম্পত্য প্রেমের আড়ালে পুরষের হিংস্র হয়ে ওঠার কাহিনী এসব গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলো তাদের নারীকে ছাড়িয়ে কোনো মানস-প্রতিমাকে তাদের অন্তরে ঠাঁই দিয়েছে। 'আবছায়া' গল্পের লাজুক কথাটি তার সহপাঠিনীর বিয়ের দিন জানল, অপর্ণা তাকে ভালবাসতে চেয়েছিল। এই ভেবে সে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়ে দিল বিয়ে করল না। "শুধু মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে সেই একটি তরুণ-শ্যামল মুখ আমার মনে পড়ে। সরু হাতে একটি মাত্র চুড়ি, নীল শাড়ির পাড়মাথাটিকে ঘিরেছে। অন্ধকারে কে যেন চুপি-চুপি কথা বলে– 'এত দেরি ক'রে এলেন– আর তো সময় নেই।"[১১]

'একটি কি দুটি পাখি' গল্পের প্রৌঢ় অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জিও অবিবাহিত থেকে গেল। সতেরো বছর বয়সে সে তার প্রতিবেশিনী পাখি নামের মেয়েটির সঙ্গে এক ভোরে যাত্রা দেখে ফেরার পথে কিছু পথ পাশাপাশি হেঁটেছিল, সেই স্মৃতি মনে করে সে জীবনে বিয়েই করলো না।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের নায়করা প্রেমের সংকীর্ণ সময়ের মিলনকে গুরুত্ব না দিয়ে বৃহত্তর মিলনের দিকে তারা ধাবিত হয়েছে।

'তুমি কেমন আছো' অন্যরকম ধারার এক রোমান্টিক গল্প; কখনো মনে হয়েছে এ যেন শুধু মানস প্রতিমার প্রতি জিজ্ঞাসা আবার মনে হয়েছে এটি স্থানিক কোনো সৌন্দর্যের, সামগ্রিক কোনো ভালো থাকার প্রতি একধরনের জিজ্ঞাসা। গল্পে বারবার লেখক পাঠককে নিয়ে খেলেছে। কখনো মিলু, কখনো উর্মিলা, কখনো পিপ্পল গড়ের বিখ্যাত মিসেস ঘোষালকে এই মানস প্রতিমা রূপে হাজির করেছে। আবার গল্পের শেষে এসে কথক যখন শোনায়, "কোথায় সেই দেশ, সেই সমুদ্র, সেই নীলিমা? যেখানে তুমি আছো, সেখানে। ভরা ষোলো তুমি, গায়ে তোমার শিশিরের গন্ধ, মুখ তোমার গোলাপি রোদে উজ্জ্বল, আলোর মতো, আলো ক'রে আছো এই জগৎ। তুমি আমার পাশে এসে বসলে। কিন্তু— এমন যদি হয় যে তুমি নেই?[১২]

তখন মনে হয়েছে কথক পুরো গল্পটি কাব্যের শরীরের ওপর নিজের মনের কল্পনার রং চড়িয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র বিকশিত হলেও তিনি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকাহিনী নিয়েও রচনা করেছেন গল্প, সে সব মানুষের জীবনচিত্র শিল্পিত ভাষ্যে উপনীত হয়েছে।

তাঁর সামগ্রিক গল্পের চরিত্রসমূহ সম্পর্কে বুদ্ধদেব গবেষক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের মূল্যায়ন এখানে স্মরণ করছি—

> বুদ্ধদেব বসু প্রেমের আশ্রয়ে মানবজীবনের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস, গীতিময়তা, হৃদয়াবেগ এবং মধ্যবিত্তমানসের নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির আবেগীরূপ উন্মোচন করেছেন, প্রেমকে সন্ধান করেছেন প্রত্যক্ষতার সীমানায়।...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বিপন্নতার প্রেক্ষাপটে, মধ্যবিত্তমানুষের সামূহিক বিচ্ছিন্নতা বিযুক্তি ও নৈঃসঙ্গ্যের শিল্পরূপ অংকন করেছেন। ... বুদ্ধদেব বসুর নায়ক-নায়িকার নিমগ্ন হয়েছে প্রেমের স্মৃতি আঁধারে আত্মখনন, আত্ম-উন্মোচন, আত্মহনন ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তারা প্রকাশ করেছে হার্দ্য কথকতা। ... বুদ্ধদেব বসু মূলত অংকন করেছেন প্রেমের আধারে অ-প্রেমের যন্ত্রণা।[১৩]

বুদ্ধদেব অনেক গল্প লিখেছেন। তাঁর সকল সার্থক গল্পের ভিত্তি অভিন্ন হলেও রূপের প্রকরণে বৈচিত্র্য আছে। তার কোনো গল্প পত্রাকারে রচিত, কোনোটিতে সুরের প্রাধান্য, কোনোটি বিবৃতিমূলক আর কোনোটি মনস্তত্ত্বসমৃদ্ধ। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে বুদ্ধদেব বসুর গল্পে কবিতার নিবিড় একটা আবহ, ব্যঞ্জনাধর্মী একটা সুরময়তার গভীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. অবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), *শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ*, 'করুণার পথধরে', অবসর, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮৩
২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, নবম প্রকাশ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি কলিকাতা, ১৪০৯, পৃ. ১০৯-১১০
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, আজকাল, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১০
৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২
৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯
৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০
৭. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১
৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০
৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৯
১০. *পূর্বোক্ত*, ভূমিকা
১১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১
১২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬
১৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩১০

বুদ্ধদেব বসু'র কাব্যে নন্দনচিন্তা

মাসুদুল হক

রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। বিশ বছরের অধিক সময় নির্বিকল্প কবিতাকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, কবিতা আলোচনা করে আধুনিক কবিদেরকে পাঠকসমাজে পরিচিত করেছেন, পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজেও অজস্র কবিতা রচনা করেছেন।[১] তাঁর কাব্য-সাধনা সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই। অর্থাৎ তিনি তাঁর শিল্পচেতনা ও কবিতা-রচনার অন্তরালে লক্ষ করেন প্রেরণার আনুকূল্য : এমন এক শক্তি, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা'র পার্থক্য খুব ক্ষীণ।[২] তাঁর অভিমত থেকেই তা উদ্ধার করা যায় :

> রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে, কবিতা আমরা লিখি না, কোনো কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন, সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র।[৩]

সমস্ত জীবন ধরেই বুদ্ধদেব বসুর কাছে কবিতা সৃষ্টি প্রেরণার উৎস ছিল রহস্যময়। কবিতার মাধ্যমেই তিনি সন্ধান করেছেন কবিতার জন্মরহস্য।[৪] অন্যত্র তিনি কাব্য সৃজন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে লেখেন :

> প্রথম যেদিন বীজ উড়ে এসে পড়লো, আর তৈরি লেখাটি বেরিয়ে এলো সেদিন : এই দুই বিন্দুর মধ্যে নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, কবির জীবনে অনেক সমন্বয় ও বিন্যাস, আহরণ ও বর্জন সংশ্লেষ— সেগুলিও কবিতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।[৫]

এখান থেকেই বুদ্ধদেব বসুর কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। অন্তত বোঝা যায় কীভাবে এক অনিবার্য ও প্রবল প্রেরণার তাড়নায় কোনো বোধ কবিতায় রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন : সমকালীন জীবনপ্রসঙ্গে অবলম্বন করেই সাহিত্য বা কবিতা চিরন্তনকে ধারণ করতে পারে।[৬] তিনি মনে করতেন : সাহিত্য 'আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশকে বেছে গুছিয়ে সম্পূর্ণ করে মনের সচেতন স্তরে তুলে ধরে'।[৭] এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য :

> সেই সাহিত্যই বড় সাহিত্য, যা সর্বযুগেই সাময়িক, যাতে প্রতি যুগই ঠিক যেন আপন মর্মকথাটি শুনতে পায়। এতে বলার চাইতে না-বলার অংশ থাকে বেশি, এবং সেইটুকু না-বলাটুকু প্রতি যুগ তার নিজের অর্থ দিয়ে ভরিয়ে নেয়। এই গুণটিকেই বলা যেতে পারে চিরন্তনতা— সত্যিকার আধুনিকতাও হয়তো তাই।[৮]

বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যে-কবিতার মাধ্যমে আমরা জগতের সঙ্গে সমানুকম্পনতা অনুভব করি এবং এ-যেন ক্ষণিকের সঙ্গে শাশ্বতের মিলন-স্পর্শ, একমাত্র শিল্পের কাছেই মানুষ পেতে পারে সত্য ও শাশ্বতের সামঞ্জস্য। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক-উপযোগিতা না-থাকলেও তা 'আলস্যজীবীর

বিলাসিতা' নয়। তাঁর মতে শিল্প হচ্ছে মানুষের আত্মার ও অনুভূতির বহির্প্রকাশ।[৯] তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> ...'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কে-ই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা— স্পষ্টত মানুষের জন্যই শিল্পকলা। স্পষ্টত মানুষের পক্ষে তা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধর্ম ও সমাজনীতি ও বিজ্ঞান তেমনি— কিন্তু ভিন্নভাবে, ভিন্ন কারণে। নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রী বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, মানুষের আত্মার পক্ষে, দেহ প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক সত্তার পক্ষে— রহস্যময় অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন।[১০]

বুদ্ধদেব বসু ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতা সংকলন *দময়ন্তী*-তে ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টোর আদলে একটি ছয় সূত্র-সংকলিত কাব্যাঙ্গিক-নির্দেশ মুদ্রিত করেছিলেন গ্রন্থশেষে। পরবর্তীকালে তা অবশ্য বর্জন করেছিলেন। তবু মনে হয় সেই নির্দেশাবলী তিনি আজীবন তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে মনে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এই সূত্রগুলোর উল্লেখ প্রয়োজন এই জন্যেই যে এখানে তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্বের আভাস-বিন্দু পাওয়া যাবে। তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> ... বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন— এই ছিলো আমার সাধনা। রচনাকালে নিজের মনে মনে নিম্নলিখিত অনুশাসন গ্রহণ করেছিলুম :
>
> (১) কাব্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।
>
> (২) 'সাধু' ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।
>
> (৩) 'কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি' 'চলিছে' 'হতেছে' ইত্যাদিও বর্জনীয়।
>
> (৪) 'কাব্যিক' শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট করে চলবো। 'মম' 'তব' 'কভু' 'যেথা' 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সনে' 'যবে' 'মতন' 'পরান' এ ধরনের কথাগুলোকে কাছে ঘেঁষতে দেবো না।
>
> (৫) মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এ-সবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলবো। অধিকরণে-'তে' ('ঘরেতে', 'টেবিলেতে') পশ্চিবঙ্গের মৌখিক রীতি হলেও, কিংবা সেই জন্যেই, প্রাদেশিকতা বলে বর্জনীয়।
>
> (৬) অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক, সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-হ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই। কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনো ব্যবহৃতই হয় না।[১১]

এই ছয়টি সূত্র থেকেই তাঁর কবিতায় শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। যেহেতু যে-কোনো কবিতার গঠনের মূল এককটি হচ্ছে শব্দ। তাই কবির নন্দনতত্ত্বের পরিচয় পাবার জন্যে তাঁর কবিতার শব্দ-ব্যবহারও লক্ষণীয়। কেননা শব্দ যে-কোনো বোধকে উপস্থাপনের একক হিসেবে কবির মানস-সংগঠন থেকে নিঃসৃত প্রাণদ-চিহ্ন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, তিনি কাব্যভাষায় শব্দ-সারল্যের খানিকটা পক্ষপাতী ছিলেন। বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতাটি প্রকাশিত হলে কবিকে লেখা তাঁর 'খোলা' চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— 'ক্রতুকৃতম,

অপাপবিদ্ধ-মস্লাবির, সোৎপ্রাসপাশ, অলাতচক্র (এমন আরো আছে) এইসব শব্দ ব্যবহার করে সত্যি লাভটা কোথায়? [...] পাঠকের স্বচ্ছন্দ উপভোগকে এমন করে নির্যাতিত ও নষ্ট করবার আমি তো কোন কারণ দেখিনে'[১২]— এ অভিমত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধদেব বসু সমকালীন বিষয়ে সাহিত্য রচনায় যেমন আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তেমনি সমকালীন ও সরল শব্দ ব্যবহারের প্রতিও তাঁর এক বিশেষ ধরনের দুর্বলতা ছিল।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় নন্দনতত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা, প্রকৃতি, সময় ধারণা, বিচ্ছিন্নতা ও নগরচেতনা। আমাদের আলোচনা মূলত এই সূত্রগুলোর আলোকেই আবর্তিত হবে।

আমরা জানি, অ-সুন্দরের মধ্যেও শিল্পের সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বোদলেয়ার। প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্য-ধারণা তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় না। তিনি সুন্দরকে অনুভব করেছিলেন রোগে, নিজের শারীরিক গ্লানির অনুপুঙ্খতায়, বিরাগে, কৃত্রিমতায়, নাগরিকতার ক্লেদে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন *ক্লেদজ কুসুম*। সম্ভবত বোদলেয়ারকে গভীরভাবে পাঠের ফলেই বুদ্ধদেব বসুও অনেকাংশে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সৌন্দর্যচেতনায়। তাছাড়া ডি. এইচ. লরেন্স. এলিয়ট পাঠের অভিজ্ঞতাও পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়। অবশ্যই এই অনুপ্রেরণাকে অনুকরণ বলা যাবে না। কেননা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর সৌন্দর্যচেতনা একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। আর এই সৌন্দর্যচেতনা মূলত তাঁর প্রেমচেতনার সঙ্গে যৌথ ক্রিয়ায় প্রকাশিত।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেহবাদী সম্ভোগ-সংরাগ। কিন্তু তাঁর প্রেমের মূলপ্রেরণা যৌনলিপ্সাকে তিনি দেহাতীত সুকুমার প্রেমেই প্রণোদিত করেছিলেন। *বন্দীর বন্দনা* থেকে *নতুন পাতা* পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনাকে অবলম্বন করে রোমান্টিক ইন্দ্রিয়বাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর কাব্যদর্শন বা নন্দনতত্ত্বের একটি মৌলিক উদ্ভাসন। তিনি প্রেমের মর্মমূলে কামনার অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য লীলাবৈচিত্র্য লক্ষ করেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি সত্য হিসাবে দেখেন দেহজ কামনাকে।[১৩] দৃষ্টান্ত :

একমাত্র কামনা অমর :
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা,
স্বপ্ন সে ভাঙিয়া যায়, ভুল হয়ে যায় ভালোবাসা—
দূর তারকার তরে দুরূহ দুরাশা।[১৪]
(মোহমুক্ত)

বুদ্ধদেব বসুর কাছে নারী যেন বিধাতার চিরন্তন অশ্লীলতার প্রতীক। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব দেহজ কামনা ও সৌন্দর্যচেতনা থেকেই নারীকে দেখেছেন 'অনঙ্গে'র বিহার-ভূমি এবং মর্ত্যকামনার মূর্তি হিসেবে। তাঁর ধারণা যদি কামনাই অমর তাহলে বিশেষ কোনো নারীর জন্য অপেক্ষা হচ্ছে অবান্তর— তাঁর মতে পৃথিবীর সকল সুন্দরীই কাম্য :[১৫]

'এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহমদ্য পান করি'।
আনিয়ো না আর-কিছু শুধু আনো প্রস্ফুট যৌবন।

[...]

সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডুষে লইবো পান করি।

(মোহমুক্ত)[১৬]

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার প্রতীক যৌবনের জয়গান মুখর; বারবার কামনা করেছেন তার স্পর্শ, যৌবনকে দেখেছেন সুন্দর ও সত্য হিসেবে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সুন্দরকে অবলোকন করেন নঞর্থকতার ভেতর থেকে। তাঁর কাছে যৌবন যেন অভিশাপ মাত্র। কবির মতে যৌবন যেন অন্ধকারে অবরুদ্ধ সুন্দর ও কল্যাণের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ সে-যৌবন দেহকে অস্বীকার করতে পারে না এবং দেহকে অস্বীকার করতে পারে না বলেই দেহজ কামনাকেও অস্বীকার করতে পারে না।[১৭] এইভাবে আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়েই বুদ্ধদেব বসু সুন্দর ও সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন :

সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।

[...]

যৌবন আমার অভিশাপ।

(শাপভ্রষ্ট)[১৮]

বুদ্ধদেব বসুর নায়িকারা রক্ত-মাংসময়। কিন্তু এই রক্ত-মাংসময় নারীর প্রেমের দেহী রূপ মর্মে মর্মে অনুভব করলেও একান্ত দেববাদেই বুদ্ধদেব বসু নিমজ্জিত হতে চান নি। তাঁর আধুনিক মার্জিত মন ও বিদগ্ধ রুচি নারীর দেহজ সৌন্দর্য থেকে আত্মিক সৌন্দর্যে উন্নীত হতে চেয়েছে। তাই তিনি লেখেন :

... এই দেহ-ধূপ দহি' উঠিয়াছে
কামনার ধূপ;—
তাহারি সুগন্ধে মোর স্নায়ু-তন্ত্রী শিহরিত! সেই মোর কলঙ্ক কুঙ্কুম।

(পাপী)[১৯]

বুদ্ধদেব বসুর মানসচেতনা অধ্যাত্মোপলব্ধি ছাড়াই দেহাতীতে উপলব্ধি করতে চেয়েছে শুধুই সৌন্দর্য ও সুষমাবোধের তাগিদে। আবার মানুষের দেহজ কামনাচেতনার জন্য তিনি স্রষ্টাকেই দায়ী করেন। তাঁর মতে, বিধাতার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে তিনিই ক্রটিহীন করেছেন, তিনিই বিকৃতিকে দিয়েছেন মহিমা আর কুৎসিতকে সৌন্দর্য। এই যে বিধাতার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে তিনি ক্রটিহীন করেছেন— এই ধারণার মধ্যে যেন হেগেলের— 'God creat nature, man correct nature'— এই বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাই বুদ্ধদেব বসু কবিতায় লেখেন :

তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন-সুধা মম।

[...]

তোমার ক্রটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।

(বন্দীর বন্দনা)[২০]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেমের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ নিজেই করেছেন *কালের পুতুল*গ্রন্থে :

সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতর যত বাধা, যত মানসিক প্রলোভন ও দুর্বলতা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নসঞ্চার; অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা— এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। এই অভিসম্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। কেননা আমি যে 'বন্দীর বন্ধনা' লিখেছিলুম তার মূল্যে এই কথাটাই ছিলো।[২১]

রোমান্টিক কবিদের অনুভবজাত চিরন্তন প্রেমের আদর্শকে তিরিশের কবিরা অস্বীকার করলেও বুদ্ধদেব বসু ভিন্নভাবে তা স্বীকার করেছেন। প্রেমের ক্ষণিক রূপ স্বীকার করতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশের মতো গুমরানো ব্যথা বা সুধীন্দ্রনাথের অতৃপ্তির অগ্ন্যুদ্‌গার তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। প্রেমের ক্ষণিক রূপ তাঁর কাছে অশান্ত বা বিক্ষুব্ধ নয়। তাঁর কাছে মনে হয়েছে জৈবকামনার বন্ধন মোচনের জন্যই প্রেমের প্রয়োজন।[২২] প্রেমের লীলা প্রজাপতির লীলার মতোই ক্ষণিক জেনেও কবি সে সত্যকে মেনে নিতে চেয়েছে তার মিথ্যা, মোহ, ভান, ছলনাসহ। দৃষ্টান্ত :

আমাদের ক্ষণিক মিলন—
মিথ্যা দিয়ে মোহ দিয়ে তাহারে করেছি চিরন্তন—
অমর করেছি তারে।
(ক্ষণিকা)[২৩]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 'যোগাযোগও বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের মতোই সত্য; প্রকৃতিকে বাদ দিলে, তাই জীবনের স্বরূপটাকেই খণ্ডিত করা হয়, বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হতে পারে না।"[২৪] প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যেই স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল কবিরা প্রকৃতিকে তার মনোভাবের বাহন করে তোলে এবং কবিতায় নির্মাণ করে প্রকৃতির বহু বর্ণিল রূপ। এ-প্রভাব থেকে বুদ্ধদেব বসুও মুক্ত নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনা তাঁর কবিতার ক্ষেত্রেও নান্দনিক মূল্য নিয়ে আসে। তাঁর বর্ণনায় প্রকৃতির সৌন্দর্যরূপ :

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হয়ে যেন লাগে;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় পরিচয়
পল্লবসম্পুটে।
(শাপভ্রষ্ট)[২৫]

তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ যেমন প্রকৃতির কবি, বুদ্ধদেব বসু ঠিক তেমন প্রকৃতিমনস্ক নন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনো এসেছে তাঁরই প্রেমস্বপ্নের সহায়ক উদ্বোধক হিসেবে। দৃষ্টান্ত :

তুমি এখানে কখনো, যদি আসবে, মেয়ে,
শোনো, আসবে কখন :
যবে আঁধার নামবে সন্ধ্যা আকাশ ছেয়ে,
কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির-নিমেষ নয়নে—

যবে জাগবে রাতের হওয়া উতল গানে—
তুমি আসবে তখন।
(আমন্ত্রণ-রমাকে)[২৬]

তবে বুদ্ধদেব বসুর কিছু কবিতা আছে, যেখানে তিনি নান্দনিক-দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত রূপকে প্রকাশ করেছেন। যেমন 'অলস সকাল' কবিতায় প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যের ইমেজকেই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত :

চা-বাগানের কোঁকড়ানো সবুজে-নীলে
পূর্ণোদর মেষপালের মতো মেঘগুলি
বিহ্বল, নিশ্চল
আজ আকাশ অসহ্য, নীল উজ্জ্বল দিন
নিম্নভূমিতে মেঘ-মেলা।
[...]
এই উজ্জ্বল সকালবেলায় উঠে এসে
তুষারের মুখ ঢেকে দিলো?
একটা চিল ডানা মেলে নিস্পন্দ
কত নিচে!
(অলস সকাল)[২৭]

আধুনিক বাংলা কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ নগরচেতনা। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনাটি মূলত নগরচেতনাকে কেন্দ্র করেই কাজ করে। ফলে নাগরিক নিসর্গও অনেকাংশেই তাঁর নান্দনিকচেতনার স্বরূপ হিসেবে কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। এও তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। দৃষ্টান্ত :

বৃষ্টি পড়ে ঘাসে
ট্রামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।
এই তো শ্রাবণ।
(ঘাস)[২৮]

কিংবা :

রাত্রি নিদ্রাতুর।
বৃষ্টি ঝর্ঝর স্বর ঝরিছে মধুর
স্বপ্নের অস্পষ্ট মহাদেশে।
যেন দীর্ঘ যাত্রা শেষে
সুদূর সমুদ্রে ভালে দীর্ঘ নীল টিকা
জ্বলে আমেরিকা।
(ছন্দ)[২৯]

কিংবা :

রাত্রি আমার প্রেয়সী
তিলে-তিলে করি রচনা
[...]
বালিকা সন্ধ্যা আকাশে ওড়ায়
হালকা হাওয়ার ওড়না।
মধ্যরাত্রি চাঁদের আলোয় গড়া,
খরযৌবন কানায়-কানায় ভরা,

ছায়ার তুলির ধুলির লিখন ফুটপাতে এঁকে যায়
এ কোন বাসরঘর।
(রাত্রি)[৩০]

উপরের প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শ্রাবণের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, তবে সে বর্ণনা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের নয়, নগর কলকাতার ট্রামের রাস্তার নাগরিক বর্ণনায় সে শ্রাবণের পতন। *'ঘাস'* কবিতাটির আরো কিছু পঙ্‌ক্তি আমরা তুলে ধরছি এ কারণে যে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার নন্দন-সূত্রগুলো পরস্পর নির্ভরশীল— এই বিষয়টি এতে উঠে আসবে। দৃষ্টান্ত :

কোথায় শ্রাবণ?
স্পর্শে, গন্ধে, সবুজ আনন্দে, ঘাসে
ট্রামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।
স্পর্শময় এ-বিশ্বের
রেখেছি আড়াল করে হাঁটা। ব্যর্থ হাঁটা।
(ঘাস)[৩১]

আধুনিক সভ্যতার বিকাশ মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। 'কোথায় শ্রাবণ'— এই বাক্য-বন্ধনের প্রশ্ন কবির বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই সৃষ্টি। তবে এই কবিতাংশের বর্ণনায় নাগরিক নিসর্গের ছোঁয়া ক্রমপ্রবাহমান ঋতুর মৌলিক স্পর্শে কবি তাড়িত। যান্ত্রিক ও রুদ্ধ নাগরিক জীবন কবিকে প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেও— এখানে প্রকৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে— যা বুদ্ধদেব বসুর কবি-প্রতিভার একটি মৌলিক দার্শনিক-সত্তা হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে। আর এ কবিতার নান্দনিক মূল্যকে উচ্চকিত করেছে।

সময় বা কাল সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন : 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক।'[৩২] এই 'বৈনাশিক সময়' অর্থেই বলতে হয়, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ইতিহাসচেতনার অভিঘাত সামান্য হলেও, বৈনাশিক কালের অভিঘাত তাঁর কবিতায় নান্দনিক মূল্য নিয়ে উপস্থিত। পৃথিবীর অস্থিরতা, মানুষের আত্মিক শূন্যতা ও নৈরাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈনাশিক মহাকালের খণ্ড-সীমায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতার পাত্রপাত্রীরা অল্প সময়ের জন্যে হলেও প্রেমের স্পর্শ পেতে চায়। দৃষ্টান্ত :

আমরা জ্বলে যাই, নিবে যাই, নিঃশেষ হয়ে যাই,
কিছু থাকে না।
তাই এখন, সময় যখন আছে
আমি তোমাকে ডাকছি।
তোমাকে ডাকছি সময়ের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু-দিক মৃত্যুর দেয়াল দিয়ে ঠাসা[৩৩]
(সময় নেই)

এখানে সত্য, প্রেম, নগরজীবন, সময় আর বিচ্ছিন্নতা— এইসব লক্ষণ একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। কবি জানেন জীবন নশ্বর মোমের মতোই ক্ষয়ে যায়, সময়ের কাছে সবকিছুই বিনষ্টিপ্রবণ। সময়ের এই বৈনাশিক রূপ জেনেই রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রেমিকাকে, মিলনের আহ্বান জানাচ্ছেন। এ তাঁর জীবনোপলব্ধির সত্যতা আর

প্রেমের ঐক্যবিন্দু ধ্বনিত হচ্ছে নগরচেতনায়, সেখানে বৈনাশিক সময় স্রোত বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে জীবন-সত্তা। তবুও কবি আশাবাদী। এই আশাবাদটুকুকেও তাঁর দার্শনিক-সত্তার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে কাল হন্তারক, বৈনাশিক যা কিছুই হোক না কেন, কিন্তু সত্তার বিলুপ্তি ঘটার পূর্ব পর্যন্ত কবিকেই দ্রষ্টা, বিশ্বের নিয়ন্তা জেনে বুদ্ধদেব বসু কাল ও প্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছেন শুধু চরিত্র হিসেবে :

> তবু বলি, আমিহীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিত :
> প্রকৃতি ও কাল শুধু নটনটী, আমি নাট্যকার
> এবং দ্রষ্টাও আমি— যতক্ষণ শেষ বজ্রপাতে
> বিলুপ্ত না হয় সত্তা, মহাবিশ্ব আর ভগবান।
> (অমরত্ব-সংগীত)[৩৪]

প্রবল অহংকারের জন্যেই কবি কালকে অতিক্রম করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। গতিশীল বৈনাশিক কালের ভেতরকার নশ্বর মানুষের আশা ও আনন্দ, বেদনা ও ভালোবাসার রূপকার তিনি। কালবর্তী হয়েই তিনি প্রেম ও কবিতার মাধ্যমে বৈনাশিক সময় অতিক্রমণের স্বপ্ন দেখেছেন,[৩৫] যাকে আমরা দেকার্তের 'I think there for I am'— এই দার্শনিক বাণীর প্রতিধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি— যেখানে অস্তিত্ববাদীচেতনা বিস্তার লাভ করছে কবির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যের ভেতর।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যের একটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে, alienation বা বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা অনেকটাই অর্থনৈতিক-দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। যা মানুষের যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গবোধ, হতাশা, একাকিত্ব প্রভৃতি অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যন্তর থেকেই তৈরি হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে পাশ্চাত্যে হেগেল ও মার্কসই প্রথম চিহ্নিত করে দেখান। বিশেষ করে মার্ক্স *Economic and Philosophic manuscript of 1844* গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে তাঁর মতামত দিয়েছিলেন।[৩৬] এই আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বুদ্ধদেব বসুরও কবিতায় লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত :

> কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী;
> বিশ্বের জানালা বন্ধ; অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
> পচা ডোবার মতো দিন; পুরোনো বিশ্ব কুয়োর তলা মোত
> রাত্রি, আর নিঃসঙ্গতা, শেষহীন
> (বৃষ্টি আর ঝড়)[৩৭]

অন্য আরেকটি কবিতায় তিনি দেখান ব্যক্তিত্বের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, স্মৃতিহীনতা, আশা-নৈরাশ্যে নির্বিকার হয়ে— তিনি যেন এভারেস্‌টের মতোই মানব-সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন। এ তাঁর কাব্যচিন্তার তথা নন্দনতত্ত্বের content এবং form— দুটোই। দৃষ্টান্ত :

> বুদ্ধি কল্পনা বিস্ময় বাসনা— কিছু আমার নয়,
> আমি চির-বন্ধ্যা, চির-নিঃসঙ্গ।
> রহস্যের শেষ জানবে ওরা, তবু রহস্য অশেষ।
> কত গ্রীষ্মে ওরা বিস্ময়ে প্রদক্ষিণ করবে আমাকে।
> আমার গ্রীষ্ম শীত বসন্ত নেই, জরাযৌবনহীন সময়হীন
> শুধু আমি।
> (এভারেস্‌ট্‌)[৩৮]

বুদ্ধদেব বসুর মতে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই—এক একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা। মানুষে মানুষে সার্বিক ঐক্য সম্ভব নয়। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিসত্তা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সভ্যতার অসামঞ্জস্য শুধু শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমেই সামঞ্জস্য পেতে পারে।[৩৯] এখানেই তাঁর নন্দনতত্ত্বের মূল সুর উন্মোচিত।

তথ্যনির্দেশ

১ দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৮৪, পৃ. ৬৪
২ মাহবুব সদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ১৯
৩ নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃ. ১৮৬
৪ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৫ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি ও কবিতা', দ্র. 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, সম্পাদক, সাগরময় ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ২০৭
৬ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৭ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, মাঘ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫
৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
৯ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১০ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', এম,সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮
১১ বুদ্ধদেব বসু 'দময়ন্তী' গ্রন্থের শেষে সংযোজিত অংশ।
১২ 'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, বিষ্ণু দে-কে লেখা'। উদ্ধৃত : সুমিতা চক্রবর্তী, ত্রিশ চল্লিশ দশকের কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩
১৩ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১৪ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৮১, পৃ. ৪১
১৫ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১৬ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
১৭ 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
১৮ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
১৯ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৩১
২০ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২
২১ 'কালের পুতুল', পূর্বোক্ত পৃ. ৬৭
২২ 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
২৩ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
২৪ 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২৫ 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
২৬ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ৮৬
২৭ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫

২৮ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ২২৮
২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯
৩২ 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৩৩ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭১
৩৪ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৩
৩৫ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯
৩৭ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা সংগ্রহ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
৩৯ 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

চিঠির বুদ্ধদেব বসু

মাহফুজা হিলালী

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তরকালের অন্যতম প্রধান লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী-নাটকে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। আবার মঞ্চে তিনি অভিনয়ও করেছেন, অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। সবকিছু মিলিয়ে তিনি একজন লেখক। একজন লেখকের প্রধান পরিচয় 'লেখক' হলেও তিনি সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ নন। চারপাশের বিভিন্ন পরিচয়ের বিভিন্ন সম্পর্কের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর জীবন চলমান। এই চলমান জীবনে তিনি কখনো সংঘবদ্ধ আবার কখনো একা। বুদ্ধদেব বসুর মনোজগৎও ছিল এরূপ। সাহিত্য এবং ব্যক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও সাহিত্যে নিছক সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন উঠে আসে না। সেখানে গণমানুষের একটি বোধকে সাহিত্যিক নিজস্ব চেতনায় চিত্রিত করেন। তাই সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন খুঁজতে তাঁর ডায়েরি বা ব্যক্তিগত চিঠির দ্বারস্থ হতে হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন তখন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা ৮টি চিঠি, কলকাতায় 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ৩৭টি চিঠি তাঁর কর্মময়-জীবনের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, পত্রিকা চালানোর দৃঢ়তা, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, একটু একটু করে সংগ্রামকে টিকিয়ে রাখার দুঃসহ যন্ত্রণা, লেখা সংগ্রহ করার জন্য কবি-লেখকের দ্বারস্থ হওয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়, এবং বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩৬টি চিঠি লেখক বুদ্ধদেব বসু এবং সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় তুলে ধরে। অন্যদিকে, কনিষ্ঠ কন্যা দময়ন্তী বসুর কাছে একযুগ ধরে লেখা ১৭৮টি চিঠি বুদ্ধদেব বসুর জীবনের শেষ একযুগের ইতিহাস তুলে ধরেছে। এতে উঠে এসেছে লেখক মনের কত বিচিত্র চিন্তা, দর্শন। দেশকালের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, সাহিত্য-চলচ্চিত্র-থিয়েটার তথা সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও এ সব চিঠিতে পাওয়া যায় সংসারের কত খুঁটিনাটি বিষয় : কলম কেনা, তা আবার হারিয়ে যাওয়া, কালি-কলমের প্রতি আকৃষ্টতা, সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-ভালোবাসা, টেলিফোন নষ্ট, গাড়ি নষ্ট, কলের পাইপ নষ্ট, গ্যাসের পাইপ নষ্ট, বাড়ির কুকুরের অসুখ, চড়ুইপাখির বংশবৃদ্ধি, কাজের ছেলের বই চুরি করে পলায়ন, কাজের লোক ছুটিতে যাওয়ায় সংসারের বিশৃঙ্খলতা, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে শারীরিক অনুভব, বিয়ে, মৃত্যু, বৈষয়িক চিন্তা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, বই চুরি, বই কেনা, মেয়ের কাছে নরম সোয়েটার আনতে বলা, আবার সোয়েটার চুরি, বন্ধুত্ব, নিজের অসুখ, স্ত্রীর অসুখ, পিতৃত্ব, নাতি-নাতনীর সঙ্গে সম্পর্ক, মেয়েদের পরিবার নিয়ে চিন্তা, বাড়ি বানানো, পুরোনো বাসস্থানের প্রতি মমত্ববোধ, বাড়ি বদল, ছেলের মুখাপেক্ষী না হওয়ার দৃঢ়তা ইত্যাদি। এই ১৭৮টি চিঠির বুননে পাওয়া যায় একটি পরিবারের আশা নৈরাশ্য, সংগ্রাম, নীতিবোধ, নির্ভরশীলতা, চলমানতা– সব মিলিয়ে যেন বসু পরিবারের কাহিনী– যেন একটি উপন্যাস বা নাটক কিংবা 'বাঙালি লেখক পরিবার' শিরোনামে

একটি কবিতা। এবং সবগুলো চিঠি লেখক বুদ্ধদেব বসু এবং পারিবারিক বুদ্ধদেব বসুকে রাখ-ঢাক না রেখেই উপস্থাপন করে।

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে প্রথম এবং প্রধানতম কথা তিনি আজীবন নিঃসঙ্গ। তবে এই নিঃসঙ্গতায় তিনি খুব একটা ব্যথিত নন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> [... ... ...] বিবিক্ত হতে না-পারলে নিজের ভেতরকার শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। একা থাকা, একা বসে ভাবা, কোনো-একটা দাবিদার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকা– এসব যার ভাগ্যে ঘটে নি, সে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ জানে না।[১]

জন্ম থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁর জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পর মা মারা যান, পিতা এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় বিবাহ করেন। মাতামহ-মাতামহীর কাছে বেড়ে ওঠেন তিনি, কিন্তু পিতৃতুল্য মাতামহও মৃত্যুবরণ করেন অল্প দিনের মধ্যেই। দিদিমার ক্রোড়ে বড় হয়ছেন। সে সময় তিনি বাইরের লোকের সঙ্গেও মিশতেন না। স্কুল-কলেজের জীবন সম্পর্কে বলা যায় :

> স্কুল ও কলেজ-জীবনে বদ্ধুদেব বসু তেমন কোন আড্ডায় মিশতেন না, কিংবা বলা যায়, মিশতে পারতেন না। শিক্ষাঙ্গনের সময়টুকু ছাড়া সারাটা দিন বাড়ির চার-দেয়ালের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখতেন তিনি। সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব কিংবা পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে বৈকালিক আড্ডা বা খেলাধুলায় মেতে-উঠতে কোথায় যেন তাঁর বড় অনীহা।[২]

এমনকি তিনি কলেজে পড়াকালীন নিজে একা একা হাতে লেখা পত্রিকা লিখতেন। সে পত্রিকা সম্পর্কে বলা যায় :

> সম্পাদক, কবি, গল্পকার, প্রবন্ধ রচয়িতা এবং হয়তো পাঠক-ও সে একাই।[৩]

ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন তিনি। এ সময় তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করেন, লেখার জন্য বিভিন্ন কবি-লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়, তারপর বন্ধুত্ব। স্নাতকোত্তর শেষে ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতা যান। ১৯৩৪ সালের ১৯ জুলাই তিনি প্রতিভা সোমকে বিয়ে করেন এবং এ মাসেই রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। কিন্তু এ কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। কারণ একদিকে তিনি ঢাকার ডিগ্রিধারী, অন্যদিকে সাহিত্যে আমদানি করেছেন 'অশ্লীলতা'। সমস্ত জীবনই তাঁকে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। রিপন কলেজে তিনি চাকরি করেছেন এগারো বছর। এরপর অপমান অসহ্য পর্যায়ে গেলে ১৯৪৫ সালে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে অন্য চাকরি খুঁজতে থাকেন আর চলে তাঁর অবিরাম লেখনী, এবং বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য বক্তৃতা। এরপর ১ আগস্ট ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দান করেন। তবে ১৯৬৩ সালে এ পদ থেকেও তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল, কারণ বিদেশে অধ্যাপনার আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছয় মাসের ছুটি দিলো না– তিনি চাকরি ছেড়ে ব্লুমিংটনে গেলেন। ১৯৩৭ সালের ১ জুন বালিগঞ্জে তাঁর বিখ্যাত ২০২-এর ফ্লাটে ভাড়াটে হয়ে উঠেছিলেন পরিবার এবং মাতামহীসহ, এখানে কাটিয়েছেন ত্রিশটি বছর। এই বাড়িতেই একলা থাকা বদ্ধদেব বসুর আড্ডা জমে ওঠে। এইটিই বদ্ধুদেব বসুর 'কবিতাভবন'– প্রকাশনার জমজমাট দিন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংসারটাও জড়িয়ে যায় এই ফ্ল্যাটের সঙ্গে। এ সময় তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুও লিখছেন। প্রতিভা বসুর

সম্পাদনা-প্রকাশনায় পত্রিকাও প্রকাশ শুরু হলো। ছোট-বড়, আত্মীয়-বন্ধু, প্রকাশক-লেখক, ভক্ত-পাঠক, প্রত্যাশী-কবি– সকলের এক জমজমাট আড্ডাস্থল হলো এই 'কবিতা ভবন'। তিনি নিজের সম্পাদনায় 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

বুদ্ধদেব নাগরিক জীবন ভালোবাসতেন– উপভোগ করতেন। দময়ন্তী বসু সিং এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> বাবা নগর ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন নিজের ঘরের টেবিলে বসে লিখতে লিখতে বারবার বাইরে তাকিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর প্রাণচঞ্চলতা দেখতে। ট্রাম-বাস-গাড়ির অবিরাম শব্দ তাঁকে কখনো বিড়ম্বিত করেনি, বিঘ্নিত করেনি তাঁর মনোনিবেশ।[৪]

বহু মানুষের এই মেলবন্ধনেও তিনি একা ছিলেন। বস্তুতপক্ষে বলা যায় তিনি নিঃসঙ্গবিলাস মানুষ। তাঁর বিভিন্ন চিঠি এ সাক্ষ্য বহন তরে। যেমন :

ক.
৩ অক্টোবর ১৯৬২
যাকে আমরা বাড়ি বলি, সেখানেও কত পর্বতের মতো নিঃসঙ্গতা, কত অন্ধকার, কত শূন্য প্রহর![৫]

খ.
৬ ডিসেম্বর ১৯৬৫
আমার স্বভাবের খুব গভীরে একটা বিষাদবোধ আছে– বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা স্বভাবতই বেড়ে চলেছে– কিন্তু বাইরের দিক থেকে আমি মানুষটা 'ফুর্তিবাজ' গোছের, একটু উসকানি পেলেই দপদপ করে উঠি– আমার ভালো লাগে হাসি তর্ক গল্প আড্ডা রসিকতা– সেই দিকটা বুভুক্ষু থাকলে নিজেকে কেমন নির্জীব লাগে। (পৃষ্ঠা-১০৯)

গ.
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
আজকাল আমাদের এমন দুর্দশা যাচ্ছে যে, ডাকবাক্স প্রায়ই খালি থাকে, অর্থাৎ তার গহ্বর থেকে রুশি ও মার্কিনি কনস্যুলেটের বিজ্ঞাপন বা বড়োজোর এক-আধটা নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া কিছুই বেড়িয়ে আসে না। আমার অহমিকায় আঘাত লাগছে রীতিমতো– মনে হচ্ছে জগৎসংসার আমাকে ভুলে যাচ্ছে। (পৃষ্ঠা-১৪৮)

ঘ.
২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
জানতাম না, আমি এত ভালোবাসি নির্জনতা-এমনকি নিঃসঙ্গতা– আমার মতো আড্ডা-পাগল মানুষ! (পৃষ্ঠা-২২৮)

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে দেখা যায়, বাড়িতে অনেক মানুষের মাঝে তিনি একা, আবার তিনি এই একাকিত্ব ভালোও বাসেন। তাঁর জীবনের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন রূপ। শৈশব-কৈশোর-যৌবনে তিনি নির্জনে একা থাকতেন, এরপর 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশের পর তাঁর নির্জনতা কমতে থাকে এবং 'কবিতাভবনে' আসার পর তাঁর আড্ডাময় জীবন শুরু হয়, শুরু হয় বিভিন্ন সভাসমাবেশ সেমিনারে যাওয়া, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কলেজে বক্তৃতা করা। এরপর আবার তিনি নাগতলার বাড়িয়ে স্থিত হয়ে বসেন। তবে এ কথা সত্য জীবনের প্রতিটি ক্ষণেই তিনি একা এবং নিজস্ব চিন্তা-দর্শনে অবিচল।

বুদ্ধদেব বসু ছোটবেলা থেকেই কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। নোয়াখালী থাকাকালীন সময়েই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন প্রবলভাবে। তাঁদের তৎকালীন বাসস্থান 'ডেলনি হাউস' মেঘনার ভাঙনের মুখে পড়লে তিনি ব্যথিত হন এবং ইংরেজি ভাষায় লেখেন কবিতা 'ডেলনি হাউস'। নোয়াখালী থাকাকালীন সময়ই তিনি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়েই তিনি ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন সাময়িকীতে কবিতা পাঠাতেন– ঢাকার তোষিনী, কলকাতার অর্চনা, নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৩ সালে তিনি আসেন ঢাকায়। সাহিত্যের দ্বার তাঁর কাছে খুলে যায়। ১৯২৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় 'রজনী হলো উতলা' গল্প প্রকাশিত হয়। এ সময়ই তিনি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ হন। ১৯২৭ সালে নিজের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার বৃত্তির কুড়ি টাকা সম্বল করে নিজের বাসস্থান '৪৭ নং পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা'কে কার্যালয় করে অজিত কুমার দত্ত ও তাঁর নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি'। এ সম্পর্কে তিনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে চিঠিতে লিখেছেন :

> আষাঢ় মাস থেকে আমরা 'প্রগতি' ছেপে বার করচি। মস্ত দুঃসাহসের কাজ– না? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আর ফেরা যায় না। একবার ভালো করে চেষ্টা ক'রেই দেখিনা, কি হয়।[৬]

'ভালো করে চেষ্টা' করে পত্রিকা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা তিনি পরবর্তীতেও অব্যাহত রেখেছেন। 'প্রগতি পত্রিকা'য় লিখেছেন, প্রভু গুহঠাকুরতা, পরিমল রায়, মনীশ ঘটক, অজিত দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রগতি' সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিভিন্নভাবে তিনি লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, খরচ কুলিয়ে ওঠার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, যে কোনো উপায়ে 'প্রগতি'কে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। নিচের চিঠিগুলো এ কথা প্রমাণ করে :

> ক.
>
> ৮ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি
>
> আপনি আমাদের হাতে যে কটি কবিতা দিয়েছেন, তার মধ্যে দুটি তো 'কল্লোলে'ই ছাপা হল। বাকিগুলো যেন অন্য কোথাও ছাপা না হয়। আমরা আস্তে আস্তে 'প্রগতি'তে তুলবো। [... ... ...] আপনার একটি গল্প চাই-ই। [... ... ...] 'উত্তরা'তে আপনার নাকি খুব influence আছে। সেখানে বলে কয়ে একটা বিনি-পয়সায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন কি?[৭]
>
> খ.
>
> ৫ই আশ্বিন রাত্রি
>
> নেপেনদার একটি লেখার জন্যও আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই, তবে সে আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন পূর্ণ হবে কি-না জানিনে।[৮]

'প্রগতি' নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু তিনি কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। সে এক প্রচণ্ড মানসিক টানাপোড়েন। নিচের উদ্ধৃতিগুলো তার প্রমাণ :

> ক.
>
> ২৪শে জানুয়ারি

> প্রগতি আগামী বছর চলবে কিনা, এখনও ঠিক করি নি। সাধ তো আকাশের মত প্রকাণ্ড; কিন্তু পুঁজিতে যে কুলোয় না। এ পর্যন্ত এর পেছনে নিজেদের যত টাকা ঢালতে হয়েছে, তার হিসেব করলে মন খারাপ হয়ে যায়। এরূপ পুরোপুরি লোকসান দিয়ে আর এক বছর চালানো সম্ভব নয়।
>
> এখনো অবিশ্যি একেবারে হাল ছেড়ে দিই নি;[৯]
>
> খ. ১৯ ফেব্রুয়ারি
>
> [... ... ...] প্রগতিকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই বোধহয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না।[১০]

এমনি আশা-নৈরাশ্যের দোটানায় তাঁর সম্পাদক জীবন দ্যোতিত হয়েছে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি। একটি পথ বন্ধ হলে আরেক পথে সংগ্রামে নেমেছেন। জীবন তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে নি– জীবনের কাছে তিনি ষোল আনা আদায় করে নিয়েছেন। স্থায়ীভাবে কলকাতা যাওয়ার পর তাঁর 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ নিয়েও প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নতুন এবং পুরাতনের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা আদায় করে নিতেন, তেমনি সাহিত্যজগতে নাম না জানা কোনো নতুন লেখকের লেখা জনসম্মুখে প্রকাশ করতেন। অর্থাৎ তিনি যোগ্যকে যোগ্য স্থান দিতেন। তাঁর এই উদ্যোগ বৃথা যায় নি। বলা হয় কবি বা লেখক সর্বদ্রষ্টা। তিনি সমর সেন সম্পর্কে যে আশা রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তা সত্য হয়েছে। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫– এর চিঠিতে বলেছেন :

> একজন কবির রচনা আমরাই প্রথম প্রকাশ করলাম– সমর সেন। [... ... ...] সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি এখন পর্যন্ত অপরিচিত [... ... ..] এঁর সম্বন্ধে মস্ত আশা পোষণ করতে বাধে না।[১১]

সমর সেন সত্যিই সাহিত্যসমাজে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন,– সেই 'মস্ত আশা' পূরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও সমর সেনের কবিতা ভালো লাগে। এ সম্পর্কে তিনি বুদ্ধদেবকে চিঠিও লেখেন। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে নতুন কবিদের কবিতা সম্পর্কে আশাবাদের পরিচয় মেলে :

> তোমাদের পত্রিকা নূতন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।[১২]

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এ পত্রিকাটিকে স্বাগত জানাতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হন নি। তিনি অনেক চিঠিতেই 'কবিতার নূতন পথ তৈরি' করতে বলেছেন। অযোগ্যের অযোগ্য আলোচনায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জানিয়েছেন। বলেছেন :

> সাহিত্যের হাটে যাদের কারবার ভিড়ের লোকের কথার কোলাহলে তাদের ক্ষুব্ধ হলে চলবে না। [... ... ...] যা মনে রাখবার অযোগ্য তা নিয়ে মনের মধ্যে জঞ্জাল জমিয়ে লাভ কি?[১৩]

এগিয়ে যাওয়ার পথে এর চেয়ে বড় পাথেয় আর কি হতে পারে? বিশাল জনগোষ্ঠীর সকলেই তো সকল কিছু গ্রহণ করবে না, তাই বলে কোনো মহৎ উদ্যোগ বিফলে যেতে পারে না। এমন কি 'কবিতা' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', সমালোচনা করলেও তিনি তা মেনে নেন। অর্থাৎ 'কবিতা' সত্য বলতে কাউকে ছেড়ে দেয় নি– রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। আবার রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা গ্রহণ করেছেন নিঃসঙ্কোচে।

কারণ, এ বোধ তাঁর নিজের মনেও দ্যোতিত হচ্ছিল। তিনি সত্যকে ভলোবাসেন– 'কবিতা'য় প্রকাশিত সত্য তাই ভালো না বেসে পারেন নি। এই 'কবিতা' পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করতে বুদ্ধদেব বসু অতিক্রম করেন কণ্টকাকীর্ণ বহু পথ। বারবার লেখকদের চিঠি লিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা চিঠিগুলোতে পাওয়া যায় তিনি কবিতা-গল্প চেয়ে চিঠির পর চিঠি লিখেছেন, নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছেন। পত্রিকার সমৃদ্ধির জন্য এক প্রাণপণ চেষ্টা। যোগাযোগ দৃঢ় করতে ও আত্মসমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একা এবং সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এসেছেন। এতেই বোঝা যায়, একটু একটু করে বুদ্ধদেব বসু যেমন লেখকে পরিণত হন, তেমনি সফল সম্পাদকেও।

মানুষ কেবল লেখকের লেখার সঙ্গেই পরিচিত হয়, কিন্তু আড়ালে থাকেন লেখক নিজে। এই আড়ালের মানুষের প্রতি পাঠকের কৌতূহল চিরন্তন। যখন আবিষ্কৃত হন, তখন পাঠক অভিভূত হয়ে পড়েন। পাঠকের অনেক কাঙ্ক্ষিত বিষয় লেখকের ব্যক্তিজীবন। বুদ্ধদেব বসুর চিঠিপত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে। একজীবনে মানুষের কত ঘটনাই না ঘটে, জীবন কখনো স্থির নয়, ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে চলে– বুদ্ধদেব বসুও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর একান্ত ঘরের কথা-নিরাভরণ জীবনের কথা প্রকাশিত হয়েছে কন্যার কাছে লেখা চিঠিতে।

রাত জেগে লেখাপড়া লেখকের একটি সাধারণ বিষয়। তবে বুদ্ধদেব বসু লেখার আলাদা ঘর ছিল না। দময়ন্তী বসুর স্মৃতি কথায় আছে :

> টেবল্ ল্যাম্পের দু'পাশে দুটি বই দিয়ে আলো আড়াল করে নিতেন– যাতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। [... ... ...] কতদিন নিঃশব্দ মধ্যরাতে হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছি বাবা গভীর মগ্নতায় লিখছেন– অন্ধকার ঘরে এক টুকরো আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর সুন্দর মুখ। (পৃষ্ঠা- ii)

লেখকের ছিল দুই ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। তার একটিতে তাঁর দিদিমা এবং বড় মেয়ে মিমি থাকতেন, অন্যটিতে একটি খাটে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে, অন্য খাটে তিনি এবং ছোট মেয়ে দময়ন্তী ওরফে রুমি। রুমি অনেক দিন রাতে বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য জেগে থাকতেন, কিন্তু প্রতীক্ষা শেষে ঘুমিয়ে যেতেন, তখনো লেখক লিখছেন। লেখকদের ব্যক্তিজীবন এরকমই। পরিবারের লোকেরা কথা বলার সময় পায় না, যতক্ষণ লেখার টেবিলে বসে থাকেন ততক্ষণ কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারে না। আবার লেখকরা তো এক দিকে ধ্যানী, পরিবারের লোকেরা তাঁর ধ্যান ভাঙাতেও ভয় পায়, পাছে কোনো মহৎকর্ম নষ্ট হয়। তারপরও লেখক যদি গৃহী হন, তাঁকে গৃহের বহুদিকে মনোনিবেশ করতে হয়– সবকিছু মিলেই তিনি সম্পূর্ণ মানুষ। ছেলে পাপ্পা যখন জন্মায় তখন রুমির ছয় পুরতে তিন মাস বাকি। মায়ের কোল থেকে নির্বাসিত হয়ে সে বাবার খাটে আশ্রয় নিল। এবং এ সময় থেকেই বাবার সঙ্গে তার সখ্য। বুদ্ধদেব মেয়ের প্রতি সচেতন হন। ছ'বছরের জন্মদিনে তিনি মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখলেন– 'পরিমা-র পত্র– রুমিকে'। এবং শুধু এতেই ক্ষান্ত হলেন না, একটি চকোলেট ও কবিতাটি রুমির বালিশের নিচে রেখে দিলেন। অভিভূত হলো মেয়ে রুমি। বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের লেখায় এই রুমিকে বহুবার দেখা যায়। আবার যখন স্ত্রী প্রতিভা বসু লিখতে শুরু করলেন, তখন তাঁর লেখক হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখে তিনি স্ত্রীকে সম্পাদক করে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আস্তে আস্তে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ হলো।

অর্থাৎ নিজেকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন না, পরিবার এবং শিল্পের প্রতি তিনি সমান দায়বদ্ধ ছিলেন। প্রতিভা বসুর থিয়েটার চর্চাকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর দুই মেয়েও নাটকে অভিনয় করেছে।

কন্যা রুমির সঙ্গে তাঁর চিঠির সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। যখন রুমি বিদেশে পড়তে গেলেন। রুমি বারবার বলেছেন কেবলমাত্র বাবার জন্যই তার ডক্টরেট ডিগ্রি হয়েছে। মেয়ের একাডেমিক প্রতিষ্ঠা এবং লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। এমনকি ছেলেমেয়েদের খাওয়া, বিদেশের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখেছেন তিনি। তাই তাঁর পত্র সাহিত্য নিছকই পত্র নয়, ব্যক্তি বুদ্ধদেব বসুর প্রতিনিধিও বটে। রুমিকে রাত্রে প্লেনে তুলে দিয়ে এসে পরদিন সকালেই তিনি চিঠি লিখতে বসেন এবং এর যাত্রা চলে ১১ মার্চ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। প্রথম চিঠিতে তাঁর মেয়ের প্রতি উদ্বেগ ধরা পড়ে। তার টাকাকড়ি ট্রাভেলার্স চেক হাতের কাছে নিরাপদে আছে কি-না, কোথায় গিয়ে একাউন্ট খুলতে হবে, ট্রাভেলার্স চেকগুলো জমা না দিয়ে নিজের কাছে রাখা ভালো, আবার চেকগুলোর নম্বরের স্লিপটা হারানো চলবে না, ব্যাগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে 'ক্লথস অ্যান্ড পারসোনাল এফেক্টস ওনলি' বলতে হবে— তাহলে ব্যাগ নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না, পথে বেশি করে খেতে হবে, স্যুটকেসে চাবি লাগাতে পারলো কি-না ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কথা চিঠিময় ছড়ানো। দূর বিদেশে রুমির মন টিকছিল না বলে বুদ্ধদেব মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কথা লিখে তাকে সেখানে স্থির হয়ে পিএইচডি শেষ করতে উৎসাহ দেন। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন :

> একবার পড়াশুনা আরম্ভ হয়ে গেলে আর মন-খারাপ করার সময় পাবি না। [... ... ...] পশ্চিম দেশগুলোকে প্রত্যক্ষ করাতেই কিছু সার্থকতা আছে। [... ... ...] ভেবে দ্যাখ কী ঐশ্বর্য এখন তোর হাতের কাছে– কত ছবি, বই, মিউজিয়াম, জ্ঞান, শিল্পকলা, চিত্তপ্রসাদ। তা ছাড়া কত দেশের মানুষ পাবি ইন্ডিয়ানার ক্যাম্পাসে, জগৎ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে ফিরে আসবি। [... ... ...] আর তোর প্রথম কদিনের কষ্ট? পরে যখন উপন্যাস লিখবি তখন দেখবি সেগুলিও কাজে লেগে যাচ্ছে। জীবনে কিছুই ফেলা যায় না। (পৃষ্ঠা-২)

লেখকের এই কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সন্তানের কাছে দায়বদ্ধ এক পিতা। আবার এতে শুধু মেয়ের প্রতি উপদেশ বা উৎসাহই প্রকাশ পায় নি, লেখক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনীয় উপাদান 'অভিজ্ঞতা' সম্পর্কে মতামতও ব্যক্ত হয়েছে। শুধু সমকালীন দেশ নয়, বিশ্বায়নের প্রতি আকৃষ্টতাও এখানে চিহ্নিত হয়। এছাড়া, কত ছোট কথাও যে তিনি মেয়েকে লিখেছেন! শুধুমাত্র 'কলম কেনার' বিষয়েই লিখেছেন অনেকগুলো চিঠি। সে সম্পর্কে রুমি জানিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসুর কালির কলমের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি, তাঁর ভয় ছিল রুমি শেষ পর্যন্ত 'ডট-পেন' দিয়ে লিখতে শুরু করেন, তাই এত কথা। লেখকের ছেলেমানুষি আবেগ এখানে প্রকাশ পায়। এরকম ছেলেমানুষি আবেগ দেখি ২০২-এর ভাড়া বাড়ি থেকে নিজেদের নাকতলার বাড়ি যাওয়ার সময় তার মন খারাপ হয়, তারপরও যেহেতু যেতে হবে তাই তিনি আর কিছুদিন থেকে ঠিক ত্রিশ বছর পূর্ণ করে যেতে চান। মেয়েকে দেশীয় আবহে রাখতে তিনি 'বিচিত্রা', 'উল্টোরথ', 'দেশ' নিয়মিত পাঠাতেন। এছাড়াও পাঠাতেন প্রচুর বাংলা বই। জানতে চাইতেন সেখানকার সমস্ত কথা। আবার গরম আর ঠাণ্ডা জল মেশাবার

কায়দাটা পর্যন্ত তিনি চিঠিতে লিখে দিতেন। খাওয়ার বিষয়ে লেখাও বাদ পড়ে নি। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা পড়ে সত্যিই একজন স্নেহময়ী, দায়িত্বশীল, চিন্তারত পিতাকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> ক.
>
> ডর্মে প্রথম কয়েকদিন তোর খাওয়ার কষ্ট হবে। [... ... ...] ওদের মাছ (ভালো রেস্তোরাঁয় ছাড়া) প্রায়ই আঁশটে লাগে– অবশ্য চিংড়িকে 'মাছ' বলে না– মাংসই বেশি নিস। ফলাহারী হয়ে প্রাণধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য টেকবে না। বিফে অভ্যস্ত হতে হবে। ও রকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর মাংস ভূ-ভারতে নেই। [... ... ...] একটা সবুজ তরকারি রোজই খাবি [... ... ...] অন্যান্য সময়ে খাবার জন্য ঘরে রেখে দিবি দুধ, আঙুর, আপেল। (পৃষ্ঠা-৪)
>
> খ.
>
> আমি শুনতে চাই যে তুই দিনে তিনবার নির্ভুলভাবে সময়মতো ভোজনালয়ে উপস্থিত হচ্ছিস [... ... ...] বাড়িতেই বা এমন কী হাতি-ঘোড়া খাও বাপু? রসগোল্লা– যা হাতে নিলে কাপড়-জামার জাত থাকে না? [... ... ...] বাড়ির রান্না কিছু ভালো লাগছে না আমার। (পৃষ্ঠা-৭)

এমনিভাবে রুমির খাওয়া সম্পর্কে লিখেছেন বুদ্ধদেব। এখানে দেখা যায়, তিনি কতটা উদার ছিলেন যে, বিফ আর মদের কথাও মেয়েকে বলেছেন, বলেছেন পরিমিত সবই প্রয়োজনীয়, ধর্মের সকল কথাই গ্রহণযোগ্য নয়– মানব ধর্মটিই আসল। আবার বাড়ির খাবারের প্রতি আকৃষ্টতা কমিয়ে সেখানকার খাবারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এতে প্রকাশ পেয়েছে অনেক ছেলেমানুষি। এবং সব কিছু মিলিয়ে পিতৃহৃদয়ের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়েছে। অনেক স্বাস্থ্য আর আনন্দ নিয়ে মেয়েকে দেশে ফিরে আসতে বলেছেন তিনি। আমেরিকায় আম নেই, কিন্তু তরমুজকে বলেছেন স্বর্গীয়। অর্থাৎ কোনো কিছুরই অভাব টের পেতে দিতে চান নি তিনি। নিজের মধ্যে শান্ত আর সংবৃত থাকতে বলেছেন। মেয়েকে এমনভাবে বলেছেন যেন আমেরিকায় স্বর্গীয় সুখ। আবার আমেরিকানদের মতো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে বারণ করেছেন, বলেছেন ঘুম না এলে যেন সে চিঠি লেখে, বই পড়ে। এতেই বোঝা যায় বুদ্ধদেবের পিতৃত্ব প্রবল ছিল। সন্তানের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। ছেলে পাপ্পা ভূগোলে 'এ' পেয়েছে বলে তিনি এতো খুশি হয়েছিলেন যে এ সংবাদ রুমিকে লিখতে ভোলেন নি। খুশি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রুমির ফরাসিতে পাসের খবর পেয়েও। কিন্তু তাঁর তিন ছেলেমেয়েই ইংরেজিতে কাঁচা বলে তাঁর কষ্টের সীমা ছিল না। রুমি পিএইচডির কাজে গাফিলতি করছিল বলে তিনি বারবার তাকে ডিগ্রিটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন, মনকে স্থির করতে বলেছেন, দরকার হলে কলকাতায় তাদের বাড়ি এসে খসড়াটা লিখতে বলেছেন, নিজে প্রুফ দেখে দিয়েছেন, বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন, সামাজিক বা রাজনৈতিক কটূ কথা আড়াল করেছেন। শেষ পর্যন্ত যে বাবার জন্যই রুমির পিএইচডি হয়েছিল তা তার কথায় পাওয়া যায় :

> একদিন বললেন, দ্যাখ্, এই যে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় তোকে দু-বছর ধরে ফেলোশিপ দিয়েছিল, তার বদলে ওদের তুই কী দিলি? [... ... ...] কী ওরা তোর কাছে বিনিময় চেয়েছিলো বল? তুই যে কাজ করবি সেটা ওই বিভাগের কাজ হবে। এটুকু প্রতিদান কি

তোর ওদের দেওয়া উচিত নয়? ডিগ্রি যদি শেষ না করিস তাহলে ঋণশোধ করা হবে না তোর।"(পৃষ্ঠা-১৭১)

এই কথাটি রুমির মনে লেগেছিল। তাই তিনি এ কাজটি শেষ করলেন। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন– 'অবর্ণনীয় আনন্দ' হয়েছে তাঁর। এরপর একে বই আকারে বের করতে চেষ্টা করতে বলেছেন। চিঠিতে লিখেছেন তাঁর আবেগের কথা। যে মেয়েটি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলো, সে মার্কিনি ডক্টরেট ডিগ্রিধারী হলো, বুদ্ধদেবের কাছে এ যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ। বাবা হিসেবে তাঁর আবেগ যে প্রবল ছিল, তা ৭ মে ১৯৬৩ সালের একটি চিঠিতে ফুটে উঠেছে :

> তুই-পাপ্পা-মিমি-জ্যোতি– তোরা ভালো থাকবি, সুখী হবি– আজকাল এর চেয়ে কাম্য আমার আর কিছুই মনে হচ্ছে না। যাদের ভালোবাসি তাদের সকলেরই ভালো হোক। (পৃষ্ঠা- ৪৬)

অন্যদিকে, বড় মেয়ে মিমি সপরিবারে আমেরিকায় চলে গেলে তাঁর কাছে 'সারা শহরটা অকস্মাৎ যেন নিঃশব্দ হয়ে যায়। বাৎসল্যপ্রেমের এ এক অনন্য উদাহরণ। বাবা হিসেবে যেমন তিনি সার্থক ছিলেন, তেমনি সার্থক দাদু হিসেবেও। তাঁর নাতি-নাতনীর বিভিন্ন কথা চিঠির পাতায় অংকিত হয়ে আছে। বড় নাতনী তিতিরের কথা পাওয়া যায়, যাওয়া যায় বুয়ান, নিয়ানের কথা। বুয়ানের জ্বরে তিনি চিন্তিত হয়েছেন, আবার বুয়ান যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, পরিচারিকার সঙ্গে অভ্যস্ত হচ্ছে তা জেনে তিনি খুশি হয়েছেন। বারবার রুমিকে সাবধান করেছেন বুয়ানের নিরাপত্তার ব্যাপারে। তিতিরের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি-হুটোপুটিতে তাঁরা যেন বন্ধু। এমনকি তাঁদের মধ্যে জুতো লুকানো খেলাও চলেছে। তিতিরের ভেতরে লেখক তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের অতীত দেখে বিস্মিত হন। তিতিরের কচি গলায় 'ও রুমি, ও রুমি, আমায় চিনবে নাকো তুমি, আমি তোমার পরি-মা'– শুনে বুদ্ধদেব অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি লেখেন রুমিকে সেই আনন্দ-বিস্ময়ের কথা। তিতির স্কুলে অঙ্ক পারে নি, বিশেষণ কালে বলে– লিখতে পারে নি বলে, তিনি শিক্ষাপদ্ধতিকে দোষারোপ করেছেন। তাঁর মতে বাচ্চা বয়স থেকে এতো পড়ার চাপ দিয়ে বাচ্চাদের স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট করছে। আবার রুমিরা যখন নাকতলায় আসছে, তখন বুয়ানের প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে রুমিকে লিখেছেন :

> কানপুরে বুয়ানের যে-সাইকেল আছে সেটা নিয়ে আসার চেষ্টা করিস, [... ... ...] সাইকেলের অভাবে বুয়ান কষ্ট পাবে। (পৃষ্ঠা-১৭৪)

এ যাত্রা রুমি বেশ কিছুদিন নাকতলায় ছিলেন। তাই বুয়ানের সঙ্গে বুদ্ধদেবের বন্ধুতা গড়ে ওঠে। ছাদে তিনি বুয়ানের সঙ্গে ফুটবল পর্যন্ত খেলেন। তারা চলে গেলে তাই তিনি মেয়েকে চিঠি লেখেন তিনি খেলার সাথীর অভাব বোধ করছেন। আবার ছোট্ট বুয়ানকে তিনি চিঠিও লেখেন। নাতি-নাতনীদের নাম নিয়েও তিনি বিভিন্ন বোধ অবলম্বন করেছেন। যেমন, মহাভারতের কথা চিন্তা করে পাপ্পার ছেলের নাম রাখেন 'দ্বৈপায়ন', নিয়ানের ঋত্বিকা নাম নিয়ে খুঁতখুঁত করেন। কিশোরী তিতির যে অনেক সময় ধরে ফোনে কথা বলে তা নিয়ে তিনি তিতিরকে ঠাট্টা করে 'নন্দিনী' বলেন। এই সকল ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সাদাসিধে বাঙালি মধ্যবিত্ত ব্যক্তিজীবন ফুটে ওঠে। বিভিন্ন চিঠির ভিত্তিতে স্বামী হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তাঁর স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীলতা ছিলো প্রচণ্ড রকমের। রুমি সংসারে বাবা-মায়ের একটি তুলামূলক চিত্র দিয়েছেন :

> বাবা যেহেতু সাহিত্যচর্চার মধ্যেই মগ্ন থেকেছেন চিরকাল, মা-ই ছিলেন সংসারে সর্বেসর্বা। জমি-বাড়ি মা-র আগ্রহ, বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিবিক্ত ছিলেন সে ব্যাপারে। [... ... ...] সাংসারিক ব্যাপারে বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞ, মা ছিলেন সর্বেসর্বা। (পৃষ্ঠা-xii)

তবে, প্রতিভা বসু যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই শেষ বয়সে বুদ্ধদেব বসু সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো– সারা জীবনই বুদ্ধদেব তাঁর স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই স্ত্রীর প্রসঙ্গ এসেছে। রোদ লেগে স্ত্রীর মাথা ধরেছে, বা হোমিওপ্যাথিতে তাঁর অসুখ ভালো হয়েছে, ব্লুমিংটনে হঠাৎ একদিন জ্বর হয়েছে সঙ্গে গা-ব্যথা মাথা-ধরা, আবার নিজে নিজেই তা ছেড়ে গেলো– এ সব ছোট অথচ ভালোবাসার কথা তিনি বলেছেন। দেশে-বিদেশে যেখানেই তিনি গেছেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েছেন বেশিরভাগ সময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের বাড়িতেও স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

> রাণুও (প্রতিভা বসু) এমন একটি গভীর অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছে যে, তার মুখে আনন্দময় স্মৃতিকথা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে থেকে- থেকেই। অবসর সময়ে, এমনকি কাজের সময়েও, শান্তিনিকেতনের কথা বলাবলি করেই দু'জনে কাটাচ্ছি।[১৪]

স্ত্রীর প্রতি তাঁর অপরিসীম আবেগ ধরা পরে। সংসার চালানো বিষয়ে, বাড়ি বানানো বিষয়ে স্ত্রীর পটুতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, তাঁর কাছে ম্যাজিক মনে হয়েছে– তিনি স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে তা মেয়েকে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন :

আমি তো ভাবতেই পারি না কী করে তোর মা এত বড় একটা কাণ্ড করে তুললেন। (পৃষ্ঠা-৪৪)

বুদ্ধদেবের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কোনো সাহিত্য পড়ে নিশ্চয়ই এ তথ্য পাওয়া যেতো না, কিন্তু চিঠির কথাগুলো বুদ্ধদেবকে একেবারে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছে। তিনি নিজের আবেগের সঙ্গে স্ত্রীর আবেগেও সমান উদ্বেলিত হয়েছেন। দেখা যায় ব্লুমিংটনে বরফ দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন সে কথা যেমন তিনি লিখেছেন, আবার স্ত্রীর কথাটিও লিখতে বাদ দেন নি। প্রতিভা বসুর মনে হয়েছে– 'বরফ কোলে নিয়ে চা খাচ্ছি'। নিশ্চয়ই স্ত্রীর এই কাব্য-কথা তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। তিনি সব সময় চাইতেনও প্রতিভা বসু জমি-বাড়ি-বেড়ানো বাদ দিয়ে বিশ্রাম নিয়ে এবং লেখার কাজ নিয়ে থাকুক। কিন্তু প্রতিভা বসু দশভুজার মতো সকল দিক সামলে চলেছেন। এমন কি তিনি থিয়েটার নিয়েও বাড়াবাড়ি রকম মেতে ছিলেন। বুদ্ধদেবের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতে তিনি উঠেপড়ে লাগতেন– বিস্তর খাটুনি ও অর্থ ব্যয় হলেও। স্ত্রীর এই নিষ্ঠায় তিনি অভিভূত এবং গর্বিত হতেন নির্দ্বিধায়। স্ত্রীর বিষয়ে তিনি আবেগপ্রবণও ছিলেন। নিচের উদ্ধৃতিতে তা স্পষ্ট হয় :

ভাবছি তোরা মার্চে এলে তোর মা-র জন্মদিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু করা যাবে। (পৃষ্ঠা-২১১)

এ রকম উৎসবী মনোভাব অনেক আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতেও পাওয়া যায়। তিনি তখন ঢাকায়, তিনি লিখেছেন :

> পূজোর ছুটিতে আমাদের নানাজাতীয় উৎসব করার প্ল্যান্ আছে– সেই উৎসবের মধ্যে আপনাদের যদি পাই, তবে উৎসবের দেবতার বোধন-কার্য সার্থক জ্ঞান করি।[১৫]

ঢাকা থাকাকালীন সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম একবার ঢাকায় তাঁদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখেছেন :

> এবার তাঁর সঙ্গে ভালোমত আলাপ হল। একদিন আমাদের এখানে এসেছিলেন;– গানে, গল্পে, হাসিতে একেবারে জমাট করে রেখেছিলেন। এত ভালো লাগলো![১৬]

মানুষকে কাছে পাওয়া, এবং তাকে নিয়ে মেতে ওঠার এই আবেগ তাঁর আমৃত্যু ছিল। প্রতিভা বসু যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তাঁকে ভালো করার জন্য বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। শুশ্রূষার জন্য আয়া ঠিক করা, মনমতো হয় না বলে বাতিল করে আবার নতুন আয়া আনা, পাপ্পার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজে সংসারের ভার নেয়া, প্রতিভা বসুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু নিজে শৈশব-কৈশোরে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চিঠিগুলো পড়লে দেখা যায় তিনি স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ সংসারী বুদ্ধদেব বসু পুরোটাই সার্থক।

ব্যক্তিজীবনে বুদ্ধদেব বসু খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না। খুব ছোটবেলায় তাঁর মাতামহের মৃত্যু থেকেই তাঁর অর্থনৈতিক দুরবস্থা শুরু হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। তাঁকে অনেক হিসেব করে দিনপাত করতে হয়েছে। তাই তিনি নিজে ছিলেন মিতব্যয়ী, আবার সন্তানদেরও উপদেশ দিয়েছেন মিতব্যয়ী হতে। এমন কি শৌখিন কেনাকাটা এবং উপহার পাঠানোও তিনি অপছন্দ করেছেন। ১৯৬৪ সালে ব্লুমিংটনে তিনি যখন সস্ত্রীক তখনও নাইলনের শার্ট কিনে লন্ড্রি খরচ বাঁচিয়েছেন। তার মানে এই নয় যে তিনি কঞ্জুস ছিলেন, ছিলেন হিসেবি– এ হিসেব সব সময় সচ্ছলভাবে জীবন ধারণের জন্য, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্টে পড়তে না হয়। ছেলেমেয়েরা ভালো চাকরি পেয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করবে এই স্বপ্নও তিনি সব সময় দেখতেন। লেখক হলেও বৈশ্বয়িক হিসেব তাঁকে ছাড়ে নি। নিচের চিঠির অংশটুটু তার প্রমাণ :

> বিবিধ টেলিফেন ও ইলেট্রিক বিল, তার উপর পাপ্পাকে তিরিশ ডলার পাঠালি, নিশ্চয়ই আমার পাঠানো টাকায় সব কুলিয়ে যায় নি? তোদের এত খরচ হচ্ছে ভাবতে ভারি খারাপ লাগছে আমার। [... ... ...] অপেক্ষা করছি উইসকন্সিনে আমার প্রাপ্য সেই ১০০ ডলারের খবরের জন্য। এ মুহূর্তে আমার অর্থবল ক্ষীণ, মাথার উপর ইনকাম-টাক্স ঝুলছে, পাপ্পার দেনা আছে ১০০ ডলার– এই সব কারণে সব ব্যাপারে খুব ভেবেচিন্তে পা ফেলছি আজকাল। আমি তোর মা-র মতো আশাবাদী নই, এক-এক সময় যেন দুশ্চিন্তার ঝাঁক ছেঁকে ধরে। (পৃষ্ঠা-১০৪)

মূলত, প্রতিভা বসুই সংসারের হাল ধরে ছিলেন। বুদ্ধদেবের সম্পদ ছিলো শুধু বই। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ছবির বই, কবিতার বই, 'মহাভারত', দামি-দামি অভিধান, কবিতার সেট, কাগজপত্র, চিঠি, পাণ্ডুলিপি– এ সবকেই তিনি জীবনের একমাত্র সঞ্চয় বলেছেন। দেশ-বিদেশের অনেক বই তিনি কিনতেন। আবার তাঁর জীবিকাও বই লেখা। তাই কলেজ স্ট্রিটে নকশালদের রণক্ষেত্র দেখে বই প্রকাশ বিষয়ে চিন্তিত হতেন। এই চিন্তা ভাগ করে নিতেন মেয়ের সঙ্গে, চিঠির মাধ্যমে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়েও তিনি চিন্তা করতেন। দেশের কৃষিব্যবস্থা উন্নত হলে কিছু সমস্যার সমাধান হবে বলে ভাবতেন। সংসারের বিবিধ হাঙ্গামায় নিজেকে জড়াতে তাঁর এতোটুকুও ভালো লাগতো না। কিন্তু সংসার-বিধাতা বড় বেশি নির্দয়– কাউকেই ছাড়েন না। বুদ্ধদেব এ সম্পর্কে বলেছেন :

> সংসারে বেঁচে থাকতে হলে এগুলোর হাত এড়ানো যায় না, সময়মতো যথাকর্তব্য করতেই হয়– নিজের স্বভাবের পক্ষে যতই তা বিরোধী হোক। (পৃষ্ঠা-৯৯)

অর্থাৎ সংসার সকল মানুষকে দিয়েই কর্তব্য করিয়ে নেয়। তাই ইচ্ছে করলেও পাপ্পাকে হোস্টেলে রেখে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বিদেশে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে তিনি প্রতীচ্যের মা-বাবার সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে কিছুটা ঈর্ষান্বিত হন। তারপর পাপ্পাকেও নিয়ে যান আমেরিকায়। আবার পাপ্পা যখন সংসারী হন, তখন তাকে স্বাধীন জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। সংসারের নানা কর্তব্যকে মাথায় নিয়েই তিনি নিজের স্বভাবের কাজগুলো করেছেন। তাই কলেজ লাইব্রেরিতে হঠাৎ দ্যা ভিঞ্চির জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস পড়ে নতুন সম্পদ আবিষ্কারের সুখ অনুভব করেন। রুমি তাঁকে বই কেনার জন্য হাজার টাকা দিলে তিনি যেন তেষ্টার সময় ঠাণ্ডা জল পান। বাংলাসাহিত্যের আরেক দিকপাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়– লেখাই যাঁর ছিল একমাত্র জীবিকা, তাঁকে দিয়েও সংসার হাজারো কর্তব্য করিয়ে নিয়েছে। সংসারের এতো কর্তব্যের পরও তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। বরং তাঁদের এই কর্তব্যজ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুকরণীয় হয়ে আছে।

প্রকৃতি তার বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে মানুষের সামনে প্রতীয়মান। প্রকৃতির সুধা পান করে যুগে যুগে মানুষ অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, নীল আকাশ, উথাল-পাথাল সমুদ্র, দৃঢ়প্রত্যয়ী পাহাড়, পাহাড়ি ঝর্ণা, সবুজ বনানী, তুষারপাত, বৃষ্টির শব্দ, শরতের বৈচিত্র্যময় আকাশ যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করে। আর যিনি কবি অথবা লেখক তিনি এর সৌন্দর্যের মূলে প্রবেশ করেন এবং সৃষ্টি করেন সাহিত্যালোক। বুদ্ধদেব বসু পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি অবলোকন করেছেন, যার প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। শুধু সাহিত্যেই নয় ব্যক্তিচিত্তেও জাগিয়েছে অনাবিল আনন্দ। অথবা এ কথাও বলা যায় প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য তাঁকে সাহিত্যিকের দ্বারে প্রবেশে সাহায্য করেছে। যান্ত্রিক কোলাহলে কলকাতার বৃষ্টিও তাঁকে আনন্দ দিয়েছে। নাকতলার বাড়ি সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> কলকাতার প্রধান আকর্ষণ দশ-ঘণ্টা-লম্বা মৃদুশীতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি। বিশেষত এই নাগতলার বাড়িতে তারা বড় সুন্দর হয়ে দেখা দেয় ও বিদায় নেয়। সকালে রোদে ভেসে যায় বারান্দা ও ছোট-একতলার ঘর, আমি স্নানের পরে একবার ছাতে যাই গেঞ্জি তোয়ালে শুকোতে দিতে, আর একবার যাই দুপুরে খাওয়ার আগে– পায়চারি করি, আধো ছায়ায় ঢাকা দক্ষিণের ছাতের কার্নিশে বসে থাকি, এই পাড়ার সব কুশ্রীতার উপরে ঝরে পড়ে নীলিমার লাবণ্য। (পৃষ্ঠা-২০৯)

এই কথায় খুলে গেছে লেখক মনের দুয়ার। কুশ্রীর ওপর, অসুন্দরের ওপর সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই শিল্পীর কাজ। শিল্পের চোখে তাই সুন্দর অপার সুন্দর হয়ে ধরা পরে। দার্জিলিঙে টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় দেখে তিনি বলেছেন, 'এইটা পৃথিবীর মধ্যেই অন্যতম দ্রষ্টব্য।' কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশ্রেণী সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য একই রকম। আবার বুদ্ধদেব সমস্ত সুন্দর শুধু নিজে দেখেই ক্ষান্ত হতেন না, প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করতে চেয়েছেন সকল সময়ই। তাই তিনি ছেলে-মেয়েদেরকেও এই সৌন্দর্য দেখতে বলেছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন :

> ফিরে এসে একবার দার্জিলিঙে বেড়িয়ে যাস– জ্যোতি মিমিরও একবার আসা উচিত– বাংলাদেশে জন্মে দার্জিলিং ও পুরী না-দেখার ক্ষমা নেই। (পৃষ্ঠা-১৫)

আবার শান্তিনিকেতনের অপার সৌন্দর্য তাঁকে আপ্লুত করেছিল– রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে তা পাওয়া যায়। তিনি শুধু দেশের সৌন্দর্যই নয়, বিশ্বপ্রকৃতিও তাঁকে অনাবিল সুখ দিয়েছে। নিউইয়র্ক-এর ফাল্গুনের হাওয়ায় যখন তাঁর ঘর 'ভেসে যায়' তিনি উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। উপমহাসাগরের এই সৌন্দর্য রুমি দেখতে পেলেন না বলে তিনি চিঠিতে আফসোস করেছেন। বুদ্ধদেব যখন ব্লুমিংটনে, তখন সেখানকার তুষার শুভ্রতা দেখে বাড়িগুলোকে মনে হয়েছে রাজহাঁস বা ব্যালেরিনা। এই 'নয়ন-ভোলানো' দৃশ্য দেখবার জন্য তিনি রুমিকে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৪-এর চিঠিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ আমন্ত্রণে যেন মেয়েকে তিনি মিনতি করেছেন। এর মাধ্যমে যেমন প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ চোখে পড়ে, তেমনি প্রিয়জনের প্রতি আবেগও ধরা পড়ে। তিনি যে ভীষণভাবে আপ্লুত, তা তাঁর নিচের কথাতে আরো স্পষ্ট হয় :

> আজ দিনটা কাটলো একেবারে মালার্মের রাজহাঁস– পুঞ্জ তুষার, উজ্জ্বল রোদ, আকাশে নির্মল নীলিমা– পথে বেরোলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। 'দেখলাম দু-চোখ ভ'রে, হে প্রভু, হে ঈশ্বর মহাশয়।' (পৃষ্ঠা-৭৫)

হনলুলুর প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়। সেখানকার সাজানো গ্রামগুলোকে তাঁর মনে হয়েছে বাংলাদেশের খোড়ো ঘরের মতো বা নোয়াখালী জেলার মাচার উপরে তৈরি ঘরের মতো। (পৃষ্ঠা--৮৩)

বুদ্ধদেবের প্রকৃতি প্রেম বিস্ময়কর, আবার এগুলো যে প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার মানস– তাও তাঁকে উচ্চে উদারতায় স্থান দেয়।

রুমিকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠিগ্রলোকে সূক্ষ্মভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁর ভেতরে বিশ্বায়নচেতনা ছিল। মেয়েকে তিনি বারবার বিভিন্ন দেশে লোকেদের সঙ্গে মিশতে বলেছেন, নিজের দেশের নিয়মের সঙ্গে অন্য দেশের নিয়মকে তুলনা করে দেখতে বলেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের ঠিকানা মেয়েকে দিয়েছেন। নানা লোকের সঙ্গে মেশা, অপেরা বা গানবাজনা শোনা ও দেখা, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণই ছিলো তাঁর কাছে আসল শিক্ষা। ১৯৬৩ সালে ইটালিতে-গ্রিসে শীতে লোক মারা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে তুষারপাতে ক্ষতি হয়েছে– এসব দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। বুদ্ধদেবের বিশ্বায়নের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তিনি কখনো চান নি তাঁর পরিবারের মানুষেরা চিরদিনের জন্য বাংলা ত্যাগ করুক, বা বাংলা ভুলে যাক। তিনি মেয়েকে চিঠি লিখেছেন :

> যা গতিক দেখছি আমার নাতি-নাতনীরা সবাই না 'ইন্দে-অ্যাংলিয়ান' হয়ে যায় এই আমার এক দুশ্চিন্তা– আমার মনের একটা অংশ দিনে-দিনে আরো ইংরেজবিরোধী হয়ে উঠছে। (পৃষ্ঠা-২০৮)

এ বিষয়ে রুমি জানিয়েছেন, তাঁর একটি নাতনী ছাড়া সকলেই প্রবাসী হয়েছে এবং বড় মেয়ে এবং মেয়ে-জামাইও মার্কিনবাসিন্দা। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের আশংকা অমূলক ছিল না।

চিঠির পাতায় বুদ্ধদেব বসুর অভিমানী চরিত্র ফুটে ওঠে। যেমন মানুষকে ভালোবাসতেন, তেমনি মানুষের ভালোবাসার প্রত্যাশী ছিলেন– তা পরিবারের লোক হোক বা বাইরের কেউ। এ জন্য আঘাত পেয়েছেন বারবার। সন্তানদের চিঠি না পেলে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়তেন। মনে করতেন সবাই তাঁকে ভুলে গেলো। আবার তাঁর

কথার অবাধ্য হয়ে বড় মেয়ে মিমি সিনেমার শুটিং-এ গেলে তিনি আহত হন। অভিমান করে রুমিকে লেখেন :

> পুত্রকন্যা বড় হয়ে গেলে, বিশেষত কন্যারা বিবাহিত হলে তাদের ওপর মা-বাবার কোনো 'কর্তৃত্ব' থাকার কথাই ওঠে না আজকের দিনে– তারা যা-কিছু করে তা-ই মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুতা বজায় রেখে চলতে হয়। (পৃষ্ঠা-১৭২)

এ কথায় ধরা পড়ে তাঁর অভিমানী মন। অভিমান করেই তিনি রিপন কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন। যাদবপুরের চাকরি ছাড়েন। তিনি বলেন :

> যে যাদবপুরকে এত ভালোবেসেছিলাম, তার কথা ভাবতে এখন বিবমিষা হয় আমার। (পৃষ্ঠা-৭৪)

দেখা যায় কোনো কিছুর উপর থেকে মন উঠে গেলে তিনি তাতে আর ভালোবাসা অর্পণ করতে পারেন নি। আবার অনেক অল্পতে খুশি হয়ে উঠতেন। তাঁর ছাত্রী সুহৃতা নিজের বিয়ের সংবাদ দিলে তিনি খুশি হন। তাঁর মনে হয় জীবনের পরম মুহূর্তে সুহৃতা যে তাঁকে স্মরণ করেছে, শিক্ষক হিসেবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নেই। খুশিতে তিনি রুমিকে পর্যন্ত সুহৃতাকে চিঠি লিখতে বলেন। বিদেশী বন্ধুরা তাঁকে ছবিকার্ড পাঠালে তিনি ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে ওঠেন, তাঁর মনে হয় তাঁদের প্রীতি যেন রোদের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এর জন্য তিনি ভাগ্যের কাছে পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানান। তবে দেশে তাঁর সমমনা বন্ধু তিনি পান নি বলে অভিমানে মন বিষাদে ভরে উঠেছে। তিনি মেয়েকে বলেছেন :

> নিজের মনে নিজের কাজ নিয়ে থাকি বলেই টিকতে পারছি– তবু এক-এক সময় অবসাদ আক্রমণ করে আমাকে, বিদেশ ঘুরে এলে সেটা কেটে যায়। (পৃষ্ঠা-১৬)

এতে বোঝা যায় দেশে তিনি স্বদেশ-স্বজাতির কাছে অনেক অবহেলা পেয়েছেন। তবে ভালোবাসা যে পান নি তা নয়, যারা ভালো বেসেছেন তাদের প্রতি তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ। তিনি লিখেছেন :

> আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের প্রত্যাখ্যান করার মতোও মনের জোর নেই আমার; নরেশ, প্রণবেন্দু, অমিয়, মল্লিকমশাই– এঁদের ভালোবাসার চেয়েও আমার ব্যক্তিগত সম্মান-অসম্মানকে বড় আসন দিতে যেন বিবেকে বাধে। (পৃষ্ঠা-৬৩)

তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে লেখক হচ্ছে না বলেও তিনি তাঁদের প্রতি অভিমানী ছিলেন। বারবার তাদের লেখার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। রুমিকে 'ওয়াশিংটনের চিঠি' লিখতে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন। পাপ্পাও ছদ্ম নামে কিছুদিন লিখেছিলেন– তার লেখার হাত দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু পাপ্পাও আর লেখাটাকে চালিয়ে গেলেন না– কষ্ট পেলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব বসুর মানস সম্পর্কে দময়ন্তী বসুর মূল্যায়ন কথায় তাঁর উদারতা, স্বার্থহীনতা প্রকাশ পায় :

> বুদ্ধদেব বসুর স্বভাবের মহত্তম দিক ছিলো সবাইকে বিকশিত হতে উৎসাহিত করা। [... ... ...] "যার মধ্যে যেটুকু গুণপনা আছে (সেটা যতো ছোটই হোক), তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার না-করাটা অন্যায়, এটা আমি ধর্মের মতো বিশ্বাস করি"– জীবন ভরে এর প্রমাণ অসংখ্যবার দিয়েছেন তিনি, সামান্য প্রতিভা দেখলেও তার স্বীকৃতি দিয়ে। নিজের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র বিষয়েও তার অন্যথা হয়নি। (পৃষ্ঠা-১২৪)

এ সম্পর্কে বলা যায় সমর সেনের কথা, প্রতিভা বসুর কথা, পাপ্পা বা রুমির কথা, এমন কি তাঁর নাতি-নাতনীদের কথা পর্যন্ত।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠিগুলোতে তাঁর জীবনদৃষ্টি তথা দর্শন পরিলক্ষিত হয়। রুমি জানিয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর কাছে মেয়েরা ছিলো ঘরের শোভা এবং মেয়েরাই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তুলনামূলকভাবে বেশি পারে। তিনি রুমিকে সাহস দিতে লিখেছেন যে, 'মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ এবং সর্বসময়ের নির্ভর এ নিজে।' এই কথা তিনি শুধু মেয়েকে যে সাহস দিতেই লিখেছেন, তা নয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজে বিশ্বাস করেছেন এবং পথ চলেছেন। তাই তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলো প্রকট। তিনি বলেছেন :

> যতদিন আমার কাগজের উপর কলম চলছে ততদিন আমার বেকার হয়ে পড়ারও আশঙ্কা নেই। (পৃষ্ঠা-১০৯)

এই যে নিজের প্রতি নির্ভরতা, তা প্রতিটি মানুষের জন্য সমান প্রযোজ্য। তাঁর কাছে 'মানুষের' মূল্য ছিল অনেক। তাই চলার পথে যে কোনো মানুষের ক্ষণিকের ভালোবাসাকেই তিনি মূল্যবান মনে করতেন। জীবনের সকল ঘটনাই ক্ষণস্থায়ী, তাঁর মতে প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনার মধ্য দিয়ে যেহেতু জীবন প্রবহমান, তাই প্রতিটি ঘটনাই মূল্যবান। জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, মনের কথা– সকল কিছুই তিনি জীবনের সার্থক মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মত হলো :

> পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ভালো বলে কিছু নেই। (পৃষ্ঠা-৪৬)

কোনো কোনো সময় তিনি স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। মানুষের জীবন এমনই। একেক সময় একেক ঘটনায় একেক রকম মনে হয়।

ধর্ম এবং জীবন সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নানা কথার উদয় হয়। লেখকরা তাকে নিজস্বতায় একে একমুখী করেন। কিন্তু চিঠিপত্রে লেখক তো লেখক থাকেন না, থাকেন নিছকই ব্যক্তি। তাই তাঁর প্রত্যক্ষ চিন্তা নির্লিপ্তভাবে উঠে আসে। সেখানে নিজের মনের নানামুখী কথা প্রকাশ পায়, যা সাধারণ মানুষ চিন্তা করেন :

> কী করে যে সময় কেটে যায় কিছুই বোঝা যায় না; মানুষ শৈশব থেকে যৌবনে উঠে এসে, তারপর বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়ে, কতই তার বদল হয় অথচ আসলে সে একই থাকে– তার সেই এক থাকার রহস্য কী, এই সব দার্শনিক চিন্তার উদয় হচ্ছে আমার মনে। আমাদের মধ্যে সেই যেটুকু 'এক'– যা বহু পরিবর্তনেও অবিকল থাকে– তাকেই হয়তো 'ব্রহ্ম' বা 'পরমাত্মা' নাম দিয়েছে আমাদের দেশে– কিন্তু মৃত্যুর পরেও সে থাকে কিনা, গীতার কৃষ্ণের কথা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, এ-সব প্রশ্নের অবশ্য কোনো উত্তর নেই– কিংবা আগামী প্রলয় পর্যন্ত তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। (পৃষ্ঠা-১১৪)

এ একেবারে আটপৌরে চিন্তা, যেন লেখক নন, সমাজের কোনো সাধারণ মানুষ। এই 'আগামী প্রলয়' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট করেন নি, হয়তো ধর্মীয় এই কুয়াশাচ্ছন্নতা তাঁর মনেও স্পষ্ট ছিলো না। অন্যদিকে, তাঁর মতে খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শুধু সন্ন্যাসী করে– তাকে সংসারী করে না, কিন্তু গীতা জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বড় করেছে। তাই তিনি গীতার ধর্মকে 'কেজো' বলেছেন। আবার তিনি ভাগ্যেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন :

> আমরা যাকে ভাগ্য বলি সেটা একটা মৌলিক ব্যাপার; আমরা যে আমাদের দেশ, মাতৃভাষা বা মা-বাবা বেছে নিতে পারি না, এতেই তো বোঝা যায় আমরা গভীরতম অর্থে কতটা পরাধীন। (পৃষ্ঠা-১৮৬)

তিনি আবার বলেছেন, মনুষ্য ধর্ম হলো, সৎকর্ম, নিরপরাধ কর্ম, সৃষ্টিশীল কর্ম, অপ্রিয়কে প্রিয়ে রূপান্তরিত করা । তাঁর মতে লাখ কথার এক কথা – 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে'। – এরকম তাঁর নিজের নানা দর্শন চিঠিগুলোতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব রাজনীতি বিষয়টিকে এড়িয়ে চলেছেন। তিনি বলেছেন :

> রাজনীতি এমন একটা কূট ও জটিল বিষয় যে তোর বা আমার মতো মানুষের পক্ষে সেটা এড়িয়ে চলাই ভালো মনে হয়। (পৃষ্ঠা-১০৬)

তবু কিছু কিছু রাজনৈতিক কথা মেয়ের সঙ্গে বলতেন। যেমন, ১৯৬২ সালে 'জরুরি অবস্থা' কে তিনি সমর্থন করেছেন (১৭ পৃষ্ঠা), কম্যুনিস্টদের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন (১৮ পৃষ্ঠা), ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা, ছাত্র-আন্দোলন, পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত, স্কটিশচার্চ কলেজের বিজ্ঞানবিভাগের ল্যাবরেটরি পোড়ানো, হরতাল ইত্যাদি নিয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন (৫৪ পৃষ্ঠা), খাদ্যের অভাব বা মূল্যবৃদ্ধি (৯৭ পৃষ্ঠা), কলকাতার রাস্তার নাম বদল (১১১ পৃষ্ঠা), দুই বাংলার ভেতরে প্রীতি সঞ্চার করা, জাতি হিসেবে ইন্দোনেশিয়া বা পাকিস্তানের মতো নিচে নেমে না যাওয়া, (১০৬ পৃষ্ঠা), পূজোর সময় চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য (১৩৪ পৃষ্ঠা), ১৯৭০-এ নকশালদের দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্নতা (১৭৭ পৃষ্ঠা), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়া (১৯৭ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি লেখার ধরন চমৎকৃত করে। প্রথম জীবনে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এবং শেষ জীবনে রুমিকে লেখা– প্রতিটি সময়েই দেখা যায় সাবলীল এবং অসাধারণ আঙ্গিকে চিঠি লিখেছেন। শুরুতে কিংবা শেষে কোনো একটি নিজস্ব বাঁক তৈরি করেছেন। রুমিকে লেখা একটি চিঠির শুরুটা তিনি এভাবে লিখেছেন :

> এখন সন্ধ্যে আটটা– চারটে থেকে ডেস্ক কপির জন্য চিঠি টাইপ করছিলাম, কুড়িটা শেষ করে থেমেছি। ক্লান্ত হয়েছি, মেরুদণ্ড টনটন করছে, চোখেরও তেমন জ্যোতি নেই তো আর। একফোঁটা স্ক-পানির এই হলো সময়। সেই সঙ্গে একটু গল্প করা যাক তোর সঙ্গে। (পৃষ্ঠা-৬২)

দু'হাতে লিখেছেন লেখক। কিন্তু মানুষের ক্লান্তি আসে। বুদ্ধদেবও এর থেকে রক্ষা পান নি। অসুখে বা দুশ্চিন্তায় তাঁরও চিঠি লিখতে, কাজ করতে, কোথাও বেড়াতে যেতে অনিচ্ছা জেগেছে। রুমিকে লেখা তাঁর ৮৫, ৯৩, ১০০,১১২ নং চিঠিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখকের জন্য লেখা বিষয়টাও খুব সহজ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকদের বলেছেন 'কলম পেষা মজুর', বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে এ কথা সত্য। অনেক সময়ই তিনি প্রেরণা থেকে লেখেন নি, লিখেছেন জীবিকার তাগিদে। তিনি বলেছেন :

> কত সময় আমার শূন্য মনে হয় নিজেকে, যেন কিছুই ভাবতে পারছি না, একটা কথাও মাথায় আর খেলছে না– তবু মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে কিছু একটা বের করেছি, ধরতে চেয়েছি, সাহস করে শুরু করে দিয়েছি, প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য নিয়ে যুদ্ধ করে-করে এগিয়েছি– আমার সেই কষ্টের কথা কাউকে বলার নয়। (পৃষ্ঠা- ১৮৩)

অনেক সময়ই লিখেছেন, প্রবন্ধ বা উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু এগুতে পারছেন না। অনেক সময়েই তাঁর লেখা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করেছে। আবার নাটক লিখতে গিয়েও শোচনীয় অবস্থায় পড়েছেন, হয়তো পূজোর সংখ্যা

বেরোনোর সময় হয়েছে, তবু তাঁর লেখা শেষ হয় নি। একাধিক বার উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিতে চেয়েছেন কিন্তু রোজগারের জন্য পারেন নি। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এতো শোচনীয় ছিল যে সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর লেখা নিয়ে চিত্রনাট্য করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি রীতিমতো দরকষাকষি করেন। তাঁর জীবনের শেষ চিঠিটিতেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কথা আছে। যারা তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করে তাদের কাছে রয়ালটির টাকা চেয়েছেন মেয়ের মাধ্যমে। তখন পর্যন্ত তিনি লিখে চলেছেন, আশা করে চলেছেন :

> কাজের স্তূপ জমে আছে, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। [... ... ...] আমি চেষ্টা করছি চলনসই শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রসন্নতা নিয়ে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে– আর বছর দশেক টিকে যেতে পারলে কয়েকটা কাজ সমাধা হয়। আমার বর্তমান লেখার রেট : সারা দিনে আট ঘণ্টা খেটে পঁচিশ-তিরিশ লাইন গদ্য– সময় বেশি চাই। [... ... ...] তুই তোর কলেজের কথা অনেকদিন কিছু লিখছিস না, আশা করি তৃতীয় বছরেও UGC-Christ Church দুটোই রাখবি– পড়াশুনার সঙ্গে কোনো রকম একটা সংযোগ থাকা ভালো। (পৃষ্ঠা-২৫৫-২৫৬)

লেখক চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯৭৪ সালের ১১ মার্চ আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৭ মার্চ। তাঁর এই বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের উদ্বেলিত-বিষণ্ন করে, তাঁর কাজের আকাঙ্ক্ষা, লেখার প্রতি নিষ্ঠা, পড়াশোনার প্রতি নিজস্ব চিন্তাধারা আমাদের অনুপ্রণিত করে। কোনো মহৎ কাজ হয়তো তিনি করতে চেয়েছিলেন সেই কাজ থেকে বাংলাসাহিত্যে বঞ্চিত হওয়া সত্যিই বেদনাদায়ক।

বুদ্ধদেব বসুর আশ্রয়স্থল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বিভিন্ন চিঠি এবং বিভিন্ন আচরণ সে সাক্ষ্য দেয়। রুমিকে সাহস দিতে তিনি লিখেছেন :

> রুমি তোর অন্তর বিকশিত হোক, এই আমার তোর জন্য বিজয়ার আশীর্বাদ। 'অন্তর মম বিকশিত করো–' এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আর নেই। কী করে বিকশিত হবে? তারও উত্তর র.ঠা. দিয়ে গেছেন– মায়ের আঁচলের তলায় নয়, বিশ্বের সঙ্গে সংযোগে। (পৃষ্ঠা-১০)

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতি তাঁর আস্থা, যা তিনি সন্তানকে বলেছেন অর্থাৎ তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিলো না। শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, কিন্তু তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন মানেই ছিল রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে তাঁর কাব্যিক মন প্রশান্তিতে ভরে গেছে। তিনি বলেছেন :

> ক.
>
> শান্তি নিকেতনে তিনদিন আপনার আতিথেয়তার ও সান্নিধ্যে যে আনন্দ ও শান্তিতে কাটিয়েছি, আমার পক্ষে তা অতি দুর্লভ ও মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কলকাতায় আমাদের জীবনের তাল এত দ্রুত, ব্যস্ততার চাপ এত অবিরাম, অবসর এত অল্প ও উৎকণ্ঠিত যে শান্তিনিকেতনের পরিপূর্ণ প্রশান্তি আমার মনকে খুব প্রবলভাবেই দখল করেছিল। সে-প্রশান্তি প্রাকৃতিক, কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক নয়; আপনার জ্যোতির্ময় নিকটবর্তিতাই গভীর আনন্দের উৎস।[১৭]
>
> খ.
>
> আপনার শান্তিনিকেতন হ'য়ে রইল আমার মানসগৃহ– নিজ গৃহের চাইতেও আপন ও প্রিয়।[১৮]

তবে কিছু পত্রিকা একেবারেই বুদ্ধদেবের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তারা অপপ্রচার চালাতে কোনো দ্বিধা করতো না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের কথা বিকৃত করে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁকে ছোট করতে সচেষ্ট হয়েছে। এর জন্য তাঁকে অনেক ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে। চিঠিতে বিস্তারিত লিখে নিজের কথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ে একাধিক চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর সর্বাঙ্গীণ শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় ১৯৪১ সালে রবীন্দ্র-জন্মদিনে 'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যা বের করার মধ্য দিয়ে, যাতে শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ হয়। এ পত্রিকা প্রকাশ করবার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেন, তিনি যেমন চাইবেন এ সংখ্যা তেমন-ই হবে, কারণ এ সংখ্যাটি একান্তই রবীন্দ্রনাথের নিজের। এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় তাঁর নিজের উদারতাও। এতে বলা যায় রবীন্দ্রনাথে তিনি লীন। তবে নিজের যুক্তিতে তিনি অটল। তাই রুমির নাম রবীন্দ্রনাথ যখন 'কাকলি' রেখেছিলেন, নাম পছন্দ নয় বলে তিনি সে নাম রাখেন নি, মেয়ের নাম রাখলেন 'দময়ন্তী'। আবার তিনি সমালোচনাও করেছেন :

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায় আমার কিন্তু একেবারেই ভালো লাগে না আজকাল। (পৃষ্ঠা-৪৮)

তবে তাঁর চিঠিতে এর বিপরীত কথাও পাওয়া যায় :

ক.

তুই আবার রবীন্দ্রনাথ পড়ছিস শুনে আনন্দিত হয়েছি– সত্যি, ঐ একটি সোনার খনি আছে আমাদের, যদিও কোনো-কোনো বিষয়ে আমি এখন নতুন করে রবীন্দ্র-বিরোধী, তবু হঠাৎ এক-একটা মুহূর্তে ছেলেবেলার মতোই স্বর্গসুখ পাই তাঁর কাছে। (পৃষ্ঠা-১৫৬)

খ.

ভারতবর্ষ বিষয়ে এমন কোনো চিন্তা নেই যা রবীন্দ্রনাথ ভাবেন নি, আধুনিক ভারতের এমন কোনো সমস্যা নেই যা তাঁর চিত্তে প্রতিভাত না হয়েছিলো। (পৃষ্ঠা-২১৬)

এরূপ বহু স্ববিরোধী কথা তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করেছেন, সমালোচনা করেছেন। তাঁকে লেখা ৩৬টি চিঠিতে এ সত্য উপলব্ধ হয় :

ক.

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

তোমার এই গল্পটি বাইরে থেকে নানা উপকরণে সাজানো জিনিস নয়, এ ভিতর থেকে আপন ভাবপ্রাচুর্যে আপনি জেগে ওঠা। [... ... ...] ভালো লেগেছে এই সহজ কথাটি ছাড়া আর বলবার কথা নেই।[১৯]

খ.

৩ অক্টোবর ১৯৩৫

তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মত হয়নি।[২০]

গ.

২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

> তোমার বইখানি নিঃসংশয়েই ভালো লাগলো, তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি। গল্প হিসেবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে। [... ... ...] তুমি যেন উদ্ধতভাবেই জানিয়েছ এতে তোমাদের হস্তক্ষেপের দরকার নেই, সব দরজাতেই লটকিয়ে দিয়েছ অনধিকার প্রবেশ অনভিপ্রেত।[২১]

ঘ.

২২ মার্চ ১৯৪০

> কবিতায় যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে।[২২]

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের সমালোচনা করেছেন বিস্তর। যেমন :

ক. ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

> একটা কথা বলে রাখি, 'কুন্তলা' নামটা ভালো লাগল না। কুন্তল মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা।[২৩]

খ. ৩০ অক্টোবর ১৯৩৫

> তোমার 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' পড়ে মনে হোলো লেখাগুলোতে আলোর ঝলকানি ভালো করে লাগে নি।[২৪]

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীলও ছিলেন। তাই তাঁর যে কোনো লেখা প্রকাশিত হলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন এবং মতামত চাইতেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ১০৩৩-এর চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মত। [২৫]

রবীন্দ্রনাথের আলোচনা তাঁর কাছে রক্ষাকবচ হয়েও দেখা দিয়েছে, নিজের পথ চলা নিষ্কন্টক করেছে। তিনি বলেছেন :

> 'বাসরঘর' সম্বন্ধে আপনার চিঠি পেয়ে সার্থক মানছি লেখক জন্ম। [... ... ...] যে দেশে উপন্যাসের পাঠক পাব্লিক লাইব্রেরীর চাঁদা দেনেওয়ালা রেলের বাবু ও ভোজনান্তশ্লথাঙ্গী-ডেপুটি-গৃহিণী, সে দেশে এ ধরনের বই পাগলের প্রলাপ। আপনার এই চিঠিটি প্রকাশিত হলে উপন্যাসের এই নতুন রূপটির একটু দাঁড়াবার জায়গা হয়তো হয়– অবশ্যি সেই সঙ্গে আমারও পায়ের নিচে মাটি ঠেকে। [... ... ...] আপনার স্বীকৃতির কথা শুনলে লোকের হয়-তো একটু চমক লাগবে : হয়-তো তার পুরোনো ও প্রিয় সংস্কারের মোহ কাটিয়ে এই নতুন গল্প-রূপকে বোঝবার চেষ্টা করবে।[২৬]

নতুন আঙ্গিক আনয়ন সাহিত্যক্ষেত্রে এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, সাহিত্য কেবল লেখকনির্ভর নয়, পাঠকনির্ভরও। পাঠকের স্বীকৃতিই সাহিত্যের মূল প্রাণ। তাই পাঠক সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু সচেতন ছিলেন। আবার নিজস্ব দর্শন-রীতিতে ছিলেন অবিচল। তাই এ দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা চিঠির উদ্ধৃতিটুকু থেকে তাঁর বোধ বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্মা-করোতোয়ার বুকে জলিবোটে, শাহজাদপুর-ঝিনাইদহ-পতিসরে যে রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদন করেছেন তা ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দ্রানী দেবীকে চিঠিতে লিখেছেন, যা তাঁর ছিন্নপত্র নামে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর যদি শুধু এই চিঠিগুলোই থাকতো, তবু তাঁকে চিনতে এবং তৎকালীন সমাজকে জানতে সর্বোপরি তাঁর মানস জগৎ বুঝতে বেগ পেতে হতো না। আজকের একবিংশ সভ্যতার বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারের ফলে সাহিত্যজগৎ পত্রসাহিত্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে বঞ্চিত হচ্ছে লেখকের একান্ত ব্যক্তিচেতনা আবিষ্কার থেকেও। বুদ্ধদেব বসুর এই চিঠিগুলো তাঁর ব্যক্তিমানসকে যেভাবে উপস্থাপন করে যে, আড়ালের কোনো কথা আর নেই। এই চিঠিগুলোর কারণে পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধদেব বসুকে পাওয়া যায়। সাহিত্য জীবনের দর্পণ– এ কথা সত্য; তবে এও সত্য যে সাহিত্যে হুবহু লেখক নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখান না– দেখান বৃহত্তর সমাজজীবনকে।– এরই মধ্যে পাঠক খুঁজে ফেরেন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু চিঠিতে ফুটে ওঠেন লেখক নিজে। বিশেষ করে সন্তানের কাছে যে চিঠি– তা তাঁর অন্তরাত্মার প্রতিফলন। বুদ্ধদেব বসুর রুমিকে লেখা চিঠিগুলো তাই এক অর্থে তাঁর জীবন-কথা। অন্যদিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠিতে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার চমৎকার দলিল। চিঠির বুদ্ধদেব বসুকে তাই আমরা অনায়াসে ছুঁয়ে দিতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর চিঠি কনিষ্ঠ কন্যা রুমিকে, সম্পাদনা দময়ন্তী বসু সিং, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২২৯
২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭৭
৩. সূত্র-প্রাগুক্ত
৪. দময়ন্তী বসু সিং, আমার স্মৃতি, বুদ্ধদেব বসুর চিঠি কনিষ্ঠ কন্যা রুমিকে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-xix
৫. বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯; এরপর থেকে এই গ্রন্থের উদ্ধৃতির পৃষ্ঠা নম্বর উদ্ধৃতির পাশে দেয়া হবে।
৬. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, ৪ খণ্ড, ১৯৮০, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫৩
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬০
১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৪
১১. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, ৩ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১০
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, ৩ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯৪
১৪. বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩৩
১৫. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, ৪ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৪
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৫
১৭. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, ৩ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২০
১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩২
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮১
২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮২
২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৫
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০৯
২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১২

বুদ্ধদেব বসু : কবিতার প্রকরণ

মাহবুব সাদিক

ত্রিশোত্তর কবিরা আবেগ, চৈতন্য ও মনন-সংবেদনের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আধুনিক বাংলা কবিতা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁরা আধুনিকতার পরিপোষণ করেছেন— কবিতার প্রকরণে সঞ্চার করেছেন মননশীল জটিলতা। তাঁদের রচনায় রূপায়িত হয়েছে গূঢ় চৈতন্যোত্থিত সংবেদনার শব্দরূপ, সাংগীতিক ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, ছন্দ-মিল-মধ্যমিল ও অলঙ্কারের নবতর দীপ্তি। বাক্যসংগঠনে জটিলতা সৃষ্টি এবং প্রচলিত শব্দ ও ভাষার নতুন ব্যবহার-বৈচিত্র্যও তাঁদের অবদান। ত্রিশোত্তর কবিতার প্রকরণ-পদ্ধতি তাই আলোচনা-সাপেক্ষ। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।'

কবিতার প্রকরণ-কৌশল ব্যবহৃত শব্দ-সমবায়কে কবিতায় রূপান্তরিত করে। শব্দ সমাবেশ, বাক্যের নির্মাণকৌশল, ছন্দ, অলঙ্কার এবং উপমা-রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্প ইত্যাদির মিলিত সমবায়েই নির্মিত হয় কবিতার শরীর। এই উপাদানসমূহের মধ্যে কোনো-কোনো কবি বিশেষ একটি বা দুটি উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ ঘোষণা করেন, 'উপমাই কবিত্ব'। পাশ্চাত্য সমালোচকদের কেউ-কেউ কবিতার প্রধান উপাদানরূপে রূপকের [metaphor] প্রাধান্য স্বীকার করেন। ছন্দ-মিল-ধ্বনি-সংগীতগুণ— এসব উপাদানের ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবি ও সমালোচক প্রাধান্য আরোপ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : 'কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।' টি.এস. এলিয়ট লিখেছেন যে, প্রত্যেক জাতির শুধু যে সৃষ্টিশীল প্রতিভা রয়েছে তা-ই নয়, কাব্যসমালোচনা ও কাব্য-প্রকরণেও তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট মনোভঙ্গির প্রাধান্য লক্ষ করা যাবে। বাংলা কবিতার প্রকরণের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং আধুনিক বাংলা কবিতায় সেই স্বকীয় প্রকরণ-পদ্ধতির প্রাধান্য অনিবার্যভাবেই পড়েছে। বুদ্ধদেব বসুও বাংলা কাব্যপ্রকরণ-ঐতিহ্যের পরিপোষণ করেছেন এবং একই সঙ্গে প্রতীচ্য কাব্য-প্রকরণের সঙ্গে নিজস্ব ভাষাগত প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন করেছেন।

বন্দীর বন্দনা থেকে *নতুন পাতা* পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসুর আবেগতাড়িত রোমান্টিক-সংবেদনা বর্ণনাপ্রধান কাব্যকলার জন্ম দিয়েছে। আধুনিক কবি কাব্যকলায় বর্ণনা পরিহার করার চেষ্টা করেন। প্রথম পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসু অবাধ বর্ণনার সঙ্গে রোমান্টিক 'উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন' করেছেন। তাঁর রোমান্টিক আবেগ-সংবেদনা প্রথম পর্যায়ের পর অনেকাংশে সংযত হয়ে এলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায়ও এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অন্তর্লীন রোমান্টিক আবেগ তাঁর কাব্যের সর্বত্রই ক্রিয়াশীল। এর জন্যেই তাঁর কবিতায় এসেছে গভীর গীতলতা। এবং এ কারণেই

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায় যুক্তির কাঠিন্য, মেধা ও প্রজ্ঞার শুষ্ক-প্রয়োগ থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখেন। রোমান্টিক আবেগের জন্যই তাঁর চিত্রকল্প ও ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রলতা পেয়েছে রম্য ও নম্র উচ্চারণ, প্রতীক-মালা বিভিন্ন অর্থদ্যোতনায় পেয়েছে রহস্যময় চমৎকারিত্ব। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর আকর্ষণ ছিলো প্রবল। প্রির্যাফেলাইটদের প্রত্যক্ষ বাস্তব-প্রীতি তাঁকে একসময় আকর্ষণ করলেও, প্রথম পর্যায়ে তিনি ইম্প্রেশনিস্টদের আলো ও রঙের ব্যবহার, আলো ও রঙের স্পন্দন, বাতাসের ঘনত্ব, সূর্যালোক ও ছায়ার প্রতিভাস এবং জড় ও জঙ্গমের রূপান্তর-প্রক্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য ছায়াপাত করেছে। সূর্যালোক ও ছায়া, চাঁদ ও নক্ষত্রলোক, আলো-অন্ধকার ও রঙের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্বের রচনায় বিশেষ গুরত্ব পেয়েছে। সপ্তদশ শতকের চিত্রশিল্পী রেমব্রান্টের [১৬০৬-১৬৬৯] আত্মপ্রতিকৃতি-পর্যায়ের চিত্র বুদ্ধদেব বসু পছন্দ করতেন। রেমব্রান্টের বেদনা-বিধ্বস্ত, বার্ধক্য-ক্লিষ্ট, জরাজনিত স্থূল ও নিষ্ঠুর রেখা-সংবলিত লালিত্যহীন ভাবনার প্রভাবে আঁকা মুখগুলোর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো প্রবল। ব্যক্তিবাদী বুদ্ধদেব বসুও শেষ-পর্যায়ের কবিতায় এঁকেছেন প্রচুর আত্মপ্রতিকৃতি— তাঁর বেদনা, বার্ধক্যের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও মোহমুক্ত মনোভঙ্গি রেমব্রান্টের আত্মপ্রকৃতির সঙ্গে অনেকটা মেলে। আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং পার্থিব-বঞ্চনার প্রতি নির্মোহ মনোভাব দু'জনের মধ্যেই লক্ষ করা যায়।

মনোসমীক্ষকদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'internal monologue' বা অন্তঃস্বগতোক্তি— প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু তা ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কবিতার প্রকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মনোবিজ্ঞানের 'association of ideas' বা ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি। অমলেন্দু বসু লিখেছেন : 'ভাবানুষঙ্গ উপমাতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাকধ্বনিতে, পুনরাবৃত্ত বাকপ্রতিমায় বা উল্লেখে, বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও পাওয়া যায়।'

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যের শুরু থেকেই বুদ্ধদেব বসু বর্জন করেছেন অতিকথন এবং উদ্বেল রোমান্টিকতার বল্গাহীন অসংযম। এ পর্যায়ের শেষতম গ্রন্থ *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*-এর কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন রোমান্টিক আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। এ কাব্যের ফর্মে গল্পের কাঠামো লক্ষ করা যাবে। *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* কাব্যগ্রন্থ থেকেই বুদ্ধদেব বসু সন্ধান করেছেন নবতর প্রকরণকৌশল। হতাশা-কণ্টকিত মানসিক অবস্থায় বুদ্ধদেব বসু আমেরিকার পিটস্‌বার্গ-প্রবাসকালে লেখেন 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের টানাপোড়েনে দোলায়িত এই রচনায় আপাত-বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে তাঁকে নতুন সৃষ্টির প্রার্থনা করতে দেখা যায়। এই প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থে। *যে-আঁধার আলোর অধিক* কাব্যের কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছে ভারতে ফেরার পথে জাহাজে এবং লন্ডনের হোটেলে। এই কবিতা কটি 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'র মতো আকস্মিক কোনো রচনা নয়—এরা একটা নতুন আরম্ভ। *যে-আঁধার আলোর অধিক*-এ বুদ্ধদেব সংহত প্রকরণকলার প্রয়োগ করেন এবং তাঁর এই নতুন চৈতন্যের ফসল ধরা দিয়েছে সনেটের রূপকল্পে।

ভাষারীতির দিক থেকে পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ের চেয়ে শেষ-পর্যায়ের রচনায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম পর্যায়ের ভাষা-সারল্য ও বর্ণনার আধিক্য দ্বিতীয় পর্যায়ে নেই, তৃতীয় পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু আরো জটিল ভাষারীতির আশ্রয় নিয়েছেন।

বাক্যগঠনরীতি এখানে সংহত ও জটিল, প্রতীকের ব্যবহার ভাষাকে আরো সংহত করেছে। ‘উক্তির বদলে চিত্রকল্প দিয়ে, ঘোষণার বদলে ছবির সাহায্যে’ তিনি প্রকাশক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। সনেটের রূপকল্প গ্রহণ করার ফলে ভাষা সংহত ও সংযত হয়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে।

বুদ্ধদেব বসুর সুবিস্তৃত পাঠ-অভিজ্ঞতা ও জীবন-অভিজ্ঞতার শাণিত চেতনা রূপায়িত হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের কাব্যসমূহে। *যে-আঁধার আলোর অধিক*-এ তিনি সনেটের রূপকল্পে কবিতাকে দিয়েছেন দৃঢ়বদ্ধ রূপ। স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে কবিতায় সঞ্চার করেছেন নির্মেদ কাঠিন্য। এ কাব্যে তাঁর স্বল্পবাক ও সংযত-সংহত প্রকাশভঙ্গি বিস্ময়কর। ভাবনাকে যথার্থ ও সংহত আকারে প্রকাশরূপ দেবার জন্য তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে সঞ্চার করেছেন নানা ভাবনার বিচ্ছুরণ। শিল্পভাবনা ও প্রকাশকলার আশ্চর্য সংহতির উদাহরণ *যে-আঁধার আলোর অধিক*। পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে রূপায়িত মিথ-ঐতিহ্যের বিস্তৃতির তুলনায় এখানকার সংহত প্রকাশভঙ্গি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মিথ-প্রয়োগে বিস্তৃতি ও বর্ণনার পরিবর্তে শেষ-পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু বেছে নিয়েছেন সংহত প্রতীকী-প্রকরণ। সমকালীন চৈতন্য, ঐতিহ্য চেতনা ও মিথিক-অভিজ্ঞানের সমন্বিত প্রকাশ শেষ-পর্যায়ের কাব্যকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। বুদ্ধদেব বসু কবিতার ভাষায় বিশেষণের সতর্ক প্রয়োগ করেছেন, পুষ্পিত করেছেন সংহত ইমেজ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এক রহস্যময় সন্নিপাতে তত্ত্বকে আবেগে পরিণত করে তাকে কবিতা করে তুলেছেন। শেষপর্বের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু তত্ত্বকে মিথের মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন, প্রতীক-রূপক-ইমেজ ও সনেটের দৃঢ়বদ্ধতায় প্রগাঢ় করে তুলেছেন কবিতাকে। তির্যক প্রকাশকলায় ও ব্যঞ্জনাময় মিথপ্রয়োগের নৈপুণ্যে শেষ পর্বে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-সাফল্য শিখর-স্পর্শী।

ভাষার সঙ্গে ভাষার মিথস্ক্রিয়ার মতো কবিতার সঙ্গে গদ্যের মিথস্ক্রিয়া [interaction] সাহিত্যের সমৃদ্ধির একটি শর্ত। ত্রিশোত্তর কবিরা কবিতার ভাষায় গদ্যপদ্যের মিথস্ক্রিয়া সাধন করতে চেয়েছেন, কবিতায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন কথ্যভাষারীতির সরল-স্বাচ্ছন্দ্য। প্রধানত এজরা পাউন্ডের অনুসরণে *দময়ন্তীর* প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেন তাঁর শব্দ ও ভাষা-ব্যবহাররীতির ইস্তেহার— যা সমকালীন ও পরবর্তী কবিরা নির্দ্বিধায় অনুসরণ করেছেন। এজরা পাউন্ড তাঁর ‘A Retrospect’ এবং ‘A Few Don’ts’-এ কবিতার রূপরীতি, ছন্দ, শব্দব্যবহার এবং ইমেজ সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু এখান থেকেই ভাষারীতির ম্যানিফেস্টো রচনার প্রবর্তনা পেয়েছেন। সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন, কথ্যবাক্‌রীতির অনুসরণ, কাব্য-প্রচলিত ক্রিয়াপদ [যেমন : ফুটি, হতেছে, চলিছে] বর্জন, কাব্যে ব্যবহৃত নাম, অব্যয়, ও প্রাচীন পদ [যেমন : মম, মোদের, এবং পরান, যবে, যথা, সনে, দেখিবারে, দেহ] বর্জন, চলিত বাংলা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ [যেমন : হস্ত, তরু, পুষ্প] বর্জন, উপভাষার পদ [যেমন : এনু, ঘরেতে, নারি] বর্জন— এসবই ছিলো *দময়ন্তীর* পরিশিষ্টে বুদ্ধদেব বসুর ভাষা-ব্যবহাররীতির নিয়ম-নির্দেশ। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার ফলে রচনার সংহতি ও দৃঢ়তা বাড়ে বলে সেগুলো তিনি বর্জন করতে চাননি। নিজের কাব্যকলায় এই নিয়ম-নীতির কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে বলে বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বীকার করেছেন। কাব্যরীতি ও কথ্যরীতির যথাযথ মিশ্রণ তাঁর অন্বিষ্ট ছিলো, যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় তা সম্পূর্ণ মানা সম্ভব হয়নি। শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা আধুনিক কবিদের রূপদক্ষ করেছে। সৈয়দ আলী আহসানের মতে : ‘শব্দের কিছু অর্থ

ধারাণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ। শব্দের অভিধানগত অর্থকে অতিক্রম করে ইঙ্গিতময় রসপ্রতিপত্তির দিকে কবির লক্ষ থাকে বলে শব্দব্যবহারে তাকে রূপদক্ষ হতে হয়। আধুনিক কবি ভাবানুষঙ্গের কারণে 'সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী, সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা, কেননা ভাষা রূপের উপাদান।' এ মত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের।

বুদ্ধদেব বসু *দময়ন্তীর* পুর্ব-পর্যন্ত কাব্যিক শব্দ, তৎসম শব্দ, সাধু ক্রিয়াপদ ও কাব্যপ্রচলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কথ্যরীতির চর্চাও শুরু হয়েছে এ-সময় থেকেই। ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে কথ্যভাষা ও কাব্যরীতির ব্যবধান বিলোপের চেষ্টায় জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে সফল এবং তাঁর কথ্যশব্দের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো'। বুদ্ধদেব বসু যে-সব কথ্যশব্দ ও কথ্যক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন সেগুলোর কয়েকটি এরকম : পূর্ব [পূর্ব]; খাড়া, চড়াই, মিশকালো, মরজি, কাৎরানি, ধুঁকতে-ধুঁকতে, বেহদ্দ, কপাট, খিস্তি, জিৎ, ধুমসো, আঁকুপাঁকু, দুকুর, রোদ্দুর, ছোঁড়া, তাত [তাপ], কামাই, উখাল, ফালতু, দুদ্দাড়; কাৎরায় ইত্যাদি।

কথ্যভাষার 'ইডিয়ম' বা বিশিষ্ট দেশজ রীতির ব্যবহার আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ-রীতি। ইডিয়ম ব্যবহারের ফলে ভাষার সঞ্চারিত হয় সহজ স্বাভাবিকত্ব। জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসু দুজনই কাব্য-পঙ্‌ক্তিতে ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন। ইডিয়ম সম্পর্কে হার্বার্ট রিড লিখেছেন :

> Idioms arise out of the contacts of daily life. They are the response of the human organism to the elements around it. They reflect the speed of life, the pressure of life, its very essance.

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক ও গ্রাম্যশব্দ কমই ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের গভীর ব্যবহারের ফাঁকে-ফাঁকে কথ্যভাষার বিশিষ্ট দেশজরীতির স্বচ্ছন্দ ও চমৎকার ব্যবহার তাঁর কবিতাকে নির্ভার চমৎকারিত্ব দিয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় প্রকরণকলা ও রীতিঐতিহ্যকে স্বীকার করেছেন। তাঁর কবিতার প্রথম পর্যায়ে বিশেষণ ও অনুপ্রাসের ব্যবহার পরবর্তী দুই পর্যায়ের চেয়ে পরিমাণগতভাবে বেশি। কিন্তু সম্পূর্ণ রচনা-পর্যায়ে তিনি অনুপ্রাস-নির্ভর ধ্বনি-বিন্যাস বেশি করেননি। কিন্তু বিশেষণের চমৎকার ব্যবহার রয়েছে তাঁর কবিতায়। অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি পারঙ্গম। বিশেষত তাঁর ব্যবহৃত উপমা পাঠকের হৃদয়ে কল্পনার নতুন দ্যুতি সঞ্চার করে।

'উপমাই কবিত্ব'– জীবনানন্দ দাশের এই মন্তব্য এখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। উপমাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে ঐ মন্তব্যে সায় দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর মতে, উপমাকে বাদ দিলে ভাষার প্রকাশ-শক্তি খর্ব হয়। ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠী অজস্র উপমার চমৎকারিত্বে অভিষিক্ত করেছেন বাংলা কবিতা। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া অন্য পারঙ্গম উপমা-রচয়িতাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুও অন্যতম। কবিজীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই তিনি কবিতা শরীরের অপরিহার্য অঙ্গরূপে উপমা-উৎপ্রেক্ষা নির্মাণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের কাব্য-রচনাকালে তরুণ বুদ্ধদেব বসুর অন্তর্চেতনা জীবন-অভিজ্ঞতায় তেমন সমৃদ্ধ হয়নি, তাঁর বোধ গাঢ়তর ভাবনায় অভিষিক্ত হয়নি। তাঁর এ পর্যায়ের রচনার বিষয়বস্তু প্রেম এবং এই রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি নির্বস্তুক ও নিরাবয়ব রোমান্টিক জগৎ থেকেই উপাদান সংগ্রহ

করেছেন। কবির রোমান্টিক চৈতন্য এ পর্যায়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎস সন্ধান করেছে রোমান্টিক কাব্য-ঐতিহ্য এবং রোমান্টিক উপাদান থেকে। আকাশ, নক্ষত্র, মেঘ, আলো-অন্ধকার, রাত্রি, মৃত্যু, চুল, চোখ— এইসব রোমান্টিক উপাদান এবং প্রকৃতির অন্যসব উপকরণ থেকে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করে নির্মাণ করেছেন সাদৃশ্যশিল্প। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ অন্তর্ভূমির গাঢ়চেতনার স্পর্শে অভিষিক্ত হয়নি বলেই প্রথম পর্যায়ের রচনায় স্মরণীয় উপমার সাক্ষাৎ কমই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপমা বুদ্ধদেব বসুর কবি-কৃতির ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। এ-পর্যায়ের উপমার কিছু উপাদান রোমান্টিক জগৎ থেকে আহৃত। বাস্তব জগৎ ও বাস্তব নাগরিক উপাদান এ-কালের উপমায় স্থান করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে কবির অভিজ্ঞতা বেড়েছে, নাগরিক জীবনের বিচিত্র কর্ম-কোলাহল এবং বিস্তৃত জীবনাভিজ্ঞান সঞ্চারিত হয়েছে কবিতায়। কবির গাঢ়তর বোধ ও নিবিড় চৈতন্য নির্মাণ করেছে অধিকতর ইঙ্গিতময় উপমা। তৃতীয় পর্যায়ে উপমার ব্যবহার পূর্বের দুটি পর্যায়ের তুলনায় কম। এ পর্যায়ের কাব্যকলায় কবির রোমান্টিক আবেগাতিশয্য প্রায় অবসিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ-শাণিত বোধ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বুদ্ধদেব বসুর প্রাজ্ঞ-চৈতন্য উপমাশরীরে সঞ্চার করেছে গভীর ইঙ্গিতময়তা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর জীবন বিস্তৃত ছিলো নগর কলকাতায়, তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিসর বিশ্বব্যাপী ছড়ানো। অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ হয়েছেন বলে তাঁর উপমায় সঞ্চারিত হয়েছে গাঢ়বদ্ধ রূপ। উপমান-উৎসের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটেছে। তাছাড়া তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু প্রতীকী কাব্যকলার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতীক ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত।

ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে অধুনিক কবি হতে চান চরম যথাযথ। শব্দপ্রয়োগে বাহুল্যবর্জন এবং আবেগের সংযত প্রকাশ তার অন্বিষ্ট। প্রকাশকলায় নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে প্রথাবদ্ধ ভাষা-প্রয়োগরীতি অতিক্রম করা-ছাড়া কবির বিকল্প নেই। আধুনিক কবির ভাষা প্রয়োগরীতি প্রথাবদ্ধ প্রকাশ-পদ্ধতি ও কাব্যভাষাকে বারবার অতিক্রম করে যায়। প্রচলিত প্রকাশ-পদ্ধতি ও কাব্যভাষা অতিক্রম করতে গিয়ে কবি কখনো নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন, কখনো কাব্যে প্রচলিত শব্দের নতুন প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করেন, কখনো কবিতায় ভাষাকে করেন রূপকাশ্রিত। রূপক অলঙ্কার [Metaphor] কবিকে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ হতে সহায়তা করে। হার্বার্ট রিড রূপক-রচনার শক্তি ও মৌলিকত্বের মানদণ্ডে কবির প্রতিভা বিচার করতে চান :

> ...and I think we should always be prepared to judge a poet, to the exclusion of all other qualities, by the force and originality of his metaphors.

পাশ্চাত্য কবিরা রূপক-রচনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফরাসি প্রতীকী এবং ইংরেজ ম্যাটাফিজিক্যাল কবিরা ইমেজের যথেষ্ট মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিক রূপকের মিশ্রণ [mixed metaphor] ঘটিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন অজস্র চমৎকার রূপক। ত্রিশোত্তর কবিতায় রূপকের সুপ্রচুর ব্যবহার ঘটেছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় রূপক-অলংকারের সুপ্রচুর ব্যবহার বর্তমান। মূর্ত বস্তু বা বিমূর্ত ভাবকে তিনি পরিয়ে দিয়েছেন অন্য একটি মূর্ত বস্তু বা বিমূর্ত ভাবের ঘেরাটোপ। একের রূপ তিনি সঞ্চারিত করেন অন্যের দেহে। রূপকে ব্যবহৃত উপমেয়-উপমানের পারস্পরিক সম্মিলন ঘটিয়ে বুদ্ধদেব বসু অজস্র শিল্প-সফল কাব্যপঙ্ক্তির জন্ম

দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর মধ্য ও শেষ পর্যায়ের রচনায়ও প্রচুর রূপক রচিত হয়েছে। এ পর্যায়ের রূপকে কখনো তিনি সঞ্চার করেন ইন্দ্রিয়ঘন আবেগ ও চিত্রকল্প, কখনো তার রূপদ্রষ্টা মনোভঙ্গি এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়। নিজের অভিজ্ঞান-আবেগ মূর্ত করতে চান তিনি রূপকের আশ্রয়েও। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের তরল রোমান্টিক সংবেদনায় রূপকের দৃঢ়বদ্ধ রূপ সঞ্চারিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায় দুটিতে কবি মেধা-মননের প্রয়োগে ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে মূর্ত করেন মনোজগতের অভিজ্ঞান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু কাব্য-কলায় মেধা-মনন প্রয়োগ করেছেন। এ-পর্যায়ে মনোজগতে সমন্বিত হয়েছে বস্তুবিশ্ব ও মনোবিশ্বের অভিজ্ঞান-সংবেদনা। রূপকেও এই অভিজ্ঞান সংবেদনা সঞ্চারিত।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে রূপান্তরশীল বেশ-কিছু সমাসোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ পাওয়া যাবে। সমাসোক্তিতে জড়বস্তু বা বিমূর্তের ওপর আরোপিত হয় সপ্রাণ চেতনের ব্যবহার বা ক্রিয়া। অন্যাসক্ত [Transferred Epithet] অলংকারে জড় বা বিমূর্তের ওপর সপ্রাণ চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ আরোপিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার সুপ্রচুর। কবির মনন-স্মৃতি-অভিজ্ঞান ও মেধা সংহত আবেগের মিথষ্ক্রিয়ায় চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। তার সামগ্রিক মানস ও সৃজনক্রিয়ার আবেগের সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগ ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় প্রবল রোমান্টিক আবেগ প্রচুর চিত্রের জন্ম দিলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে তা পরিশীলিত-সংহত হবার সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রকল্পগুলোও অনেকাংশে সংহতি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভেই তিনি ইংরেজি চিত্রকল্পবাদী কবিতার স্বরূপবৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। পাউন্ড প্রবর্তিত চিত্রকল্পবাদী কবিতার রূপরীতি বুদ্ধদেব বসুই আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। *দময়ন্তী* থেকে শুরু করে *শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর* পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু-রচিত চিত্রকল্পগুলো সংহত ঔজ্জ্বল্যের ধারক। অন্তিম পর্যায়ের চিত্রকল্পগুলো সংখ্যায় কম, কিন্তু অভিনব ও কল্পনাসমৃদ্ধ। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

১. মাঝে-মাঝে মনে হয় তুমি সেই মৃত মেয়ে,
যাকে আমি কখনো ভুলি নি–
যেন এক স্বপ্নে ফোটা অমল সংগম,
যার বৃত্তে জঙ্গম সময় স্থির,
এবং পল্লবে যার নীড় বেঁধে পথশ্রান্ত ইচ্ছারা ঘুমিয়ে পড়ে :
['কেবল তোমাকে নিয়ে', মরচে-পড়া পেরেকের গান]

২. কে তুমি আমাকে ছুঁয়ে গেলে আজ স্বপ্নে
পায়রা-পাখায় কোঁকড়া বাতাসে হালকা,
[মৌলিনাথের স্বপ্ন', ঐ]

৩. চোখে চোখ রেখে ছিলে তুমি অনিমেষ,
ঠোঁটে প্রলোভন, কৌতুকে আঁকা ভুরু,
মৃত হৃদয়ের লুপ্ত আদরে মাখা।
বতিচেলি-মুখ, পাণ্ডুর।
[ঐ, ঐ]

৪. তারা
কোথায়?
এও কি সম্ভব যে তারা ঈর্ষার অনলে
পুড়ে-পুড়ে পানের দোকানের দড়ি হয়ে ঝুলছে—
যে-কোনো পুরু-ঠোঁট লম্পটের বিড়ি ধরাবার
জন্য?
['যুবক-যুবতীরা', একদিন : চিরদিন]

প্রথম পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসু প্রতীকী-প্রকরণরীতির পরিপোষণ করেন নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য থেকেই তিনি অভিনিবেশ সহকারে প্রতীকের পরিচর্যা করেছেন। *দময়ন্তীর* নাম-কবিতার দময়ন্তী প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনাবলির সর্বত্র এমন-কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যারা অন্য শব্দের কনটেক্‌স্‌টে বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জনা লাভ করে প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে 'অন্ধকার', সাপ', চাঁদ', বীজ', 'আগুন', বিদ্যুৎ', পদ্ম', শীত', চুল', ব্যাং', জোনাকি', পাখি', গুহা', ইত্যাদি শব্দ প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছে। এসব প্রতীক পৃথক আলোচনায় অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক সাহিত্যের মিথ-মুখী প্রবণতা ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠীকে মিথ-ব্যবহারে প্রণোদনা জুগিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মিথের ব্যবহার একেবারে কম নয়। পুরাণ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই লক্ষ করা যায়। কবিতা ছাড়াও, নাটক এবং কাব্যনাটকে তিনি মিথের ব্যবহার করেছেন শিখর-স্পর্শী সাফল্যে। ভারতপুরাণের কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'সংক্রান্তি' ও 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে। বুদ্ধদের বসু তাঁর *কঙ্কাবতীর* নায়িকাকে তুলে এনেছেন বাংলার লোককাহিনী থেকে। Northrop Frye মিথকে গ্রহণ করেছেন প্রায় সত্য কাহিনীরূপে। লোককাহিনী জীবনের বহিরঙ্গ-বৈচিত্র্যের সন্ধানী— মিথ জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান করে। তবু মিথ আলোচনায় লোককাহিনী-প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণনামূলক প্রকরণরীতি পরিহার করার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এ-পর্বে সমসাময়িক জীবনচেতনার সঙ্গে মিথকল্পের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মিথের সংযোগ-সহযোগেই এ পর্যায়ের কবিতা অর্জন করেছে সংহতি ও সংক্ষিপ্তি; রোমান্টিক আবেগও প্রশমিত হয়েছে। *দময়ন্তীর* নামকবিতা মিথ-প্রয়োগের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। পৌরাণিক নল-দময়ন্তীর পার্থিব প্রেমের মিথকল্পের সহায়তায় বুদ্ধদেব বসু এখানে জীবন ও জরা, যৌবন ও প্রেম সম্পর্কে অপূর্ব জীবনভাষ্য রচনা করেছেন। মিথের দময়ন্তীর পার্থিব প্রেম-কামনার সমান্তরালে কবি ব্যবহার করেছেন নিজের ও নিজ-কন্যার জীবনের প্রেমকাহিনী। প্রতিরূপক হিসেবেই এখানে মিথের ব্যবহার হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিরূপক ব্যবহারের চমৎকার দৃষ্টান্ত :

স্বর্গ তোকে চায়, যজ্ঞ তোকে চায়, মৃত্যু তোকে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূতে এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।

'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।
[দময়ন্তী, *দময়ন্তী*]

মিথ-কাহিনীর দময়ন্তী হংসদূতের মুখে প্রিয়তম নাম শুনে মহেন্দ্র-অগ্নি-যমকে প্রত্যাখ্যান করে বেছে নিয়েছিলো মানুষ নলকে। এ কবিতায় কবি-কন্যাও দেবতাদের অতি-মর্ত প্রেমের পরিবর্তে বেছে নেবে মর্ত-প্রেমিকের রক্তমাংসের মানবিক প্রেম। শেষতম গ্রন্থ *স্বাগতবিদায়েও* এই মিথ ব্যবহার করে 'দময়ন্তী ও নল' নামে একটি কবিতা রচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

আধুনিক কবিতায় মিথ ব্যবহার হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতিরূপকের আকারে। Northrop Frye লিখেছেন, বাস্তবতা শিল্পরূপ পায় পরোক্ষ উপমায়, মিথ এমন শিল্পকর্ম যা রূপকের [metaphor] সঙ্গে অভিন্ন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মিথ কখনো প্রতিরূপক এবং কখনো রূপকরূপেই রূপায়িত। কম ক্ষেত্রেই প্রতীকাকারে পুরাণের প্রয়োগ ঘটেছে। কবিতায় পুরাণপ্রকরণকে আর্টের আধুনিকতার একটি পদক্ষেপ হিসেবে স্থির করেছেন এলিয়ট। মিথ মানব প্রজাতিসত্তার অভিজ্ঞতার আধার। পুরাণের অবিস্মরণীয় উৎস-উৎসারিত রূপক-চেতনা দ্বারাই বুদ্ধদেব বসু বর্তমান বিশ্বের জটিলতার দ্বারোদ্ঘাটন করতে চান। মিথকল্পের রূপায়ণের মধ্যেমেই তিনি শাশ্বত মানবমূল্যবোধের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করেন। মিথ-প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসু মধ্য ও অন্তপর্যায়ের রচনায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। পুরাণপ্রকরণের প্রয়োগে তিনি ভারতীয় পুরাণকেই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু দে-র মতো পাশ্চাত্য পুরাণ তাঁর কাব্যে একেবারে প্রাধান্য পায়নি। ভারতীয় পুরাণের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ থেকে মনে হয় ভারতীয় মনোভঙ্গি তাঁর সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় অন্তর্লীন ছিলো।

প্রথম পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসু মুখ্যত মুক্তক অক্ষরবৃত্ত এবং গদ্যছন্দকে কবিতার বাহন করে তুলেছেন। *বন্দীর বন্দনায়* অক্ষরবৃত্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। কিন্তু এ পর্যায়ের ছন্দে রাবীন্দ্রিক মাধুর্য ও অনাড়ষ্ট ধ্বনিতরঙ্গ কোথাও-কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাধু ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্দ-ব্যবহার মাঝে-মধ্যে ছন্দোদোলায় ঈষৎ আড়ষ্টতা সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অর্জন করেছে সমর্থ বাকস্পন্দ। ছন্দের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু সুর ও ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যচর্চার প্রধান বাহন মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে সঞ্চার করেছেন একাধারে আবেগ ও নিরাবেগ সংহতি। রোমান্টিক কবিতার আবেগাক্রান্ত যাত্রাপথ থেকে তিনি খুব ধীরে সরে এসেছেন ধ্রুপদী কবিতার নিরাবেগ ও নির্মোহ নির্মাণকলার দিকে, কাব্যিক ঢঙ থেকে গদ্যভঙ্গির স্বাভাবিকতার দিকে। এই ক্রম-অগ্রসরমাণ ও ক্রমপরিবর্তনশীল মানস ছন্দের ক্ষেত্রেও মুক্তি অন্বেষণ করেন— শঙ্খ ঘোষের এ মন্তব্য যথার্থ।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকরণ বাঙালি কবিদেরই মানস-সংবেদনাজাত হলেও প্রতীচ্য কাব্যপ্রকরণ ও শিল্পঐতিহ্য ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতাকে পুষ্টি জুগিয়েছে। চিত্রকল্প, প্রতীক ও পুরাণপ্রকরণ ইউরোপীয় কাব্যপ্রকরণ থেকেই এসেছে। প্রতীকী কাব্যের উৎসস্থল বোদলেয়ারের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে বুদ্ধদেব বসু প্রতীকী

কাব্যান্দোলনকে বাংলা কবিতার প্রকরণের সঙ্গে যুক্ত করেন। প্রতীক ও পুরাণপ্রয়োগ অবশ্য বাংলা কবিতায় একেবারে নতুন নয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় আদ্যন্ত প্রতীক প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কবিতা প্রতীকের যথার্থ পরিচর্যায় সংহত কাব্যরূপ পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিবেচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তিনি শুধু কাব্যের বিষয়েই মনোযোগী ছিলেন না, কাব্যের প্রকরণকলা বিষয়েও তাঁর মনোযোগ ছিলো অখণ্ড। মানসচৈতন্যের সপ্রেম পরিচর্যায় তাঁর কাব্যবিষয় যথার্থ প্রকরণের সন্নিপাতে শিল্পরূপ পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

দ্রোহী-দ্রষ্টা বুদ্ধদেব বসু

মাহবুব হাসান

একশ’ বছর আগে জন্মেছিলেন বুদ্ধদেব বসু (জন্ম : ১৯০৮, ৩০ নভেম্বর, মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৪)। আজ আমরা তার জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছি। কেন করছি, এটা একটি জিজ্ঞাসা হতে পারে কিংবা নাও পারে। ভিন্ন চিন্তার মানুষরা এবং তারা যদি সৃজনশীল পৃথিবীর মানুষ হন– প্রশ্ন তুলতেই পারেন। মানবযাত্রার এবং সমাজের কেউই প্রশ্নাতীত নন। বিবেচনাটি যদি এমন হয়, তাহলে জিজ্ঞাসাটাই যথার্থ। আর যারা বিশ্বাস করেন রবীন্দ্র-উত্তর কবিতাযাত্রায় বুদ্ধদেব বসু এক অসাধারণ কৃতিমান, তারা প্রশ্ন না করে সোজা ঢুকে যাবেন উৎসব কমিটিতে– যাতে তাকে যথার্থ সম্মানে স্মরণ করা যায় এবং অর্পণ করা যায় তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আবার তৃতীয় একটি পথের মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম হবে না– যারা মনে করেন বুদ্ধদেব বসুর হাতে মুক্তি পেয়েছে ইউরো আধুনিকতার রাজপথটি। সেই পথের দীর্ঘ অববাহিকায় স্নাত হয়ে বাংলা কবিতা পেয়েছে আধুনিক হওয়ার সুযোগ ও সাহস।

মাইকেল মদুসূদনের ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আর মহাকাব্যিক চেতনা-পরিসরকে রবীন্দ্রনাথ নামিয়ে এনেছিলেন রোমান্টিসিজমের জাগতিক প্রতিবেশে এবং সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলেন উপনিষদিক বোধসত্তা মানবধর্ম। রহস্যময়তা ঈশ্বরপ্রেম আর বস্তুতান্ত্রিকতার একটি মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথে। বাস্তব আর পুরাতনীর এই সংশ্লেষ রবীন্দ্রনাথকে ঋষিতে পরিণত করেছিল– সর্বজনস্বরে ‘গুরুদেব’ শব্দবন্ধ তাই সর্বত্রই উচ্চারিত হয় অকাতরে। রবীন্দ্রচৈতন্যের ঘের ভেঙে নতুন চৈতন্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু এবং তার সমকালীন কবিবন্ধুরা। সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথের অনুকারীরা যথেষ্ট তিরস্কার, কটূক্তি নির্মাণ করেছিলেন তিরিশি ‘পঞ্চপাণ্ডবের’ কবিতাকলার বিরুদ্ধে। যেসব সমালোচনা ইতিবাচক ছিল না– নেতিই শিরোপরি বসেছিল তাদের। নতুনকে গ্রহণ বা বরণ করে নেয়ার মতো উদার মন ও মানবিক, নৈতিক শক্তি রবীন্দ্রনাথে ছিল কিন্তু তার উনিশ শতকি মননধর্ম ও চিন্তা-প্যাটার্ন, তাকে অনুজপ্রতিম কবিদের সমকালে নামতে দেয়নি। যদিও চেষ্টা করেছেন তিনি আধুনিক হতে কিন্তু তাঁর মননধর্ম পরে ছিল আমৃত্যু রোমান্টিক উপনিষদিক ভাবধারা, মনুষ্যধর্ম ও ভক্তি প্রবণতার ছাল-বাকলা। শেষের কবিতার অতি আধুনিক ব্যঙ্গ চরিত্র অমিত রায়ের ভাবনা থেকেও এ চিন্তা প্রকাশিত। ‘...অমিত রায় চাইছে কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা– তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণাওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমনকি যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের আদলে হয়, ক্ষতি নেই। এ-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে বিদ্রূপগর্ভ, কিন্তু এতে আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি আছে এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্র নিরূপণেও ভুল হয়নি। এ-বক্তৃতার শেষ অংশে আমাদের অমিত রায়-রূপী রবীন্দ্রনাথ ভাবীকালকে দখল করে নিচ্ছেন, যখন ‘আবার

হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ' এবং ডিকেন্সের কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে। কৌতুকের আবরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় এখানে স্পষ্ট। [কবি রবীন্দ্রনাথ/বুদ্ধদেব বসু : ৩১-৩২]

রবীন্দ্র-চেতনার এই ধর্ম থেকে বুদ্ধদেব বসু এবং অন্যরা কবিতার নতুন চিন্তা ও দেখার নতুন পথটিকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বলেই আজ বাংলা ভাষায় নতুন চিন্তার দ্যুতি আর চিন্তার বহুরৈখিক পথ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আধুনিক, উত্তরাধুনিক চিন্তার খৈ রচনার যে কথা বলা হচ্ছে ইউরো আধুনিকতার ধারা এদেশের শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায় প্রবাহিত হয়েছিল বলেই তা আজ বাস্তব সত্য।

বলা হয়ে থাকে যে, তিরিশি পঞ্চপাণ্ডবের হাতে ইউরো আধুনিকতার সন্নিপাত ঘটেছে। এখানে আমার সামান্য দৃঢ় দ্বিমত আছে। প্রথমত, বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি বলে আমার বিবেচনা। কবিতা ও গদ্যে অপর তিনজন– সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে ইউরো-চেতনাসার নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। ওই অর্থে জীবনানন্দ দাশকে এ তালিকায় যুক্ত না করাই শ্রেয়তর। যে নেতি সর্বব্যপ্ত হয়েছিল বোদলেয়ার, র‍্যাবো, হেল্ডার্লিন, রিলকেসহ গোটা ইউরো যান্ত্রিক জীবনে তার সর্বগ্রাসী রূপ ধরা পড়েনি বাঙালি আধুনিকদের রচনায়। কিন্তু নাগরিক মানবজীবনের কঠিন ও বহুস্তরীয় উপাদান উপ্ত হয়ে উঠেছে তাদের রচনায়। এ-বোধসত্তা কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি কবিদের মননেশায় ঠোক্কর দিয়েছে। এতে লাভ হয়েছে দুটো। একটি দৃষ্টি উন্মোচন। অন্যটি নতুনকে গ্রহণ করে কবিতার কলাধর্ম পাল্টে নেয়া। জীবনানন্দে– 'অন্ধকার' ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল হলেও জীবনের প্রগাঢ় ঘ্রাণ তিনি পেয়েছেন আবহমান বাংলাভূমির জীবন ঐক্য থেকে। আর তার প্রতিবেশ পৃথিবী নিসর্গ-প্রকৃতি আর চলমান গ্রামীণ নগর প্রতিবেশজাত হলেও নিস্তরঙ্গ প্রায় বৃহত্তর জীবনই আপ্ত করে আছে তার কবিতা রাষ্ট্র। যতটা তিনি ইউরো দৃষ্টিস্নানে ঋদ্ধ হয়েছেন– ততোধিক লোকঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন দায়বদ্ধ। এ-বিবেচনায় আমি জীবনানন্দ দাশকে ইউরো-আধুনিকতার 'পঞ্চপাণ্ডব' ঘেরের বাইরে প্রতিস্থাপন করতে চাই। কবিতায় প্রথম জীবনে জীবনানন্দ দাশ (ঝরা পালকের সময়) প্রভাবিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম দ্বারা, প্রবলভাবেই। আবার ওই বইয়েই স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল তার লোকস্নাত ভিন্নবোধের কথামালা। কিন্তু বিষ্ণু দে– এদের মধ্যে ছিলেন ভিন্নতর– আপদমস্তক ইউরো কবিতাকলা আর মিথিকরসে স্নাত। তার কবিতার ভাষাভঙিও তাকে 'ইউরো-সচেতন' হিসেবে চিত্রিত করে রেখেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঐতিহ্যপ্রীতিতে সিক্ত। অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন বাংলা কালচার আর ইউরো কালচারের মিশ্রণের কারিগর। বুদ্ধদেব বসু প্রথম যৌবনে তীব্রভাবেই ইউরোপীয় অবক্ষায়িত কালচারাল হ্যাঙ্গোভারের অধীন ছিলেন। মধ্যজীবনে তিনি কমপারেটিভ লিটারেচারের মাস্টারি করতে গিয়ে ভারতীয় মিথ ও বাংলা কবিতার রূপারূপ চাখতে চাখতে নতুন ভাবনায় জারিত হয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি বহন করেছেন আধুনিক ঐতিহ্যের চেতনাসার। তবে সেই সঙ্গে মিশিয়েছেন দেশ-কাল-সমাজ-সংসার আর লোকজ অনুশাসনকে। ধর্মকে তিনি ব্যবহার করেননি– মেশাননি ধর্মসত্তাকে তার সৃষ্টিচেতনার আকরণে। কিন্তু কালচারকে যা ধর্মপ্রেক্ষাপটে বিপুল পরিসর নিয়ে বয়ে চলেছে তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন নতুনতর সৃষ্টিতরঙ্গ রচনায়। তার নাটক ও কাব্যনাটক তপস্বী ও তরঙ্গিণী, অনাম্নী অঙ্গনা, সত্যসন্ধ, কলকাতার ইলেক্ট্রা– মিথিক জীবনসত্যকে বর্তমান কাল পরিসীমায় এনে নতুনতর ব্যঞ্জনা নির্মাণ

করে যে শিল্প সৌন্দর্য রচনা করেছেন, তাকে অবশ্যই করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করা উচিত।

একটি অভিযোগ আছে যে, রবীন্দ্রনাথকে এড়ানোর জন্যই এই ইউরো সাহিত্যের আমদানি করা হয়েছে। কথাটায় সত্য যতটা না আছে, তার চেয়েও বেশি আছে যুগের দাবি। কারণ ওই যুগটাই চাইছিল ভিন্নমাত্রা। এজন্যই চিন্তাশীল নবীনরা যুগের দাবিকে আপনার অঙ্গচ্ছেদ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। অবশ্য রবীন্দ্র কাব্যশাসন থেকেও বেরোতে চেয়েছিলেন তারা। রবীন্দ্রচেতনার ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে নতুন কবিতারূপ নির্মাণ করতে চাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন তিরিশিরা। এ-চিন্তা করার ক্ষমতাটাকেও আমি কবিতার ইতিবাচক রূপান্তরের প্রত্যাশা বলে মনে করি। কবিযশ তারা সহজেই পেতেন যদি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ অনুকারী হতেন। কিন্তু 'যশ নয়, কীর্তি নয়, কোন এক বিপন্ন বিস্ময়' রচনায়ই তারা চেয়েছিলেন বাংলা কবিতায়। সেটাই ঘটেছে এবং তা অবশ্যই আমাদের কবিতার জন্য বীক্ষান্তর নির্মাণ করেছিল। সেই কাব্যচেতনার ধারাস্রোত আজও, এই একুশ শতকি বাংলা কবিতার রূপাদল বহুলাংশে দখল করে রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলা কবিতার এ-প্রকরণ কারিগরি ও আকরণ নির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর অবদানই অধিক।

২.

যারা ভক্তি নিয়ে কবিতা পাঠ করেন তাদের চোখে ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে না। এরা সাধারণ পাঠক। কিন্তু যারা কবিতার রসাস্বাদনে কবিতা পড়েন তারা প্রচলিত কাব্যরীতির ছোঁয়াস্পর্শ যেমন পান, তেমনি উপলব্ধি করতে পারেন কাব্যিক ব্যঞ্জনার উনতা কিংবা প্রাবল্য। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। যেহেতু তিনি কবি এবং বাংলা কবিতার রূপাদল ও প্রকরণসজ্জায় সমকাল ও প্রতিবেশবিশ্বের র‍্যাশনালিটিকে ব্যবহার করতে তীব্রভাবে উৎসাহী ছিলেন– সে কারণেই রবীন্দ্র-উত্তর কবিতা নতুন বীক্ষাকাশ পেয়েছে। আমরা, পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা বলি তিনি রবিদ্রোহী ছিলেন। আমি একে দ্রোহ বলে বিবেচনা করি না। কারণ তা দ্রোহ ছিল না। রবীন্দ্রমানস সমকাল এবং সমকালীন জীবনচেতনার কোন ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন না। তিনি উপনিষদিক অরণ্য, কালিদাশীয় পটভূমি, গুপ্তযুগের উজ্জয়িনী, আর পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্তী নিসর্গকেই ব্যবহার করেছেন অবিচল ঢঙে। তার বাসস্থান কলকাতা, তার গমনাগমনের শহরগুলো, বিশশতকি মহানগরের চেহারাসুরত কেন তার কবিতায় উঠে আসেনি– সেই সত্যই বুদ্ধদেব বসু– কথিত রবিদ্রোহী লিখেছেন বিশ্বকবির মৃত্যুর অনেক পরে। তিনি ভক্তি নিয়ে নয়, শ্রদ্ধা দেখিয়ে নয়, আমাদের শেখালেন একজন কবির অবদানকে পূর্ণমূল্য কিভাবে দিতে হয়। কবিতা বা রচনা পছন্দ না হলে কি ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ লিখিত হতে পারে– কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর সমালোচনা– যা আলোচনার ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার পয়েন্টগুলো তুলে ধরতে কোন দ্বিধা করবে না– বুদ্ধদেব বসুর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' সেই রকম একটি বই। এই বইটি বুদ্ধদেব বসুর পাঁচটি বক্তৃতার সংকলন, যা তিনি ১৯৬২ সালের মার্চে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। 'Tagore : Portrait of a Poet' শীর্ষক মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকটির অনুবাদ। অনুবাদ নিজেই করেছিলেন এবং বাংলায় অনেক কিছুই সংযোজন করেছেন। গোটা রবীন্দ্রনাথ না পড়েও এ বইটিতে যে কোন পাঠক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন রবীন্দ্রচেতনার আগাপাছতলা। বুদ্ধদেব বসু দ্রোহী নন এ-কারণেই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে নাকচ

করেননি– বরং তার অবদানকে মূল্যায়ন করেছেন এবং তার সমকালীন ও নতুন প্রজন্মের কাছে মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছেন। এ-পর্যায়ে একটি উদ্ধৃতি জরুরি– 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে কবিতার প্রায় সর্বপ্রকার উদাহরণ পাওয়া যায়– ছন্দোবদ্ধ গদ্য থেকে অতলস্পর্শী উচ্চারণ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না। দেখতে পাচ্ছি, এই ভিন্ন ভিন্ন ধরনগুলোর যুগপৎ চর্চা করেছেন তিনি, একই বছর অথবা একই মাসের মধ্যে বিপরীতধর্মী কবিতা লিখেছেন; তাঁর বহু কবিতা ভাব অথবা শৈলীর বিচারে পরস্পরের অনাত্মীয়। ... এ কথা মানতেই হবে যে, আকস্মিক ও ক্ষণিকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় ছিল উদার; পুনরুক্তি বা তরলতার আশংকায় নিবৃত্ত না হয়ে যে কোন মুহূর্তের যে কোন কম্পনকে তিনি কবিতার বা গানের আকার দিয়েছেন। তবু এ কথাও সত্য যে, তার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলো (উৎকৃষ্ট অর্থ জনপ্রিয় নাও হতে পারে) এক অন্তর্লীন সম্বন্ধসূত্রে সংযুক্ত। যদি আমরা 'চয়নিকা' ও 'সঞ্চয়িতা'র রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারি, যদি তাঁর ব্যাপ্তির বদলে অন্তঃসার বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহলে তাঁর কবিতা পর্যায়ে একটি অভিপ্রায়ের অনুসৃতি ধরা পড়ে, একটি মূল ভাবনার বিবর্তন। তাঁর জীবনের যে অংশে তিনি শুধুই কবি, সর্বজনীন গুরুদেব নন, যেখানে তাঁর সত্যিকার অভিজ্ঞতাগুলো কুঁড়ির ভেতরে গন্ধের মতো ব্যাকুল, তাঁর সেই ব্যাকুল জীবনের কাহিনী, সব অবাস্তবতা ও বিক্ষেপের ফাঁকে ফাঁকে, তিনি কবিতার পরে কবিতায় আমাদের শুনিয়েছেন। যেন একটি নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলনের নাটক, যাতে তিনি প্রথমে নায়ক ও পরে নায়িকা আর যাতে প্রেমিক-প্রেমিকার অবিরল রূপান্তর ঘটছে। এ নাটকের নান্দীপাঠ সন্ধ্যাসঙ্গীত যবনিকা উত্তোলিত হল মানসীতে আর গীতাঞ্জলিতে ঘটল দ্বন্দ্বের সমাধান। ...আজকের দিনের সেসব তরুণ, যারা বহু বিভিন্ন কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত এবং রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে উৎসাহী নন। বিশেষত তাঁদের উদ্দেশে দু-একটি কথা বলতে চাই। এমন কোন কবি নেই যিনি আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেন এবং যে কোন একজন কবির কাছে আমরা শুধু তাই দাবি করতে পারি, যা তাঁর অধিকারভুক্ত। ...তাঁর কবিতায় তীব্রতা নেই, নেই কোন বিসংবাদী সুর, তাঁর কোন পঙ্‌ক্তি হাতুড়ির মতো আঘাত করে না। যখন তিনি সবচেয়ে মর্মস্পর্শী তখনও তিনি উপরিস্তরে মধুর; তাঁর ভাষা যেন কিটসের 'পেলব যামিনী', বা বাংলাদেশের সেই মলয় সমীরণ, যাকে তিনি এবং জয়দেব যশস্বী করেছেন। নিষ্করুণ বা কঠিন হওয়া তাঁর স্বভাবে নেই; যখন তিনি গভীরতম বেদনার কথা বলেন, তখনও তার স্পর্শ মখমলের মতো কোমল। পেট্রাক অথবা রঁসারের মতো, তিনি নিরন্তর কাব্যোচিত শব্দ ব্যবহার করেন, এমন শব্দ, যা কখনও পরস্পরের প্রতিবাদ করে না, সৌন্দর্যের সঙ্গে আবহমানভাবে সম্পৃক্ত শব্দ দিয়েই রচনা করেন সৌন্দর্য। ...তাঁর কবিতায় চলতিকালের জীবন অথবা কথ্যভাষার আস্বাদ নেই। তাঁর কাব্যের সমগ্র পটভূমি মধ্যযুগ ও পুরাকাল থেকে সংগৃহীত : ... তাঁর মনের মানচিত্রে রঙিন হয়ে আছে উপনিষদিক অরণ্য, গুপ্ত যুগের উজ্জয়িনী ও পদ্মা তীরবর্তী বাংলার নিসর্গ, কিন্তু স্বল্পসংখ্যক গদ্য রচনা বাদ দিলে– তাঁর জন্মস্থল ও পৈতৃক বাসভূমি কলকাতা স্থান পায়নি। তিনি আক্রান্ত হননি আধুনিক নাগরিক জীবনের কোনো চরিত্রলক্ষণে,....সত্য, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, কিন্তু সেটা আক্ষরিক অর্থেই দৃষ্টিপাত, তাও যেন অনিচ্ছা কাটিয়ে, কিছুটা কর্তব্যবোধে সাধিত। বেকার কেরানি, ট্রামের ভিড়, গলির জঞ্জাল– এগুলো তথ্য হিসেবে উল্লিখিত হলেও জীবন্ত হয়ে ওঠেনি, কেননা কবি এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, তাঁর জীবনের অংশ নয় এরা, বাইরে থেকে ধার করে আনা জিনিসমাত্র। শব্দচয়নে কথ্যভঙ্গির আনুগত্য

আছে। কিন্তু বাগধারায় তুলনীয় পরিবর্তন ঘটেনি, কেরানি ও ফুটবল খেলোয়াড়ের ভাবনা ও ভাবনার ভাষা ও সুগন্ধিত রাবীন্দ্রিক। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের পক্ষে যন্ত্রযুগ একেবারেই অবান্তর ও অগ্রাহ্য ছিল। [কান্তা ও কবিতা : কবি রবীন্দ্রনাথ : ২৭-৩০]

এ-হল বুদ্ধদেব, কথিত রবিদ্রোহী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ও সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে যিনি স্পষ্টবাদী। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গদগদ ভাব যাদের চেতনাভ্যাস, তারা অন্ধজনের তুল্য এবং তারাই অধিক দেখেন জগতের রূপ-রস। জীবনানন্দ দাশ এই সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন শাশ্বতভঙিতে। তথ্য ও তত্ত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে রবীন্দ্র-মনন যে সব কবিতা নির্মাণ করতে পেরেছে, তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক বুদ্ধদেবের একটি ছোট ফুটনোট থেকে। ওখানেই বেরিয়ে এসেছে গদ্য আর কবিতার পার্থক্য। 'মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি', এবং নিবিছে সাঁঝের ভাতি, আসিছে আঁধার রাতি/এখনি ছাইবে চারি ভিতে'– এ-হল যাকে বলে ছন্দোবদ্ধ গদ্য, কিন্তু 'আঁধার রজনী আসিবে এখনি/মেলিয়া পাখা'– এখানে সেই একই তথ্যে জাগল আবেগের স্পন্দন এবং 'পাখা' শব্দের সংযোগে একটি চিত্রও রচিত হল। ...তথ্য নয়, ভাব নয়, ভাষাই কবিতার প্রাণদাত্রী। [কান্তা ও কবিতা : কবি রবীন্দ্রনাথ : ৫০] এ-বিশ্লেষণ যথার্থ। তবে চিত্র ও চিত্রকল্পময়তার দ্বৈরথ যেসব পঙ্ক্তি রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন সেখানেই তিনি তৃতীয় একটা ব্যঞ্জনা নির্মাতার অধিকারী হয়েছেন। ভাষা কবিতার প্রাণদাত্রী তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি কাব্যপঙ্ক্তি কেমন যোজন দূরত্বের– উপরের উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট। রাত যখন পাখা মেলে আসে তখন তার রূপ অন্য একটি 'মানে' সৃজন করে। সেই আঁধারে যেন প্রাণ জেগে আছে। সেই আঁধার রাত আসছে যেন পাখির পিঠে সাওয়ার হয়ে। শব্দ ব্যবহারের তারতম্য কেমন করে গদ্য আর কবিতার মধ্যে তফাৎ রচনা করে, এটি তার একটি উদাহরণ।

মানসী কাব্যগ্রন্থটিকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র কাব্যের 'অনুবিশ্ব' হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। মূলত এই কাব্যগ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাতিস্বিক' হিসেবে চিত্রিত করলেন। তার রোমান্টিক চৈতন্যের নায়ক-নায়িকারা মানুষ বলে চিহ্নিত হলেও তারা বস্তুবাস্তবে বাস করে না। রবীন্দ্র মননধর্মে যার উদ্দেশে তাঁর সংরাগ নিবেদন করছেন তিনি কোন সুচিহ্নিত ব্যক্তি নন, এক অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল সত্তা। 'ভুল ভাঙা', 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা', 'আকাঙ্ক্ষা', 'তবু', 'মানসিক অভিসার', 'অপেক্ষা', 'আশংকা', 'আমার সুখ' এবং আরও অনেক কবিতার অন্তরালে আমরা একটি মানবীকে নির্ভুলভাবে চিনতে পারি, কখনও তাঁর 'মধুর বাহু' বা 'নীলাম্বরী'ও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু 'নিষ্ফল কামনা'য় এই নারী তার দেহের সীমা অতিক্রম করে অনন্তের প্রতীক হয়ে উঠল। ...'ধ্যান' এর চিত্রকল্পগুলো এমন বিরাট ও স্পর্শাতীত যে কোন দেহধারিণী নারীর সঙ্গে সেগুলোকে ঠিক মেলানো যায় না। মনে হতে পারে, কবি যাকে সম্বোধন করছেন তিনি বিশ্বপ্রকৃতি, কিন্তু 'যত দূর হেরি দিগদিগন্তে/তুমি আমি একাকার'– এ অন্তিম ঘোষণায় তার চেয়েও একটি দৃঢ়তর ইংগিত ধরা পড়ে। 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত অনেক কবিতারই লক্ষণ এ দ্বিমুখিতা বা বহুমুখিতা, সেগুলোর বিষয় মানবিক অর্থে প্রেম, না ঐশ্বরিক অর্থে ভক্তি, সে বিষয়ে আমরা মনস্থির করতে পারি না; নারী ও প্রকৃতি, কবিতা ও বিশ্ব, প্রেমিক ও ভগবান এরা যেন একই দেহে অবস্থিত হয়ে দেখা দিয়েও দেখা দিচ্ছেন না, আর তারই ফলে কবিতাটির বর্ণবিভা ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। [কান্তা ও

কবিতা : কবি রবীন্দ্রনাথ : ৩২-৩৩] গোটা রবীন্দ্রমানসের চেহারা চরিত্র এমনটাই– এ-বিষয়ে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইউরো-রোমান্টিকরা যেমন করেছেন, রবীন্দ্রনাথেও তার যেন ব্যতিক্রম নেই।

এ বইয়ের তৃতীয় পর্যায়টি হল 'দেবতা ও বধূ'। সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে সোনারতরী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নারীদেহিনী মানবপ্রেয়সী– কবি যে এই 'অন্তরতম' দেবতার বিবাহিত বধূ, এই একটি চিত্রকল্প কবিতাটির কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে; আর আমরা বলতে পারি না যে, 'জীবনদেবতা'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা, যাতে নাম উচ্চারণ না করেও, একটি ছদ্মবেশ অবশিষ্ট রেখেও নিজেকে তিনি ভগবানের ভক্ত হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন। ... বৈষ্ণব কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে কত ঋণী তা নিয়ে এখানে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর কবিতার পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে 'চিত্রা' থেকে 'খেয়া' পর্যন্ত তাঁর ঈশ্বরচেতনা প্রধানত রাধাভাবাপন্ন। [দেবতা ও বধূ : কবি রবীন্দ্রনাথ : ৫৬-৬০]। চতুর্থ পর্যায়টির শিরোনাম 'এ-পার ও-পার'। 'গীতাঞ্জলি'র সব রচনা পরস্পর সম্পৃক্ত, একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে সঞ্জাত; এই তন্ময় সংলাপকে ব্যাহত করে না কোন নীতিকথা অথবা কৌতুকরচনা। অনেক সমান্তর পথ অবশেষে এখানে এসে মিলিত হল : প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা। স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান– এসব সূত্র, যা এতকাল বিচ্ছিন্ন অথবা আংশিকভাবে যুক্ত অবস্থায় দেখা দিয়েছে, তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটল, একবার এবং শেষবারের মতো, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র কাব্য পর্যায়ে। তিনটি নাম, কিন্তু একটিই কাব্য, বক্তব্যে ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক ও সমর্থক। সর্বসাকুল্যে এই গীতিগুচ্ছের সংখ্যা তিনশ' ছিয়াত্তর; এর মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য যেমন আছে, তেমনি আছে অন্তত একশ' ভাস্বর ও অনির্বাণ রচনা, যাতে প্রেরণা কোথাও শ্লথ হয়নি এবং যা কলাসিদ্ধিতেও অবিকল।' [এ-পার ও-পার : কবি রবীন্দ্রনাথ : ৭১]। এ-বইয়ের শেষ পর্যায়টি বুদ্ধদেব সাজিয়েছেন 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক দীর্ঘ রচনায়। আটটি স্তরে সাজানো এই আলোচনার মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরি গীতাঞ্জলির অনুবাদ থেকে পরবর্তীকালে অন্যদের হাতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বিপাক এবং বিস্মৃতি। কেন এমনটা ঘটেছে তারই যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বুদ্ধদেব বসু এবং আমি ধারণা করি, তার এই বিচার-বিশ্লেষণ যথার্থ। তবে কবি থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার পেছনে সেই অনুকারীরাই দায়ী, যারা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঋষিত্ব দান করেছেন এবং 'গুরুদেব' বানিয়েছেন। সব সমাধানই তর্কে বহুদূর ওই বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা চলে রবীন্দ্রমনন-মানস এবং তাঁর রচিত কবিতাবলির চারিত্রলক্ষণ অনুধাবনে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিকোণটি ছিল ইউরো-সঞ্জাত। উপনিষদিক মানবপ্যাটার্ন রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করে, তাকে খর্ব করেননি বুদ্ধদেব। ইউরোপীয় কালচারাল হেজেমনি সত্ত্বেও যে উদার মানবিক ও কালিক বৈশিষ্ট্যের কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায়– তিনি রবীন্দ্রদ্রোহিতার চেয়ে অধিকমাত্রায় সম্মোহিতই ছিলেন। তার সাংস্কৃতিক ধারাস্রোত ও যাপিত জীবনচর্যার সঙ্গে ইউরো-চৈতন্যের সংঘাত হয়নি বরং তাকে নানা মাত্রায় মিলিয়ে-মিশিয়েছেন। এ মেলানোর কাজটাই বিশ্বচেতনার শামিল। মানব সংস্কৃতির সব উৎসমূল যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে এ সত্যেই উপনীত হওয়া যায় যে– মানুষের অগ্রযাত্রা ঘটেছে গুচ্ছে গুচ্ছে এবং সেই অগ্রযাত্রায় বিপুলভাবে প্রভাব ফেলেছে জলবায়ু বা আবহাওয়া, প্রতিবেশ পৃথিবী। বিভিন্ন জাতিসত্তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পেছনেও

কাজ করেছে ওইগুলো। কাল একজন কবির মানস-দেবতা। কেননা কালিক স্পর্শেই রঞ্জিত হয়ে ওঠে কবির মানস। এজন্য রাবীন্দ্রিক কাল আর বুদ্ধদেবের কাল এক নয়। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকী কালিক চেতনায় বসবাস করেছেন, কুড়ি শতকের ঝাঁঝালো যান্ত্রিক নগরে বাস করেও তার মানসপ্যাটার্ন টাল খায়নি কবিতার আবহনির্মাণে। তিরিশোত্তর কবিদের কালের সঙ্গে চার ও পাঁচের দশকের কবিতার কাল মাত্রাগতভাবে ভিন্ন। সামাজিক বিন্যাস পাল্টে যাওয়া, রাজনৈতিক প্যাটার্ন পাল্টে যাওয়া, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, লুটেরা মানসিকতা, অমানবিকতা, নৃশংসতা ও ব্যক্তিসত্তার অনুকারিতা আবহমান বাংলা সংস্কৃতিকেও নির্মাণ করে তুলেছে ভিন্নভাবে। কুড়ি শতকী প্রথম পর্যায় মধ্য পর্যায় ও শেষ পর্যায়ে এই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রূপারূপ ভিন্ন সজ্জায় বিবর্তিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশটি ছিল ঔপনিবেশিক লুটেরাদের শাসনাধীন। দ্বিতীয় বা মধ্য পর্যায়টি দেশ বিভাগ ও সাংস্কৃতিক বিভেদের কাল আর শেষ পর্যায়টি আমি বলতে চাই নতুনসত্তায় উত্তরণের কাল। বুদ্ধদেব বসু এ তিনটি কালিক সময়ের সন্তান এবং গৌরব অনুভব করি এই দেখে যে, তিনি ঔপনিবেশিক জ্ঞান-গরিমার অনুশাসক হয়েও মধ্য পর্যায় থেকে আত্মানুসন্ধানে নীত হয়েছেন। আর শেষ পর্যায়ে তিনি স্বাধীনতার স্বরূপ ও সাংস্কৃতিক বীক্ষার স্বচ্ছ নীলাকাশ পেয়েছিলেন আপনার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে। ঐতিহ্যকে তিনি পুনর্নির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন ইউরো মনন থেকে, কিন্তু তাকে নবায়ন করেছেন নিজস্বতায় মাখিয়ে। কবিতায় যেমন, তেমনি নাটকে এবং গল্প-উপন্যাসেও এই নবীকরণের বহু উপাত্ত-উপকরণ লক্ষ্য করা যায়।

'কবি রবীন্দ্রনাথ' পড়ে আমাদের কি উপকার হল, পাঠক রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু বুঝতে পারল, সেটাই কিন্তু আসল লাভ। বুদ্ধদেব বসু– এক্ষেত্রে যেমন সফল তেমনি অজস্র কবিকে কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যায় এবং তার অবদানকে স্বীকার করে নিজেদের চেতনা ও শিল্পভাবনাকে ঋদ্ধ করা যায়– এ গ্রন্থ তারও কথা বলেছে। বুদ্ধদেব বসু কালিক চেতনায় রবিদ্রোহী। কালই তাকে নির্মাণ করেছে। যারা কালের সৃজনবোধনজাত নন, তারাই কেবল অগ্রজ কবির অনুকারী আর কেউ নন।

দ্বিতীয় পাঠের তিথিডোর

মাহমুদ কামাল

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)–র গদ্যভাষা বরাবরই আমার কাছে আকর্ষণীয়। মূলত কবি কিন্তু তাঁর গদ্যের যারা মনোযোগী পাঠক তাদের কাছে তিনি একজন শিক্ষক বটে। পেশাগত জীবনে শিক্ষক লেখালেখিতেও জাদুময় ভাষা এবং ব্যাকরণসিদ্ধ বাক্যাবলীর কারণে দূরের পাঠকের কাছেও শিক্ষক হয়ে ওঠেন। তাঁর উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। চল্লিশটির বেশি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। গদ্য, পদ্য মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা একশ ষাট। *সাড়া* প্রথম উপন্যাস।

তাঁর মধ্যপর্বের রচনা *তিথিডোর* (১৯৪৬-১৯৪৯) যখন পাঠ করি তখন নিতান্তই ছাত্র। ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয়ার পর অখণ্ড অবসরে অন্যান্য গ্রন্থপাঠের সাথে বুদ্ধদেব বসুর বৃহৎ উপন্যাস *তিথিডোর* দ্রুতই পড়ে শেষ করি। উপন্যাসের কাহিনী, ভাষাশৈলী, স্বাতী ও সত্যেন চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং তাদের প্রেম-পর্বের সফল সমাপ্তি পাঠক টেস্টে সেই যে গেঁথে গিয়েছিল তার ব্যত্যয় দ্বিতীয় পাঠেও ঘটেনি। বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তরুণ পাঠকের *তিথিডোর* পঞ্চাশের পাঠকের দ্বিতীয় পাঠেও যথারীতি আলোড়িত। কি আছে *তিথিডোরে?* মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক এই উপন্যাসে কি যে এমন জাদু আছে দ্বিতীয়পাঠেও পুরনো পাঠকের ক্লান্তি আসে না। বুদ্ধদেবের ভাষা এবং রচনাশৈলী পাঠককেও বেগবান করে, আলোড়িত করে। ছাত্রজীবনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি যৌন পত্রিকায় *যমুনাবতী* নামে বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাস পড়েছিলাম। 'গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীতে এ নামে কোনও উপন্যাস সূচিভুক্ত হয়নি। কিন্তু, যদ্দুর মনে পড়ছে রচনাটি বুদ্ধদেব বসুরই। তার নিজস্ব গদ্যভাষা *যমুনাবতী*তেও ছিল প্রকাশিত। অর্থাৎ, ভাষার জাদু পাঠককে টেনে নিয়ে যায় লেখার শেষ অক্ষরে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মসন্ধান এবং তার বিশ্লেষণ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন উপন্যাসে। এর মধ্যে বৃহৎ *তিথিডোরে* উঠে এসেছে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবর্তনমুখী ঘটনাবলী। রাজেন বাবুর সংসারে পাঁচ পাঁচটি সুন্দর মেয়ে এবং একমাত্র পুত্র বিজনের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নতুন চেহারা ফুটে উঠেছে তেমনি নিঃসঙ্গতার অন্তঃবিক্ষেপ জেগে উঠেছে, রাজেন বাবু, স্বাতী ও সত্যেন চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বিকাশের মধ্য দিয়ে। স্বাতী ও সত্যেনের প্রেম উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অথচ রাজেন বাবুর বড় মেয়ে শ্বেতা'র জন্ম থেকে শুরু করে পাঁচ কন্যা এক পুত্রের পৃথিবীতে আবির্ভাব এবং স্ত্রী শিশিরকণার মৃত্যু অল্প পরিসরের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যেই শিশিরকণার জীবদ্দশায় শ্বেতা, মহাশ্বেতা এবং সরস্বতীর বিয়ে হয়ে যায়। রাজেন বাবু— স্বাতীর বাবা, তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির ডালপালা বিস্তৃত। কিন্তু, এই মানুষটি ভরা সংসারের মধ্যে

থেকেও যেন আলাদা। বাবার চোখে তার পাঁচ পাঁচটি মেয়েই সুন্দরী। একের পর এক কন্যাসন্তান জন্ম নিলেও তিনি অসুখী নন। শিশিরকণা যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হলেন, তখন রাজেন বাবু বলেন, "বেশ হ'লো— ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে হবে— বেশ।" এ কথায় শিশিরকণা সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, কেন, মেয়ে কেন? স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনায় শিশিরকণা কখনোই উৎফুল্ল ছিলেন না। তো, রাজেন বাবুর পাঁচটি মেয়ে তার কাছে অতি আদরণীয়। চতুর্থ মেয়ের পর বিজন জন্মগ্রহণ করার পর যতটা না খুশি তার চেয়ে পঞ্চম কন্যা স্বাতী জন্মাবার পর তিনি আরও খুশি। শিশিরকণার মৃত্যু রাজেন বাবুকে একাকিত্বের দিকে নিয়ে গেলেও তার নৈঃসঙ্গ্য তার কাছে কখনো বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠেনি। বরং, মেয়েদের নিয়ে তার যে উচ্ছ্বাস তাও নৈঃশব্দ্যের প্রলেপে ঢাকা। তবে, কনিষ্ঠার প্রতি রাজেন বাবুর পক্ষপাত একেবারেই স্পষ্ট।

> জাজিম-পাতা বিছানাহীন শূন্য খাটটার দিকে রাজেন বাবু একবার তাকালেন, তারপর দুই চোখ ভ'রে দেখতে লাগলেন তার সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে সুন্দর, তাঁর সর্বশেষ, তাঁর একমাত্র কন্যাকে। (পৃ. ২৩৬, *রচনাসংগ্রহ*, ৭ম খণ্ড)

শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর চরিত্র তত বিকশিত না হলেও শাশ্বতী এবং স্বাতী উপন্যাসের দাপুটে চরিত্র। এর মধ্যে স্বাতী রাজেন বাবুর চোখে, তাঁর সর্বশেষ, তাঁর একমাত্র কন্যা।

মানুষ মূলত একা। একাকিত্ব নৈঃসঙ্গ্য চেতনাকে সীমারেখায় বেঁধে ফেলে। স্বাতী সত্যেনের একাকিত্ব নিজ নিজ পরিমণ্ডলে মধুর। কোলাহলে থেকেও স্বাতী একাকী। কখনো নিজেকে নিজেই ভেঙে অন্য এক স্বাতীকে আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। স্বাতী নৈঃসঙ্গ্যতার কয়েকটি চিত্র :

ক. যারা বেঁচে আছে, যাদের নিয়ে পৃথিবী, স্বাতীর মনে হ'লো তারা তার কেউ না। এমন-কিছু সে জেনেছে যা আর কেউ জানে না; সেইজন্য সকলের থেকে সে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবীর মধ্যে সে একলা। সবাই চলেছে একদিকে, নেচে, লাফিয়ে, ছুটে, ঘুরে, তাড়াতাড়ি, দেরি ক'রে, দলে-দলে চলছে বলির পাঁঠা, কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছে, একলা সে জানে। একলা সে জানে যে, জীবন্ত মানুষরাই মরন্ত, যারা বেঁচে আছে তারা দিনে-দিনে মরছে, মৃত্যু নেই শুধু মৃতের। (পৃ. ৪২৫)

খ. আকাশে নীল মেঘ কালো ছাই রং ছড়ালো, বৃষ্টি ঝমঝম, ঝমঝম। আলো কম, আরো ক'মে আসে, ম'রে যায়, আর পড়া যায় না, দেখা যায় না, বই খোলা, বই কোলে, ব'সে থাকে, ভাবে, আবছা, একলা, চুপ। (পৃ. ২৫০)

গ. কিন্তু কান্না তো থামে না স্বাতীর। কী ক'রে থামবে? কে চ'লে গেলো এই বাড়ি ছেড়ে? বড়দি? না, না, আমি, আমি— স্বাতী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো মনে-মনে— এ-তো আমি, রোজ সন্ধ্যেবেলা সমস্ত আকাশ কাঁদিয়ে যে চ'লে যায়, সে-তো আমি; আবছা অন্ধকারে শূন্য মাঠে ছোট্ট ইস্টেশনে রেলগাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায়, সেও তো আমি। (পৃ. ২৮৯)

পাশাপাশি সত্যেনের একাকিত্ব তার কাছে স্বর্গস্বরূপ। সত্যেনের বাড়িতে আরও কেউ থাকে কিনা স্বাতীর এ প্রশ্নে তরুণ অধ্যাপকের উত্তর, "একেবারে একা! এই একাই স্বর্গ!"

নিজেকে নিয়েও স্বাতীর প্রশ্ন রয়েছে। একাকিত্বই এই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। স্বাতীর অকষ্টকল্পনায় চিরকালীন জন্মরহস্য নিয়ে যে চিন্তাসূত্র বুদ্ধদেব বসু এঁকেছেন সে চিন্তা গতানুগতিক হলেও স্বাতীর ব্যক্তিত্বের কারণেই ওই বর্ণনা আলাদা রূপ পেয়েছে।

> মা ম'রে গেলেন— তবু তো আমরা বেঁচে-বর্তে আছি; ভালো— হ্যাঁ, ভালোই তো আছি, হঠাৎ হাতুড়ির বাড়ি পড়লো হৃৎপিণ্ডে, মা–র জন্য যে তার আর কষ্ট হয় না, সেই কষ্টে যেন বুক ফেঁটে গেলো। তবে কি কারো জন্যই কিছু এসে যায় না কোথাও?
>
> পৃথিবীকে না–হ'লে এক মুহূর্ত চলে না আমার কিন্তু আমাকে না–হ'লে পৃথিবীর তো চলবে চিরকাল। এই যে বৃষ্টি, হাওয়া, রোদ্দুর,এ কি আমার জন্য? এরা কি আমাকে চায়? কোনো রকমে হঠাৎ জ'ন্মে গেছি পৃথিবীতে, জানিনা কেমন ক'রে না মরে আছি— তাই তো সব পাচ্ছি। এই রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া, মনে হয় আমারই জন্য সব, চাষ, আমাকেই চায় ওরা— কিন্তু না–ই যদি চায়, তা'হলে আমি কেমন ক'রেই বা হলাম! আমি না— হয়ে অন্য কেউ তো হ'তে পারতো, আমি হলাম কেন? (পৃ. ২৩৯)

স্বাতী শৈশবে মাকে হারিয়েছে। কিন্তু, মায়ের স্মৃতি ধূসর ধূলিমলিন হয়নি। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে মৃতা মায়ের প্রসঙ্গ রয়েছে। স্বাতীর অন্তর্মুখিতায় পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সাথে মায়ের অস্তিত্বও তাকে সংবেদন করে। তখন নিজেকেই মাতৃস্থানীয় মনে হয়।

> আমার মা–ও নেই, বাবাও নেই, ক্ষীণ একটু হাসলেন সত্যেন বাবু। ...স্বাতী কথা বললো না। হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেলো তার। এ বাড়িতে যদি একজন মা থাকতো এখন, কত ভালো লাগতো।
>
> নিজের রুগ্ন মা–র স্মৃতিকে মনে-মনে সাজিয়ে দাঁড় করালো এই ঘরে, দেখলো তাঁর হাসি, শুনলো তাঁর কথা, আর ছায়া ভরা ঘরে চুপচাপ ব'সে ব'সে তার যেন মনে হ'তে লাগলো যে–মার কথা সে ভাবছে, সে-মা আর কেউ নয়, সে নিজেই। (পৃ. ২৫৬)

নিঃসঙ্গতার মধ্যে থেকেও স্বাতীর মানসলোকের অন্তর্মাধুর্য ধরা পড়ে তার প্রকৃতি চেতনার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি নিজের মতো হলেও প্রকৃতিই স্বাতী হয়ে ওঠে। এই স্বাতী-প্রকৃতি স্বাতীর অনুভবে এবং তা চৈতন্যহীনতা থেকে ক্রমান্বয়ে সংবিত্তির রূপ পায়।

> কিন্তু বারান্দায় আলো জ্বালা হয়নি, পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো একটি–দুটি লাইন টেনে দিয়েছে বাবার পায়ের কাছে, আর স্বাতী যেদিকে মুখ ক'রে বসেছে, আকাশের ঠিক সেখানটায়, ঠিক তার চোখের সামনে দপদপ করছে মস্ত সবুজ একলা একটা তারা— এই সন্ধ্যাতারা?— পৃথিবীর এত লোকের মধ্যে যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে আকাশের পলক-না-পড়া-চোখ। মানুষের চোখ যখন জলে ভ'রে-ভ'রে ওঠে, এ–তারা যেন সেই রকম, এত পরিষ্কার যে জল দিয়েই বানানো মনে হয়, ঠিক যেন আকাশের গায়ে লেগে নেই, একটু স'রে এসেছে, এক্ষুনি গ'লে প'ড়ে যাবে, যেমন চোখের জল উপচে পড়ে মানুষের চোখ থেকে মুখে। (পৃ. ২৭৭)

যাকে কেন্দ্র করে স্বাতী–সত্যেন, শাশ্বতী-হারীতের চরিত্র বিকশিত হয়েছে সেই রাজেন বাবু— পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রের পিতা— তার ভরা সংসারে থেকেও তিনি যথারীতি একা। এই একাকিত্ব স্ত্রী শিশিরকণার মৃত্যুর পর থেকেই জমাট বেঁধেছে।

একমাত্র পুত্র বিজনের পরিবার ও সমাজ বিচ্ছিন্নতাও রাজেন বাবুকে একাকী করেছে। বড় মেয়ে শ্বেতার স্বামীর মৃত্যুতে কষ্ট পেয়েও তিনি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হারীত— কমিউনিস্ট চিন্তাধারার অনুসারী, কথাবার্তায় স্পষ্ট কিন্তু তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপরীতে— তাকেই পছন্দ করেছে শাশ্বতী। বিষয়টি হারীত রাজেন বাবুকে জানালে দ্বিধায় ভোগেন তিনি। বড় তিন জামাই প্রমথেশ, হেমাঙ্গ, অরুণের পাশে হারীতকে দাঁড় করাতে পারছেন না তিনি। রাজেন বাবুর মনোবেদনা মর্মস্পর্শী। এ বেদনা একাকিত্বেরই।

> কিন্তু মেয়ে তাকে পছন্দ করেছে, ' মেয়ে সুখী হবে, আমি কে? কিছুই কি নই? আমার না ওরা? ...না, ফল কি গাছের? মুকুল গাছের, ফুল গাছের, ফল পৃথিবীর। যে— মুহূর্তে পাকলো, সে— মুহূর্তে দিতে হবে পৃথিবীকে, না দিলে ফল পচবে, গাছ মরবে। ...যদি পড়ে, পোড়ো জমিতে, জোলো জমিতে, মরুভূমিতে? ... কে জানে, কেউ কি বলতে পারে? কাকে জিগেস করবেন? কার সঙ্গে কথা বলবেন আজ? বিছানায় শুয়ে, অত কষ্ট পেয়ে, রোগে ধুঁকতে-ধুঁকতে, তবু-তো সে ছিলো। গেলো কোথায়? ত'বে কি সত্যি চ'লে গেলো, আর দেখবো না, তার মেয়ের বিয়েতেও দেখতে পাবো না একবার? (পৃ; ২১০)

তিথিডোরের বাসিন্দাদের নৈঃসঙ্গ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। তার ভাষায়, "স্বৈরবৃত্ত-কালে অমোঘ নির্দেশে রাজেন বাবু, বিজন, শাশ্বতী, স্বাতী, হারীত, সত্যেন, প্রবীর মজুমদার— তিথিডোরের এই সব মানুষ, কখনো হয়ে উঠেছে একাকিত্বের উপাসক কখনো নৈঃসঙ্গ্যপূজারী, কখনো বা তারা করেছে নির্বেদ-নিরানন্দের আরাধনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে একদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে চোরাকারবারি-কালোবাজারি করে একদল মানুষের দ্রুত ফুলে-ফেঁপে ওঠা— এই যুগল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল মানুষের সব প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞান। তিথিডোরের মানুষদের গায়ে লেগেছে এই নষ্ট সময়ের ছোঁয়া; সময়ের বিনষ্টিতে বিপন্ন হয়েছে তারা। ফলে তাদের মানসলোকে দেখা দিয়েছে নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্যের সংক্রমণ।" (বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্য চেতনার রূপায়ণ)

দ্বিতীয় পাঠেও প্রথম পাঠের *তিথিডোর* উজ্জ্বলতা হারায়নি। বৃহৎ পরিসরের এই উপন্যাস শুধু রাজেন বাবুর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— এটি হয়ে উঠেছে একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি। এই সময়টি গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশ দশকের আগে ও পরের সময়। এ সম্পর্কে সন্তোষ কুমার ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "বৃহৎ উপন্যাস কখনও কখনও আপনকালের দলিল হয়, তবে বৃহত্ত্ব ছাড়িয়ে মহত্ত্বে মর্যাদা পায়, *তিথিডোর* তিরিশের শেষ আর চল্লিশের শুরুর কলকাতার পরিশীলিত একটি বিশেষ সমাজমানসের দলিল।"

বুদ্ধদেবের জন্মশতবার্ষিকীতে একষট্টি বছর আগের লেখা *তিথিডোর* পাঠকের দ্বিতীয় পাঠে এতটুকুও ম্লান হয়নি। বরং সেই সময়ের সমাজমানসের এই দলিল পাঠক-চেতনাকে বহুদূর সম্প্রসারিত করে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ

মুজিবুল হক কবীর

বাংলা ছন্দের উৎস সন্ধানে আমরা বারবার ফিরে যাই চর্যাপদের কাছে। চর্যাপদগুলো রাগাশ্রিত, সুরসিদ্ধ, সুরগত প্রভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই চর্যাপদের ছন্দ শিথিল হয়ে পড়েছে। সংস্কৃতজাত মাত্রাবৃত্ত, প্রাকৃতে 'পাদাকুলক', 'চউপইআ', এবং 'দোহা'-ছন্দোবদ্ধ নামে চিহ্নিত। এই তিন ছন্দোবদ্ধেরই প্রভাব চর্যাপদে সুস্পষ্ট। তবে অধিকাংশ চর্যার আচার্যরা মাত্রাপ্রধান পাদাকুলককেই (কুলক-স্তবক) প্রয়োগ করেছেন তাঁদের কবিতায়। পাদাকুলকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে চারটি পাদ (পঙ্ক্তি) রয়েছে, প্রতিপাদে ১৬ মাত্রা এবং ৮ মাত্রার পর যতি-চিহ্ন। ৩৭টি চর্যা পাদাকুলক তথা প্রত্নকলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে রচিত; আর অন্যদশটি 'দোহা', 'চউপইআ' কিংবা অন্যছন্দে নির্মিত। চর্যাপদে অনেক কবি-ছান্দসিক খুঁজে পেয়েছেন মাত্রাবৃত্তের আদিরূপ, আবার কেউ পেয়েছেন অক্ষরবৃত্তের অস্পষ্ট আভাস। মূলত চর্যাপদেই প্রথম বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়—ক্রমে তা স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ। বাংলা কবিতার প্রধান তিনটি ছন্দই লক্ষণীয় (অক্ষরবৃত্ত—মাত্রাবৃত্ত—স্বরবৃত্ত) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ ছন্দ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে অক্ষরবৃত্ত পয়ারেরই প্রাধান্য বেশি বিশেষত কাহিনীমূলক কাব্যগুলোতে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা খুঁজে পাই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচর্যা; স্বরবৃত্তের নিদর্শন পাই লোচনদাসের ধামালীতে, কৃত্তিবাসের রামপাঁচালীতে, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে, নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে, ময়মনসিংহ গীতিকায়, মেয়েলি ব্রতকথায়, বাউলগানে, ঈশ্বরগুপ্তের (যুগসন্ধিক্ষণের কবি) নানা কবিতায়। এ সময়ে ছন্দ টলে গেছে, মাত্রাগত হেরফের হয়েছে, ধ্বনিকে প্রলম্বিত করে পূরণ করা হয়েছে মাত্রাগত ফাঁক।

আধুনিক কালের সূচনালগ্নে বাংলা ছন্দ ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট একটি রূপলাভ করে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-১৮৭৩) প্রথম পয়ারবন্ধে আঘাত হানেন, আট-ছয়ের চৌদ্দ মাত্রার বিভাজনকে মাইকেল মান্য করলেও পদান্তিক যতিকে উপেক্ষা করেন, প্রথাসিদ্ধ মিল-বিন্যাসকে বর্জন করে 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যে ফুটিয়ে তোলেন যতিপাতের স্বাধীনতা এবং প্রবহমানতা। কবিতার শিরায় বইয়ে দেন তিনি এক যুগান্তকারী পরিবর্তন-স্রোত। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মূলত অক্ষরবৃত্তেরই একটি রূপ। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অঙ্গুলিমেয় কবিতা তিনি নির্মাণ করেছেন। মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথই অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নানামুখী বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যদীপ্ত করে তুলেছেন। 'আবিষ্কার করেছেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'। লোকছন্দ বা স্বরবৃত্তকে মার্জিত, পরিশীলিত করে পাঙক্তেয় করে তুলেছেন তিনি। মুক্তক-পরিবেশ রচিত হয় তাঁর অক্ষরবৃত্ত কবিতায়। অমিল ও সমিল অক্ষরবৃত্ত মুক্তক ছন্দেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। মুক্তক স্বরবৃত্তেও লেখেন কবিতা। তবে মুক্তক মাত্রাবৃত্তছন্দে প্রথমে কবিতা নির্মাণ করেন কাজী

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। রবীন্দ্রনাথের প্রধান ছন্দ ছিল অক্ষরবৃত্ত। নজরুলের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন রবীন্দ্র-উদ্ভাবিত মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে–তবে এতে রয়েছে জীবনানন্দের আত্মচারিত্র্য–চিহ্ন। আধুনিক বাংলা কবিতায় যাঁরা পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অন্যতম, বুদ্ধদেব বসু আত্ম–স্বাতন্ত্র্যবাদী, অন্তর্মুখী ও নিভৃতচারী, চরম নৈঃসঙ্গ্যবোধেতাড়িত এক কবি। পাশ্চাত্যশিল্পের ভুবন তিনি চষে বেড়িয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুড়ি হয়েছে সমৃদ্ধ, নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন বৈশ্বিক আত্মার সঙ্গে–রবীন্দ্রবলয় ভাঙার প্রবণতা আমরা লক্ষ করি তিরিশের কবিদের সঙ্ঘবদ্ধপ্রয়াসে–রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই পাণ্ডবদের এগিয়ে যাওয়া–'ভাব-ভাষা-ছন্দ' এই তিনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনভর সক্রিয়, পরীক্ষাশীল। তাঁর এই বৃত্ত-ভাঙার কাজে সময়কে ব্যয়িত করলেও বুদ্ধদেব বসু ছন্দ-প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে রীতিনিষ্ঠ এবং কিছুটা রাবীন্দ্রিক ছন্দের জটাজালে আবদ্ধ। ভাব-ভাষা একেবারেই আলাদা, আবেগদীপ্ত, সংহত, মননরসে ঋদ্ধ। জীবনানন্দ দাশ 'ঝরাপালক'-এ এবং বুদ্ধদেব বসু 'মর্ম্মবাণী' (১৯২৪)-তে নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করতে সক্ষম হননি। 'মর্ম্মবাণী'-র (১৯২৪) 'অরূপ' কবিতাটি সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত :

৪ ৪ ৪ ৪ ২
ডালে-ডালে | কোকিল-দোয়েল | বুকের ব্যথা | ঝরায় গানের | সুরে
দেখেছিলেম | তারে অনেক | দূরে ।
সন্ধ্যাবেলার | শুকতারাটির | মত
চিরদিনের | কোন্ বেদনায় | নত,
কোন্ অসীমের | সুদূর পানে | চেয়ে,
চঞ্চলা কোন্ | মেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা '(১৯১৪-১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যে সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তকের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। নজরুলের 'কামালপাশা'ও মুক্তক স্বরবৃত্তে রচিত। কবিতাটি ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুল মুক্তক স্বরবৃত্তে ২২ মাত্রার পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন কামালপাশা কবিতায় :

নিজের হাজার। ঘায়েল জখম। ভুলে তখন। ডুকরে কেন। কেঁদে ফেলি। শেষে।

ছান্দসিক আবদুল কাদিরের মতে, 'বাংলা মুক্তক রীতির স্বরবৃত্ত কবিতায় এরূপ সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তি আর কোনো কবি রচনা করেছেন কিনা, তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন'। (নজরুল প্রতিভার স্বরূপ ॥ আবদুল কাদির ২৪ পৃঃ) বুদ্ধদেব বসু 'অরূপ' কবিতায় প্রয়োগ করেছেন সর্বোচ্চ ১৮ মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে 'জীবন দেবতা' কবিতায় ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন, আর বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'মর্ম্মবাণী' (১৯২৪)র 'জীবন-দেবতা' কবিতায় ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন :

(ক) মানসকুসুম | তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, | পরেছ কি গলে,
আপনার মনে | করেছ ভ্রমণ
মম যৌবন | বনে।
('জীবনদেবতা', চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ)

(খ) নাই নাই মোর। হীরা কাঞ্চন
নাই উপহার, । নাই কোনো ধন,
এনেছি আমার । মাথার ভূষণ
এনেছি আমার । স্বর্গ।
(জীবনদেবতা, মর্ম্মবাণী, বুদ্ধদেব বসু)

এ দুটো কবিতার পর্বভাগে রয়েছে চমৎকার সাদৃশ্য। 'মর্ম্মবাণী'র কবিতা শাব্দিক ও ছান্দিক প্রথাবদ্ধতার শিকার।

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) ভাবনা ও প্রকরণে অনন্য, বলা যায়, ছন্দে-ভাষায় উপমায় ঐশ্বর্যশালী *বন্দীর বন্দনা* প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণযোগ্য : 'এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মত যার ভিতর সূর্যের রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত', বুদ্ধদেব বসু নানাবিধ ছন্দ-রসে ডুবে গিয়ে কবিতার ভাবগত-ভাষাগত প্রসাধনে, রূপ-নির্মাণে ও পরিমার্জনায়, মননের দ্যুতি বিচ্ছুরণে বরাবরই তৎপর ছিলেন, মনে হয়, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন তিনি। জীবনানন্দ দাশ যেমন ব্যবহার করেছেন দীর্ঘপদভাগের মুক্তক, তেমনি বুদ্ধদেব বসুও :

৮ ৮ ১০
(ক) বাকি সব মানুষেরা । অন্ধকারে হেমন্তের । অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
(১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ১৯৬০)

(খ) আজ আমি ক্লান্ত হয়ে । পথপ্রান্তে পড়ে আছি । নীরব ব্যথায় শান্ত মুখে
ঝরে-পড়া বকুলের । গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
(শাপভ্রষ্ট, বন্দীর বন্দনা)

এখানে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি-সীমা জীবনানন্দ দাশের উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তির মতো ২৬ মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে। 'কালস্রোত' কবিতাটিও মুক্তক অক্ষরবৃত্তে নির্মিত-এ কবিতারও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছাব্বিশ মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। যেমন একটি পঙ্‌ক্তি : আমার হৃদয়-পানে । স্পন্দনের, ক্রন্দনের । বন্ধনের নিত্য অভিসার।

(কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা)

এ দুটো কবিতাই অমিল মুক্তক, দু' একটি ক্ষেত্রে নিকট ও দূরবর্তী মিলবন্ধন লক্ষণীয়। অনুপ্রাসযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে, একই বর্ণে আংশিক রঞ্জিত ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে, ক্রিয়াপদ ও নামধাতুর ব্যবহারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এসেছে একটু আলাদা মেজাজ–

১) ভাবিবার, দেখিবার । বুঝিবার অবসর । ছিলো নাকো কোনো-
কিংবা
২) আলস্যের লাস্যভরে । লীলায়িত মধ্যাহ্ন মন্থর,
ক্লান্তিঘেরা অপরাহ্ণ । উদার, উদাস,
৩) উচ্ছলিয়া, উল্লসিয়া, । ঝর্ঝরিয়া ঝরেছে নিয়ত।
(কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা)

'কালস্রোত' কবিতায় দু'চারটি পঙ্‌ক্তি চারমাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্বে নির্মিত হয়েছে এমন মনে-হওয়া অস্বাভাবিক নয় :

ক) ছেড়ে যেতে। চাহে নাকো। মন।
খ) আমি শুধু। পড়ে রবো। বেদনার। কূলে,
গ) তারপরে। আর কভু। জ্বলিবে না। আলো,
ঘ) যা পেয়েছি,। থাক তাহা। নয়নের। আলো হয়ে। মোর,
তারই তরে। সব মোর। প্রেম।
ঙ) শুধু তারই। লাগি মোর। হৃদয়ের।
প্রেম ও। প্রণাম
এইদিন। রজনীরে। ভালোবেসে। দিয়ে গেনু দান।

হয়তো স্বতঃপ্রণোদনায় বুদ্ধদেব বসু অক্ষরবৃত্তের শোষণাগ্রহী শরীরে মাত্রাবৃত্তকে চারিয়ে দিয়েছেন, যা অক্ষরবৃত্তের সান্দ্র-ভাবকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। মুক্তক অক্ষরবৃত্তে নির্মিত 'বন্দীর বন্দনা'ও। এ কবিতায়ও সর্বোচ্চ ছাব্বিশ মাত্রার সন্ধান পাওয়া যায়। ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্ব এ কবিতায় লক্ষণীয় :

ক) আপনার কাছে। মোরে করিয়াছো। বন্দী চিরন্তন।
খ) মোরে ক্ষমা করি। তব অপরাধ। করিয়ো ক্ষালন।
গ) বিধাতা, জানোনা। তুমি কী অপার। পিপাসা আমার। অমৃতের পরে।
ঘ) শিরায়-শিরায়। কত সরীসৃপ। তোলে শিহরণ

অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ– যা কিনা মিশ্রছন্দেরও আমেজ এনে দেয়। বুদ্ধবসুর 'প্রেমিক' কবিতাও মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই রয়েছে ত্রিশ (৩০) মাত্রা, আট+আট+আট+ছয় যা জীবনানন্দ দাশের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বাংলা ছন্দের মুক্তক রূপনির্মাণে প্রথম প্রয়াসী হয়েছিলেন' রবীন্দ্রনাথ। তাঁর *সন্ধ্যা-সংগীত* (১৮৮০-৮২) কাব্যের 'তারকার আত্মহত্যা' (১৮৮১) কবিতায় তিনি 'সার্থকভাবে ছন্দের বন্ধন মোচনের আনন্দ প্রথম অনুভব করেন'। তবে 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭)য় রবীন্দ্রনাথ প্রথম সচেতনভাবে চৌদ্দ মাত্রা-পরিসরে মুক্তক ছন্দ প্রয়োগ করেন। গিরিশচন্দ্র অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর 'রাবণ বধ' নাটকে, যা ভাঙা-অমিত্রাক্ষর বা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি 'রাবণ বধ'-এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। 'যা হোক, ...গরিশ চন্দ্রের ছন্দ আর রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দ সমজাতীয় নয়। ছন্দের পদবিভাগে ও যতি-স্থাপনে এই ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশি এবং গৈরিশছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান, অনেক স্থলেই অনেকটা কাটা কাটা গোছের। এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট। পঠিতব্য কবিতা ও অভিনেতব্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দু'জনের হাতে দুই রূপ ধারণ করেছে'। (*ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ১১৬ পৃ.)

সব ছন্দে মুক্তক রূপ ফুটিয়ে তুলতে তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবগণ রবীন্দ্রনাথের কাছে, মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্য নজরুলের কাছে কম-বেশি ঋণী।

'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) কাব্যের 'মানুষ' কবিতা (১৯২৮) মূলত ৪টি সনেটকল্প শিল্পরূপ, প্রতিটি পঙ্‌ক্তি আঠারমাত্রার অক্ষরবৃত্তে নিষ্পন্ন :

১. আসঙ্গবাসনা-পঙ্গু। আমি সেই নির্লজ্জ কামুক;
২. আমি যে করেছি পান। ব্যগ্রকণ্ঠে এই উগ্র সুরা-

৩. কেহ ছিন্ন নগ্নগাত্র, | কেহ দীপ্ত সুদৃশ শোভায়,
৪. এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ | নারীমাংস চেয়ে সুখকর,

'বিজয়িনী' ও 'পরাজিতা' সনেটদ্বয়ও অক্ষরবৃত্তে (দীর্ঘ পয়ারবন্ধে) নির্মিত। 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৩)-র 'অসূর্যম্পশ্যা' ২৬ মাত্রায় অক্ষরবৃত্তে রচিত সনেট, যার ষটকের স্তবক আলাদা নয়।

'যে-আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের 'রাত তিনটের সনেট' (১৮ এপ্রিল, ১৯৫৫) মুক্তক অক্ষরবৃত্তে রচিত, 'শিথিল উচ্চারণ ভঙ্গি', 'এখানে ভাষায় গদ্যের উপযোগী বাকধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণ রাখতে গিয়ে কবি মাত্রা প্রসারিত করেছেন'। বুদ্ধদেব বসু হ্রস্ব দশমাত্রা পঙ্ক্তি বিন্যাসেরও সনেট লিখেছেন :

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থঃ এই দেহ ম্রিয়মাণ,
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
(স্মৃতির প্রতি : ৩)

কথ্যবাক্‌ভঙ্গির চমৎকার ব্যবহার আমরা লক্ষ করি 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'বিদেশিনী' কবিতায়। অক্ষরবৃত্তছন্দে নির্মিত এ কবিতায় রয়েছে মাত্রা-সংশ্লেষের উদাহরণ :

তার উপর রোজ পড়ি অমৃত বাজার কিছু ফল আছেতো শিক্ষার (বিদেশিনী, দ্রৌপদীর শাড়ি)।

বুদ্ধদেব বসুর প্রধান লক্ষ্য ছিলো কাব্যরীতির সঙ্গে বাক্‌রীতির মেলবন্ধন সৃষ্টি। তিনি তা অক্ষরবৃত্ত পয়ারের মাধ্যমে অনবদ্যভাবে রূপ দিয়েছেন। যেমন :

৮ ৬
এরা তো বাঙালি নয় | কী করে জানবে
মা বাবা ভাই বোন | স্বামী স্ত্রী
এসব কথার মানে | কী
[বিদেশিনী, দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)]

এখানে 'মা', 'স্ত্রী', 'কী' এগুলো কথ্যভাষার মতো টেনে উচ্চারিত হয়ে ২ মাত্রার রূপ পেয়েছে। 'কী' কথাটি প্রথম চরণে ১ মাত্রা ও শেষ চরণে ২ মাত্রা হয়েছে, যা মনে করিয়ে দেয় ছড়ার ছন্দের ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির 'ঘুম' শব্দটি ব্যবহারের কথা। পয়ারের সংকোচনশীলতার জন্যই মা, স্ত্রী প্রভৃতি একাক্ষর শব্দ কাত হয়ে পড়েনি'। (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৮৪, পৃ. ১১১)

বুদ্ধদেব এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : যদি লিখতুম–

৮ ৪
মাতা, পিতা, ভাই, বোন। পত্নী, স্বামী
এ সব কথার কী যে। মানে

তাহলে যা হতো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। ...যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাক্যবিন্যাসে, হুবহু মুখের কথার মতো বলে সহজ ও জোরালো লাগছে। (প্রাগুক্ত, ১১১ পৃ.)

যুগের চালচিত্র ও সংগ্রামমুখর জীবনের বোধ-অনুভূতিকে স্পর্শ করার জন্য 'কবিতার ভাষা আর স্পন্দ কেবলই সাযুজ্য তৈরি করতে চায় আমাদের দৈনন্দিন

বাক্‌রীতির সঙ্গে'। বস্তুত, কবির কাজই হলো ভাষার ভাসমান স্তর ভেদ করে 'দেশীয় বাক্‌রীতির মৌলিক তেজ' কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা। 'সেইখান থেকেই কবি তুলে নেবেন তাঁর বাক্‌স্পন্দ'। বাক্‌স্পন্দকে বুদ্ধদেব বসু বুঝে নিতে চেয়েছেন 'ছন্দ কাঠামোর মধ্যেই। 'চলচ্চিত্র' কবিতা থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি :

ট্রামে আর বাস-এ
ঘাম, চুরুটের ধোঁয়া, দু-পয়সার সাপ্তাহিক, গরম অসহ্য গরম।
ফিরিঙ্গি মেয়ের ব্রণ-ফোটা মুখে
পাউডার প্রলেপ। চাঁদনির এগার টাকার স্যুটে
শোভনশরীর রাকেশলোভন
বেকার, বীমার দালাল।
(চলচ্চিত্র, *দময়ন্তী*)

'চার মাত্রা পর্বে লেখা মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দের এ কবিতায় বাক্‌ছন্দের বিন্যাস কথ্য বাক্‌ভঙ্গির চাপে ছন্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাসটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মনোযোগে পড়লে বোঝা যায় ছন্দের শৃঙ্খলাই কথ্য ভাষাছাঁদকে এখানে জীবন্ত করেছে, ভাষার তির্যক ব্যবহারে যে শ্লেষের উদ্দাম, তাতে অনিবার্য কাজ করেছে কথ্যভঙ্গির স্বাভাবিকতা। (কবি বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তম দাশ, পৃ. ৬৭)

'দময়ন্তী'-তে সংকলিত হয়েছে ২৫টি কবিতা। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ১০টি আর ১৫টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। বাংলা ছন্দ ও মিলবিন্যাসে 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) এক অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত অনেক কবিতায়ই রয়েছে বাক্‌স্পন্দের চোরাস্রোত :

হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দে বাড়ি ফিরে বলে 'বাবা, দ্যাখ্যো কী এনেছি'।
সে কিন্তু বোঝে না, এরা এত কেন জমায় জঞ্জাল,
বোঝে না সে এ-ই তার আজীবন আকাঙ্ক্ষিত ফল,
কুঁচকে যায় ভুরু-'এরা বড়ো বেশি করে চ্যাঁচামেচি'।
(বৃদ্ধকবি, স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশের মতো বুদ্ধদেব বসুরও প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। তাঁর *কবিতা-সংগ্রহ*-এর ৩৬৪টি কবিতার মধ্যে ১৮৮টি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নির্মিত। মাত্রাবৃত্তে নির্মিত হয়েছে ৫৭টি; স্বরবৃত্তে ৩২টি এবং গদ্যছন্দে লেখা হয়েছে ৮৭টি।

মাত্রাবৃত্তেও বুদ্ধদেব বসুর দক্ষতা, ক্ষমতা অসাধারণ। রবীন্দ্র আবিষ্কৃত ছন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। *মানসী* (১৯৮০) কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রথম প্রয়োগ করেন। 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত পয়ারের প্রথম নিদর্শন। পরে তিনি এ কবিতাটির মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পরিবর্তিত করেন। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত রচনার প্রথম কৃতিত্ব নজরুল ইসলামের, পরে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন; তবে একথা সত্যি যে, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুও রবীন্দ্রনাথের *সেঁজুতি* (১৯৩৮) প্রকাশের অনেক আগেই মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে কবিতা লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের (১৯৩৭) 'কঙ্কাবতী' (১৯২৯) কবিতায় প্রবহমান মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন প্রেমের আবহ তৈরি করার জন্য :

তোমার নামের। শব্দ আমার | কানে আর প্রাণে | গানের মতো-
মর্মের মাঝে | মর্মরি বাজে, কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী
(কঙ্কাবতী গো)

দূর-সিন্ধুর | তরঙ্গ-রোল | অমাবস্যায় | অনবরত
অন্ধকারের | অন্তর-ভরা | ছন্দ-শিহর | স্পন্দমান
(কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতী)

বুদ্ধদেব বসু 'কঙ্কাবতী'-কে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর 'সাহিত্যচর্চা'র 'বাংলাছন্দ' প্রবন্ধে। 'কঙ্কাবতী' ছয় মাত্রা পর্বের মাত্রাবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তেও বুদ্ধদেব বসু বাক্‌স্পন্দকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ৬ মাত্রাবিশিষ্ট পর্বে :

১. আপনারা কবে? আমরা এসেছি সাতাশে।
ওকভিলে আছি। আসবেন একদিন।

……………………

২. আমরা চমকে, থমকে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধে বেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি সুরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে?
(ম্যাল্-এ, দময়ন্তী)

'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) কাব্যের 'সেরেনাদ', 'কবিতা','কঙ্কাবতী', 'রূপকথা', 'এক পয়সায় একটি' (১৯৪২)র 'যামিনী রায়-কে, 'দময়ন্তী'-র(১৯৪৩), 'সাগর-দোলা', 'ম্যাল'-এ, 'দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)র, 'স্বয়ংবরা' 'নূপুর' 'দোল পূর্ণিমা'র কবিতা, 'প্রৌঢ় প্রেম', 'ঝরা ফুলের গান', 'শ্রাবণ', 'শীতের প্রার্থনা, 'বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫)-এর 'নেপথ্য নাটক', 'অসম্ভবের গান, 'আকাশ-পাতাল, 'বর্ষার দিন, 'মুক্ত প্রেম, 'মরচে-পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬)'-এর 'মৌলিনাথের স্বপ্ন', 'আরোগ্যের তারিখ' মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতা।

সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্ত নিয়েও বুদ্ধদেব বসু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন :

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
দ্যাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।
(অসম্ভবের গান, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর)

'আরোগ্যের তারিখ' কবিতাটি চার পঙ্‌ক্তির স্তবকে নির্মিত, সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্তে ৩, ৪ ও ৫ মাত্রার অপূর্ণ পর্বের সমাবেশের ফলে এক ধরনের ধ্বনি-সুষমা আমাদের শ্রুতিবোধকে নাড়া দেয় :

চোখের চুম্বকে | ফুলকি জ্বলে ওঠে।
মোমের মতো গলে; | করতল;
গালের পাশে গাল; | নিঃস্ব সিগারেট
জড়িয়ে দেয় চুলে | ডাইনি-ধোঁয়া।
(রচনাকাল ১৯৬৫)

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র প্রথম অংশেও সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্তছন্দ বুদ্ধদেব বসু প্রয়োগ করেছেন :

ব্যাঙের ছাতা কবে | সাজাবে পৃথিবীতে? | ডাকবে উল্লাসে | দর্দুর?
শিশিরবিন্দুর | আদরে ভরপুর | ঝুলবে আঙিনায় | কুমড়ো?

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর বহুপূর্বে, মানসী পর্বে (১৮৯০-১৯০০) দু-একটি এবং ক্ষণিকা-পর্বে (১৯০০-১৯১৬) গীতাঞ্জলিতে ৭ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কবিতা নির্মাণ করেছিলেন :

জড়ায়ে আছে বাধা, | ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা | বাজে।
(গীতাঞ্জলি-১৪৫)

গম্ভীর গাঢ় ধ্বনিনির্ভর সংস্কৃত মন্দাক্রান্তাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। নিয়ত পরিবর্তনে বিশ্বাসী তিনি– ৮। ৭। ৭। ৫ এর পর্ববিভাগকে একটু পরিবর্তন করে ৭/৭/৭/৫.৪.৩ মাত্রার 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দকে 'মেঘদূত'- এর অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। শুধু মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত ছন্দেও তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার শতদল ঝর্ণাধারাকে খুলেমেলে ধরেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিশীলিত স্রোতধারা বয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকাপর্ব (১৯০০-১৯১৬) থেকেই। বুদ্ধদেব বসু 'দময়ন্তী'র 'পদ্মা' কবিতায় বাক্‌ভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বরবৃত্ত মুক্তকে :

আমরা যখন | নানারকম | খাবার খাচ্ছি | চুমুক দিচ্ছি | চায়ে
হঠাৎ দেখি | চেয়ে
এক্কেবারে | কিনার ঘেঁষে | যাচ্ছে ইস্টি | মার,
প্রচণ্ড তোল | পাড়
লাগছে জলে।

লোকছন্দ বা স্বরবৃত্তের অন্তরে রয়েছে গতি-চাঞ্চল্য– নানাভাবে শব্দগত মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে, অসমপঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে কিংবা নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে স্বরবৃত্ত ছন্দকে করা যায় বৈচিত্র্যমণ্ডিত। বুদ্ধদেব বসু স্বরবৃত্ত ছন্দে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন যা বাংলা কবিতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে, কারণ স্বরবৃত্তে সনেট বা সনেটকল্প কিছু রচনা করা খুবই কষ্টসাধ্য; কল্পনা, মেধা ও ছন্দ-রসকে একত্রে মেলাতে হয়। 'স্বরবৃত্তের নৃত্য চপল ভঙ্গীতে সনেটের ভাস্কর্য-কঠিন সুমসৃণ ভাবদেহে সংযম-সুলভ সুমধুর ছন্দঃসঙ্গীত সৃষ্টি করা দুরূহ'। (আবদুল কাদির, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর)

স্বরবৃত্তে বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেট নির্মাণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ইচ্ছামুক্তি' শিরোনামে (১৩২৭ মাঘ সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথও স্বরবৃত্ত ছন্দে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন–গীতিমাল্যে'র ১০৮ সংখ্যক কবিতা, 'ছড়ার ছবি'র (১৯৩৭) আকাশ প্রদীপ, 'রোগশয্যা'র (১৯৪০) তিন সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

'পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু এবং হিন্দী কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' বাংলা দলবৃত্তে (স্বরবৃত্তে) চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন, (রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দীছন্দ, রামবহাল তেওয়ারী, ১৩৯৩, ১২৪ পৃ. বুদ্ধদেব বসুর একটি চমৎকার সনেট 'এক তরুণ কবিকে', স্বরবৃত্তছন্দে নির্মিত। দশমাত্রার পঙ্‌ক্তি, 'নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ যেন কম, এ সনেটে আছে 'আক্রমণ', 'চতুর মন' পর্বে তিন মাত্রার বিন্যাস, এসব পর্বে তিনি বিশেষ দলকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দুই মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন' :

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া,
আক্রমণ, কাফে-র করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।–

চতুর মন ছদ্মবেশ ছাড়া
ঢাল-তলোয়ার আর কি তোমার আছে;

(এক তরুণ কবিকে, ১৯৫৬, *যে-আঁধার আলোর অধিক*, ১৯৫৮)

দু'একটি কবিতার স্তবকে লক্ষণীয় স্বরমাত্রিকের চাল। এ রীতিটি। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত– এই উভয় ছন্দে সিদ্ধ :

নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে,
জোয়ার এলো জলে,
লুকিয়ে রাখা আশার মতো
বাঁশের ফাঁকে ইতস্তত
একটি-দুটি ম্লান জোনাক
ক্বচিৎ নেবে, জ্বলে।

(সমর্পণ ১৯৫৪, *যে-আঁধার আলোর অধিক*, ১৯৫৮)

জীবনের একটু উত্তাপ, আবেগঘন একটু অনুভূতি ধরার জন্য বুদ্ধদেব বসু ছন্দেই মুক্তির ইশারা খুঁজে পেতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু কালের অমৃত ও গরল ছুঁয়ে-ছেনে দেখেছেন যে, জীবন আসলে নদীর মতো বাঁক নেয়, বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে–নেচে ওঠে অন্তর্লীন ছন্দে–একটি অদৃশ্য বন্ধন সে কেবলি অতিক্রম করতে চায়–বন্ধনেই খুঁজে বেড়ায় মুক্তি। 'তিনি চান এই বন্ধনের মধ্যেই তৈরি হোক একটা সচল টানাপোড়েন, একটা টেন্‌শন। তিনি চান বাইরের পৃথিবীর বস্তুগত বা ভাবগত জটিলতা তাঁর কবিতায় বাঁধা পড়ুক এই ধ্বনিগত টেন্‌শনে'। (বন্ধুর ছন্দের দুর্গে, শঙ্খঘোষ। বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য ১৯৯১ সম্পাদনায়– ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায়)

মূলত বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা-জীবন-পরিসরে রবীন্দ্রনাথের মতো ছন্দমুক্তির সাধনা করেছেন, ছন্দকেই জ্ঞান করেছেন তিনি কবিতার শরীর বলে। তিনি মনে করেন, ছন্দস্পন্দই হলো কবির ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন গদ্যছন্দ। গদ্যকবিতার জনক রবীন্দ্রনাথ, তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শুধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তই গদ্যকবিতার পরিমণ্ডল থেকে দূরে ছিলেন, বুদ্ধদেব বসুসহ অন্য তিনজন লিখেছেন গদ্যছন্দে কবিতা, যা রাবীন্দ্রিক গদ্য কবিতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা– বুদ্ধদেব বসু ভাষাশিল্পী, 'জীবনের নানা পর্বে ছন্দরূপের অভিনব উদ্ভাবনে কবিতার নতুন ভুবন গড়ে তুলেছেন'। ১৯৪০ সালে তাঁর গদ্যছন্দে লেখা কবিতার সংকলন *নতুন পাতা* বেরোয়। এ গ্রন্থের ৫৬টি কবিতাই গদ্যছন্দে নির্মিত। সর্বমোট ছয়টি বইতে রয়েছে তাঁর গদ্য কবিতা। গদ্যছন্দে রচিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থটির নাম 'একদিন চিরদিন' (১৯৭১)।

নতুন পাতার কবিতায় এক ধরনের ধ্বনিস্পন্দ ও আবেগ এবং মন্থর সুর সঞ্চারিত হয়েছে, স্বাভাবিক বাক্‌স্পন্দ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'চিল্কায় সকাল' কবিতায় প্রেম আর প্রকৃতির আশ্চর্য এক যুগলবন্দী রচিত হয়েছে গদ্যছন্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের সামর্থ্যে :

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কতদূর থেকে উড়ে আসছে

জলের উপর দিয়ে। কী দুঃসাহস!। তুমি হেসেছিলে, আর তোমার আমার কী ভালো লেগেছিল
তোমায় সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো; দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।
(চিল্কায় সকাল, *নতুন পাতা*)

'চিল্কায় সকাল', 'ঘুমের গান' ও 'বিরহ'– এই তিনটি কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় : 'তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান- ছেঁড়া লিরিক, এবং লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়'। 'চিল্কায় সকাল', 'কলকাতা', 'শীতরাত্রির প্রার্থনা', 'রাত্রি', 'জন্ম', 'একদিন : চিরদিন' প্রভৃতি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বা ইন্দ্রিয়জ চেতনার চালচিত্র ও নান্দনিক উপলব্ধির বিচিত্র বর্ণবিচ্ছুরণ। আর অন্যান্য গদ্যকবিতায় রয়েছে তাঁর হৃদয় ও মননের আত্মভাষার স্বীকৃতি এবং এক অপূর্ণবোধের ছাপ।

বুদ্ধদেব বসুর কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক নিবিড়। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বন্ধনেই মুক্তি খুঁজেছেন, আপন বোধ, উপলব্ধি ও গাঢ় অনুভূতিকে বিস্তৃতভাবে খুলে মেলে ধরার জন্যেই তাঁর প্রয়োজন হয়েছে গদ্যছন্দের অভিজ্ঞান-পত্র।

সহায়ক গ্রন্থ / পত্রিকা

১. *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* ॥ ড. প্রবোধচন্দ্র সেন
২. উত্তরাধিকার (বুদ্ধদেব বসু, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ ॥ আবদুল কাদির)
৩. *ছন্দ* ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ
৪. *হিন্দীছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ* ॥ রামবহাল তেওয়ারী
৫. *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী
৬. *কবি বুদ্ধদেব বসু* ॥ উত্তম দাশ
৭. *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বিষয় ও প্রকরণ* ॥ মাহবুব সাদিক
৮. *বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য*, সম্পাদনায় : ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায়
৯. *আধুনিক বাংলা ছন্দ* ॥ নীলরতন সেন
১০. *বুদ্ধদেব বসুর সুনির্বাচিত কবিতা সম্পাদনায়* ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ
১১. *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পাদনায়* ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ
১২. *ছন্দের ঘরবাড়ি* ॥ মুজিবুল হক কবীর

কাব্যপ্রতিভূ বুদ্ধদেব বসু

মুশাররাফ করিম

'রবীন্দ্র বিরোধ-বরণে বিচিত্রতার' অন্যতম প্রধান রূপকার বুদ্ধদেব বসু। তিরিশের শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত সর্বাধিক বিচিত্রকর্মা। তাঁর শিল্পিত হাতের বিদ্যুৎস্পর্শে সৃষ্ট মৌলিক রচনা, অনুবাদকর্ম এবং সম্পাদনা থেকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে চারিত্র্য গঠনের এক ভিন্নমাত্রা ও দিকনির্দেশনা। এমন অজস্রপ্রসূ শিল্পসম্ভার তাঁর সমকালীন শিল্পসাধকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। কাব্যচর্চা, কথাশিল্প গঠন, নাটক নির্মাণ এবং জ্ঞানগর্ভ গদ্যের বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরে বুদ্ধদেবের পরিশ্রমসাধ্য, অবাধ-অবিরাম বিচরণ 'কল্লোল যুগের কাল্লোচ্ছ্বাস'কে করেছে ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষত কবিতাকে তিনি উৎকর্ষের চরম শিখরে স্থাপন করতে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আলোচনার আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমির দিকে দৃকপাত করা অনিবার্য। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও বিকাশ এক যুগান্তকারী ঘটনা। একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা তথা বাঙালি জাতির কৃষ্টি-শিল্প-সংস্কৃতি উৎকর্ষের স্বর্ণশিখরে স্থাপিত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় নতুন কাল– 'রবীন্দ্র যুগ'। সাহিত্য সাধনার সূতিকাগার থেকে তিরোধান পর্যন্ত রবীন্দ্রযুগ তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভের দুর্লভ গৌরব অর্জনের পর সঙ্গত কারণেই বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভূখণ্ডে রবীন্দ্রপ্রভাব আরো প্রবল হয়ে উঠে। রবীন্দ্র যুগের দ্বিতীয় পর্ব অবধি সেই প্রভাব নির্বিরোধ অটুট থাকে এবং বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রবীন্দ্রনাথই গ্রাহ্য হতেন মধ্যমণি হিসেবে। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং একে ঘিরে সাহিত্যাঙ্গনে এক নতুন কালের প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

বস্তুত এ নতুন কালের দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্র বর্জন প্রবণতা তীব্র ও বেগবান হয় তৃতীয় পর্যায়ে এসে। আর এই প্রবণতার উৎসভূমিই হলো 'কল্লোল'-এর মেলবন্ধন। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভাবতুম রবীন্দ্রনাথেই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তারপর আর পথ নেই। কিন্তু 'কল্লোল' এলে সে ভাব আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল।" তিনি আরো আভাস দিয়েছেন যে, রবীন্দ্রমুগ্ধ সবুজপত্রের মোহিতলাল মজুমদারও ১৩২৮ বঙ্গাব্দ থেকে 'রবীন্দ্রবিদ্রোহী' হয়ে গিয়েছিলেন। কল্লোলের প্রবাহে তরুণ প্রজন্মের শিল্প সাধকগণ রবীন্দ্র উত্তরণ বা রবীন্দ্রউত্তীর্ণ আধুনিকতার উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, কল্লোল প্রবাহের শ্রেষ্ঠ তিন তরুণ প্রতিভূ হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু।

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রণোদনা প্রধানত সাহিত্য পত্র-পত্রিকাসমূহ ঘিরেই ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়। কল্লোল ব্যতিরেকে প্রগতি, কালি কলম, শনিবারের চিঠি, ধূপছায়া, উত্তরা কবিতা, পরিচয়ও পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এসব সগোত্র-পত্র-পত্রিকার যুগপৎ প্রয়াসকেই আমরা 'কল্লোল চেতনা' বলে অভিহিত করতে পারি। রবীন্দ্র বিরোধ-বরণের কবিতাকেই 'তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা' বলে অভিহিত করা হয়। আর তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে যাঁরা অনাবিল মেধা-মনন, অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা হলেন, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে। এঁদের কণ্ঠেই উচ্চকিত হয় রবীন্দ্র বর্জনের সুতীব্র কোরাস।

বুদ্ধদেবের অজস্রপ্রসূ কর্মযজ্ঞ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার মাইলস্টোন। কৈশোরকাল থেকেই সাহিত্যচর্চার মতো অসম্ভবের সাধনার অভিযাত্রা সূচিত হলেও ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তা পরিপক্ব হতে শুরু করে।

তৎকালীন পূর্ব বাংলার ঢাকায় অবস্থানকালে ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'প্রগতি' এবং পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে 'কবিতা' পত্রিকা বিরামহীন পঁচিশ বছর (১৩৪২-১৩৬৭) সম্পাদনা করে কবিতা চর্চার ধারা ও রূপরেখার আশ্চর্য ধরনের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। বুদ্ধদেবের এই ভূমিকার ফসল তাঁর সমকালীন এক প্রজন্মের কবিদের গোলায়ও উঠেছে। আধুনিক কবিতার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু এতটাই সিরিয়াস ছিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি তিল পরিমাণ ছাড় দেননি। কাজেই কবিতা রচনাকালে তাঁর পঞ্চইন্দ্রিয় সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সজাগ রাখতেন। সদা-সর্বদা পরিশীলন অব্যাহত থাকত মনস্কতার গহীন গভীরে। তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি বুদ্ধদেবের কবিতার গঠনশৈলী, প্রকরণ ও বাচনে। ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'অন্তঃস্বভাবেও তিনি ছিলেন একান্তভাবে কবি-ই-স্বগতচারী'।

বুদ্ধদেব বসুর সাকুল্য রচনার মলাটবন্দী অবয়বের সংখ্যা দেড়শতাধিক। তন্মধ্যে মৌলিক কাব্যগ্রন্থ হলো সতেরোটি। কাব্যানুবাদেও বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত। তাঁর অনূদিত শার্ল বোদলেয়ার, জার্মান কবি রাইনার মারিয়া রিল্কে, হেল্ডার্লিন-এর কবিতাও গ্রন্থিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের মৌলিক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে *মর্ম্মবাণী* (১৯২৫), *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০), *একটি কথা* (১৯৩২), *পৃথিবীর পথে* (১৯৩৩), *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭), *দময়ন্তী* *২২ শে শ্রাবণ* (১৯৪২), *প্রৌপদীর শাড়ি* (১৯৪৮), *যে-আঁধার আলোর অধিক* (১৯৫৮), *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *মরচেপড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬), *একদিন চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১), *স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১) নান্দনিক সৃজনকর্মের দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধদেব বুসর কাব্যচর্চার সূত্রপাত বয়ঃসন্ধিকালে অর্থাৎ কৈশোরে। কৈশোরের কোমলমতি প্রাণের সস্তা আবেগের ফল্গুধারায় রচিত পঙ্‌ক্তিমালার সমাহারের তিনি নামকরণ করেন 'মর্ম্মবাণী'। মর্ম্মবাণী প্রকাশে আবেগের লাগাম বুদ্ধদেব সুসংহত বা সংযত রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম কাব্য পুস্তিকা হিসেবে *মর্ম্মবাণী* ছাপাখানার মুখ দেখে এবং মলাটবন্দী হয়ে প্রকাশিত হয়। মর্ম্মবাণীর উল্লেখযোগ্য কবিতা নামধেয় পদ্যসমূহের মধ্যে 'জীবন দেবতা', 'শঙ্খ' 'যাত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, *মর্ম্মবাণী*র কাব্যগুচ্ছ রবীন্দ্রপ্রভাবে সিক্ত। কোন কোন কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামকে অনুকরণ অনুসরণ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বুদ্ধদেব

বসুর নিজস্ব স্টাইলের প্রথম কাব্যকৃতি *বন্দীর বন্দনা*। *বন্দীর বন্দনা* প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। *বন্দীর বন্দনা* সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'মনে হলো এ যেনো একটি দ্বীপ...দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত।' কল্লোলের কালোচ্ছ্বাসে এক দুর্নিবার গতিতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও বিকাশ। বুদ্ধদেবের কাব্যকীর্তিতে আধুনিক কবিতা ধর্মের প্রবণতা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, গঠনশৈলী এবং প্রকাশভঙ্গি বাংলা কবিতার দেহাবয়বে আধুনিকতার লাবণ্যের স্পর্শ আবরিত। তাঁর কবিতায় চেতনার স্ব-বিরোধিতা নাগরিক চেতনারই ফল। প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধদেবের শিল্পীমনস্কতা এক 'দেশহীন' 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' ছিল। যে 'নিরুদ্দেশ গন্তব্যে' দেশের বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী বা জনসমাজ ছিল হয় অনুপস্থিত নয়তো অতি প্রচ্ছন্ন বা গৌণ। তবু এ কথা সম্ভবত সর্বৈব সত্য নয় যে বুদ্ধদেবের সৃষ্টি একেবারেই অচ্ছিন্ন নাগরিক চৈতন্যের ফসল। কারণ তাঁর কৈশোরের একাংশ অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব বাংলার নোয়াখালীর বর্ধিষ্ণু গঞ্জ-গ্রামে। যৌবনের কিয়দংশ কেটেছে জনাকীর্ণ ঢাকা শহরে। সঙ্গত কারণেই তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিসত্তা ও অস্তিত্ব চেতনায় আটপৌরে মফস্বলেরও ছায়া পড়েছিল। তবু একথা বলা বোধকরি অসঙ্গত নয় যে, যে অর্থে প্রেমেন্দ্র মিত্র নাগরিক কোলাহলের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মাটির সোঁদা গন্ধ পেয়েছিলেন এবং সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে অপ্রতুল হলেও সৃষ্টি সামগ্রীতে পূর্ণ করেছিলেন শিল্পের ঘড়া। আর 'জীবনানন্দ তো আত্মমগ্ন ছিলেন সম্পূর্ণ।' রূপসী বাংলার অতীন্দ্রিয় চেতনা মাটি স্পর্শে প্রতিনিয়তই তাঁকে প্ররোচিত করেছে। উল্লিখিত কবিদ্বয়ের মতো বুদ্ধদেব এতটা মৃত্তিকাসংলগ্ন হতে না পারলেও মাটির আহ্বান একেবারেই বিস্মৃত হতে পারেননি। মৃত্তিকা তাঁকে সামান্য হলেও উদ্বেলিত করেছে। আর এর মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব তাঁর চেতনায় সন্ধান পান এক ভিন্ন স্বদেশের। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্য : 'আমি ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের প্রসাদবঞ্চিত।' তিনি যথার্থই বলেছেন। কারণ তাঁর মানসচৈতন্যে স্থায়ী ডেড়া গেড়ে বসেছিল প্রতীচ্য সাহিত্যালোক। শার্ল বোদলেয়ার, রাইনার মারিয়া রিল্কে, ডি এইচ লরেন্স, হেল্ডারলিন, হাক্কালি এমনকি মরগ্যান, সিগমুন্ড ফ্রয়েড আর এলিসের ভাবনা ও চেতনা জগত বিচরণ করে কায়োমনে তাঁদের বিশ্বাস ভূমির স্থায়ী নাগরিকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণেই বুদ্ধদেবের সৃষ্টি সম্ভারে য়্যুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব প্রগাঢ়। বুদ্ধদেব আরো বলেছেন, 'আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী।' তাঁর এসব উচ্চারণের প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় তাঁর রচনাসমগ্রে, যেখানে রোমান্টিকতা হয়ে উঠেছে প্রবল। রোমান্টিক যন্ত্রণাবিদ্ধতাই বুদ্ধদেব বসুর আত্মগত দর্শন। সমকালীন য়্যুরোপীয় কবিতা চিন্তা ছিল 'কবিতা অনুপ্রেরণার ফসল নয়, অধ্যবসায় সাধ্য।' এই চিন্তা-চেতনায় বাঙালি কবিদেরও বিশ্বাস জমাট বাঁধে। সংক্রমিত হয় বুদ্ধদেবেও। ফলে পদ্য বা গদ্য ছন্দে কবিতা নির্মাণের আগ্রহ আধুনিকমনস্ক নান্দনিক বাঙালি কবিদেরও স্বভাবসিদ্ধ হয়েছিল। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'বুদ্ধদেবের সচেতনতা এ বিষয়ে অনেকটা অ্যাকাডেমিক অনুপুঙ্খতার প্রতিও ঝুঁকেছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আধুনিক কবিতারূপ গঠনে কৃত্য এবং অকৃত্যের নির্ণয়ে।' ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'রূপসচেতনা, তথা কবিতার ভাষা নিয়ে মুখে চলতি ভাষার কাছাকাছি চলে আমার আসার আগ্রহ বাংলা আধুনিক কবিতাতেও সাধারণ প্রবণতার আকার ধরেছিল। কিন্তু ঐভাবে বিশিষ্ট করে প্রতি উপাদানকে তলিয়ে দেখার ঔৎসুক্য ছিল বুদ্ধদেবের নিজস্ব। নিজের প্রয়োজনে হলেও কবিতা চিন্তার অনুরূপ অনুশীলিত ব্যাখ্যান কেবল প্রকাশের প্রকরণেই নয় 'আধুনিক' বাংলা কবিতার একটি সাধারণীকৃত

রূপচরিত্র নির্মাণেরও সহায়ক হয়েছিল নানা দিক থেকে। এই অর্থেই বুদ্ধদেব কেবল আপন কাব্যসৃষ্টিতেই স্বতন্ত্র নন, 'আধুনিক' কবিতা এবং কবিগোষ্ঠীর মেলবন্ধনেরও দিশারি।'

বন্দীর বন্দনা বুদ্ধদেবের প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য একটি কাব্য পুঁথি। আলোচ্য গ্রন্থটিতে গ্রন্থিত কবিতাসমূহ পাঠ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এতে কবিভাবনা তখনো পরিপক্ক হয়নি। কাব্য ভাষা ও কাব্য ভাবনার পূর্বে প্রচলিত রীতির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ড. সুকুমার সেন তো *বন্দীর বন্দনা* কবিতাখানি ও গ্রন্থ নামকরণটি নজরুলের বন্দীর বন্দনা'র অনুকরণ বলে অনুমান করেছেন। তদ্ব্যতীত কবিতাটিতে রবীন্দ্রভাবনার সাযুজ্যও পরিলক্ষিত হয়। এতে ডিএইচ লরেন্স কিংবা হাক্সলির যৌন আগ্রহের ছায়াপাতও ঘটেছে। যেমন–

তুমি মোরে দিয়াছ কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি সম
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।
('বন্দীর বন্দনা' : *বন্দীর বন্দনা*) অথবা
আমি যে রচিব কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলনা স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।
('মানুষ' : *বন্দীর বন্দনা*)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি পাঠ করলে রবিঠাকুরের *বলাকা* কাব্য মানসপটে ভেসে উঠে–

আমারে দিয়েছ স্বর
তার বেশি করি আমি দান,
আমি গাই গান।

পার্থক্য শুধু বুদ্ধদেবের প্রতিবাদী চেতনার উচ্চারণে। এ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য : 'তাহলেও এ কাব্যের কবিতায় রবীন্দ্র নৈকট্যের মুদ্রণই বরং রবীন্দ্র অতিক্রান্তির 'উদ্দীপ্ত উল্লাসে' ঘননিবিড়।' বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছ স্বতন্ত্র কাব্যযাত্রার সূচনা হয় *কঙ্কাবতী* থেকে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এ গ্রন্থের মাধ্যমেই কবির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ইতঃপূর্বে যথাক্রমে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে *একটি কথা* ও ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *পৃথিবীর পথে* কাব্য সংকলনের কবিতাবলীতে বুদ্ধদেব বসুর স্বতন্ত্র কাব্যসত্তার আভাস ইঙ্গিত পরিস্ফুট হতে শুরু করেছিল। বুদ্ধদেবের *কঙ্কাবতী* সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ এরকম বলেছেন, 'বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী প্রেমের কাব্য। এসব কবিতা পড়তে বসে এগুলো বিদ্রোহের কবিতা নয়, এসবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের থেকে সৌন্দর্য ঝরে পড়ে এসব কবিতায় কঙ্কাল মুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন– এসব জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর মনে হয়।' আসলে বুদ্ধদেব অন্তর্বদ্ধ সৃষ্টির ভাবনায় সর্বদাই থাকতেন বিভোর। কাব্য কল্পনায় 'আত্মপরিব্রাজী' যে কিনা নিজের বিশ্বাসের চৌহদ্দীর চতুর্দিকে বিরামহীন পরিক্রমণশীল কবিপুরুষ। তাঁর কবিসত্তা বস্তুত প্রেমের সরোবরে নিরন্তর অবগাহনরত অবস্থায় বিরাজ করতো। তাঁর প্রেমচেতনা শারীরিক 'ইন্দ্রিয়মন্থন বেগে স্পন্দিত'। *কঙ্কাবতী* কাব্যে কবির মানসচৈতন্য য়্যুরোপীয় কাব্যভুবনে বিচরণের ছায়াপাত প্রবল। অবশ্য তা যে অন্ধ অনুকরণ সে কথা বড় গলায় বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের প্রতীচ্য কাব্যপ্রেমের সরল বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' এ তাঁর 'অধিবাস্তব রহস্যমগ্নতা' এবং বুদ্ধদেব *কঙ্কাবতী*-তে তাঁর রোমান্টিকতাকে বিমূর্তি দান করার প্রয়াস চালিয়েছেন। 'অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের প্রসাদবঞ্চিত' বুদ্ধদেব *দময়ন্তী*-তে এসে

পুরাণের মিথের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ভারতের পুরাণ মিথকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস কাব্যের ছন্দায়িত দেহের গণ্ডি অতিক্রম করে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৯৬)' কাব্যনাট্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই *দময়ন্তীতেই* তিনি কবিতায় মুখের ভাষা প্রয়োগের যথাযথ রীতিনীতির উদ্ভাবন করেন।

ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'বুদ্ধদেবের কবি ভাবনায় প্রেম একান্তভাবেই কামসম্ভব। আর কামের মূলে রয়েছে প্রকৃতির তাড়না। জৈবতার পেষণে তবে কী প্রেমের নিলয়? এ দ্বিধায় এ জিজ্ঞাসায় কেঁপেছে তাঁর কবিচেতনা থেকে থেকে; কিন্তু প্রত্যয় ভঙ্গ হয়নি তাঁর।'

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়;
যে প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ জান্তব
মৃত্যু নেই তা।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুব সর্পিল সোপানে সোপানে
আছে নব জীবনের অঙ্গীকার,

দময়ন্তী সোপানে উপরিউক্ত কবিতাটি বুদ্ধদেবের পরিণত যৌবনে রচিত (১৯৩৯)। তাঁর যৌবন যখন অস্তাচলের পথে তখন কবি রচনা করেন 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর)' কবিতা। এতেও দময়ন্তী কবিতার অনুরূপ একই সুর ও বাণী অনুরণিত।

তবে কি, জন্তুর ধর্ম মেনে নিয়ে,
প্রকৃতির অন্ধটানে অজাত সন্তানে শুধু
ডেকেছি, কবিতা লিখে? যৌবনের বন্দনা আমার

সে কি শুধু জনন শক্তির পূজা?...' পরবর্তী কবিতাসমূহেও একই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যযজ্ঞে প্রকরণের নানা অলিগলিতে 'এই স্বাভাবিকতারই নিরন্তর উৎসার।'

সচেতন বাক প্রতিমা নির্মিতিতে বুদ্ধদেবের এক ধরনের মুন্সীয়ানা প্রতীয়মান হয়। বাক বলতে শুধু শব্দের ঝনাৎকারিত্ব নয় বরং সুঠাম বাক্যবিন্যাসেও তিনি পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছেন, এমনকি চিত্রকল্পের বিন্যাসেও বুদ্ধদেবের শব্দচেতনা অসামান্য দ্যোতনা সৃষ্টি করে। যদিও তিনি কবিতার প্রয়োজনে প্রচুর বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেছেন তথাপি পরিচিত, চেনা-জানা শব্দের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল অধিক। তবে শব্দ চয়নে বুদ্ধদেবের অবস্থান স্ট্যান্ট সৃষ্টির বিপক্ষে। একটি দৃষ্টান্ত :

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনে হাওয়ায় কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো করে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপরে আনে আকাশ, হিংসুক
হাত ছড়িয়ে দেয় হিম শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।
(শীত রাত্রির প্রার্থনা)

শব্দের অদ্ভুত প্রয়োগে বুদ্ধদেব শীতকালীন নৈশ পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন। বুদ্ধদেবের শব্দে এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি লীন হয়ে থাকে। একটি উদ্ধৃতি :

'...মনে হয়, নারীরে বেসেছি ভালো,
যেহেতু কবিতা
জেগেছে, জ্বলছে তার চোখ থেকে– সে নিজে বোঝেনি।'

বুদ্ধদেবের শব্দ-চেতনা তাঁকে এক পৃথক কাব্যভাষা নির্মাণে সহায়তা করেছে। কি কবিতা কি কথাশিল্পে শব্দ বুদ্ধদেবকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মন্ময়তায় পরিচালিত করেছে। আশিস সান্যাল বলেছেন, '...নতুন রীতির প্রবর্তনে, নতুন ভাষাশ্রয়ী বাকবিধি নির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।...নতুন রীতির সাহিত্যাদর্শের প্রবর্তনে, নতুন মন্ময় ভাষারীতির প্রবর্তনায় তাঁর অবদানের কথা একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

এজরা পাউন্ড তাঁর 'কবিতা ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন 'কবিতায় প্রয়োগকৃত ছন্দকে হতে হবে ধ্বনিময়, অর্থদ্যোতক শব্দের পরম্পরা, পর্ব গুনে গুনে লেখা নয়। ছন্দ তা-ই, যা কবিতাতে ঘনবদ্ধ আবেগ বা আবেগের ঘনবদ্ধ ছায়া হয়ে আসে। কোনও কবি যখন কোনও ছন্দ ব্যবহার করবেন তা অন্যের কাছে অনুধাবনযোগ্য হতে হবে।' বুদ্ধদেবের কবিতার ছন্দের সঙ্গে এজরা পাউন্ডের বক্তব্যের কোথায় যেন একটা সাযুজ্য পাই। বুদ্ধদেব ছন্দ-সচেতন কবি কিন্তু ছন্দ ভেঙেছেনও। তাঁর অনেক কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দে পর্ব বিভক্তি প্রায় অনুপস্থিত কিন্তু কবিতা হয়ে উঠেছে ধ্বনিময়। অবশ্য তাঁর মধ্যে আমরা ছন্দের বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি দেখতে পাই। তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে কাব্যের নতুন উদ্যান। বুদ্ধদেবের সিংহভাগ কবিতা মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ছন্দের দোলায় দোলায়িত। তবে বেশ কিছু কবিতা দলবৃত্ত বা কলাবৃত্ত মুক্তকেও রচনা করেছেন। এছাড়া বুদ্ধদেব গদ্য ছন্দকেও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত গদ্য কবিতা থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব বহুলাংশে অপসৃত হয়েছে। যেমন–

'কি একটু পরে তোমার মত এগিয়ে এলো আমার দিকে,
তোমার নরম, রক্ত-উষ্ণ হাত
এসে লুকোলো আমার হাতের মধ্যে
নিবিড় হয়ে এলো আমার হাতের মধ্যে
নরম উত্তপ্ত, উষ্ণ-আর্দ্র তোমার হাত;

এ প্রসঙ্গে উত্তম সেন বলেছেন, '...গদ্য পদ্যের দুটি আলাদা বিভাগকে অনেক যুদ্ধের পরে নিজ কবিতা সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন বুদ্ধদেব। বাংলা গদ্য-পদ্যের এ বিরোধভাজন বুদ্ধদেব বসুর কাব্যসাধনার অন্যতম মুখ্য কৃত্য।'

কবিতার উপাদান বা বিষয় বৈচিত্র্যে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রবলয়কে ভেঙে বের হয়ে এসেছেন। তাঁর রচনায় গৎবাঁধা দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়-আশয় বড় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র প্রভাব পাণ্ডুর চাঁদের মতো ম্লান হয়ে পড়েছে। সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি, কিন্তু স্বতন্ত্র কবিসত্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছেন। তাই তো বাংলা কবিতার বিশাল ভূখণ্ডে বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টি সম্ভার যুগপৎ নন্দিত– নিন্দিত হয়েও তাঁকে করেছে 'বৈনাশিক আধুনিকতার অনাবিল সাহিত্য প্রতিভূ।'

তথ্যসূত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৪র্থ পর্যায়) : ভূদেব চৌধুরী/*কল্লোল যুগ* : অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

নীলাঞ্জনের খাতা : অস্তিত্ববাদের জানালা থেকে একটি দৃষ্টিপাত

মুহম্মদ মুহসিন

(উত্তরাধুনিক ধারণার দ্বারা আলোকিত ও প্রাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারাটি কলাকৌশল এবং তত্ত্ব-তাত্ত্বিকতার সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে। এই পুষ্টি যাঁরা বিধান করেছেন তাঁরা ছিলেন একাধারে ইউরোপীয় সাহিত্যে-দর্শনে সুপণ্ডিত এবং বাঙালি মননে সমৃদ্ধ অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এমন এক পণ্ডিত ও সৃষ্টি প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গৌরবকাল *কল্লোল* যুগের দিকপাল কবি ও ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তিকে বিবেচনায় রেখে এমন ভাবনা খুব সহজ ও স্বাভাবিক যে তাঁর হাত ধরে বাংলা উপন্যাসে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয় উপন্যাসের অনেক কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক অনুধ্যান। এই ভাবনার আলোকে তাঁর অন্যতম সফল উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা*'র প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি অস্তিত্ববাদী সংকটের চিত্র খুব অনায়াসে চোখে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই বিশ্বাস কতটা প্রতিষ্ঠাযোগ্য তা খতিয়ে দেখা।)

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা* নীলাঞ্জন দে নামক এক ব্যক্তির একটি ব্যক্তি সম্পর্ক বিষয়ক সঙ্কটের কাহিনী। সঙ্কটটি নীলাঞ্জনের। তবে এ সঙ্কটের উদ্ভব ও বিস্তারের উৎসভূমে দাঁড়িয়ে আছে দুটি নারী চরিত্র। দুয়ের মধ্যে মুখ্য জন তাপসী দত্ত, ডাকনাম তপু। গৌণ জন ঊর্মিলা মজুমদার, ডাকনাম মিলি। হয়তো তিনি খানিকটা গৌণ বলেই শুধু ডাকনাম মিলি দ্বারাই উপন্যাসজুড়ে পরিচিত। অন্যান্য চরিত্র একদমই হাতে গোণা। মূল কাহিনী এই তিনজনের মধ্যেই আবর্তিত। নীলাঞ্জনের সাথে নির্ঝঞ্ঝাট এক পরিণয়মুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে মিলির সাথে। সে এমন এক সম্পর্ক যে নীলাঞ্জন উহাকে প্রেম বলে হয়তো কখনো ভাবেন নি যদিও সে সম্পর্কের মধুর প্রবাহকে তিনি পরিণয়ের গন্তব্যে পৌছে দিতে উন্মুখ। কিন্তু সেখানে সঙ্কট এসে দাঁড়ায় যখন তিনি অনুভব করেন যে তাপসী নামের মেয়েটির সাথে তাঁর সহমর্মিমতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার নাম প্রেম। শুধু প্রেম নয়, তাঁর সঙ্কট দাঁড়াতে পারতো অন্য অনেক কিছু ঘিরে।

তিনি অর্থাৎ নীলাঞ্জন দে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সিলেবাসে শিক্ষিত বিংশ শতকের গোড়ার দিকের একজন আধুনিক বাঙালি। পিতা পৃথ্বীশ দে মৃত। অথচ সে মৃত্যুও তাঁকে কোনো সঙ্কটের মুখে দাঁড় করায় নি। দূরদর্শী পিতামহ ঢাকায় টিকাটুলির অদূরেই চার বিঘে জমির বিশাল বাড়ির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন (বসু, রচনাসংগ্রহ-৯, নীলাঞ্জনের খাতা ২৭৬)[১] যা কাকাদের দেশে-বিদেশে থাকার কারণে এখন সংসারের

১। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপন্যাস *নীলাঞ্জনের খাতা* থেকে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, নবম খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই পৌষ ১৩৯৯*। পরবর্তী বন্ধনীবদ্ধ তথ্যসূত্রসমূহের (Parenthetical Reference) ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু *নী.খা.এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর)*।

একমাত্র সন্তান নীলাঞ্জন এবং তাঁর মায়ের জীবনকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও অন্তত মৌলিক চাহিদাগত নিঃসঙ্কটতা প্রদান করেছে। সুতরাং বাঙালি সমাজে বাবার মৃত্যুতে আশঙ্কিত সঙ্কটসমূহ নীলাঞ্জন দে'র জীবনে গভীর কোনো ছায়াপাত করে নি।

এছাড়া নীলাঞ্জন দে'র জীবনকালের যে পর্বটির চিত্ররূপ এই উপন্যাস, ইতিহাসে সে এক গভীর সঙ্কটের সময়। নীলাঞ্জন দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন ১৯৩৪-এর পূর্বে তবে এর নিকটবর্তী কোনো এক সময়ে।[২] বিশ্বের ইতিহাসে সে এক ঘোরতর সঙ্কটের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্পসাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তীব্র বীভৎসতায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইম্প্রেশনিজমের টেকনিক সময়ের যন্ত্রণাকে ধারণ করার আর শক্তি রাখছে না (Guenther 37)। যুদ্ধ শেষে শান্তিপ্রিয় মানুষেরা বীভৎসতা থেকে মুক্তি পেতে যে অধীর আগ্রহে দিনাতিপাত করছিলো তারই প্রকাশ স্বরূপ উইমার রিপাবলিকের ১৯১৯-৩৩ সময়কালের মধ্যে বিশেষ করে চিত্রশিল্প জগতে শিল্পসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ধারা এক্সপ্রেশনিজম অনেকটা নির্জীব ও নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিলো। এক্সপ্রেশনিজমের তীব্র রঙের কম্পোজিশনে প্রকাশিত ত্রাস ও ভীতির পরিমাণ গণমানুষের অনুভূতির ওপর অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছিলো। তখন সাধারণের অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাতেই যেন বিশের দশকেই জন্ম নিচ্ছিলো স্নিগ্ধ প্রশান্তির ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক ধারা (Guenther 43)। বিস্ময়কর যে, কাব্যপ্রেমী নীলাঞ্জন যিনি নিজের মুখে বলছেন সতেরো বছর বয়সে 'শরৎ চন্দ্রকে গিলে খেয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে ক্নুট হামসুন আর মাক্সিম গর্কিকে ধ'রে ফেলেছি, 'দি পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে' পড়া হয়ে গেছে' (নী. খা. ২৭৯), সেই নীলাঞ্জন দে'র মানস জগতে শিল্পজগতের বিশ্বব্যাপী এসব সঙ্কটেরও কোনো রেখাপাত আমরা উপন্যাসে লক্ষ করি না।

এই সময়ের ভারতবর্ষের চিত্র অধিকতর গভীর সঙ্কটের উদাহরণ। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৯ পাস হয়ে গেছে। অল্প ব্যবধানে পাস হয়ে গেছে কুখ্যাত রাউলাট আইন ১৯১৯ যার ফলশ্রুতিতে ঘটে গেছে অমৃতসরের জঘন্য তাণ্ডব। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ডাকে গণমানুষ এমন সাড়া দিতে শুরু করেছে যে 'জেলখানা হয়ে উঠেছে ভারতমাতার মুক্তিকামী জনতার তীর্থস্থান' (Mukherjee 417)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরকে পর্যন্ত অবাক করা ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র নীলাঞ্জন দে (নী. খা. ৩১৫) রেনেসাঁস থেকে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত যাঁর প্রত্যহ বিচরণ (নী. খা. ২৯১), সেই অসাধারণ নীলাঞ্জন অসাধারণ ও অস্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এই সকল সঙ্কট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তাঁর দীর্ঘ স্মৃতির খাতায় এসব নিয়ে একটি লাইনের দুশ্চিন্তাও নজরে পড়ে না।

১। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি এই যে নীলাঞ্জন দে নন্দিনীতে স্থাপিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ইন্টারভিউকালে দেখছেন তাপসী দত্তের বি. এ. পাস ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (নী. খা. ২৪২)। অপরদিকে নীলাঞ্জন দে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র এবং তাপসী দত্ত যখন বরিশাল ছেড়ে তাঁদের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন একদিন নীলাঞ্জন দে তাপসীকে বলেছিলেন "তুমি তো আই. এ. পাশ করেছো, ভরতি হ'য়ে যাও না কেন ইউনিভার্সিটিতে?" (নী. খা. ৩১৮)। এর সাথে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯২১ সালে। এই সব মিলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে নীলাঞ্জন দে'র বি. এ. পাশ তাপসী দত্তের ১৯৩৪ সালের বি. এ. পাশের পূর্বে এবং ১৯২১ সালের পরে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর নামপুরুষ কথকের জবানিতে এর কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি যে নীলাঞ্জন দে কেন এই সকল দৃশ্যমান সঙ্কটগুলোকে গণনা-ই করছেন না, অথচ এত ধীমান ও এনলাইটেন্‌ড ব্যক্তিটি স্থূল সিনেমা কাহিনীতে সচরাচর যাকে বলা হয় ত্রিভুজ প্রেম তেমন একটি প্রেমকাহিনীর মধ্যে তাঁর জীবনের প্রাথমিক সঙ্কটটি অনুভব করছেন এবং পরক্ষণেই সে সঙ্কট দাঁড়িয়েছে অন্য এক বড় সমগ্রকে ঘিরে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজ-সচেতনতার ঘাটতি বলেও অনুভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে নীলাঞ্জন দে'র কথকতায় তাঁর প্রেমপর্বের এবং তৎপরবর্তীতে জীবনের সমগ্রতায় অনুভূত সঙ্কটটিকে যে চিন্তন ও ঘটনাচিত্রের মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে খুব প্রকটভাবে অনুভূত হয় যে সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক এবং এমনকি প্রেমের মত ব্যক্তিক সঙ্কটের চেয়ে অনেক প্রকট এক দার্শনিক সঙ্কটের অভিব্যক্তি তাঁর সামগ্রিক জীবন। অস্তিত্ববাদী দর্শনে জীবনকে যেভাবে সীমাহীন মরুভূমির মত ধু-ধু সঙ্কটের এক বিস্তার আকারে চিত্রিত করা হয়, জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রভূত বৈভব ও প্রাচুর্য নিয়েও, নীলাঞ্জন দে'র জীবন তেমন এক সঙ্কটের জীবন্ত প্রতিরূপ। সামগ্রিক জীবনটিই যেখানে এমন এক সঙ্কটের প্রতিলিপি সেখানে সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক অপর সকল সঙ্কট ও বিপত্তি গৌণ হতে বাধ্য। কামু'র Meursaultও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ কিংবা আরব-ফরাসি সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত হয় না, Hamletও ডেনমার্কের জনগণ কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবিত হওয়ার অবকাশ পায় না। এতে কামু কিংবা শেক্সপিয়রের বিরুদ্ধে যেমন সামাজিক দায়হীনতার অভিযোগ নেই, অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়ণের চরিত্র হিসেবে নীলাঞ্জন দে'ও তেমনি লেখক বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে সামাজিক দায়হীনতার অভিযোগ প্রশমন করে। সাথে এটিও স্বাভাবিকভাবে লেখক বুদ্ধদেব বসুর জন্য একটি বড় কৃতিত্বের বিষয় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সচেতনভাবে সৃষ্ট একটি অস্তিত্ববাদী চরিত্রের প্রথম নির্মাণ হয়তো তাঁরই হাতে।

নীলাঞ্জন দে'কে অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়ণের একটি সফল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্ববাদ নামক দর্শনের ধারাটির ওপর সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি ভয়াবহ অদার্শনিক স্বভাব আছে। দর্শন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতার এক শাস্ত্র। সাম্প্রতিক কিছু দিন বাদ দিলে দর্শনের গোটা ইতিহাস হলো মোটের ওপর এক যুক্তিবাদিতার (Reason) ইতিহাস। অথচ অস্তিত্ববাদী দর্শনের শেকড় আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্তিকায় প্রোথিত যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতার স্থান নেই কিংবা থাকলেও খুব গৌণ। সাধারণভাবে দার্শনিকরা যেখানে মানুষের সংজ্ঞা দেন 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী '(Rationa animal) হিসেবে সেখানে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মানুষের সংজ্ঞা দেন 'আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী' (Animal with Reason, Will and Emotion) হিসেবে (Raymond 2)। এই সংজ্ঞায় লক্ষণীয় যে অস্তিত্ববাদীরা তাঁদের দার্শনিক প্রক্রিয়ায় বা অনুসন্ধিৎসায় বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদিতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন না, তবে তাঁরা আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বের সাথে যুক্তিবাদিতার পাশে স্থান দিচ্ছেন। অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন জীবনের যে অভিজ্ঞতাসমূহ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত নয় (Nonintellectual modes of experience) বরং হৃদয়বৃত্তির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও সমানভাবে দর্শনের ক্ষেত্রভুক্ত এবং দর্শনের দায়ভুক্ত। দর্শনের জটিল অন্ধিসন্ধিগুলোতে মস্তিষ্কের যেমন অধিকার, শরীর ও আত্মারও তেমন অধিকার (Unamuno 28)। মানস জগতের

এই বিশাল রাজ্যকে শুধু কবিতা আর উপন্যাসের জন্য বরাদ্দ দিয়ে দিতে রাজি নন অস্তিত্ববাদীরা। তবে অস্তিত্ববাদীদের এই দাবিতে কবি-সাহিত্যিকরা দখলিস্বত্ব আপনাআপনি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন তা-ও তো স্বাভাবিক নয়। তাই অস্তিত্ববাদের জমিনে দুই পক্ষের দাবির সমবিন্দুতে ঘটেছে দার্শনিক-সাহিত্যিকের এক মহামিলন। অস্তিত্ববাদের দার্শনিকদের তালিকায় তাই প্যাসকাল, কিয়ের্কেগার্দ, উনামুনো, হাইডেগার, নিটশে প্রমুখ দার্শনিকের সাথেই রয়েছে সাহিত্য জগতের বিশাল বিশাল মহীরুহ। কামু, সার্ত্র, দস্তয়েভস্কি, দে বেভোয়ার প্রমুখের মত বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ববৃন্দ অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা দার্শনিকরূপেও সুবিদিত। বুদ্ধদেব বসুর কবি বা সাহিত্যিক চরিত্র নীলাঞ্জন দে মনোরাজ্যে বহন করেন এঁদেরই অনেকের অস্তিত্ববাদ বিষয়ক ভাবনা ও সঙ্কট যা নীলাঞ্জন দে'র যাপিত জীবন পরিক্রমায় এবং বিশেষ করে জীবনকে খতিয়ে দেখার উপসংহার পর্বে পৌনঃপুনিকভাবে প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়।

অস্তিত্ববাদী দর্শন কী এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ জীবনের কী কী সঙ্কটের কথা বলেন- এ প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সংবলিত উত্তর নেই। সার্ত্র অনেকটা খেদোক্তি আকারে একবার বলেছিলেন অস্তিত্ববাদ আজকাল এত হরেকরকম আপাত অসংলগ্ন বিষয়াদিকে বোঝায় যে এর দ্বারা (অস্তিত্ববাদ দ্বারা) মূলত এখন আর কিছুই বোঝায় না (Sartre 15)। একই অস্তিত্ববাদ কখনো ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (কিয়ের্কেগার্দ), আবার কখনো ঈশ্বরের অনস্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত (সার্ত্র কিংবা নিটশে)। হ্যাঁ ও না এর এমন অসমন্বিত যোগফল দর্শনের অন্য কোনো অঞ্চলে আর দেখা যায় না। এটি অস্বাভাবিক কোনো চিত্রও নয়, কেননা অস্তিত্ববাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এটি একটি মৌলিক ধারণা যে জীবনের সীমাহীন অভিজ্ঞতাগুলোকে কোনো সুষম পদ্ধতিগত বিন্যাসে উপস্থাপন সম্ভব নয় (cannot be neatly summarised into a system)। তারপরও বিশেষ করে দর্শনের অধ্যাপকগণ অস্তিত্ববাদের এত বিবিধ ও বিপরীতমুখী ভাবনাগুলোকে এক সুতায় গাঁথার অর্থাৎ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। Existentialism and the Philosophical Tradition গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক Diane Darsoum Raymond তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজন। তিনি এই সমন্বয়ে অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন কয়েকটি মৌলিক বিষয় : Meaning, Anxiety or Suffering, Alienation, Freedom, Intersubjectivity and Authenticity (Raymond xi)। রেমন্ডের সমন্বয়ে ও আলোচনায় এই বিষয়গুলো তাদের ব্যক্ত্যর্থে ভিন্ন ভিন্ন হলেও অস্তিত্ববাদের কাঠামোতে তারা পরস্পর ও আন্তঃসংযুক্ত একটি সমগ্র। এ বিষয়গুলোর অধিকাংশই নীলাঞ্জন দে'র জীবন ও জীবনবোধের সঙ্কটকে ঘিরে আবর্তিত।

নীলাঞ্জনের খাতা উপন্যাসের মূলকাহিনী যখন নীলাঞ্জন দে নিজে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন তখন তাঁর যাপিত ও চলমান জীবন নিয়ে এক যন্ত্রণার পরিক্রমা চলছে। উক্ত যন্ত্রণা কোনো এক রৈখিক শারীরিক ব্যথাবোধ নয়। এর মধ্যে একীভূত আছে বহুমুখী ভাবনা ও বিষয়। জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে অর্জিত নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের দায় গ্রহণের যন্ত্রণা ইত্যাকার নানান প্রসঙ্গ। এসবই অস্তিত্ববাদের সাথে তাঁর যন্ত্রণার সাদৃশ্য উপস্থাপন করে।

অস্তিত্ববাদের এই যন্ত্রণা সম্পর্কে বলতে গেলে J. A. Cuddon-কে স্মরণ করা খুব প্রাসঙ্গিক। অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যায় J. A. Cuddon তাঁর Penguin Dictionary of Literary Terms এ বেশ সহজ করে বলেছেন অস্তিত্ববাদ হচ্ছে Supine and passive existence থেকে Active existence এ পৌঁছার Consciousness অর্জন করতে গিয়ে এবং Meaningful existence-এর চেষ্টা করতে গিয়ে অপরিহার্য ফলস্বরূপ অর্জিত Angst or Sufferings। এ কথা অবশ্য মৌলিকভাবে J. A. Cuddon-এর নয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের অধিকাংশের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি রয়েছে এ ব্যাখ্যায়। দস্তয়েভস্কি বলেছেন, যন্ত্রণাই সচেতনতার উৎস। কামু বলেছেন, মানুষ হিসেবে জীবনের প্রথম যন্ত্রণাটাই অনুভূত হয় তখন যখন জীবনের সচেতন অনুভব থেকে প্রথম প্রশ্ন জাগে 'কেন এই বেঁচে থাকা'।

> Rising, streetcar, four hours in the office or the factory, meal, streetcar, four hours of work, meal, sleep, and Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday or according to the same rhythm – this path is followed most of the time. But one day the 'why' arises and everything (of existential pain) begins in that weariness tinged with amazement. (Camus 10)

এই কেন'র প্রসঙ্গে Raymond বলেন, অস্তিত্ববাদ যেহেতু ধরে নেয় যে essence-এর পূর্বেই existence (Existence precedes essence), সেহেতু অস্তিত্বের বাহকেরই দায় হয়ে দাঁড়ায় সেই অস্তিত্বের অর্থ অন্বেষণ। কিন্তু অস্তিত্বের কোনো স্থির নিশ্চিত অর্থের সন্ধান সম্ভব হয় না এবং তখন মানুষের জন্য আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র অনুভূতি যা শুধু মানুষই অনুভব করতে পরে এবং যার নাম নৈরাশ্য তথা নৈরাশ্যের যন্ত্রণা (Raymond 9) ।

উল্লেখ্য, অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক Raymond : Existential theist, Existential nihilist and Existential revolter (39)। এঁরা সকলেই নিজ অস্তিত্বকে সকল শর্তের বাইরে রেখে স্বাধীন ও সচেতনভাবে Active existence-কে অনুভব করেন। এই অনুভব অন্তে Existential theist'গণ আত্মার মুক্তির মাঝে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পান ফলে Existential Sufferings তাঁদেরকে আক্রমণ করে না এবং অস্তিত্ববাদের এই আবশ্যিক অংশটির সাথে তাঁরা সম্পর্করহিত বলে অনেকে তাঁদেরকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে স্বীকারই করেন না। Existential nihilist'গণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা জীবনের কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য কিংবা অর্থ খুঁজে পান না। সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করাই তাঁদের পক্ষে নীতিগতভাবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের একমাত্র সুখ তাঁরা জীবনে কোনো সুখের মোহে বা আশায় ভোগেন না। Existential revolterদের অবস্থান মধ্যবর্তী। এঁরা জীবনের এবং অস্তিত্বের অর্থ সন্ধান করেন। উপলব্ধি করেন যে অস্তিত্বের স্থির সুনিশ্চিত অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তবে নিজ অস্তিত্বের শক্তি ও সামর্থ্যের বিশ্বাসে সিসিফাসের মত একটি বিদ্রোহী শক্তি এঁদের মাঝে জেগে ওঠে। অনুমিত হচ্ছে সিসিফাস জানেন যে তাঁর পাথর পাহাড়ের চূড়ায় কোনোদিন পৌঁছবে না, তারপরও অমিত শক্তিতে সেই চেষ্টাটাই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছেন। জীবনের সুনিশ্চিত অর্থহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনার এইটুকু অর্জনই Existential revolterদের কাছে অস্তিত্বের অর্থ এবং জীবনের সুখ ও আনন্দ।

নীলাঞ্জন দে'র অস্তিত্ব ও জীবন নিয়ে এই সচেতন অনুভব তাঁর স্মৃতিকথা লেখাকালের। কামু কথিত 'কেন' প্রশ্নটি তখন তাঁর সবে জেগেছে এবং তিনি তাঁর যাপিত ও চলমান জীবনের অর্থের অনুসন্ধান কেবল শুরু করেছেন। তিনি অনুভব

করতে শুরু করেছেন "কত দেরীতে জীবনকে মূল্য দিতে শিখি আমরা, যৌবনের স্পর্ধায় কত অবহেলা করি জগৎকে, কত বছর কেটে যায় শুধু এই কথাটি বুঝতে যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের চেয়ে কিছুই বড় নয়- কিছু না, কিছুই না!" (নী. খা. ২৬৪)। যে সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর এই অনুভব সে সময়কে অবশ্য তিনি অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত ফিকশনসমূহ যাতে অস্তিত্ববাদের বক্তব্য ধৃত আছে সেসব উপন্যাসে অবশ্য অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে জীবন মূল্যায়নের এমন উদাহরণ খুব গোচরীভূত হয় না। বুদ্ধদেব হয়তো এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম স্থাপন করেছেন। অবশ্য সেই ব্যতিক্রম আমাদের আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমরা দেখবো জীবনের স্বাধীন ও শর্তহীন অস্তিত্বকে এভাবে সবার উপরে স্থান দেয়ার পরে নীলাঞ্জন দে যখন এর চূড়ান্ত অর্থ খুঁজতে গেলেন তখন সুনিশ্চিত অর্থহীনতার উপলব্ধিতে তাঁর নৈরাশ্য ও যন্ত্রণার চিত্রটি কী দাঁড়ালো।

এ ক্ষেত্রে নীলাঞ্জন দে'র প্রতীতিতে Raymond কথিত তিন শ্রেণীর অস্তিত্ববাদীর চারিত্র্যই লক্ষ করা যায়। নীলাঞ্জন দে অনুভব করেন জীবনের বর্তমানটুকু ঘিরে সকল যন্ত্রণারা আবর্তিত হয়। জীবনের বাইরে জড়ের, প্রগতির, চেতনার কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। উপলব্ধি করেন "প্রগতি বলে কিছু নেই, সব ফিরে ফিরে আসে, অতীতকে আমরা কিছুতেই ছাড়াতে পারি না" (নী. খা. ২৪৫)। এ উপলব্ধিতে নীলাঞ্জন দে Existential nihilist-এর চারিত্র্য বহন করেন। এমনই অনুভব লক্ষিত হয় যখন যাযাবরের মত দেশ থেকে দেশে ফেরা নোঙরহীন জীবন নিয়ে অনুশোচনা করে বলেন "কোনো নতুন শহরে, নতুন দেশে পৌঁছাচ্ছি, এই বোধটাই আশ্চর্য, পৌঁছলে পর নতুন কিছু নেই। পথ আর ভ্রমণের গতি: সেটাই সব। আসল কথা, কোথাও কোনো শেকড় নেই আমার; ভেসে ভেসেই জীবন কেটে যাবে" (নী. খা. ২৪৬)। অর্থের অন্বেষণে ক্রমাগত এই অর্থহীনতার সন্ধান দিশেহারা করে তোলে তাঁকে। সচেতন অস্তিত্বের বাইরের স্বপ্নের মাঝের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-অনুভূতিকেও জীবনের অর্থ হিসেবে আঁকড়ে ধরতে তখন আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রশ্ন জাগে—

> কেন স্বপ্নেরা সাধারণত এত ভীতু, কেন ছেঁড়াখোঁড়া ভিখিরির মতো বা আধপেটা বেশ্যাদের মতো অন্ধকার গলির মোড়ে মোড়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে- পুলিশের বুটের শব্দে কিলবিল ক'রে ঢুকে পড়ে যে যার বিবরে, এদিকে রাজপথে নিশেন উড়িয়ে চলে মাসের শেষে মাইনে, পটল কিনতে গিয়ে দরদস্তুর ক'রে তিন পয়সা বাঁচানো (জীবন)? কেন তারা সাহস ক'রে চুলের ঝুটি ধরে টেনে নেয় না আমাদের, যেমন আমাকে নিয়েছিলো সেই রাত্রে, প্যাসিফিক-পেরনো এরোপ্লেনের তন্দ্রার মধ্যে? কী আশ্চর্যই না হতো যদি ঐরকম ছবি দিয়ে-দিয়ে সচেতনভাবেও ভাবতে পারতুম আমরা, ভাবতে পারতুম রক্ত দিয়ে, বিনা চেষ্টায়, আমাদের অস্থিমজ্জার পরতে-পরতে। (নী. খা. ২৫৪)

এই চিত্রে দৃশ্যমান Existential nihilist নীলাঞ্জন দে'র পক্ষে অস্থিমজ্জার পরতে-পরতে জীবনের এমন অর্থের এবং এমন আনন্দের অনুভব সচেতন জীবনের অবস্থানে থেকে সম্ভব হয় না। তাঁর পক্ষে বরং সম্ভব হয় অধিকতর বেদনার অনুভব- 'খারাপ যখন লাগছেই তখন আরো খরাপ লাগুক, কত খারাপ লাগতে পারে, দেখি!' (নী. খা. ৩১৭)।

নীলাঞ্জন দে'র জীবনে সক্রিয় অস্তিত্ববোধের এই স্মৃতিকথা লেখাকালীন পর্বের পূর্বে আরেকটি পর্ব গত হয়েছে যখন Existential theistদের সাথে তাঁর জীবনবোধের সাদৃশ্য ছিল। সে পর্বে দেখা যায় তিনি অস্তিত্বের অর্থ খুঁজছেন একটি পরম শর্তহীন

অতীন্দ্রিয়তায় (Absolute Unconditional Transcendence)। তাঁর এই অন্বেষণের সাথে সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (Soren Kierkegard), পল টিলিশ (Paul Tillich) কিংবা কার্ল ইয়াসপার্সের (Karl Jaspers) দার্শনিক ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। অস্তিত্বের যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তি এবং অস্তিত্বের বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতে এর সার্থকতার আকররূপে তিনি কখনো দাঁড় করাতে প্রয়াস পেয়েছেন মৃত্যুকে আবার কখনো বা ভালোবাসাকে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শরীরী অস্তিত্বের বাইরে অবস্থিত এক সার্থকতায় পৌঁছার আকাঙ্ক্ষায় তিনি যথেষ্ট আবেগের সাথে উচ্চারণ করছেন–

> মৃত্যুর যদি এটুকু দাবি না থাকে জীবনের ওপর যে একবার তার সান্নিধ্যে এলে, অন্তত কিছুদিনের জন্য, চেতনার কোনো গভীরতর আহ্বান আমরা শুনতে পাবো, কোনো পাতালের কলরোল, কোনো স্তবগানের প্রতিধ্বনি- মৃত্যুর যদি এটুকুও দাবি না থাকে আমাদের ওপর তাহলে তো মানুষের আর পশুর জীবনে তফাৎ থাকে না। (নী. খা. ২৬৪)

জীবনের বিরল আনন্দের এক মুহূর্তে মৃত্যুকে তাই তাঁর খুব কাছে মনে হয়। ‘এখন মরে গেলেই তো হয়,’ কথাটা আমার মগজের মধ্যে খেলে গেলো, ‘মরবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর কখন পাবো!’ (নী. খা. ৩৩৭)।

তবে পরক্ষণেই সাময়িক বুদ্বুদের মত একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ববাদের সাথে আপাত সঙ্গতিহীন জীবনের অন্তস্থিত প্রেম রূপক একটি বিষয়কে জীবনের অর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান প্রেম-নিয়ে-কোনোদিন-না-ভাবা প্রেমিক নীলাঞ্জন দে। তাপসী দত্তের বাহুবন্ধনে জীবনের একটিবারের আলিঙ্গনে এমন একটি পুরুষ অস্তিত্ব জেগে উঠেছিল নীলাঞ্জন দে'র জীবনে। প্রেমের মধ্যে জীবনের সার্থকতা প্রতিষ্ঠার পুরুষটি তাৎক্ষণিকভাবেই তাঁর জন্য জীবনের দৈনন্দিনতায় চমৎকার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিল–

> কিন্তু না- বাঁচবার আদেশ হয়েছে আমার উপর, আজ থেকে নতুন জীবন আরম্ভ আমার, আজ থেকে যতদিন বাঁচবো প্রতিটি দিন ঠিক এই রকমই হবে, কেননা সে আমার সঙ্গে থাকবে- সে! এখনো জ্বালা করছে আমার মুখ, তাপসী যেখানে চড় মেরেছিলো সেখানে আর হাত রাখিনি তার পরে- ঠিক অমনি থাক, কোনো এক অজানা জন্ম নিচ্ছে সেই আঘাতটিকে ঘিরে ঘিরে, তাকে আমি বিরক্ত করবো না। তার কোমল চুল আমার মুখের উপর, তার গ্রীবার গন্ধ আমার মুখের উপর- দ্যাখো, কেমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছি আমি, আমার গা থেকে যেন তারা ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে। (নী. খা. ৩৩৭)

প্রেমের মাঝে জীবনের অর্থ প্রতিষ্ঠার এই শেষোক্ত প্রয়াস অবশ্য দর্শনের শর্ত পূরণ করে না, যেহেতু সমগ্রের অর্থ অংশ ধারণ করতে পারে না। তবে এই অসঙ্গতি নীলাঞ্জন দেকে অস্তিত্ববাদী চরিত্র থেকে খুব একটা দূরে সরায় না কারণ তাঁর এই প্রয়াস একেবারে বুদ্বুদের মতই সাময়িক এবং তাৎক্ষণিক। এই একমাত্র উচ্চারণের পূর্বে বা পরে কখনোই অস্তিত্বের বেদনাবিস্মৃত এমন লক্ষ্যমুখী সহজ উল্লাসের উচ্চারণ তাঁর জীবনে আর নেই। এই সাময়িক বিচ্যুতির বাইরে বরং Existential revolter হিসেবে সারাটি জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করার যে স্থায়ী সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, যে revolt-এর শক্তিতে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণের পরিবর্তে সিসিফাসের পাথরটির মত জীবনকে বয়ে বেড়াচ্ছেন এবং যার বলে তিনি আজ পৃথিবীজুড়ে, এশিয়া ইউরোপ আর আমেরিকার মাটিতে আর আকাশে অস্তিত্বের এক স্থায়ী যন্ত্রণা যাপন করে যাচ্ছেন, সেই সিদ্ধান্তের স্বাধীন নির্বাচক নীলাঞ্জন দে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের বক্তব্য ও মতামতের নিরিখেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অস্তিত্ববাদী চরিত্র।

উপরের বাক্যটিতে যে বিশেষ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হলো 'স্বাধীন' ও 'নির্বাচক' এই শব্দদ্বয়কে প্রফেসর Raymondও অস্তিত্ববাদের ধারণার কেন্দ্রে রেখেছেন যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। উক্ত শব্দদ্বয় নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যেও নীলাঞ্জন দে অস্তিত্ববাদের সঙ্কট বিমূর্তায়নের চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার যোগ্য। ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকেও নীলাঞ্জন দে নিজেকে স্বাধীন জ্ঞান করেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন–

> 'আমাদের বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে- অসংখ্য দুঃখ আর অমঙ্গলের আমরা অধীন, কিন্তু আমাদের এই ক্ষণিক অস্তিত্বের বাইরে কোনো-এক অনন্ত, চিরন্তন, সর্বক্ষম ও মঙ্গলময় সত্তার এ পর্যন্ত মানুষ শুধু কল্পনাই করেছে, এই জগতের মধ্যে কোনো প্রমাণ পায় নি। হয় ভগবান নেই, নয় তিনি সর্বক্ষম নন, কিংবা সর্বক্ষম হলেও মঙ্গলময় নন–।' (নী. খা. ২৯২)

এই অক্ষম ভগবানের অধীন তিনি নিজেকে মনে করবেন না এটাই স্বাভাবিক। ভগবান থাকলেও তাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি রাখেন বলে মনে করেন। মিলির জায়গায় ক্রমে তিনি তাপসীকে স্থান দিয়েছেন। এ ঘটনাও তাঁর স্বাধীন নির্বাচন। এ নিয়ে তিনি অন্য কাউকে দায় দেন নি। সর্বোপরি একটি নোঙরহীন জীবনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার চরম সিদ্ধান্তটিও তাঁরই স্বাধীন নির্বাচন। এই সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা সুতরাং বৈধ এবং তারও চেয়ে বরং সমালোচকদের ঔচিত্যের দায়যুক্ত যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অস্তিত্ববাদী সঙ্কট রূপায়ণে প্রথম কিংবা অন্যতম আদি পর্বের চরিত্র বুদ্ধদেব বসুর *নীলাঞ্জনের খাতা* শীর্ষক উপন্যাসের নাম চরিত্র নীলাঞ্জন দে।

তথ্যসঙ্কেত

বসু, বুদ্ধদেব। নীলাঞ্জনের খাতা। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, নবম খণ্ড। কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই পৌষ ১৩৯৯। পৃষ্ঠা ২৩৯ - ৩৫৯।

Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Trans. Justin O'Brien. New York: Vintage Books, 1955.

Guenther, Irene. "Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimer Republic." Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris. Durham & London: Duke University Press, 2003. 33-73.

Mukherjee, L. A Study of English History. Calcutta: Mondal Brothers & Co. (Private) Ltd., 28th Edition.

Raymond, Diane Darsoum. Existentialism and the Philosophical Tradition. New Jersey: Prentice Hall, 1991.

Sartre, Jean-Paul. Existentialism. Trans. Bernard Frechtman. New York: Philosophical Library, 1497.

Unamuno, Miguel de. The Tragic Sense of LIfe. Trans.J. E. Crawford Flitch. New York: Dover Publications, 1954.

বুদ্ধদেবের সম্ভব অসম্ভবের গান

মোস্তাক আহমাদ দীন

অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন ! কোথায় কামরূপ
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ?
তাহলে আজো কেন শান্তি নেই?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ?

কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
দ্যাখো-না ডুব্ দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে।

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,

সে আজ এতদূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সেই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু,
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে-ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল— কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলস্থূল!

আবার বয়সের হুলস্থূল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?
থামে না চ্যাঁচামেচি! যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

১

মহাভারত পাঠের আগে এই কবিতাটি পড়লে কীরকম লাগত আমাদের? দুর্ভাগ্য, এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আর কোনোদিন হতে পারব না; যারা মহাভারত পড়ার আগে এই কবিতাটি পড়েছেন, তাদের কাছ থেকে, বা যারা এখনো পড়েননি সেরকম পাঠকের মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হওয়াই উত্তম, কারণ যে-অভিজ্ঞানে কবিতা-পাঠ সার্থক ও আনন্দময় হয়, সেই মূলাধারে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতা কোনোদিনই দুই জন পাঠকের একরকম হতে পারে না। তবে, একটা কাজ খানিকটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে সেটি হলো ছন্দ-মাত্রা ঠিক রেখে, কবিতায়-উল্লিখিত মহাভারতের চরিত্রগুলোর জায়গায় অন্য অন্য নাম বসিয়ে পড়ে দেখা। কিন্তু আমরা নিশ্চিত, শেষে তা করেও দেখা যাবে, তাতেও পূর্বপাঠ-এর অনেকাংশ আঁচ এসে লাগে, আর যতটুকু লাগে না, তাতে ভীষণরকম পাঠবিপর্যয় ঘটে, ফলগত কারণে যাকে নিরর্থক বললেও বেশি বলা হয় না। এ-বিষয়ে এত বাগ্‌বিস্তারের উদ্দেশ্য কবিতাটির মহাভারতনির্ভরতার কথাটি বলে এই কথাটিও জোর দিয়ে বলা যে, এই কবিতাটির মহাভারতনিরপেক্ষ পাঠের পক্ষে এর অন্যান্য কুশলতা সামান্য।

শুরুতেই স্বীকার করা উচিত, বুদ্ধদেব বসুর 'অসম্ভবের গান' আমাদের প্রিয় কবিতার অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ এটি আমাদের কাব্যসংস্কারোচিত আকাঙ্ক্ষাকে— একে ভালো-মন্দ যাই বলা হোক না কেন— নিবৃত্ত করতে পারেনি। অথচ তাঁর এই কবিতাটিকেই আমরা সবচেয়ে বেশি পড়েছি; পড়ার কারণ, আকর্ষণ নয়, (অন-)আগ্রহ। এ-আগ্রহের অন্যতম কারণ মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি, অন্য কারণ এর অসংলগ্নতা/দূরবর্তিতা; আর সবচেয়ে বড় কারণ স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, বিশেষত গদ্যকার বুদ্ধদেবের প্রতি আমাদের সবিশেষ মুগ্ধতা— এই তিনটি কারণই বারবার আমাদেরকে এই কবিতাটির মুখোমুখি হতে বাধ্য করে।

২

কবিতাটির মখোমুখি হওয়ামাত্রই মহাভারতের চরিত্র, কিছু দৃশ্য আবহপট আমাদের সামনে আসতে শুরু করে ঠিকই, কিন্তু এ মনে না হয়ে যায় না যে এটি একটি আকাঙ্ক্ষা— (শব্দটি তিনি নিজে বললেও) বলা উচিত— বাসনা-জড়িত কবিতা। তাঁর কাব্যপরিক্রমার এই পর্যায়ে উপস্থিতির কারণ ও তাঁর ধারাবাহিকতা ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে— তাঁরা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাববিশ্বের মধ্য দিয়ে যে-কবির পথচলা শুরু, তা থেকে মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এই বিশেষ প্রবণতার মাধ্যমে। এই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য কখনো বিগ্রহ, কখনো-বা গলগ্রহ ছিলেন বলে তাঁর কবিতাকেন্দ্রিক গ্রহণ-বর্জনের সবকিছুর ওপর রবীন্দ্রনাথের গনগনে নিঃশ্বাস চাপ সৃষ্টি করেছিল, তা আন্দাজ করা যায়। (এ-প্রসঙ্গে *মৌলিনাথ* উপন্যাসের মৌলিনাথের সুইনবর্ন-পড়ার কথা মনে করা যেতে পারে যার সঙ্গে বুদ্ধদেব তাঁর নিজের তখনকার রবীন্দ্র (পাঠ)-বিরোধিতার যোগসূত্রের কথা স্বীকার করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আর লোথার লুৎসের-নেওয়া সাক্ষাৎকারে) এর ফলে, রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক বিমূর্ততা আর রোমান্টিক অতিমূর্ততার ভাব-আবহ থেকে ছুটে-ছিটকে বেরিয়ে-পড়াটা বিকারবিগার-এর রূপ নিয়েছিল। বিষয়টি অতিঅবশ্যই ব্যাখ্যাপেক্ষী।

বিমূর্ত/অতিমূর্ত বা অশরীর জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আজ প্রায়-সর্ববিদিত হলেও, তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে তাঁর কবিতাজগৎ শরীর ও বাস্তবশূন্য আর এতে কালিদাস ও জয়দেবের রক্তধারা প্রবাহিত নয়; কিন্তু এরা যে-রূপে আছেন, তা কবির অনুশীলনের চাপে মুদ্রাহীন আর তাঁর স্বধর্মে আচ্ছন্ন বলে, অস্পষ্ট। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের প্রথম বই *মর্ম্মবাণী*-তে রবীন্দ্রনাথের প্রায়-সর্বার্থক উপস্থিতির কারণে যে-অনাদর হয়, তার জন্যেই তাঁর দ্বিতীয় বই *বন্দীর বন্দনা* প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই বিকার/বিগারায়নের ঘটনাটি ঘটে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* বইয়ে এই বিষয়টিকে সহজ ও অনিবার্যরূপে গ্রহণ করলেও, পরবর্তীকালের সমালোচক এতে প্লুটার্কলিখিত *লাইফ অফ সিজার*-এর ছুটে-চলা সেই নগ্ন যুবককে খুঁজে পেয়েছেন, যাকে ঘিরে আবর্তিত ‘বন্ধ্যা নারীদের সংস্কার আর সন্তান কামনা।... স্নায়ুতন্ত্রীশিহরিত কামনার ধূমে আমরা এমনভাবেই পেলাম এক চলন্ত তরুণকে, যে-তরুণ নগ্ন করে দেখিয়ে দিচ্ছে তার অন্ধকার-অমা-রাত্রি-সম কামচেতনা ও কামজগৎ।... *বন্দীর বন্দনা*-র এই ভোগের নগ্নতা এক ঝটকায় যেন বা রবীন্দ্র কাব্যাদর্শ ভেঙে দিল।’ অথচ দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখলেন :

> ‘বন্দীর বন্দনা’র বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা, ভাবনা ও প্রকরণের অভিনব রূপান্তর, শব্দচয়নে উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রশস্তি লিখলেন— এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো যার ভিতরে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।

রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিক/কূটায়ত বাক্যটির মধ্যে তরুণ কবির কাব্যপ্রয়াসের সম্ভাবনার ইশারা ব্যক্ত হলেও, (এর ভেতর থেকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ কাব্যসমালোচিকা অর্থাতিরিক্ত যে-ব্যঞ্জনাটুকু আবিষ্কার করেন, জানি না এই কারণেই সাহিত্যসমালোচনার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন কি না) বুদ্ধদেব সেই সম্ভাবনাকে, তাঁর বহুগামিতার কারণে নষ্ট করলেন। তার অর্থ এ নয় যে, কবিকে স্থির বা অচল থাকতে হয়, কিন্তু এরপরও, নিজের কাব্যচিন্তার কারণেই একধরনের অবিচলতার মধ্য দিয়ে কবিকে যেতে হয়— এই বিষয়টি বুদ্ধদেব জানতেন, অন্য

কবিদের মধ্যেও এই ব্যাপারটি তিনি লক্ষও করেছেন, দেখেছেন বিচিত্র-পথে চলার পরও সেই কবিগণ শেষপর্যন্ত স্বপথে/স্বধর্মেই নিষ্ঠ, তার প্রমাণ তাঁর অনেক গদ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর নিজের কবিতাজীবনে সেই গুণের প্রকাশ ঘটেনি। ঘটলে, যে-*মর্ম্মবাণী*-কে আদর্শ করে তার পথচলা শুরু হয়েছিল, তাকে যুগপৎ লালন ও জারণ করে— জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-এর মতো— নিজের পথ খুঁজে-নেওয়া সম্ভব হতো (বিভিন্ন পথে ঘুরে-ফিরে তাঁকে ফের রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে আসতে হতো না)।

আর এই পথ খুঁজে না-পাওয়ার কারণেই তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই অস্থিরতা, নানা পাঠ/পথ-ভ্রমণের চিহ্ন, আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা : ধারণা থাকা সত্ত্বেও, সমর্থপূর্ণ শব্দের অনুপস্থিতির কারণে ঘটেছে নানা অসংলগ্নতা, আবার কখনো-কখনো ঘটেছে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও। 'অসম্ভবের গান' কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

৩.

কবিতাটি পড়ার সময় অর্জুন পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির চিত্রাঙ্গদা কৃষ্ণ— মহাভারতের এই পাঁচটি চরিত্রের উল্লিখন দেখে একজন দীক্ষিত পাঠককে হতাশ হতে হয় এই ভেবে যে, এই কবিই 'অসম্ভবের গান' (ছাড়াও মহাভারতের বিষয় নিয়ে আরো কবিতা) লিখেছেন, আর কবিতাটি লেখার বিশ বছর পরে *মহাভারতের কথা* নামে গদ্যবই লিখবেন, যেখানে থাকবে এর কোনো-কোনো চরিত্রের সুগভীর বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত কিছু বিবেচনা। বিশ বছর পর একই বিষয়ব্যাপার নিয়ে লিখে যিনি সামর্থ্যের পরিচয় দেবেন, তার ওপর ভিত্তি করে সেই আকাঙ্ক্ষা আগের লেখায় খোঁজা যে ঠিক নয় তা আমরা জানি— এছাড়া এই বইটি লেখার পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন কবিতা-লেখার এগার বছর পরে— তারপরও, হতাশার কারণ হতেই পারে, যদি দেখা যায় সেই ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার ঘটে।

কবিতাটি *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত,— বয়সের দিক থেকে যৌবন পেরিয়েছেন— আগের বইগুলির যৌবনোন্মত্ততা, বাসনার তাড়না এখানে নেই, তারপরও মাঝে-মাঝে আকাঙ্ক্ষা/বাসনা থেকে পেয়ে বসে। 'অসম্ভবের গান' কবিতাটি এরকম একটি হঠাৎ-আকাঙ্ক্ষার কবিতা, বোঝা যায় আগের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এখনো হচ্ছে, যা তার কাম্য ছিল না। দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের কিছু চরিত্রের প্রবণতাকে মূল পুঁজি করে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার নানামুখী ভাবনাকে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন; প্রকাশ করতে গিয়ে চরিত্রগুলোকে গ্রহণ না করে, আকস্মিকভাবে ব্যবহার করে পাঠকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন।

বাউলেরা নিজেদের প্রবোধ দিয়ে, বা সুপথে চলার-কথা বলে একপ্রকার গান লেখেন, একে তারা বলেন 'মনশিক্ষা', এই কবিতাটি সেরকম নয়, যদিও এরও শুরুটা নিজেকে লক্ষ্য করে। পুরো কবিতাটি পড়ে, কথা-বলার ঢঙটি দেখে তিনরকম ধারণা হয়— ১. কবি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, সামনে অর্জুন ও যুধিষ্ঠির; ২. কবি নিজেকে অর্জুন ভেবে নিয়ে কথা বলছেন, সামনে যুধিষ্ঠির থাকতে পারেন বা নাও থাকতে পারেন; ৩. মাঝে-মাঝে নিজেকে যুধিষ্ঠির ধরে নিয়ে কথা বলছেন, অর্জুনও উপস্থিত; এবং এর বাইরে আরেকটি বিশেষ ধারণা কখনো-কখনো মনে হয় : নিজেকে একই সঙ্গে অর্জুন ও যুধিষ্ঠির ভেবে কথা বলে থাকতে পারেন। একটি বাক্যে বা কবিতায় বা কাহিনীতে এরকম বহুস্বরগত ভাবনার যোগ তৈরি হলে সেই পাঠবস্তুর আমরা যে-কারণে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, বুদ্ধদেবের কথা-বলার এই ঢঙটিকে আমরা সেই

ভাব-এ গুরুত্ব দিতে পারছি না, কারণ, মহাভারতের এই দুটি চরিত্রের যে-বিশিষ্টতা, এরকম সড়গড় উপস্থাপনে তাদের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্যতা ধরা পড়ে না।

প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে কবি যখন বলেন 'কোথায় অর্জুন, কোথায় কামরূপ' তখন মনে হয় তিনি অর্জুনের খোঁজ করছেন, অর্জুন সে সময় তার কাছে, বা দূরে কোথাও থাকতে পারেন; তবে, আমাদের ধারণা, কবি এখানে তাঁর ভেতরের অর্জুনকে খোঁজ করছেন, জাগাতে চাইছেন— যার মধ্যে যৌবনের কামনাবাসনা আছে। কারণ কবিতাটির মধ্যে এ-ইঙ্গিত স্পষ্ট যে : যৌবন-পার-করে-আসা এক ব্যক্তি/ কবি হঠাৎ-আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে বুঝতে পারছে, তার মধ্যে কামতৃষ্ণা জেগেছে ঠিকই, কিন্তু শরীর-সামর্থ্যে সে অক্ষম। এ-অবস্থায় নিজের মধ্যে অর্জুন-সত্তা/শরীর-এর জাগরণ-কামনা সঙ্গত, আর— মাঝের কিছু স্তবক বাদ দিয়ে— শেষ স্তবকটি যদি পড়ি, তাহলেও দেখব এতে পরিণতি-বর্ণনা অসঙ্গত হয়নি, বরং মর্মান্তিকই হতে পেরেছে। তার কারণ, কবিতাভুক্ত যৌবন-পেরুনো/ক্ষমতাহারা লোকটির বিপ্রতীপে অর্জুন চরিত্রের প্রেমিক/কামচেতন আর যুদ্ধপ্রবণ বীর্যবন্ত অবস্থান খুবই মানানসই আর তৎপরতাময়। *মহাভারতের কথা* বইটি থেকে বুদ্ধদেবের চমৎকার গদ্যে এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের চুম্বক-অংশ পড়া যেতে পারে :

> হ্রদের প্রান্তে এসে যুধিষ্ঠিরের চার ভ্রাতাই নেপথ্য-বাণী অমান্য করেছিলেন, কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেছিলেন শুধু অর্জুন। 'এসো না দৃশ্যমান হও, তারপর দেখি আমার বাণে বিদীর্ণ হ'য়ে কেমন আমাকে নিবৃত্ত করতে পারো!'— এই আহ্বান, এই তাৎক্ষণিক যুদ্ধঘোষণা অর্জুনের কণ্ঠে অনবরত শুনতে পাই আমরা— পর্বের পর পর্বে, ঘটনার পর উত্তেজনাময় ঘটনায়। হনুমান-কতৃক প্রতিহত ও পরাস্ত হ'য়ে উগ্র ভীমসেনও ক্ষমা চেয়েছিলেন একবার (বন : ১৪৭), কিন্তু অর্জুন কখনো অস্ত্র ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন না। 'মা সাহসং কার্ষীম'— এই নিষেধের জীবন্ত এক উত্তর যেন অর্জুন : তিনি ব'য়ে যান সব বাধা ডিঙিয়ে উচ্ছল স্রোতে, চারদিকে বিস্তার করেন প্রভুত্ব; তাঁর মতো বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন সমগ্র মহাভারত-রামায়ণে অন্য কারোরই নয়।

এবার পড়া যেতে পারে প্রেমিক/কামরূপ :

> একদিকে তিনি অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা, অন্যদিকে পরমরমণীয় যুবাপুরুষ; তাঁর কীর্তিফলকে এই কথা উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত আছে যে তিনি ললনাপ্রিয়, এবং মহিলারা তাঁকে ভালোবাসেন। প্রথম বনবাসে তাঁর তিনটি প্রণয়িনী পত্নী জুটলো; স্বর্গে তার জন্যে বিলোল হলেন স্বয়ং উর্বশী; অজ্ঞাতবাসের পুরো বছরটি তিনি যাপন করলেন নারী সেজে নারীসংসর্গে, পুরস্ত্রীদের গল্প শুনিয়ে, নৃত্যগীত শিখিয়ে; পঞ্চস্বামীর মধ্যে তাকেই শুধু তাঁকেই শুনতে হলো দ্রৌপদীর মুখে প্রণয়গঞ্জনা; এবং তাঁর তৃতীয় 'মৃত্যু'র পর তিনি প্রায়বিস্মৃতা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়প্রভাবেই প্রাণ ফিরে পেলেন (অশ্বমেধিক পর্ব)। এসব ঘটনাও কারণ, যেজন্য অর্জুন হয়ে ওঠেন আমাদের চোখে ক্রমশ আরো প্রীতিপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী।

কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন অর্জুনের 'ফ্রেন্ড, গাইড এবং ফিলসফার'; এ-প্রসঙ্গে গীতার পটভূমি আর তার বিষাদযোগ-এর কথা মনে করে নিয়ে ভাবা যেতে পারে— এমন একটি বহুমাত্রিক চরিত্র যার, তাঁকে একটি কবিতার কেন্দ্রবিন্দু করা তো অতিস্বাভাবিক ঘটনা, বরং এই চরিত্রের নানা মাত্রা নিয়ে পরবর্তীকালে পৃথক মহাকাব্য রচিত না-হওয়াটাই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। কিন্তু বুদ্ধদেবের পক্ষেও অর্জুনকে 'অসম্ভবের গান' (বা অন্য কোনো) কবিতাতেও মূল চরিত্র হিসাবে আনা সম্ভব হলো না। অথচ অর্জুনচরিত্রের ঘটনা-পরিবেশ বুদ্ধদেবের কবিতার

রূপক হওয়ার জন্যে একদম যুৎসই ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রথম স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে একবার উচ্চারণ করার পর, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যখন আবার সবিস্ময় প্রশ্ন রাখেন 'এক বসন্তেই শূন্য তূণ?' তখন অর্জুনের বীরজীবনের এমন অবাস্তব ঘটনার সঙ্গে নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যর্থতার যে-সামঞ্জস্য ঘটে, তা অনবদ্য। অথচ একই কবিতায় নিজের বা বাসনাপূরণ ঘটাতে অন্য চরিত্র ও তার অনুষঙ্গাদি নিয়ে এসে অনেক কিছুকে অব্যবস্থিত করে ফেললেন। তবে কি ভাবব, এই কবিতা লেখার প্রায় দেড় যুগ পরে, বুদ্ধদেব যখন *মহাভারতের কথা* লিখবেন তখনকার ভাবনার মতো কোনো ভাবনা আগে ভাবেননি? বিশেষরূপে যে ভাবেননি তার প্রমাণ *মহাভারতের কথা* বইয়ের ভূমিকা; তিনি জানিয়েছিলেন, মহাভারতের কথা (রচনাকাল ১৯৭১-৭৪) লেখার প্রায় এগার বছর আগে, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক পড়াবার সময় কিছু পুঁথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে, 'অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধস্থাপনের সম্ভাবনা' তাঁকে চঞ্চল করে, এবং টের পান 'মনের দু-একটা পূর্বার্জিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে ধীরে পরিণত হ'য়ে উঠছে'। তিনি 'অসম্ভবের গান' কবিতাটি লেখেন তারও প্রায় দশ বছর আগে, ১৯৫০ সালের ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বরে; ভূমিকা-উক্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর মহাভারতকেন্দ্রিক ভাবনাগুলো তখনো ছিল ভ্রূণাকারে, প্রাথমিক পর্যায়ের; ফলে দু-দিনে কবিতাটিকে শেষ করলেও, তাঁর পরবর্তীকালের পরিণত পর্যবেক্ষণের পরিচয় এই কবিতাটিতে যুক্ত হতে পারেনি। তাই, বলা যায় এর চরিত্রগুলো কবিতাতে সুগৃহীত না হয়ে এলোমেলোভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ তখনো এই চরিত্রগুলোর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তাঁর মনে রূপ লাভ করতে পারেনি। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই, তাঁর সম্ভাবনাময় 'অসম্ভবের গান' কবিতাটি দুঃখজনক ব্যবহারের উদাহরণ হয়ে থাকল।

দুঃখজনক ব্যবহারের প্রধানতম একটি উদাহরণ হলো যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির তাঁর অনেক মানবিক দুর্বলতাসত্ত্বেও— কারও কারও কাছে এই দুর্বলতার জন্যেই— অতি প্রিয় একটি চরিত্র। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নানা দৌর্বল্য : ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষার জন্যে নানা বিষয়ে জড়িত হলেও, এমনকি নিজেকে পাশা খেলায় লিপ্ত করার পরও তাঁর প্রতি আমাদের আকর্ষণ কমে না। যুধিষ্ঠিরের প্রতি বুদ্ধদেবের আগ্রহ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ তাঁর *আমাদের শহরের রাখাল* বইয়ে লিখেছিলেন, 'একে খণ্ডিতভাবে দেখতে চান না বলেই সমস্ত ঘটনাবিস্তারের মধ্যে— তার অনুপুঙ্খের মধ্যে— তিনি খুঁজে বেড়ান শুধু একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য, এক মহান পরিকল্পনা, এক মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অনুসরণ করে সেই সম্পূর্ণতায় তিনি পৌঁছান'। আমাদের কাছে, মানবিক দুর্বলতার কারণে যুধিষ্ঠিরের মহিমা যে বড় করে দেখানো হয়েছে, সেটা ঠিকই মনে হয়েছে । বুদ্ধদেব লিখেছেন : 'যেহেতু তিনি এত বেশি অস্থির ও অনিশ্চিত, যেহেতু বাধা তাঁকে জড়িয়ে আছে পায়ে-পায়ে, যেহেতু সংশয় তাকে নিস্তার দেয় না কখনো—তাই আমাদের মধ্যে তিনি বড়ো হ'য়ে ওঠেন ক্রমশ, তার সব স্খলন পতন মনস্তাপ ও স্ববিরোধের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে একটি বিবর্তনরেখা, কোনো দুর্নিরীক্ষ নির্জন পথে যেন অতি ধীরে এগিয়ে চলেন তিনি।'— এই যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাঁর কবিতার একাধিক স্তবকে জায়গা দিলেও, উপস্থাপন করেছেন গৌণরূপে। এতে গৌণত্ব ঘটেছে দু-ভাবে— প্রথমত এখানে তাঁর উপস্থিতি প্রথম চরিত্র হিসেবে হয়নি, দ্বিতীয়ত তাঁর জীবনের পাশা খেলার যে-ঘটনাটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি তাঁর জীবনের মূলঘটনা নয়, অনুঘটনামাত্র।

কবিতায় যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি ঘটেছে দ্বিতীয় স্তবকে, এরপর আরো পাঁচটি স্তবকে পাশা খেলা বা তাঁর আসক্তির বিষয়টিকে সম্প্রসারিত করে বুদ্ধদেব তাঁর আকাঙ্ক্ষা/বাসনার কারণটি খুঁজেছেন; এই খোঁজার মধ্যে আমাদের আপত্তির কারণ এই নয় যে, ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষার খাতিরে এই কাজগুলো যে করেছিলেন যুধিষ্ঠির এখানে তার উল্লেখ হয়নি, বরং আপত্তি হলো মূল বিষয়টির সঙ্গে অনুঘটনার আবহের অসামঞ্জস্য, আর আংশিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে (তাঁরই প্রিয় চরিত্র) যুধিষ্ঠিরের মাহাত্ম্য খণ্ডন। যেমন দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, এক বসন্তেই কি তূণ (বা যৌবন-শক্তির আধার) শূন্য? তাহলে তার শান্তি নেই কেন? কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীরে পাশায় পণ রেখেছিল; এতে স্পষ্ট যে এখানে ঘটেছে স্ববিরোধিতাগত অসামঞ্জস্য, কেননা, আমাদের মতে, তূণ শূন্য হলে অর্থাৎ আসক্তি চলে গেলেই শুধু একজন খেলোয়াড় তার স্ত্রীকে পাশায় দান ধরতে পারে।

এরপর তৃতীয় স্তবকে তিনি লিখেছেন :

কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরের দুই পঙ্‌ক্তির পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। দিন/যৌবন-এর শেষে ক্লান্ত পাখায় কেন আকাঙ্ক্ষা জাগে, এই জিজ্ঞাসা আর বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির/ জানে না কেন এই পরিশ্রম'— এই দুটি পঙ্‌ক্তির অর্থ-গতি সম্পূর্ণ বিপরীত মনে-হওয়া অস্বাভাবিক নয়; প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে আকাঙ্ক্ষাজড়িত জিজ্ঞাসা (অর্জনের ইচ্ছাও রয়েছে), এবং শেষে আছে আকাঙ্ক্ষা/পাঞ্চালী-বিসর্জনের ব্যাপার। অবশ্য এখানে এই বিষয়টিও আমাদের মনে জাগছে যে, বুদ্ধদেব এখানে পাঞ্চালীকে বাদ দিয়ে খেলার আসক্তির সঙ্গে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়েছেন; মেলাতেই পারেন, তবে এতে এই প্রশ্ন জাগতে পারে তা গতিধর্ম-বিরোধী হলো কি না (সে কারণে নারীচেতনাবাদীদের চোখও কপালে-ওঠা অবাস্তব নয়)।

যুধিষ্ঠিরের জুয়োর আসক্তিটাকেই যে তিনি বড় করে এনেছেন, তার প্রমাণ অন্যান্য স্তবকেও আছে; পরের স্তবকেই লিখেছেন : উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো/আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা?— এখানে পাশা শব্দটি বিশেষায়িত করে, কর্তা-রূপ দিয়ে কবিতার মূল ভাবটাকেই ম্লান করে দিলেন বুদ্ধদেব; পরের পঙ্‌ক্তিতে একথা স্পষ্ট নয় যে চিত্রাঙ্গদার আশা ঠিক কে করে? মহাভারতের বিচারে প্রথমেই আমাদের অর্জুনের কথা মনে পড়বে; মণিপুরের সেই চিত্রাঙ্গদা যার সঙ্গে অর্জুনের জীবন-বাসনার কিছু অংশ জড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে অর্জুনের কথাই যে বলা হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ হল শেষের স্তবকের আগের স্তবক, যেখানে বলা রয়েছে 'স্বপ্নে ওঠে রোল— কোথায় কামরূপ/কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!/ হে বীর ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?/

—আবার বসন্তের হুলস্থুল! ... এখানে ব্রহ্মচারীকে বলতে তিনি অর্জুনকেই যে বোঝাচ্ছেন, সেকথা আরো স্পষ্ট হয় যখন শেষের স্তবকে গিয়ে প্রশ্ন করা হয়, *ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?* আর, সব্যসাচী যে অস্ত্রকর্মা অর্জুনেরই আরেকটি গুণবাচক নাম, তা তো সকলেরই জানা। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়, অর্জুনকে নিয়ে-আসা বা বোঝানোই যদি তাঁর উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আমাদের আপত্তির কিছু থাকত না। তিনি, 'আজো

কি চিত্রাঙ্গদার আশা?' বলে পরবর্তী স্তবকেই গিয়েই চলে গেলেন, সেই যুধিষ্ঠিরে— জুয়োর প্রসঙ্গে (আর স্বাভাবিক কারণেই আগের বাক্যটি হয়ে পড়ে আকস্মিকতার দোষে দুষ্ট।) এই বাক্যে জুয়ো আর মদে নিজেকে ডুবে-যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বলেছেন, অন্তত অন্ধকার তো পাওয়া যাবে; কিন্তু পরের স্তবকেই আবার সেই অন্ধকার আর শূন্য তূণ-এর উল্লেখ করে বলছেন 'এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো/ অনিশ্চয়তার অসম্ভবে'— পঙ্‌ক্তি দুটি নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বৈধ আর অস্থিরতাপীড়িত মনের পরিচায়ক।

পরের স্তবকে আবার পাঞ্চালী-প্রসঙ্গ; বোঝা যায় এবার তার উল্লেখ সেই তথ্যটি দেওয়ার জন্যে যে, যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীকে খেলায় দান হিসেবে ধরলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে ফিরে পেয়েছিলেন, এবং তা 'অনিশ্চয়তার অন্বেষণে'। এখানে যে-কোনো পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, (আগের স্তবকে) অনিশ্চয়তার অসম্ভব আর (পরের স্তবকে ফের) 'অনিশ্চয়তার অন্বেষণে' ব্যবহার করার কারণটা কী? খেলার অনিশ্চয়তা, না কি আদ্যানুপ্রাসের ধ্বনিপ্রবাহ তৈরি? খেলার অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে পাঞ্চালীকে ফিরে-পাওয়ার তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মূল ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো আলাদা ব্যঞ্জনা আসে কি না, তা খুঁজতে গেলে দূর-কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি-অসঙ্গতির কথাটি না ভাবলেও, এই স্তবকের শেষের দুই পঙ্‌ক্তির তথ্যটি যে-কারো পক্ষেই উপেক্ষা করা অসম্ভব। পাঁচ স্বামী নিয়ে পাঞ্চালীর সংসার, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সখ্য, (পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের হারের পর যখন তাঁকে বিজেতাদের কাছে চলে যেতে হবে তখন) তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়— এই সব যুগে যুগে মহাভারত-পাঠকদের ভাবাচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতাতে এই তথ্যগুলো কোনো বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহৃত না হয়ে অবিশেষ তথ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হলো শুধু। আর (কৃষ্ণের সখী বোঝাতে) শেষ পঙ্‌ক্তি— 'স্বয়ং কৃষ্ণের সেই মধুর'— পড়ামাত্র এমন ভাবনা জাগে যে তাঁর পক্ষে এমন একটি শিথিল বাক্য লেখা কীভাবে সম্ভব হলো!

এর পরের স্তবকটি মহাভারতের বিষয় মাথায় না-রেখেও পড়া যায় বলেই হয়ত অনেকটা কিছুটা অর্থময় হয়ে উঠেছে; অথবা অর্থময়তায় অন্য কারণ হতে পারে, এর ভাবটা মরমি : 'ফসল অন্যের, তোমার শুধু,/অন্য কোনো দূর অরণ্যের/পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে-ওঠা/কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়'— এই বর্ণনায় বুদ্ধদেব মহাভারতের কোন আবহপটের কথা মনে রেখে লিখেছেন সেই কথাটি না-ভেবে, আর দেহগত আকাঙ্ক্ষা ও মরমি ভাব-এর বিপরীতমুখিতার কথা মনে রেখেও বলা যায়, শুধু চিত্রগত কারণে এই স্তবকটি তার মূল ভাব প্রকাশের খানিকটা সহায়ক হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য স্তবকের মধ্যে রয়েছে ভাবের অসঙ্গতি— আদ্যানুপ্রাস-অন্ত্যানুপ্রাস তৈরির জন্যে শব্দের নাতিচিন্তিত ব্যবহার, অভিজ্ঞতার বিকৃত আরোপন প্রভৃতি। অন্ত্যানুপ্রাস ছাড়া বাকি বিষয় ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে; এ-বিষয়টিও, শেষ স্তবকটি বাদে, প্রতিটি স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য থেকে খুঁজে পেতে আদনা পাঠকেরও অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এই খোঁজার মধ্য দিয়ে সচেতন পাঠকের এই ধারণাও হবে যে, শব্দ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার অনিবার্যতা মেনেছেন, না কি মাত্রার দিকেই তাঁর নজর ছিল; বুঝতে পারবেন, পাঞ্চালী না লিখে দ্রৌপদী লিখলে কোনো প্রকার অসুবিধে হতো কি না; পাঠক এও যাচাই করতে পারবেন যে, অন্য শব্দ ব্যবহার না করে 'চ্যাঁচামেচি' শব্দটি নির্বাচন করার কারণে— দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতো— আপনিও একে 'দুঃসাহসিক প্রয়োগ' বলতে পারেন কি না।

৪

এই লেখার অভিমুখের সঙ্গে যাঁরা একমত, বা একমত না-হলেও, যাঁদের একমত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরকে সবিস্ময় বেদনার শরিক করে লেখাটি শেষ করতে চাই। আপনিও নিশ্চয়ই আমার মতো বুদ্ধদেবের *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* বা *যে আঁধার আলোর অধিক* বা অন্য কোনো বইয়ের কয়েকটি কবিতাকে পছন্দ করেছেন, আর এই সব মুগ্ধতাসহ 'অসম্ভবের গান' বা এই তরফের অন্যান্য কবিতা পড়ে আমারই মতো নিরাশ হন। আমি নিশ্চিত, আমারই মতো আপনি ভালোবেসেছেন তাঁর অনেক গদ্যকে যা একই সঙ্গে মননঋদ্ধ ও হার্দ্যগভীর; শব্দ-নির্বাচন, চেতনাপ্রসারী শব্দবন্ধ, যতিচিহ্নের যথোচিৎ ব্যবহার তাঁর গদ্যের মেরুদণ্ডকে যে-রূপে খাড়া করে রাখে, তাতে আমারই মতো আপনাকেও নিশ্চয়ই চিন্তিত হতে হয় এই ভেবে যে, এমন গদ্যশিল্পী যিনি, তাঁর কবিতার শব্দ-ভাব এরকম লতাশিথিল হবে কেন। তাঁর অনেক কবিতায় যে গল্প-বলার ভঙ্গি প্রকট হয়ে থাকে তা যে-কোনো পাঠকের চোখে পড়ার কথা, এ-বিষয়ে— ঠিক গল্প নয়, গদ্য-প্রভাব আরোপনে— তাঁর নিজেরও কোনো আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না, কারণ এই বিষয়টি না-থাকার কারণে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে মৃদু অনুযোগও ছিল তাঁর— কখনো-কখনো মনে হয় তাঁর এই প্রবণতাটই তার কবিতার অনেকটা ক্ষতি করেছে। এই কথার সায় মেলে লোথার লুৎসের-নেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি প্রশ্নের জওয়াবে যখন তিনি তাঁর গদ্যের বাক্যনির্মাণের ভেতরের সেই কথাগুলো জানান, যা সাধারণত একজন কবি তাঁর কবিতা-বিষয়েই করে থাকেন; তাঁর এই ভাবনা নিঃসন্দেহ তার গভীর মননভাবনার পরিচায়ক।

এসব বিচারে— বিশেষ করে *বন্দীর বন্দনা*-র কোনো কোনো কবিতায়— সাধকপরিচিতি থাকা সত্ত্বেও ধ্বনিসৃষ্টির জন্যে অযথা শব্দ-ব্যবহারকারী হিসেবে অভিযুক্ত গোবিন্দদাসের রীতির অনুসরণ দেখে— আমাদের মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গভীরতর অর্থে মননশীল কোনো ব্যক্তির মননহীন কবিতা লেখার উদাহরণ যেমন বুদ্ধদেব, তেমন একই গুণের (বা আরো বহু গুণের) গুণী হয়েও মননঋদ্ধ কবিতা লেখার নজির হলেন সুধীন্দ্রনাথ; প্রথম বাক্যটি শুনলে বুদ্ধদেব কী বলতেন জানি না, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে যে অকুণ্ঠ সায় ছিল তার প্রমাণ তাঁর লিখিত *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ*-এর ভূমিকা; এই ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'এই বইয়ের কবিতাগুলি যাঁর রচনা, তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর নানা গুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি।'...'এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাধ দত্তের মতো এমন একজন কবি যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন'। ...'আমি বলতে বাধ্য যে জগতের অন্যান্য উত্তম কবির মতো সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন— স্বভাবকবি নন স্বাভাবিক কবি। তা যদি না-হ'তো তাহলে তাঁর মতো মেধাবী ব্যক্তি কবিতা-নামক বায়বীয় ব্যাপার নিয়ে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না'। (এখানে সুধীন্দ্রনাথকে মহীয়ান করার জন্যে ব্যবহৃত হলেও, তার বিপরীতে 'নিরীহ' আর 'বায়বীয়' শব্দ দুটি লক্ষযোগ্য।) কমবেশি এরকম সপ্রশংস বাক্য পুরাকাল, সমকাল ও পরকালের অনেক কবি সম্পর্কেই করেছিলেন বুদ্ধদেব; প্রশংসা করেছিলেন কালিদাস বোদলেয়র রিলকে, হেল্ডার্লিন পাস্টারনাককেও— প্রবণতাগত বৈভিন্ন্য সত্ত্বেও একজনের পক্ষে অনেকের বিচার-করা

তাঁর গুণগ্রাহিতা/মননশীলতারই পরিচায়ক। কোনো কবির পক্ষে এই গুণগ্রাহিতা তখনই সার্থক হয় যখন এই গ্রহণ তাকে আচ্ছন্ন না করে ঋদ্ধ আর সচল করে, অস্থির না করে গতির প্রাণনা দেয়; কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে এই গুণগ্রাহিতাকে আমরা এ-কারণেই বহুগামিতা বলতে বাধ্য— এই গমন-বাসনা তাঁকে এতটাই চঞ্চল ও অস্থির করেছে যে শেষপর্যন্ত তা তার কাব্যশক্তিতে ক্ষয় ধরিয়েছে, যে-ক্ষয় তাঁকে ক্রমে বিচলিত করেছে, সমকালিকদের অনুকরণও করিয়েছে— অবশ্য এই অনুকরণকে কেউ কেউ সমভাবও বলতে পারেন— ব্যাপারটি বুদ্ধদেব বসুর মতো সর্বগ্রহণবাদী মহাপ্রাণ শিল্পীর জন্যে তো অবশ্যই, তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে আমাদের জন্যেও বেদনাদায়ক ঘটনা ছাড়া আর কী হতে পারে।

অতি রাবীন্দ্রিক, না রবীন্দ্রবিরোধী

শান্তনু কায়সার

তাঁর কন্যা মীনাক্ষী দত্তের ভাষায় বুদ্ধদেব বসুকে কেউ বলতেন 'রবীন্দ্রবিরোধী', আবার কেউবা 'অতি রাবীন্দ্রিক।'[১] বলাই বাহুল্য, উভয় মতই পক্ষপাতদুষ্ট। প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে হলে এর পটভূমি ও তাৎপর্য বোঝা দরকার।

'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু তাঁর পরিণত বয়সে 'পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম' হিসেবে তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, 'যেহেতু বাঙালি, উপরন্তু সাহিত্যে সচেষ্ট', সেকারণে কৈশোরে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথে নিমজ্জন ঘটেছিল।' সে সময়ের ঐ বিবেচনায় তিনি যেমন তাঁকে ভেবেছেন 'দেবতা' হিসেবে তেমনি পরিণত বয়সের এই প্রবন্ধের শুরুতেও রবীন্দ্রনাথকে ভেবেছেন 'এক দৈব আবির্ভাব হিসাবে।'

তাহলে মাত্র বিশ–পূর্ব ও উত্তর বয়সে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও তাঁর সম্পাদিত 'প্রগতি'তে, বিশেষত এর অন্তর্গত 'মাসিকী'তে কেন এত রবীন্দ্রবিরোধিতা? উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর তাঁর স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করলো যে কিশোর অথবা সদ্য তরুণ সে কেন এমন রবীন্দ্রবৈরী হয়ে উঠলো? পরিণত বয়সে সেই সময়ের কারণ দর্শাতে গিয়ে *আমার যৌবন* গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন, তাঁর তাঁদের একটা 'বোঝাপড়া'র দরকার হয়েছিল। কারণ, তা না হলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে চিরকালের মতো আটকা পড়ে যেতেন। তাঁকে তাঁদের পক্ষে 'সহনীয়' ও 'ব্যবহার্য' করে তোলা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এটি শুধু তাঁর একার কথা ছিল না, ছিল তা তাঁদের কাল ও প্রজন্মের কথা। এজন্যে বিষ্ণু দে বলেছিলেন "উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে" "রবীন্দ্রব্যবসা" তাঁরা করতে চাননি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্মুখে 'পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর' আছেন জেনেও নিজেকে 'নমস্কার' করে আপনার হাতে 'অক্ষয় লেখনী' তুলে নিতে চেয়েছিলেন। একারণে 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ' অনিবার্য জেনেও বুদ্ধদেব বসুরা সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের সহজ পথকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে ভিন্ন পথে যাত্রা করতে চেয়েছেন।

বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে পরবর্তীকালের পরিণততর কাব্যপ্রয়াস সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন[২] এটি ছিল তার সূচনাপর্ব। "বাংলা কবিতার আসর তখন মাত করে রেখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ আর সমর সেন। বুদ্ধদেব বসুর হাতে 'কবিতা'র রথের রশি। সে ছিল এক মন-মাতানো উদ্বেলিত সময়।"

বিষয়টির আরো স্পষ্ট পরিচয় পাওয়ার জন্যে অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব–ত্রয়ীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বর্ণিত একটি সাক্ষ্য নেয়া যাক। রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম লিখে যাব আমরণ। অমন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বসে অমন প্রতিজ্ঞা করার সাহস আসত।

"বলতেন, এমনভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব।"

'আমার সামনে আর কেউ বসে নেই?' চমকে উঠতাম।

'না।'

'রবীন্দ্রনাথ?'

"রবীন্দ্রনাথও না।' 'যদি সর্বক্ষণ মনে কর সামনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন তবে নিজের কথা আর বলবে কি করে? তবে তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই ছায়ানুসরণ করবে। তুমি ভাববে তোমার পথ মুক্ত, মন মুক্ত, তোমার লেখনী তোমার নিজের আজ্ঞাবহ।"

সেকারণে 'আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে' পেলেও এবং 'একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয়' জেনেও 'ক্ষুদ্র' কিন্তু স্বতন্ত্র পথ বেছে নিতে হয় বুদ্ধদেব বসুদের। অতএব 'অতি-আধুনিকে'র 'সুস্পষ্ট শ্লেষ' ও কটাক্ষ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-পরবর্তী নতুন যুগের সূচনা কিংবা অন্তত প্রয়াস করতে হয় তাঁদের।

শোনা যায়, প্রগতিপর্বে বুদ্ধদেব রাতে *পূরবী*র কবিতা পড়তেন আর দিনের বেলা স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন ও লক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেন। একটি 'মাসিকী'তে বুদ্ধদেব যুবনাশ্বের গল্প যে 'ভাল' নয় সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উত্থাপিত প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন "তাঁর একমাত্র কারণ কি এই যে, তাঁর চরিত্রগুলো পুরনো আমলের জমিদার বা বালিগঞ্জ নিবাসী ব্যারিস্টার নয়?" তাতে ঐ কটাক্ষ রুচিকর না হলেও অনিবার্য ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৩১–'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন একটি ছোট নিবন্ধ 'নবীন কবি।' দিলীপ কুমার রায় বুদ্ধদেব বসুর 'কাঁচিছাঁটা' যে ছ'টি কবিতা রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন সেগুলো পাঠের প্রতিক্রিয়ায়ই তিনি ঐ রচনাটি লেখেন। তাঁর আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে 'নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াসে'র পরিবর্তে কবিতাগুলোকে 'সহজ স্বকীয়তায়' ছন্দ, ভাষা, উপমায় 'ঐশ্বর্যশালী' বলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। 'শনিবারের চিঠি' কবির এ বিবেচনাকে বলেছিল 'অরবীন্দ্রিয়।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন পরে 'বাংলা কাব্যপরিচয়'–এর একটি ভুল সংকলন করেন তখন বুদ্ধদেব বসু তার কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। ১৩৪৫-এর আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি লেখেন, "...এই কি তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রুচি? কথাটা বিশ্বাস করবার মতো নয়, কিন্তু না করেই বা উপায় কী?" উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে বুদ্ধদেবের মনোযন্ত্রণাকে বোঝা যায়। তাঁর বিবেচনা যে সঠিক ছিল তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, পরে ঐ কাব্য সংকলনটি কবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন কিংবা তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, 'প্রগতি'তে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রার্থনা না করলেও কিংবা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে গেলেও 'কবিতা'র সূচনা সংখ্যাটি বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন 'তাঁর একটি কবিতা', যদিও ভয় ছিল, 'পাছে তাঁর অসামান্য সৌজন্য ও কর্তব্যবোধের তাগিদে লিখে পাঠান কোনো দায়সারা গোছের সার্টিফিকেট অথবা তাঁর 'ঝুলি' হাতড়ে বের করে দেন দু-চার লাইনের কোনো পদবিন্যাস, যেমন দেখা যেতো সেকালে অনেক মাসিকপত্রে ও কবিতার বইয়ের বিজ্ঞাপনে।' তিনি অবশ্য তাঁর আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দ্রুত উত্তর দেন এবং পাঠান দীর্ঘ গদ্যকবিতা 'ছুটি' তাঁর সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ একটি রচনা।[৩]

কিন্তু কাব্য সংকলন বিষয়ে বুদ্ধদেবের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করেছিল বলে মনে হয় না। ঐ সময়ের একটি চিঠিতে বিষ্ণু দে যদিও বলেছিলেন "সমালোচনাটি আমার মনে হয় আপনার একটি উৎকৃষ্ট লেখা" এবং "এর প্রয়োজন ছিল", তবু রবীন্দ্রনাথ তাতে ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে ঐ চিঠিতেই লিখেছিলেন, "... যেহেতু লেখাটি শালীনতায় বিনীত অথচ বিস্তৃত আর স্পষ্ট, তাই সঙ্কোচের কারণ দেখি না এবং আশা করি রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝবেন না।" কিন্তু ফিরতি চিঠিতে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, "... রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমতোই ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁর কিছু প্রমাণ এরই মধ্যে পেয়েছি।" সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, এরপরই 'কবিতা' পত্রিকায় বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ চিঠিতেই বুদ্ধদেব লিখেছেন, "ধূর্জটি বাবুও (ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়) লিখেছেন ভালো লেগেছে। আরো দু'একজন লিখেছেন। আমি ভাবছি এই চিঠিগুলি পরবর্তী সংখ্যায় ছেপে দেব—নিজের প্রশংসাপত্র হিসেবে নয়, আমার লেখাটি যে অন্যায় হয়নি, বাংলাদেশের অনেক গ্রাহ্য ব্যক্তিরই যে এইরকম মত, তার নিদর্শন হিসেবে।"[৪]

এভাবে আমরা দেখবো, রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন এই সম্পর্কের নানা চড়াই-উৎরাই ঘটেছে ও টানাপোড়েন চলেছে। কিন্তু এর মধ্যে তাঁদের উভয়ের শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্কটিও মোটামুটি অটুট থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে প্রতিভা ও বুদ্ধদেব বসুর শান্তিনিকেতনে পারিবারিকভাবে অবস্থানের মধ্য দিয়ে তাঁরা কবির যে নিকট ও মধুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, যার বর্ণনা '*সব পেয়েছির দেশে*' ও *জীবনের জলছবি*তে রয়েছে, তা ছিল তাঁদের জীবনের অক্ষয় সম্পদ। কিন্তু জীবন যেহেতু দ্বান্দ্বিক এবং তাঁর চিরন্তনতার মধ্যে দৈনন্দিতারও একটি প্রধান ও বাস্তব জায়গা ও ভূমিকা রয়েছে সেহেতু সেখানে ভুল বোঝাবুঝি, এমনকি স্বার্থপরতাকেও অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর মত ব্যক্তিদের জীবনে, যাঁরা আমৃত্যু কর্মক্ষম ও সক্রিয় ছিলেন। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যদি *পূর্বোক্ত* পত্রগুচ্ছ থেকে বুদ্ধদেব বসুর দুটি উক্তি উদ্ধৃত করি, ক. "কর্মঠ জীবনের পক্ষে শীতই অনুকূল শুনতে পাই, কিন্তু তার জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রাদির বিশেষ দরকার।" খ. "আমার জীবনে সত্যিকারের অবসর এত কম যে স্মৃতিবিলাস দুর্লভ।" এই বাস্তবতায় বিষ্ণু দে যে বুদ্ধদেবের 'ঈর্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক' করে তোলার প্রয়াসের কথা বলেছেন পরম কাঙ্ক্ষিত হলেও দৈনন্দিন জীবনে তা সর্বদা সম্ভব ছিল না।

বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা ছিল আরো অসম্ভব। 'কল্লোল'-এ যে লেখকের 'রজনী হলো উতলা' ছাপা হলে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার বীণাপাণি দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে লেখেন "এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল," যিনি 'নিজের ওপর ছড়া' লিখতে গিয়ে প্রতিপক্ষের জবানীতে নিজেকে 'মেষ' বলে চিহ্নিত করেছেন ('মিটিং ডেকে ঠিক করেছি/ওটা একটা মেষু'), 'Western Influence on Rabindranath'–এর শুরুতে যিনি অন্যের লেখা উদ্ধৃত করার সময় বলে নেন তা এক অতিশয়োক্তি ('exaggeration'), করিমগঞ্জে (সিলেট) প্রদত্ত লিখিত ভাষণে যিনি বলেন, "আমাদের মাতৃভাষাই তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। আজ আমরা যারা লিখছি এবং আমাদের পরে যারা লিখবে, চিরকালের বাঙালি লেখক এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী" এবং যিনি বিদেশী শিক্ষার্থীদের বলেছেন তিনি যে Tagore আবিষ্কার করেছেন তার অর্থ নিজের ও বিশ্বের আবিষ্কার তাঁকেই কিনা রবীন্দ্রবিরোধিতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়।

তবে কি তিনি অতি রাবীন্দ্রিক? না, তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। সে ভাষা আপনার পছন্দ হয় না। আমারই দুর্বলতা, অক্ষমতা। ...আমি কি তাকে ঘোলাটে করে তুলি ইংরেজি ভাষা দিয়ে?" বঙ্কিমচন্দ্র যে মনে করতেন তিনি ইংরেজি অক্ষরে বাংলা লিখেছেন এবং সমকালের সকলের বাংলারই এই বৈশিষ্ট্য[৫] বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের সমকালে এবং এখনও তা কার্যত বর্তমান। বিষ্ণু দে একেই বলেছেন 'বিদেশী পথিক' অথবা 'বর্বর', 'বুঝিনাকো ভাষা যে এদের' (সাধারণ মানুষের)। ফলে 'ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।' একটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী যা বলেছিলেন তাতেও এর স্বরূপ বোঝা যায় : "সুধীনবাবুর লেখা পড়ে আনন্দ পাই কিন্তু কোথায় যেন একটু অভাব থেকে যায়— এই অভাব কেবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়, মনের এবং বিচারশক্তিরও অভাব। ...সঙ্গের cutting পড়ে মনে হল 'পরিচয়ে'র লেখক ইংরেজিতে তাঁদের বিশেষ মনের পরিচয় দিয়েছেন।"[৬]

ফলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেলেও বুদ্ধদেব বসুর ভাষা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সেটা হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক, বুদ্ধদেব বসু নিজেও তা চেয়েছেন। কিন্তু 'রাত ভরে বৃষ্টি' প্রসঙ্গে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মানসী দাশগুপ্ত যে বলেছিলেন,[৭] নয়নাংশু মালতির প্রেমে পড়লেও মালতি প্রকৃতপক্ষে তার প্রেমে পড়েনি, সে প্রেমেরই প্রেমে পড়েছিল তা বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। তার চরিত্ররা সাধারণত ভালবাসারই প্রেমে পড়ে, হয়তো ভালবাসেনা।[৮] বুদ্ধদেব বসুর কাছেও, মনে হয়, জীবনের চেয়ে 'সাহিত্য' বড়ো।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একই ঘটনার দুই বর্ণনা, বাস্তব ও কথাসাহিত্য থেকে। প্রথম উদাহরণ বাস্তবের : "পড়ন্ত বেলায় রৌদ্রপ্লাবিত এসপ্লানেড : কাজ ফেলে সকলেই আজ রাস্তায়— শামলা পরা উকিল-ব্যারিস্টার, আলখাল্লায় খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, পীত বসন, গৈরিক বসন, জনসাধারণ, প্রায় মনে হয় উৎসব, কোনো মিছিল, কিন্তু মিছিল নয়, লোকেরা ছুটছে এলোমেলো, দিগ্বিদিকে, যেন উদভ্রান্ত, কোথায় যাবে, কী করবে, দিশে পাচ্ছে না। ঝাপসা মনে পড়ে নিমতলাঘাটে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলাম একবার, ঢুকতে না পেরে, রাস্তার দিকে বেরুতেও না পেরে, অগত্যা গঙ্গার পাড়ি বেয়ে নেমে নৌকো নিয়ে ময়দানের কাছে নেমেছিলাম এসে আমরা কয়েকজন; বলছি আমরা, কিন্তু অন্যদের বিষয়ে আমার স্মৃতি অস্পষ্ট— শুধু মনে পড়ে অজিত চক্রবর্তীকে, বোধহয় ফিরতে পথে দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে, ব্রিস্টল হোটেলে বসে দু'জনে পান করলাম দু'গ্লাস শেরি অথবা ডেমুর্থ— কেন হঠাৎ চায়ের বদলে সুরা তা বলতে পারবোনা, তখনও আমি অ্যালকোহল সেবনে অভ্যস্ত হইনি— কিন্তু বোধহয় সেইজন্যেই এই দিনটিকে আমার কোনো বিশেষ আচরণের দ্বারা চিহ্নিত করার জন্য।" *(আমাদের কবিতাভবন)*।

অন্যদিকে *তিথিডোর* উপন্যাসে রয়েছে এই বর্ণনা : "মেঘলা হয়ে এলো দিন; চৌরঙ্গীতে আমরা আসতে বৃষ্টি নামলো। কিন্তু এসপ্লানেডে এসে বাস দাঁড়ালো যখন, আবার জ্বলজ্বলে রোদ আর সেই ভিজে নরম আলোয় স্বাতী দেখলো ভিড়ের এক আশ্চর্য আলোড়ন, এসপ্লানেডের পক্ষে আশ্চর্য। স্যুটপরা অফিসচাকুরে, কালোকোর্তা উকিল, ছাতা হাতে আধবুড়ো বাবুরা, ছিপছিপে ছোকরা কেরানি, ইংরেজ, চিন, মাদ্রাজি, পাদ্রি, পার্শি ...সব দিক থেকে সব দিকে আসা যাওয়া করছে সকলে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ঠিক যেন জানে না, একটু দিশেহারা। অফিস ছুটি বলেই সোজা বাড়ি ফিরতে হবে,এই

মুখস্ত কথাটা অনেকেই যেন ভুলে গেছে।" 'সোজা দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউ মিছিমিছি হাঁটছে, কেউ হঠাৎ মনস্থির করে বারকয়েক পা ফেলেই থেমে যাচ্ছে আবার, কেউ কাগজ পড়ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তার ঘাড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়েছে এরা দুতিনজন। এইমাত্র পৌঁছলো কাগজের স্পেশাল, হাতে হাতে উজোড় হয়ে যাচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণদিবসের প্রত্যক্ষ এই বর্ণনা যতটা না বাস্তব, তার চেয়ে বেশি 'সাহিত্যিক।' এমনকি উপন্যাসের চরিত্রের বর্ণনাও লেখক প্রভাবিত। অনভ্যস্ত সুরাপানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও বাস্তব বর্ণনায় লেখক ঘটনাটিকে যেমন বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তেমনি চরিত্রের বর্ণনায় 'উজোড়'-এর মতো শৌখিন ও আহ্লাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বাতন্ত্র্যের এই ঝোঁক লেখককে কখনো কখনো উন্নাসিকও করেছে। প্রথমে 'প্রগতি'র 'মাসিকী' থেকে কয়েকটি উক্তি :

"এরা ভালো লেখেন কি মন্দ— সে আলোচনা করবার আগে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন— রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে এঁদের সাহিত্য বিশিষ্ট।"

"সৌভাগ্যবশত, অতি-আধুনিকেরা অন্ধ রবীন্দ্রমোহ থেকে মুক্ত। ...রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর তুল্য আরো কবির আর্বিভাব তখনি সম্ভব হবে, যখন বাঙলা কবিতার সুর রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হবে। অতি আধুনিকদের কাব্যে এই স্বাতন্ত্র্যতা আছে এবং এটি খুব শুভ লক্ষণ। তাঁদের নিজেদের একটি বক্তব্য বিষয় আছে এবং সে কথা বলবার জন্যে প্রত্যেকে এক একটি আলাদা আলাদা ভঙ্গিও খুঁজে পেয়েছেন। কবিতার technique ও মনের attitude-এ এই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে।"

'যুগ-প্রবর্তক কে জানিনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে বাঙলা সাহিত্যে এসে গিয়েছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করতে ইচ্ছে করেনা।'

কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-পরবর্তী স্পষ্ট প্রতিনিধি, যিনি তাঁরই ভাষায় কবিতার technique ও মনের attitude-এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেই নজরুলকে। ব্যক্তিত্ব হিসেবে 'বর্ণাঢ্য' বলেও যে কবি হিসেবে 'প্রতিভাবান বালক'-এর অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারেননি তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয় এবং তিনি সাহিত্যিক উন্নাসিকতার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েন। অত্যন্ত ভ্রান্ত ও অন্যায়ভাবে তিনি বলেন, 'পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলোতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একইরকম।

অতএব রবীন্দ্রনাথ নজরুলের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে ও চিহ্নিত করতে পারলেও[৯] বুদ্ধদেব বসু তা পারেননি। ফলে দৃষ্টিভঙ্গিবিচ্যুত হয়ে কবির ভাষাগ্রহণও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেকারণে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াসও কখনো কখনো পথচ্যুত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব যে বলেছিলেন "Rabindranath's works are European Literature written in the Bengali Language " বিচ্ছিন্নতার অর্থে সেটা তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দুই

পূর্বোক্ত 'বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে পত্রাবলী'র একটি চিঠিতে ১৯৩৮-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং থেকে পূর্বোক্ত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু,

বিষ্ণু দে-কে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মুস্কিলই এই যে যাঁরা তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত শ্রদ্ধাবান তাদেরই তিনি ভুল বোঝেন।"[১০] সংবাদপত্রের প্রভাব অথবা প্ররোচনায় কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বুদ্ধদেব বলেছিলেন বলে যে, রটনা রটেছিল The age of Rabindranath is over তা কবিকে যথেষ্ট আহত করেছিল বলেই মনে হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি যে, 'সময়হারা' কবিতা লেখেন তাতে ত বটেই, ঐ কবিতাটি যে *কাব্যগ্রন্থে (আকাশপ্রদীপ)* সংকলিত হয়েছিল তার উৎসর্গপত্রেও এর স্বাক্ষর রয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি যা লেখেন তাতে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি তাঁর অভিমান মোটেও গোপন থাকেনি। "বয়সে তোমাকে অনেকদূর পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে—এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয় বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।"

এখন দেখা যাক 'সময়হারা'য় কবি কী বলেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে :

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো সারী নেই,

তারপর কবি বলেছেন :

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ায় শূন্য বেলায় কাটাই খেয়াল গড়ে।

তারও পরে কবির ভাবনা :

সময় গেছে তারই,
সন্দেহ আর নেইকো একেবারেই।
সময় আমার গিয়েছে তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই,
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল, ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে।

অতঃপর কবির উপলব্ধি :

বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল পাঁজি-ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।

কবিতার অন্তিম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন "নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র" তখন নবীনের কাছে প্রবীণের আর্তি বেদনাঘন হয়ে ওঠে। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে তা হয় আরো বেদনাবিধুর :

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সমহারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

এই দ্বন্দ্বদীর্ণ সম্পর্ক একটি পরিণতি বুঝি পায় 'কবিতা'র রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে। কবির জীবদ্দশায় এই তাঁর শেষ জন্মদিন। তারও দীর্ঘদিন পর ১৯৪৪-এ

'কবিতা'য়ই জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী'র সমালোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন, "রবীন্দ্রনাথ পুনরুক্তির সম্রাট, কিন্তু তাঁর প্রতিটি পুনরুক্তি একটি নূতন সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্যে সেগুলি পুনরুক্তি বলেই মনে হয় না।" কিন্তু এ কথার আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি কবির জীবদ্দশায়, 'কবিতা'র ১৩৪৮-এর পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যায় কবির শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থ *রোগশয্যায়* ও *আরোগ্যর* সমালোচনা করতে গিয়ে বলছেন, "পৃথিবীকে ভালবাসেন, প্রকৃতিকে ভালবাসেন, মানুষকে ভালবাসেন, এ কথা কতবার কত রকম করে বললেন, তবু বলা ফুরুলোনা। কী করে ফুরুবে?...মানুষ নিজে প্রেমে পড়লে যেমন অন্যের লেখা প্রেমের কবিতা যথেষ্ট বলে মনে হয় না, তেমনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিদিন তাঁর নিজের রচনাই মনে হয় অসম্পূর্ণ, নতুন করে আবার বলেন, 'তোমাকে ভালবাসি।' এই পৃথিবী থেকে ছন্দে গানে তিনি বিদায় নিচ্ছেন 'পূরবী' লেখবার সময় থেকে–বিদায়ের শেষ কি আজও বলা হলো! প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায় নেবার মতোই দীর্ঘ করুণ মধুর সুন্দর এ বিদায়। আজ তিনি প্রস্তুত, তবু বেলা শেষের ম্লান আলোতেও নির্নিমেষ নয়নে দেখতেন প্রিয়তমার মুখশ্রী। সেই চির পুরনো যে এখনো এত নতুন তা কি তিনিই জানতেন!"

বুদ্ধদেবের প্রতি অভিমানহত হয়ে যতই তিনি 'সময়হারা' কবিতা লিখুন, অন্তিম যাত্রার সময় আমরা কবির কণ্ঠে শুনি নির্মোহ ও নিষ্কম্প উচ্চারণ :

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্যৎ জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

দৈনন্দিনতার গ্লানি ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন চিরন্তন। 'কবিতা'র এই সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুও যখন 'রবীন্দ্রনাথের গান' নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন তাঁর মধ্যেও নির্মোহ মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। এই প্রবন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য 'সঙ্গীতের কাজ করিয়ে নিয়েছেন ভাষাকে দিয়ে, এত বড়ো শিল্পী তিনি' রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকে অনেকটাই শনাক্ত করেছে। তাঁর গানের শক্তিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে এটি যে 'অনুবাদের অগ্নিস্নান পর্যন্ত সহ্য করতে পারে' সেকথা জানিয়েও তাঁর অন্তিম মন্তব্যে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের মূল বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রকৃত গুরুত্বে তুলে ধরেন :

'তবে বাংলা না জানলে, বাংলা না পড়লে রবীন্দ্রনাথের কিছুই পড়া হয় না।'

তিন

বুদ্ধদেব বসু 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র সঙ্গে একসময় যুক্ত হয়েছিলেন। সেময় তিনি 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রদত্ত উদাহরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের শেষ করি। একবার একটি কলেজের ছাত্র আমাকে বলছিল, 'হিটলারের আমলে জার্মানির কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা তো দেখছেন। আমাদের দেশে এইরকমই দরকার।' আমি তাকে বললুম, 'ওরা আইনস্টাইনকে তাড়িয়েছে–।' সে বাঁধা দিয়ে

বললে, জ্যুরা ভয়ানক খারাপ লোক, তাদের তাড়ানোই উচিত।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা ধরো আমাদের স্বদেশী হিটলার যদি রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে চান তুমি তাতে রাজি আছো?' সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয়ই তবে তাড়াতে হবে।' আমি বললুম, 'যে উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয় সে উন্নতি আমি চাইনা, কারণ মনে মনে আমি নিশ্চয়ই জানি যে সেটা উন্নতি নয়, ঘোর অবনতি। এই কথাই আমার শেষ কথা।"

কিন্তু ফ্যাসিস্ত শক্তির এই দানবীয় উত্থান ও অবস্থান অকারণ নয়, তারও পটভূমি রয়েছে। এই প্রবন্ধেই স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর পর্যবেক্ষণ ও স্বীকারোক্তি; একদিকে গান্ধীর লবণ আন্দোলন, অন্যদিকে 'বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-মন্দা।' কী অসম্ভব সস্তা সমস্ত পণ্য, অথচ দেশব্যাপী দারুণ অনটনের হাহাকার।' 'নিজের জীবনে উপলব্ধি করলুম কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকের মূল্য। সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের তার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় কি না হয়। কোনো কোনো দিকে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল, মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে এই প্রথম সচেতন হলুম।' সেই সঙ্গে তিনি দেখলেন মহাযুদ্ধের আরম্ভ। '...সম্পূর্ণ হলো জর্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়।' অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, 'একটা সুসভ্য উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম পরে বীভৎস মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘষছে। জার্মানীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁদের নামে জগতের কাছে জার্মানির পরিচয়, নাৎসিশাসন সদ্য ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণের মত তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত— এ দৃশ্য যখন দেখলুম আধুনিক জার্মানির দুই মহামানব— আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড–তাঁদের মধ্যে একজন হলেন চৌর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওয়ালা ঘেরাও হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন; যখন দেখলুম জর্মানির সব বড়ো বড়ো লেখক শিল্পী নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী, তখন কানে এলো ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধিকার হরণের ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলাফেরায়, আচারে-ব্যবহারে, চিন্তায়-রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হলো তখন বুঝলুম পৃথিবীতে বড়ো রকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তাঁর প্রমাণের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহযুদ্ধ। এই স্পেনের গৃহযুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো, বোঝা গেলো পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশী জাতির উপরেই অত্যাচার চলে তা নয়, স্বজাতিকের রক্তস্রোতে ভাসানো হয়; শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের 'উন্নতি' সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ মানেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।"

কিন্তু এই উপলব্ধি সত্ত্বেও যেহেতু তিনি সাংস্কৃতিক অর্থেও 'রাজনীতি' বিমুখ এবং মনে করেন যা কিছু পবিত্র তা-ই ব্যক্তিগত[১১] সেহেতু সীমাবদ্ধ ঐ দৃষ্টিকোণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। রবীন্দ্র-সংখ্যা 'কবিতা'র সম্পাদকীয়তে তিনি 'পূর্ববঙ্গীয় জেদে'র কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সেই জেদ যতোটা 'সাহিত্যিক' ও উন্নাসিক ততটা জীবনের প্রতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের গান অবশ্যই ব্যক্তিগত রচনা কিন্তু তা সম্পূর্ণই ব্যক্তিক বা

ব্যক্তিগত নয়। অন্তত তাঁর স্বদেশী পর্যায়ের গানগুলোতে সমষ্টি মানুষ তাঁদের ভাবনাই মূলত প্রতিফলিত। যে আইনস্টাইনের কথা তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন সেই বিজ্ঞানীও নিজেকে সামষ্টিক মানুষ ও সমাজের সৃষ্টি বলে গণ্য করতেন। নেহাতই 'বিজ্ঞানী' হলে তিনি হয়তো হিটলারের অতোটা রোষের শিকার হতেন না। স্বদেশ ও বিশ্বের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব বসুর চোখ খুললেও 'স্বাভাবিক' অবস্থায় তিনি তাঁর 'সাহিত্যিক' বিশ্বাস ও কর্মকেই আঁকড়ে ছিলেন। ভাবেননি, বিশেষ পরিস্থিতিততে তীব্র ও চূড়ান্ত হয়ে উঠলেও শ্রেণী ও স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীরা অন্য সময়ও অকার্যকর কিংবা নিষ্ক্রিয় থাকে না।

তাঁর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বারবার তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নিজ গণ্ডীতে বৃত্তাবদ্ধ থাকার কারণে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষাও প্রকৃত অর্থে তার গন্তব্যে পৌছুতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু তিনি আজীবন শিল্পের চর্চা করেছেন সেহেতু যারা 'অর্ধনগ্ন', 'খাদ্যহীন', 'খাদ্যের কাঙাল' তাদের আত্মীয় হতে না পারলেও সেই বিষয়ের ভাবনা থেকেও রেহাই পাননি। ফলে নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমকারী রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাঁকে বারবার যেতে হয়েছে। অতএব রবীন্দ্র-বিমুখতার কাল হিসেবে যা চিহ্নিত সেই 'বন্দীর বন্দনা' পর্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'কুমারীর প্রথম প্রেমিক।' আর রবীন্দ্র-মৃত্যু-উত্তর কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪২-এ প্রকাশিত *বাইশে শ্রাবণ*-এ সংকলিত এবং কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রথম জন্মদিনে লেখা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তিনি বলেন :

তোমারে স্মরণ করি এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম।

অতএব বিমুখতা ও ভালবাসার ঋদ্ধ এই সম্পর্ক উত্তরপ্রজন্মের জন্যে ভাবনার অনেক খোরাক জোগাতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. *আমাদের ২০২/ অ্যালবাম থেকে কয়েকজন;* কোলকাতা তথ্যসূত্রের গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রকাশস্থান কোলকাতা
২. *তাঁকে চেনা এক কঠিন মানসযাত্রা*, বিষ্ণু দে, দেশ, ১৪ ভাদ্র, ১৩৮৭
৩. *আমাদের কবিতাভবন*
৪. বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে পত্রাবলী, দেশ, ৩১ ভাদ্র, ১৩৯৬
৫. *কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, গোমেন্দ্র বসু সম্পাদিত*
৬. *কবির চিঠি কবিকে*, ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৯, দেশ, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৯৮
৭. *সেইসব দিন, সাক্ষীর আত্মকথা অহর্নিশ*, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা
৮. এতে লেখকেরও সমর্থন রয়েছে। *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে'র প্রাথমিক অংশ : 'মনে হয়–আর কাছে নয়/ভালবাসি ভালবাসারেই।/যে ভালবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু— /তীব্র মত্ত আমার হৃদয়। আত্মহারা আমার হৃদয়।
৯. বসন্ত নাটিকা উৎসর্গ প্রসঙ্গে সমকালীন ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়ার জবাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মর্তব্য
১০ এই অভিযোগ অবশ্য বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। স্বয়ং জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী দত্তের সাক্ষ্য : "সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা একবার একটা নাটক করেছিলেন, যেটা আমি বাবা-মার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম। পরদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগলো আমাদের নাটক?' আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, 'খুব খারাপ'। ঘরে ঢুকে বাবা তখন একটা গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর সুভাষ চলে গেলে আমাকে বললেন— লোকের মুখের উপর প্রশংসা

করা যায়, নিন্দে নয়। অথচ বাবা যে নিজের জীবনে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তা নয়। মেজাজ খারাপ থাকলে এবং যখন তাঁর যে মত তার বিরুদ্ধে কিছু বললে রীতিমতো ক্রুদ্ধস্বর।”

'আমাদের ২০২', *পূর্বোক্ত*

পূর্বোক্ত 'পত্রাবলী'র একটিতে বিষ্ণু দে'র উক্তি, “চঞ্চলের কাছে শুনলুম আপনি আমাকে maliceগ্রস্ত বলেছেন। আশা করি, সেটা কথার কথা। প্রথমত আপনার সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুত্বে যে malice-এর অভাব প্রমাণিত, তা আপনি হঠাৎ একটিমাত্র নগণ্য সমালোচনায় অস্বীকার করবেন, এটা বিশ্বাস্য নয়, কি বলুন? তাছাড়া বিরুদ্ধ সমালোচনা malice জাত, তা মানলে আপনিই বা কি করে এতোদিন ধরে আমাদের সমালোচনা করলেন, তা বোঝা শক্ত। ...এমনকি আপনি যে কাউকে কাউকে কম্যুনিস্ট আখ্যায় অকারণে শোভিত করে তাদের বিপন্ন করেছেন, তাও maliceজাত কারণে তা কি কেউ বলেছে?”

১১. স্মর্তব্য *পূর্বোক্ত* 'রবীন্দ্রনাথের গান'-এর একটি উক্তি : “গান তাঁর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট সৃষ্টি।” এখানে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি লক্ষণীয়।

কালের সম্পাদক, বুদ্ধদেব বসু ও কিছু প্রশ্ন

শামীম রেজা

“সৃষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্ত হইতে সহস্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।”[১]. রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির প্রতিফলন অর্থাৎ সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যকে যারা সহস্রভাবে চিহ্নিত করে সাধক পাঠক ও সাধারণ পাঠককুলে নব নব রস ও চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, তাদেরকে কোন ধরনের স্রষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করবো? দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক, সমালোচক, নাকি অন্য কোন অভিধায়। আমাদের সাহিত্য সমালোচনা, কিংবা দর্শনচর্চার ইতিহাসে পরম্পরা নেই, এ অভিযোগ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও পাই। এই কথা মাথায় রেখে আজ এমন একজন কবি, নাট্যকার ও কথাকারের প্রবন্ধের সঙ্কলন নিয়ে আলোচনায় বসেছি, যিনি রুচির সমগ্রতায় কালের সম্পাদক হিসাবে বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে। তিনি বুদ্ধদেব বসু; যাঁর প্রবন্ধের সঙ্কলন ‘কালের পুতুলে’র প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪৬। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন “গ্রন্থটির প্রুফ দেখার সময় আবিষ্কার করেছি (খবরটি অবশ্য আমার কাছে নতুন নয়) যে বারো বছর আগে যে আমি ছিলাম এখন আর সে আমি নেই। ফলত, প্রবন্ধগুলোর বক্তব্যসুদ্ধ বদলে দিতে মাঝে মাঝে লুব্ধ হয়েছি; তা থেকে বিরত হয়েছি এই ভেবে যে, বেঁচে থাকলে হয়তো দশ বছর আবার এমনি পরিবর্তনের স্পৃহা জাগবে। অতএব আমার সংস্কারকর্ম ভাষাগত পরিশোধন ছাড়িয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি এবং ভাষাসংস্কারেও লক্ষ রেখেছি যাতে আমার তৎকালীন রচনারীতি অত্যধিক ব্যাহত না হয়।”[২].- এ কথা সত্যি এখানে সৃজনশীল প্রবন্ধ (Creative essay), ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা জার্নাল (a written record of the things you do, see, etc. every day :) ও (প্রায়) গবেষণা প্রবন্ধ মানের মোট ২৫টি লেখা স্থান পেয়েছে ১৪৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে।

আজকে যখন ‘কালের পুতুল’ নামক এমন বৈচিত্র্যময় সঙ্কলন গ্রন্থের আলোচনা করতে বসেছি, তখন বাঙালির ভাবনা কীর্তিতেও নতুন সংযোগ ঘটেছে। যা বিশ্বের দরবারে সম্মানিত ও আদৃত হয়ে শুধু ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেই নয় সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে, এমন চিন্তা যা সাব অল্টার্ন বা ‘নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাসের’ তত্ত্ব হিসাবে স্থান পেয়েছে আমাদের চিন্তাজগতে। যার সঙ্গে দেরিদার বিনির্মাণেরও যোগ বা সম্পর্ক আছে। এমন চিন্তা অভিজ্ঞানকে সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন, হোমিভাবা মুম্বাইয়ে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক কলকাতায় ও ঙগো ভন ডঙ কেনিয়ায়। যদিও কলোনির মুক্তির পরেও বহুকাল অব্দি বেঁচেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তবু তিনি বাখতিন কিংবা, উপনিবেশউত্তর সাহিত্য তত্ত্ব দিয়ে কলোনিতে বেড়ে ওঠা জীবনানন্দ দাশকে কিংবা কাজী নজরুল

ইসলামকে কিংবা তাদের সাহিত্যকে আলোচনা করেননি, যা করার কথাও নয়; এই 'কথাও নয়' কথার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন করা যায়, যে বুদ্ধদেব ইউরোমনস্ক, তিনি সাহিত্য সমালাচনার রীতি ধারা সম্পর্কে বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে জানবেন না তাতো হয় না!। "এক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কিন্তু এই আপাত দুর্বলতাই তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর রচনার প্রধানতম আকর্ষণ।"[৩] তবে বুদ্ধদেব বসুর এই সঙ্কলন নিয়ে বিশ্লেষণ করার পূর্বে আমার মনোযোগ ছিল তিনি কি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সৃজনশীলতাকে বিচার করেছেন– বিশেষ করে কবি ও কবিতাকে। প্রাবন্ধিকের কোন বিশেষ লক্ষণকেই তিনি মানেননি, তত্ত্ব, যুক্তি ও বিশ্লেষণ দিয়ে কোনো গ্রহণ বর্জন তিনি করেননি, তারপরও তার ব্যক্তিগত কবিতা অভিরুচির প্রতি প্রশ্ন জাগে–

(ক) ইউরোপের চোখ দিয়ে আমাদের কবিদের বিবেচনা করেছেন কি তিনি?

(খ) মার্কসবাদী (পশ্চিম থেকে আসা প্রথম কোন উত্তম ফসল) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন কি কবি ও কবিতাকে?

(গ) জাতীয়তাবাদ যা কলোনির বিরোধী হলেও বেড়ে ওঠা তার ইউরোকেন্দ্রিক মেটান্যারেটিভ অভিজ্ঞান থেকে– এই দিক দিয়ে কি বিবেচনা করেছেন বুদ্ধদেব।

(ঘ) প্রাচ্যের নন্দনতাত্ত্বিক সেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের ধারাবাহিকতার নতুন কোন ধরন বা ধাপ নির্মাণ করে কী এই আলোচনায় এগিয়েছেন তিনি।

(ঙ) নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৎকালীন সময়ে 'ভাববাদ' ও 'বস্তুবাদী' মতবাদকে মাথায় রেখে তিনি বিচার করেছেন তার কালের লেখকদের, যারা তাঁকেও তার পত্রিকা 'কবিতা'কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিলেন।

(চ) শুধু 'শিল্পের জন্য শিল্প'– এই দর্শনের মধ্যে আটকে থেকেছেন?

এই প্রশ্নগুলো সামনে রেখে আগানো যাক, বুদ্ধদেব বসুর ২৫টি ব্যক্তিক চিন্তার রচনার দিকে। বিভাজন রেখা আঁকার পূর্বে যারা দুকলম পদ্য কিংবা কাহিনী লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের প্রতি বুদ্ধদেবের পরিষ্কার বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় নেই, "যে কোনো লেখকের বিষয়ে বিবেচনা করতে হলে তাঁর উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের কথাও বলতে হয়; কেননা দৈবক্রমে দুটি একটি সদগ্রন্থ লিখে ফেলা যায়, কিন্তু একজন লেখকের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্যও যখন দেখা যায় তখনই তিনি বড় লেখক হিসাবে গ্রাহ্য। সৃষ্টির প্রেরণা যেখানে সত্য, অজস্রতা সেখানে অবশ্যম্ভাবী না হোক, অবিরল।"[৪]

লেখার ইস্কুল, কালের পুতুল এই প্রবন্ধ দুটিকে সৃজনশীল প্রবন্ধ শাখায় বিবেচনায় নিলে দেখতে পাব, এই সময়ে তরুণ লেখকদের প্রতি এই উপদেশ বাক্য চিরকালীন সত্য, আজকে দেখছি, দু'কলম লিখেই এমন পোড়ো দেশে খ্যাতির লোভে মিডিয়ায় মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ানো তরুণদের আস্ফালন। এটা দোষের নয়, তবে বই পড়াটা যেন, বিশেষ করে কবিদের জন্য নয় এটা চালু আছে এখানের বর্তমান কবি-লেখকদের মধ্যে। আকাশ থেকে ওহি আসবে আর তারা হেরা গুহায় বসে প্রাপ্ত বাণী লিখে ফেলবেন, আর তৈরি হবে যেন এক-একখানা আসমানি কিতাব। আসলে আকাশ বলতে যে কিছু নেই, এই তথ্যটুকু জানতেও নারাজ এরা। ফলে বই কেনা শব্দটি বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিতে নেই বললেই চলে। কারণ দুটো

মনে রাখার চিত্রকল্প কিংবা একটা প্রবন্ধ যে লেখক বা কবি লিখে উঠতে পারেননি, তিনি গালাগাল করেন সমালোচকদের। গালমন্দ করেন অধ্যাপক বা সমালোচকরাতো সৃজনশীল না, বক্তব্য হলো এসব কবি নামধারীদের একজন প্রাজ্ঞ-পাঠক, সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য উত্তম। তাই লেখকের লেখার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের কথাও সমান্তরাল আলোচনার বিষয়। দৈবক্রমে একটি সদগ্রন্থ লেখা সম্ভব হলেও এরপর ক্রমোন্নতিকালপর্বে তাকে বিশ্বসাহিত্য আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সংযোজন না করলে, যে কোনভাবেই মহাকালতো দূর হস্ত কালেই ফুরিয়ে যাবেন, সে কথা এদেরকে দিব্যি কেটে কে বোঝাবে। এবার এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর কথা শোনা যাক– "এ বিষয়ে আমাদের দেশে মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত মত শোনা যায়। অনেকের মুখে শুনেছি অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে হয়েছে, কেননা গায়ে পড়ে যারা উপদেশ দেন তাঁদের উৎসাহ অদম্য– বেশি লেখা খারাপ, তাতে লেখা খারাপ হয়। কিন্তু এমন ক'জন লেখকের নাম আমরা মনে আনতে পারি, যাঁদের রচনাবলী পরিমাণে প্রচুর নয়? শেলি তিরিশ তাঁর কিটস ছাব্বিশ বছরের জীবনে এত লেখার সময় কখন পেয়েছিলেন তা ভেবে অবাক হওয়া অন্যায় হয় না। কোনো কোনো 'বাজে' লেখক ও যে বেশি লেখেন তাতেও অবাক হবার কিছু নেই; লেখা যার খারাপ, তিনি যতবারই একটি বই লিখবেন ততবারই খারাপ বই লিখবেন, এ তো সোজা কথা।"[৫]

এই কথা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তাই আজকের তরুণদের যারা লিখতে এসেছেন, তাদের জন্য বলে রাখা ভালো যে, 'বাজে' লেখা চিহ্নিত করতে হলেও তো চাই মগ্ন-পাঠ। আর পাঠ ছাড়া অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন করবে কিভাবে, পাঠককে নতুন রসের সন্ধান দিতে হলে তো তলস্তয়ের মত বলতে হবে, লেখক হতে হলে একমাত্র উপায় 'গ্রন্থপাঠ-গ্রন্থপাঠ-গ্রন্থপাঠ।' আমাদের কবি বন্ধুরা অর্থাৎ একটা সময়কালকে যদি ২৫-৩০ বছর হিসাবে ধরি, তাহলে দেখতে পাবো লিখছেন এই পর্বে ছয় শত জন নিয়মিত-অনিয়মিত। কিন্তু ক'জনের কথা মানুষ মনে রাখবে? কী কী কারণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মনে রাখবে একজন সৃজনশীল কিংবা নন্দনতান্ত্রিক লেখককে? সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। একটা বাগানে বিভিন্ন রকম ফুল ফোটে, কোন একটা বা বিশেষ ক'টা ফুল মানুষের নজর কাড়ে, ঘ্রাণ ছড়ায়, কিন্তু কত আগাছার কিংবা অপুষ্টিতে ভোগা গাছওতো ঐ বাগানে থাকে, তা না হলে বাগান হবে না। আমরা অবশ্য সাংস্কৃতিকভাবেই গ্রন্থবিমুখ জাতিতে পরিণত হচ্ছি, তা না হলে একখানা ভালো গ্রন্থ প্রকাশ পেলে তার বিক্রি সংখ্যা সারা বছরে সর্বোচ্চ পাঁচশত কপি হবে কেন? জনসংখ্যা যেখানে ১৫ কোটির উর্ধ্বে। এর কারণ শুধু রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নই নয়, আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করার প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার অভাব। সংস্কৃতি দু'চার বছরে বদলে ফেলা যায় না, এটা শত বছরের প্রবহমান ধারার ফসল। কিন্তু ঐতিহ্য নির্মাণ করা যায়, এবং তা করতে পারেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বরাই।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর একটি ঘটনা ঘটেছে, এখানকার প্রধান লেখকরা বিশেষ করে কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, হাসান আজিজুল হক কিংবা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখার পরিমাণ এতই কম যে, ঐতিহ্য দাঁড়িয়েছে বেশি লিখলে রুগ্‌ণ সাহিত্যের জন্ম হবে, তরুণদের মধ্যেও এই প্রবণতা কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। এই প্রসঙ্গে আবার বলা প্রয়োজন "...জনপ্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখাও আমাদের

অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও এটাও দেখি যে প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় লেখকেরই কালক্রমে পাঠকসংখ্যা বেড়ে চলে।"[৬]

'জনপ্রিয়' সাহিত্য সম্পর্কে 'সমারসেট মম'-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃতি করেছেন বুদ্ধদেব এইভাবে "আমরা যখন বলি যে অমুক বইটি এতই ভালো যে এ যুগে এর আদর হবে না, হবে ভবিষ্যতে, এবং এ মতের সমর্থনে দু-একটা বিখ্যাত নজির দেখাই, তখন আমরা ভুলে থাকি যে এমন কত হাজার বই লেখা হয়েছে, বর্তমান যাদের গ্রহণ করেনি, এবং ভবিষ্যৎ তাদের কবর দিয়েছে। বর্তমানে উপেক্ষিত হলে ভবিষ্যতে সম্মানিত হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই"[৭]। ... আমরা সাধারণত বলি যে বড় লেখক ভবিষ্যতের জন্য লেখেন। কথাটা এ হিসাবে সত্য যে বড় লেখকের দৃষ্টি এত দূরে প্রসারিত যে তাঁর স্বকালের বহুযুগ পরেও তাঁর লেখা মূল্যহীন হয়ে পড়ে না। অনেক সময় তাঁর মধ্যে আমরা ভবিষ্যতের অগ্রদূতকে দেখতে পাই, অবশ্য তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেও তা প্রমাণিত হতে পারে।

এমনও তো ঘটেছে কয়েকশত বছর পর একজন ফিটজেরাল্ট ওমর খৈয়ামকে আবিষ্কার করেছেন পিরামিডের ভিতর রাখা গুপ্তধনের মত। এসব ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।

বুদ্ধদেব বসুর আলোচ্য সৃজনশীল প্রবন্ধ দুটি আলোচনা করতে করতে আরো যে প্রশ্নগুলো মাথায় এসে হাজির হয়, তা হলো তৎকালীন বাংলা, ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল তখন। 'শিল্পের জন্য শিল্প' প্রশ্নটি যে প্রেক্ষাপটে ইউরোপে এসেছিল তার মধ্যে কি 'জীবন' বাদ দিয়ে শিল্পী তাঁর মানস গঠন করেছেন তাদের শিল্পে? নাকি শিল্পকে সস্তা জনপ্রিয়তা ও আনাড়িদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে শিল্প সেলফে স্থায়ী আসন গেড়েছে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে কিছু নমুনা প্রতিস্থাপন করলে দেখতে পাবো তার 'লেখার ইস্কুল' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে, আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখা সম্ভবত এই সময়ের কাছাকাছি। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী– "আমাদের সাহিত্যরচনা, আমাদের সাহিত্যবিচারের প্রচেষ্টা নিয়ে কাল যে বিচিত্র নৃত্যের আয়োজন করে, তার মতো নিশ্চিত, তার মতো অনিশ্চিত আর কিছু নয়। সে কথা ভেবেই এ বইয়ের আমি নাম দিয়েছি *কালের পুতুল*। এই প্রবন্ধগুলির প্রথম রচনাকাল আর গ্রন্থকারে তাদের প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান মাত্রই পাঁচ-দশ বছরের, ..."[৮]

তাহলে জীবনানন্দের যখন ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* প্রকাশিত হয় ঠিক তার পরপরই একই বছরে তার পত্রিকায় 'জীবননানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি' শিরোনামে লেখাটি লেখেন বুদ্ধদেব। এ বছরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুল নাচের ইতিকথা* লিখিত হয়। এদিকে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সিংহাসন থেকে যুক্তরাজ্যের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রস্থান। চিলিতে সামরিক শাসন জারি হয়েছে এই বছরেই। আমরা যদি ১৯৩৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই ভূ-খণ্ড ও বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো, বুদ্ধদেবের লেখায়, কী প্রবন্ধে, কী 'সৃজনশীল' লেখায় এসবের প্রতিফলন বা প্রভাব খুব একটা পড়েনি, এমন কী বলা চলে দৃষ্টি রাখতে চাননি, এসবের ওপর তিনি। কিন্তু তিনি তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের মত কঠিন এক বাস্তবের ভিতর থেকে বেড়ে উঠেছেন, প্রতিনিধিত্ব করেছেন শিল্প-সাহিত্যের, দেশ থেকে দেশান্তরে। ১৯৩৯ সালে জার্মানির চেক ও

পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। পরের বছরই জার্মানির প্যারিস দখল ১৯৪০; এই বছরেই লেখা বিপ্লবী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক’, তিনি এই বইয়ের প্রকাশ হওয়ামাত্র আলোচনাও করেন, সেখানেও তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হতে হবে, নয়তো কবি।”[৯] এই সময়ে হেমিংওয়ের ‘ফর হুম দ্য বেল টোলস’-এর প্রকাশ, আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চার্চিলের শপথ গ্রহণ এ বছরেই। ১৯৪৫, ‘দ্য রোডস টু ফ্রিডম’ লেখেন জ্যাঁ পল সার্ত্রে, মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্র বসুর ভারত স্বাধীন আন্দোলন, হিটলারের আত্মহত্যা, হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ। ১৯৪৮ জ্যাঁ পল সার্ত্রে যখন লেখেন ‘হোয়াট ইজ লিটারেচার’ তখন বুদ্ধদেব আত্মমগ্ন হয়ে লেখেন *দ্রৌপদীর শাড়ি*, কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৯ সালে আর্জেন্টিনার লেখক হোর্হে লুই বোর্হেস লেখেন ‘দি আলেফ’, সিমন দ্য বুভ্যয়র লেখেন ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ তখন বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন *তিথিডোর* উপন্যাস।

এ রকম তথ্যচিত্র দিয়ে ভরে ফেলা যাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি ‘সমারসেট মম’ যাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– সেখানে তিনি তৃতীয় বিশ্বের এমন কোন সমমনা লেখকের খোঁজ পাননি যাদের উদাহরণ দেওয়া যায়? যেমন দেখুন আমাদের এই সময়ে আমরা পাশ্চাত্যের সাদাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আবার গর্তে ঢুকে পড়েছি আমেরিকা ও ইউরোপের মিডিয়ার উপনিবেশের মধ্যে, অপরদিকে মানসিক উপনিবেশ গাড়ছে বিশেষ করে সাহিত্যে লাতিন ও আফ্রিকা। সবার কাছ থেকে ভালোটুকু চাই সত্যি, তবে একথাও সত্যি আমরা খোঁজ নিচ্ছি না একজন চাকমা তাদের ভাষায় কী ভাবছেন, কিংবা পাশের একজন অহমিয়া উড়িয়াদের ভাষায় নতুন কী চিন্তা– নতুন কী লেখা তৈরি হচ্ছে, নেপালি কিংবা মালে কিংবা তামিল বা লংকান সাহিত্যে নতুন কিছু ঘটছে কী-না। বুদ্ধদেব বসুও আমাদের মত এড়াতে পাড়েন না এ সব প্রশ্নের।

ভারতের এমন উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থার সময়ে একজন প্রাজ্ঞ সম্পাদক, কবি, কথাসাহিত্যিক কীভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক’ আলোচনায় শুধু এক লাইনে একটি কবিতার প্রশংসা করেন ‘... এর বিষয় ভারতের ইতিহাসের পালাবদল; কথা খরচ হয়েছে কম, অথচ সব কথাই আছে।’[১০] তাঁর সামনে ততদিনে মায়াকোভস্কিদের কবিতা এসে পৌছায়নি তা বলা মুশকিল যেমন, তেমনি সাম্যবাদ নিয়ে তর্ক হয়নি তাও তো নয়। বিষ্ণু দে, সমর সেন নিয়ে তিনিই তো আলোচনা করেছেন, সেখানেও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এমন দর্শনলব্ধ জ্ঞানের কথা। দর্শন কবিতা নয়, জ্ঞান কবিতা নয়, কবিতাই নতুন দর্শন দান করতে পারে, তবে সমকাল কবি হৃদয় ও কবিতায় ছাপ ফেলবে না তা কেমন করে হয়? উপনিবেশ উচ্ছেদের যে ‘সাম্যবাদ’ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে তার তেমন আঁচ নেই প্রবন্ধ সমালোচনায়। সমর সেনের কয়েকটি কবিতার আলোচনায় তিনি লেখেন “... সৌন্দর্যের উপলব্ধি পথে যে বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণী স্বার্থের বিরোধ।”[১১] এরপরই তিনি বলেন, “আশা করি সমর সেনের বলবার কথা এ রকম নয় যে মানবসমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার অধীন বলে কবি তাঁর নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। মুষ্টিমেয় প্রতাপশালীর দ্বারা বৃহৎ সমাজের শোষণ পৃথিবীতে কিছু নতুন ঘটনা নয়; মধ্যযুগে তার রূপ হয়তো আরো ভয়াবহই ছিলো। কিন্তু প্রায় সকল যুগেই এমন কবির উদ্ভব হয়েছে, যিনি জীবনের সমগ্র ও

চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন; স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তাহলেও এ কথা সত্য যে, কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি; সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্ত মাংসকে গড়ে তোলে।"[১২]

এই কথাগুলোর মধ্যে অনেক প্রশ্ন জন্ম দেয় প্রথমত মধ্যযুগে আগ্রাসন ভয়াবহ ছিল বলে বর্তমানকে মেনে নেয়া? দ্বিতীয়ত, স্থানিক ও সাময়িক ঘটনায় কবি যেন আবদ্ধ না হন, স্থানিক ঘটনার মধ্য থেকেই তো কবিকে বৈশ্বিক হতে হবে নয় কি? জীবনের সমগ্রতা ও চিরন্তন মূল্যবোধকে ধরতে হবে এবং তৃতীয়ত, শুধু অচেতনভাবেই কি কবিতা ধরা দেয়? নাকি চেতন-অচেতনের যে জায়গা, সেখানে তার সমকালীন অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস, পুরাণ ও ঐতিহ্যের অভিঘাতের সংমিশ্রণ ছাড়া কীভাবে পরবর্তীকালের দ্রষ্টা হবেন একজন কবি।

মার্ক্সবাদী তো নয়ই, জাতীয়তাবাদী (কোনোভাবেই ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়) স্বাদেশীকতাও তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে, কবিতা কিংবা সাহিত্য আলোচনায়। প্রাচ্যতত্ত্ব কিংবা সংস্কৃত নন্দন তাত্ত্বিকদের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও ঘুণাক্ষরে আলোচনায় স্থান পায়নি। পেতে হবে এমন কোনো কথা আছে কী-না যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে উত্তরে বলতে হবে হ্যাঁ কথা আছে, কারণ আমাদের সমালোচনাতত্ত্ব যে বঙ্কিম বাবুর হাত থেকে শুরু তার কিছুটা ব্যক্তিগত সমালোচনা পর্যায়ে যৌবন লাভ করে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে; যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আজও দাঁড়ায়নি। এরপরে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কথার অনুরণন তুলে বললেন 'সমালোচনাকে সাহিত্য করে তোলা'[১৩]– উচিত, যা আজকে সমালোচনা সাহিত্য হিসাবে পরিচিত– আর এই সমালোচনা সাহিত্য যে 'টেক্সট' ধরে আলোচিত হয় সেখানেই আজ বিশ্বের প্রাজ্ঞজনদের বিভিন্ন মত ও পথ অনাবিষ্কৃত হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন দর্শনেরও, যা বাংলায় হয়নি। তাঁর কারণও স্পষ্ট, ব্যক্তিগত মত দান ব্যতিরেকে অন্য কোন দর্শনের খোঁজ কিংবা তুলনামূলক আলোচনার অভাব কিংবা পরম্পরার অভাব। দেখতে পাচ্ছি, প্রাচ্যতাত্ত্বিক কিংবা সংস্কৃততাত্ত্বিকদের রসবোধ কিংবা কাব্যকলার রসাস্বাদনে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মত, তুলনামূলক আলোচনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বুদ্ধদেবের লেখায় উপস্থাপিত হলো না। পাঠক নিজস্ব একটা রাস্তা খুঁজে পাবেন নিজের সঙ্গে নিজের পাঠের সঙ্গে মেলানোর, সে ব্যবস্থাটা আজ অবধি অপ্রতুল থেকে গেল, ব্যক্তিগত মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে। ব্যক্তিগত মতকে যাচাই করার পন্থা কী, সেদিকে প্রশ্ন ও উত্তরের জবাব দিয়ে আগালেন না বুদ্ধদেব বসুর মত প্রাজ্ঞজনও। তিনি লিখলেন *কালের পুতুল* নামক প্রবন্ধে "সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তুলতে পারলে মস্ত একটা সুবিধা এই যে পরবর্তী যুগে মতামতগুলো সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি নাও হয়, সাহিত্যরসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে মনকে নাড়া দেবে সুন্দর, তাই কোনোকালেই তা ব্যর্থ হবে না।"[১৪]– এটা আমার কাছে গোঁজামিলের মত মনে হয়, কারণ একটা 'টেক্সট' নিয়ে সমকালে বিভিন্ন মত তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। সেই মতগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ও পূর্বোক্ত চিরায়ত কোনো লেখার সঙ্গে যদি আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন ও সৌন্দর্য নিরূপণে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞান স্থাপন না করা হয়, শুধু আবেগের ফুলঝুড়িতে কিছু বক্তব্য ব্যক্তিগত রচনা তার বুদ্বুদ টাইপের বিশ্লেষণ এখন আমাদের কাছে অর্থহীন। আগামী পৃথিবীতে একটা উত্তম 'টেক্সট' থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও দর্শনের খোঁজ মিলবে, বাংলায় যেমন এখন দলিত সাহিত্যের একটা ঘরানার দর্শন

মিলছে, পাশ্চাত্য ও লাতিন সাহিত্যে, অনেক আগেই একের পর এক তত্ত্ব আসছে মিলিয়ে যাচ্ছে। সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটলদের সময়ও মিলেছিল একজন হোমারের টেক্সটকে কেন্দ্র করে এমনই দর্শন।

'জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি' এই শিরোনামে প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "আমাদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর।"[১৪]

চারটা শব্দবন্ধ 'আধ্যাত্মিক' 'শারীরিক' 'বুদ্ধিগত' 'ইন্দ্রিয়নির্ভর'। প্রথম শব্দবন্ধটার পূর্বে শুধু সবচেয়ে কম এর জায়গায় 'সমকালীনদের থেকে কম' বলে অন্যগুলো 'সবচেয়ে বেশি' বললে ভুল হবে না এতদিন পর। 'বুদ্ধিগত' জায়গায় 'সবচেয়ে কম' শব্দটিও এত বছর পর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ আলোচনায় আর চলছে না। বুদ্ধিগত, ইন্দ্রিয়প্রবণতা, শারীরিক বিষয়টি যেন পৌনঃপৌনিকভাবেই চেতন-অবচেতনের মধ্যামধ্যি মাখামাখি করে বেড়ে উঠেছে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থেও। যেমন ধরুন 'বোধ' কবিতাটির এক পর্যায়ে সাম্যবাদের শ্রমজীবীদের কাতারে দাঁড়ায়ে প্রশ্ন করেন নিজেকে একাকী কবি–

'হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;

.....
এইসব সাধ
জানিয়াছি একদিন,– অবাধ-অগাধ;
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে;'[১৬]

এই কবিতাটির মধ্যে বুদ্ধিগত প্রশ্ন যেমন আছে তেমনি আছে শারীরিক ও ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রসঙ্গ। এমন উদাহরণ পরবর্তী গ্রন্থগুলোয় অজস্র দেয়া চলে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে।

একই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন '... তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, উপদেশ নেই; তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি; তা নিছক কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১৭]

এই কথাগুলো ভুল প্রমাণিত করেছেন জীবনানন্দ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে বিশেষ করে 'মহাপৃথিবী' 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। তারপরও বুদ্ধদেব বসুর অমর সৃষ্টি জীবনানন্দ আবিষ্কার, একজন সম্পাদক ও নন্দনতাত্ত্বিকের কাজ ভবিষ্যতের কবিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া সমকালে; তা বুদ্ধদেব বসু তার 'কবিতা' পত্রিকার গ্রন্থ আলোচনায় দিয়েছিলেন "...জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তার প্রথম পরিণত গ্রন্থ।... কারণ এ বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।"[১৮]

এমন স্বীকৃতি খাটি জহুরি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্ণকারের খাঁটি স্বর্ণ দেখে দেয় কী-না ভাবা মুশকিল। সমকালের প্রতিদ্বন্দ্বী লেখককে এমন মর্যাদা দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি– এমন মহান সম্পাদক ও জহুরিকে অভিবাদন। 'জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন' শীর্ষক আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যের সঙ্গে এখন একমত হওয়া কঠিন, কারণ এই প্রবন্ধ যখন লেখা হয় ১৯৪৩ সালে তখন জীবনানন্দ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে একজন অল্পপরিচিত ৪৪ বছর বয়স্ক কবি। যার জীবদ্দশায় কোন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাই বুদ্ধদেব বসু লিখতে পেরেছেন, "... বাংলাকাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছর যেসব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্য জগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখেন না;... ।"[১৯]

কবিতা ছাড়া আসলে অনেক কিছুই তিনি লিখে ফেলেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি, যা বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালে দেখেও গেছেন। তবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্য থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন তা পরিষ্কার করেননি তিনি। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারক বলেই জীবনানন্দের অন্যরকম কদর আমাদের কাছে। আর তাদের সময়ের কাব্য আন্দোলনের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের ভিতর তিনি না থেকে সমস্ত ফসলই যার ঘরে ঠাঁই পেয়েছিল, তিনিই তো জীবনানন্দ। একপেশে রবীন্দ্রবিরোধিতা ও প্রাচ্যকে অবজ্ঞা করে ইউরোকেন্দ্রিক মননের মধ্যে জীবনানন্দ ছিলেন না। তিনি একাধারে আবহমান বাংলার প্রকৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডার থেকে আপনার করে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কবিতার শরীরে। যা বুদ্ধদেবের মত মেধাবী সম্পাদকের চোখ এড়িয়ে গেছে।

এছাড়া 'নজরুল ইসলাম' শিরোনামে যে প্রবন্ধ তিনি লেখেন 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সেখানে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত হাজির করা যায়। তবে তিনি যখন লেখেন 'অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ– এবং প্রধান দোষ।... তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের।'[১৯]

এই কথার সঙ্গে একমত হওয়া যায়, তবে তিনি নজরুলকে তুলনা করতে গিয়ে কিপলিঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তিনি হোসে মার্তি, তাঁর সমকালের ফ্রাংক হর্ন, উইলিয়ম এডওয়ার্ড বার্ঘার্ট ডুবয়েস মাদাগাসকার কবি জেন জোসেফ ব্যাবিয়েরিভেলো, কত কত নাম সেই সময়ে উজ্জ্বল ছিল, যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদেরকে বাদ দিয়ে সেই একই ভালোলাগা 'কিপলিঙে' এ যে বুদ্ধদেবের একান্ত একচোখের দেখা, যা থেকে তিনি বের হতে পারেননি শেষজীবন পর্যন্ত। তাছাড়া নজরুলকে যিনি বললেন, জীবনদর্শনের গভীরতা নজরুল কাব্যকে বিকশিত করলো না, এই একই অভিযোগ এতদিন পর বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধেও দাঁড় করানো যায়; যা বুদ্ধদেবের শিল্প মনন ও কাব্য কৃর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনিই বরং বাঙালি ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নীলচোখের আবরণে যে সাম্রাজ্য তৈরি করলেন লেখালেখির জগতে, তা আজ ভঙ্গুর-প্রশ্নবিদ্ধ।

তারপরও বাংলাসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তার সম্পাদনা, তার কাব্যকৃর্তি, উপন্যাসের সহজীকরণ প্রক্রিয়া, নাট্যজগতে ভিন্নতর মাত্রার সংস্থাপন, বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় তাঁর সমকালের কবিদের অভিভাবক হিসাবেই আমাদের মাঝে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন বুদ্ধদেব বসু।

তথ্যসূত্র

১। বিপরীতের বাস্তব রবীন্দ্রনাথের গল্প : দেবেশ রায়, প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা ১০ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯

২। কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু; দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, প্রকাশক শিবব্রত সিংহ রায়, নিউএইজ পা. প্রা. লি. ১৯৯৭

৩। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ : অরুণ কুমার সরকার, 'কলকাতা,' জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত দশ ও একাদশ সঙ্কলন ১৯৭৪

৪। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; লেখার ইস্কুল

৫। প্রাগুক্ত

৬। প্রাগুক্ত

৭। প্রাগুক্ত

৮। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; প্রবন্ধ কালের পুতুল

৯। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক

১০। প্রাগুক্ত

১১। প্রাগুক্ত

১২। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; সমর সেন, 'কয়েকটি কবিতা'

১৩। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; প্রবন্ধ-কালের পুতুল

১৪। প্রাগুক্ত

১৫। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; প্রবন্ধ-জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি

১৬। প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ- আবদুল মান্নান সৈয়দ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, অবসর, তৃতীয় মুদ্রণ ৪৬/১ হেমচন্দ্র দাশ রোড, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০

১৭। কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু; প্রবন্ধ- 'জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি'

১৮। প্রাগুক্ত

১৯। বুদ্ধদেব বসু; প্রবন্ধ-জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন; কালের পুতুল,

সহযোগী গ্রন্থ

১। অহর্নিশ-বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, শুভাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত

২। RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM, EUPHRANOR, SALAMAN AND AB SAL by, EDWARD FITZGERALD Edited by G. F. MAINE Colling London and Glasgow.

৩। The Cambridge History of Africa_ General Editors. J. D. Fage and Roland Oliver.

৪। দেশে ফেরার খাতা- এসে সেজেয়ার- অনুবাদ দেবলীনা ঘোষ ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যপ্রকাশ।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক কালসন্ধ্যা

শাহজাহান হাফিজ

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক *কালসন্ধ্যা* পড়ে আমার ভালো লেগেছে। আমার ভালো লাগার আনন্দ আমি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এজন্য এই লেখার অবতারণা। অবশ্য ভালো লাগার অনুভূতি জনে জনে ভিন্ন। আমার যা ভালো লেগেছে অন্যের তা ভালো না-ও লাগতে পারে। তবু যদি কারো এ লেখা পড়ে ভালো লাগে, তাহলে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যের আধুনিক ধারা নির্মাণের অন্যতম স্থপতি কবি বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় মহাকাব্য *মহাভারতের* অতিপ্রাচীন একটি কাহিনী অবলম্বন করে, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকটি রচনার পেছনে লেখকের কিছু ভাব-অনুভূতি, কিংবা বলতে পারি পশ্চাৎ-প্রেরণা, গভীরভাবে কাজ করেছে। এখন সেই পশ্চাৎ প্রেরণার কথা কিছু লিখছি। বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬২ সালের শেষদিকে কি ১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে— মার্কিন দেশের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল 'তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক'। এই বিষয়ে পড়াতে গিয়ে তিনি একদিকে ইউরোপীয় মহাকাব্য *ইলিয়াড, অডিসি, ঈনিদ* অন্যদিকে ভারতীয় মহাকাব্য *মহাভারত* ও *রামায়ণ* বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং পাঠদান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচুর নোট তৈরী করেন, এবং ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে, তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এর ফলে তাঁর মনে মহাকাব্য বিষয়ে বিশেষ করে ভারতীয় মহাকাব্য বিষয়ে গভীর আগ্রহের, কিংবা বলতে পারি, এক ধরনের গভীর আবেগ অনুভূতির জন্ম হয়।[১] এরই প্রত্যক্ষ প্রভাবজনিত কারণে দুই বছর পর দেশে ফিরে তিনি *মহাভারত* অবলম্বনে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটকটি রচনা করেন। তিনি *মহাভারত* অবলম্বনে আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে— এখন মনে পড়ছে : *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, *প্রথম পার্থ* ও *অনাম্নী অঙ্গনার* কথা। এবং তাঁর বিখ্যাত আলোচনা গ্রন্থ *মহাভারতের কথা*। এই সময়ে কিছু কবিতাও তিনি *মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে লেখেন। এই ধরনের কবিতার মধ্যে— এই মুহূর্তে মনে পড়ছে— *যে আঁধার আলোর অধিক* গ্রন্থের 'শিল্পীর উত্তর', *স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা* গ্রন্থের 'দুই কুকুর' ও *সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্ষাকু সেন্নিন* গ্রন্থের 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ'-এর কথা। *কালসন্ধ্যা* নাটকটি নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বসুর একটি বিশিষ্ট রচনা। মানবভাগ্যের এক চরম বিপর্যয়ের কাহিনী তিনি এই নাটকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২.

কালসন্ধ্যা কাব্যনাটকের কাহিনীর সূত্র প্রসঙ্গে লেখক তাঁর গ্রন্থের শিরোনামহীন ভূমিকায় লিখেছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন : 'তুমি যেমন কুরু পাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি।

আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে— আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি'। কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হলো।'

যথাকালে কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় *মহাভারতের* মৌষল পর্বে তা বর্ণিত আছে। কালসন্ধ্যার কাহিনী লেখক 'মুষল পর্ব' থেকে নিয়েছেন, তা জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানান নি, কাহিনীটি মুষল পর্বের কোন অংশ থেকে নিয়েছেন, কীভাবে নিয়েছেন। তিনি আরও জানান নি, তাঁর গৃহীত কাহিনীটি তিনি কি হুবহু 'মুষল পর্ব' থেকে নিয়েছেন, নাকি মূল ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে নিজের মতো করে সেই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন। ফলে *কালসন্ধ্যা* নাটকটির রচনাকর্ম কতখানি সার্থক হয়েছে, তা আমরা লেখকের রচিত কাহিনী পড়ে কিছুতেই বুঝতে পারি না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এবং আলোচ্য নাটকটি যথাযথভাবে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য, আমি প্রথমে মুষল পর্বের কাহিনী ও *কালসন্ধ্যা* কাহিনী পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করব, তারপর কাহিনী দুটির আলোকে, নাটকটির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক আলোচনা করব। এতে নাটকটি বুঝতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

৩.

মুষল পর্বের কাহিনীটি এরকম :

যদু বালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব

একদিন নররূপী নারায়ণ কৃষ্ণ বেদীর ওপরে বসেছিলেন। তার আটজন পাটরানী, জাম্ববতী, সত্যভামা, ভদ্রা, লগ্নজিতা, সিত্রবিন্দ্রা, মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীসত্যাসহ আরও ষোড়শ-সহস্র রমণী তার সেবায় নিয়োজিত ছিল। রমণীদের সেবা গ্রহণ করতে করতে কৃষ্ণ ভাবছিলেন অনেকদিন হয় স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে এসে তিনি মানবরূপ ধারণ করে বাস করছেন; এবার তাকে ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। যাবার আগে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করে যেতে হবে। ভাবেন তিনি 'পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।/ আমা হতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার ॥/ অদ্ভুত হইল বৃদ্ধি যদুবংশগণ।/ কাহা হতে এসব হইবে নিবারণ॥' যদু বংশের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা ভাবতেই কৃষ্ণের 'গান্ধারীর শাপ তবে হইল স্মরণ। যদু বংশ শেষ না রহিবে একজন ॥' তিনি ভাবলেন, গান্ধারীর সেই শাপ পূর্ণ এবং যদুবংশের ধ্বংসের সময় হয়েছে। তাঁরও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় হয়েছে। এই সব কথা মনে পড়তেই তিনি পিতা বসুদেবকে 'দানযজ্ঞ' করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণের অনুরোধে যথাসময়ে দানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। নিমন্ত্রণ পেয়ে অনেক মুনি এলেন। তাদের 'সবাকারে বসুদেব পূজিয়া বিধানে।/ দিব্যগৃহ বসিবার দেন প্রতিজনে ॥/ চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে।/ সবাকারে পূজা করিলেন উপহারে নানা ॥' ধনরত্নসহ ব্রাহ্মণগণ বিদায় নেবার সময়— অদূরে ক্রীড়ারত তার পুত্রদের সঙ্গে— কৃষ্ণ তাদের দেখা করে যেতে বললেন। কৃষ্ণের কথা মতো কিছুদূর যেতেই, মুনিগণ যদুনন্দনদের দেখা পেলেন। যদুনন্দনগণ মুনিদের দেখে কৌতুকবশত তাদের জ্ঞান পরীক্ষা করার এক কৌশল স্থির করল। জাম্ববতীসূত শাম্বকে, গর্ভবতী স্ত্রী বেশে মুনিদের সামনে হাজির করে বলল, 'চিরদিন গর্ভবতী এইত অঙ্গনা।/ না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা ॥/ কতদিনে প্রসবিবে কি হবে অপত্য।/ আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য ॥' মুনিরা ধ্যানস্থ হয়ে, প্রকৃত ঘটনা জেনে, তাদেরকে অবজ্ঞা ও উপহাস করা হয়েছে বুঝতে পেরে, খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব।/ ব্রাহ্মণেরে উপহাস

কর তোমা সব ॥/যেই লৌহপাত্রে কৈলে গর্ভের আকৃতি।/ এখনি উত্তম বংশ হৈবে উৎপত্তি ॥/ তাহা হতে তোমা সবা হবে বড় ভয়।/ যদুকুল ধ্বংস হবে কহিনু নিশ্চয় ॥' এই শাপ দিয়ে মুনিরা চলে যাবার পর, শ্বম্ব আচম্বিত এক মুষল প্রসব করে। মুষল দেখে, অমঙ্গল চিন্তায়, যদুনন্দনগণের মন বিষাদে ছেয়ে যায়। কৃষ্ণ সব বুঝতে পেরে পুত্রদের বললেন, 'মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।/ ঘসিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে ॥/ ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।/ সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার ॥' পুত্রগণ পিতার কথা মতো প্রভাসতীরে গিয়ে ঘষে-ঘষে মুষল ক্ষয় করল। তবে মুষলের খুবই পাতলা একটা অংশ রয়ে গেল, যা কিছুতেই ক্ষয় করা যায় না দেখে, অবশিষ্ট সেই অংশটুকু জলে ফেলে দিয়ে, প্রভাসের জলে স্নান করে, তারা দ্বারাবতী ফিরে গেল।

যদুকুল ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি

'মুষল ঘসিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।/ সেই হ্রদে হৈল নল-খাগড়ার বন ॥/ শেষে লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল। জলে ছিল মীনরাজ তাহারে গিলিল ॥/ ধীবর আইল মীন করিতে ধারণ।/ জালে বদ্ধ হৈল মীন দৈবের কারণ ॥ লৌহ শেষ পায় মীন কাটিবার কালে।/ জরা নামে আখেটিক এল সেই স্থলে ॥/ মাপিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থান।/ কর্ম্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণ ॥' 'নররূপী নারায়ণ' কৃষ্ণ মুষল সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা জানতে পেরে অনুভব করলেন, এবার যদুবংশ ধ্বংসের পটভূমি তৈরি হয়েছে; একে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। তিনি বলভদ্রকে ডেকে এনে, সকল বৃত্তান্ত বলে, তাকে যদুকুল বংশের ক্ষয়ের উপায় বললেন, 'ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।/ যদুকুল ক্ষয় করি হব স্বর্গগামী ॥ মোর বংশ ক্ষয় করে আছে কোন্ জন।/ ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন ॥/ প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে।/ যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে ॥' উপায় স্থির করে দুই ভাই মাতা-পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে, নারীদের দ্বারকাপুরীতে রেখে, যদুকুলের সকল পুরুষদের নিয়ে প্রভাসতীরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে-গমন

অতঃপর কৃষ্ণ তাঁর 'এক লক্ষ আটাইশ সহস্র নন্দন' ও যাদব বংশের 'ছাপান্ন কোটি' পুরুষ সদস্য নিয়ে যথাসময়ে প্রভাস হ্রদের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

যদু বালকগণের জলক্রীড়া

প্রভাসতীরে পৌঁছে, সবাই মিলে আনন্দিত মনে দুপুরে স্নান করে প্রচুর মদ্য সহযোগে যাদবগণ মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করল। তারপর কৃষ্ণকে ঘিরে বসে সকলে গল্প গুজবে মত্ত হল। কৃষ্ণ সাত্যকিকে বললেন, 'কহ কহ সাত্যকি সবার বরাবর।/ কোন্ মতে কুরুক্ষেত্রে করিলে সমর ॥' কৃষ্ণের আহ্বানে সাত্যকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্মৃতি মন্থন করে, যোদ্ধা হিসেবে নিজের সম্পর্কে খুবই বড়াই করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলল, 'বহু সৈন্য ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।/ভূরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে ॥/ প্রাণপণে যুঝিলাম নাহি নিবারণ।/ আপনা জানিতে কার্য না করি হেলন ॥' সাত্যকি ভূরিশ্রবা নৃপতিকে শক্তিতে পরাস্ত করেছে বলায়, কৃষ্ণ বললেন যে, একথা ঠিক নয়। সম্মুখ যুদ্ধে সাত্যকি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এক পর্যায়ে ভূরিশ্রবা তার চুলের মুঠি ধরে তাকে হত্যা করতে অস্ত্র তোলে। কৃষ্ণ তা দেখতে পেয়ে-ভূরিশ্রবাকে লক্ষ্য করে অর্জুনকে-তীর নিক্ষেপ করতে বলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন তীর নিক্ষেপ করে অস্ত্রসহ ভূরিশ্রবার হস্ত

কর্তন করে ফেলে। আহত মৃতপ্রায় ভূরিশ্রবা মাটিতে পড়ে গেলে সাত্যকি তাকে হত্যা করে। এতে যোদ্ধা হিসেবে তার কোনো কৃতিত্ব নেই। অস্ত্রহীন আহত, অসহায় ভূরিশ্রবাকে হত্যা করে সাত্যকি খুব একটা বীরত্বের পরিচয়ও দেয় নি। কৃষ্ণের মুখে তার নিন্দা শুনে, সাত্যকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এবং উচ্চৈচঃস্বরে বলতে থাকে, কৃষ্ণই সমস্ত দোষে দোষী; তাঁরই কূট-কৌশলে কুরবংশ ও পাণ্ডব বংশ ধ্বংস হয়েছে। সাত্যকি আরও সরাসরি কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করে বলে, 'পরম কুটল তুমি কে জানে তোমারে।'

যদুবংশ ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ

সাত্যকি ও কৃষ্ণের বাদানুবাদ কিছুক্ষণ চলার পর যাদবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণকে নিন্দা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে কৃতবর্ম্মা খঞ্জন হাতে সাত্যকিকে আক্রমণ করে। সাত্যকিও পাল্টা আক্রমণ করে। সাত্যকির অস্ত্রাঘাতে কৃতবর্ম্মা নিহত হয়। এরপর যাদবরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে, উভয় পক্ষ উভয়কে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। যুদ্ধে সকল অস্ত্র শেষ হয়ে যায় তবু যাদবরা শেষ হয় না। অতঃপর হ্রদ থেকে নল-খাগড়া তুলে পরস্পরের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করে, একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। কৃষ্ণ দেখলেন যাদবরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হতে শুরু করেছে। তাই আর দেরি না করে তার সারথী দারুককে প্রপৌত্র বজ্রসহ মথুরায় পাঠালেন, তাকে সেখানে রেখে আসার জন্য। দারুক বজ্রকে মথুরায় রেখে ফিরে এসে দেখল, যাদবেরা সকলেই নিহত হয়েছে। শুধু কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই বেঁচে আছে। দারুককে দেখে কৃষ্ণ তাকে অবিলম্বে হস্তিনা নগরে গিয়ে অর্জুনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বললেন। দারুক হস্তিনা নগর যাত্রা করলে, কৃষ্ণ বলরামকে প্রভাসতীরে রেখে, নিজে গেলেন দ্বারকায় যদুগণের মৃত্যু সংবাদ পিতামাতাসহ পুরজন-সকলকে দেয়ার জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

ব্রহ্মশাপে যদুবংশের সবাই নিহত হয়েছে; বাকি রয়েছেন শুধু শ্রীকৃষ্ণ। নিজের মৃত্যু-কীভাবে হবে ভাবতে ভাবতে তিনি প্রভাসতীরের একটি গাছের শাখায় উঠে এক পা ঝুলিয়ে বসলেন। এমন সময় 'মৃগ মারিবার ছলে,/ ব্যাধ এল সেই স্থলে,/ দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ ॥' গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দূর থেকে সেই পা দেখে ব্যাধ হরিণ মনে করে, 'মুষলের শেষ পাই,/ যাই বাণ নিরমাই,/ দৈবে সেই বাণ নিল হাতে। টানিয়া ধনুক খান/ সন্ধানিয়া মারে বাণ/ চরণ ভেদিল জগন্নাথে ॥' দৈব আগত ব্যাধের সেই মুষলের তৈরি বাণের আঘাতে, কৃষ্ণ অচিরেই দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মশাপে এভাবেই যাদবগণ সকলে মৃত্যুবরণ করে।

অর্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন

হস্তিনা নগর থেকে দারুকের সঙ্গে যাত্রা করে, ত্বরিত গমনে আসি দ্বারকা নগরী।/ বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারাবতী হেরি ॥/ পূর্ব্ব রূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।/ শূন্যকার পুরীখণ্ড দিবসে আঁধার ॥/ পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।/ চিত্রের পুত্তলী প্রায় সবে অনাথিনী ॥' দ্বারকাপুরীর এই পুরুষশূন্য, চারিদিকের 'শূন্যকার' ও 'দিবসে আঁধার' পরিবেশ দেখে অর্জুন খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি আরও দুঃখ পেলেন যখন জানতে পারলেন, পারস্পরিক হানাহানিতে যাদবদের সকলেই নিহত হয়েছে, শুধু কৃষ্ণ ও

বলরাম বেঁচে আছেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখার জন্য অর্জুন তাই প্রভাসতীরে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, ভূমিতে পড়ে রয়েছে যাদবদের মৃত শরীর। কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই-ও জীবিত নেই। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে অর্জুন 'হা হা রবে' কাঁদতে কাঁদতে, 'করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন।'

অর্জুনের বিলাপ

'হায় কৃষ্ণ প্রাণধন,/ বন্ধুরূপে নারায়ণ/ করুণাসাগর অবতার।/ পাণ্ডবের প্রাণধন,/ সব হৈল অকারণ,/ তোমা বিনা দিবসে আঁধার।' এই বলে অর্জুন বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ছিলেন তাঁর আজীবনের বন্ধু, মন্ত্রণাদাতা ও অভিভাবক; আর পাণ্ডবদের ছিলেন বিপদের দিনের ত্রাণকর্তা। কৃষ্ণের সহায়ক ভূমিকার জন্যই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। সারাজীবনের এইসব স্মৃতির কথা স্মরণ করে অর্জুন কৃষ্ণের জন্য শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদন

কৃষ্ণের মৃত্যুতে অর্জুনের শোক কেবলই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে। 'কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।/ বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥' বিলাপের একপর্যায়ে কৃষ্ণ-সারথী দারুক অর্জুনকে বলে, 'অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।/ আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার।/ বিধিনীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের কার্য/ আপনি সবার তুমি কর প্রেত কৰ্ম্ম ॥' দারুকের কথায় অর্জুন সকল যাদবের ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদন করতে উদ্যোগী হন। 'চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি রাশি।/ জ্বালিলেন চিতা অগ্নি গগন পরশি ॥/ দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।/ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরসিত ॥/ রেবতী রামের সঙ্গে পশি হুতাশন।/ অগ্নিকার্য্য করিলেন অর্জ্জুন তখন ॥/ সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।/ বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥'

দস্যুগণ কর্তৃক যদুস্ত্রীদের হরণ ও পাষাণ হওনের কথা

'দারুক পুনশ্চ কহে অর্জ্জুনের প্রতি।/ অর্জ্জুন বন্ধুর কৰ্ম্ম করহ সম্প্রতি ॥/ স্ত্রীগণ লইয়া যাও হস্তিনা নগরে।/ প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে ॥/ তোমা বিনে কার শক্তি রক্ষিবারে পারি।/ সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকা নগরী ॥' দারুকের অনুরোধে অর্জুন যদুস্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে হস্তিনা নগর যাত্রা করতেই সমুদ্রের জল প্রবেশ করে দ্বারকাপুরীতে। এবং মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র দ্বারকা নগরী সমুদ্রের বিপুল জলরাশির নিচে তলিয়ে যায়। অর্জুন স্ত্রীগণকে নিয়ে কিছুদূর যেতেই, এক দল দস্যু অতর্কিত আক্রমণ করে, যদুস্ত্রীদের হরণ করার উদ্দেশ্যে, তাদের ধরে টানাটানি করতে থাকে। দস্যুদের দুঃসাহস দেখে অর্জুন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। কিন্তু দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস এই যে, পরাজিত, বিধ্বস্ত, অর্জুনের সম্মুখ দিয়ে, দস্যুরা যদুস্ত্রীদের হরণ করে নিয়ে যায়। তিনি তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। 'পরাজয় পেয়ে পার্থ পরম চিন্তিত।/ কান্দিতে কান্দিতে যান পরম দুঃখিত ॥/ বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।/ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন করপুটে ॥/ অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।/ জিজ্ঞাসা করেন তারে ব্যাস মহাশয় ॥/ কি হেতু হইলে দুঃখী কুন্তির নন্দন।/ আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥' ব্যাসদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে অর্জুন তাঁকে, দস্যুগণ কর্তৃক যদুস্ত্রীদের হরণ ও দস্যুদের নিকট তার

দুঃখজনক পরাজয়ের ঘটনা উল্লেখ করে, নিজের অক্ষমতায় অনুতাপ করতে থাকেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে অনুতাপ করতে দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'অর্জুন তুমি শোক করো না। ঘটিত ও ঘটিতব্য যা, তার সবই আমি জানি। প্রকৃত ঘটনা হল, অষ্টাবক্র মুনির অভিশাপের কারণেই দস্যুরা যদুস্ত্রীদের হরণ করতে সমর্থ হয়েছে। তবে দস্যুরা তাদের স্পর্শ করলেই তারা পাষাণে পরিণত হবে। কাজেই এই বিষয়ে তোমার অনুতাপ করার কোনো কারণ নেই। তুমি এখন তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাও।' দস্যুগণ কর্তৃক যদুস্ত্রীদের হরণের আসল ঘটনা জানতে পেরে, ব্যাসদেবের নির্দেশ মতো, অর্জুন হস্তিনায় ফিরে গেলেন।

অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশ ধ্বংস কীর্তন

অর্জুন হস্তিনা নগরে পৌঁছে যুধিষ্ঠিরের নিকট যদু বংশ ধ্বংসের সমুদয় কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

অর্জুনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে, যুধিষ্ঠির গভীর শোকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে 'হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু' বলে ক্রন্দন করতে থাকেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের ছিল দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। কৃষ্ণের সহযোগিতার জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁরা জয়লাভ করেছিলেন। সেই সব দিনের নানাবিধ স্মৃতিকথা মনে করে, যুধিষ্ঠির করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকেন।

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান

কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদে যুধিষ্ঠিরের মনে গভীর বৈরাগ্য ভাবের সৃষ্টি হয়। রাজ্যপাট ছেড়ে সংসার ত্যাগ করে, মহাপ্রস্থানের পথে বেরিয়ে পড়ার চিন্তা, তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। অন্য চার পাণ্ডব-ভ্রাতাকে নিজ মনের ভাব জানাতে যুধিষ্ঠির 'রাজা কন ভাইসব কি ভাবহ আর।/ ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥/ কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।/ কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥' যুধিষ্ঠিরের মনোভাব জানতে পেরে, দৌপদীসহ তাঁর ভাইয়েরাও, মহাপ্রস্থানে যাবার আগ্রহ ব্যক্ত করে। তাঁদের আগ্রহের কথা জেনে রাজা যুধিষ্ঠির সকলকে সঙ্গে নিয়েই, রাজ্য ত্যাগ করে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মথুরা নগরে দূত পাঠিয়ে কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে আনিয়ে, তিনি তাকে ইন্দ্রপ্রস্থের শাসনভার অর্পণ করেন; আর পরীক্ষিতকে দেন হস্তিনার রাজ্যভার। তারপর 'শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।/ পাঞ্চালনন্দিনী সঙ্গে হলেন বাহির ॥/ শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।/ বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে ॥/ কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।/ ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া ॥/ চলিল পাণ্ডবসহ দ্রুপদ-নন্দিনী।/ হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব-চক্রপাণি ॥' দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানে চলেছে জানতে পেরে 'ঘর হতে বাহির হইল কুলনারী।/ উর্দ্ধশ্বাসে ডাক ছাড়ি হাহাকার করে ॥' কুলনারী ছাড়াও অন্য যারাই এই সংবাদ শুনল, তারা সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

প্রজাগণের খেদোক্তি

'হায় কর্ম বৃকোদর, ধনঞ্জয় বীরবর,/ সহদেব নকুল কুমার।/ দ্রৌপদী পাঞ্চালসুতা,/ সতীসাধ্বী পতিব্রতা,/ রচিল লক্ষ্মণ অবতার ॥' এই ভাবে প্রজাগণ নানারকম স্মৃতিকথা উল্লেখ করে খেদ প্রকাশ করতে লাগল। দ্রৌপদীর জন্ম, তার স্বয়ম্বর সভা, অর্জুন কর্তৃক

লক্ষভেদ করে দ্রৌপদী লাভ ও পাশা খেলায় জিতে দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নারায়ণ কর্তৃক লজ্জা নিবারণ— এই রকম আরও নানা ঘটনা বর্ণনা করে প্রজাগণ খেদ করতে লাগল। খেদ করতে লাগল যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, সহদেব ও নকুল মহাপ্রস্থানে চলেছে দেখে। তারা করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, না ত্যজ না ত্যজ সাই,/ তোমা বিনা গতি নাই,/ আমরা চলিব সর্ব্বজন/ ওহে ধর্ম্মমহারাজা,/ ভীম, পার্থ মহাতেজা,/ ওহে দুই মাদ্রীর নন্দন।/ তোমা বিনা গৃহবাস,/ আর যত অভিলাষ,/ ছাড়ি পাপজীবনের সাধ।/ মহারাজ তোমা হতে,/ সদা সুখ পৃথিবীতে,/ আজি কেন এতেক প্রমাদ।' —এই ভাবে প্রজাগণ, পাত্রমিত্র পুরজন, কাঁদতে কাঁদতে নানা প্রকার খেদ প্রকাশ করতে লাগল।

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য এবং অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীর পরিত্যাগ

প্রজাগণকে শোকে কাতর দেখে যুধিষ্ঠির তাদের প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'শোক না করহ সবে যাহ নিকেতন॥ এই পরীক্ষিত হৈল রাজ্যেতে রাজন।/ আশাসম তোমা সবে করিবে পালন ॥/ মম বাক্য অন্যথা না কর সর্ব্বজন।/ নিজ নিজালয়ে সবে করহ গমন।/ সংসার আশার সার নন্দের নন্দন।/ মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ।' তারপর তাঁরা, দ্রৌপদীসহ পঞ্চভাই, গন্তব্য-পথে চলতে লাগলেন। জাহ্নবীর তীরে পৌঁছে, স্নান সমাপন করে, পূর্বদিক অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন, 'আমি হুতাশন শুন ইন্দ্রের নন্দন।/ মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডব দাহন॥' তারপর তাঁদের বললেন 'করিলে অনেক কর্ম বিনাশিলে ভার।/ পরম সন্তোষ পায় পৃথিবী অপার॥/ অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।/ স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন ॥/ অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।/ দেহ তো আমার তবে এ নহে কৌতুক ॥' বৈশ্বানরের অনুরোধে, অর্জুন তাঁর 'গণ্ডিব ধনুক। আর তূণ-পূর্ণ-শর' তাঁকে প্রদান করেন। তারপর তারা সকলে মিলে, গন্তব্য-পথে, পুনরায় চলতে লাগলেন। এখানেই মুষলপর্বের কাহিনী শেষ।[৩]

৪.

মহাভারতের মুষল পর্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হল। এবার বুদ্ধদেব বসু রচিত *কালসন্ধ্যা* নাটকের কাহিনীটি— পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে তুলে ধরছি। কাহিনীটি নাটকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেভাবেই এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

কালসন্ধ্যার কাহিনী

পূর্ব রঙ্গ

এখনো যবনিকা ওঠে নি। দুই যাদব বৃদ্ধ দুদিক দিয়ে প্রবেশ করে মঞ্চের অগ্রভাগে দাঁড়ালেন; এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাদের কথোপকথনে এই কথাটা প্রথমেই উচ্চারিত হয় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কেটে গেছে ছত্রিশ বছর। প্রথম বৃদ্ধের কথায় আমরা জানতে পারি, 'এই তো সেদিনমাত্র কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ।/ তবু আমাদের এই লোলচর্ম, পাণ্ডুবর্ণ কেশ/ নির্ভুল জানায় বার্তা কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর,/ আর এই বিশ্বধামে কিছু নেই, যা নয় নশ্বর।' দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনে দ্বিতীয় যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তা হল, দ্বারকা নগরীর জন্য শঙ্কাবোধ। ওরা আশঙ্কা করছেন, দ্বারকা নগরীতে অচিরেই হয়তো কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সেই-বিপদের নানা দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। (এক পর্যায়ে তাঁরা মঞ্চের দুদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।)

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল দ্বারকাপুরীর প্রসাদের একটি কক্ষে, বাতায়নে দাঁড়িয়ে আছেন সুভদ্রা এবং অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন সত্যভামা। বাতায়নের বাইরে রাজপথ দেখা যাচ্ছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন এমন একটা সময়ে, যখন কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে সকল যাদব পুরুষ প্রভাস হ্রদের উদ্দেশে বেশ আগেই যাত্রা করেছে। দ্বারকাপুরীতে শুধু স্ত্রীলোকগণ ও বসুদেব রয়েছেন। তাঁদের কথোপকথন শুরু হতেই নেপথ্যে নানাবিধ অশুভসূচক শব্দ শোনা যেতে লাগল। সেই অশুভ শব্দ শুনে তাঁরা দ্বারকাপুরীর অমঙ্গল চিন্তায়, বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আশঙ্কাপূর্ণ সংলাপে বোঝা গেল দ্বারকা নগরীর ভাগ্যে দারুণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে 'গুরু গুরু শব্দ যেন ভূমিকম্প,/ জায়মান ঝঞ্ঝার অগ্রিম গর্জন,/ বন্যার আয়োজন, জনতার চিৎকার।' বাতায়ন পথে দেখা যাচ্ছে অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। 'নভোমণ্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,/ মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা।/ না/ নয় সন্ধ্যা, নয় রৌদ্র, নয় রাত্রি,/নেই অস্ত কনক, নেই স্নিগ্ধ ছায়া/ নম্র-কিরণশালী চন্দ্র কোথাও নেই,/ কম্প্র অংশুমালী সেই নক্ষত্র।' তাঁদের কথোপকথনে আমরা বুঝতে পারি, দ্বারকাপুরী ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রের বুকে বহমান প্রবল ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, বন্যার জল বেড়ে উঠছে কেবলই। যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্র গ্রাস করবে দ্বারকাপুরী। আমরা জানি, এই সময়টা যাদব পুরুষগণ দ্বারকা নগরীতে নেই। তারা গেছে প্রভাসতীরে। সেখানে তাদের কোনো অমঙ্গল হল কি-না সেই আশঙ্কাও ফুটে উঠেছে, তাদের কথোপকথনে, '... দ্বারকায় সর্বনাশ উড়িয়েছে ধ্বজা,/ উন্মাদ রাজন্যকুল, আশঙ্কায় বিহ্বল জনতা;/ পঞ্চভূত উতরোল, চরাচরে ওঠে প্রতিবাদ।' তবে যাদবপুরুষদেরও ধ্বংসের প্রকৃত সংবাদ সত্যভামা সুভদ্রা জানতে পারে প্রথম অঙ্কেরও একেবারে শেষ দিকে প্রভাসতীর থেকে আগত কৃষ্ণের কথায়। কৃষ্ণ প্রথমে কৃতবর্মা ও সাত্যকির নিহত হওয়ার কথা বলেন, '... কৃতবর্মা ও সাত্যকি/ মদিরার উত্তুঙ্গ চূড়ায়/ কালদষ্ট, হৃতদৃষ্টি, বিলুপ্তসংবিৎ/ পরস্পরে হত্যা করেছেন।' তারপর বিস্তারিতভাবে যাদব পুরুষদের ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনা করেন, 'যে-মুহূর্তে সাত্যকি হঠাৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট/ অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,/ সেই ক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হলো/ সর্বভুক উৎসাহে রক্তিম,/ জন থেকে জনান্তরে, তৃণ থেকে তৃণান্তরে যেন।/ বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা আরম্ভ করে দিলেন।/ নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।/ প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র অচিরাৎ ধুলায় লুটালো।/ হত শাম্ব, চারুদেষ্য, অনিরুদ্ধ/ ইত্যাদি জ্ঞাতিরা-দ্রুত-পরস্পর কিংবা যুগপৎ—/ যেন ঝরে শুকনোপাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,/ অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।/ পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত অঙ্গে,/ কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়গ।/ আমি সেই দৃশ্য দেখে 'মাটি থেকে এক মুষ্টি এরকা নিলাম তুলে;/ স্পর্শমাত্র প্রতি তৃণ পরিণত হলো/ বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে/ হলো তারা ধাবমান অবিরাম আপন আবেগে।/ তুলি তৃণ-যাদবেরা পড়ে যায়/ কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,/ অথবা ব্যাধের/ বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী।' যদুবংশের ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনা করার পর কৃষ্ণ সুভদ্রার এক জিজ্ঞাসার উত্তরে জানায় যে, খুব শিগগিরই অর্জুন এসে উপস্থিত হবেন। তিনি বলেন, তিনি আসছেন। তার কাছে দূত গেছে বার্তা নিয়ে : 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো/ ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।/ ইতিমধ্যে/ আমি শেষ করেছি আমার কর্ম, এর পরে অর্জুনের অধিকার।' সত্যভামা ও সুভদ্রার সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে অলক্ষিতে কৃষ্ণ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এখানেই প্রথম অঙ্কের কাহিনী শেষ। প্রথম অঙ্কের চরিত্রগুলো হলো : সত্যভামা, সুভদ্রা, কৃষ্ণ, কয়েকজন সুরাবিহ্বল অভিজাত বংশীয় পুরুষ ও রমণী, দ্বারকার বিবিধ জনতা (স্ত্রী ও পুরুষ), দুই প্রহরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

যবনিকা উঠতেই দেখা যাবে দ্বারকার রাজপথ। পিছনে রাজপুরীর সিংহদ্বারের আভাস। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁকে আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর কাঁধে গাণ্ডীব, পিঠে তূণ, মুখে পথশ্রম ও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন। চলার ভঙ্গি চেষ্টাকৃতভাবে বীরোচিত। অর্জুন ও কৃষ্ণ পরস্পর কথা বলতে লাগলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে লক্ষ করে বললেন, 'তোমাকে কিছুটা যেনো বয়স্ক দেখছি।' উত্তরে কৃষ্ণ বললেন 'তোমাকেও তো আমার মতোই বয়স্ক দেখছি।' কৃষ্ণের সঙ্গে এ জাতীয় প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর, অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বার্তা ত্বরিতে পাঠিয়েছিলে? আছেন তো কুশলে ক্ষত্রিয়বর্গ,/ বসুদেব, বলরাম, মহিলারা?' কৃষ্ণ নিরুত্তর। অর্জুন চারিদিক দেখলেন এবং অনুভব করলেন, 'কী অদ্ভুত নিঃসাড় দ্বারকাধাম।/ রাজপথ জনহীন, সব গৃহে রুদ্ধ বাতায়ন।/ সে আজ অতিথি, তার কোনো শ্রদ্ধা প্রাপ্য নেই যেন।/ কী ব্যাপার?' হঠাৎ-ই তিনি, হতাশাপূর্ণ সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন, শুনতে পেলেন সমুদ্রের দূরশ্রুত কল্লোল। অর্জুন কৃষ্ণকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কৃষ্ণ তাকে বললেন, 'পরস্পর উন্মাদ হননে/ যদুবংশ লুপ্ত আজ; বসুদেব শোকে, আর বলরাম/ যোগ্যাসনে প্রাণত্যাগ করেছেন।/ অভ্রান্ত গান্ধারী!' কৃষ্ণের মুখে যদুবংশের ধ্বংসের কথা শুনে অর্জুন অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। অর্জুনের শোক লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ তাকে শোক না-করার জন্য বললেন, 'অর্জুন, তুমি তো বীর। ধৈর্য ধর/ তাছাড়া, কেন বা শোক? কার জন্য? কে কাকে সংহার করে?' অর্জুনকে কৃষ্ণ আরও বললেন, 'জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,/ জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই।' কাজেই কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ঠিক নয় বলে তিনি জানালেন। তিনি অর্জুনকে আরও বললেন, মানুষ যে মৃত্যুর অধীন— এটাই একমাত্র জীবনসত্য নয়; সে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অজ্ঞ। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, সে তা জানে না। এভাবে অর্জুন ও কৃষ্ণের মধ্যে, দীর্ঘক্ষণ ধরে কথোপকথন চলতে থাকে। তাদের সংলাপের এক পর্যায়ে, প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে নারীদের সমবেত আর্তস্বর ভেসে আসে, 'পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো।/ পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো।' নারীদের সমবেত আর্তস্বর শুনে কৃষ্ণ অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন, 'ঐ আজ্ঞা।/ রাজকন্যা, রাজা মাতা, রাজবধূ-/ সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,/ ষোড়শ সহস্র নারী,/ শিশু, বৃদ্ধ, অসংখ্য সেবক,/ আর স্বর্ণমাণিক্যের বিরাট ভাণ্ডার-/ সব নিয়ে যাত্রা করো তুমি। / গন্তব্য— হস্তিনাপুর।/ যুধিষ্ঠির দেখবেন এদের।' এরপর কৃষ্ণ, যাদব নারীদের নিয়ে, অর্জুনকে দ্রুত দ্বারকানগরী ত্যাগ করতে বললেন। কারণ যে কোনো সময় সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করবে। এর আগেই সকলকে নিয়ে তাঁকে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। অর্জুন কৃষ্ণকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। এর উত্তরে কৃষ্ণ তাকে বললেন, 'চিরকাল ধরে আমি/ ছিলাম তোমার সঙ্গে-লক্ষ্য না অলক্ষণীয়;/ পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে, খাণ্ডব দাহনে,/ কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্যে, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে,/ এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিশ্রম্ভালাপে,/ এমনকি বাসর শয্যায়।/ মনে হয় তোমার জন্যই আমি/ বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে; আর একলব্যের ঘাতক/ তাও আমি-দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।/ গান্ধারী আবৃত

চক্ষে দেখেছেন/ মূল সত্য, আদি বীজ। তাকে নমস্কার।/ কিন্তু আজ তোমার আমার পথ/ ভিন্ন; জনে জনে মুক্তির বরণি ভিন্ন।/ বন্ধু, আজ একা যাও, কর্ম করো; মুক্ত হও কর্মজাল থেকে।' এই কথা বলে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। অর্জুন দেখলেন, কৃষ্ণ নেই— তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। এই সময়ে, আবারও তিনি শুনতে পেলেন, নারীদের সমবেত আর্তস্বর, 'পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো।' আর্তস্বর শুনে দ্বারকাপুরীর দিকে তাকাতেই তিনি দেখলেন, প্রসাদের বহির্ভাগের একটি পথে অত্যন্ত ভীত— সন্ত্রস্ত কয়েকজন প্রসাদ পরিচারিকা প্রবেশ করল। তাদের কথোপকথনে বোঝা গেল, দ্বারকাপুরীর দিকে সমুদ্র সবেগে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু—কুটির, অট্টালিকা, প্রাসাদ আর মন্দির— উত্তাল বন্যার জলে নিমজ্জিত হবে। এক পর্যায়ে তারা ছুটতে লাগল। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'ত্বরা কর, ত্বরা কর, ত্বরা কর,/ পশ্চাতে ধাবমান সিন্ধু।'

ভয়াল সন্ধ্যা ও রাত্রির অবসান হলো। অন্ধকার দূর হয়ে চারদিক আলোকিত হলো। সময় : প্রভাত কাল। একটি বনভূমির আভাস দেখা যাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন মঞ্চে। তার পিছনে এল ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক বহন করে অনুচরবর্গ। তাদের অনুসরণ করে আরও পশ্চাতে এল যাদব নারীরা। বিশ্রামের জন্য অর্জুন সকলকে নিয়ে বন-ভূমির সন্নিকটে উপবেশন করলেন। এই সময় একদল দস্যু অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে। অর্জুনের অনুচরবৃন্দ দস্যুদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। আক্রান্ত ও ভয়ার্ত নারীরা আর্তনাদ করতে থাকে। অর্জুন দ্রুতগতিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ধনুকে তীর যোজনা করে দস্যুদের লক্ষ করে নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে একে একে তার নিক্ষিপ্ত সব তীরই লক্ষভ্রষ্ট হয়। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে, অত্যন্ত অবসন্ন শরীরে প্রায় নিমীলিত চোখে ভূতলে শুয়ে পড়েন। দস্যুরা পরাজিত অর্জুনকে অবহেলা ভরে পাশ কাটিয়ে, স্বর্ণ-মাণিক্যসহ যাদব নারীদের জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। এখানেই দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ। এই অঙ্কের চরিত্রগুলো হল : অর্জুন, কৃষ্ণ, অর্জুনের অনুচরবৃন্দ, কয়েকজন নারী (প্রাসাদের পরিচারিকা) ও দস্যুদল।

উত্তর কথন

যবনিকা উঠলে, দেখা গেল, ব্যাসদেব তাঁর আশ্রমে ভূর্জপত্র ও লেখনী নিয়ে, গ্রন্থরচনায় রত। তিনি দেখতে ঘোর কৃষ্ণকায় ও কুদর্শন; তার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর ও কর্কশ। তাকে দেখে যুবা, বৃদ্ধ কিছুই মনে হয় না। তিনি যেন বয়সের অতীত শিলাখণ্ডের মতো স্থির ও অবিচল। ব্যাসদেবের লেখালেখির এই মুহূর্তটিতে, শ্লথ চরণে মঞ্চে প্রবেশ করেন গাণ্ডিবধারী অর্জুন। দস্যুদের নিকট তার পরাজিত হওয়ার ঘটনা এবং যাদব নারীদের দস্যুদল কর্তৃক জোরপূর্বক হরণের কথা উল্লেখ করে তিনি ব্যাসদেবের নিকট নিজের অক্ষমতার জন্য অনুতাপ করতে থাকেন। সখেদে তিনি ব্যাসদেবকে বলেন, 'ভাষা নেই, পিতামহ, কণ্ঠ নেই করি উচ্চারণ।/ আমি আজ ঈর্ষা করি কর্ণ, দুর্যোধনে/ মৃত্তিকায় বুক চেপে যাঁরা/ নিঃসৃত রক্তের বেগে পুণ্যধামে চলে গিয়েছেন।/ তাঁরা বীর, সার্থক ক্ষত্রিয়।/ আর আমি, অর্জুন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী,/ চিরকাল জয়ে নিঃসংশয়,/ অবশেষে জীবন্মৃত-জীবন্মৃত/ কেন এই অক্ষমতা, যার তুলনায়/ মৃত্যু ছিলো শতগুণে বরণীয়?' অর্জুনের খেদ শুনে, পুথি বন্ধ করে, ধীর শান্তভাবে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, 'থামো/ বাহুল্য তোমার উক্তি।/ সব আমি জেনেছি অগ্রিম।/... প্রপৌত্র, প্রপিতামহ, সকলের সমান বয়সী,/ আমি সব জেনেছি, করেছি সহ্য :/ পুরুষ ও নারীর প্রণয়,/ পুরুষ ও

নারীর বিদ্বেষ,/ সৌহার্দ্য, অসূয়া, দয়া, আত্মগ্লানি।/ পার্থ, তুমি দুষ্য নও, শ্লাঘ্য নও।' এরপর তিনি যাদব বংশের সকল পুরুষ ধ্বংস থেকে ব্যাধ কর্তৃক কৃষ্ণের মৃত্যু, দস্যুগণ কর্তৃক যাদব নারীদের হরণের ঘটনা উল্লেখ করে, তাকে বললেন, 'এই সব যা যা ঘটেছে সব দেবতার ইচ্ছাতেই ঘটেছে। মানুষ হিসেবে, অর্জুন তোমার করার কিছু নেই। ঘটিত ঘটনাবলীর জন্য তোমার দুঃখ করারও কিছু নেই।' এই কথা বলে, ব্যাসদেব তাঁকে, নিজ দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'যাও বৎস, শান্তমনে স্বীয় পথে, গর্বিত গাণ্ডিব, তূণ/ দাও তাঁকে ফিরিয়ে যিনি দিয়েছিলেন। আর অস্ত্র/ ধারণ করো না।/ ভুলে যাও বীরত্ব, যুদ্ধ ও জয়। এ-মুহূর্তে/ আছেন হৃতাবশিষ্ট মহিলারা-/ সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,/ বৃদ্ধ, বৃদ্ধ, শিশুগণ। তাদের স্থাপন করো অভিপ্রেত রাজ্যে বা আশ্রমে/ মোহন পরীক্ষিৎ রাজা হস্তিনায়।/ তারপর পঞ্চভ্রাতা তোমরা বেরিয়ে পড়ো/ পঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের।/ জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে-/ হয়তো বা আরব্ধ এখনই।/ যাত্রা করো, বিদায়।' অর্জুন শ্লথ চরণে নিজ দেশের উদ্দেশে, বেরিয়ে গেলেন। ব্যাসদেব আবার আসনে বসে পুথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, লেখনী হাতে তুলে নিলেন। মঞ্চে আলো ম্লান হয়ে এল। রচনায় নিবিষ্ট ব্যাসদেবকে কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা— কোনো শিলাখণ্ডের মতো অস্পষ্ট ও স্থির। ধীরে যবনিকা নেমে এল। এখানেই *কালসন্ধ্যা* নাটকের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।[৪]

৫.

আমরা এখন— মহাভারতের মুষলপর্ব ও বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* নাটকের কাহিনীর আলোকে-*কালসন্ধ্যা* নাটকটির বিভিন্ন দিক আলোচনা করব। প্রথমেই কাহিনী ও চরিত্র প্রসঙ্গ।

ক. বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকের মূল কাহিনী— যদু বংশের ধ্বংসের কাহিনী-মহাভারতের মুষলপর্ব থেকে যে নিয়েছেন, তা তিনি নাটকটির মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন। আমরা মুষলপর্ব পড়ে জানতে পারি, তিনি 'সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন,' 'যদুবালকগণের জলক্রীড়া,' 'যদুবংশ ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ,' 'শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ,' 'অর্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসতীরে রামকৃষ্ণের মৃত শরীর দর্শন,' 'দস্যুগণ কর্তৃক যদুস্ত্রীদের হরণ ও পাষাণ হওনের কথা'— প্রভৃতি অধ্যায় থেকে তার নাটকের কাহিনী চয়ন করেছেন। তবে কাহিনী সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি *কালসন্ধ্যার* জন্য চয়নকৃত কাহিনীতে যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন। নাট্য সৃষ্টির জন্য নাট্যকার যতখানি স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন তিনি সেই স্বাধীনতার সবটুকুই গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি, মুষলপর্বের প্রধান ঘটনা— যদু বংশের সকল পুরুষের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু— প্রভাসতীরে সংঘটিত হয়েছে। দ্বারকাপুরীতে তেমন কিছুই ঘটে নি। কিন্তু *কালসন্ধ্যায়* দেখি, নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাই ঘটছে অথবা অন্যত্র ঘটিত ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে দ্বারকাপুরীর প্রাসাদে ও তার সম্মুখস্থ রাজপথে। প্রভাসতীরের ঘটনার সরাসরি এখানে কোনো উল্লেখ নেই। নাট্যকাহিনীর প্রয়োজনে নাট্যকার *কালসন্ধ্যায়* নতুন কিছু প্রসঙ্গ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নতুন কিছু চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য আমরা আলোচ্য নাটকটির কাহিনী পর্যালোচনা করে, কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। প্রথমেই আলোকপাত করছি, 'পূর্বরঙ্গ'

অধ্যায়টি সম্পর্কে। এখানে আমরা দুই বৃদ্ধ যাদবের দেখা পাই। এই দুটি চরিত্র লেখক নতুন সৃষ্টি করেছেন। 'পূর্বরঙ্গ' অধ্যায়টি-র প্রসঙ্গ কথাও নাটকের প্রয়োজনে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মুষলপর্বে এর কোনো উল্লেখ নেই। *কালসন্ধ্যা* নাটকের জন্য-নাট্যারম্ভের পূর্বমুহূর্তে— মঞ্চের সম্মুখভাগে দুই বৃদ্ধ যাদবের উপস্থিতি, রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এদের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে। এবার যদুবংশের ধ্বংসের সময় সমাগত। নাটকটির যবনিকা ওঠার আগেই লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, গান্ধারীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার সময় হয়েছে, এই ইঙ্গিতটি নাট্যাকাহিনীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। একটি কথা : 'পূর্বরঙ্গ' অধ্যায়টিতে গ্রিক নাটকের কোরাসের ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়। গ্রিক নাটকের কোরাস অংশে নাট্যারম্ভের পূবেই-নাট্যভিনয়ের সময়, কী ধরনের ঘটনা ঘটবে তার ইঙ্গিত থাকে। 'পূর্বরঙ্গ'-তেও আমরা কোরাসের মতোই ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপের মধ্যে দিয়ে পরে কী ঘটবে তার আভাস পাই। *কালসন্ধ্যার* প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠলে, আমরা দেখি, দ্বারকাপুরীর প্রাসাদে সুভদ্রা ও সত্যভামা পরস্পর কথা বলছে। এই দুটি প্রধান চরিত্রই লেখক নাটকের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। এদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীতে যে দুঃসময় ঘনিয়ে আসছে— তা নাট্যকার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে কৃষ্ণ মঞ্চে প্রবেশ করেন। তার কাছ থেকেই সত্যভামা ও সুভদ্রা, প্রভাসতীরে যাদব পুরুষদের সকলেরই, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে। এই কৃষ্ণ চরিত্রটি লেখক 'মুষলপর্ব' থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। শুধু এটুকু ব্যতিক্রম দেখি, 'মুষলপর্বে' কৃষ্ণ দ্বারকায় এসে বসুদেবকে প্রথমে যাদবপুরুষদের মৃত্যুর সংবাদ দেন, সত্যভামা-সুভদ্রাকে নয়। 'মুষলপর্বে' দেখি কৃষ্ণ বসুদেবকে যাদবপুরুষদের নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়ে প্রভাসতীরে ফিরে যান; এবং সেখানে ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কালসন্ধ্যা নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠলে প্রথমে কৃষ্ণ ও কিছুক্ষণ পরে অর্জুনকে দেখতে পাই। এরপর দ্বারকাপুরীর সম্মুখস্থ রাজপথে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কথোপকথনে লিপ্ত দেখি। অর্জুন কৃষ্ণের নিকট থেকেই যাদবপুরুষদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পান : এবং কৃষ্ণের নির্দেশেই যদুস্ত্রীদের নিয়ে হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। আলোচ্য এই দ্বিতীয় অঙ্কের কৃষ্ণ চরিত্র লেখক সৃষ্টি করেছেন নাটকের প্রয়োজনে। কৃষ্ণ-অর্জুন কথোপকথনও লেখক কল্পিত। 'মুষলপর্বে' আমরা দেখি অর্জুন দ্বারকায় আসার আগেই, কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অর্জুন যাদবপুরুষদের ধ্বংসের ও কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পান কৃষ্ণ-সারথী দারুকের নিকট থেকে। দারুকের অনুরোধেই তিনি শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্ধ্বদৈহিক কায্য সম্পাদনের পর যাদবস্ত্রীদের নিয়ে হস্তিনাপুর রওয়ানা হন। অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য্য সম্পাদন বিষয়ক প্রসঙ্গ *কালসন্ধ্যার* লেখক এড়িয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর মতো ঘটনাও তিনি তাঁর নাটকে উল্লেখ করেন নি। আলোচ্য নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ ভাগে যাদবস্ত্রীদের নিয়ে অর্জুনের যাত্রা, দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া, যুদ্ধে দস্যুদের নিকট তার দুঃখজনক পরাজয়, দস্যুদল কর্তৃক যাদবস্ত্রীদের হরণ, অর্জুনের ব্যাসদেবের নিকট গমন এবং নিজ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার স্মরণে খেদ প্রকাশ, ব্যাসদেব কর্তৃক ঘটিত ঘটনার অন্তরালবর্তী রহস্য বর্ণনা, অর্জুনকে সান্ত্বনা দান এবং তারই নির্দেশে অর্জুনের নিজ দেশে গমন প্রভৃতি ঘটনা, 'মুষলপর্বে'র কাহিনী অনুসরণে লেখক যথাযথভাবে *কালসন্ধ্যায়* লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে

যাদবস্ত্রীদের পাষাণ হওয়ার কাহিনী নাটকটিতে উল্লেখিত হয় নি। আলোচ্য নাটকটির প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে কাহিনীর প্রয়োজনে, নাট্যকার আরও কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন দ্বারকানগরীর অশুভ সময় ও বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। আলোচ্য এই চরিত্রগুলো হল : কয়েকজন সুরাবিহ্বল অভিজাত বংশীয় পুরুষ ও রমণী, দ্বারকার বিবিধ জনতা (নারী ও পুরুষ), দুই প্রহরী, কয়েকজন নারী ও অর্জুনের অনুচরবৃন্দ। *কালসন্ধ্যা* নাটকের কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন বলে আমি মনে করি। চরিত্র সৃষ্টিতেও, বিশেষ করে সত্যভামা, সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও অর্জুন চরিত্র রূপায়ণে— লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

খ. *মহাভারতের* 'মুষলপর্ব' থেকে *কালসন্ধ্যা* নাটকের কাহিনী আহৃত এ কথা বুদ্ধদেব বসু নাটকটির মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন '... দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।' এই 'আদিসত্য' বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? লেখকের নিজের কথাতেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক। *কালসন্ধ্যার* দ্বিতীয় অঙ্কে, অর্জুনের এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ এই আদি সত্য সম্পর্কে বলেছেন, 'গান্ধারী আবৃত চক্ষে দেখেছেন/ মূল সত্য আদি বীজ। তাকে নমস্কার।' গান্ধারী যে আবৃত চক্ষে 'মূল সত্য, আদি বীজ' দেখেছেন, তা আসলে কী? এ সম্পর্কে আলোচ্য নাটকটির মুখবন্ধে লেখক যা লিখেছেন, তা এখানে আবারও উদ্ধৃত করছি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন : 'তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে— আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।' কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'দেবী আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তা-ই উক্ত হলো।' যথাকালে কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় *মহাভারতের* 'মুষলপর্বে' তা বর্ণিত আছে। নাট্যকারের এই বক্তব্য থেকে 'আদি সত্য' সম্পর্কে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, মানবভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। অলৌকিক শক্তি তার জীবন খাতায় যা লিখে রেখেছেন, যা অবশ্যম্ভাবী, তা ঘটবেই। অনেক অনেক আগেই স্থির হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে, কৃষ্ণের কারণেই, যদুবংশ ধ্বংস হবে। 'মুষলপর্বে' আমরা দেখি—কৃষ্ণের কূট-কৌশলে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এখানেই তাই অনিবার্যভাবে, মানব জীবনে নিয়তির প্রবল প্রভাবের প্রসঙ্গটি এসে যায়। প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতেও তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত গ্রিক ট্রাজেডি নাটকগুলোতে—মানব জীবনে নিয়তির প্রবল প্রভাবের কথা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। মহাকাব্যগুলোতে ও গ্রিক ট্রাজেডি নাটকগুলোতে মানুষ স্বাধীন নয়, সে নিয়তিরই অধীন। এই নিয়তির স্বরূপটি কী? স্বরূপটি হল, মানুষমাত্রেই অলৌকিক শক্তির হাতে বন্দি। এই যে অলৌকিক শক্তি, মানুষকে যা নিয়ন্ত্রণ করে, এটাই নিয়তি। নিয়তির প্রভাব থেকে মানুষের নিস্কৃতি নেই—এটাই আমরা দেখি, প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে ও গ্রিক ট্রাজেডি নাটকগুলোতে— সোফোক্লিশ-এর *ঈদিপাস দি কিং* নাটকে আমরা দেখি, রাজা ঈদিপাস অলৌকিক শক্তির হাতে বন্দি। নিয়তিই তার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত সর্বনাশের নিয়ামক। ভাগ্যের হাতে বন্দি, অসহায়, রাজা ঈদিপাসের সেই উক্তি, নিবিড় বেদনার সঙ্গে আজো আমাদের স্মরণে আসে, 'আমার নাম কি? পিতৃঘাতী। আমার নাম কি? মাতার স্বামী। দেবতার সম্পর্কহীন এক লজ্জিত

নির্যাতিত মানুষ। ঈদিপাসের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর বলবার আর কী বাকি আছে?'[৫] একই রকমভাবে *মহাভারতের* 'মুষলপর্বে'ও দেখি, অলৌকিক শক্তির হাতে বন্দি, পূর্বনির্ধারিত নিয়তির অমোঘ কারণে, যাদবপুরুষরা সকলেই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের ধ্বংসের জন্য নিয়তিই দায়ী। মানব জীবনে এই অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই, নিয়তির পূর্বনির্ধারিত এই নিয়ন্ত্রণকেই, লেখক 'আদি সত্য' বলে অভিহিত করেছেন।

কালসন্ধ্যা রচনায় কবি বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার এই কাব্য নাটকটি পড়তে বসে, মাঝে মাঝেই, বিদ্যুদ্দীপ্ত, উজ্জ্বল সব সংলাপের মুখোমুখি হয়ে চমকে উঠেছি। আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি। হৃদয়ের গভীরে অনুভব করেছি, আধুনিক বাংলা কাব্যের বিশিষ্ট এই কবির শিল্প-সিদ্ধি কতই না গভীর। কবিতায় শব্দের ব্যবহার, বর্ণনাভঙ্গি কতই না সুন্দর। আমি এখানে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটকটি থেকে ভালোলাগা কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি :

১. সত্যভামা : বলেছিলে, 'এসো, অন্য কথা বলি। প্রেম সুখ সুন্দর যৌবন।' সুভদ্রা : 'আমাদের সব সুখ অন্তরালে বয়ে যায় অশ্রুর প্লাবন।' সত্যভামা : 'জ্বলে প্রেম আত্মভুক : লালসায়, বিচ্ছেদের তীব্রতাপে, ঈর্ষার জ্বালায়।' সুভদ্রা : 'কখনো বোঝে না কেউ কোন গুপ্ত ছিদ্র পথে যৌবন পালায়।'

২. সত্যভামা : 'না! আমি বুঝি না। বুঝি না।/ হত্যা থেকে প্রতি হত্যা যদি/অবিরাম হয় উৎসারিত,/ যদি হিংসা না থামে কোথাও,/ যদি কারো হৃদয়ে না জাগে দয়া, কোনো হন্তা না পায় মার্জনা,/ যদি যুগ-যুগান্তর ধরে/ শুধু চলে ভ্রাতৃবধ বংশে-বংশে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে/ তবে শেষ পর্যন্ত কি মনু বংশ/ সেই মতো অবক্ষয়ে বিলুপ্ত হবে না।/ যেমন মণ্ডলাকার মহাসর্প যে নিজেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়? কৃষ্ণ : সত্যভামা,/ আমি সৃষ্টি করি নি এ-বিশ্বলোক, তুমিও করো নি।/ আমি শুধু দু-একটি কথা জানি, যা তুমি জানো না। প্রথমত, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;/ যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন-/ সব দ্বন্দ্ব :/ পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে।/ এবং ফলত ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।

উদ্ধৃত কাব্যময় সংলাপ দুটিতে দেখি, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসু মানবমনের বিচিত্রমুখী অনুভব-অনুভূতি ও বিচিত্রমুখী সমস্যার গভীরে আলো নিক্ষেপ করেছেন। *কালসন্ধ্যার* প্রসঙ্গ পুরাতন, নাটকের পাত্র-পাত্রীও পুরাতন, কিন্তু তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে কবি আধুনিক জীবনের ভাবনা-বেদনাকে রূপ দিয়েছে; এবং সাম্প্রতিক জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এখানে একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। উপরে উদ্ধৃত সংলাপের একটি পঙ্‌ক্তিতে কৃষ্ণ বলেছেন 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব।' এ কথা বলতে কৃষ্ণ কী বুঝাতে চেয়েছেন? আমি মনে করি, এই কথা বলতে কৃষ্ণ সমাজের মধ্যে ও সামাজিক মানুষের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে, যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে সমাজ জীবন ও মানব জীবন গতিশীল রয়েছে, তার কথাই বলতে চেয়েছেন। *মহাভারতের* কাহিনীতে আমরা জানি দ্বন্দ্বের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। দ্বন্দ্বের কারণেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। আবার এই দ্বন্দ্বের কারণেই সমাজ গতিশীল রয়েছে, জীবন স্রোত সচল রয়েছে। আমরা আরও জানি যে, এই দ্বন্দ্বের আড়ালে, এই জীবনস্রোত প্রবাহের আড়ালে রয়েছে অলৌকিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ; রয়েছে নিয়তির খেলা! বুদ্ধদেব বসু এবং যে মহাকাব্য থেকে তিনি তাঁর

নাটক *কালসন্ধ্যার* কাহিনী চয়ন করেছেন সেই মহাকাব্য *মহাভারতের* রচয়িতা উভয়েই মূলত জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী এবং নিয়তিবাদী। তাদের বিশ্বাস, কোনো দৈবশক্তি অথবা নিয়তি মানুষের জীবনকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে অবশ্যম্ভাবী এক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের পুরুষকার ও সংগ্রামশীলতার কোনো মূল্য নেই। তবে এই অপরাজেয় নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের এই অনমনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তার প্রাণশক্তির চরম বিকাশ ঘটে এবং তার চরিত্রের মূল ধাতুটি এক অপরূপ দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়ে পরে।[৬] মানবজীবন সম্বন্ধে এই বিশেষ ভাবনা ও বিশ্বাসবোধ *মহাভারতসহ* পৃথিবীর বিশিষ্ট সব প্রাচীন মহাকাব্যের ও গ্রিক ট্রাজেডি নাটকগুলোয় উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠভাবে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি একইরকম সাবলীলতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* নাটকেও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি, তার এই নাটকে, কিছুটা ছোট পরিসরে হলেও, মহাকাব্যিক চেতনাকে অনেকটাই ধরতে পেরেছেন। বুদ্ধদেব বসুর নাট্য রচনার সার্থকতা এখানেই।

৭

যুগধর্মের চরিত্র বিবেচনায় *কালসন্ধ্যাকে* আধুনিক চেতানা-দীপ্ত নাটক বলা যাবে না। বলা যাবে না এতে আধুনিক চিন্তাস্রোত প্রবহমান। বরং নিয়তিবাদের মতো অতি প্রাচীন, জীবনসংগ্রামবিরোধী, দেব-দেবী বা ঐশীশক্তি—নির্ধারিত মতবাদকেই লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বর্তমান আধুনিক ভাবনা-দীপ্ত এই সময়ে যুক্তিবাদী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের কাছে যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে নিয়তিবাদ প্রসঙ্গটি বাদ দিলে এই নাটকের আরও একটি দিক রয়েছে, যাকে আমরা বলতে পারি, এর রচনাশৈলীর দিক। নাটকটিতে লেখকের আধুনিক কাব্যবিন্যাসরীতি, পরিশীলিত শব্দ প্রয়োগ, সংলাপ রচনায় বৃদ্ধিদীপ্ততা, আর্থিক নির্মাণে সজাগতা প্রভৃতি শৈলীগত বিষয়গুলো যদি বিবেচনা করি, তাহলে *কালসন্ধ্যাকে* আধুনিক কালের সাহিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শুধু শৈলীগত বিষয়টিই নয়, নাটকটির পাত্র পাত্রীর মানসভুবন গঠনের কথা যদি ভাবি; এবং যে-ভাষায় তারা কথা বলছে, মনোভাবনা ব্যক্ত করেছে, তা যদি বিবেচনা করি, তাহলে *কালসন্ধ্যাকে* অবশ্যই আধুনিক মানুষের মনের উপযোগী, আধুনিক সাহিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রাচীন মহাকাব্য অবলম্বনে পৃথিবীর বহু লেখকই, নতুন যুগের উপযোগী করে, জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের দেশের খ্যাতিমান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও *রামায়ণের* কাহিনী অবলম্বনে *মেঘনাদ বধ কাব্য* রচনা করে বিপুল সাফল্য লাভ করেছেন। মধুসূদন *রামায়ণের* রাক্ষসরাজ রাবণকে একজন শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান হিসেবে চিত্রিত করেছেন। চিত্রিত করেছেন শ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিক ও বীর হিসেবে, যে তার স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, গৌরব অর্জন করেছে। কবি বুদ্ধদেব বসু-ও তেমনি *মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে রচিত *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটকের কাহিনীকে, আধুনিক ভাষা-শৈলী প্রয়োগ করে, বর্তমান যুগের উপযোগী করে নির্মাণ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো— সত্যভামা, সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও অর্জুন— প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে, আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে। নাট্যকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাঁর *কালসন্ধ্যা* নাটকটিকেও আমরা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য, একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করি।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধদেব বসু, *মহাভারতের কথা*, মুখবন্ধ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৮, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৫

২. বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকে আলোচ্য পর্বটিকে 'মৌষলপর্ব' লিখেছেন। যামিনীকান্ত ঘোষাল সম্পাদিত *কাশীদাসী মহাভারত*-এ (প্রথম সংস্করণ : বিজয়া, ১৩৭৪, প্রকাশনায় : ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৫, ইসলামপুর, ঢাকা-১১) 'মুষলপর্ব' লেখা হয়েছে। আমি আমার লেখায়, যামিনীকান্ত ঘোষাল অনুসরণে, এই পর্বটিকে 'মুষলপর্ব' নামেই অভিহিত করেছি।

৩. যামিনীকান্ত ঘোষাল সম্পাদিত *কাশীদাসী মহাভারত* (প্রথম সংস্করণ : বিজয়া, ১৩৭৪, প্রকাশনায় : ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৫, ইসলামপুর, ঢাকা-১১ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে মুষলপর্বের কাহিনীটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যনাটক *কালসন্ধ্যা* (প্রথম দে'জ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯১, মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা— ৭০০০৭৩) থেকে কাহিনীটি, সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৫. সৈয়দ আলী আহসান, *ঈদিপাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৯৬, পৃ. ৪৭

৬. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত, *গ্রিক নাটক সংকলন*, ভূমিকা, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, তুলি-কলম, ১ এ কলেজ রোড, কলকাতা-৯, পৃ. ৬

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যসুষমা

শিহাব সরকার

কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েই বুদ্ধদেব বসুর ইন্দ্রজালে বন্দী হয়ে পড়েছিলাম। কবিতা নয়, স্কুলজীবনের শেষদিকে আমরা চার বন্ধু তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প পড়ি। ঐ সময় গোগ্রাসে একের পর এক পড়ে যাচ্ছি ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বাংলা ক্লাসিক উপন্যাসগুলো। এরই এক ফাঁকে আমাদের হাতে এলো বুদ্ধদেব বসুর গল্প। আমার কাছে ওটা ছিল সাহিত্যপাঠের সম্পূর্ন নতুন এক অভিজ্ঞতা।

দুবছর পর যখন কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের ভুবন আমাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ততদিনে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' পড়া হয়ে গেছে। আমার চেতন-অবচেতনের আরাধ্য কিছুকাল আগেও ছিলেন তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় অজান্তেই আধুনিক বাংলা গদ্যের সিংহাসনে আসীন হলেন বুদ্ধদেব বসু– অন্তত আমার মতো একজন উঠতি কবির কাছে। ছোটগল্প দিয়ে আমার সাহিত্য ভাবনা এবং লেখালেখির শুরু, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরই কেবল একটি-দুটি করে কবিতা ছাপতে শুরু করেছি। কিন্তু ধীরে ধীরে কবিতাগ্রন্থ হয়ে এলেও বুদ্ধদেব বসু আমার চোখে সত্তর দশক থেকে আজ অবধি একজন জাদুকরী গদ্যশিল্পী। সমসাময়িকদের মধ্যে কবি বলতে বুঝি মুখ্যত জীবনানন্দ দাশকে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কখনো আমাকে তেমনভাবে টানে নি। কাব্যনাটকগুলো অবশ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

বৃহদার্থে আধুনিক বাংলা গদ্যের একক রূপকার যদি হয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ তাহলে এর কৌশলগত বিকাশের স্থপতি বলতে হয় বুদ্ধদেব বসুকে। সমসাময়িকদের প্রায় সবাই ঋজু, স্বচ্ছন্দ গদ্য লিখেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু ত্রিশ-চল্লিশ দশকে বিকাশমান সেই গদ্যে যোগ করেছেন এক স্বতন্ত্র লাবণ্য, সতত সৃজনশীল একজন মেধাবী শব্দ-কারুশিল্পীই যার জন্ম দিতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভুবনে প্রবেশ করার চল্লিশ বছর পর আমার আজ মনে হয়, চূড়ান্ত বিচারে তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যশৈলীর অন্যতম এক জনক হিসেবে বেঁচে থাকবেন বাঙালির সাহিত্যে। জীবনানন্দ দাশসহ অনেক কবির ওপর থেকে অপরিচয়ের পর্দা সরিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন তাঁদের অন্তর্জগতে, নিজে ছিলেন আক্ষরিক অর্থে কবিতামগ্ন কিন্তু শেষ বিচারে গদ্যের সিদ্ধি কবিতায় তাঁর অর্জনকে ছাপিয়ে ওঠে। এ মন্তব্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যখন লক্ষ করি 'আমরা তিনজন' বা 'বনতুলসী'-র মতো ছোটগল্প 'সাড়া' (১৯৩০), 'তিথিডোর,' (১৯৪৯) বা 'গোলাপ কেন কালো'-র (১৯৬৭) মতো উপন্যাস অথবা ব্যক্তিগত রম্য রচনা বা ভারি প্রবন্ধগুলো এই একবিংশ শতাব্দীতেও অবিশ্বাস্য রকমের সতেজ ও প্রাণময়। বিষয় এবং আঙ্গিক উভয় দিক থেকে এই ঘোর লাগানো গদ্যের তুলনা নেই বাংলা সাহিত্যে, যে কথা অন্য এক বিচারে প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। অপ্রয়োজনীয়

ভাবে অলংকার প্রধান এবং তৎসম শব্দাবলী ভারাক্রান্ত বাংলা গদ্যে মুক্তির হাওয়া এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সাধুরীতি সত্ত্বেও তাঁর গদ্যেই আমরা প্রথম আস্বাদ পাই লোক-পাঠকের তড়িৎ যোগাযোগের। রবীন্দ্রনাথ, বাংলায় প্রথম লিখেছিলেন কম্যুনিকেটিভ গদ্য। অপর দিকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একরৈখিক নির্মেদ গদ্যে যোগ করেছেন তাঁর নিজস্ব ধরনের প্রকরণ। তাঁর গদ্য ইভোকেটিভ, স্তরে স্তরে যার বাঙময়তা। ফলে তাঁর ভঙ্গি সামান্য মন্থর কিন্তু কখনো সেই গদ্য পাঠককে ক্লান্ত করে না। কারণ কী ছোটগল্প, কী উপন্যাস, কী ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ— কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ এবং প্যারেনথিসিসের আতিশয্য সত্ত্বেও পাঠকের মর্মে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায় তাঁর চিত্রাবলী এবং মেসেজ। এ প্রসংগে আমরা ইমাম হাল্ডি, লরেন্স ডারেল অথবা কিছুটা দূরকল্পনায়, জেমস জয়েস বা উইলিয়াম বারোজের নাম মনে করতে পারি।

তবে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য এই ক্ষেত্রে যে তিনি সহজপাঠ্য ও সরল, কিন্তু স্বাদু এবং স্টাইলাইজড— এই উভয় ধরনের গদ্য লিখেছেন সমান্তরালভাবে। আবার কোনো কোনো পাঠে মনে হয় বয়স বাড়ার পাশাপাশি নান্দনিকতাবোধ এবং ধুলোকাদার বাস্তবতাসঞ্জাত অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গদ্যের ধরনও পাল্টেছে। পুরানা পল্টন (১৯৩২) শিরোনামের ব্যক্তিগত রচনায় প্রথম যৌবনে দেখা ঢাকার বর্ষার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, ‘পুরানা পল্টনের বর্ষার রূপ কিছুতে ভোলবার নয়; সকাল বেলাকার ছেঁড়া মেঘের আকাশ, ভিজে হাওয়া, মাঠে জমে থাকা জল, মাঠ-ভরা নতুন সবুজ ঘাস, আমাদের উঠোনের তুলসী-মঞ্চে ঘন লতার আড়ালে ঘন-নীল অপরাজিতা, মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ। আকাশ ভরা সেই নরম-নীল মেঘ, সেই অশ্রান্ত, অজস্র বর্ষণ বাইরে তাকালে মনে হতো সমস্ত বৃষ্টি যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মনে হতো, পৃথিবীর শেষ সীমা এই খানে।’ একই রচনায় বিষণ্ন এবং স্মৃতিমেদুর ভাবালুতায় আপ্লুত হয়ে তিনি লেখেন, ‘পুরানা পল্টন– অনেক দিন আগে যে মেয়েকে ভালোবাসতাম হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলো। এককালে যে নিতান্ত আপন ছিলো, তার নাম আজ কানে ঠেকছে নতুন, অবাক হতে হয়— তাঁর সঙ্গে অতদিনের ঘনিষ্ঠতা— তা কি সত্যি? সেদিন হয়তো তাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তার নামের শব্দে মধুরতা, বিষাদ...।’

তিন দশক পর আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের এক নতুন, অভিনব অবয়ব। ষাট দশকের শুরু থেকে ‘মহাভারতের কথা’ (১৯৭৪) পর্যন্ত তাঁর গদ্যশৈলী ক্রমশ হয়ে উঠেছে সংহত ও সান্দ্র। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *শার্ল বোদলেয়ার* কবিতা গ্রন্থের ভূমিকায় এমন এক গদ্যরীতির ভেতর পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করেন– যার মূর্ছনা এবং সার্বিক ব্যঞ্জনাকে মনে হয় রীতিমত অপার্থিব। এ এক ইন্সপায়ারড গদ্য, বাংলা ভাষা আগে তা কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। *কালিদাসের মেঘদূত, হোল্ডার্লিন এর কবিতা, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা*— এই তিন অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাকেও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শুধু এক অনুকরণীয় গদ্যভঙ্গি নয়, বৈদগ্ধ্য এবং সংশ্লিষ্ট কবিদের রচনার ক্রিয়েটিভ বিশ্লেষণও এই চারটি ভূমিকাকে অনন্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এক অলৌকিক বোধে তাড়িত হয়ে লেখা *শার্ল বোদলেয়ার কবিতা* গ্রন্থের ভূমিকার শেষদিকে আমরা আধুনিক বাংলা গদ্যশৈলীর স্থপতিকে পুরোমাত্রায় অনুভব করি। তিনি লেখেন, ‘মানুষ

দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী। মানুষ পাপী, কিন্তু জানুক সে পাপী, মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন, মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী:বোদলেয়ারের সমস্ত কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবেন বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।' বুদ্ধদেবীয় এই গদ্যের আভাস পাওয়া গিয়েছিল চল্লিশ দশকের শেষদিকে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 'নোয়াখালি'তে (১৯৪৭) তিনি লেখেন, 'রামগঞ্জ, লক্ষীপুর, শ্রীরামপুর... তুচ্ছ ভেবেছি এই সব নাম, অতি তুচ্ছ, আজ তারা কত বড়ো, কী মারাত্মকরকম বড়ো ঈর্ষাযোগ্য নয় এই ভাগ্য, কিন্তু, কে জানে। গান্ধী আজ সেখানে, আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের দিনের পৃথিবীতে আর কী?' ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সেই সূত্রে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিচিত্র স্পন্দনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গদ্যের বিশাল ক্যানভাসের পেছনে আন্তর্জাতিক বোধ উপলব্ধিরও রয়েছে বিশাল ভূমিকা।

'কল্লোল' পত্রিকার প্রেরণা এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, নৃপেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অকৃত্রিম শুভাকাংক্ষীর সপ্রাণ উচ্ছ্বাস ছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম খ্যাতি এবং সৃজনশীলতার শিখরে পৌছে গেলেও তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজ তাঁর সম্পর্কে এখনো উদাসীন। ব্যতিক্রমী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ। আর বুদ্ধদেব বসু নজরুলের আঁচ ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর সামান্য 'বিভ্রান্তি' এবং 'আড়ষ্টতা' বাদ দিলে বলা যেতে পারে, কবি নজরুল এবং ব্যক্তি-নজরুলকে তিনিই প্রথম বাঙালি পাঠকের সম্মুখে সাহিত্য এবং শিল্পবিচারের পটভূমিতে স্থাপন করে দেখান। এ ক্ষেত্রে গদ্যভাষা বিষয়বস্তুকে দিয়েছে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা। কাজী নজরুল ছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'প্রগতি' এবং 'কবিতা' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সেই বিশ-ত্রিশ দশক থেকেই নজরুলের সম্মোহনী জালে তিনি আটকে আছেন, নজরুলের বর্ণাঢ্য জীবন এবং কবিতা বা গান সব কিছুই তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। ১৯৪৪ সালে নজরুলের ওপর রচনাটি লিখে তিনি প্রমান করলেন কবির প্রতি কী পরিমান ভালোবাসা এবং অনুরাগ তিনি এতদিন লালন করে এসেছেন। *কালের পুতুল* গ্রন্থের নজরুল ইসলাম শিরোনামের প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু সোজা-সাপটা, দ্বিধাহীন ভাষায় লিখলেন, 'বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, মোহিতলাল তখনো ঠিক সমাগত হননি, রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথই প্রধান কবি। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না। তা নয়– কেনই বা থাকবে না– কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন।' ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর অনেক বাঙালি সমালোচক এবং সাহিত্যবোদ্ধা— এই নজরুল বিচার হয়তো মানতে চাইলেন না। কিন্তু নিজের মতো করে বুদ্ধদেব বসু নজরুল মানসের যে অকাতর প্রশংসা করেছেন তাকে আমরা ভুলে থাকতে পারি না। সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো সমসাময়িক সম্পর্কে এ ধরনের নির্ভেজাল তারিফ বিরল।

পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত, জীবনানন্দ দাশকেও দুর্জ্ঞেয়তার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর আটপৌড়ে লোকসমাজে হাজির করেছেন বুদ্ধদেব বসু। অকালমৃত বামপন্থী সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বিপরীত মেরুর কবি। বুদ্ধদেব বসু এই প্রভিগ্যাল কিশোর– কবির বিস্ময়কর কবি প্রতিভা সম্পর্কে

পাঠককে অবহিত করেছেন। এসব কাজ যেন ছিল তাঁর সাহিত্যগত দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি অকুণ্ঠভাবে লিখে গেছেন তাঁর সমসাময়িক ত্রিশ দশকের প্রধান কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীর ওপর। তাঁর ভাষায় সুধীন দত্ত ... 'বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুনসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য কাউকে দেখিনি।'

ত্রিশ দশকের কবিরা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অর্ধব্যাপ্ত উপস্থিতিকে 'অস্বীকার' করে এক ধররেন 'প্রথাবিরোধী' অবস্থান নেয়ার কথা ভাবলেও এরা সবাই অবচেতনায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথে সম্পর্কিত। কবিতার বিষয়ের দিক থেকে এঁরা হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার পটভূমিতে নিজেদের অল্প বিস্তর স্বতন্ত্র করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি প্রকরণের দিক বিবেচনায় আনি, দেখবো এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথ থেকে এক পা এগোতে পারেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম জীবনানন্দ দাশ। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এবং নজরুলেরও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু তিনি অল্প সময়ের ভেতর এক নতুন বাকভঙ্গি আয়ত্ত করলেন, যা বাংলা কবিতায় অনাস্বাদিত। বুদ্ধদেব বসু নিজেও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বলয় ছিন্ন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর যে কটি গদ্যরচনা তার সবগুলোতেই ছাপিয়ে ওঠে বাংলা কবিতার প্রধানতম পুরুষের প্রতি তাঁর নিখাদ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথে মুগ্ধ বুদ্ধদেব বসু পূর্নাঙ্গ গ্রন্থ *সঙ্গয় নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ* এবং অন্যান্য গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নরাজির সঙ্গে পরিচিত করেছেন পাঠককে। যেমন কবিতায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী গদ্যের ভুবনেও বিচরণ করেছেন একজন বিস্ময়-বিমূঢ় মানুষের মতো। অথৈ রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে অন্তরঙ্গ করে তোলার প্রায় দুঃসাধ্য কাজে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৩০-এ প্রকাশিত *সাড়া* থেকে *গোলাপ কেন কালো* (১৯৬৭) পর্যন্ত কুড়িটি উপন্যাস লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। লিখেছেন অজস্র ছোটগল্প। ছোটগল্প বইয়ের সংখ্যা ১৫। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ভাষা প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার মতোই বিশুদ্ধভাবে তাঁর নিজস্ব। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গদ্যশৈলীর আস্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমসাময়িকদের থেকে পৃথক। হাতে-গোনা কিছু কাজ বাদ দিলে অধিকাংশ উপন্যাস এবং ছোটগল্প লিরিকধর্মী, মানব মানবীর হার্দ্য ও জৈবিক সম্পর্ক, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা জটিলতা এবং আমাদের রহস্য মনোজগৎই তাকে টেনেছে বার বার। 'অবজেক্টিভ' থীমের চেয়ে 'সাবজেক্টিভ' থীমের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল বেশি।

মূলত কবি বলে বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সমস্ত গল্প উপন্যাসে বহমান 'পোয়েট্রি' বা কাব্যগুণের এক অন্তঃস্রোত। এবং এই বিষয়বস্তুর বাহন হিসেবে তিনি কুশলী শিল্পী কারিগরের মতো আয়ত্ত করেছিলেন এক অনবদ্য গদ্যভাষা, যা পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ পর্যায়ে আমরা মনে করতে পারি *তিথিডোর* উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদটি, যেখানে বিয়ের শেষে ছোটমেয়েকে বরপক্ষ নিয়ে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ নিঃসঙ্গ, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পিতা ফাঁকা বিয়ে বাড়িতে একা ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। কোনো সংলাপ নেই, ন্যারেশন নেই, এ পরিচ্ছেদে আমরা পাই নাতিদীর্ঘ এক শব্দ-কোলাজ— যেখানে প্রায় কোনো বাক্যই সম্পূর্ণ নয়, আছে আপাতবিচ্ছিন্ন চিত্র-খণ্ডচিত্র, চিত্রকল্পের এক আশ্চর্য ঘন সন্নিবেশ। বিমোহিত পাঠকের বুঝতে দেরি হয় না সদ্য 'কন্যা হারানো'

বিষাদগ্রস্ত একজন বাঙালি পিতার মানসিক শূন্যতাকে বোঝাবার জন্য এ রকম একটি গদ্য ভঙ্গিরই প্রয়োজন ছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর আগে কেউ এমন সার্থক গদ্য কোলাজ ব্যবহার করেন নি। এখানে তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা তর্কাতীতভাবে।

কলাকৈবল্যবাদের পরোক্ষ প্রতিধ্বনি এবং নিঃসংকোচে ঘোষিত সাহিত্যদর্শন 'চাই আনন্দের সাহিত্য'কেই বুদ্ধদেব বসু গদ্যভাণ্ডারের বিষয় এবং আঙ্গিকে ব্যবহার করে গেছেন। এই দর্শনের প্রভাবে, বলা যায়, তাঁর গদ্য চর্চার প্রকরণ এবং আঙ্গিক এমন সদা-আমোদিত ও স্ফূর্তিময়। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর জীবনানন্দ-গবেষক, বাংলা সাহিত্য-প্রেমিক আমেরিকান সমালোচক ক্লিন্ট বুস সীলি লেখেন 'তাঁকে আমার মনে হয়েছে একজন আবেগতীব্র মানুষ। দ্রুতলয়ে কথা বলেন তিনি, অবাক সুন্দর তাঁর হাস্যধ্বনি। সবকিছুতে আগ্রহ। আমার বিবেচনায় তিনি একজন 'জীয়ন্ত', 'প্রাণবান', 'টগবগে' এবং 'উদ্যমী' মানুষ। আমাদের আলাপ কখনো কখনো খেই হারিয়ে ফেলছিল। অব্যক্ত ভাবনাগুলো প্রকাশের সময় তিনি আবেগে থরথর করে কাঁপছিলেন।' এই বর্ণনা থেকে মনে হয় ব্যক্তি বুদ্ধদেব বসু নিজেই যেন গদ্যভাষার জীবন্ত পোর্ট্রেট।

ছেষট্টি বছরের জীবনে বুদ্ধদেব বসু দুশোর বেশি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এর সিংহভাগ জুড়ে আছে গদ্য রচনা। ছোটগল্প সংকলন, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা সংগ্রহ ছাড়াও রয়েছে গবেষনা গ্রন্থ, চিঠি এবং আত্মজৈবনিক স্মৃতিচারণ। রন্ধনকলার ওপরও তাঁর বই আছে। এসব গ্রন্থই গদ্যশিল্পী-কথাশিল্পী বুদ্ধদেব বসুকে কোনো না কোনো বিচারে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে। গদ্যশৈলীর প্রসাদগুণ বুদ্ধদেব বসুকে সাধারণ পাঠকের ভেতর জনপ্রিয় করেছে। তিনি নিজেও হয়তো তাঁর গুনমুগ্ধ পাঠককে একটি নাক-উঁচু শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ দেখতে চান নি। বোধ করি তাঁর শিল্পীসত্তার অঙ্গীকারই ছিল বাঙালি পাঠককে বিশুদ্ধ সাহিত্যপাঠে প্ররোচিত করা, যার জন্য তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের ব্যাপারটি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। নইলে তিনি কেন লিখবেন *উত্তরতিরিশ, কালের পুতুল* বা *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*র মতো সুপাঠ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধগ্রন্থ অথবা 'আমার ছেলেবেলা' বা 'আমার যৌবন' এর মতো আবেশ-জাগানো স্মৃতিচারণ অথবা স্ব-কৃত *শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা*-অনুবাদ গ্রন্থের অমন এক যুগান্তকারী ভূমিকা— যা দশকে দশকে পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের ভিতর আধুনিকতার বীজ রোপন করেছে। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে 'চুল কাটা' এবং 'গোপালপুর-অন-সী' রম্যরচনা দুটির কথা। চুলকাটার মতো একটি দৈনন্দিন কোনো ব্যাপারকে যে সাহিত্যে মণ্ডিত করা যায় তা বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন ক্ষমতাবান গদ্যশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। ভ্রমণকাহিনীতেও তিনি অতুলনীয়।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যরুচি, সাহিত্যবোধ এবং শিল্পচিন্তা পুরোপুরি তাঁর নিজের। পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে তাঁর ওপর বিপুলভাবে। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি পশ্চিমঘেষা। কিন্তু বিষয় ও প্রকরণের এই পাশ্চাত্যমুখিতাকে তিনি বাঙালিয়ানায় আর্দ্র করে নিতেও ভোলেন নি। ফলে সর্বশেষে বুদ্দদেব বসুর কাছ থেকে আমরা এমন এক সাহিত্যসম্ভার বিশেষ করে গদ্যে, উপহার পাই যা একক ও অনন্য। বলতে লোভ হয়, বাংলা গদ্যে সাহিত্য অদ্বিতীয়। হয়তো সেজন্যই আজ পর্যন্ত আমরা তাঁর কোন সার্থক অনুসারি পাই নি। পরবর্তী প্রজন্মে প্রধান বাঙালি গদ্যকার এবং

কথাশিল্পীরা তাঁর প্রভাবে নিজেদের ঋদ্ধ করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁর মেজাজ এবং চারিত্র্যকে সম্পূর্ন গ্রহণ করতে পারেন নি। কারো কারো চেষ্টা ছিল, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু থেকে গেছেন অধরা। অন্যান্য সাহিত্যে, এমন কি বাংলা সাহিত্যেও এর দৃষ্টান্ত আছে। শিল্পের অনেক প্রহেলিকার মধ্যে এটিও একটি।

প্রেমকথার ছেলেমানুষি

সিরাজ সালেকীন

বুদ্ধদেব-কাব্যের প্রথম পর্বে কঙ্কাবতী নামের মানসকন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধে 'কঙ্কাবতী' সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের একটি খসড়া তৈরির প্রচেষ্টা থাকবে।

সহজ মানুষ প্রেম বুঝে ভালো। কিন্তু তা যদি দর্শনের কবলে পড়ে তাহলে দেনা-পাওনায় গড়মিল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধর্ম ও কাব্য তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে তত্ত্ব গড়ে; এই ফাঁকে মন গড়িয়ে মরে, যদি মন থাকে। এই কাজে 'ভাব করিয়া সর্বাংশে না মজিলে' সাগর হয় যে ডোবা তাই-বা কজন বুঝে। রাজপুত্র আর ঘুটেকুড়ানির প্রেম এমনিতে রূপকথা কিংবা রাধাকৃষ্ণের লোককথা লোকের হাতে হাতে ভাবের কীর্তন। তবু এই পর্যন্ত নারী ও পুরুষ প্রায় সমানে সমান, উভয়কেই চেনা বা অনুধাবন করা যায় অর্থাৎ বস্তু বলে কিছু আছে। এখানে সকল কিছুর পরও কীর্তি তো প্রেমেরই, এতে নরনারী আছে— দেহ ও মন নিয়ে আছে। এরপর মানুষের জটিল মনের আধুনিক কারসাজিতে দৃশ্যমান কোনো চিরন্তন পুরুষ [eternal he] তৈরি হয় না, কারণ সকল পুরুষই সমকালীন ও একান্ত অধিকারপ্রবণ; কিন্তু তাদের জন্য চিরন্তন নারী [eternal she] না হলে চলে না। পুরুষের আরো চাই; স্ত্রী আছে সন্তান জন্মদানের জন্য, এর বাইরে সততার সাথে অন্তত একান্ত একজন নারী চাই, তার সঙ্গে প্রেম। কেমন যেন তেলেজলে অমিশেল ভাব! অথচ ভাবের কথা— ভাব জানিলে সকলি মিলে বা মিশে [মর্মার্থ হবে— হাতে ক্ষমতা থাকলে সকলই সম্ভব]। প্রভু কৃষ্ণ ষোলোশ' গোপীর সঙ্গে থাকলে আর যাই হোক তা লীলা, কেবল একান্তভাবে রাধাকে অধিকারের ব্যাপারেই তা প্রেম অভিধা পায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, নিজেকে অন্যের ভেতর অস্তিত্ববান দেখলেই আমরা প্রেম অনুভব করি। কথাটা বৈষ্ণবতত্ত্বে ফেললেও নিরামিষ হয় না; অধিকার ও অধিকৃতের শব্দার্থ পার্থক্যও স্পষ্ট। কেন না বহু পূর্ব থেকেই পুরুষতন্ত্র বলে কিছু একটা আছে। এর বাইরে নিকট অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়, অন্তত তাকাই যেন আমাদের ঔপনিবেশিক পর্বে, বাণিজ্যপুঁজি পণ্য উৎপাদন করে হন্যে হয়ে খুঁজছে বাজার বা ক্রেতা। পুঁজি হলেন প্রভুপুরুষ, পণ্য তাঁর প্রেম, যা বাজার বা ভোক্তার উদ্দেশেই উৎসর্গ করছেন। এভাবেই রোম্যান্টিকেরা যন্ত্রযুগে প্রেমের বহির্বাণিজ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, আর আমরা ভুল বুঝে বড়শিতে গেঁথে গেছি।

এটা খুবই মজার ব্যাপার যে ইংরেজেরা বাণিজ্য, সেই উপলক্ষে শাসন করতে এসে ভারতবর্ষে আমাদের রোম্যান্টিকতা শিখিয়ে গেলেন। লাভের মধ্যে এই লাভ হল কুল গেল অকূলে ভেসে। এমনিতে মুক্তকচ্ছ, অথচ হাতে আরশি, টেরিতোলা চুল, আকাশে চাঁদ— এইসব বাবুদের কথা। ইন্দ্র যেখানে উর্বশীকে সামলাতে ভয় পায় আমরা তাকে বাগানবাড়ি গড়ে দিই! অবশ্য এর জন্য গাঁটের [যদি পরনে কিছু থাকে!] পয়সা খরচ করে ভারতবর্ষের কৃষক। এসবও অন্যরকম প্রেমের [অপ্রেমের] নিদর্শন।

বটতলার হিসাবের খাতা থেকে চুইয়ে-পড়া খুচরো পয়সা থেকেই তৈরি হয় নগর-মহানগর। দূর অতীতে যেভাবে কর্ম রূপান্তরিত হয়েছিল বর্ণে বা অর্থনৈতিক খেলার, রঙে, প্রায় সেভাবে কেউ কেউ শিক্ষা-ক্ষমতার দাপটে অনির্দিষ্ট কিছুর দখল চেয়েছিল, ফলত পৃথক হয়েছিল। এসবও প্রেমতত্ত্বে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার, তা না হলে ব্যর্থ হবে আদর্শলিপির শিক্ষা।

যে উপলক্ষে এতকথা সেই বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন মস্ত জ্ঞানভাণ্ড কাঁধে, তার আহৃত শস্য ছিটাতে ছিটাতে। তাঁর আত্মভাষ্যে প্রমাণিত হয়, অন্তত পাঠ-অভিজ্ঞতায়, শতকরা আশিভাগ তিনি ইয়োরোকেন্দ্রিক। নোয়াখালি-কুমিল্লা হয়ে ঢাকা পেরিয়ে কলকাতায় স্থিত হওয়ার পর্ব-পর্বান্তরে যেভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠে তাঁর মনন সমৃদ্ধ হয়েছে তাতে তাঁর শ্রেণীগত পক্ষাবলম্বন স্পষ্ট : '... পশ্চিমের কালচার আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সেটাকে প্রজ্ঞার দিক দিয়ে সংযুক্ত করে আপন করে নিতে হবে; নইলে আমরা কখনো জাতি হিসেবে বড় হতে পারব না।' এই হল শিক্ষিত ভদ্রলোক; এরা গঙ্গা বা বুড়িগঙ্গার তীরে পঞ্চব্যঞ্জনে অন্নভোজন সমাধার পর বৈকালে শেলী-কিটস-বায়রনসহ টেমস খালের তীরে [!] বায়ু সেবন করেন! এরা মূলত প্রাণে ও জ্ঞানে বাঁচেন ইউরোপে। আমরা দেখেছি অভিসন্দর্ভনির্ভর গবেষকেরা প্রায়শ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে সমাজ-সংলগ্নতার চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এই ভেবে আমরা অনেকেই তৃপ্তি পেয়েছি বুদ্ধদেব একজন সাচ্চা শিল্পী, ভাবি নি তিনি সমাজ অসম্পৃক্ত বলেই বি-রাজনীতিকরণ তাঁর মর্মে বিদ্যমান— যদিও উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি সাক্ষ্য দেয় তিনি কুল হারিয়েছেন। আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলে, তাঁর মূলক্ষেত্র সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে যেমন তিনি লিখছেন : 'আমাদের পাঠক্রমে প্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসন— তাঁর মরুপ্রতিম নাটকগুলিও ডিঙোতে হয়েছিল আমাকে— কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ব্রাউনিং তাঁর এবড়োথেবড়ো ছন্দ আর ইতালির গালগল্প নিয়ে, একটি উন্মাদনা ছিলেন সুইনবার্ন, একটি প্রণয় প্রির‍্যাফেলাইট-গোষ্ঠী— এবং চিত্রকলায় আমার প্রথম প্রবেশের সরু রাস্তাটিও তাঁরাই। আমার এই তখনকার প্রিয় কবিদের কাছে আমি যে কিছু শিখেওছিলাম, আমার 'কঙ্কাবতী' বইটাতে তার নিদর্শন আছে।' বিদ্যায়তনের দোষ বিশেষ কিছু নেই, এগুলো শাঁখের করাত— রসিক জানে কীভাবে কাটতে হয়। আমাদের বাঁকা উঠোনেই বেহুলার মতো নেচে উঠেছিল বাঙালি, আত্মমর্যাদার জন্য— বিশ শতকের শুরুতে। বিতর্কিত তবু বাঙালির আত্মসন্ধানী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যপর্যায়ে জন্ম নেয়া এবং স্বদেশী-অসহযোগ-জাতীয়তাবাদী আলোড়নে কৈশোর-যৌবন কাটানো বুদ্ধদেবই বিদেশী 'কালচার' গ্রহণ করার পরামর্শ দেন, আবার ইয়োরোপীয় বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে চিনছেন মাটি, মাটির মানুষ। অথচ ঐতিহ্য সন্ধানে ব্যস্ত বাঙালি নিজের মতো করে তখন খুঁজে ফিরছেন অতীত ইতিহাস, সাহিত্যিক উপাদান বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। অন্তত আমাদের সাহিত্যে ততদিনে যুক্ত হয়েছে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, মৈমনসিংহ গীতিকা, ঠাকুরমা'র ঝুলি। অবশ্য আমাদের [কালোচুলের কুচবরন কন্যা?] কঙ্কাবতীও প্রিয় নাম কিংবা মনোসুন্দরী হিসেবে স্থান পেয়েছে ধ্যানী নয়, জ্ঞানী বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে— তবে এই জ্ঞানে আছে কুল হারানোর কলঙ্ক। নিশ্চয়ই তখনও শাহরিক কলের ধোঁয়ায় বা কলের জলে কঙ্কাবতীর কালো চুল লাল বা সাদা হয়ে যায় নি। তাহলে উদ্ধৃতির মর্মার্থে কেমন করে মিলবে বা প্রবেশ করবে কঙ্কাবতী? কঙ্কাবতী গো তোমার জন্য কষ্ট হয়! বোতলবন্দি

আলোড়নে তেলে-জলে ভালোই জমে বুদবুদ! রোম্যান্টিকতায় ঘোর-লাগা কঙ্কাবতী তুমিও কী তেমনই বুদবুদ, বোতলবন্দি মনের খোঁয়ারী?

নারী ও প্রেম নিয়ে বুদ্ধদেব যে নির্বাণপন্থী ছিলেন না তা স্পষ্ট। তবুও জীবনানন্দ যেমন ঘোষণা করতে পারেন 'বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিল দেহ একদিন' [*রূপসী বাংলা*, সংখ্যা : ৫৪], তেমনটা অন্তত বুদ্ধদেব বসু উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হন। অবিশ্বাসের দোলা তাকে আক্রমণ করে, তিনি প্রচার করতে চান অপ্রেমতত্ত্বের প্রাথমিক পাঠ :

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল –
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী –
জানি সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি –
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো। [প্রেমিক, *বন্দীর বন্দনা*]

পৌরাণিক পর্বে ইন্দ্র তাঁর রাজত্ব হারানোর ভয়ে প্রায়শ ধ্যানব্রতী ঋষিদের ধ্যানবিচ্যুত করার জন্য স্বর্গনর্তকীদের পাঠিয়ে দিতেন। সেইসব জ্ঞানগর্বী উগ্রতেজা পৌরাণিক ঋষিদের মতোই উচ্চারণ করছেন বুদ্ধদেব বসু। ঋষিদের ভণ্ডামিও উল্লেখযোগ্য। যেমন, ঋষিরা কি কাম অস্বীকার করেছেন? পুরাণগুলো কি কামশাস্ত্রের সূতিকাগার নয়? বরং আমাদের অস্বীকারের তান্ত্রিকতা ভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। কেবল তান্ত্রিক নয়, পুরাণ-পুরুষেরাও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার ভয়ঙ্কর প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁদের পর্বেই পুরুষ-রেত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বীর্য হিসেবে। এর সৃষ্টিক্ষমতা অপূর্ব— একে ধারণ করতে গিয়ে কেবল নারী নয় নদী, পাহাড়, হরিণ, মাছ ইত্যাদি সবকিছুই গর্ভবতী হয়েছে। এমনি আধিপত্যধর্মী কামের ঘূর্ণাবর্তে অস্থির বুদ্ধদেব। তিনি তাই কেবল প্রেম নয় নারীসত্তাকেই অস্বীকার করছেন কিন্তু আকাঙ্ক্ষা সর্বগ্রাসী। এই 'প্যারাডক্স'টি কলোনির সমবয়সী।

এই অস্বীকারের পরও বুদ্ধদেব কঙ্কাবতীকেই নিজের মনোসুন্দরী হিসেবে নির্বাচন করেন। কবি-পুরুষের আধিপত্যে কঙ্কাবতী পরিণত হয়েছিল কঙ্কালে; বাঙালি বলেই কি এমন দুরবস্থা? নারী যখন খেলার পুতুল তাতে কঙ্কাল পুনরায় কঙ্কাবতী হতে সময় লাগে নি, কিন্তু তাতে কী এমন নতুন প্রেমের নতুন প্রলেপ লেগেছে! তবু কঙ্কাবতী নামকে কেন্দ্র করেই কথিত প্রেমের আবহ তৈরি করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু *কঙ্কাবতী* [প্রকাশ : ১৯৩৪, রচনাকাল মূলত ১৯২৯-১৯৩২] কাব্যগ্রন্থের 'আরশি', 'সেরেনাদ', 'কঙ্কাবতী', 'রূপকথা' ও 'শেষের রাত্রি' কবিতায়। পুরুষের ইচ্ছায় নারীর রূপ-স্বরূপ বদলানোর ইতিবৃত্ত বহু পুরাতন হলেও উনিশ শতকে তা দৃশ্যমান ভদ্রমানুষের সাংস্কৃতিক মান অর্জন করে। অবশ্য বাণিজ্যের মোহ তাতে কতটা সংশ্লিষ্ট তার বিচার আমরা এখনও করিনি। এবি পড়ে বিবি সাজতে হয় নারীকে, কেবল ভবতারিণী নামের ওপর ভর করে ভদ্রলোকের ঘর-সংসার চলে না। এছাড়াও আছে পুরুষতান্ত্রিক সহধর্মিণীর প্রসঙ্গ। এজন্যই কঙ্কাবতীকে মাটির টানে গ্রহণ করেন নি বুদ্ধদেব, গ্রহণ

করেছেন প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর স্বপ্নমধুর মধ্যযুগপ্রীতির কারণে। কঙ্কাবতীর স্বরূপ তাই পাল্টে গেছে, তার লাল ও লালচে হলুদ চুল, আপেল ও বেহালার প্রসঙ্গ, জানালার কাচে বাতাসের শব্দ বাঙালির পরিমণ্ডল নিশ্চয়ই নয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকতার বড় সুবিধা হল এতে প্রায়শ কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না। এই চায় পুরুষ। বিরহ যেখানে কীর্তিত হয়, যেমন রাধা, তাকে সম্ভবত কেউ রোম্যান্টিকতা বলে না। কিন্তু পুরুষ দায়িত্বহীনভাবে বিরহী হলে তাকে রোম্যান্টিকতা বলতে বাধা নেই। কেন না মিলনের পূর্বে বিরহ আসে না। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে পুরুষের কিছু না হারালেও নারী হারায় তার সম্ভ্রম, যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরই তৈরি করা। অস্পষ্ট নয়, প্রেমে বিরহ একটা খেলা। সবচেয়ে বড়ো ধোঁকা প্রেমিকাকে জপমালায় পরিণত করা কিংবা তাকে বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র দেখতে পাওয়া। না-পাওয়ার শান্তি বা গ্রহণ না করার সুবিধা পাওয়া যায় এতে :

আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
তারার মতন একশো কোটি। ['কঙ্কাবতী', *কঙ্কাবতী*]

সম্ভবত এভাবেই আকাশে নক্ষত্রে-নক্ষত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একজন মৃত্তিকার নারী। দিবাস্বপ্নকে অপ্রাপ্তি বা অতৃপ্তি হিসেবে চালিয়ে দেবার প্রচেষ্টা সুখকর নয়, অস্থিরতার লক্ষণ। এজন্যই কঙ্কাবতীর শব্দছন্দে জলঘূর্ণনের প্রতিলিপি থাকলেও তা নিরুদ্দিষ্ট, এ যেন জলের সঙ্গে জলের কথা বলা এবং এটাই কবিব্যক্তির সমাজস্বভাব। এর সমান্তরালে বিবেচনা করা যায় জীবনানন্দের কঙ্কাবতীকে, এখানে সে মৃত্তিকা-সংলগ্ন ও সমাহিত :

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে— আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে; এই ঘাস; সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজও অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
এই ঘাস : এরই নীচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
[*রূপসী বাংলা*, সংখ্যা : ১০]

আমাদের জন্য কিছুই কি ব্যবহারোপযোগী থাকবে না? মাটির নিচে গুপ্ত রেখে বা আকাশের নীল ছুঁয়ে আর কতকাল? যদি আমরা আমাদের পরাজয়ের ইতিবৃত্ত বুঝতে শিখি তাহলেই কেবল কঙ্কাবতী কঙ্কাল হবে না। যে 'সময়'-কে বুদ্ধদেব চিহ্নহীন করে রাখছিলেন কিংবা আরো পরে যা 'আধুনিক' নামে চিহ্নিত হবে তার ভেতরটা না পাল্টালে তো কঙ্কাল ও কঙ্কাবতীর তৃতীয়মাত্রা অনুধাবন অসম্ভব।

বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সেই কত বছর আগে, কৌশোরে, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ পড়েছি আমি, পড়েছি না বলে পড়া শুনেছি বলাই সঙ্গত; এখন অত্যন্ত পরিণত বয়সে আবার তাঁর লেখা গদ্য ও কবিতা পড়লাম। দেখি কৈশোরে একদা যে মোহে পড়েছিলাম, এখনও তা ক্ষয় হয়ে যায় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন আমাদের সেন্ট গ্রেগরিস স্কুলের বাংলা শিক্ষকদের একজন; বুদ্ধদেব বসুকে তিনি মনে করতেন আদর্শ গদ্যলেখক; তাই সুযোগ পেলেই গদ্যের রীতি এবং প্রবন্ধের রূপ সম্পর্কে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে বুদ্ধদেবের 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ও 'উত্তরতিরিশ' বই থেকে লেখা পড়ে শোনাতেন। সেই শোনা থেকেই আগ্রহের সূত্রপাত, তারপর মোহগ্রস্তের মতোই তাঁর গদ্য পড়েছি; এবং যা বলছিলাম, চল্লিশ বছর পরেও তাঁর রচনা পড়ে কেবল যে পুরাতন অনুভূতির কথা মনে জাগলো তাই নয়, নতুন করেও লাভ করলাম সাহিত্যপাঠের আনন্দ। বুদ্ধদেব বসু টেনে নেন, এবং ধরে রাখেন, তাঁর রচনার মধ্যে অসামান্য প্রবহমানতা রয়েছে। সেখানে উপমা আসে অতিসহজে, শব্দ প্রয়োগ মনে হবে অপ্রত্যাশিত কিন্তু দেখা যাবে একবারেই যথার্থ, বিশেষ্যের সঙ্গে চমৎকার যোগ ঘটে বিশেষণের, এবং একটি দু'টি নয় পরপর তিনটি করে বিশেষণ যোগ করতে তিনি পছন্দ করেন। লেখার রীতিতে সতর্কতা থাকে, সংযমের অভাব ঘটে না, অথচ সর্বদাই মনে হয় সবকিছু স্বতঃস্ফূর্ত, আপনা আপনি এমনি এমনি এগিয়ে চলেছে, নদীর মতো। এবং রচনাগুলো গান গায়, নদীর মতোই। যতিচিহ্ন হিসাবে কমার পর কমা আসে, আমাদেরকে স্থির থাকতে দেয় না, ডাক দেয়, চলমান রাখে। আমার সেই শিক্ষকের মুখে শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল বুদ্ধদেব গদ্য কেবল পঠনে সুখকর নয়, শ্রবণেও মধুর। আসলেও তাই। তাঁর লেখাপড়া মানেই শোনা, যে জন্য পড়া শেষেও মনের ভেতর একটা সুর বাজতে থাকে, গানের।

মূলত তিনি কবি। সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের বসতবাড়ির নাম রেখেছেন 'কবিতাভবন'; 'কবিতা' নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি তিনি পঁচিশ বছর সম্পাদনা করেছেন অব্যাহতভাবে; শনাক্ত করেছেন অনেক কবির মেধাকে যাঁরা এমনিতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন কিন্তু ততটা পরিচিতি পান নি; বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য অনেক পাঠকই বুদ্ধদেব বসুর কাছে ঋণী। নতুন কবিদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর পত্রিকায়, তাঁদেরকে সহায়তা দিয়েছেন রচনা প্রকাশ করে এবং পরামর্শ দিয়ে। আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক তৈরিতে তাঁর সম্পাদক ও সমালোচকের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বললে অনায্য উক্তি করা হবে না।

নিজে তিনি কবিতা লিখেছেন; সে-সব রচনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের মাধ্যমে ফরাসি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয়

করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু বলতে হবে, এবং মানতেও হবে যে, তাঁর আসল রচনা কবিতা নয়, গদ্যই; যদিও সে-গদ্য অবশ্যই একজন কবির লেখা গদ্য। সে-গদ্যের চাঞ্চল্য ও প্রবহমানতা পুরোপুরি কাম্যধর্মী, যা আমাদেরকে স্পর্শ করে, চলমান রাখে। এমন গদ্য কবিপ্রতিভাহীন কারো পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর লেখা অতিসামান্য বিষয়কে অসামান্য করে তোলে। কে বলবে যে ১৯২৫-৩০-এর গ্রাম্য পুরানা পল্টন একটি অত্যন্ত রোমঞ্চকর ও রহস্যময় স্থান ছিল; কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যে তো পুরানা পল্টন নিজের সামান্যতা হারিয়ে প্রায় অলৌকিক এক লোকালয়ে পরিণত হয়েছে। কলকাতার অলিগলি ও রাস্তাঘাটও তাঁর লেখার জাদুস্পর্শে তাদের দিনানুদৈনিকতা হারিয়ে অনন্য হয়ে ওঠে। একই কথা তাঁর নায়কদের সম্পর্কেও সত্য। নায়িকারা তবু আকর্ষণীয় হবার যোগ্যতা রাখে, অন্যান্য কারণের সঙ্গে তাদের দৈহিক গড়ন, ভঙ্গি ও সৌন্দর্যের কারণে, তোদের বেশ কয়েকজনের ফর্সা পা লেখকের সহায়তায় আমরা অবলোকনে সফল হই। কিন্তু নায়কদের অনেককেই মনে হয় বেশ ভালো রকমের অসামাজিক তো বটেই, অকর্মণ্যও; তাদের দম্ভ রয়েছে মেধার কিন্তু সেই-মেধার কার্যকরিতা তেমন একটা প্রকাশ পায় না, কেননা প্রকাশের যে-ক্ষেত্রটি তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে সেটা হলো সাহিত্যিক সাফল্য, যে-সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জন্য অপ্রতিষ্ঠিত। এই বিচ্ছিন্ন ও আত্মঅভিমানী নায়করা নায়িকাদের আকর্ষণ কেড়ে নেয় মেধাবী হওয়ার কারণে। এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরকে দুর্লভ করে রাখবার ক্ষমতা রাখে বলে। তদুপরি বেচারা নায়িকাদের সামনে উপস্থিত বিকল্পগুলো আরো সামান্য বটে। এরা আত্মপীড়ন করে, আত্মহত্যাও করতে চায়, অন্তত একজন তো করেই, কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে যায় বিদেশে, একজনকে দেখা যায় সমাজ ছেড়ে পলাতক হচ্ছে সাঁওতাল পরগনায়। এইসব নায়কদের অবশ্য মস্ত গুণ হচ্ছে বাকপটুতো। চমৎকার কথা বলে, চিঠি লেখে, বক্তৃতা করে, মনোবিশ্লেষণ ঘটায় ডায়েরিতে, এমনকি স্বগতোক্তিতেও। বুদ্ধদেব তাঁর নিজের ভাষার অসামান্যতা তাঁর নায়কদেরকে অকাতরে দান করেন, কখনো কখনো সেই ব্যাপারটাকে অপাত্রে দান বলে মনে হলেও সেই বদান্যতায় লেখকের অসামান্যতা মোটেই অস্পষ্ট থাকে না। কবির শক্তি সম্পর্কে কোলরিজের যে সর্বজনগ্রাহ্য উক্তি সেটি বুদ্ধদেব বসুর লেখা সম্পর্কে খুবই প্রযোজ্য। কোলরিজ বলেছেন কবি রাখেন সেই ক্ষমতা যার সাহায্যে তিনি পাঠককে রচনাপাঠকালে ব্যক্তিগত অবিশ্বাসের কার্যকারিতাকে স্বেচ্ছায় স্থগিত করে দিয়ে কবি যা বলছেন সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিতে বাধ্য করেন। বুদ্ধদেবও জানেন প্রায়-অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে।

কোলরিজের প্রসঙ্গ এলে রোমান্টিক কবিদের কথা মনে পড়ে। রোমান্টিক কবিদের প্রধান গুণ হচ্ছে সৃষ্টিশীল কল্পনা। বুদ্ধদেব বসুও রোমান্টিকই; তাঁর কল্পনাশক্তি পরিচিতকে অজানা করে তোলে, যদিও অজানাকে যে সব সময়ে পরিচিত করে দেয় এমন নয়। রোমান্টিকরা সাধারণত আত্মমুখী হন; সে-গুণটিও বুদ্ধদেবের রচনার সর্বত্র পাওয়া যাবে।

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতায় রোমান্টিকতার কোনো অসদ্ভাব নেই। ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রায় সকল কবিই রোমান্টিক। এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাই, যদি ও তাঁর সাহিত্যিক অর্জনের প্রধান ভিত্তিটা হচ্ছে মহাকাব্য ও নাটক। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মেজাজটা ক্লাসিকাল কিন্তু অন্তরে তিনিও রোমান্টিকই। কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ মোটেই অভিন্ন

নন, তাঁরা দুই ভিন্ন ধরনের কবি, কিন্তু উভয়েই যে রোমান্টিকই এটা কেউই অস্বীকার করবেন না। আর সবার সেরা রোমান্টিক তো রবীন্দ্রনাথ নিজে, যিনি নিজেকে জন্মরোমান্টিক বলে ঘোষণাই করে গেছেন।

কিন্তু তফাৎ আছে। অন্য রোমান্টিকরা সকলেই আত্মমুখী ঠিকই, কিন্তু তাই বলে যে বিষয়বিমুখ তা নয়, তাঁরা নিজের কথা বলেন এবং সেই সঙ্গে চারপাশের জগৎ ও সমাজকেও নিবিড়ভাবে দেখতে পছন্দ করেন। ধরা যাক ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা, কোলরিজের কথাও। এঁরা উভয়েই রোমান্টিসিজমের দৃষ্টান্তপুরুষ বলে স্বীকৃত। নিজেদের বিষয়ে এঁরা খুব করে বলেছেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেশি, কোলরিজ কিছুটা কম, কিন্তু তাঁদের কারো ভেতরেই সমাজমনস্কতার অভাব ছিল না, রাজনীতিতেও তাঁদের উভয়ের প্রগাঢ় আগ্রহ ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো ফরাসি বিপ্লবে যোগ দেবার জন্য প্যারিসেই চলে গিয়েছিলেন। কোলরিজ রাজনীতি নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেন, লিখেছেন এবং রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতাও করেছেন। শেলি ও বায়রনের ভেতর বিপ্লবীচেতনা কাজ করেছে, এমনকি কিটসও শিল্প বিপ্লবের আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এবং সাধারণভাবে ইংরেজি সাহিত্যের ওই রোমান্টিক কবিরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ। আসলে তাঁরা বিকাশমান পুঁজিবাদের আগ্রাসনকে অস্বীকার করতে চাইছিলেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের সমাজমনস্কতা সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি; এমনকি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়েছেন। রোমান্টিক নজরুলকে সঙ্গতকারণেই বিদ্রোহী বলা হয়; কিন্তু কেবল বিদ্রোহী নন, নজরুল আসলে বিপ্লবীই ছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়লে মনে হবে তা রাজনীতিমুক্ত। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা মোটেই নয়, যেটা অনুসন্ধান মাত্র ধরা পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। যে জন্য দেখি তাঁর বিষণ্নতা কিছুতেই ঘোচে না। পুঁজিবাদ যে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়, ব্যক্তির জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, এমনকি প্রোরচনা জোগায় আত্মহত্যার, এই দুঃসংবাদ তাঁর কবিতায় আছে, এবং তা অত্যন্ত বিশেষভাবেই রয়েছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। এটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয় যে প্রথম জীবনে জীবনানন্দ নজরুলের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যে-প্রভাবের ছাপ বেশ প্রত্যক্ষরূপেই উপস্থিত দেখি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এ (১৯২৫)। অন্তর্মুখী এই কবির ভেতর ছিল গভীর দেশপ্রেম, যে জন্য তিনি বলতে পেরেছেন 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই-না আর', তাঁর স্বভাসিদ্ধ নিম্নকণ্ঠে জানিয়েছেন 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও– আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব...।'

জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে সমালোচক বুদ্ধদেব যতটা অবহিত ছিলেন অন্যকোনো প্রধান লেখক ততটা ছিলেন না। বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছেন বলে মনে করবার কারণ নেই, তবে বুদ্ধদেবের রচনার এখানে সেখানে জীবনানন্দের শব্দ ও পঙ্তি উঁকিঝুঁকি দেয় বৈকি। যেমন, বুদ্ধদেবের একটি উপন্যাসের নাম 'নির্জর স্বাক্ষর', যেটি জীবনানন্দের একটি কবিতার শিরোনাম থেকে এসেছে। যেমন, ওই উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত বিষণ্ন, শেষ পর্যন্ত ক্রন্দনরত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মীরা ও মালতী তাদের একজনের স্বামী ও অপরজনের প্রেমিক সাহিত্যিক সোমেন দত্তের মৃত্যুকে স্মরণ করে পরস্পরের মুখোমুখি বসে থাকে। "বেলা বাড়লো, রোদ পড়ে গেলো, কিন্তু কেউ উঠলো না। কোনো কথাও বললো না, কেউ তাকালো না কারো দিকে, শুধু নিঃশব্দে বসে থাকলো দুজনে, যেন একজনের অন্যজন ছাড়া এখন

আর কেউ নেই।" পড়তে গিয়ে বনলতা সেনকে মনে না পড়ে উপায় কী? তাঁর অন্য এক চরিত্রের মুখে জীবনানন্দ দাশের কবিতার পঙ্‌ক্তিও শুনতে চাই। কিন্তু প্রভাব কতটা পড়েছে কী পড়ে নি সেটা মুখ্য বিবেচ্য নয়, যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সেট হলো বুদ্ধদেবের ও জীবনানন্দ, এঁরা উভয়েই রোমান্টিক, কিন্তু পরস্পর থেকে ভিন্ন প্রকারের, যে-ভিন্নতা দুজন বড় লেখকের মধ্যে সর্বদাই অনিবার্য, কিন্তু এঁদের ক্ষেত্রে যা স্মরণীয় তা হলো বুদ্ধদেব, নজরুল থেকে অনেক দূরবর্তী তো অবশ্যই, জীবনানন্দের নিকটবর্তী হয়েও তিনি তাঁর কাছ থেকেও দূরবর্তী বটে। সেটা বিশেষ করে এজন্য ঘটেছে যে, জীবনানন্দ আত্মমুখী হয়েও অনেক বেশি ইতিহাসসচেতন, বুদ্ধদেবের তুলনায়। বুদ্ধদেব সম্পর্কে বরঞ্চ এমনটা বলা অন্যায় হবে না যে, তিনি ইতিহাসের বড় একটা পরোয়া করেন না। তিনি অত্যন্ত আধুনিক; কিন্তু সে-আধুনিকতাকে লক্ষ করলে কখনো কখনো মনে হয় তিনি যতটা না আধুনিক তার চেয়ে বেশি সমসাময়িক।

জীবনানন্দ দাশ একটি 'বোধে'র কথা বলেছেন–

আলো-অন্ধকারে যাই– মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়– কোন এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।

এই বোধ তাঁকে বিপন্ন করে, যেমন করে বিস্মিত; 'বিপন্ন বিস্ময়' বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও পাবো আমরা, তাঁর একটি উপন্যাসের নামই হচ্ছে 'বিপন্ন বিস্ময়', তাও আবার প্রথম দিককার নয়, শেষদিকেরই। কিন্তু জীবনানন্দের বিপন্নতা ও বিস্ময় কেবল যে নিজেকে নিয়ে তা নয়, তাঁর যাত্রা কেবল যে অন্তর্গামী সেটা বলবার কোনো উপায় নেই। তিনি বেরিয়ে যান নিজের বাইরে, ইতিহাসকে দেখেন, যেমন বর্তমানের তেমনি অতীতের; যেমন তিনি গ্রামের তেমনি শহরের, বিশেষ ভাবেই গ্রামের, যেখানে ধান আছে, রয়েছে শালিখ, আছে হিজল ও হাঁস, ডুমুর ও বেতফল। আত্মঅতিক্রমণের এই রোমান্টিক ঘটনাটিতে বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন না। তিনি পছন্দ করেন নিজের ভেতরে থাকতে। রোমান্টিক সাধারণ প্রকৃতিপ্রেমিক হন; বুদ্ধদেব বসু সেখানেও ব্যতিক্রম।

২

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হচ্ছে এই যে, বাঙালির জীবনে যেহেতু ঘটনার অভাব এবং বৈচিত্র্যও স্বল্প সেই জন্যই আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক হওয়া উচিত ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে, কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিক যতই সঙ্কীর্ণ হোক মানুষের মনের রহস্যের কোনদিন কোনখানে সীমা নেই।" মনের রহস্যের যে সীমা-পরিসীমা নেই সেটিই তো অত্যন্ত বাস্তবিক একটা সত্য; শিল্প বলি সাহিত্য বলি সবকিছুই তো মনোরাজ্যের ওই অপরিসীম রহস্যময়তারই উন্মোচন-প্রচেষ্টা ও স্মারকচিহ্ন। কিন্তু উপন্যাস তো তাঁর জন্ম থেকেই একটি সামাজিক শিল্পমাধ্যম। এবং রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই, তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা কেউই ভুল করেন নি মানুষের মনকে তার বাইরের সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করার আবশ্যকতার ব্যাপারে, তাঁরা বরঞ্চ মেনে নিয়েছেন যে, সেটিই হচ্ছে ঔপন্যাসিকের জন্য সঠিক কাজ, যথার্থ কর্তব্য। হ্যাঁ, আধুনিককালে কোনো কোনো ঔপন্যাসিক মানুষের অন্তর্জগতের রহস্যের ওপর আলো ফেলতে চেয়েছেন ঠিকই, সে-দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে তাঁরা বিশিষ্ট সাহিত্যিক রীতিরও উদ্ভাবন করেছেন; কিন্তু সেই উদ্ভাবন আরোপিত নয়, অনুকরণও নয়, সেটি এসেছে ভেতরের প্রয়োজন থেকে। বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে

অচেতন-অবচেতনের ধারাপ্রবাহকে উপস্থিত করার যে-রীতি অবলম্বন করেছেন সেটা আমাদের নিজস্ব সাহিত্যিক-সামাজিক ইতিহাসের পরিণতি নয়, আরোপিত বটে। বুদ্ধদেবের অসাধারণ ক্ষমতাগুলোর একটি হচ্ছে নতুনকে গ্রহণ করার দক্ষতা। ইউরোপের শিল্পধারার নতুনত্বকে তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছেন অত্যন্ত সহজে এবং মনোহর উপায়ে।

কিন্তু একটা অসুবিধা থেকে গেছে। তাঁর উপন্যাস পাঠে অনেক সময়েই অলডাস হাক্সলি, জেমস জয়েস এবং ভার্জিনিয়া উলফের লেখার কথা স্মরণে আসে। ভার্জিনিয়া উলফের কাব্যময়তা বুদ্ধদেবের রচনারীতির সমগ্রোত্রীয়। যে-অসুবিধার কথা বলেছি সেটা কেবল যে সাহিত্যিক তা নয়, সামাজিকও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে যে-সমাজ গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশে সেটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর সম্ভব যে ছিল না বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অসুবিধার ব্যাপার এই যে, চেতনার অন্তর্প্রবাহের উপস্থাপনার সাহায্যে ইউরোপীয় লেখকেরা মানুষের যে-বিচ্ছিন্নতাকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন সে-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের পরিষ্কার ছায়াপাত ছিল। ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সামাজিক মানুষ, যদিও সামাজিক কারণেই পরস্পর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন; বুদ্ধদেবের নায়কদেরকে মনে হয় ইতিহাস ও সমাজের বাইরের মানুষ, সমাজ ভেতর থেকেও তার বহির্বাসী।

ওদিকে তাদের ভেতরের জগতটা যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তা বলা যাবে না। এদের মনোজগতে আলো আছে, তবে সেখানে অন্ধকারই বেশি; সেই অন্ধকারকে আলোর অধিক বলবার চেষ্টা ঔপন্যাসিক করেন ঠিকই, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত আলো-আঁধারীই থেকে যায়, মোটেই আলোর অধিক হয়ে ওঠে না। মৌলিনাথের কথাই ধরা যাক। মৌলিনাথ ওই নামের উপন্যাসের নায়ক; উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৫২। মৌলিনাথ অকালবার্ধক্যে পীড়িত, সে অত্যন্ত মেধাবী, যে জন্য মফস্বল শহরে বেশ খ্যাত; চিত্রা ও গীতা দুই বোন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, একজনের পর অপরজন; কিন্তু মৌলিনাথ বিয়ে করবে না, তার একমাত্র আনুগত্য সাহিত্যের প্রতি; একগ্রচিত্তে সে সাহিত্যে রচনা করবে। তার ভেতরে একটা 'বোধ' কাজ করছে, যে-বোধ গভীর বিচ্ছিন্নতার। অথচ ইতিহাস তার চতুর্দিক জুড়ে খেলা করছে, যে জন্য পশ্চাৎপদ ঢাকা ছেড়ে তাকে যেতে হচ্ছে কলকাতায়, এবং চিত্রা ও গীতা যাচ্ছে আরো দূরের শহরে, কলকাতা পেরিয়ে দিল্লিতে। কিন্তু লেখক মৌলিনাথের পক্ষে অতটা যাওয়া সম্ভব নয়; শেষ পর্যন্ত সে চলে যায় সাঁওতাল পরগনায়। না, সেখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়; যাচ্ছে, যেতে হচ্ছে নির্জনতার খোঁজে। আমাদের স্মরণে আছে যে, একদা বিদ্যাসাগরও কলকাতা ছেড়েছিলেন, গিয়েছিলেন ওই সাঁওতাল পরগনাতেই, তবে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে নয়, মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে। মৌলিনাথ নতুন বিদ্যাসাগর নয়, সমাজ-পরিবর্তনে আদৌ সে আগ্রহী নয়, তার আগ্রহ আত্মপ্রতিষ্ঠায়, কলকাতায় বসবাসরত অবস্থায় যে কাজে সে সুবিধা করতে পারছে না। একদা-প্রেমিক গীতা ও তার স্বামী বিমলেন্দুকে লেখা চিঠিতে সে জানাচ্ছে, "আতঙ্কের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। যদি আমি আর লিখতে না পারি, যদি আমি আর লিখতে না পারি। যদি ফুরিয়ে যায়, থেমে যায়, হারিয়ে যাই। কী হবে তাহলে, কী হবে, কী হবে, কী উপায় হবে আমার। কেমন করে বাঁচবো, মরে গিয়েও বেঁচে থাকবো কেমন করে? হিম হয়ে গেছে হাত-পা, বন্ধ হয়ে গেছে নিঃশ্বাস।"

মৌলিনাথের পক্ষে সৃষ্টিশীল হবার পথে প্রধান অন্তরায় কোনটি? মৌলিনাথ জানে না, কিন্তু আমরা ঠিকই টের পাই যে, সেটা হলো জীবনীশক্তির অভাব। এই শক্তিটা আসবে কোথা থেকে? আসবে ভেতরের সঙ্গে বাইরের সংযোগের মধ্য দিয়ে। কেবল ভেতর থেকে, ভেতরে যে আছে শুধু তা দিয়েই সৃষ্টি করাটা তো মাকড়সার কাজ, শিল্পীর কাজ নয়। মৌলিনাথ বাইরে থেকে কিছু নেবে না, কেবল অন্তরের সম্পদের ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে এই ব্যবস্থাটা নিষ্ফলা হতে বাধ্য। তার ক্ষেত্রে সেটা হয়েছেও বটে। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর নিজের বেলাতেও এক সময়ে ওই সঙ্কট মর্মান্তিকভাবে দেখা দিয়েছিল বলে তিনি তাঁর 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' বইতে লিখেছেন। এটি ১৯৭৪-এ লেখা। গত চার মাস ধরে– না প্রায় পাঁচ মাছ ধরে– আমি লিখছি না, একটি পঙ্‌ক্তি নয়, একটি বাক্য নয়। জানাচ্ছেন যে, লেখার ইচ্ছাটাই মরে যাচ্ছে তাঁর। তবে মৌলিনাথের বেলাতে যেমনটা ঘটেছিল তাঁর ক্ষেত্রে অবিকল তেমনটি ঘটেনি। তাঁর উপলব্ধিটা দাঁড়িয়েছে এই রকমের। তন্ময় ভাবে কিছু রচনা করতে হলে প্রথমে চাই আস্থা– আস্থা নিজের উপর, অচেতনভাবে মানব সংসারের উপরেও, মানুষের মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার স্থায়িত্বের উপর– এক কথায় আমরা যাকে অস্পষ্টভাবে জীবন বলি তার উপর।" কলকাতায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন, এতো অন্যায় ও অবিচার, নৈরাশ্য ও নিষ্ঠুরতা, এতো ব্যর্থ উন্মাদনা ও অপব্যয়িত উদ্যম, এতো ধ্বংস ও সন্ত্রাস ও আতঙ্ক, যে তাঁর মনে হচ্ছে কী এসে যায় এসবে। অর্থাৎ কী হবে লিখে? মৌলিনাথের মতো নয়, আবার তার মতোও বৈকি। বাইরে থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারছেন না, আবার সেখান থেকে যে দূরে সরে যাবেন তাও সম্ভব হচ্ছে না, যে জন্য ইচ্ছা হচ্ছে লেখাই ছেড়ে দেবেন। মৌলিনাথ পালিয়ে গিয়েছিল সাঁওতাল পরগনাতে, সেখানকার এক ডাকবাংলোতে আশ্রয় নিয়েছিল সে, লেখার ক্ষমতা আবার ফেরৎ পাবে এই ভরসায়; কিন্তু বেচারা মৌলিনাথ না জানুক তার রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু ঠিকই জানেন যে জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে অল্প কিছুদিন সৃষ্টিমূলক কাজ অব্যাহত রাখা যায় হয়তো, কিন্তু কাজটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, হবার নয়। এবং হয় যদিও তাহলেও এর সে সৃষ্টি কৃত্রিম হতে বাধ্য। কেননা তাতে আড়ম্বর ও সাজসজ্জা থাকতে পারে ঠিকই, কিন্তু প্রাণ থাকে না।

ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৯৪২ সালে, বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে যুদ্ধকে একটি নতুন ভয়ঙ্করতায় নিয়ে গেছে, তখন কলকাতায় মূলত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে যে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয় বুদ্ধদেব তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন; এবং হিটলারের ফ্যাসিবাদকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন, আর যে মেরুদণ্ডহীন মদাপ্লুত অন্যায় পশুশক্তি বীভৎস মাতলামিতে আজ পৃথিবী ভরে ছারখার করে বেড়াচ্ছে তাকে আমরা বলব, তুমি সব পারো কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব কাড়তে পারবে না– তাই তুমি পরাজিত আমরাই জয়ী। কথাগুলো খুবই সুন্দর, কিন্তু হিটলারের পক্ষে একথা শুনে কি সংযত হয়ে যাবার কথা? নাকি বাক্যব্যয় না করে বরঞ্চ চেষ্টা করার কথা ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা, যাতে করে ফ্যাসিবাদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা কোণঠাসা হয়? কিন্তু তেমন আন্দোলনের ডাক বুদ্ধদেব বসুরা দিতে পারেন না, যে জন্য তাঁদের ধিক্কারধ্বনি বাতাসে হারিয়ে যায়, বক্তব্য শুনতে সুন্দর হলেও আদপে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে না, যেমন ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, এমনকি বক্তৃতাও, মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা এসেছিল দৃঢ় অঙ্গীকার থেকে। এমনটা রোমান্টিক কবিদের ব্যাপারে ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁরা প্রবলভাবে ভালোবাসেন, তাই প্রচণ্ডরূপে ঘৃণাও করেন। আর বিশ্বের বিরূপতা দেখে তাঁরা লেখা ছেড়ে দেবেন এরকমের চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেন না, উল্টো বরঞ্চ বৈরী পরিবেশকে জয় করবেন বলে সঙ্কল্পে দৃঢ় হন।

বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা এ রকমের নয়, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাতে অঙ্গীকার যা রয়েছে সেটা জীবনের প্রতি নয়, সাহিত্যের প্রতিই। 'সবপেয়েছির দেশে' বইতে তিনি লিখেছেন,

> আমি যদি কবি হই তাহলে কবি হিশেবে আমার কর্তব্য ভালো কবিতা লেখা, তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে সেই আমার যোগসূত্র।... আমি বরং বলবো, ভালো কবিতা লেখার জন্য যে-রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল বলে জানি, আমি চাইবো আমার জীবন সে-ভাবেই গড়তে, সেটা এস্কেপিজম নয়, সেটা শুভবুদ্ধি।

জীবনের চেয়ে কবিতা বড় এমন কথা কিন্তু অন্যকোনো রোমান্টিক কবি বলেন নি, বলেন নি এমনকি 'এস্কেপিস্টে' বলে কখনো কখনো-অভিহিত কিটসও। 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' বইতে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নাম গ্রহের কোনো একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি বলেই তার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কথাগুলো শুনতে চাঞ্চল্যকর ঠেকে, বুদ্ধদেবের নায়কদের মুখে চমৎকার মানায়, কিন্তু এটাতো কোনো নায়কের বক্তব্য নয়, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর উক্তি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যোজন যোজনের। জীবনানন্দও পুরোপুরি আধুনিক, বিশ্বের যেখান যা সুন্দর সৃষ্টি আছে তার মর্মগ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র অনাগ্রহ নেই, কিন্তু গভীরভাবে প্রোথিত তিনি মাতৃভূমিতে, বুদ্ধদেব যেটা হতে অনিচ্ছুক বলে জানাচ্ছেন।

বুদ্ধদেবের 'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাসটি ১৯৬৯এ লেখা। এর নায়ক শ্রীপতি ভদ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। গ্রাম থেকে সে কলকাতায় এসেছে। ছাত্র সে অত্যন্ত মেধাবী। গৃহশিক্ষকতা করেছে আরতির। এবং আরতি তার এমনই অনুরাগী যে শ্রীপতি ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারে না। মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীপতিকে আরতি ও তার চিকিৎসক পিতা নিজেদের বাড়িতে এনে রেখে যত্ন ও শুশ্রূষা যতটা করা সম্ভব করে সারিয়ে তুলল; কিন্তু সুস্থ হয়েই শ্রীপতির ভেতর জেগে উঠেছে অহংবোধ, নামান্তরে যা হীনমন্যতা; সে পালিয়ে গেছে দিল্লিতে। নিজের মেধার জোরে সে সাংবাদিক হিসাবে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে, দৈনিক পত্রিকায় এডিটরিয়াল লেখে চমৎকার, কিন্তু রাজনীতি তার খুবই অপছন্দ, এমন কোথাও যেতে তার আগ্রহ যেখানে রাজনীতি কেউ কথা বলবে না। এই শ্রীপতিকে বুদ্ধদেব যে অপছন্দ করেন তেমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই। বরঞ্চ শ্রীপতিরাই বুদ্ধদেবের নায়ক বটে।

'দময়ন্তী' কবিতার বইয়ের উৎসর্গপত্রে বুদ্ধদেব লিখেছেন,

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল,
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলক ধাঁধায়,

মীমাংসার স্বর্ণমৃগ সন্ধানীরে নিত্যই কাঁদায়,
প্রতিপক্ষে পিত্ত জ্বলে, সত্তার কপাটে পড়ে খিল।

'মাছধরা' নামের ছোট্ট কবিতাটিতে যে-মানুষটির কথা বলছেন তিনি তাঁর সঙ্গে কবির নিজের মিলটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না,

সে করে মাছের চাষ। আছে এক নির্জন পুকুর।
এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল
ছিপ ফেলে বসে থাকে উদয়াস্ত, যেন অনুপস্থিত, সুদূর

এই জোয়ালে তাঁর আপত্তি নেই। এ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে, আনন্দও দেয়; এই অভ্যাসের বাইরে যেতে তিনি নারাজ। কবির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তও অত্যন্ত স্পষ্ট, কবি অন্যকোনো কাজে লাগেন না কবিতা সৃষ্টি ছাড়া, যে বক্তব্য আমরা একটু আগে উদ্ধৃত করেছি। 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' বইটির ভূমিকায় কবির কর্তব্য সম্পর্কে তিনি লিখছেন,

> যে মধ্য-উনিশ শতকে ইংলন্ডে উপযোগবাদের অভ্যুদয় হলো সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন কবি কোনো 'কাজে লাগে' না, যে-বায়রনের বিদ্রোহের যুগ পার হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ, প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার করে নিতে হয়, অতএব, একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন।

প্রতিবাদ করতে গেলেও প্রতিবদের পাত্রকে স্বীকার করে নিতে হয়, তাই উপেক্ষা ও স্বেচ্ছানির্বাসনই বরঞ্চ গ্রাহ্য– এই দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিকের কাছে প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এটি বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিসিজমের ভেতরে আছে। তাঁর বসবাস ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে; সেটিকে তিনি মেনে নিয়েছেন, এবং মেনে নিয়ে আনন্দের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, নিজের এবং নিজের পাঠকদের জন্য। এ রোমান্টিসিজম বিদ্রোহীর নয়, বন্দীর বটে।

৩

শেকস্‌পীয়রের 'টেমপেস্ট' নাটকে এরিয়েলের অবস্থানটা 'প্রভু' প্রসপেরোর আজ্ঞাবহ হিসাবেই; কিন্তু তার একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে, অদৃশ্যভাবে সে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে। এরিয়েলের স্বপ্ন ছিল একদিন সে স্বাধীন হবে, বিদ্রোহ করে নয়, প্রভু প্রসপেরোর কৃপাভাজন হয়ে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ইংরেজের অধীনে নিজেকে বন্দী অবস্থাতেই জানতো বটে, তবে এরিয়েলের মতো তার মধ্যেও স্বাধীনতার একটা স্বপ্ন ছিল, এবং একটা উড়ু উড়ু ভাব যে ছিল না তাও নয়। অন্য রোমান্টিকরা এই পরাধীনতাকে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। নজরুল তো বিদ্রোহই করেছেন; প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতি ছিল বহুমুখী। জীবনানন্দ দাশের প্রত্যাখ্যানটা ছিল গভীর, যদিও শান্ত। বুদ্ধদেব বসুই ব্যতিক্রম, তাঁর অবস্থান অনেকটা এরিয়েলের মতো, বন্দী যখন হয়েছেনই তখন বন্দী অবস্থায় যতটুকু সুযোগ আছে স্বাধীন থাকার সেটুকুকে তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছেন, সৃষ্টিশীল উপায়ে। ইংরেজের কাছ থেকে সাহিত্যচর্চার যে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা পাওয়া গেছে তার জন্য তিনি

বরঞ্চ কৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষীয়দের কেউ কেউ ইংরেজদের হাত থেকে শিক্ষা নিয়েছে বিজ্ঞানের, কেউ-বা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিন্তু বাঙালি যে গ্রহণ করেছে সাহিত্যচর্চার প্রভাব, এতে তিনি সন্তুষ্ট। *An Acre of Green Grass* বইতে বুদ্ধদেব বলছেন, "Our soul had drunk of the literature of England, and a new literature was born"; এবং যোগ করেছেন এই বক্তব্য যে, "This is a fact for which I find no parallel, for though the British have cast their nets over half the globe, no other foreign shores have responded to them in this particular fashion." এবং অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তা হলো মাতৃভূমিতে বিশ্বের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। সে-দাবিও যথার্থ। তবে এই বীজ ছড়ানো কেবল যে অবিমিশ্র মঙ্গলই গঠন করেছে তা নয়, এতে অমঙ্গলও কিছুটা ঘটেছে বৈকি। অমঙ্গলের একটা হলো সাহিত্যকে অত্যন্ত অধিক মূল্যপ্রদান, অপরটি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের সৃষ্টি, এবং তাদেরকে অনুকরণ করার স্পৃহা। আনুগত্যসৃষ্টিতে এসবের সাংস্কৃতিক ভূমিকাটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

বুদ্ধদেব বসুর নিজের সাহিত্যচর্চার যে বাংলা সাহিত্যের জন্য উপকারী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা গদ্যে তিনি নতুন গতিশীলতা এনেছেন। সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করেছেন। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান মোটেই সামান্য নয়। এবং এমন অনেক উপভোগ্য রচনা রেখে গেছেন, যাদের আবেদন কালজয়ী হবে এমনটা ধারণা না-করবার কোনো কারণ নেই। সর্বোপরি তাঁর প্রত্যেকটি লেখারই ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে। এবং তারা নানা ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেবে।

১৯৩০ সালে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশ করেন। এর সাত বছর আগে নজরুল তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লিখেছেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে; যে অভিযোগে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩০-এ ও আরেকবার ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ হয়েছিল নজরুলের, যেটি কার্যকর হয় নি, গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দরুন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে কোনো বন্দনাগীতি নেই, আছে বিদ্রোহের ঘোষণা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নজরুলের লেখা মোটেই পছন্দ করে নি, যে জন্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বইগুলো একের পর এক নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধদেবের দুটি বই, ১৯৩৩-এ প্রকাশিত 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' এবং ১৯৬৯-এ প্রকাশিত 'রাত ভরে বৃষ্টি' সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অবশ্যই নয়, প্রশ্নই ওঠে না; অভিযোগ ছিল অশ্লীলতার। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাকে কবি তাঁর বন্দীদশা সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই রকমের,

> প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদী কারাগারে বন্দী করে রেখেছো আমায়
> নির্মম বিধাতা মম। এ কেমন অকারণ আনন্দ তোমার।

রাষ্ট্র তো নয়ই, কবি নিজেও নন, দোষ যা তা নির্মম বিধাতার। এই বন্দিত্ব ইতিহাসের ভেতরে অবস্থানরত-অবস্থায় ঘটছে না, যেন ঘটছে বাইরে। এবং এই বন্দিত্ব নিয়ে কবির কোনো আক্ষেপ নেই বরঞ্চ রয়েছে গৌরব ও আনন্দ।

কিন্তু ইতিহাসের বাইরে কি কিছু ঘটে? ঘটা সম্ভব? যৌবনের এই যে বন্দীদশা তাতেও ইতিহাস আছে বৈকি। বলা যাবে রয়েছে আধুনিক ইতিহাস, যা কিনা

পুঁজিবাদের তৎপরতা, যে পুঁজিবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, পরিণত করে আত্মমুখী ব্যক্তিতে, এবং উৎসাহিত করে ভোগবাদিতায়। আধুনিকতার এ একটা রূপ বটে; বুদ্ধদেব যাকে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিয়েছেন। আধুনিকতার আরো একটা রূপ ছিল বৈকি, বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের পর যেটি কারো অগোচরে থাকার কথা নয়; এ রূপটি হলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যেটা আধুনিকের চেয়েও আধুনিক, বলতে হবে অত্যাধুনিক, কেননা এর অবস্থান হচ্ছে পুঁজিবাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে। 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশের প্রায় চল্লিশ বছর পরে প্রকাশিত 'বিপন্ন বিস্ময়' উপন্যাসে একজন সাহিত্যসেবী রথীন্দ্রনাথ রায়, বেশ জোর গলাতেই বলে, 'তিরিশের কবিরা ছিলে ভীরু ও কামুক, যে-স্বাধীনতার ধ্বজা যাঁরা উড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ ছিল না। একজন তাঁর নিজের কামদাহ সহ্য করতে না-পেরে তার জন্য অপরাধী করলেন ভগবানকে, প্রেমিকার দেহের অন্তরালে কঙ্কালের দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে উঠলেন।' বুঝতে অসুবিধা নেই যে, যে-কবির কথা এখানে বলা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন বুদ্ধদেব নিজে। চল্লিশ বছর পরে, মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে, এভাবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজের উপন্যাসেই নিজের বিরুদ্ধে একজন প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু ততদিনে তো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কেবল বুদ্ধদেবের কালের আধুনিকেরাই নন, তাঁদেরকে পেছনে ফেলে রেখে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিরা নিজেদের নানা রকমের 'ক্ষুধা'র সংবাদ আরো অকপটে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুদের সময়ে ডি এইচ লরেন্স অত্যন্ত আধুনিক ছিলেন, বিশেষ করে লরেন্সের 'দেহ-অবলম্বিত এবং দেহ-কামনার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত' প্রেমতত্ত্বের কারণে। কিন্তু লরেন্সের ওই তথাকথিত আধুনিকতার ভেতরে আসল ব্যাপারটা যে ছিল পুঁজিবাদবিরোধিতা সেটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিদের অধিকাংশই বুঝতে পারে নি। লরেন্সের কালে পুঁজিবাদ তার অমানবিকতাকে উন্মোচিত করে ফেলেছে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার ভেতর দিয়ে। পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করার দুটি পথই শুধু তখন খোলা ছিল, একটি হলো সমাজতন্ত্র, অন্যটি পুঁজিবাদের যান্ত্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে সরিয়ে দিয়ে প্রাক-পুঁজিবাদী 'মনুষ্যত্বে'র চর্চা করা, যে মনুষ্যত্বে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি শুষ্ক বুদ্ধির দ্বারা অবদমিত হবে না। লরেন্স দ্বিতীয় পথের পথিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য মূল ব্যাপারটা প্রবৃত্তির কারাগারে উৎফুল্লরূপে বন্দী হওয়া ছিল না, সেটা ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রোমান্টিক যুদ্ধঘোষণা। বুদ্ধদেব বসুদের লেখায় লরেন্সের বহিরঙ্গের ব্যাপারগুলো পাওয়া যাবে হয়তো, কিন্তু ভেতরের প্রাণটা সেখানে অনুপস্থিতই রয়ে গেছে।

৪

রথীন্দ্রনাথ রায়ের মাধ্যমে বুদ্ধদেব যেমন একজন প্রতিপক্ষ হাজির করেছেন, ওই একই কাজ রবীন্দ্রনাথও করে গেছেন তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, যেখানে অমিত রায় নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রবীন্দ্রনাথের লেখার বেশ কৌতূককর সমালোচনা করে, এবং পাঠক তা উপভোগ করে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের কর্তব্যের মধ্যে একটি ছিল রবীন্দ্রবৃত্ত থেকে বের হয়ে যাওয়া। সে-কাজে নজরুল ও জীবনানন্দ তাঁদের নিজ নিজ উপায়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। বুদ্ধদেবও রবীন্দ্রবৃত্ত থেকে বেরিয়ে-যাওয়া লেখক, কিন্তু তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গতও। তাঁর উপন্যাসগুলোর অনেক ক'টিই 'শেষের কবিতা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। দেখা যাবে আছে সেই বৈদগ্ধ্য এবং কথোপকথনের উৎকর্ষ; রয়েছে প্রেম ও বিরহকে প্রধান করে

তোলা। কিন্তু 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ ওই একবারই লিখেছেন; বুদ্ধদেব বসুকে যা ভিন্ন ভিন্নভাবে বেশ কয়েকবার লিখতে হয়েছে।

বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে 'তিথিডোর' (১৯৪৯), যে-উপন্যাসের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ হলো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে কলকাতার মানুষের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। ওই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। তবে সেই পরিবারের সঙ্গে বাইরের কয়েকটি পরিবারের কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এরপর থেকেই দেখা যাবে তাঁর উপন্যাসে জীবন-সংকোচন ঘটেছে। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বহু মানুষের ভিড় করাকে পছন্দ করতেন না, একথা তিনি সরাসরি জানিয়েছেন; কিন্তু তাঁর নিজের উপন্যাসে যত মানুষ আছে, বুদ্ধদেব তত সংখ্যক মানুষকেও প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ; কেননা তিনি মনে করেন উপন্যাসের কাজ হওয়া দরকার মানুষের ভেতরে যে মানুষটি আছে তার খোঁজ করা। কিন্তু সেখানে, সেই অন্তর্জগতে যাওয়া মানেই তো বন্দী হয়ে পড়া, যেটা তাঁর উপন্যাসে ঘটেছে বৈকি।

ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের অভিজ্ঞতার জগতটা ছিল নিতান্তই সঙ্কীর্ণ, যে জন্য অল্প কয়েকটি পরিবার নিয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে। বুদ্ধদেব ইচ্ছা করেই নিজেকে সঙ্কীর্ণ জগতের ভেতর নিয়ে গেছেন। কিন্তু জেন অস্টেনের সঙ্গে তাঁর একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হলো মেয়েদের চরিত্র আঁকা। বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্য নারীপ্রধান নয়, পুরুষপ্রধান বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হচ্ছে 'তিথিডোরে'র স্বাতী। দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাতী পিতৃতান্ত্রিকতার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্বাতীকে আমরা আর দ্বিতীয়বার পাই না। তার কারণ বুদ্ধদেবের জগতটি অসংশোধনীয় রূপে পিতৃতান্ত্রিক। পিতারা সাধারণত যেমন হয় তাঁর নায়কেরাও তেমনি কর্তৃত্বপরায়ণ এবং যতটা না সংবেদনশীল সে-তুলনায় অনেক অনেক অধিক স্পর্শকাতর। তারা মনে করে তারাই কেন্দ্রীয়, অন্যরা, বিশেষ করে মেয়েরা হচ্ছে পরিধির। মেয়েরা অধিকাংশই সুন্দরী, কিন্তু সেটা মেয়েদের নিজেদের আনন্দের জন্য নয়, নায়কদেরকে চরিতার্থতা দানের প্রয়োজনে।

এখানে এসে বোধ করি একটা কথা বলা দরকার। সেটা এই যে, সমস্ত আধুনিকতা, নাগরিকতা এবং ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর ভুবনটিতে নিম্নমধ্যবিত্ত উপাদানের কোনো অভাব নেই। নিম্নমধ্যবিত্তের অহমিকা, লেখাপড়া নিয়ে বড়াই, বিচ্ছিন্নতা, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে তোলা, খাদ্যে উৎসাহ (বুদ্ধদেব বসু রান্নার ওপর একটি বই লিখবেন ভেবেছিলেন) এবং সম্ভব-অসম্ভব নানা রকমের কল্পনাবিলাস, ইউরোপ আমেরিকার প্রতি মোহগ্রস্ততা, এরকম অনেক কিছুই তাঁর লেখায় পাওয়া যাবে। এমনকি তাঁর যে দর্শনবিমুখতা সেটিও নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ বৈকি। তাঁর অনেক বইয়ের শিরোনাম যে কোনো নিম্নমধ্যবিত্তের পছন্দ হবার কথা; যেমন 'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'মিসেস গুপ্ত', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'প্রেমের বিচিত্রগতি', 'অকর্ম্মণ্য', 'মন দেয়া-নেয়া', 'বাড়ি-বদল', 'ভদ্রতা কাকে বলে', 'বিদেশিনী', 'অদর্শনা', 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'হৃদয়ের জাগরণ', 'হাওয়া-বদল' 'পুনর্মিলন', 'পারিবারিক', 'অসামান্য মেয়ে', 'রূপালি পাখি', 'সানন্দা', 'বাসরঘর', 'বিশাখা', 'তুমি কি সুন্দর', 'ক্ষণিকের বন্ধু', 'রান্না থেকে কান্না'। তাঁর উপন্যাস ও গল্প পড়তে পড়তে কখনো কখনো মনে হয় যেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিকভাবে ফিরে এসেছেন।

এই ফিরে আসার ব্যাপারটাতে বুদ্ধদেব যে অবিশ্বাসী ছিলেন তা কিন্তু নয়। An Acre of Green Grass-এ তিনি লিখেছেন, "Time is continuous and history cyclic”. সময় প্রবহমান, কিন্তু ইতিহাস চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। তাই শরৎচন্দ্রের ফিরে আসাটা বিচিত্র কী। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ওই বইতে একটি উক্তি বেশ চাঞ্চল্যকর। সেটি এই রকমের, “It is our misfortune that Saratchandra was gulled by his admirers into imagining that he was anything except a story-teller”. শরৎচন্দ্রকে তাঁর অনুরাগীরা বোকা বানিয়ে বেচারার সর্বনাশ ঘটিয়েছেন, তিনি যে একজন গল্পবলিয়ে ভিন্ন অন্যকিছু নন এই সত্যটি ভুলিয়ে ছেড়েছেন। অর্থাৎ যে-শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে উৎসাহ নেন, মানুষের চরিত্র ও মানুষ্যত্ব সম্পর্কে উজ্জ্বল দার্শনিক মন্তব্য করেন, এবং সামন্তবাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও যথার্থ বুর্জোয়াদের মতো হয়ে ওঠেন, সেই শরৎচন্দ্র মিথ্যা, সত্য শুধু নিম্নমধ্যবিত্ত গল্পবলিয়েটি। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে অবশ্য এটা বলা যাবে না যে, তিনি খুব ভালো গল্পবলিয়ে, কিন্তু এটা অবশ্যই সত্য যে তিনি দার্শনিক-চিন্তার ব্যাপারে স্বভাববিমুখ।

নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেবের একটি মূল্যায়ন সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধ : ‘পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি।’ হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সত্য যে নজরুল সে-ধরনের অগ্রগমন নেই যেটি বিশ্বের বড় বড় লেখকের বেলায় দেখা যায়। কিন্তু নজরুল বালক ছিলেন না, অকালবার্ধক্যে তাঁকে পায় নি, তিনি ইঁচড়েপাকাও নন, এমনকি ‘মৌলিনাথ’ উপন্যাসে পুরানা পল্টন সম্পর্কে বুদ্ধদেব যে লিখেছেন– ‘কৈশোরের সেই লাবণ্য... যার নিজেকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো’ –সে-লাবণ্যও নজরুলে পাওয়া যাবে না। নজরুল আসলে যৌবনের সাহিত্যিক, যে-যৌবনের প্রধান গুণ বিদ্রোহ। বুদ্ধদেবও যৌবনেরই লেখক, কিন্তু ওই জীবনে যথার্থ বিদ্রোহ নেই, যা আছে তা হচ্ছে বিদ্যমানকে মান্য করা ও তা থেকে আনন্দ সংগ্রহ; ‘টেমপেস্টে’র সেই এরিয়েলের মতো। জীবনানন্দ দাশও কিন্তু মেনে নেন নি, যদিও তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। এটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয় যে, বুদ্ধদেবের প্রিয় ঋতু হচ্ছে বর্ষা, যেটা সকল বাঙালিরই প্রিয় বটে। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, এই ঋতু মানুষকে পরস্পরবিচ্ছিন্নও করে বটে, করে তোলে আত্মমুখী, যেমনটা বুদ্ধদেব হতে পছন্দ করেন। অপরদিকে জীবনানন্দের পছন্দ হচ্ছে হেমন্ত, যাতে বিষণ্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই।

৫

ঔপনিবেশিক শাসনকে মান্য করার ব্যাপারটা দিয়েই শেষ করা যাক। একদা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও (১৮১২-১৮৫৯) ওই শাসনকে খুশি মনে মেনে নিয়েছিলেন, যেটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সিপাহি অভ্যুত্থানের সময় কবিতায় তিনি সিপাহিদের উদ্দেশে যে ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিক্ষেপ করেছিলেন, যা অনেকটা ইয়ার্কির পর্যায়ে পড়ে, তার মধ্য দিয়ে। বুদ্ধদেবের রচনায় এধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য বা গ্রাম্যরুচির পরিচয় পাবার প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি ঈশ্বর গুপ্ত যেখানে ‘আধুনিকতা’বিরোধী বুদ্ধদেব সেখানে পরিষ্কারভাবে আধুনিকতার পক্ষপাতী। এই দুই কবির ভেতর সময়ে ব্যবধান এক শ’ বছরের, রুচির ব্যবধানও অত্যন্ত অধিক। বুদ্ধদেব বলেছেন তাঁর ভেতরে দেশপ্রেম নেই, অপরদিকে ঈশ্বর গুপ্ত জানাচ্ছেন যে, তিনি দেশের কুকুরকেও পছন্দ করবেন ‘বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ওই গুণটিকে বলেছেন ‘দেশবাৎসল্য’। কিন্তু একজনের এই দেশবাৎসল্য এবং অপরজনের মধ্যে সেটির

স্বঘোষিত অভাব সত্ত্বেও দুজনের ভেতর নৈকট্য দেখা যায় অন্তত দুটি ক্ষেত্রে। একটি হচ্ছে এঁরা উভয়েরই এরিয়েলপন্থী, এবং দুজনের ভেতরই রয়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত উপাদানের উপস্থিতি।

ঈশ্বর গুপ্ত বেশ স্পষ্টভাবেই ইংরেজভক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি অবশ্যই এরিয়েলপন্থী। বুদ্ধদেব যে ইংরেজভক্ত তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। যদিও রুচির পরিবর্তন এবং সময়ের অগ্রগতির দরুন বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে ভক্তিটা স্থূলরূপে প্রকাশ পায় নি। শেক্‌সপীয়রের নাটকে এরিয়েলের কাজটা কিন্তু এমনিতে যতটা নিরীহ বলে মনে হয় ভেতরে ততটা ছিল না; প্রসপেরোর ভৃত্য হিসাবে এবং প্রভুর স্বার্থে দ্বীপটির আদি অধিকর্তা ক্যালিব্যানের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালানোতে এরিয়েলের কোনো আপত্তি দেখা যায় নি। ক্যালিব্যানের বিদ্রোহ দমন ও তাকে দিয়ে প্রসপেরোর নানা ধরনের গৃহকর্ম সম্পাদন করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এরিয়েলই ছিল প্রসপেরোর ব্যবহৃত অস্ত্র। অতটা না হলেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে ইংরেজের আধিপত্যকে পোক্ত করার কাজে যে সাহায্য করেছেন এ ধারণা মিথ্যা নয়। বুদ্ধদেবের সাহিত্যচর্চা নিশ্চয়ই অমন ক্ষতিকর হয়নি। হবার কথাও নয়। বিশেষ করে এই জন্য যে স্বদেশের যে ভূমিতে ওই আধিপত্যের চাষবাস চলছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের দরুন সে-ভূমি ইতিমধ্যেই বেশ নারাজ ও রুক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওই আধিপত্যকে সাহায্য দানে বুদ্ধদেবের কোনো অসম্মতি যে ছিল না, এটা খুবই সত্য কথা।

বুদ্ধদেব বসুর রচনায় নিম্নমধ্যবিত্ত উপাদানগুলো আমরা সহজেই দেখতে পাই। আত্মসচেতনতা, বিচ্ছিন্নতা, আত্মসন্তুষ্টি, ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্কে মোহ, বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা যেমন ‘তিথিডোরে’র ব্যারিস্টার হারীতকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা– এসব নিম্নমধ্যবিত্ত সংস্কৃতির অংশ। তিনি নিজে যতই যা বলুন না কেন বুদ্ধদেবে একজন খাঁটি বাঙালি; ঈশ্বর গুপ্তের মতোই নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি; তবে অবশ্যই পরবর্তী কালের, এবং অনেক অগ্রসর, সুশিক্ষিত, সমৃদ্ধ, এবং রুচিঋদ্ধ।

একথা হয়তো সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ যাকে সাহিত্যের ‘সত্যমূল্য’ বলেছেন, অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে গভীর সত্যের উন্মোচনের কারণে যে সাহিত্য মূল্যবান, সেই ‘সত্যমূল্যে’র কিছুটা অভাব বুদ্ধদেব বসুর রচনায় রয়েছে, কিন্তু তিনি অবশ্যই একজন কালজয়ী লেখক। যে বৃত্তের ভেতরে আমাদের অসহায় অবস্থান তাকে ভাঙতে তিনি সাহায্য করেন নি এটা জেনে নিয়েও বলতে হবে যে, তাঁর লেখা আমরা উপভোগ করি, অনেককাল করবো, এবং তার লেখার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক যে বৃত্তের ভেতর আমাদের অবস্থান ছিল, এবং এখনো যা শেষ হয় নি তাঁর সংস্কৃতি সম্পর্কে বুঝবার ব্যাপারেও সহায়তা পাবো, এবং পাচ্ছি। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম ‘কালের পুতুল’; নিজে তিনি তেমনটা ছিলেন না, তবে তাঁর কালের ছিলেন বৈকি, শ্রেণীরও; ওই বন্ধনের ভেতরেই তিনি অসামান্য, মেধা এবং পরিশ্রমের কারণে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-ভাবনা

সৌভিক রেজা

১.১ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে, তার একটি হচ্ছে ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর। কেন? না, এইদিন বুদ্ধদেব বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি উল্লেখ করার মতো তারিখ হচ্ছে– ১৯৩০ সাল। এ বছর বুদ্ধদেবের *বন্দীর বন্দনা* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য তারও আগে ১৯২৪ সালে বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ *মর্ম্মবাণী* বেরিয়ে গেছে; কিন্তু সেই বইয়ের কবিতাগুলো নিয়ে বুদ্ধদেবের তেমন কোন আগ্রহ পরবর্তীকালে লক্ষ করা যায় না। কেননা তাঁর মনে হয়েছিলো ওই কবিতাগুলো রচনার সময়ে তিনি ছিলেন 'একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে-কল্পনায় জট-পাকানো একটা বাণ্ডিল–অগোছালো, অস্থির, দোলায়মান–মনের এক অংশে নেহাৎ ছেলেমানুষ'। আর *মর্ম্মবাণীর* প্রকাশের ব্যাপারটা তাঁর কাছে নেহাতই 'ছেলেমানুষি' বলে মনে হয়েছিলো। শুধু বুদ্ধদেব বসুর বেলায়ই নয়, একইরকম ব্যাপার আমরা জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। জীবনানন্দ দাশ তবু তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংকলনে *ঝরা পালক* থেকে তিনখানি কবিতা বাছাই করেছিলেন; কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী তাঁর প্রথমপর্বের কাব্য *কবিতাবলী* বা *উপহার* নিয়ে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তন্বী* সম্পর্কে পরবর্তীকালে কখনোই কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেননি।

বুদ্ধদেব বসু আমৃত্যু সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলে কেউ-কেউ মনে করেন। সমীর সেনগুপ্ত তো একেই বলেছেন তাঁর 'বুদ্ধদেব-বসুত্ব'। আর বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় এই বুদ্ধদেব-বসুত্ব ধীরে-ধীরে অর্জন করেছিলেন *বন্দীর বন্দনার* কবিতাগুলো রচনার সময় থেকেই। *বন্দীর বন্দনা*-র কবিতাগুলো যখন এক-এক করে লিখে উঠছেন বুদ্ধদেব, তাঁর সেই সময়কার মানসিক অভিক্ষেপ সম্পর্কে বলেছেন :

> কলকাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও, ঢাকায় ফিরে স্বস্তি পেয়েছিলাম সেবার; নতুন করে ভালো লেগেছিলো পুরানা পল্টনের উন্মুক্ত মাঠে, নির্জনতা, আমার অভ্যস্ত আরাম, আমার অবকাশে ভরা অন্তরঙ্গ দিন-রাত্রিগুলি। এই যে আমি বেঁচে আছি বইয়ে এবং এবং বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হয়ে, ভালোবাসা দিয়ে এবং পেয়ে, রৌদ্র এবং নক্ষত্রের আলোয় ঘুরে-ঘুরে– কোনো-কোনো মুহূর্তে আমার মনে হয় এই জীবন বড়ো সুন্দর, বড়ো আশ্চর্য, যেন ভেবে পাই না মানুষের মনে কেন থাকে মালিন্য, ঈর্ষা, বিদ্বেষ...ভেবে পাই না কেন কুৎসিত বাসনা-কামনা আমাকেও দংশন করে মাঝে-মাঝে– যে-আমি কবিতায় এত ভাবের কথা লিখছি। আমার এই সব ভাবনা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট–অথবা সেগুলি ভাবনাই নয়, অনুভব মাত্র–যার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য নেই–কিন্তু এরই তলা থেকে হঠাৎ একদিন দুটো লাইন ভেসে উঠলো–
>
> যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
> বসে আছি আমি।'

এই পঙ্‌ক্তি দুটোকে, বুদ্ধদেব বসুর নিজের কাছেই মনে হয়েছিলো, 'এক যুবকের জবানবন্দি, এক দেবশিশুর আত্মঘোষণা।' তিনি বলেছেন, 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত!'–এই শেষ উক্তিটি কাগজে লিখেই আমার অনুভূতি হলো–এটা ঠিক, এটা হয়েছে, এটা সত্যি।' এই কবিতা কোন্ অর্থে ঠিক হয়েছে? কোন্ দিক থেকে সত্যি বলে হয়েছিলো বুদ্ধদেবের? এই প্রশ্নের, এই কৌতূহলের উত্তর পেয়ে যাই যখন তিনি তাঁর কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'মানে এটা বানানো নয়, আওয়াজের কুচকাওয়াজ নয়, নয় রবীন্দ্রনাথে বা সত্যেন দত্তে বদহজমজনিত উদ্গার–এখানে আমার কিছু বলার ছিলো, এই প্রথম আমি নিজের গলায় কথা বলতে পারলাম।' "বন্দীর বন্দনা" কবিতাটি লেখার পরপরই বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিলো, 'এতদিন শূন্যে ঝুলে থাকার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম এবার–অন্তত একটু দাঁড়াবার মতো জায়গা।' ডুইনো এলিজি (The Duino Elegies) লেখার পূর্বমুহূর্তে রিলকের (Rainer Maria Rilke) যে-মানসিক অবস্থার বিবরণ পাই আমরা, তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের এসব ঘটনার বেশ কতকটা মিল দেখতে পাই আমরা। হয়তো এরকম অভিজ্ঞতা পৃথিবীর আরো অনেক কবিরই রয়েছে; ভবিষ্যতে হবেও।

বুদ্ধদেবের কবিতা- ভাবনার সঙ্গে আমরা তাঁর মানসিক উদারতার ঘটনাগুলোও যোগ করতে চাই। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলি। যেমন : পাস্তেরনাকের (Boris Pasternak) *ডাক্তার জিভাগো* (Doctor Zhivago) উপন্যাস নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের তুমুল বিতর্ক হয়েছিলো গত শতাব্দীর ষাটের দশকে, যার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রয়ে গেছে 'কবিতা' পত্রিকার পাতায়। তারপরেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নিয়মিতই 'কবিতা'র পাতায় দেখা গেছে। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব তাঁদের এসব মতদ্বৈধতা উল্লেখ করেও শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে, যখন তিনি এত ভালো কবিতা লিখছেন?' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে, বিশেষ করে, দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-পাতার সম্পাদকের সঙ্গে বিতর্ক করে, সেইসব পত্রিকার পাতায় লেখা ছাপানোর কথা আজকের দিনে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বুদ্ধদেবের এই মানসিক ঔদার্যের কারণ হচ্ছে, একজন কবির কাছে তাঁর প্রথম এবং সর্বশেষ দাবি ছিলো–ভালো-কবিতা রচনা, এছাড়া আর অন্যকিছুই নয়। আর সে-কারণেই এই বিষয়টিকে তাঁর কবিতা-ভাবনার অন্যতম একটি প্রধান উপাদান হিসেবে আমরা মনে রাখতে চাইছি। সেইসময় আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তিনি খণ্ডন করেছিলেন এই বলে, 'আধুনিক কবিতার চরিত্রই এই যে সে যেটুকু বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার বলবার থাকে; তাই তার ঘনতা ও তীব্রতা বেশি'; আর সেজন্যই আধুনিক কবিতাকে কারো-কারো কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত আর যুৎসই জবাব আর কী-ই বা হতে পারে!

১.২ রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে-কয়জন কবির অবদান সর্বাগ্রে স্মর্তব্য, তাঁদের মধ্যে কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র কবিতা লিখেই নয়, সেইসঙ্গে পত্রিকা-প্রকাশ ও সম্পাদনা, কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-রচনা–এসব কাজের ভিতর দিয়ে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন ও নিজস্ব একটি ঘরানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাছে কবিতা সাহিত্যের নিছক একটি শাখামাত্র ছিলো না; বরং তিনি মনে করতেন, কবিতা হচ্ছে—একজন সৃজনশীল প্রতিভার আন্তর-অনুভূতির প্রকাশ। বলা যায়, সে-কারণেই কবিতাকে রাজনৈতিক প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, বা তাকে রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে

সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি তীব্র বিরোধিতা করে গেছেন আজীবন। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অন্য-কিছু নয়, শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চায় আত্মনিবেশ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে অধ্যাপনা থেকে সাংবাদিকতা—জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কিছুতেই যুক্ত তিনি ছিলেন ঠিকই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেই স্থিত ছিলো তাঁর অবিচল আর অখণ্ড মনোযোগ। সাহিত্য, বিশেষভাবে কবিতা ছিলো তাঁর আত্মোপলব্ধির অনন্য স্মারক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অম্লান দত্ত এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'ধার্মিক যেমন ঈশ্বরের দিকে তাকান মুক্তির জন্যে, বুদ্ধদেব তেমনি পচনশীল-মরণশীল পরিবেশে দাঁড়িয়ে কবিতার দিকে তাকিয়েছেন একধরনের মুক্তির জন্যে।' 'প্রগতি' (১৩৩৪-১৩৩৬), 'কবিতা' (১৩৪২-১৩৬৭)-র মতো পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়েও তিনি কবিতার প্রতি তাঁর সেই মুক্তির দায় যেন পরিশোধ করতে চেয়েছেন।

২.১ বুদ্ধদেবের মানস-গঠনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা তিনি নিজেই বহুবার অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর সময়কালের আধুনিক কবিদের তুলনায় বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চার পরিমাণও অনেক বেশি। অবশ্য এটিও সত্যি যে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে, বিশেষ করে কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরই কাছে লেখা এক চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, 'আমার কাছে আপনি দেবতার মত। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি।' শুধু কৈশোর বা যুবা বয়সেই নয়, বুদ্ধদেবের এই রবীন্দ্র-মুগ্ধতা তাঁর প্রৌঢ় বয়সেও যে অটুট ছিলো; তার নমুনা দেখতে পাই, যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেবের এই অনুরাগের, শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ হচ্ছে, একজন সৎ কবির স্বকীয় মর্যাদাবোধকে রবীন্দ্রনাথ সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। আর সাহিত্যিক-উত্তরাধিকারী হিসেবে বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে তাঁর কবি-জীবনের শুরু থেকেই আয়ত্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কোনো কবি যদি এই আত্মসচেতনতা অর্জন করতে না-পারেন, তবে তাঁর সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য—এটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর পূর্ববর্তী কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মলিক, যতীন্দ্রনাথ বাগচী—প্রমুখ কবির পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। যে-কারণে শুধু বুদ্ধদেব বসুই নয়, তাঁর সমকালের জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে—সকলেই তাঁদের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এই আত্মসচেনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কারণ এঁরা এটি অন্তত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আত্মসচেতন কবিমাত্রেই তাঁর মৌলিক কাব্যকৃতিকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য রাখেন। প্যাটমোর (Coventry Patmore)-কে লেখা এক চিঠিতে কবি হপকিন্স (Gerard Manley Hopkins) বলেছিলেন, 'every true poet, I thought, must be original and originality a condition of poetic genius; so that each poet is like a species in nature...and never recur.'। একজন কবির কাব্যকৃতির এই মৌলিক-নির্মাণের জন্যে, সেই কবির কবিতা-ভাবনার মৌলিকতাও ভীষণভাবে জরুরি। এইটি ঠিক যে কবিতা কবির মৌলিক দর্শনের অভিব্যক্তি নয়; আবার তাই বলে, তাঁর জীবনের, অভিজ্ঞতার সরাসরি উৎসারণও নয়। বরং কবিতা, কবির সামগ্রিক উপলব্ধিকে আত্মস্থ করেই অভিব্যক্ত হয়। সে-কারণেই কবির কবিতা-ভাবনার গতিবিধি সম্বন্ধে, পাঠকের অন্তত, একটা ধারণা থাকা দরকার। বুদ্ধদেব বসু

প্রখরভাবেই আত্মসচেতন যেমন ছিলেন, তেমনি এই সচেতনতার ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করেছিলো রোমান্টিক কাব্য-চেতনা। যে-রোমান্টিকতার প্রতি তাঁর আজীবন পক্ষপাত ছিলো। এখানে বলে নেয়া দরকার যে, রোমান্টিকতা বুদ্ধদেব বসুর কাছে, নিছক একটি কাব্যিক চেতনা কিংবা সাহিত্য-আন্দোলন ছিলো না। এটি ছিলো তাঁর ভাষায়, 'মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি।' যে-চিত্তবৃত্তি একজন কবির মৌলিক কাব্যচেতনারই একটি নির্বিভেদ উপাদান। এই দিকটির দিকে খেয়াল রেখেই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে'। বুদ্ধদেবের কাছে রোমান্টিকতা ছিলো সাহিত্যচর্চার এক উদ্দীপ্ত প্রেরণা; যে-কারণে তিনি বলতে দ্বিধা করেননি, 'বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা—এ-সমস্ত জিনিশকে যাঁরা 'রোমান্টিক' ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা নিতান্তই অবৈধ।" যা কিছু সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে বা সাহিত্যচর্চার জন্যে ক্ষতিকর—তারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব ছিলেন সবসময়ই সোচ্চার। সাংবাদিকতার পেশাকে তিনি সবময়ই সাহিত্যচর্চার জন্যে ভীষণরকম ক্ষতিকর 'কাজ' বলে মনে করতেন, যদিও তিনি নিজেও এই পেশায় যুক্ত ছিলেন। নরেশ গুহকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'সম্প্রতি আমি স্থির করেছি স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় লেখার কাজ ছেড়ে দেবো। ওতে ...আমার ভিতরের প্রভূত লোকসান হয়েছে...অথচ ছেড়ে দিলে সাংসারিক দিকে আপাতত ক্ষতির আশঙ্কা খুব।...সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। সাবধান!' সাংবাদিকতার পাশাপাশি দলীয়-রাজনীতির প্রতিও তাঁর ছিলো বিষম বিতৃষ্ণা; এর কারণ হিসেবে বলা যায় : তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক আনুগত্য একজন লেখকের স্বকীয়তাকে চরমভাবে বিনষ্ট করে। গত শতকের চল্লিশের দশকে যখন বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতি-পন্থার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত, বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিলো, তখনও বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজস্ব সাহিত্যানুচিন্তন থেকে সরে আসেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংঘাতময় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্বধর্মে অবিচল ছিলেন। অনুবর্তী সেই অস্থির সময়ের স্মৃতিচারণ করেছিলেন তিনি এভাবে :

> নানা রঙের নিশেনের তলায় আশ্রয় নিলেন আমাদের খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক কবি-সাহিত্যিক। যা ছিলো ধারণায় অতি উদার তা পরিণত হলো কঠিন এক-একটি মতবাদে; ঐ প্রগতি ব্যাপারটা হয়ে উঠলো একটি ট্রেডমার্ক...সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় তফাৎ ঘুচে গেলো। আমি আছি দর্শকের ভূমিকায় দূরে...অনেক অপব্যয় ও আবেগের অনেক ব্যর্থতা পেরিয়ে ধীরে ধীরে আমার অনুভূতি হলো যে সব গতি ও প্রগতি, পতন ও বিতর্কের পরে অবশেষে কোনো-এক গভীর রাত্রে নিজের মধ্যে নিবিষ্টতা ভালো।

এখানে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই কবি ইয়েট্স (W. B. Yeats)-এর একটি কবিতার কথা আমাদের তখন মনে পড়ে; যেখানে তিনি বলেছিলেন :

I Think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right;
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,
Or an old man upon a winter's night.

২.২ ইয়েট্‌স যে-কারণে বলেছিলেন, যুদ্ধ বা হানাহানির সময় কবিদের জন্যে নিজেদের মুখ বন্ধ রাখাই উত্তম; সেই একই কারণে বুদ্ধদেব বসু, নিজের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট রাখবার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কেননা, রাজনীতিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন বা রাজনীতি যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদেরকে সঠিক পথে চালাবার কোনো ক্ষমতা সাহিত্যিকদের নেই। কাজেই তাঁদের উচিত নিজের কাজ নিজের মতো করে করবার সামর্থ্য অর্জন করা। বুদ্ধদেব বসু কবিতার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই এ-রকম ভাবতে পারতেন, 'কবিতা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে না, ...কবিতা নিজেই মূর্ত, মূর্ত না-হলে সে কবিতাই হলো না।...স্বনির্ভর বলে, কবিতার একটু সুবিধে আছে; যেমন জগৎকে বদলাবার তার শক্তি নেই তেমনি অন্য কিছুও পারে না তার বিকার ঘটাতে...তার সঙ্গে তর্ক চলে না, তা আমাদের উপযোগের অধীন নয়, আমাদের সেবা করে না সে, দখল ক'রে নেয়।' তার মানে ঠিক এটিও নয় যে বুদ্ধদেব বসু প্রগতি-বিরোধী ছিলেন বা একেবারেই রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের বেলায়, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, তিনি কোনোরকম আপোস করেননি, বলা উচিত আপোস করতেও চাননি। একইরকম আপোসহীন ছিলেন ব্যক্তি-মানুষের অধিকার সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রেও। কবির এই মানবিকবোধ কতোখানি তীব্র, ও গভীর ছিলো সেইটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন তিনি বলেন, 'সবচেয়ে ভালো...এমন কোনো ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি বলে অনুভব করতে পারি...আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি পুতুল নই।' সেইসঙ্গে এই চরম সত্যটিও তিনি স্বীকার করতেন, 'মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষত্বের পরম অভিজ্ঞান।' অভিজ্ঞানের সেই স্মারক-চিহ্ন পাবার আকুলতা থেকেই কবি বলেন :

ঋজু পথে আমাদের চলা। পিঁপড়ের কর্মঠ মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব, শৈশব, যৌবন পার হয়ে;
এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নেয় নথিপত্র, স্বাক্ষর, দলিল;

তাই ক্রমে বুড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়ে মানবের অগণ্য সন্ততি।
কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় যদি, তার পথ তোমারই হৃদয়ে—
কেননা কেবল তুমি জানো সেই সূক্ষ্ম, বাঁকা, চেষ্টাহীন গতি।
(স্মৃতির প্রতি : ২)

ফরাসি-কবি বোদলেয়ারের ধরনে তিনিও ব্যক্তি-মানুষের প্রগতিতে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্যিকারের প্রগতি হচ্ছে ব্যক্তির নৈতিক প্রগতি, আর সেটি 'হতে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।' অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু নিজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই—কী জীবনে, কী সাহিত্যে, ব্যক্তি-মানুষকেই তিনি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায় :

> ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যেককে আলাদা ক'রে দেখলে, মানুষের মধ্যে...আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়, যেখানে একই উদ্দেশ্যে–কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়–অনেকে জড়ো হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে; সব মিলে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ক্লান্তি আসে।

৩.১ ব্যক্তিগতভাবেও, বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন, কবিতা-নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা কবির জন্যে একধরনের আশীর্বাদস্বরূপ। এইটি তো অস্বীকার উপায় নেই যে, শিল্প-সাহিত্য একান্তভাবেই ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব নির্মাণ। সম্মিলিতভাবে, জোট বেঁধে কবিতাচর্চা করা যায় না। সে-কারণেই, বুদ্ধদেব বসু, কবির দিক থেকে, নির্জনতাকে, নিঃসঙ্গতাকে কবিতাচর্চার নিয়ামক শক্তি হিসেবে সবসময়ই বিবেচনা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় নিঃসঙ্গতা কখনো-কখনো মানুষকে দুঃখ দেয় বটে; কিন্তু আবার সেইসঙ্গে তা বেঁচে থাকার অবসন্নতাটুকু দূর করে জীবনের মাধুর্যও যেন বাড়িয়ে দেয়। কবি যদি তাঁর নিঃসঙ্গতাকে সহ্য করতে পারেন, যদি তাকে সৃষ্টিশীলতায় অভিব্যক্ত করতে পারেন, তবে তাঁর কাব্যের ভাব-বিন্যাস পাঠকের জন্যে একাধারে চিত্তহারী, মনোগ্রাহী ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধদেব বসুর মতে, নিঃসঙ্গতার মানে সঙ্গহীন, সঙ্গীহীন অবস্থা নয়; বরং মনকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করবার উপায়কেও তিনি নিঃসঙ্গতা হিসেবে বিবেচনা করতেন। যে-কারণে নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সৃষ্টিশীলতার নিরন্তর প্রেরণা। আর তাঁর মতে, কবিতা হচ্ছে সেই সৃষ্টিশীল প্রেরণার শিল্পময় প্রকাশমাধ্যম। কবিতা রচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেখানে প্রেরণাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন; বিপরীত দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রেরণায় ছিলেন বিশ্বাসী। প্রেরণার পাশাপাশি পরিশ্রম, খাটুনি; আর সেইসবের পাশাপাশি 'নিঃসঙ্গতা'কে, তাঁর 'নিষ্ক্রিয়তা'কে একজন কবির কবিতা-কর্মের জন্যে জরুরি উপাদান বিবেচনা করে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'যে শক্তির নিজের ক্রিয়া নেই কিন্তু অন্যের ক্রিয়া গ্রহণের জন্য উন্মুখ, ঐ বিশেষণ তারও প্রতি প্রযোজ্য। এবং এই অবস্থাটা কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর অংশ নিয়ে থাকেন, ভাব-সত্তাকে গ্রহণ করেন, ধারণ করেন, জন্ম দেন—তার বীজ কোথা থেকে পড়ে কেউ জানে না।' বুদ্ধদেবের এই কবিতা-ভাবনার অসাধারণ কাব্যিক প্রকাশ দেখতে পাই 'প্রকোষ্ঠ' শীর্ষক কবিতায়, যেখানে তিনি বলেছেন :

> সব বিরেচক ব্যর্থ,কষ্ট তার অনুচ্চারণীয়।...
> শুকনো জিভে স্বভাবত অসম্ভব কুটুম্বসুধা;
> অতএব বন্ধুহীন, আত্মীয়ের ঈষৎ অপ্রিয়।
> অথচ, সে বলে, এও নষ্ট নয় : তাকে ভগবান
> প্রকোষ্ঠের আহ্নিক আসনে নাকি কদাচিৎ দেখা দিয়ে যান।

শুধু একা বুদ্ধদেব বসুই নয়, সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-শিল্পী মাত্রেই নিঃসঙ্গতাকে, নির্জনতাকে উপভোগের চেষ্টা করেছেন, তাকে তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিৎশে (Friedrich Nietzsche) বলেছিলেন : 'My humanity is a constant self-overcoming. But I need solitude—which is to say, recovery, return to myself, the breath of a free, light, playful air.'। নিৎশেই শুধু নন, জার্মান কবি রিলকে এক তরুণ কবির (Franz Xaver Kappus) কাছে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে এই উপদেশ দিতে ভোলেননি, 'Love your solitude and bear with sweet-sounding lamentation the suffering it causes you.' শুধুই একাকিত্বকে নয়, সেইসঙ্গে নিজের দুঃখকেও ভালোবাসার তাগিদ দিয়েছিলেন এই কবি। তরুণ কবিকে বলেছিলেন, 'Your solitude will be a hold and home for you even amid very unfamiliar conditions and from there you will find your ways.' একজন তরুণ কবিকে প্রতিকূল পরিবেশে যা সবসময় সহায়তা করে, সেইটি হচ্ছে তার নিজস্ব একাকিত্বের বোধ। রিলকে গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন যে শিল্প সবসময়ই এই অন্তহীন একাকিত্বের ফসল। একমাত্র ভালোবাসা, আন্তরিকতাই পারে তাকে কোনো-না-কোনোভাবে স্পর্শ করতে। এই বিশ্বাস থেকেই রিলকের মতো কবি বলতে পারেন, 'Works of art are of an infinite loneliness and with nothing so little to be reached as with criticism '। এসব থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, নিঃসঙ্গতাকে কেন বুদ্ধদেব বসু কখনোই ভয় পাননি। শুধুই কি তা-ই? বলা যায়, নিঃসঙ্গতা তাঁকে কখনোই ক্লান্ত, পীড়িত করতে পারেনি। কেননা, তাঁর জীবন ছিলো একজন বিশুদ্ধ কবির জীবন; যিনি সাহিত্যকে একধরনের ব্রত হিসেবে, নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের আত্মসচেতনতার বোধকে নিরন্তর খুঁজে চলেছিলেন—এইটি বুদ্ধদেবের স্বধর্ম। যে-কারণে তিনি বলেছিলেন :

> মনের গভীরতম স্তরে, আমরাও সুখ, শান্তি ও স্থিতির উপরে অন্য কিছুকে মূল্য দিয়ে থাকি, আমরাও চাই কোনো-এক পরম ও নামহীন সুখ, কোনো-এক চরম নামহীন দুঃখ; এবং যা আমরা জীবনে পাই না, কিংবা যা চাইবার সাহস হয় না আমাদের, সেইসব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই জীবনের বাইরে খুঁজে বেড়াই আমরা; কেউ ধর্মে, কেউ দর্শনে, কেউ সাহিত্যে। যারা নিছকভাবে বাঁধা রাস্তায় জীবন কাটায়, পায়ে-পায়ে সব নিয়ম মেনে চলে, বেআইনি, যুক্তিরহিত, অকথ্য ও অনির্বচনীয়ের দ্বারা কখনো ক্লান্ত হয় না, শুধু তাদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হলে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন থাকতো না।

বুদ্ধদেবের এই বক্তব্য থেকে, আমরা দ্বিধাহীনভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হই যে, সাহিত্য, বিশেষভাবে কবিতা, তাঁর কাছে ছিলো এক স্বনির্ভর শিল্প-মাধ্যম; যা কিনা তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের সঙ্গে ভীষণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাঁর ভাষায়, 'এই সামঞ্জস্য মানেই সম্পূর্ণতা, তৃপ্তি।' সামঞ্জস্যের এই বোধ তাঁর মধ্যে ছিলো বলেই সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক-সত্য থেকে, দার্শনিক-মতবাদ থেকে সার্থক কবিতার ব্যবধানকে স্বীকার করে নিতে তাঁর এতোটুকুও বাধেনি; বরং এইটি স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বসু একজন কবির চৈতন্যকে, তাঁর আত্মজিজ্ঞাসাকে, আত্মোপলব্ধিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পেরেছিলেন। বোদলেয়ারের মতো বুদ্ধদেব বসুও সে-কারণেই চেয়েছিলেন :

> মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী।

তবে তিনি সেইসঙ্গে এইটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিজের চৈতন্যের দ্বারা সবসময় নিজেকে পরিচালনা করা–মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিশেষভাবে যারা, বুদ্ধদেব-কথিত 'বাঁধা রাস্তায় জীবন কাটায়'। এই গভীর সত্যটি মেনে নিয়েই তিনি বলেছেন, 'সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।' এভাবেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা-ভাবনাকে এক মানবীয় চৈতন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে চেয়েছেন। এর পাশাপাশি এটিও আমাদের মনে রাখা উচিত হবে যে, না-কবিতাকে, না-সেই চৈতন্যকে কবি কখনোই কোনো-একটি নির্দিষ্ট 'থিওরি' দ্বারা বিশ্লেষণ করতে চাননি। কেননা, কবিতা তাঁর কাছে ছিলো, বহু বাঞ্ছিত ও অতি দুর্লভ সামঞ্জস্যের

প্রতিমূর্তি; এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি সার্থক কবিতার ভিতরে একইসঙ্গে মিশে থাকে একজন কবির চৈতন্য ও প্রচেষ্টা। সে-কারণে তিনি এ-ও মনে করতেন, 'এমন কোনো থিওরি হতে পারে না, যা সব কবির বা সব কবিতার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।' বুদ্ধদেবের মতো একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির পক্ষে কোনো-একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে কবিতাকে সমর্পণ করা ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনি গভীরভাবেই এইটি বিশ্বাস করতেন যে, কবিতা লেখার মানেই হচ্ছে একজন কবির শুদ্ধতমভাবে নিজেরই কাছে নিজের ফিরে আসার মতো একটা ব্যাপার। আর এই ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত তাঁর আত্মোপলব্ধির অনির্বচনীয় আস্বাদন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি কবিতায় এভাবে বলতে পেরেছেন :

> শুধু তা-ই পবিত্র, যা অতি ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
> নরম, আচ্ছন্ন আলো; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার
> লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার;
>
> ....
> তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক; সে যেখানে যাবে;
> হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির। (রাত তিনটের সনেট : ১)

কবির ক্ষেত্রে, এই ব্যাপারটি কখনোই এমনি-এমনি বা হঠাৎ করে ঘটে না। এর জন্যে কবিকে পরিশ্রম করতে হয়, দরকার পড়ে তাঁর অধ্যবসায়ের। বুদ্ধদেবের মতে, একজন লেখকের জন্যে ধৈর্য ও পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আর কবিতা হচ্ছে, কবির 'সচেতন প্রয়াসের ফলাফল, এবং কিছুটা দৈবেরও দান'। এখানে আমরা আরো-একটি বিষয় দেখতে পাই : সেইটি এই যে, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু প্রেরণা এবং দৈবের ওপর বিশ্বাস রেখেও পরিশ্রম, প্রযত্ন কিংবা নিরন্তর অধ্যবসায়ের দিকটিকে একবারে উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে : কবিতা লেখাটাও একটা কাজ—খাটুনির অর্থে, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা'র অর্থে কাজ—আর তার জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়। কেমন করে তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে তা অন্য কেউ কবিকে বলে দিতে পারবে না, সেখানেও শুধু তাঁর নিজেরই মন সহায়, ভরসার জায়গা নিজের অভিজ্ঞতা।

৩.২ আমরা দেখতে পাই যে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা-ভাবনায় কোনো 'নির্দিষ্ট থিওরি'-কে নয়, বরং কবির আত্মচৈতন্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন; তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেছেন কবির ব্যক্তি-চেতনাকেই। ওই যে বলা হয়ে থাকে, 'Charge your style with life'—বুদ্ধদেবের কবিতা সেই উপলব্ধিরই উৎসারণ; আর তাঁর কবিতা-ভাবনাও সেই উপলব্ধির গভীরতম প্রকাশ। যে-কারণে সমীর সেনগুপ্ত যখন যখন বলেন, 'জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তা ...হচ্ছে : সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখা।' সেটি মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বরং বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো ঠিক তার উল্টোটি; যা কিনা কবির নিয়তি-নির্বন্ধের পাশাপাশি তাঁর সচেতন উদ্যমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে, বুদ্ধদেব বসু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণসহ, অত্যন্ত সহজভাবে পাঠককে জানিয়েছেন :

> কোনো-কোনো কবিতা লিখে উঠতে আমার সময় লেগেছে পাঁচ থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এই কথাটায় একটুও অত্যুক্তি নেই, কেননা 'লেখা' বলতে শুধু কাগজের উপর কলম চালানোকেই বোঝায় না; আদি কল্পনা ও তৈরি লেখাটার মধ্যে, কোনো অজ্ঞাত কারণে, কখনো-কখনো মস্ত ব্যবধান ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই নেপথ্যে চলে অনেক

> আয়োজন, অনেক নতুন বিন্যাস ঘটে কবির জীবনে, অনেক আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়—কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে অলিখিত ও অপেক্ষমাণ কবিতাটির সম্পর্ক কী, কেমন ক'রে সেটিকে তা পুষ্টি দেয় ও জন্মের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলে, সেই প্রক্রিয়াটি ঘটে সচেতন ও অচেতন মনের সীমান্তরেখায়—কবি তার কিছুটা মাত্র টের পান, বাকি অংশ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন থাকে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা-ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে জীবনের আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়ের যে-সূত্রটি বিস্তারিতভাবে বলতে চেয়েছেন, সেটি কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানব-জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন আত্মসচেতন মানুষের জীবনও একইভাবে আহরণ-বর্জন-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে; কবির গড়ে-ওঠার সূত্রটিও অনেকটা তেমন। সেখানে এসব গ্রহণ-বর্জনের পাশাপাশি প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে প্রতিভা আর কঠোর পরিশ্রমের। বুদ্ধদেব বসু মনে-প্রাণে এইটি বিশ্বাস করতেন যে পরিশ্রম ছাড়া শুধুই প্রতিভা, কবিতা-নির্মাণের ক্ষেত্রে, একেবারেই মূল্যহীন। বলা যায়, এভাবেই জীবনকে কবিতার সঙ্গে, কবিতাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কোনোকিছুকেই বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং সমগ্রতার মধ্যে দিয়ে সামঞ্জস্য নির্মাণের চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। যে-সমগ্রতার মূল উৎস ছিলো তাঁর স্বদেশ, স্বদেশের সংস্কৃতি আর তার ঐতিহ্য; যে-ঐতিহ্য তাঁর চেতনায় আত্মোপলব্ধির পাশাপাশি একধরনের আত্মজিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এই আত্মোপলব্ধি এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই আলোকিত হয়ে থাকে একজন কবির নিজস্ব চৈতন্য।

৪.১ 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২' শীর্ষক কবিতায় বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন :

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস;
ডুবে যা নিরভিমান একতাল, বিশ্রস্ত নির্বেদে।

এসব পঙ্‌ক্তি পাঠ করেই এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে বুদ্ধদেব বসু রীতিমত জীবনবিমুখ বা প্রকৃতিবিমুখ কবি ছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে নানাভাবে আকৃষ্ট করেছে—যেমনটি অল্পবিস্তর সব কবিকেই কোনো-না-কোনোভাবে করে থাকে। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে, বিশেষ করে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্যে, প্রকৃতির প্রতি এই কবির অনুরক্তির অজস্র নিদর্শন রয়েছে। প্রকৃতি যে-যেরকমভাবে আমাদের চারপাশে রয়েছে, তাকে ঠিক-ঠিক সেভাবেই নয়, বরং প্রকৃতি তাঁর মনে কীরকমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যে সবসময় সেটিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। শুধু প্রকৃতির বেলায়-বা কেন? একজন কবির জন্যে তাঁর চৈতন্যের বাইরে তো কিছুই নেই। চারপাশের অভিজ্ঞতাকে প্রযত্নে গড়ে তুলেই তো কবি তাঁর অনুভব আর উপলব্ধিকে কাব্যে পরিণত করে থাকেন। সিডনি (Sir Philip Sidney)র সনেট-সিকোয়েন্সে সে-কারণেই তো দেখতে পাই এরকম ভাষ্য : 'Fool, said my Muse to me, look in thy heart and write.'। এবং ঠিক সেই একই কারণেই তো বুদ্ধদেব বসুর বলা : 'প্রাঙ্গণে কিছুই নেই; পারিস তো বধির হয়ে যা।/ যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি?' তিনি সারাজীবন ধরে তাঁর কবিতায় তো বটেই, নিজের কবিতা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্নেরই একটা যথাযথ জবাব খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির বিরাটত্বকে বুদ্ধদেব বসু মানতেন বলেই তাকে নিয়ে বিশেষ-কোনো ধরনের ভাব-

বিহ্বলতা দেখাতে তিনি কখনোই উদগ্রীব ছিলেন না। আবার এমনও তো হতেই পারে মার্কিন কবি ডিকিনসনের (Emily Dickinson) তিনিও বিশ্বাস করতেন–

Nature is what we see...
Nature is what we hear...
Nature is what we know–
Yet have no art to say–
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity.

আর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রকৃতির সেই সরলতায়, তার অনিবর্চনীয়তায় গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েই বুদ্ধদেব বসু 'মহুয়ার দেশে' শীর্ষক তাঁর এক গদ্য রচনায় বলেছিলেন, 'চারদিকে এমন নিরিবিলি, এমন চুপচাপ, লোক এত কম আর সময় এত প্রচুর যে এই অনাড়ম্বর প্রকৃতির প্রতিটি ছোটো-ছোটো ভঙ্গি আমাদের দিনগুলির মধ্যে বোনা হয়ে যায়। মন দিয়ে দেখতে হয় না, চোখ মেলে তাকালেই চোখে পড়ে।'

৪.২ বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সেই রকম একজন কবি, যে-কবির কাছে জীবন ও কবিতা ছিলো সমার্থক। বলতে পারি, তাঁর কাছে জীবন ও কবিতা ছিলো একই চৈতন্যের নানারকম প্রসারণ। যিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতার পক্ষেই মানব-জীবনের যাবতীয় অসাঞ্জস্যকে, বিরোধকে একটি সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তার ঘটানো সম্ভব। যে-সামঞ্জস্যের মানে হচ্ছে—মানব-জীবনে সম্পূর্ণতার একটি বোধ নির্মাণ করা, সম্পূর্ণতার একটি ক্ষেত্র তৈরি করা। সেইসঙ্গে আমরা এটিও বুঝে নিতে সক্ষম হই যে, বুদ্ধদেব বসুর মানসতা ছিলো জীবনের শ্রেয়োবোধের দিকে। যে-শ্রেয়োবোধের কাব্যিক প্রকাশ ছিলো আধুনিক কবিতার নতুন জগৎ নির্মাণের প্রচেষ্টায়; যে-কবিতা আধুনিক হয়েও চিরকালীন। আর তাঁর কবিতা-ভাবনা সেই অর্থে জটিল না-হলেও তা লক্ষণীয়ভাবে অনন্যসাধারণ। এই কবিতা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে শুধু যে বিশ শতকের একজন আধুনিক কবির উপলব্ধির, মননের, অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখতে পাই, তা-ই নয়; বলা যায়, কবিতার চিরকালীন ভোক্তাদের কাছেও (পাঠক ও কবি–দু-তরফের জন্যেই) সেখানে বিস্তর উপাদান রয়েছে, রয়েছে আলোকবর্তিকা। সেই আলোকবর্তিকার সহায়তায় পাঠক-কবি-সমালোচক–সকল পক্ষই নিজ-নিজ গন্তব্যের দিকে খানিকটা দৃঢ় পদক্ষেপে যাত্রা করতে পারবেন। যদিও জীবনেরই মতো সাহিত্যের কোনো গন্তব্য রয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। কেননা, জীবনে যেমন শুধু চলা-ই রয়েছে, সাহিত্যের অভিপ্রায় এর বিপরীত কিছু নয় বলেই তো মনে হয়। যাকে বলা হয় 'the poet of the mind', বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঠিক সেই জাতের কবি; তাঁর কবিতা-ভাবনাও সেই কবিধর্মার্থীরই অনুস্বাক্ষর।

বুদ্ধদেব বসুর পৃথিবীর পথে

সৌমিত্র দেব

মনে হবে ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু তা নয়। একটি কবিতা সংকলনের নাম *পৃথিবীর পথে।* পৃথিবী নিয়ে ভাবনা কবিদের এক প্রিয় বিষয়। শিল্পের বীজ মানসলোকে রোপিত হলেও পৃথিবীর পথ পরিব্রাজন করেই তৃপ্ত হয় শিল্পী মন। সে পথকে ম্যাক্সিম গোর্কি যেভাবে দেখেছেন বাংলার কবিসত্তার অনুভব তার থেকে অনেকটাই আলাদা। আবার আদিযুগ, মধ্যযুগ, রোমান্টিক যুগ অথবা আধুনিক কবিতায় তার দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। অগ্রজ কবিদের প্রভাব পরবর্তীদের রচনায় থেকে যায়। কিন্তু সমসাময়িকদের কিছু শব্দও যখন অন্য কবিকে আলোড়িত করে তখন সেই শব্দের গুরুত্ব অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। জীবনানন্দের সুপরিচিত কবিতা বনলতা সেনের প্রথম লাইনে আছে 'হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। অন্যদিকে তিরিশের দশকের অন্যতম কবি বুদ্ধদেবের বসুর কাব্যগ্রন্থের নাম 'পৃথিবীর পথে'।

পৃথিবীর পথে মোট ১৯টি কবিতার সংকলন গ্রন্থ। এই কবিতাবলীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলোর প্রথম প্রকাশের বিবরণ পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো : ওগো বিদ্যুল্লতা (কল্লোল, আগস্ট ১৩৩৪), অসূর্যম্পশ্যা (প্রগতি, ভাদ্র ১৩৩৪), সুদূরিকা (প্রগতি, ভাদ্র ১৩৩৪), বৈশাখী পূর্ণিমা (কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৫), বাসর রাত্রি (প্রগতি, ফাল্গুন ১৩৩৪), তৃতীয়া (প্রগতি, মাঘ ১৩৩৪), বিরহীর চিঠি (প্রগতি, পৌষ ১৩৩৪), উৎসর্গ (কল্লোল, পৌষ ১৩৩৪), মুক্তিস্নান (প্রগতি, আশ্বিন ১৩৩৫), তবু তোমা ভুলি নাই (কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ ক্ষেত্রে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। কিছু কিছু সংস্কার, বর্জন, সংযোজন, যতিচিহ্নের এবং বানানের পরিবর্তন ছিল তার স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো প্রথম প্রকাশের সময় যেভাবে ছিল গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর তা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যতিচিহ্নের পরিবর্তন তো বটেই। কোন কোন শব্দের উচ্চারণজনিত বানান যেমন সৃজিয়াছো, করিছো, রচিয়াছো পূর্বে উল্লিখিত হয়েছিল ওকার বর্জিত হয়ে। আর কিছু নাহি সাধ কবিতাটি কবির *বন্দীর বন্দনা* কবিতাগ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৬২)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর আগেই কবিতাটি পৃথিবীর পথে (প্রকাশ জুলাই ১৯৩৩) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। *পৃথিবীর পথে* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির নাম 'পূর্বরাগ'। কবিতাটির শুরুই হয়েছে নিসর্গের নিবিড় স্নিগ্ধ বর্ণনা দিয়ে। 'ফাল্গুনের অপরাহ্ন নেমে এলো স্নিগ্ধ, সুমধুর/ নিঃশব্দ চরণপাতে/ উদার প্রান্তর ভরে/ শ্যাম তৃণ পল্লবের মুখে। ছড়াইলো আলোর আবীর;/ধূসর গগনে মেখে দিয়ে গেলো রাঙা রক্তের প্রলেপ/ পত্রহীন, শুষ্ক, ঋজু, দীর্ঘবৃক্ষরাশি/ পশ্চিম দিগন্ত পাড়ে করিয়াছে ভিড়/ তারই পাছে সূর্য অস্ত যায়/ নীরব গৌরবে।' তারপরেই কবি বর্ণনা করেন পৃথিবীতে গোধূলির নেমে আসার সংবাদ। তারপর এক সময়, 'ম্লানতরো হয়ে আসে গগনের ছবি, ডুবে যায় রবি।' এরপর রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা : 'এখনি নামিবে অন্ধকার;/ এখনি উঠিবে জ্বলি তারকার মণি। বাতাস

উঠেছে জেগে; বয়ে নিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস;/ কয়ে যায় কানে কানে। এরপরেই কবির স্বগত সংলাপ : 'আমি কহি মনে মনে; আমি কারে করিবো আহ্বান রাত্রির উৎসব সভা তলে?/ কার তরে স্তিমিত দীপের আলো বারম্বার তুলিবো জ্বালিয়া/ নবীন ইন্ধনে।' এরপরেই গভীর বেদনা নিয়ে ঝরে পড়ে তার পূর্বরাগ : 'ম্লানতরো হয়ে গেছে সন্ধ্যার গগন— আমার ব্যথায় কোন সাড়া তার বাজে নাই বুকে;/ ম্লান, উদাসীন এই সন্ধ্যার গগন।'

কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই প্রকাশ পেয়েছে কবি মনের প্রেমের আর্তি। দ্বিতীয় কবিতা ওগো বিদ্যুল্লতায় আছে গীতলতা। অনেকটাই রাবীন্দ্রিক ধাঁচ। প্রেয়সীর উদ্দেশে নিবেদিত এই কবিতাটি কবির নাম মুছে দিলে যে কারো কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলেই মনে হতে পারে। যেমন : 'ওগো বিদ্যুল্লতা আমার হৃদয়ে কেন তুমি আজি দীপ্ত রচন-রতা?'/ মেঘের কণ্ঠে জ্যোতির মালিকা/ কেন মিছে, হায়, পরালে, ক্ষণিকা?/ সবে না সে ভার, ছিঁড়ি যাবে ডোর/ নিবে যাবে সব আলো/ আকূল আকাশে তুমি মিলাইবে মধুর স্বপন যথা; আমরি হৃদয়ে ঘনাবে আবার কৃষ্ণা নিশির কালো।/ তবে রেখে দাও এক নিমেষের আলোকের ফুল্লতা। ওগো বিদ্যুল্লতা। ...' এভাবেই লিখেছেন 'শেষ অভিসার' 'অসূর্যম্পশ্যা', 'সুদূরিকা', 'বৈশাখী পূর্ণিমা', 'প্রেমপত্র', 'বাসর রাত্রি', 'তৃতীয়', প্রভৃতি কবিতা। এর মধ্যে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' কবিতাটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। অনেকটা মধ্যযুগের কৃত্তিবাসদের ঢঙে। যেমন :

> 'বৈশাখী পূর্ণিমা এলো বৈশাখী পূর্ণিমা এলো
> বৈশাখী পূর্ণিমা এলো আজ, নদীর চঞ্চল জলে, পল্লব অঞ্চল তলে
> নব্যজ্যোৎস্না কাঁপিছে সলাজ। ...'

এরপরে বিরহীর চিঠি কবিতাতে চিত্রকল্প পেয়েছে আধুনিক মাত্রা। তবে ছন্দ এবং শব্দ চয়নে রক্ষিত হয়েছে বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারাবাহিকতা। যেমন—

> 'আকাশটা আজ মরে আছে
> মেঘলা দিনের ঘোলা আলোয়,
> সকাল বেলার রাঙা কমল
> ডুব মেরেছে দীঘির কালোয়।
> আলোর পাখি মুখ ঢেকেছে,
> পাথার প্রাহার মিলিয়ে গেছে
> ভস্মরেণুর আল্পনাতে
> সেজেছে আজ নীলের আলয়।'

পরবর্তী কবিতাগুলোর মধ্যে আছে 'উৎসর্গ'; 'আর কিছু নাহি সাধ', 'তথাপি বাঁচিয়া রবে?' 'পাপী', 'মুক্তিস্নান', 'তবু তোমা ভুলি নাই', সেই ভালো, রহিয়ো নির্ব্বাক', 'তোমারে বেসেছি ভালো', ও 'প্রথম চুম্বন'। বুদ্ধদেব বসুর জীবনের প্রথম দিকে লেখা এই কবিতাগুলোতে তার নিজস্বতা এবং স্বকীয়তার ছাপ থাকলেও শব্দ চয়নে ছন্দের গঠনে, বিষয়ে প্রকরণে অগ্রজ কবিদের প্রভাবও ছিল অনস্বীকার্য। বেশিরভাগ কবিতাই তার দীর্ঘ। কোন কোন কবিতায় নজরুলি ঘরানাও দেখা গেছে। যেমন 'উৎসর্গ' কবিতায়—

> 'তারি তরে রচি মোর গান;-
> যেজন, এসেছে কাছে ভালোবেসে, হাতে হাত ছুঁয়ে,
> স্পর্শের তরঙ্গ দিয়ে দেহ— তট গেছে মোর ধুয়ে;

যাহার কেশের গন্ধে মোর মালঞ্চের ফুল হয়েছে সুরভী।
যার আঁখি কামনায় মনের গগনে মোর ফুটিয়াছে রবি
আমার কেশের মেঘে যার রাঙা আঙুলের বিদ্যুৎ বল্লরী
পুলকিত শিহরণে বারম্বার গেছে খেলা করি।

অথবা 'পাপী' কবিতায়—

'আমারে করিয়ো ভয়; জেনো আমি তোমাদের
নাহি একজন
তোমরা গড়েছো গৃহ, রচিয়াছো শান্তি ভরা
সংসার অঙ্গন।...'

তবে একজন আধুনিক কবির তীব্র রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া যায় বুদ্ধদেবের এই গ্রন্থভুক্ত শেষ কবিতায়–

'আমি শুধু চেয়েছিনু করাঙ্গুলি স্পর্শতর
দিয়েছিলে তুমিই চুম্বন;–
প্রথম চুম্বন সেই কম্পিত কুসুমসম ফুটেছিল
সম্পূর্ণ সুন্দর'
মুদিত পদ্মের মত বীরে ঢলে পড়েছিল
মোর মুখ তর ওষ্ঠাধর;
নিমীল উৎপল-সম নত হয়ে এসেছিল
তব দুটি নীলিম নয়ন।
প্রথম চুম্বন সেই, সে নিগূঢ় পরশেই মেখেছিনু
তৃপ্ত তনুমন,
শুধু করেছিনু আশা একটি মহান মৃত্যু
রুদ্ধশ্বাস তব বক্ষপর। ...'

পৃথিবীর পথে কাব্যগ্রন্থে কবি বুদ্ধদেব বসু যত বেশি আধুনিকতা দেখিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি আরাধ্য করেছেন রোমান্টিকতাকে। আর সে রোমান্টিকতা প্রবাহিত হয়েছে বাংলা কবিতার সহজিয়া ধারায়।

বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহের তথ্য অনুযায়ী *পৃথিবীর পথে* কাব্যগ্রন্থটি বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক ৪৬/১ রণেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলকাতা হতে জুলাই ১৯৩৩ সনে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১/৮ ডিমাই ৪+৪৪ পৃষ্ঠা দাম এক টাকা। কাব্যগ্রন্থের নামপত্রে মুদ্রিত ছিল *পৃথিবীর পথে*/ বুদ্ধদেব বসু প্রণীত/ প্রেমের কবিতা ১৯২৬/২৮) জ্যাকেটের ছবি এঁকেছেন অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। জ্যাকেটের প্রথম ফ্ল্যাপে ডিএম লাইব্রেরি দ্বারা *বন্দীর বন্দনা* সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জ্যাকেটের তৃতীয় ফ্ল্যাপে ছিল *বন্দীর বন্দনা* সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা।

মহাভারতের কথা : বুদ্ধদেব-দর্শন

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

এক অসাধারণ, দুস্তর ও নিয়তি-নির্ভর পথে ভ্রমণের সুযোগ নিলেন বুদ্ধদেব বসু। অসাধারণ এজন্যে যে, ভারতবর্ষের সর্বসীমায় মহাভারতের উপস্থিতি বিশালতায় কিংবা অনুপ্রবেশে লোকাচার, রাজাচার ও ধর্মাচারকে অতিক্রম করে গেছে। দুস্তর— তাঁর অগম্যতার পরিভাষা নির্মাণের কারণে, উপলব্ধির অনুপূর্ব বিশ্লেষণের কারণে। এবং নিয়তি তো ধর্ম ও প্রকৃতির এক যুগল কুহেলিকা— তাকে গ্রহণ করতে হয় দ্বেষ ও দ্বন্দ্বে, শঠতা ও সারল্যে। বুদ্ধদেবের বিহার পরিধিতে জল-স্থলের প্রাবল্যেও স্বর্গের দৃশ্যাবলী, মানুষ ও দেবতার মৌলিক রূপভেদে বৃত্তাকারে উপস্থিত হয়। গতি সময়কে ধারণ করে আলোর আপেক্ষিকতায়, তা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য— তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্যতাও সে সত্যের অধিক। মহাভারত যেন প্রবাহিত সেই সত্যের সঙ্গে যোগ করে ভারতপুরাণ— তার কাল ও অবস্থান, বিবেচনা ও গোত্র একাধারে ইতিহাস, কাব্য, দর্শন-ধর্ম ও বিজ্ঞান। এহেন বুদ্ধদেবীয় অভিব্যক্তি চিন্তামাত্রায় নতুন উপাত্ত যোগ করে, কাহিনীগর্ভে নিমজ্জিত হতে দেয় নতুন উপকরণ।

বাইশটি অধ্যায়; পরিশিষ্ট: সংযোজন ও সংশোধন, নির্দেশিকার সঙ্গে মুখবন্ধ যুক্ত করে মহাভারতের কথার শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু যে শ্লোক উদ্ধৃত করলেন তা অনন্তমুখী তো বটেই, অন্তর্ভেদীও :

> ‘কোনো কোনো কবি এই ইতিহাস পৃথিবীতে পূর্বে বলেছিলেন,
> কেউ কেউ সম্প্রতি বলছেন, ভবিষ্যতেও অন্য কবিরাও বলবেন।’

সময়ের এক অব্যহত যাত্রায় মহাভারত সম্পৃক্ত। তবে সময়-ধারণা খুবই আপেক্ষিক, তার বর্তমান বলে কোনো কিছু থাকা উচিত নয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (পল ও অনুপল) কল্পনায়ও বর্তমানের অস্তিত্ব নেই, হয় অতীত অথবা ভবিষ্যতের প্রাক-কল্পনা। এই সময়-ধারণাকে শ্রবণ ও দর্শনের পরিক্রমায় বহু রৈখিক হতে হয়। বুদ্ধদেব তাঁর মহাভারত-বিচারে নানা প্রশ্নের সঙ্গে কাল মেলাতে গিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় থেকেছেন। আমরা গুরুনেত্রে সে অভিনিবেশের এমন প্রশ্ন পেতে পারি—

১. ধর্ম কি?
২. মানুষ-দেবতা-ঈশ্বর রূপ কি?
৩. সংসার-সমাজ ধারণা কি?
৪. পূর্ব কি পশ্চিমের প্রতিসরণ?
৫. ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যে প্রভেদ কি?

মূলত, আমার পাঠবিবেচনায় বুদ্ধদেব বসু মহাভারত খনন করে উপরিউক্ত পাঁচটি নিঃশর্ত জিজ্ঞাসার প্রবাহিত রূপ সন্ধান করেছেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে এক অনন্ত শর্তময় ভ্রমণে যোগ দিতে পারি।

১.১: চরিত্রঘন মহাভারতে শূন্যের অবস্থান পূর্বে না উত্তরে? আসুন ধর্মযাত্রায় পথটিকে প্রসারিত এবং দীর্ঘ করার জন্য সচেষ্ট হই।

'—ধর্ম! ধর্ম! ধর্ম! কতবার আমাদের শুনতে হলো ধর্ম-ভীষ্মের মুখে, বিদুরের মুখে, ব্যাসের মুখে, নারদের মুখে— সবচেয়ে বেশি যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে— অবিরাম অফুরন্তভাবে পুণরুক্ত'। তাহ'লে মহাভারত কি ধর্মগ্রন্থ? সে সত্য কি আমরা গীতায় পাই? অর্জুন ও কৃষ্ণ-আচরণে মহাভারত কি তখন অলৌকিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে না? বুদ্ধদেব বসু তাঁর সহজাত ভাষাশৈলীতে ধর্মকে সরোবর থেকে পর্বতে, বক থেকে যক্ষে, দ্যূতক্রীড়া থেকে সমরাস্ত্রে পরীক্ষা করেছেন; আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এক মানবিক বিশ্লেষণে প্রতিনায়কের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। ধর্মের সহযাত্রী হয়ে স্বধর্ম যেমন বিবেচিত, তেমনি অধর্ম প্রকাশিত '—সম্যকভাবে পরধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্ম পালন করা ভালো, [কেননা] স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে পাপাক্ত হতে হয় না।'

ধর্ম ও স্বধর্মে এই যে কৃষ্ণ-ব্যাখা তার অনুকূলে যে অধর্ম উঁকি দিচ্ছে, বোধকরি বুদ্ধদেব আমাদের তা প্রকৃতভাবেই উপলব্ধি করাতে পেরেছেন। ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্যের ধর্মের একটি পুরাণগত মিল উদ্‌ঘাটনে তিনি যেমন উদ্বুদ্ধ করেন; তেমনি ধর্মব্যাখ্যায় ঈশ্বর কিংবা অবতারের অবস্থানকে মানুষের সঙ্গে মিলিত করেন; নিয়তিকে গ্রাহ্যে না এনে। তবে মহাভারত তো মূলত নিয়তি-নির্ভর এক আখ্যান, তাই এর ধর্ম-আচরণ ও ধর্ম-উচ্চারণে বিস্তর তফাৎ। এরপর আছে ধর্মরূপ আচার, ধর্মরূপ গোত্র, ধর্মরূপ রাজ্য, ধর্মরূপ অনন্ত ইত্যাদি।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের ধর্মকথন, যুধিষ্ঠিরের সংশয়, কুরুদের আধিপত্য থেকে মায়া ও ছলনা, কৌলিন্য ও ধ্বংসের মধ্যে বীজের কি নতুন অঙ্কুরোদ্‌গম নয়? বুদ্ধদেব বসুর যৌক্তিক ও মানবিক বিশ্লেষণে অবতার কৃষ্ণের ধর্ম ও স্বধর্ম ও অধর্মের ভেদটুকু মুছে গেছে। যা কিছু পৃথিবীতে বোধ ও বিবেচনার যোগ্য তাঁকে তিনি জ্ঞান ও শক্তির মেলবন্ধনে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বুদ্ধদেব পাঠেই আমরা রামধর্ম, লক্ষণধর্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠির-অর্জুনের ধর্মপাত্রটি অন্যভাবে ধারণ করার প্রয়াস পাই।

'মহামানব সাধারণ মানবিক বৃত্তির বহু উর্ধ্বে, এক অদ্বিতীয় কর্মবীর ও ধর্মবীর— এই-ই হলেন বাল্মীকির রামচন্দ্র।' এ-ই যদি হন রাম,— তবে যুধিষ্ঠিরকে বুদ্ধদেব দেখেন এমন : 'আমাদেরই মতো অথচ আমরা কেউ তার মতো নই। ভারতবর্ষীয় প্রতিভার এই এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় সৃষ্টি, যুধিষ্ঠির : কর্মকারী কিন্তু কর্মবীর নন, ধর্মাচারী কিন্তু ধর্মবীর নন, অফুরন্তভাবে জ্ঞানান্বেষী হয়েও জ্ঞানগুরু হতে পারলেন না, স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা নিয়েও তপস্যারত হলেন না কখনো,— আমাদের অনেক ভাগ্যে কোনো অর্থেই তাঁকে মহাপুরুষ বলা যায় না। তিনি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ ...'

প্রেক্ষিত এমন, কৃষ্ণ শুধু অর্জুনের সারথিই নন, কুরুক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রা ধর্মবিধাতা। '—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ! ... স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়'—এই উচ্চারণের পর আর কিছু নেই, মঞ্চে শুধু কৃষ্ণ আর অর্জুন, আর সেই মঞ্চ নিখিলবিশ্বে পরিব্যাপ্ত;—। নিশ্চিতভাবে আমরা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে একমত পোষণ করে শুনতে পারি— 'শুনছি ধর্মের কথা, ধর্মের আহ্বান, ধর্মের প্রত্যাদেশ।' এবং এই-ই হলো কুরুক্ষেত্র। কৌরব ও পাণ্ডবের ধ্বংসলীলার স্বধর্ম। অধর্ম কি খুব দূরে ছিল?

২.২: বুদ্ধদেব বসুর ছুরিটি দুধারী; জীব রক্তাক্ত হওয়া মাত্র তা ধুয়ে-মুছে আনাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর আনাজে মুখ মরে এলে শান হয় বালি ও পাথরে। রামায়ণ যেমন রাম-রাবনের অলৌকিক আখ্যান; অন্যদিকে মহাভারত তেমনি কৌরব-পাণ্ডবের লৌকিক ইতিহাস-ভূগোল। এখানে অংকের খেলাটি কৃষ্ণের হাতে। বনবাস ও সরোবর, রাজত্ব ও নারী, সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব— ইস্পাত ও আগুনের নিঃশর্ত চুম্বনে আমাদের বোধকে জাগতিক করে তোলে। কি ছিল, কি ঘটল, কি ঘটতে পারত-র নানান মাত্রা, নানান আবর্ত বুদ্ধদেব চিহ্নিত করেন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্তর্লোকীয় মনোবিশ্লেষণে। এখানে মানুষ-দেবতা-ঈশ্বর সময়ের নিষ্ঠ-অনিষ্টের সঙ্গে ত্রিভুজ তৈরি করে আছে। যাবতীয় প্রাণীকুল এক উদ্দেশ্যবিহীন মহাকালের কাছে সমর্পিত থেকেও দৌড়ের কাঠিটি হাত বদল করতে পছন্দ করে। তখনই মানব-দেবতা, তখনই দেবতা-ঈশ্বর এক যুগল থেকে অন্য যুগলে উত্তীর্ণ হয়ে শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়। শরীর ও মনের যমজ গমনে মানুষ যেমন খোঁজে নিকেত ও অনিকেতের ভেদ, তেমনি ঈশ্বরও পেতে চায় আস্থা ও অনাস্থার ফলাফল। ঈশ্বরের জন্য মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের জন্য ঈশ্বর— একটি সরল রেখার দুই প্রান্ত, কেবল বৃত্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। মহাভারতের এই রূপটি বুদ্ধদেব তাঁর প্রতিটি পর্বে কম-বেশি পাঠকের ভাবনায় ও দর্শনে উপস্থাপন করেছেন সম্যকভাবে।

ক. কৃষ্ণের মুখে আমরা শুনেছিলাম : '—আমি লোকক্ষয়কারী বৃদ্ধ কাল, অধুনা লোক সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি।'

খ. 'যা থেকে সূর্য উদিত হন এবং যাঁর মধ্যে তিনি অস্ত যান, তাঁরই অন্তরে সব দেবতা প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই তিনি (ব্রহ্ম)।'

অর্জুনের বাস্তবতা কৃষ্ণে, আর কৃষ্ণ হরিরূপে জগৎমায়া, জগৎ-ঈশ্বর!

৩.৩: 'অঋণী অপ্রবাসী হয়ে দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে, যিনি রান্না করেন, তিনিই সুখী।'— সংসার যাপনের একটি মৌলভাবনা বুদ্ধদেব উপস্থাপন করলেন। এ সংসার কি সন্ন্যাসীর না গৃহীর? বনবাসেও সংসার যাপিত হচ্ছে। আহার, নিদ্রা, ভোগ, তত্ত্বকথা, বিবাদ ইত্যাদি চলছে। আবার গৃহেও আনন্দ, ক্রীড়া, সম্ভোগের ঊনভাব পরিদৃষ্ট হয় না। হ্যাঁ, সংসার-ধারণা এবং সমাজ-ধারণার প্রকরণগত পার্থক্যটুকু বুদ্ধদেব তাঁর মহাভারতীয় নৌকায় তুলেছেন সন্তর্পণে। কুটিলতা, সংহার ও বিনাশ শেষে কৃষ্ণ-অর্জুনসহ যখন কোনো প্রাণীই আর জীবিত নেই— তখন একাকী যুধিষ্ঠির চললেন ঊর্ধ্ব আরোহণে; না, শরণার্থী কুকুরটিও যে সঙ্গে আছে! সংসার যাপন করেছেন কৃষ্ণ, করেছেন পাণ্ডব ও কৌরবেরাও। ছল ও কৌশলে (অবশ্যই প্ররোচনায়) পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করেও ভোগ করতে পারে নি সামাজিক অসংলগ্নতায়। তারও পূর্বে কৌরবেরা দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হয়ে পাণ্ডবদের ফতুর করেছে। ধর্মের নামে ন্যায় ও শৃঙ্খলার কারণে যশ ও খ্যাতির আবাহনে— সংসার ও সমাজ হয়েছে ছিন্নভিন্ন। কাম ও ভোগে পদদলিত হয়েছে জ্ঞান ও বোধ। আর্য-অনার্যের কূটচক্রের অন্তরালে অন্য এক 'পঞ্চম' কি বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছিলেন? মহাভারতের আধুনিক ইঙ্গিতে অবশ্য তার কাঠামো যথাযথ স্পষ্ট নয়।

সমবায়ী এ আখ্যানে বুদ্ধদেব স্পর্শ করেছেন হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভারতপ্রাণ তথা সংসার-সমাজপ্রাণ। ঈশ্বর চিন্তার অন্তরালে সত্যের রূপ; আলোর গতির

অধিক মনোবেগ আমাদের দিয়েছে নিত্যনতুন সৃষ্টিভাবনা। মহাভারত খননে তাঁর এই নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আধুনিকই নয়, অভূতপূর্ব।

৪.৪: পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে, আবার নিজেও আবর্তিত হয় স্ব-চক্রে। সেখানে সৌরীয় সময়ের ধারণা দিন ও বছরে গড়ালে— পূর্ব ও পশ্চিমের একটি কল্পদিক তৈরি হয়ে যায়। সময়, দিক, চিহ্ন এবং সর্বোপরি কাল, এক অনন্ত প্রচ্ছায়া। তারপরও বুদ্ধদেব বিষয়টির একটি সরলীকৃত ধারণায় 'পশ্চিম' উপস্থিত করেছেন। এ পশ্চিম যেন হিমালয়কে নির্দিষ্ট করার জন্য গ্রীক পুরাণকে দাঁড়িপাল্লার অপর প্রান্তে তুলেছে। তাঁর পাঠের বিশালতা, তাঁর বিচারের বিস্তৃতিই বস্তুবিন্দু দৃশ্যবিন্দুতে পরিণত হয়। সাহিত্যবিচারের পাশাপাশি চরিত্রবিচারেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠ।

'যুধিষ্ঠিরের বিপরীত মেরুতে, লেভিনবেজুখভের জগৎ থেকে বহু দূরে, আমাদের স্মরণলোকে অন্য এক পুরুষ বিরাজমান: পাশ্চাত্য মানুষের সীমান্তলঙ্ঘী কৌতূহল ও জঙ্গমতার প্রতিরূপ যিনি— আদিসেয়ুস। অর্জুনের চেয়েও বিচিত্র তাঁর জীবন। আরো ব্যাপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসার। ভার্জিল কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উলিসেস বললেন তাঁর শেষ অভিযান ও মৃত্যুর সেই বিবরণ, যা উদ্ভাবন করে দান্তে প্রমাণ করেছেন যে খ্রিষ্টভক্ত স্বর্গযাত্রী হয়েও তিনি ইতালীয় রেনেসাঁসের এক পূর্ববিহঙ্গ। ... যুধিষ্ঠির ও তাঁর গৃহাশ্রমে চিরকাল আবদ্ধ থাকেন নি; তাঁকেও একদিন ডাক দিয়েছিল এক বিপুল মুক্তি— এবং প্রাচীন হিন্দুর চিৎপ্রকৃতি ও ভারতবর্ষীয় ভূগোল অনুসারেই তাঁর সেই যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছিল। ... পৃথিবীর অন্য কোনো পুরাকাব্যে এমন একটি সুন্দর ও সুসংগত ও অনুরণনময় সমাপ্তি আমরা দেখতে পাই না।'

আমরা তাই দিক ভুলে যাব, ভুলে যাব সময়— কেবল মানুষচরিত্রের মৌল স্বরূপটি উন্মোচনে বুদ্ধদেব বসুর উপরিউক্ত বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ হব। অনন্ত শূন্যতায়, মহাভ্রমণে মানুষকে এই যে সমবিন্দুতে স্থাপন— তাই আপেক্ষিক সত্য; তাই-ই ধ্রুব। এমন একটি মিলনে যাজকের ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

কথা আরো আছে,— মহাভারতের থৈ ও অথৈয়ের মধ্যে বুদ্ধদেব যাত্রায় আমরা এক স্পর্শময় ভারতবর্ষকে অবলোকন করি যা উপকরণে ও গঠনে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে,— কিন্তু অর্জুনকে ছোঁয়। আবার অন্যদিকে রামায়ণ প্রসঙ্গে রামের উদাহরণ তিনি নিশ্চিন্তে আমাদেরকে দেন মানুষ ও অবতার— উভয়পক্ষের হয়ে।

'এই দ্বিতীয় পুনর্মিলনের প্রাক্কালে রামের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ আমরা দেখলাম না, যা কোনো শিশির কুমার ভাদুড়ীর দ্বারা অশ্রুসঞ্চারীভাবে অভিনয়যোগ্য।'

চরিত্র বিশ্লেষণের এই যে গভীরতা— তা পাঠককে স্তরে-স্তরে আপ্লুত করে; যুক্তিময় করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থন যোগায়।

৫.৫: "পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় কৃষ্ণ তাঁকে শুধু এই কটি কথা বলেছিলেন (মৌষল:৪) : 'যতক্ষণ অর্জুন এসে না পৌঁছান আপনি এখানে পুরস্ত্রীদের রক্ষা করুন; বলরাম বনের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় আছেন। আমি তাঁর কাছে যাই। বহু কুরুবীরের নিধনকাণ্ড আমি দেখেছি। আজ যদুকুলের বিনষ্টিও দেখলাম। এখন আমি বলরামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তপস্যা করব।'—"

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে ম্লান করে যুধিষ্ঠির যখন ক্রমান্বয়ে উজ্জল হচ্ছেন তখন নিশ্চিত যে, মহাভারতের অন্তিমপর্ব আসন্ন। অর্জুন বিষয়ে বুদ্ধদেবের আবেগ, যুধিষ্ঠির সম্পর্কে তাঁর অনীহা এবং কৃষ্ণকে কলকাঠি নিয়ন্ত্রক হিশেবে চিহ্নিত করেও— বুদ্ধদেবীয় দ্বন্দ্বে

জড়িয়ে যায় 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য: দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য।' মহাভারতের কাহিনী যেভাবে দিক পরিবর্তন করেছে— তার রেখা ধরেই বুদ্ধদেব বসু একে-একে পেরেক পুঁতে গেছেন। আর কারণও আছে, যেভাবে মহাভারত-এর আখ্যানভাগে নানা সময়ে নানা বিন্যাসকারী মূল অগ্নিকাণ্ডে খড়কাঠি ঠেলেছেন— তাতে একে শুধু 'সৃষ্টিছাড়া গ্রন্থ' বলেই বুদ্ধদেব ক্ষান্ত হন নি; আরো বলেছেন—'অসংগতির প্রাচুর্য'। তারপরও তিনি বললেন, *মহাভারত* এক 'বৈভবের অভিজ্ঞান'। এই অভিজ্ঞান– তা দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যকে সমান্তরাল করল, বিপরীতমুখী করল, এবং অবশেষ এক বিন্দুতে স্থাপিত ক'রে যুধিষ্ঠিরকে মহাযাত্রায় নিয়ে গেল। কৃষ্ণ তো ভগবান, কৃষ্ণ তো অর্জুনের সারথি। কৃষ্ণ যদি কর্তা হয় তবে অর্জুন কি? অর্জুনের তো কোনো ঈশ্বর-চেতনা নেই। আবার ছিল না তাই বা বলি কিভাবে? বিশ্বরূপ দর্শনের পর বলেন— 'আপনার মহিমা না-জেনে, ভ্রান্তি অথবা প্রণয়বশত, আমি আপনাকে বন্ধু বলে ভেবেছি, সম্বোধন করেছি— দুর্বিনীতভাবে কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলে।' কিন্তু তারপরও কথা থাকে। অর্জুন চরিত্রের দ্বন্দ্ব সেখানেই— অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধবিমুখতা যেমন অস্বভাবী, ঈশ্বর-চেতনাও তেমন অসহনীয়।' এই হলো বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন। আবার তাঁর যুধিষ্ঠির যখন একা মহাভারতকে উর্ধ্বলোকে তুলে নেন তখন তা যেন ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের অন্যরূপ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়। *মহাভারতের কথা*-র বড় আনন্দ এখানে যে— মহাভারতকে তিনি লালন-পালন করেছেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে; এর সমস্ত অপচয়কে তিনি মূল্যহীনের তালিকায় তোলেন নি, বর্জন করেন নি বিন্দুতম অমনোযোগে।

মহাভারতের আখ্যানভাগ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর রচনা *মহাভারতের কথা* গ্রন্থখানি বিশ্লেষণ ও ভাষায়, তুলনায় ও গোত্রে, দর্শন ও ভাবনায়, ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় অতুলনীয়। ধর্ম, জ্ঞাতি, সংসার, সর্বোপরি আঠারো দিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মৃত্যু-উৎসব— বিস্তারে ও ব্যাপকতায় পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ স্পর্শ ক'রে যায়। ভোগ ও ত্যাগ, মানব ও দেবতার এই যে ঘৃণা এবং ভালোবাসার রথ— তা দাপটের সঙ্গে জগৎসংসার তছনছ করে দেয়। যাপনের জন্য প্রণীত বেদ, উপনিষদ, গীতা যেন আলোর গতির বাইরে অবলোকন করল সৃষ্টিলোক। সৃষ্টিধর্মের রূপান্তরে লয়ধর্মের রূপ,— আবার ক্ষয়ের ভেতর দিয়ে জয়ের অবগাহনেই যেন স্বধর্ম পালন! *মহাভারতের কথা* আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসে, কল্পনা ও আনন্দে, যাপন ও ঐশ্বর্যে, প্রকৃতি ও পরমায় এক নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করে— এক 'পঞ্চম' মাত্রায় আমরা আবিষ্ট হই। অংশভাগী হই গৌরবে, মর্মাহত হই অনাচারে; প্রবঞ্চনা ও শঠতায় ক্লীবের কৌশল হয়ে যায় ঘৃণার উপকরণ। তাঁর চিন্তা, তাঁর সমন্বয়, তাঁর ধ্যান বিস্তারিত হয় হিমালয় চূড়ায়— আর তারপর অসীম শূন্যতায় থাকে অসমাপ্ত বুধসভা। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মহাভারত-দর্শনের আনন্দই আলাদা।

বুদ্ধদেব বসু : লালমেঘে চিত্রকল্পের ক্যানভাস

হেনরী স্বপন

কবিতা শব্দের শিল্প হলে, কবির গদ্য তো কাব্যময় হবেই। যখন কোন ঘটনা–গল্প ও উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে তার চরিত্রগুলো কোন্ ভাষায় মেতে উঠবে ক্রোধ কিংবা প্রশান্তির বাস্তবতায়। কল্পনার পটভূমিতে হলেও প্রত্যেক মানুষের চরিত্র দাঁড়ায় সামাজিক স্তম্ভে আলাদা আলাদা প্লাটফর্মে। এবং তা প্রকাশের ভাষাও বিভিন্ন বিষয়ের–পরিবেশের আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ওঠে। এ জন্যই প্রত্যেক লেখকের পৃথক পৃথক বৈপরীত্য থাকে। মোদ্দাকথা, বিষয়–অভিজ্ঞতা–বাস্তবতার অথরিটি থাকে। তাই যা বলছিলাম, "–পদ্যের যেটা প্রধান আকর্ষণ– শব্দ, শব্দকথা বা বাক্যের সেই অতিদেশাত্মক দিক– গদ্যের ভাষা যেখানে পদ্যের মত উপস্থাপিত বাক্যের বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যেতে থাকে।" এই রকম আর কি!

তাহলে বুদ্ধদেব বসু! বহুপ্রজ এই লেখকের লেখা আমাদের কতভাবে তাড়িত করতে পারে? শুধু তন্ময় অভিনিবেশ আবর্তিত। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভাষায় নিজস্বতার স্মার্টনেস চকচকে শুধু *লালমেঘ* উপন্যাসই নয়, তাঁর সমস্ত গদ্যই রবীন্দ্রগদ্যের হাতছানি এড়িয়ে নিজের দিকে ফেরা। যা কেবল বুদ্ধদেবের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। মাইকেল–শরৎ–নজরুল ও অন্যান্য তাৎপর্যময় বহু লেখার ভিড় থেকে আধুনিক একাকিত্বের কাছে ফিরে আসার মতো জ্যোতি। যেদিকে ফিরে তাকালে যেন আত্মার শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু কোনোভাবেই সময়ের অনুভবকে নিয়ন্ত্রণ করে চলা যায় না। বিষয়কে বাদ দেয়া যায় না- ঘটনার ক্রমানুসারে। তাই কল্পনা আর বাস্তবতা মূলত কংক্রিট নয়। প্রবহমান নদীর মতো গভীরতা পেতে আরও সমুদ্রের দিকে দ্রুত এগোয়। "... এমন-কি যেখানে নির্মলা-সত্যবান প্রসঙ্গ আছে, সেখানেও বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। 'রূপালী পাখি'–'যেদিন ফুটলো কমল'–'বাড়ি বদল'–'আমার বন্ধু'–উনিশশো তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে লেখা এই উপন্যাসগুলোতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি চুম্বন নেই; সারা 'বাসর ঘর' উপন্যাসে যতদূর মনে পড়ে একটিবার মাত্র আছে। *লালমেঘ* যার কাহিনী ব্যভিচারে অথবা তার সহজ সমর্থনে শেষ হতে পারত, যেমন অনায়াসে এড়িয়ে গেছে লালসার পিচ্ছিল পথ, তেমনি পরিহার করছে বোন-সতীনে ঘর করার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটিকে। *লালমেঘ* উপন্যাসে *দুই বোন*–এর অসহ্য ভণ্ডামি নেই; অবিনাশ জানে, সন্ধ্যামনি জানে, শোভনা জানে, মায়ের জাত আর প্রিয়ার জাত নিয়ে কোনো ন্যাকাপনা নেই; শোভনা আর সন্ধ্যামনি দু-জনেই রক্তমাংসের স্ত্রীলোক। শশাঙ্কর মতো একটি নির্বোধ নাগর অবিনাশ নয়, সে দস্তুর মতো শিক্ষিত ব্যক্তি।

> অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটেছে দেখতে দেখতে হঠাৎ উর্মির হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমাকে আমি ভালবাসি! আর তোমার

দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি– জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে'।

দুই *বোন* উপন্যাসে এ-রকম ন্যক্কারজনক ঘটনা অথবা চরিত্রসমাবেশ লালমেঘ-এ অকল্পনীয়; যে কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়ে মাটি করেছিলেন সেই কাহিনীর পুনরুদ্ধার হয়েছে 'লালমেঘ' উপন্যাসে।"

জয়েসীয় ভাষা প্রকরণের আঙ্গিকে বাংলা ভাষায় সচেতনভাবে লিখিত চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উপন্যাস এটি। কথাসাহিত্যের চলমান দীর্ঘ বর্ণনা পদ্ধতির পরিবর্তে নিরীক্ষানির্ভর ভাষামুদ্রা ও বাক্যশৈলীর সার্থক উপস্থাপনায়; বুদ্ধদেবের গদ্যশৈলীর এও এক ধারাবাহিক স্বাতন্ত্র্য। 'এই ভাষামর্ম সব ভাল গদ্য লেখকেরই থাকতে বাধ্য।' 'লালমেঘ' উপন্যাসে ভাষার এই উন্মোচন যতটা প্রতীকী ততটা সাংকেতিক। ভাঙা ভাঙা বাক্যের গঠন। সাধারণত যা আমরা দেখি : অগ্রজ সাহিত্যে হামেশাই আশ্রম–বৈঠকখানা এবং রোমান্টিক আখ্যানের প্রভুত্ব। ঠিক সেই সময় কল্লোলের প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব–জীবনানন্দ। কেননা ফরাসি সিম্বলিস্ট আন্দোলনে কেবল মালার্মেই চিহ্নিত হয়ে আসে না, ইংল্যান্ডের ইয়েটস-জয়েস-এলিয়ট এবং বলা চলে সমস্ত ইউরোপেই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তখন। এই যেমন :

> "আকাশে ঘোর লেগেছে। লাল একটা মেঘ : যেন ডানা ছড়ানো পাখি, এখনি উড়ে চলে যাবে। রঙিন গোধূলি ভরে উতরোল হাওয়া। দক্ষিণ থেকে আসছে এই হাওয়া, সমুদ্র থেকে বঙ্গোপসাগর থেকে হাজার মাইলের নোনাজল পার হয়ে। কলকাতাতেই এই ঝড় : সমুদ্র না জানি আজ কেমন, অবিনাশ চোখ বুজলো, আর দেখলো তার চোখের সামনে কেশর ছড়ানো সিংহের মতো ঢেউগুলো লাফিয়ে পড়ছে। রাত্রে ভয় করে, আর এমনি আমরা ভয় করি– আমাদের রক্তের জোয়ারের আতঙ্ক আর রহস্যকে ভয় করি"

–আপাত এই উদ্ধৃতি উপমা ও চিত্রকল্পে নিসর্গের বর্ণনাও যেন প্রবহমানতা লাভ করেছে প্রতিভার অন্তর্মূলে– মানুষের অন্তর্জীবনের প্রাসঙ্গিকতায়। তা'হলে পাঠক, সিম্বলিস্ট ঐতিহ্যের ধারায় সমৃদ্ধ আরো একটি উপন্যাসের উপমা ও চিত্রকল্পের বিবমিষা বর্ণিত দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

> "... কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের–আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু'তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল বইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।"

এই গদ্য জীবনানন্দ দাশের। যেমন কবিতায়, তেমনই সে গদ্যের আইনস্টাইন যেনো। *কারুবাসনা* উপন্যাসের এই কাব্যগদ্য। ভাবতে অবাক হতে হয় ১৯৩৩ সালে লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছিল প্রায় ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, গ্রন্থাকারে ছাপা হয়ে বেরোনোর জন্য। ১৯৩৪ সালে *লালমেঘ* বই হয়ে বেরোয়। এ বছরই বেরোয় বুদ্ধদেবের আরও ৪টি উপন্যাস–বাড়িবদল-সূর্যমুখী-রূপালী পাখি ও পরস্পর। বুদ্ধদেব এবং জীবনানন্দ সম্পর্কে আমরা যা জানি– এঁরা দুজনেই একই দশকের প্রতিনিধিত্বকারী। সমসাময়িক সময়ে দুজনের উপন্যাসের কৃতকৌশল শব্দ-শব্দকথা বা বাক্যেও জয়েসীয় একই পেইন্টিং জ্বলে ওঠে। কেবল ঘটনাপরম্পর অভিজ্ঞতায় ভিন্ন-বিভিন্ন নৃত্যের শরীর যেন সিম্বল। কিন্তু আর যা কিছু আর্টফর্ম একই।

যখন কল্পনার বিস্তার–স্মৃতিচারণ বর্ণনের পরই শুরু হয়— পরস্পরের দীর্ঘ সংলাপ— তাই, *লালমেঘ* উপন্যাসের অবিনাশ ও সন্ধ্যামনির কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করছি। চেতনাপ্রবাহরীতির পারফরমেন্স এখানেও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

> ‘এতক্ষণ কী করলে?’ ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো সন্ধ্যামনি।
>
> অবিনাশ কথা না–বলে ওর হাতের উপর চাপ দিলে। ও হঠাৎ একবার ভিতর থেকে কেঁপে উঠলো, কান্না–থেমে যাওয়া শিশুর মতো। তারপর চোখ বুজে চুপ করে রইল।
>
> খানিক পরে অবিনাশ বললো : ‘আজ আর তোমার যাওয়া হলো না।’
>
> সন্ধ্যামনি জবাব দিলো না।
>
> ‘এখন কেমন লাগছে?’
>
> সন্ধ্যামনির বোজা চোখের দীর্ঘ পক্ষগুলি একবার কেঁপে উঠলো। ‘তুমি এখান থেকে যেয়ো না,’ অর্ধ-স্ফুট স্বরে বললে ‘কাল নিশ্চয়ই তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। সঙ্গে কোন লোক দেবো কি ?’
>
> সন্ধ্যামনি আস্তে আস্তে চোখ মেললো— ‘কী হবে এখান থেকে গিয়ে?’
>
> ‘তুমি কি এখান থেকে যেতে চাও না?’
>
> সন্ধ্যামনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। ‘তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।’

“তবু একথা সত্য ‘লালমেঘ’ আংশিকতা দোষে দুষ্ট।”

তাহলে কি সেই সেক্স পোলিওটেড–রোমান্টিসিজম?

> অন্ধকার ঘর, সন্ধ্যামনি যেখানে শুয়ে আছে একটু শব্দ আসছে না। ইলেকট্রিক আলো না–জ্বেলে অবিনাশ হাতড়ে–হাতড়ে মোমবাতি বার করে জ্বালালো। ঘরের জিনিসগুলোর কঙ্কাল–ছায়া পড়লো দেয়ালে। বাতির শিখাটা কেঁপে উঠলো, শাদা দেয়ালের উপর দিয়ে ফ্যাকাশে ছায়াগুলো পরস্পরকে তাড়া করছে।
>
> অস্পষ্ট তন্দ্রার মধ্যে সন্ধ্যামনি অস্ফুট শব্দ করে উঠলো।
>
> তারপর অবিনাশ ওর পাশে গিয়ে বসতেই দুই দীর্ঘ, উৎসুক বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে এনে তার কোলের উপর মুখ চেপে ধরলো।

এই এতটুকুই অশ্লীলতা! নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ শৈল্পিক উপস্থাপনের জন্য বহু অশ্লীলতা দোষে বুদ্ধদেব বসুর সুনাম এই জন্মশতবর্ষ আগের বহু পুরনো ব্যাপার। অশ্লীলতা কোনো এক সময়ের বোরখা সেন্সরশিপ। তবুও তো নিয়ন্ত্রণের ভাষা কিংবা গবেষণা–তর্ক–বিতর্কের যৌনতাবিষয়ক আলোচনা সভামাত্র।

তবে এখন অশ্লীলতার সংজ্ঞা কি হবে? আজকের স্ক্রিন সভ্যতায় অবাধ মিডিয়া সম্ভোগের এই যুগে এসে! তাহলে লাখনৌ'র বাঈজীর নাচ কতটাই বা অশ্লীলতা! হুসেনের ন্যুড সরস্বতী কেন অশ্লীলতায় বিতর্কিত হয়। হুমায়ুন আজাদের ভাষায় নারীর এন্থলজি বর্ণনা অতিশয় অশ্লীলতা বলে *নারীগ্রন্থ* বিক্রি নিষিদ্ধ হয়। তসলিমার মেয়েবেলা যৌন বিকৃতির দায়ে বাজেয়াপ্ত বইয়ের তালিকায় পেরেক ঠুকে দেয়া হয়। অথচ স্বাধীনতা পর্বের বস্ত্রহরণ–ধর্ষণের দায়ে যুদ্ধাপরাধীর হুঙ্কার নিষিদ্ধ হয়না–বাজেয়াপ্ত হয় না–বিচার হয় না। বুদ্ধদেব বসুর জীবন–গ্রন্থ থেকে জানা যায় : ১৯২৫ সালে ভারপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই তাঁর ইংরেজি গল্প Joiede Vivre-এর অংশবিশেষ অশ্লীলতার দায়ে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে আপত্তি করেন। বুদ্ধদেবের ঘাড়ে সেই থেকেই অশ্লীলতার জোয়াল ওঠে। অতঃপর ‘রজনী হলো উতলা’ গল্পের অশ্লীলতায় সর্বত্র প্রতিক্রিয়া হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় অভিযোগের কিছুটা লাঘব হয়। এরপর *সাড়া* উপন্যাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং আরও অভিযোগে শেষ পর্যন্ত

অশ্লীলতার দায় আদালত হয়ে গড়িয়েছে পুলিশি ধাওয়া পর্যন্ত। বেচারা! জীবনানন্দকেও কবিতায় 'স্তন' শব্দের অশ্লীলতার দায়ে চাকরি হারাতে হয়েছিল। আর তিরিশের অতি আধুনিক এঁরা কয়েকজন তো ফ্রান্স/ইউরোপের গল্প-উপন্যাস-কবিতা পাঠে বুঁদ হয়ে থাকতেন। তলস্তয়-গ্যটে-জয়েস-মার্কেজ-কুন্দেরা-এলিয়ট-বোদলেয়ার-হেল্ডার্লিন-রিলকে-এজরাপাউন্ড-স্টিভেন্স-কার্লস-কামিংস-পাস্তেরনাক প্রমুখ ইউরোকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার উৎসে আমাদের গদ্য ও কাব্যের ফর্ম নানা অনুষঙ্গে বদলেছে। বদল হয়েছে আধুনিকতার আবর্তে। পাঠক তখনো লিভিংরুম–ড্রইংরুমের প্রতিশব্দে শরীরশিল্পের দূরত্ব ও মহত্ত্ব বুঝে উঠতে পারেন নি– তাই তো চারিদিকে রি-রি রব–দুর্বোধ্যতার–অশ্লীলতার। আর আজকের পাঠক তো ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব মনঃসমীক্ষণে অনেক খোলামেলা যৌন সম্পর্কে এবং নারী-পুরুষের প্রেমে ও সঙ্গমে। শুধু কি তাই, আজকাল তো কামসূত্র পাঠ ও পাঠ্য যেন ফোনসেক্সের প্যারাডাইমে আকসার–এ জন্যেই হয়তো বুদ্ধদেব তার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : "আজকের দিনের পাঠকরা শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে, প্রথম প্রকাশকালে *সাড়া* চিহ্নিত হয়েছিল অশ্লীলতার দুঃসহ নিদর্শনরূপে। কেউ এতে ইডিপাস–এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বা অজাচার।"

তথ্য উদ্ধৃতি সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থ

১. বুদ্ধদেব বসুর জীবন : সমীর সেনগুপ্ত, বিকল্প প্রকাশনী–কলকাতা–৭০০০৭৩
২. কবিতা সংগ্রহ (পঞ্চম খণ্ড) : বুদ্ধদেব বসু, সম্পাদক–নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা–৭৩
৩. গদ্যসমগ্র (২) : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, প্রতিভাস, কলকাতা
৪. জীবনানন্দ : অরুনেশ ঘোষ, কবিতীর্থ, কলকাতা-৭০০০২৩
৫. কারুতান্ত্রিক জীবনানন্দ : সম্পাদনা–শর্মী পান্ডে, গ্রাফিত্তি–কলকাতা–২৬
৬. ব্রেক ইয়োর সায়লেন্স প্লিজ : বাসুদেব দাশগুপ্ত, কলকাতা
৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়–শতবার্ষিক স্মরণ* : সম্পাদনা : ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
৮. কলকাতা–বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা : সম্পাদক–জ্যোতির্ময় দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা
৯. হাংরি সাক্ষাৎকারমালা : মলয় রায় চৌধুরী— সম্পাদক : অজিত রায়, প্রকাশক-মহাদিগন্ত-কলকাতা
১০. অহর্নিশ : বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা। সম্পাদক : শুভাশিস চক্রবর্তী, কলকাতা
১১. ধ্রুবপদ : প্রসঙ্গ : যৌনতা ও সংস্কৃতি। সম্পাদক : সুধীর চক্রবর্তী, কলকাতা
১২. রক্তমাংস : সম্পাদক : গৌতম ঘোষ দস্তিদার, জানুয়ারি-২০০৮ সংখ্যা, কলকাতা
১৩. নৌকা সাহিত্যপত্র : সম্পাদক : অমলেন্দু বিশ্বাস (ক্রোড়পত্র : কবি বিনয় মজুমদার সংখ্যা) জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা
১৪. *লালমেঘ* (উপন্যাস) : বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ থেকে ফটোকপি করে পঠিত।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য

অমিয় দেব

একদা বুদ্ধদেব বসুর ইচ্ছা ছিল তিনি পেশাদার নাট্যকার হবেন। কিন্তু তাঁর পেশাদার ঢঙে লেখা 'রাবণ' নাটক (১৯৩১?) কেন নাট্যনিকেতনে বিজ্ঞাপিত হয়েও শেষ পর্যন্ত উপস্থাপিত হয় নি, তার কারণ শোনা গিয়েছিল তাঁর পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর 'অপৌরাণিক' সংলাপ। তাঁর সাড়ে তিন দশক পরের মহাভারত-নির্ভর কাব্যনাট্য পর্যায়ের সংলাপ শুনে হয়তো নীহারবালা কি শিশির ভাদুড়ী কি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সেই আপত্তি হত না। পুরাণের পুনর্জন্ম না ঘটিয়েও যে পুরাণে আধুনিকতা পুরে দেওয়া যায়, তার প্রমাণ এই নাট্যপর্যায়। তবে নাটক যে অনেকসময়ই আবার অংশতও এক উপস্থিত মনোরঞ্জনের আয়োজন তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন শৌভনিক প্রযোজিত 'পাতা ঝরে যায়'-এর মঞ্চসাফল্য দেখে। শুনেছি প্রথম রজনীতে সেই নাটকের প্রথম উক্তির ('আজ মাছটা পচা ছিলো') বাচিক আতিশয্যে তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিতই হয়েছিলেন, যদিও প্রয়োগের দাবি একেবারে অমান্যও করতে পারেন নি। অন্যদিকে, আকাশবাণীতে যার শ্রুতিসাপেক্ষ প্রয়োগ ছিল মনোমুগ্ধকর সেই *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-র প্রথম অভিনয় যে প্রয়োগনৈপুণ্যের অভাবেই মঞ্চসফল হতে পারল না, তাও তিনি বুঝেছিলেন। অথচ তাঁর মঞ্চভাবনায় যে ফাঁক ছিল না তার প্রমাণ *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-রই পরবর্তী প্রয়োগ, আর শুধু এই নাটকেরই নয় তাঁর অন্য নাটকেরও। তাঁর মৃত্যুর তিন দশক পরে তিনি এখন শুধু কবি নন, নন কেবল কথাসাহিত্যিক বা প্রবন্ধকার বা অনুবাদক, তিনি এখন নাট্যকারও।

তাঁর কাব্যনাট্য কতটা কবিতা আর কতটা নাটক, এই নিয়ে বোধকরি তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। কবিতা যে নাটকও হতে পারে তার এত ভূরি ভূরি উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে আছে যে তার জন্য তাঁকে আলাদা করে টি.এস.এলিয়টের দ্বারস্থ হতে হয় নি। মনে হয় না তিনি একথা বিশ্বাস করতেন যে নাটক হতে হলে কবিতাকে গদ্যের ভান করতে হবে। নাটকের জন্য যে-গতি চাই তা কবিতা কোনো অংশে কম সঞ্চার করে না। আবার নাটক কখনও কখনও স্থিতির দাবিও তোলে, তখন কবিতা তো প্রকৃষ্ট। তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র চতুর্থ সংস্করণের (১৯৭৭) সম্পাদক নরেশ গুহ যে 'সংক্রান্তি' কাব্যনাট্যের প্রথম স্বগতভাষণের প্রায় পুরোটাই "ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ" নাম দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাতে বুদ্ধদেব বসুর অভিপ্রায়ই সোচ্চার হয়েছে (তিনি *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-র তিনটি কাব্যাংশ 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যার প্রথমটি— আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু' 'গাঁয়ের মেয়েরা' নামে *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-ভুক্ত করেছিলেন নরেশ গুহ) কবিতা ও নাটকের দ্বন্দ্ব নিরসনই হয়েছে, প্রসার হয় নি। এমন কথা বোধহয় বলা যায় না যে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-র সেই বহুশ্রুত প্রথম গদ্য স্বগতভাষণ এই স্বগতভাষণের চেয়ে বেশি নাট্যগুণান্বিত। তবে অনেক আগে লেখা তাঁর প্রথম কাব্যনাট্য, ১৯৩৬-এর সেই 'অনুরাধা' যা প্রতিভা বসুর উৎসাহে

তাঁদের যোগেশ মিত্র রোডের অঙ্গনে গুণীজনসামীপ্যে মঞ্চস্থও হয়েছিল ও বছরতিনেক পরে 'চতুরঙ্গে' (চৈত্র ১৩৪৫) 'অনুরাধা রায়' নামে ছাপা হয়েছিল এবং ১৯৮৭-র 'কবিতাভবন বার্ষিকী ২'-তে যা প্রতিভা বসু পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন— তার অন্যতম প্ররোচনা ছিল তিরিশ দশকের আরাধ্য *গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন* (দ্রঃ 'আমার যৌবন', পরিচ্ছেদ ৩৩)। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যনাট্যে যে-আয়াসচিহ্ন কেউ কেউ দেখতে পাবেন, তা তাঁর শেষের এই কাব্যনাট্যপর্যায়ে নেই। সাবলীলতা এখানে অনেক সংহত, যেন বা যে-ইয়েটসের *প্রায়শ্চিত্ত* তিনি অনুলিখন করেছিলেন— 'সংক্রান্তি'র সঙ্গে এক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট— তাঁর আদর্শ তিনি শিরোধার্য করে নিয়েছেন, বা হোফমানস্টালের।

এই পর্যায়ের প্রথম রচনা *কালসন্ধ্যা*-র গোড়ায় একটা "পূর্বরঙ্গ" আছে। বলা বাহুল্য এটা সংস্কৃত পূর্বরঙ্গ নয় যা নান্দীপূর্ববর্তী। এটা অনেকটা গ্রিক প্রোলোগসের মতো— দুই যাদব বৃদ্ধি দুদিক থেকে মঞ্চে ঢুকে অনুত্তোলিত যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কী কথা? বলছেন শঙ্কার কথা, দুর্লক্ষণের কথা— কুরুক্ষেত্রের ছত্রিশ বছর পরে ঋদ্ধিময়ী দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ, কেন শঙ্কা? চলছেন পাঁচ যোগ চার নটি স্তবকে। স্তবকনটি চার পঙক্তির সমিল অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাসংখ্যা আঠারো। মিল : ক ক খ খ, ক খ ক খ এবং ক খ খ ক, অর্থাৎ চার পঙক্তির যে-কটি মিলবিন্যাস সম্ভব। স্তবকনটি আঁটোসাঁটো হলেও বাচনসম্মত। প্রস্তাবনা তেত্রিশ বছর আগেকার 'অনুরাধা'-তে ছিল প্রবহমানতা-নির্ভর, এখানে মুখ্যত পঙক্তিস্বভাবী। 'অনুরাধা'-র শুরু :

> রাত্রি হয়ে এলো শেষ। ধূসর মসৃণ
> পথ শূন্য পড়ে আছে, যেন অন্তহীন
> প্রতীক্ষার দীর্ঘ দৃষ্টি অপল্লব চোখে
> পার হয়ে পৃথিবীর সবুজ আলোকে
> মিশে গেছে সময়ের সুরঙ্গ-গহ্বরে।

এখানে :

> এই তো সেদিনমাত্র কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ।
> তবু আমাদের এই লোল চর্ম, পাণ্ডুবর্ণ কেশ
> নির্ভুল জানায় বার্তা কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর,
> আর এই বিশ্বধামে কিছু নেই, যা নয় নশ্বর।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী-তে গাঁয়ের মেয়েদের দিয়ে সেভাবে প্রস্তাবনা শুরু হয়েছিল তারই অনুবৃত্তি এটা, যদিও সমস্বর নয় :

> আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
> মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা ;
> শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য—
> বৃষ্টি নেই।

কিংবা *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-র সমাপ্তিতে রাজপুরোহিতের বাচন আরো দ্রুত মনে পড়তে পারে :

> দুঃখ কোরো না মাতা; মন্ত্রী তুমি শান্ত হও;
> ব্যর্থ সব অনুশোচনা, ব্যর্থ অনুধাবন।
> যেমন রজ্জু থেকে গাভীরা, তেমনি কর্ম থেকে তারা নিঃসৃত।
> এই ফলাফল, এই চরম : এরই জন্য তোমরা।

অবশ্য একে ওই নাটকের ভরতবাক্যও বলা যায়, যেমন 'কালসন্ধ্যা'য় ব্যাসদেবের মুখের শেষ দুই চরণ :

এই সব কুশীলব-ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

কালসন্ধ্যা-র মতো 'প্রথম পার্থ'ও শুরু করছেন দুই বৃদ্ধ, তবে তাঁদের বাচন ঈষৎ ভিন্ন তালের। তাঁরা নাটকের ধ্রুবপদ— গ্রিক পোলোগস নন, গ্রিক কোরাস। তাঁদের কথা বলে দিয়ে তাঁরা চলে যাবেন না, থাকবেন শেষ পর্যন্ত, কেবল অন্যদের কথার সময় প্রচ্ছন্ন হবেন। যেমন নাটক শুরু করছেন তেমনি শেষও করবেন তাঁরা। আদলটা অনেকটা গ্রিক ট্রাজেডির। মঞ্চেরও দুই অংশ। পেছনে মূল পাত্র, প্রোটাগনিস্টের বাচনলিপ্সু, কিছু চাইতে এসেছেন তাঁর কাছে, এ্যান্টাগনিস্ট। তাঁদের দুজন আবার দুই বৃদ্ধের সঙ্গে একটু ওকালতিও করেন। এক দ্বিরালাপ থেকে অন্য দ্বিরালাপের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন তাঁদের। দ্বিরালাপ ব্যর্থ হল— সেই ব্যর্থতার শেষ মাশুল যারা দেবে তাঁরা যেন তাদেরই প্রতিনিধি। তাই বেদনার তাদের অবধি নেই। আর তৃতীয় বা শেষ দ্বিরালাপও যখন ব্যর্থ হল, তখন যে-অন্তিম বাচন তাঁদের তার অন্তর্গত উপলব্ধিই ট্রাজেডির সারাৎসার। প্রথম বৃদ্ধের এই তিন পঙক্তিতে আছে বিশেষ অনুষঙ্গ আর দ্বিতীয় বৃদ্ধের পাঁচ পঙক্তিতে তার সাধারণ নিষ্কাশ :

প্রথম বৃদ্ধ : কর্ণ বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তার মৃত্যুর মূল্যেও।
তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ, কাল সূর্যোদয়ে।
—মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?
দ্বিতীয় বৃদ্ধ : কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব— মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি—
তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।

'প্রথম পার্থ' কেবল কর্ণ-কুন্তী, কর্ণ-দ্রৌপদী ও কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদ নয়, কুরুক্ষেত্র রহস্যের এক মর্মোদ্‌ঘাটনও— তা-ই সম্ভব করে তোলা হয়েছে এই দুই বৃদ্ধের সবাক উপস্থিতিতে। জাঁ জিরোদু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে নাটক লিখেছিলেন 'না, ট্রয়ের যুদ্ধ হতে যাচ্ছে না'। উদ্যোগপর্ব মাথায় রেখে এমন ভাবনা হতেই পারত, না, কুরুক্ষেত্র ঘটছে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যে ধীরে ধীরে অনিবার্য হয়ে উঠল তারই নাম তো 'উদ্যোগ'। বুদ্ধদেব বসু সেই অনিবার্যেরই একটা দিক দেখবার চেষ্টা করেছেন এই নাটকে। তাঁর মূল প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁকে সাহস জুগিয়েছে মহাভারত, হয়তো বা হোমারও।

'অনাম্নী অঙ্গনা'-র প্রথম ও শেষ বাচন শুধু নয়, এক মধ্যবাচনও, স্বগতগুঞ্জরিত গান যারা স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যের অধিকারী। প্রথম গানে এক চিত্রার্পিত-প্রায় অঙ্গনাকে আমরা তার দূর দয়িতের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠতে দেখি। সেই দূরত্ব ঘোচবার নয় যেহেতু দাসীপণ সত্ত্বেও তার কর্ত্রী তাকে ছাড়বেন না। দ্বিতীয় গান এক আসন্ন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার পূর্বাভাষ। তৃতীয় গান তার উত্তরভাষ যার ভবিষ্যৎ অভূতপূর্ব। আর যে-প্রত্যক্ষ বাচনে তার রাজবধূ কর্ত্রীকে সেই অভূতপূর্ব ভবিষ্যতের কথা অঙ্গনা

বলছে তাকে কবিতা না বলার কোনো কারণ নেই। এখনও কারোর কারোর কানে আছে এই নাটকের প্রথম একক পাঠে কণিকা সরকারের কণ্ঠ :

সে :
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর—
পিতার মতো বিদ্বান, মাতার মতো নেপথ্যচারী,
মাতার মতো দীনতায় ধন্য, পিতার মতো উদাসীন,
ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র নয়,
নয় শত্রু বা মিত্র, সংসারী বা সন্ন্যাসী :
এক অখণ্ড স্থির ভাবনায় মগ্ন,
ভুক্তভোগী, তবু সুদূর—
আমার স্মরণচিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞান।
তাই, দেবী,
আমার পক্ষে দাসিত্ব আজ বরণীয় গুণ্ঠন,
নামহীন অস্তিত্ব এক দুর্গধাম,
যার অন্তরালে আমার বীজময় রাত্রি—
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে—
ফলে উঠতে পারে গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোক্তা যার ভবিষ্যৎ।

এমন কবিতার আরো উদাহরণ আছে এই নাটকে, যেমন রাজমাতা সত্যবতী যেখানে বধূ অম্বিকাকে ব্যাসের সঙ্গে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হতে বলে ব্যাসের জন্মকথা শোনাচ্ছেন যখন তিনি ছিলেন ধীবরকন্যা, যমুনায় খেয়া বাইতেন, আর যখন তাঁর নৌকোয় একদিন উঠলেন পরাশর। সেই কুয়াশা-ঢাকা মিলনের এক গদ্য প্রকরণও বুদ্ধদেব বসু কিছুদিন আগে লিখেছেন তাঁর *আয়নার মধ্যে একা* উপন্যাসে (১৯৬৮), নানাভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে গদ্যের প্রসার সত্ত্বেও কবিতা কোনো অংশে কম নয়। তার একটি পঙক্তি তো যে একবার শুনেছে তার ভোলা দায় : 'নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত— একটি তরণী শুধু ভসমান।' এমনকি যখন অম্বিকা অঙ্গনাকে এই সদ্যশ্রুত গল্প শোনান, তখন এর অভিঘাত খানিক ফিকে হয়ে এলেও একেবারে মিলিয়ে যায় না : 'রইলো ভেসে/ শুধু একটি নৌকো, একটি নারী, একটি পুরুষ।' অন্যদিকে, প্রাত্যহিক বাচনেও যে কবিতা অপারংগম নয় তার সাক্ষ্য তো নাটকের শুরুতেই আছে। গান শেষ করেছে অঙ্গনা, সঙ্গে সঙ্গেই সখীরা ঢুকল। তাদের তিনজনের পরপর কথা শুনছি আমরা :

১. ধরা পড়ে গেলি! ধরা পড়ে গেলি!
২. তার নাম কী, বল! কবে দেখা তোর সঙ্গে?
তোর আপন গাঁয়ের মানুষ?
৩. গিয়েছিলি রুগ্ন মায়ের সেবার জন্য,
নিয়ে এলি নিজের জন্য নতুন জীবন।

এমনি নানান চালে ও নানা মাত্রায় নাট্য রচনা করে চলেছে কবিতা। অথচ এমন নয় যে তার গদ্যনাটকে কোনো কাব্যমাত্রা নেই। আছে। আর মাঝে মাঝেই তা গদ্যকে কবিতার বিকল্প করে তুলেছে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-র কোনো কোনো অংশে তো বটেই,

‘পাতা ঝরে যায়’-এর শেষেও তা-ই ঘটেছে। ‘পাড়াটা কী চুপচাপ।/ তেমন আর কী। মাঝে-মাঝে বাস্ চলে।/ মাঝে-মাঝে ট্যাক্সি।/ মাঝে-মাঝে লরি।/ মাঝে-মাঝে বাতাসের শব্দ।/ পাতার শব্দ।/ গাছের শব্দ।/ গাছে পাখি।/ পাখি উড়ে যায়।/ গাছে পাতা।/ পাতা ঝরে যায়।/ কাকের ডাক।/ কুকুরের ডাক।/ মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ। মাঝে-মাঝে টেলিফোন। মাঝে মাঝে রেডিও।/ মাঝে-মাঝে একবারে চুপ।/ মনে হয় কেউ কোথাও নেই।/ পায়ের শব্দ নেই।/ হাওয়ার শব্দ নেই।/ হাজারিবাগের ভোরের গন্ধ নেই।/ হাবলু-বুলুর গায়ের গন্ধ নেই।/ মিহিজামের জলের গন্ধ নেই।/ রায়গঞ্জের ঘাসের গন্ধ নেই।/ মনে হয় আমরা কখনো বাঁচিনি।/ আমরা বেঁচে আছি।’ বস্তুত বুদ্ধদেব বসু কবিতাকে গদ্য-পদ্য উভয়েরই অতিরিক্ত, তবে অন্তর্বর্তী, এক গুণ বলে ভাবতেন। তাঁর কাব্যনাট্য পদ্যবাহী নাটক, কিন্তু কবিতায় সমৃদ্ধ। আসলে পদ্যমাত্রেই যে কবিতা নয়, এবং গদ্যমাত্রেই অ-কবিতা নয়, সেই ভাবনা জাগ্রত ছিল বুদ্ধদেব বসুর, জানতেন গদ্যকে কবিতা করে তুলতে হয়। তার জন্য চাই স্বভাবোক্তির পাশে বক্রোক্তি, তার জন্য চাই উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চাই সংবেদনের ঘনতা আর ফাঁকে ফাঁকে বোধের উন্মেষ।

২

‘প্রথম পার্থ’ ও ‘সংক্রান্তি’ একযোগে মঞ্চে দেখেছি, কুরুক্ষেত্রের বোধ তাতে তীক্ষ্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে যদি ‘অনাম্নী অঙ্গনা’, তারপর ‘প্রথম পার্থ’ ও ‘সংক্রান্তি’, সবশেষে *কালসন্ধ্যা*— একটুখানি বিরতি দিয়ে দিয়ে। মঞ্চ মানে একটি-দুটি তাৎক্ষণিক অবলম্বন ছাড়া নিরলংকার অঙ্গন; নাটক থেকে নাটকে সাজবদলের অস্বস্তি নেই। আলোর হেরফের একটু-আধটু হোক, কখনও ঈষৎ প্রখর, কখনও মৃদু— মায়া বিছানোর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। আর সেই সঙ্গে একটু স্বল্পস্থায়ী আবহবাদন, কখনোই সংলাপাশ্রয়ী নয়। ‘অনাম্নী অঙ্গনা’-তে আছে পরপর কয়েকটি দৃশ্য : অঙ্গনা একা, অঙ্গনা ও সখীরা, সত্যবতী ও অম্বিকা, একা অম্বিকা, অম্বিকা ও অঙ্গনা, অঙ্গনা একা, অঙ্গনা ও অম্বিকা, একা অঙ্গনা। কালক্ষেপ কেবল একবারই ঘটছে, দ্বিতীয়বার অঙ্গনার একাকিত্বের পরে— সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়। তাতে বিরামের দরকার নেই, ধীরে ধীরে আলো কমিয়ে এনে আবার ধীরে ধীরে আলো বাড়িয়ে দিলেই চলবে। আর আলো কমানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক বাদন। ‘প্রথম পার্থ’ ও ‘সংক্রান্তি’-তে অঙ্কবিভাজন নেই, *কালসন্ধ্যা*-য় আছে। ‘প্রথম পার্থ’তে দৃশ্যান্তর ঘটছে নিরবচ্ছিন্ন কালক্রমে। ‘সংক্রান্তি’ তাই অন্তর্বর্তী এক বিরতিব্যতিরেকে অবিরাম উপস্থাপিত হতে পারে। *কালসন্ধ্যা*-য় পূর্বরঙ্গ থেকে প্রথম অঙ্কে অবশ্য দুবার একটু কালক্ষেপ হচ্ছে, আর উত্তরকথনের আগে তো বটেই। এ-সবই অবশ্য আলোয় বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব, আলাদা বিরামের দরকার নেই। এবং প্রথম অঙ্কে কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্য ঘটে গেলেও ঘটছে সত্যভামা ও সুভদ্রার চোখের উপর, অর্থাৎ মঞ্চের একপাশে তাঁদের উপস্থিতি বিরামহীন। তাঁরা যেন প্রথম অঙ্কের সূত্রধার। তাঁদের অবস্থান যে এক প্রাসাদকক্ষে, তার হুবহু অনুকৃতি সম্ভবত রসাভাসই ঘটবে; তাঁরা অন্যদের দেখছেন কিন্তু তাঁদের কেউ দেখছে না, এই প্রতিভাস নির্মাণ তো একান্তই অভিনয়সাপেক্ষ। এত কথা আমি বলছি এই প্রতীতিতে যে বুদ্ধদেব বসুর এই নাট্যচতুষ্টয়ের একাদিক্রমে অভিনয় সম্ভব এবং এই আশায় যে কোনো নাট্যদল সেই প্রয়াস করবে। তবে ‘অনাম্নী অঙ্গনা’-র পরের বিরতি একটু দীর্ঘ হলে ভালো, কেন না বিষয়ের দিক থেকে তা ঈষৎ দূরবর্তী, অন্তত অন্য তিন নাটকের মতো ঘনসংবদ্ধ নয়।

'অনাম্নী অঙ্গনা'-তে তিনটি প্রেক্ষিত আছে, রাজমাতা সত্যবতীর, রাজবধূ অম্বিকার আর তাঁর নামহীনা দাসীর। সত্যবতীর কাছে বংশের চেয়ে বড়ো কিছু নেই আর তার প্রয়োজনেই তিনি ব্যাসদেবকে আবার নিয়োগের জন্য ভেবেছেন। এবং নিয়োগ যাতে এবার পুরোপুরি সার্থক হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি বধূকে আপন অতীত শোনালেন। পরাশরের সঙ্গে ধীবরকন্যার সেই মহার্ঘ মিলন এক ধ্রুব হয়ে উঠল নাটকের। অম্বিকার কুলসর্বস্ব রুচি তাঁকে কিছুতেই ভীষণদর্শন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সাদরে গ্রহণ করতে দেবে না, তিনি তাঁর দেবর জেনেও না। বরং শান্তনুপত্নীর অতীত তাঁকে তাঁর চোখে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞেয় করে দিল। অথচ রাজমাতার আজ্ঞা তিনি কীভাবে অবজ্ঞা করেন! তাই বিকল্প ব্যাসের কথা তাঁকে ভাবতে হয়। তাঁর সুদর্শনা দাসীকে তিনি মুক্তি ও উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে সেই চেষ্টা করেন। তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছলনা ব্যাস ধরতে পারবেন না— রানীর বেশে তিনি দাসীকে রানী বলেই ভাববেন। তার উপর শূদ্রাণীর নিশ্চয়ই রুচির সমস্যা নেই। আর শূদ্রাণী যে কখনও কখনও দেব অনুগ্রহ পেয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সদ্যশ্রুত সত্যবতী-পরাশর-কথাও শুনিয়ে দেন তাঁর দাসীকে। অবশ্য তা মুগ্ধতা বা শ্রদ্ধা থেকে নয়। অম্বিকার জগৎ অহংকারী, অশ্রদ্ধাপ্রবণ। তবে তাঁর অজান্তেই তিনি অঙ্গনার মধ্যে সত্যবতীর সম্ভাবনা আরোপ করে দিলেন। কিন্তু সত্যবতী হয়ে ওঠার কোনো বাসনা অঙ্গনার নেই। গোড়ায় সে মুক্তি চাইছিল, কিন্তু যখন তাকে দিলেন অম্বিকা তখন তার দাসিত্বই সে ফিরে চাইল— দাসী থেকে সে তার ভাবী সন্তানকে লালন করবে। তার মধ্যে যার জাগরণ ঘটেছে তা কেবল নারীত্ব বা মাতৃত্ব নয়, তা চারিত্র। সেই চারিত্র হৃদয়ংগম করবার ক্ষমতা অম্বিকার নেই। তাঁর মনে হচ্ছে বুঝি অঙ্গনা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিদুরের নাম করে কুরুবংশের কেন্দ্রবর্তিনী হবার চেষ্টা করছে : 'মূর্খ! জানিস না,/ মাতা যার শূদ্রাণী আর পিতা বর্ণসংকর— / সেই পুত্র যত না পূর্ণাঙ্গ হোক,/ অন্ধের চেয়েও, ক্লীবের চেয়েও/ শতগুণে রাজা হবার অযোগ্য!' আর অঙ্গনা যখন উত্তরে বলে 'আমি যদি ধীবরকন্যা সত্যবতী হতাম/ তাহলে একবার যমুনার বুকে কুজ্‌ঝটিকায় আবৃত হবার পর,/ একবার ব্যাসদেবকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করে,/ আর-কিছু কাঙ্ক্ষণীয় আমার থাকতো না—/ না ভরতবংশীয় রাজদণ্ডধারী স্বামী, না রাজত্ব, না অন্য কোনো সন্তান' তখন অম্বিকার মুখে ফুটে ওঠে ভর্ৎসনা যেন বা সে অনধিকার চর্চা করছে। কিন্তু তাঁর সকল অবিশ্বাস ও সাংসারিক প্ররোচনা সত্ত্বেও যখন অঙ্গ না অপরিবর্তিত থাকে, তখন অম্বিকাকে মানতে হয় : 'হয়তো তোর কথাই সত্য,/ হয়তো সংসারসীমার বাইরেই তোর যথাস্থান।' যে-পথে মুক্তি ঘটেছিল তপস্বী ও তরঙ্গিণীর যেন সেই মুক্তির পথই তার :

না, দেবী, পুত্রের জন্য নয়—
আমার নিজেরই জন্য। আমি দেখতে চাই দূরযাত্রীকে তীরে দাঁড়িয়ে,
দেখতে চাই আকাশে আমার জয়ধ্বজা—
একমাত্র ধবলতার সংকেত—
ঘোর যুদ্ধে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত।

সেই ঘোর যুদ্ধের প্রথম সন্ধিক্ষণে অবস্থিত 'প্রথম পার্থ', দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণে 'সংক্রান্তি'। এ-দুয়ের অন্তর্বর্তী বিরতি দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'প্রথম পার্থে'র স্থায়ী প্রেক্ষিত দুই বৃদ্ধের। তাঁরা হস্তিনাপুরের দুই ব্রাহ্মণ, সাধারণ্যের প্রতিভূ। তাঁরা যুদ্ধ চান না, কেননা যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতি সাধারণ্যের। অথচ যুদ্ধ হবে কি হবে না তা সাধারণ্যের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তারা দর্শক, তারা শ্রোতা মাত্র, কিন্তু ভোক্তা শেষ পর্যন্ত তারাই।

কেউ বলে দর্পিত দুর্যোধন দায়ী,
কেউ দোষ দেয় দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে,
কেউ বলে কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন;—
আমরা কিছু জানি না। শুধু ভাবি :
যে-দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু,
আর গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ?
একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ,
এক স্বার্থ, এক জন্মভূমি, ভ্রাতৃব্যেরা সকলেই ধর্মজ্ঞ—
তবু দ্বন্দ্ব কেন?
সমাধানের কোনো উপায় কি নেই— অস্ত্র ছাড়া?
বিতর্কের কোনো উত্তর কি নেই— রক্তপাত ছাড়া?
কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহূর্তে মিলিয়ে দিতে পারেন
গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপাণ্ডবকে,
যারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে এক সঙ্গে, এক অন্ন খেয়ে?

আছেন একজন, কর্ণ, তিনি 'ন যোৎস্যে' বললেই হয়তো যুদ্ধ হবে না। তাঁর প্রেক্ষিত নাটকের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রেক্ষিত যথাক্রমে কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের। দ্বিতীয়ের সঙ্গে এই তিন প্রেক্ষিতের সংঘাত নিয়েই নাটক। সেই সংঘাত থেকেই ট্রাজেডির অনিবার্যতা ছেঁকে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু। একবার অডেন *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন তাতে কোনটা আপতিক, কোনটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম আর কোনটা কৃতকর্মরূপী অদৃষ্ট। সেই সঙ্গে এও দেখিয়েছিলেন যে স্বেচ্ছাপ্রণোদনার মাত্রা মোটেই কম ছিল না *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*-এ আর ট্রাজেডি মুখ্যত তার বৈগুণ্যেই। প্রাচীন গ্রিক ভাবনায় বোধহয় বৈগুণ্যের স্থান বেশি ছিল না— মানুষী অবস্থানেই ছিল ট্রাজেডির ভিত্তি। নাটক যখন শুরু হল তার আগ থেকেই রাজা অয়দিপউস পিতৃহন্তা ও মাতৃভর্তা, কিন্তু তিনি তা জানেন না; নাটক তাঁর ব্যবহারে কখনও কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলেও, না। বুদ্ধদেব বসু কি বৈগুণ্য দেখাচ্ছেন, না অনৌচিত্য? কর্ণ জানলেন তিনি প্রথম পার্থ, মন আর্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু রাধা-অধিরথ ভুলে, সকল অবমাননা ভুলে, অর্থাৎ সব অতীত ভুলে, শুধু ভুলে নয় অস্বীকার করে, তিনি কি আবার ভ্রূণ হয়ে উঠতে পারেন? নাটক শেষে প্রথম বৃদ্ধের কথা তো সেই প্রশ্নই তুলছে— 'মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?' আর কুন্তী ত্যাগ করেছিলেন বলেই, 'কালস্রোত আমাকে অনেক দূর টেনে এনেছে।/ তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান—/ হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না।' ত্যাগ করেছিলেন বলেই, তিনি আজ যখন বলেন, 'কর্ণ, তুমি আমার, তুমি আমার', তখন কর্ণকে বলতে শুনি, 'ক্ষমা করবেন। আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার বলে ভাবিনা।/ আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর-কিছু নয়।' বৈগুণ্যস্পষ্ট হলেও কুন্তীর সেই ত্যাগ আর তার পরবর্তী নীরবতা তথা অস্বীকৃতি এখন ওই অডেন-কথিত কৃতকর্মরূপী অদৃষ্ট, অপরিবর্তন। কিন্তু তাই বলে কি সন্তাপ সম্ভব নয়, ক্ষমা? কিন্তু কুন্তী যা চান, আর যা উদ্যোগসম্পৃক্ত কূটনীতিরই অংশ তাতে তো দুর্যোধনকে ত্যাগ করে কর্ণকে তাঁর স্বধর্ম বর্জন করতে হয়!

দ্রৌপদীর প্রেক্ষিতে কূটনীতি আরো স্পষ্ট। কুন্তীর আশঙ্কা ভ্রাতৃহত্যা; পার্থের প্রতিস্পর্ধী কর্ণও যে পার্থ তা দ্রৌপদী জানেন না, তাঁর আশঙ্কা পরাজয়। কিন্তু যে-

বিবিক্তির অনুরোধ তাঁর কর্ণের কাছে তাও তো কর্ণের স্বধর্মবিরোধী। কারণ যুদ্ধ তাঁর সাধনা, তাঁর সিদ্ধি যুদ্ধেই। তিনি জানেন :

মহত্তম সেই যুদ্ধ, যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।
আজ পাণ্ডবেরা জয়োৎসুক, কৌরবেরা জয়োৎসুক,
আকাঙ্ক্ষায়, আশঙ্কায় তাঁরা চঞ্চল—
পাঞ্চালী, তুমিও তা-ই।
শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,
শুধু আমি অনাবিলভাবে প্রস্তুত।
তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,
কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু বলে ভাবি না—
আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।

আর কূটনীতিচূড়ামণি কৃষ্ণ যখন তাঁর এই কথার ('আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব— আমার ব্যক্তিগত/... আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ— আর-কিছু নয়') উত্তরে তাঁকে অগ্রিম জানিয়ে দেন তিনি কোন ছলনার আশ্রয় নেবেন,যাতে অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়, তখন ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হলেও তিনি পিছিয়ে আসেন না, জানেন :

আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে-ডালে পক্ক হয়ে ফলে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র পরিণাম,
অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু।

উদ্যোগপর্বে যে-কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ আছে (অধ্যায় ১৪০-৪৩) তাতে কৃষ্ণ কর্ণকে বলেননি তিনি কীভাবে অর্জুনের হাতে কর্ণের মৃত্যু ঘটাবেন। এই অনুপুঙ্খ বুদ্ধদেব বসু যোগ করেছেন কর্ণকে বুঝে উঠবার জন্য। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে তিনি কৃষ্ণের বিকল্প প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন না তাতে শুধু তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা নয় চারিত্র ও প্রকাশ পাচ্ছে। হোমারের আকিলেউসকে তাঁর মা তাঁর ভবিতব্যের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি পাত্রোক্লাস-বধের প্রতিশোধে পিছপা হন নি। 'নিবেলুঙ্গেনলিড'-এও, আমরা জানি, হাগেন জেনে গিয়েছিলেন তাঁর মা তাঁরা ক্রিমহিল্ডের দেশ থেকে ফিরবেন না, তা সত্ত্বেও তিনি জাহাজের মুখ না ঘুরিয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাগেন তাঁর কথা রাখছিলেন, আমন্ত্রিত অতিথি তাঁরা-মধ্য-দানিয়ুর থেকে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে আকিলেউস শূরশ্রেষ্ঠ, বন্ধুর মৃত্যু যে-ক্রোধের সঞ্চার করেছে তাঁর মধ্যে তা শূরোচিত স্বভাবসম্মত। কিন্তু কর্ণ কেবল বীর নন, কেবল দুর্যোধনকে কথা দেননি, তিনি তাঁর আপন সত্তারও অনুগামী। নিজেকে নিজে নির্মাণ করছেন তিনি— তিনি কে, তার শেষ পরিচয় দেবেন এই যুদ্ধে। আর তার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন সবচেয়ে কঠিন দ্বৈরথ। এক প্রাতিস্বিকতারই যেন তিনি মূর্ত রূপ, স্বাধীন, স্বধর্মপ্রণোদিত— 'প্রথম পার্থ' শুধু প্রচ্ছদ।

'সংক্রান্তি' যুদ্ধশেষের নাটক, কিন্তু ঘটছে হস্তিনাপুরে। অন্তিম কুরুক্ষেত্র মূর্ত হয়ে উঠছে এক ধারাবিবরণে যার শ্রোতা অস্থির ও পুত্রস্নেহে অন্ধ। পরে যখন বিবরণ তুঙ্গে, শুনতে শুনতে দৃশ্য হয়ে উঠছে শেষ যুদ্ধ, তখন এক সত্যদর্শিনী হলেন দ্বিতীয় শ্রোতা যাঁর ন্যায়বোধ নয় তাঁর মাতৃস্নেহের অন্তরায়। নাটক বিবরণপ্রসূত প্রতিক্রিয়ায়, দূরবর্তী ঘটনাক্রমের সঙ্গে যেন সংঘাত চলছে প্রথম শ্রোতার। সংঘাত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রোতার বিবদমান প্রেক্ষিতেও, কিন্তু শেষ পুত্রবিয়োগের হাহাকারকে আচ্ছন্ন করে নয়। পিতার হাহাকার অপ্রশমন্য : 'রুদ্ধ হোক সূর্যোদয়! নির্বাপিত হোক জ্যোতিষ্কেরা!/ বিধ্বস্ত হোক দিন, রাত্রি, বৎসর!/ আমারই চক্ষুর মতো চরাচর হোক অন্ধকার,/ সব হৃদয় প্রস্তর হয়ে যাক,/ সব বেদনা লুপ্ত,/ লুপ্ত আশা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রন্দন!/ হায় পুত্র, হায়, সংসার, হায় মরত্ব!' মাতার হাহাকার শম খুঁজে পায় :

স্বামী, নম্র হও। মৃত্যুও এক দেবতা, তাঁকে প্রণাম করো।
বলো আমার সঙ্গে সমস্বরে, 'পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছো, এখন নিদ্রা যাও।
অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার।
জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির,
তুমি সেই ভয় থেকে নিষ্ক্রান্ত। বিশ্রাম করো।'

গান্ধারীর এ এক নতুন আবেদন লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু— ট্রাজেডির সারাৎসার তা। মৃত্যু বিষয়ে এক নতুন বোধের কথা আমরা শুনছি যা বুদ্ধদেব বসুর শেষদিকের কবিতাতেও শুনি— শুধু 'স্বাগতবিদায়' শিরোনামেই নয়, অন্তর্গত ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিতাগুচ্ছেও। (আর এই ফাঁকে বলে নিই তাঁর কাব্যনাট্যের পঙক্তিবিন্যাসের সঙ্গে কিছু *শেষের কবিতার* পঙক্তিবিন্যাসের মিলও দেখি।)

'সংক্রান্তি' নাটক লিখতে বসে কথকের রহস্য উদঘাটনের খানিক প্রয়াস পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। সঞ্জয় সেই কথক যিনি দূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ঘটমান বর্তমান বয়ন করে চলেছেন। তাঁর কথনের কোনো পূর্ণ মাত্রা নেই, কারণ তা ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলেছে। অতীত তাঁর অধিগত, কিন্তু ভবিষ্যৎ দূর অস্ত। তাঁর অবস্থান বর্তমানে। 'আমি উদ্ভাবক নই, বিবৃতিকার।/ আমার চক্ষু আমার সাক্ষী। আকাশে সূর্যালোক সাক্ষী।/ আর নেপথ্যে যদি দেবগণ থাকেন, তাঁরাও।' অথচ 'উবাচ' ক্রিয়াপদের নির্বিকার কর্তা হওয়া যে সহজ নয় তা তো ধৃতরাষ্ট্রের অসহিষ্ণুতায়, এমনকি কটূক্তিতেও কখনও কখনও প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মনে করেছেন প্রচ্ছন্ন পাণ্ডবসমর্থক, কিন্তু তিনি না পাণ্ডব, না কৌরব, সূতমাত্র, পৃথগ্‌বর্ণ, কেবল এক মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী যার আভাস নেই দিগন্তেও। কার সাধ যায় বিনাশের বিবৃতিকার হতে! এক সূক্ষ্ম বেদনা কাজ করে যায় তাঁর মধ্যে, উদ্বেগ বা আর্তি নয়, বেদনা : 'মাতা, আমাকে ক্ষমা করবেন— আমি সত্যকথনে প্রতিশ্রুত আছি।/ বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের মতো/ দুর্যোধন প'ড়ে আছেন ভূপৃষ্ঠে—/ ভগ্নজানু, চলৎশক্তিহীন।' আর এই বেদনা থেকেই জন্ম নেয় বোধ। সূতের শেষ কথা 'সংক্রান্তি' নাটকেরও শেষ কথা :

মহাকাল! মহান! আমিও প্রণাম করি তোমাকে।
লোকে তোমাকে বলে দণ্ডধারী, দণ্ডদাতা,
কিন্তু আমার মনে হয় স্বহস্তে তুমি সংহার করো না,
শুধু হরণ করো বুদ্ধি, রোপণ করো উন্মাদনা।

আর এমনি করে ইন্দ্রগণ পতিত হন,
মানুষের ইতিহাসে আসে ক্রান্তিকাল,
মহৎ বংশ লুপ্ত হয়ে যায়।

এই বোধ থেকে ব্যাসের সেই পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তি— 'এই সব কুশীলব ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,/ একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার'— কি খুব দূরবর্তী, সঞ্জয় কি নন ব্যাসেরই অংশ? কথক হয়তো বা কবিরই পূর্বাবস্থা। কবিমাত্রেরই যে ব্যাসের কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকার থাকে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি বুদ্ধদেব বসুর এই কাব্যনাট্যপর্যায়, যদিও পরোক্ষ প্রমাণ তিনি 'বন্দীর বন্দনা' থেকেই দিয়ে আসছেন?

ব্যাসের 'এই সব কুশীলব'-এর প্রথম উদ্দিষ্ট অর্জুন মৌষলপর্ব আদৌ হৃদয়ংগম করতে পারেননি। ব্যাসকে বুঝিয়ে বলতে হল :

তুমি পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।
শেখো :
অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম, সব আপেক্ষিক।
যা-কিছু সময়োচিত, তা-ই যথাযথ।
শেখো :
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,
সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।

উদ্ধার আরো করা যায়। এও দেখানো যায় তাঁর শেষ পর্যায়ের কোনো কবিতাই যেন এখানে লিখে চলেছেন বুদ্ধদেব বসু (নাটকে কবিতার স্থান নেই এমত মাথার দিব্যি তিনি দেননি)। ঘটনাক্রমে একটু পিছিয়ে গেলেও দেখা যাবে, দস্যুদের হাতে পরাস্ত অর্জুন বিমূঢ়। তারও আগে, কৃষ্ণের জরাদর্শনে বিমূঢ়, বিমূঢ় কালসন্ধ্যার দ্বিরালোকে, ক্ষুধার্ত সমুদ্রের অগ্রগামী কল্লোলে, বিমূঢ় যদুবংশের পরস্পরহননের কথা শুনে। কিছুরই কি কোনো মানে নেই— কৃষ্ণ যিনি তাঁকে একদা গীতা শুনিয়েছিলেন তাঁকে বলে দেবেন না? না, কৃষ্ণ শুধু বলছেন, 'ত্বরা করো', 'আসন্ন সময়'। ব্যাস দ্রষ্টা, মন্তা, আবর্তের বাইরে, কৃষ্ণ যুগপৎ ভেতরে ও বাইরে, ভোক্তা ও দ্রষ্টা, দ্বা সুপর্ণা। গাণ্ডীবধারণের অক্ষমতায়, দিব্যাস্ত্রের বিস্মৃতিতে, পরাজয়ে পরাজয়ে যখন অর্জুনের হতাশ্বাস চরমে, তখন ক্ষণিকের জন্য তাঁর চিরচেনা শ্যামল কৃষ্ণের উদয় ঘটল, যেন বা তাঁর মানসপটে (বুদ্ধদেব বসু কি পুনরুত্থান-পরবর্তী যিশুর কথা ভাবছিলেন?)। 'কালসন্ধ্যা'-র অন্য কুশীলব যাঁদের অক্ষর মারফত উদ্ধার করেছেন ব্যাস, তাঁদের প্রধান সত্যভামা ও সুভদ্রা যাঁদের চোখের সামনে নামছে সেই অদ্ভুত আঁধার যার অর্থ তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। আর কৃষ্ণ যখন তাঁদের এসে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তখনও না। সুভদ্রা কুরুক্ষেত্র শুনিয়ে বলছেন, 'তবুও কি স্থিতি নেই— ক্ষমা নেই?/ তবু— প্রতিহিংসা?' কৃষ্ণের উত্তর : 'প্রতিহিংসা নয়— প্রতিদান। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত।/ দু-একটি প্রশ্ন ছিলো শূন্যে ঝুলে,/ সর্বদাই থাকে।/ আজ কুরুক্ষেত্রের উত্তর এলো—/ অনুবৃত্তি, উপসংহার।' আর অস্থির সত্যভামা যখন সংশয়ান্বিত : 'যদি যুগ-যুগান্তর ধরে/ শুধু চলে ভ্রাতৃবধ বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে/ তবে শেষ পর্যন্ত কি মনুবংশ/ সেইমতো অবক্ষয়ে বিলুপ্ত হবে না/ যেমন মণ্ডলাকার মহাসর্প, যে নিজেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়?' তখন কৃষ্ণ বলছেন :

আমি সৃষ্টি করিনি এ-বিশ্বলোক, তুমিও করো নি।
আমি শুধু দু-একটা কথা জানি, যা তুমি জানো না।
প্রথমত, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;
যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন—
সব দ্বন্দ্ব :
পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে
এবং ফলত—
ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।

মৌষল যে কুরুক্ষেত্রেরই রূপান্তর, এক তীব্রতর কুরুক্ষেত্র, তা-ই ফুটে উঠেছে এই নাটকে। ভ্রাতৃহত্যার যে-দ্বিতীয় মাত্রার আভাস আছে 'প্রথম পার্থে'—'দুই পার্থের/ একই গর্ভে সঞ্জাত দুই পুরুষের/ পরস্পরের হাতে সংহার, একই মাতৃশোণিতে নিমজ্জন—/ যুগপৎ মৃত্যু, দ্বিগুণিত হত্যা!' অয়দিপউসের দুই পুত্র পোলুনাইকেস ও এতেয়োক্লেসের পরিণাম যার উপমান (বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ না করে কেবল ইঙ্গিত করে গেছেন তার), তা-ই যেন মৌষলের গন্তব্য!

৩

চেনা গল্প নিয়ে নাটক আর নাটক যেখানে নিজেই গল্প— এ-দুয়ের মধ্যে তফাত আছে। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন সব গল্পই চেনা গল্প, কেবল পুনর্লিখিত হয়ে হয়ে চলে। 'পুনঃপুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা'— ঋগ্বেদের এই সূত্র ক্রমেই প্রিয় হয়ে উঠছিল বুদ্ধদেব বসুর। রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ ('পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপধারিণী') অবলম্বনে এর অর্থ তিনি করেছিলেন, 'পুনঃ পুনঃ নবজাত, নিত্য সমরূপা এবং বর্ণের দ্বারা অলংকৃতা'। তাঁর কাব্যনাট্যচতুষ্টয় যে এরই উদাহরণ তা নিয়ে তর্ক নেই— গল্প চেনা। অলংকরণ তথা অনুপুঙ্খের যোগ-বিয়োগ হয়ে থাকলেও রূপের ব্যত্যয় ঘটে নি। কর্ণ-দ্রৌপদী-সংবাদ বুদ্ধদেব বসুর সংযোজন, উদ্যোগপর্বে কেবল কৃষ্ণ-কর্ণ ও কুন্তী-কর্ণ-সংবাদ ছিল। অন্তিমে কুরুক্ষেত্রের বিবরণকালে গান্ধারী চক্ষুষ্মতী হয়েছে। অতিসংক্ষিপ্ত বিদুরসম্ভব আখ্যান প্রয়োজনীয় বিস্তার পেয়েছে। অষ্টাধ্যায়ী মৌষলপর্ব কেবল পুনরলংকৃত। কিন্তু কেন এই অনুকৃতি বা নবজন্ম? প্রথম যৌবনের 'প্রগতি'-কালীন 'পুরাণের পুনর্জন্ম' তো এ নয় যাতে পোশাক পাল্টে আধুনিক হবার প্রয়াস ছিল। এই আধুনিকতার মাত্রা অন্যতর। একদিকে, কখন পরিস্থিতি বা ঘটনা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, এবং কখন হয় না, তা বোঝাবার চেষ্টা করছেন বুদ্ধদেব বসু। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতা কীভাবে সত্তা নির্মাণ করে আর এষণার জন্ম দেয়, তাও। তিনি তেমন অস্তিত্ববাদের কথা আলাদা করে বলেন নি, অথচ তাঁর শেষপার্যায়ের এক বড় ভাবনা সত্তাসংক্রান্ত। মানুষ উত্তরাধিকারের দাস নয়, নয় অবস্থানের সন্তান; সে কীভাবে হয়ে ওঠে, তার জাগ্রত চৈতন্য তাকে কীভাবে গড়ে তোলে, তাতেই তার পরিচয়— তার মনুষ্যত্ব। একদিক দিয়ে এই কাব্যনাট্যচতুষ্টয় বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারতের কথা*-র প্রস্তুতিপর্ব। আর *মহাভারতের কথা*-র কেন্দ্রে আছে অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের প্রতিতুলনা। 'কালসন্ধ্যা'-র শেষে অর্জুন যে ব্যাসের সব কথা বুঝতে পারছেন তা মনে হয় না। কিন্তু এ কথা তিনি যখন যুধিষ্ঠিরকে বলবেন, যুধিষ্ঠির সব বুঝতে পারবেন। যুধিষ্ঠিরের এই বোধই *মহাভারতের কথা*-র প্রতিপাদ্য। এই বোধ তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার জাগরণ ঘটাতে হয়েছে। তা-ই বুদ্ধদেব বসুর কাছে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ

অরুণকুমার সরকার

ভাবতে অবাক লাগে যে বসুও ষাট বছরে পা দিচ্ছেন। ভাবতে অবাক লাগে এই জন্য যে আজ পর্যন্ত তাঁর রচনায় বার্ধক্যের ক্ষীণতম ছায়াটুকুও অনুপস্থিত,— না তাঁর কবিতায়, না তাঁর প্রবন্ধে। জীবনব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যে-কোনো উদ্ভিন্ন যুবকের মতোই প্রগাঢ় এবং আত্যন্তিক। অথচ এই তো আশীর্বাণী বিতরণের সময়, সাবধানী হিতোপদেশে মুখর হবার অবকাশ, অথবা শিরোপা মাথায় দিয়ে সম্রাট হয়ে বসার। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু চিরকাল যুবকদের সঙ্গে-সঙ্গেই রইলেন, কিছু গভীর দূরত্ব বজায় রেখে নয়, প্রায় তাঁদের কাঁধে হাত রেখে, পাশে-পাশে। এর ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে বৈকি। অকালবৃদ্ধেরা তাঁর মানসিক বয়োপ্রাপ্তিতে সন্দেহ করে যতটা দূরে সরে গেছেন, তরুণেরা ঠিক ততটাই তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে বিশ বছর আগে তদানীন্তন তরুণদের মনেও বুদ্ধদেব একই আকর্ষণী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাহলে কি এ-কথাই মেনে নেব যে বুদ্ধদেব বসুর কোনোই পরিবর্তন হচ্ছে না বা হয়নি, একই কেন্দ্রবিন্দুতে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছেন তিনি? না, ঠিক তার উল্টোটাই বরং সত্য। অতুলনীয় এক সজীব, চলমান, গ্রাহী মনের অধিকারী বলেই বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না-নিয়েও, তারুণ্য বজায় রাখা। কোনো মতামতকেই তিনি আঁকড়ে ধরে থাকেননি, চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেননি কোনো ভাবাদর্শকে। স্বদেশে-বিদেশে সাহিত্য এবং চিন্তাক্ষেত্রে গত তিরিশ বছরে যত তরঙ্গ উঠেছে সবকটাই তাঁর মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সমুদ্রস্নানের আনন্দ পুরোপুরিই তিনি উপভোগ করেছেন, যদিও কোনোসময়েই নিজেকে ভেসে যেতে দেন নি।

ভেসে যাওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। প্রাথমিক মানবিক মূল্যবোধগুলিতে বরাবরই তাঁর হৃদয়-মন বাঁধা রয়েছে, তদুপরি রয়েছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পীসত্তা। তাই কোনো ছাপমারা মতবাদের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় না-নিলেও জগদব্যাপারে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিচ্ছন্ন, তৎপর এবং নিজস্ব তা একজন অলস পাঠকেরও নজর এড়ায় না। ফলত, তাঁরা যে-কোনো রচনায় একটি সংস্কারমুক্ত, মানবতাবোধ প্রাজ্ঞ, নিটোল, সজীব, আধুনিক মনের পরিচয় পাই আমরা। কোথায় এর উৎস?

বুঝতে কষ্ট হয় না যে বুদ্ধদেবের যাবতীয় জ্ঞান, এমনকি সংসারবুদ্ধি, সাহিত্য থেকেই উপার্জিত; দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্বের মোটা-মোটা কেতাব থেকে নয়, পৃথিবীজোড়া গল্প-উপন্যাস-কবিতার অফুরন্ত রসভাণ্ডার থেকে। সাহিত্য থেকে সংগৃহীত বলেই, আমার মনে হয়, তাঁর ধারণাগুলো এমন পার্থিব, মানবিক, সরস এবং প্রাণময়। এবং ব্যক্তিগত।

এক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কিন্তু এই আপাত-দুর্বলতাই তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর রচনার প্রধানতম আকর্ষণ। এক হাতে তথ্যের গুরুভার তথা বিভিন্ন মতবাদের ঝুলি এবং অন্য হাতে যুক্তির লণ্ঠন তথা বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে গ্রহণ-বর্জনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একটা গ্রাহ্য পরিণতির দিকে পৌঁছনোই যে-কোনো প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পাহাড়ে ওঠার সময়ও তিনি পোশাক পালটাতে রাজি নন। চিন্তার রাজ্যে তাঁর পথ-চলা এমনই অনায়াস যে মনে হয় তিনি ঢিলে পাঞ্জাবি গায়ে নিজের আনন্দে শিস দিতে-দিতে চলেছেন।

প্রতারক এই চলনভঙ্গি। কেন না, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, প্রাবন্ধিকের কাছে যা-কিছু কাম্য,—প্রাসঙ্গিক খবরাখবর, বিশ্লেষণ, মনন এবং সংশ্লেষণ, সবই তাঁর রচনায় উপস্থিত। কিন্তু ছদ্মবেশে, নিখুঁত মুখোশ এঁটে। মনে করুন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ দু-টি : 'নোয়াখালি' এবং 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি'। শেষোক্ত রচনাটি শার্ল বোদলেয়ার ও ফিয়ডর ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিষয়বস্তুটা নিঃসন্দেহে দুরূহ এবং গুরুগম্ভীর। তথাপি বুদ্ধদেবের রচনা শুরু হয়েছে আমাদের এই কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের এমন একটি করুণামধুর এবং নেহাৎ ব্যক্তিগত বর্ণনা দিয়ে যা কিনা অনায়সেই কোনো ছোটোগল্পের উপক্রমণিক হতে পারত। কিন্তু অনতিবিলম্বেই চুপিসারে লেখকের সঙ্গে-সঙ্গে কখন-যে আমরা তামাম ইউরোপীয় সাহিত্যের আবহাওয়ায় দু-দুজন দিক্‌পাল সাহিত্যিকের অন্দরমহলে উপনীত হয়েছি, নিজেরাই ঠাহর করতে পারি না। রচনার শেষ অক্ষরটি থেকে চোখ তুলেই অনুভব করি এক রহস্যময় উপন্যাসের জগৎ থেকে ঘুরে আসা গেল, পরক্ষণেই বুঝতে পারি বোদলেয়ার এবং ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে অনেক নির্ভুল তথ্যও আমাদের শেখা হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক তখনই তারিফ করি প্রাথমিক ভূমিকাটুকুর যথার্থ্যকে, যেটাকে ছোট গল্পের ভূমিকা বলে মনে হয়েছিলো। নিদারুণ গ্রীষ্মের দহনজ্বালায় শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লেশের মধ্যেই তো বোদলেয়ার-ডস্টয়েভস্কির স্ফূর্তি।

এমনিতর আর একটি রচনা 'নোয়াখালি'। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজীর বাণী ও ব্যক্তিত্ব নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে, এতই নিপুণভাবে যে গান্ধী-দর্শনের অনেক গ্রন্থেই হয়তো তা পাওয়া যাবে না। অথচ সমস্ত রচনাটি জুড়ে, আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত রচনাটি জুড়ে, লেখকের শৈশবস্মৃতি মন্থন আর অপরূপ নিসর্গবর্ণনা। বুদ্ধদেব জানেন আলোচ্য বস্তুকে যথোচিত পটভূমিতে স্থাপন করতে পারলে ছবির মতোই তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ এবং তর্কাতীত। প্রাবন্ধিকদের মধ্যে, আমার মনে হয়, একমাত্র বুদ্ধদেবেরই আছে এই আবহসৃষ্টির ক্ষমতা, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল রবীন্দ্রচর্চার ফসলে পরিব্যাপ্ত। এই বিচিত্র নয়নাভিরাম উদ্যানে মালি ও মালাকে পৃথক করে দেখা শক্ত, এখানে রবীন্দ্রনাথকে যতটা পাচ্ছি, বুদ্ধদেবকেও ততটা। লক্ষ করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে বুদ্ধদেব অল্পই মাথা ঘামিয়েছেন। একজন কারিগর সমধর্মী অন্য কারিগরের শিল্পকর্মকে যে-ভাবে দেখে থাকে, একান্ত কাছ থেকে, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, কারখানার উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন অনেকটাই সে-রকম। নামকরণে বা জাতি-বর্ণ-নির্ণয়ে তাঁর আগ্রহ নেই, রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দ নিয়ে যে-ফুলটি ফুটে উঠেছে, তাঁর দৃষ্টি সেই সমগ্রতায় একাগ্র।

এ-দৃষ্টি কবির। ফলত, সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলিকে বুদ্ধদেব একটি অখণ্ড কবিতা হিসেবে পাঠ করেছেন। এবং কাব্যবিচারে যে-পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে অথবা হওয়া উচিত, সেই পথেই আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্র-রূপকর্মের রহস্য। হাজারদুয়ারি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা দিক থেকে প্রবেশ করা সম্ভব। এতাবৎ বিশেষ কোনো-একটি দিকের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করাই প্রবন্ধকাররা নিরাপদ বলে মনে করে এসেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন, একটিমাত্র দিক আছে, একটিমাত্রই, যে-দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। সে-দিকটা রূপকর্মের দিক, নিছক শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির দিক। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র বিচার এইদিক থেকেই।

তাই অপরাপর সমালোচক যখন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার উৎস কি সমাজচিন্তার ফলশ্রুতি নিয়ে গলদঘর্ম, বুদ্ধদেব তখন চুপি-চুপি আমাদের অন্যদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেন 'গল্পগুচ্ছ'-এ মিতভাষণের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তুলে ধরেন চিত্রময়ী এক বর্ণনা অথবা অনায়াসেই শিশুর মতো লাফিয়ে উঠতে পারেন : দ্যাখো, দ্যাখো কি অবাক-করা 'সহজ পাঠ'-এর এই মিল— ছোটো খোকা বলে অ আ/ শেখেনি সে কথা কওয়া।'

স্বভাবতই, উপমা-অনুপ্রাস, বিশ্লেষণ-অলংকার, ছবি-ভাবচ্ছবি এবং বর্ণনাশিল্পের বিভিন্ন দিক থেকেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের গদ্য, ছোট গল্প এবং উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের দেশ-কাল সম্বন্ধে সর্বদাই অবহিত রয়েছেন অথচ তার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না-দিয়ে কবিতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র। এবং পাচ্ছেনও; পাচ্ছেন দুরূহতম স্থানেও। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই; তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত করে তোলে। হয়তো কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য কখনো হাতে তুলে দেন না; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগ সঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার রশ্মি, হয়তো ইন্দ্রিয়ের কোনো নতুন শিহরণ। (প্রবন্ধ-সংকলন : ৩২-৩৩ পৃ.)

পরিবর্জন তো নয়ই, বরং ঈষৎ পরিবর্ধন করে উদ্ধৃত কথাগুলিই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বুদ্ধদেবের প্রবন্ধও ইঙ্গিতধর্মী, তাঁর রচনাও মূলত কবিতার সম্প্রসারণ, শব্দের সুচারু বয়ন। কিন্তু তুলনায়, দ্বিধা না-করেই বলব, বুদ্ধদেবের গদ্য, বিশেষত তাঁর সম্প্রতিকালের গদ্য, ঢের বেশি সংযত, ঘনসংবদ্ধ এবং নির্মমভাবেই আত্মসচেতন। তাছাড়া এ-টাও লক্ষণীয় যে রচনার ন্যায়শাস্ত্রকে বুদ্ধদেব কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করেন না এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, তথ্যের পারম্পর্যকে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে থাকেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রযুক্ত সেই একই পদ্ধতিতে বুদ্ধদেব সমকালীন কবিতারও বিচার করেছেন। বিচার না-বলে উপভোগ বলাই হয়তো সংগত। কেন না, প্রচলিত অর্থে যাকে বিচার বলে, সে-রকম কিছু ঘর্মাক্তকলেবর রচনা বুদ্ধদেবের একেবারেই নয়। ফলত তাঁর রচনা সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দেরই প্রকাশ। আর তাঁর

কৃতিত্ব এইখানে যে নিজের আনন্দকে তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। পেরেছেন তাঁর অপরূপ বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালীর জন্যেও বটে আবার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটুকুর জন্যেও। তাই জীবনানন্দের গভীরতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা কি অমিয় চক্রবর্তীর বৈরাগ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বুদ্ধদেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন না, তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি থেকে হঠাৎ-হঠাৎ এমন অনেক হীরকখণ্ড আবিষ্কার করেন যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়।

যে-কোনো অভিজ্ঞতাকে পছন্দসই একটা তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে ফেলতে না-পারলে বুদ্ধিজীবীরা অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে অভিজ্ঞাতাটাই মূল্যবান এবং শুধুমাত্র সেই অভিজ্ঞতাটুকুই যা তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায় অনুভব করতে পারেন। অর্থাৎ তত্ত্বের যে-টুকু অংশ মানুষের জীবনে ফলিত এবং প্রকট, তাঁর উৎসাহ সেখানেই সীমাবদ্ধ। বিমূর্ত তত্ত্বকথায় তাঁর কোনো আসক্তি আছে বলে মনে হয় না। তাই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে কোনো সুদূর দার্শনিক তাঁর কূটজিজ্ঞাসার জালে নিজেকে ক্রমাগত ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন না, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ একজন মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ে সশরীরে হাজির হয়।

তত্রাচ যাঁরা কোনো শিল্পীর ক্রিয়াকর্মকে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলতে না-পারলে চিত্তে সুখ পান না, তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে দু-টি বিশেষণে প্রয়োগ করতে উৎসুক হবেন : এক, তিনি রোমান্টিক; দুই, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এ-ক্ষেত্রে দু-টি বিশেষণই যে যথোপযুক্ত বুদ্ধদেবের প্রবন্ধাবলিতে তার ভূরি-ভূরি সমর্থন পাওয়া যাবে। নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী দুর্মরভাবেই রোমান্টিক। আর তারই নাম রোমান্টিকতা, বুদ্ধদেব লিখেছেন,

> যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়— শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে : তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়— সেই বিশাল ও স্বতো-বিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।

(প্রবন্ধ-সংকলন : ২১৪-২১৫ পৃ.)

বুদ্ধদেব বসুর সুঠাম, কাব্যরসাপ্লুত, সাবলীল গদ্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবেই নয়, রোমান্টিকতার এই সংজ্ঞা, বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যেরও সংজ্ঞা। দোষে-গুণে গোটা মানুষটাকে পাওয়াই যার অভিলাষ কোনো খণ্ডসত্যকেই তিনি মেনে নিতে পারেন না। বুদ্ধদেবের জীবনবীক্ষার মূলসূত্র এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সাম্প্রতিক নাটক-উপন্যাসের নিহিতার্থ।

যিনি বিশ্বাস করেন 'মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে', শিল্পী হিসেবে তিনি সত্য কথাই বলেন। তবুও, যাঁরা বুদ্ধদেবের সঙ্গে একমত হবেন না, সব মানুষ একমতাবলম্বী হলে পৃথিবী তো বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠত, তাঁরাও যদি শিল্পকর্ম মনে করে তাঁর প্রবন্ধাবলির পাতা ওল্টান, দেখতে পাবেন কেমন করে একটি কূলপ্লাবী নদী ধীরে-ধীরে পরিণত হয়েছে হ্রদে। দেখতে পাবেন বুদ্ধদেব বসুর মৌল মেজাজ— তাঁর তারুণ্য, তাঁর ঔৎসুক্য, উৎসাহ, কৌতূহল, আনন্দবোধ— এককথায় তাঁর চিন্তার উদ্যম যথাপূর্ব রয়ে গেছে।

সমালোচনার আর একটা দিক আছে সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটন করা, এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ-কাজ যাঁরাই করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে স্বীকৃত, এবং তাঁদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে পরবর্তী যুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ণ গৃহীত না হলেও শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাঁদের রাজত্ব নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য করে তুলেছিলেন। এইটেই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই সমালোচক।

'কবিতা' আষাঢ় ১৩৫০

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ

আবদুল কাদির

বাঙালির সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছন্দোবন্ধ অক্ষরবৃত্ত পয়ার। এই সনাতন পয়ার-বন্ধেই বাংলা ভাষার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য বিরচিত। পয়ার-বন্ধ ত্রিবিধ : ১৪-অক্ষরের লঘুপয়ার, ১৬-অক্ষরের পূর্ণপয়ার ও ১৮-অক্ষরের দীর্ঘপয়ার। প্রধানত ১৪-অক্ষরের পয়ার-পঙ্‌ক্তিতেই সেকালের রামায়ণ, মহাভারত, নবিবংশ, হরিবংশ, রসুল বিজয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসা মঙ্গল, ইমাম-মঙ্গল প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেকালের রচনায় মালঝাঁপ পয়ার, তরল পয়ার, লঘুত্রিপদী, দিগক্ষরা ও একাবলী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের সাক্ষ্যৎও প্রচুর পাওয়া যায় : কিন্তু পূর্ণপয়ার ও দীর্ঘপয়ারের নিদর্শন বিরল। নিম্নে রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপূজ্জবিধান' থেকে শেষোক্ত দুটি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সাবিত্রী কাটিল সূতা   বিশ্বকর্মার নির্মাণ ॥
তেকারণে বস্ত্র কান্ধে   পূজা করি নিরঞ্জন ॥
নিরঞ্জন পূজ ভক্তা   সভে শুন ইতিহাস ॥
কেমতে করহ পূজা   দুই হাতে লয়্যা ঘাস ॥

৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘ পয়ার :

মহাদেব মহাদেব বলিআ ডাকেন করতার।
গঙ্গা বলে কেবা ডাকে কোন জন বল রে ওঙ্কার ॥

ধর্মপূজাবিধানে পূর্ণপয়ার ৬+৪+৬ অক্ষরের লয়ে নির্মিত হতেও দেখা যায় : যথা—

গঙ্গা গামারের   পেড়িয়ানে   সিন্ধুরে মন্তিয়া।
রাখিলা ধর্মের   পাদপদ্ম   স্থাপনা করিয়া ॥

অন্তত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের নৌকাখণ্ডে দীর্ঘপয়ার রচিত হয়েছে ১০+৮ অক্ষরের লয়ে। তার চার পঙ্‌ক্তি-

গোআল জরম আন্ধে শুনে   দধি দুধে উতপতী।
এঁবে তাকে উপেখহ কেহ্নে   তোর ভৈল কী কুমতী ॥
পসার সাজিউ দধি দুধে   সেসি জীবার উপাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দি   বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর নৌকা খণ্ডে পূর্ণ পয়ার পঙক্তিনিচয়ের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্রুবপদ রূপে সন্নিবেশিত একটি ৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘ পয়ার পঙ্‌ক্তি-

সব সখি দেখে মোর (কাহাঞিল)
না তুলিহ জলের উপর ॥ ধ্রু ॥

এখানে 'কাহ্নাঞি ল' পঙ্‌ক্তি—মধ্যে অতি-পর্ব (hyper measure) রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্ণপয়ার পঙ্‌ক্তিগুলিতে বন্ধনীর মধ্যে 'কাহ্নাঞি ল' কথাটি চিহ্নিত হওয়ার এইই তাৎপর্য।

রামাই পণ্ডিতের রচনায় দীর্ঘপয়ার পঙ্‌ক্তি দেখা যায় লঘুপয়ার অথবা পূর্ণপয়ার পঙ্‌ক্তির পাশে : যথা-

সিন্ধু জলে সাঁঝা জাল গতি ভাই আনন্দিত মনে।
জয়-শঙ্খ ধ্বনি দিলে তুষ্ট নিরঞ্জনে ॥
— (শূন্যপুরাণ, তীর্থ-আবাহন)

চন্দনের কাঠ যদি আপনি আনিল হনুমান।
চন্দন ঘষিল ধর্ম দেবতার বিদ্যমান ॥
— (শূন্যপুরাণ, অথ টীকা-পাবন)

কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে দীর্ঘপয়ার ও পূর্ণ পয়ারের এরূপ উদাহরণ বেশি পাওয়া যায় না। সেকালে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল লঘুপয়ার। চতুঃস্বরপাদ স্বরবৃত্তের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর ছিল বলেই লঘুপয়ার জনমন হরণ করতে পেরেছিল।

কিন্তু পয়ারের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আজও বিতর্কের অবসান হয় নি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪ খ্রি.) তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব* (প্রথম সংস্করণ, ১২ আষাঢ় ১২৮১ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বলেছিলেন :

> যখন বাঙ্গালা ভাষারই আদি মূল সংস্কৃত হইল, তখন তদঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে, ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ যেরূপ সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেরূপ। সুতরাং পয়ারকেই অনুষ্টুপের স্থানীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা যে অনুষ্টুপ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতে পারা যাইতেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় অগত্যা শ্রীজয়দেব মিশ্রের গীতগোবিন্দ কাব্যের কোনো কোনো পজ্ঝটিকা শ্লোকের সাথে বাংলা "পয়ারের কতক সাদৃশ্য" লক্ষ্য করেন এবং পরামর্শ দেন যে, "সংস্কৃতের যে-ছন্দের সহিত উহার (পয়ারের) কতক সাদৃশ্য আছে তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত।" তিনি গীতিগোবিন্দ কাব্যের ৪র্থ সর্গের ১২ ও ১৪-সংখ্যক শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করে বলেন যে, "উপরিউক্তবিধ গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।"[১] তাঁর উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের ছন্দ ১৬ মাত্রার পজ্ঝটিকা। কিন্তু প্রাকৃত পজ্ঝটিকা থেকে বাংলা অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উদ্গাম হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত শ্রীদিলীপকুমার রায় সমর্থন করেন না। তাঁর বক্তব্য—

> অনেকে বলেন, জয়দেবের 'বিকশিত সরসিজ ললিত মুখেন' এই ধরনের (পজ্ঝটিকা) ছন্দ থেকেই বাংলা চতুর্দশমাত্রিক অক্ষরবৃত্তের উদ্ভব। কিন্তু এ-কথা সত্য নয়। ... অনুষ্টভ্ ছন্দকেইন্দ পয়ারের হোক পয়ার প্রেরণার একটা উৎস বলে নির্দেশ করা বোধ করি অন্যায় হবে না। ... সব চেয়ে বড় কথা এই যে, পূর্ণপয়ার ও অনুষ্টুভের দোলার মধ্যে আত্মীয়তা গভীর।[২]

কিন্তু সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ থেকে যে বাংলা পয়ারের উদ্ভব হয় নি, তা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন :

> এক সময়ে কেউ কেউ পয়ারকে সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দ থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুমান যে তথ্যসম্মত বা যুক্তিসংগত নয়, আশা করি এ-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।[৩]

বাংলা অক্ষরবৃত্ত পয়ারের প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্বন্ধে একদা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছিলেন :

> পূর্বেই আমি বলেছি, স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে এবং চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার চৌদ্দ স্বরের স্বরবৃত্তের বিকার মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার স্বরের পরেই একটি করে যতি থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ও গানের সুরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কমে গিয়ে অর্থাৎ স্বরবৃত্তের পদগুলো আরো ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে।...
>
> পয়ার শব্দটি 'পদ-চার' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রবিবাবুর এ-কথাটি সত্য হলে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তিগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করে।[৪]

প্রাচীন লোকচ্ছন্দ (folk metre) থেকে বাংলা পয়ারের উৎপত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে, সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার ও ঘুম-পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। ... বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে। ...
>
> দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধ'রে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা সুরে। ...
>
> একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক—
>
> এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
> তার মধ্যে ব'সে আছে শিবু সদাগর।
>
> এটা পয়ার, কিন্তু চৌদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চৌদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।
>
> এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
> তারি মধ্যে বসে আছে শিবু সদাগর।
>
> ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে।[৫]

দেশজ ছড়া—ছন্দের ১৪—সিলেবল্ কিরূপে সংকুচিত হয়ে ১৪ অক্ষরের পয়ার ছন্দে পর্যবসিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। সাধারণত ছড়া-ছন্দের চাল চতুঃস্বর। প্রাচীনকালের নাথ-গীতিকা, রামায়ণের পুঁথি, মহাভারত— পাঁচালী প্রভৃতিতে মোটামুটিভাবে চার মাত্রায় যতি দিয়েই ছন্দের অবয়ব গড়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' থেকে একটু নমুনা তুলছি—

> বৃদ্ধ রাজা দশরথ শুভ্র মাথার কেশ।
> শুভ্র আসন শুভ্র বসন রাজার শুভ্র বেশ ॥
> রাজকার্য করেন রাজা বসিয়া সিংহাসনে।
> সবদেশের রাজা আইল রাজ-সম্ভাষণে॥[৬]

এ-ছন্দ স্বরবৃত্ত-ভঙ্গিমা। এর প্রতি পঙ্ক্তিপ্রান্তে আছে পূর্ণযতি ও মিল। এরূপ নির্দিষ্ট নিয়মে বিরতি ও অন্ত্যমিল রয়েছে বলে ভাবপ্রবাহ পঙক্তিসীমা লঙ্ঘন করে প্রবাহিত হতে পারে নি। ছন্দের পায়ে পড়েছে বেড়ি। এই বেড়ি ভাঙেন মধুসূদন। তিনি পয়ারে প্রবর্তন করেন প্রবহমানতা। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার গুণে ছন্দ হয়ে ওঠে ঊর্মিল। অক্ষরবৃত্ত পয়ার থেকে স্বরবৃত্তের চার-মাত্রার চাল অন্তর্হিত হয়ে আট মাত্রার চাল বলবৎ হওয়ায় ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত হয় ওজস্ ও গাম্ভীর্য। পয়ারের পদক্ষেপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> পয়ারটা চতুস্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা 'পদ-চার' শব্দের বিকার। ইহার এক একটি পদ এক একটি ঝোঁকের শাসনে চলে। ... এক একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে, তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক এক লাইনে চৌদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে, তবে নানা ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। ...তবেই দেখা যাইতেছে, আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট-মাত্রাই দু'খানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা।[৭]

রবীন্দ্রনাথের এ-কথার তাৎপর্য এই যে, পয়ারের পূর্ণপর্বে ৮—মাত্রা এবং তার আদিতে ঝোঁক (Stress) ও অন্ত্যে যতি (Pause) থাকে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

কোদণ্ড টঙ্কার সহ অসির ঝন্‌ঝনি
রোধিল শ্রবণ পথ মহা কোলাহলে।
— (*মেঘনাদবধ-কাব্য*, প্রথম সর্গ)

এখানে পঙ্‌ক্তির প্রথম ও নবম অক্ষরে পড়েছে ঝোঁক। পঙ্‌ক্তির প্রথম পাদে আট-মাত্রা ও দ্বিতীয় পাদে ছয়-মাত্রা। দ্বিতীয় পাদের শেষে দুই মাত্রার ফাঁক ধরলে তারও পরিমাণ হয় আট-মাত্রা। এখানে পঙ্‌ক্তিটিতে আট-মাত্রা অবিভাজ্য এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে চতুর্থ ও দ্বাদশ মাত্রার পরে ঈষদযতি অনুভূত হয় না। প্রথম পঙ্‌ক্তিটির আট মাত্রাকে দুখানা করে চার—মাত্রায় ভাগ করতে গেলে তার ধ্বনিচিত্র হয় এরূপ—

৫	৪	৫	২
কোদণ্ড টঙ—	কার সহ	অসির ঝন্	ঝনি ০০

এখানে দুটি পাদেই চার-মাত্রার পরে যতিবিলোপ না ঘটলে তার চাল হয় ৫+৪+৫+২ অক্ষরে; তাতে পয়ারের চারিত্র্যচ্যুতি ঘটে। এরূপ লুপ্তযতি অবিভাজ্য আট-মাত্রার যুক্তপর্ব ও ছয়-মাত্রার সার্ধ পর্ব পয়ারের পঙ্‌ক্তিতে যত বেশি থাকে ততই বেশি হয় তার পদমর্যাদা। তাতেই তার শক্তি ও সৌন্দর্য।

মধুসূদনের হাতে অক্ষরবৃত্ত পয়ারের লাভ হলো প্রাণস্পন্দন ও ধ্বনিরতরঙ্গ; রবীন্দ্রনাথ তাকে করলেন বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও মাধুর্যময়। মধুসূদন বিজোড়-সংখ্যক মাত্রার পরেও যতি স্থাপন করেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের মিষ্টতা' রক্ষার প্রয়োজনে সর্বদা সমমাত্রার পরে বিরতি ব্যবহারের কঠোর বিধান পালন করেন। আধুনিক কবিগণও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত প্রথারই একনিষ্ঠ অনুবর্তন করেছেন। দৃষ্টান্ত দেখুন—

নির্ভুল নিয়মে অনুসরি পরস্পরে
প'ড়ে আছে যুগ্ম ট্রাম-লাইন, ক্লান্তিকর
অফুরন্ত ছন্দের বাঁধা সমিল পদ্যের
মতো; ম্লান গ্যাসালোক স্খলিত মদ্যের
মতো জ্বলিছে নির্জন অ্যাসফল্টের' পর
পিচ্ছিলচ্ছটায়। রাত্রি হয়ে এলো শেষ;
— (বুদ্ধদেব বসু, 'অনুরাধা' : প্রস্তাবনা)

এর পর্ববিভাগ ও যতিবিন্যাস হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের ধরনে। কিন্তু রবীন্দ্রউত্তর যুগে ১৪-অক্ষরের লঘুপয়ারে কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে,— তার স্থান গ্রহণ করেছে দীর্ঘপয়ার ও মুক্তক অক্ষরবৃত্ত। শেষোক্ত দুই রীতিতে কিছু নতুনত্বও সম্ভব হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আয়ুষ্মতী' কাব্যনাটিকা

(১৩১৯ কার্তিকের 'প্রবাসীতে' প্রথম প্রকাশিত) অমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ার-বন্ধে রচনা করেছিলেন; এই রীতিতে বুদ্ধদেব বসু লেখেন তাঁর 'কোনো বন্ধুর প্রতি' শীর্ষক সুবিখ্যাত কবিতা। তার কয়েক পঙ্‌ক্তি —

আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে? অমিতের লাবণ্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভু? সুচরিতা কভু জন্ম নেয়
মর-রমণীর গর্ভে? দেখিতে কি আশা করো, সখা,
পরিষ্কার সূর্যালোকে গডুইন-দুহিতারে কভু?
অথবা বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন মধ্য-যুগ হতে
উঠে এসে কখনো কি দাঁড়াইবে সম্মুখে তোমার
আবেলার্ড-প্রিয়া? ব্যারেট কখনো এসে ভালোবেসে
আঙুল বুলায়ে দিবে তব রুক্ষ কেশগুচ্ছ-মাঝে?

— (বন্দীর বন্দনা)

রবীন্দ্রনাথ 'অতি পরিণত বয়সে' ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর *প্রান্তিক* কাব্যের প্রথম ১৩টি কবিতা ও ১৭ সংখ্যক কবিতা এই ছন্দরীতিতে রচনা করেন। মনে হয়, কবিতায় এ-রীতিটি প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসুর প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ তারিখে লিখেছিলেন তাঁর 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা'— অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রথম কবিতা। তাঁর পঙ্‌ক্তির ঊর্ধ্বতম দৈর্ঘ্য ১৪ অক্ষর। বুদ্ধদেব বসুর *বন্দীর বন্দনা* কাব্যের 'শাপভ্রষ্ট,' 'কালস্রোত,' 'অমিতার প্রেম,' 'বন্দীর বন্দনা', 'অপর্ণার শত্রু' ও 'প্রেমিক' এই রীতিরই কবিতা; কিন্তু তাতে পঙ্‌ক্তির ঊর্ধ্বতম দৈর্ঘ্য ২৬-অক্ষর। তাঁর মুক্তকের নমুনা—

আমি হেথা ব'সে আছি
ব'সে আছি শুধু,
স্তব্ধচিত্ত, মৌন ভাষাহীন।...
মনে ভাবি : এই দিন, এই রাত্রি আর কভু আসিবে না ফিরে,
এই ফুল আর ফুটিবে না
ভুবনে আমার ;
এদের সৌরভে আর ভরিবে না আমার হৃদয়
অগাধ, অবাধ, মুগ্ধ মাধুর্যের পরিপূর্ণতায়;
এ উজ্জ্বল আলোখানি প্রাণের প্রদীপ মোর জ্বালিবে না আর।...
ব'সে ব'সে তাই শুধু আজিকার দীপ্তি-পানে করুণ নয়নে চেয়ে রই;
আনন্দের কলস্বনে অনাগত বেদনার পদধ্বনি শুনি
হৃদয়ের স্পন্দনের সনে।
হাসিতে ভাসিয়া-যাওয়া দুই চোখে মোর
অশ্রু-বাষ্প ক্রমে জমে' ওঠে।

— (কালস্রোত)

এখানে পঙ্‌ক্তিগুলি ৬, ৮, ১৪, ১৮, ২২ ও ২৬ অক্ষরে নির্মিত। এরূপ অসমপঙ্‌ক্তিক কবিতার প্রবহমানতা অব্যাহত রাখা দুরূহ; কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রেও অসামান্য

শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত অমিত্রাক্ষর মুক্তক কবিতাগুলি এ-ছন্দের স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের পথে এক শক্তিময় প্রাগ্রসর পদক্ষেপ।

বাংলার তিন প্রধান ছন্দ : অক্ষরবৃত্ত (Literal metre), স্বরবৃত্ত (Syllabic metre) ও মাত্রাবৃত্ত (Moraic metre) এ তিন ছন্দেই মুক্তধ্বনি (Open syllable) এক কলা (One unit) ; কিন্তু বদ্ধধ্বনি (Closed Syllable) স্বরবৃত্তে সাধারণত এক কলা, মাত্রাবৃত্তে সর্বদা দুই কলা এবং অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যে সচরাচর এক কলা ও শব্দপ্রান্তে সর্বদা দুই কলা। মধুসূদন খুব বিরল ক্ষেত্রেই শব্দমধ্যবর্তী রুদ্ধস্বরের ধ্বনিমূল্য দুইকলা ধরেছেন ; যথা—

নূপুরের ঝন্‌ঝনি কিঙ্কিনীর বোলী

অথবা—

কি যাঞ্ঝা করি আমি রামের সমীপে

এখানে 'ঝন্‌ঝনি' চার-কলা ও 'যাঞ্ঝা' তিন-কলা রূপে পরিমিত হয়ে ছন্দরক্ষা করেছে। মধুসূদন এখানে ভাবের লালিত্য রক্ষার প্রয়োজনেই শব্দমধ্যস্থ বদ্ধধ্বনির মূল্য বিকল্পে দ্বিকল (two unit) ধরেছেন। কিন্তু তিনি ভ্রমেও কুত্রাপি অক্ষরবৃত্তে শব্দপ্রান্তিক বদ্ধধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে এক-কলা করেন নি। ফলে অক্ষরবৃত্ত লাভ করে তার স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা ও মার্জিত স্বরূপ। কিন্তু সমকালীন বাংলা অক্ষরবৃত্ত কবিতায় শব্দমধ্যস্থ রুদ্ধস্বরের প্রসারণ হয়েছে অবারিত এবং শব্দপ্রান্তস্থ রুদ্ধস্বরের সংশ্লেষণ হয়েছে অনবধানতার পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত দেখুন—

ক্লান্ত গণিকার
সুরা-ক্লিন্ন কণ্ঠের বিলোল সঙ্গীত
মূর্চ্ছায় বিলীন হলো। ...
রহস্যের ছায়া
নগরের শরীরের রয়েছে আবরি'
এ-অস্থায়ী মুহূর্তের চঞ্চলতায়। ...
এ-প্রভাতে ঘরে আসে খবরের কাগজ
চায়ের পেয়ালা থেকে ভাতের থালায়
গৃহিণী হাঁপিয়ে ওঠে

— ('অনুরাধা' : প্রস্তাবনা)

এখানে 'খবরের' শব্দে প্রান্তিক বদ্ধস্বর 'রের' সঙ্কুচিত হয়ে এক-কলা রূপে গণ্য, এবং বিকল্প উপায়ে 'খবরের্কাগজ' রূপে ছন্দঃসন্ধি (metrical liason) ঘটিয়ে ধ্বনির ভারসাম্য বিধান করেছে। কিন্তু এভাবে মৌলিক শব্দের উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে স্বরবৃত্ত সুলভ ভঙ্গিবৈচিত্র্য (modulation) বাংলা অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতির বিরোধী।

উপরোদ্ধৃত উদাহরণে মাত্রাবৃত্তের ব্যতিক্রান্ত ভঙ্গিতে 'কণ্ঠের' চার-মাত্রা ও 'চঞ্চলতায়' ছয়-মাত্রা হয়ে ছন্দ পরিমিত হয়েছে। এ-প্রথা সিদ্ধ বলে ছান্দসিকেরা সায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের *ক্রন্দসী* কাব্যের—

'হিরন্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে'
'অসূর্যম্পশ্যা-রূপা পরাণ-প্রিয়ার'

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির ছন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত ১৩৪৪ আশ্বিনের 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন : "আমার মতে এ-সমস্ত লাইন নিশ্চয়ই ছন্দপতন।"[৮] এখানে 'হিরন্ময়ের ক্ষয়ে' পর্বের শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি 'রণ' দুই-কলা এবং 'অসূর্যম্পশ্যা' পর্ব

‘অসূর্যম-পশ্যা-রূপা’ উচ্চারিত হয়ে আট-কলা গণ্য হয়েছে। কিন্তু এভাবে ধ্বনিসাম্য সাধন শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কানে নামঞ্জুর মনে হয়েছে। অথচ তিনি নিজে এ-নিয়মেই লিখেছেন—

বৃষ্টির বন্যাত, রাত্রির অন্ধতায়, শুধু
রটিয়েছে প্রকৃতির পরামর্শ— বাড়ো বীজ, বাড়ো। ...

*   *   *   *

সে নিজে বোঝেনি, আমি তাকে ভালোবেসে
আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে, শব্দের সম্মোহনে, আর
কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো ভালোবেসেছি নারীরে ...

*   *   *   *

যে ভালোবসার বাসা নতুন ননীর মতো তোমার শরীরে নয়,
ঢেউয়ের গানের মতো নামে নয়, হাজার ঢেউয়ের মতো নামে নয়;
এমন কি, কবিতায় নয়, শব্দের ছন্দে নয়, ছন্দের সম্মোহনে নয় ;
যে ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—
তীব্র, মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয় !

— (‘মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে’)

উপরের প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে ‘বৃষ্টির’ ও ‘রাত্রির’ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক হয়ে ছন্দরক্ষা করেছে। ‘ছন্দের ইন্দ্রজালে’ ‘শব্দের সম্মোহনে,’ ‘শব্দের ছন্দে নয়,’ ‘ছন্দের সম্মোহনে’ প্রভৃতি অষ্ট মাত্রক পূর্ণপদে ‘ছন্দের’ ও ‘শব্দের’ শব্দ মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক হয়েই ধ্বনিভারের সামঞ্জস্য সাধন করেছে। এ-সকল পদে অক্ষর বৃত্ত রীতিতে মাত্রাবৃত্তের ব্যতিক্রম (variation) আধুনিক কান অগ্রাহ্য করে না।

মধুসূদন অক্ষরবৃত্ত পয়ারে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন বীর্য ও গাম্ভীর্য; তাই তিনি এ-ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গির ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রানুসারীরা অক্ষরবৃত্তে সুরমাধুর্য (melody) সৃষ্টির প্রেরণায় অধিকতর উদ্দীপিত; ফলে অধুনাতনকালে অক্ষরবৃত্ত কবিতায় শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রকরূপে ব্যবহারে প্রবণতা প্রবল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতিতে নৈপুণ্য প্রদর্শনের দিকেই এঁদের শক্তির প্রয়োগ সমধিক। বুদ্ধদেব বসুও মাত্রাবৃত্তে দক্ষতা দেখিয়েছেন। চতুর্মাত্রক মাত্রাবৃত্তে তাঁর রচনার নিদর্শন—

সব চেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস
মূর্ত আশার মতো দীপ্ত আকাশ।
জ্যৈষ্ঠের খর তাপ তীব্র পরশ
রোদ্দুরে যত রোষ আমে তত রস।

— (ছোটদের কবিতা : ‘বারো মাসের ছড়া’)

এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ৪+৪+৪+২ মাত্রা। সংস্কৃত পজ্ঝটিকা তথা প্রাকৃত পাদাকুলক থেকে বিকশিত হয়েছিল মধ্যযুগের ব্রজবুলি-ভাঙা পদাবলীতে ৪+৪+৪+৪ বা ৪+৪+৪+৩ মাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘ-মাত্রিক ঘেঁষা কবিতা, প্রাচীনকালের বাংলা কাব্যের স্বরবৃত্ত-ঘেঁষা অক্ষর বৃত্ত পয়ার নয়। আধুনিককালে প্রধানত তারই প্রভাবে চতুর্মাত্রক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। উপরোদ্ধৃত রচনাটিতে চতুর্মাত্রিকতার বিশিষ্ট ভঙ্গিটিই সুপ্রকট; এতে ৮+৬ মাত্রার চাল (movement) নেই বলে পয়ারের প্রকৃতিগত পদমহিমা প্রকাশ পায় নি। নিম্নে দেখুন বুদ্ধদেব বসুর মাত্রিক রীতির দীর্ঘত্রিপদী—

স্বপ্নেই হলো লীন   স্বপ্নের পরিচিতা;
  বাসা নাই তার বাসা নাই।
বিরতিবিহীন কাল   চল্লিশে দিলো তাল
  আশা নাই তার আশা নাই ॥
— (দ্রৌপদীর শাড়ি : 'পথের শপথ')

এখানেও আট-মাত্রার পদগুলো চার-মাত্রায় বিভাজ্য এবং একটিও যুক্তপর্বিক পদ নেই, ফলে দীর্ঘত্রিপদীর অন্তর্নিহিত সুরমাধুরী প্রাধান্য পেয়েছে; কিন্তু অবিভাজ্য অষ্টমাত্রক পদ থাকলে ধ্বনিব্যঞ্জনা হতো স্বভাবত গম্ভীর ও উদাত্ত।

ষন্মাত্রক মাত্রাবৃত্তে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার একটি স্তবক—

মিশে যায় দুটি উৎসুক মেঘ পরস্পরে,
হঠাৎ ফুরোয় ঝরিয়ে বৃষ্টিবিন্দু :
তেমনি তোমার অপ্সরী-বাহু স্পর্শময়
এখন কোথায়? তবু ছিলো এই মাত্র।
— (মরচে পড়া পেরেকের গান : 'মৌলিনাথের স্বপ্ন')

এর প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে ৬+৬+৫ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ৬+৬+৩ কবিতাটির বিভিন্ন পঙ্ক্তির প্রান্তিক অপূর্ণপদে মাত্রা-সংখ্যার তারতম্য করে ছন্দঃস্পন্দের বৈচিত্র্য সাধনের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

সপ্তমাত্রক মাত্রাবৃত্তে তাঁর কবিতার একটি স্তবক —

বল, তো বোন, কবে   আবার মধুমতী   গাভীর বাঁট হবে   উচ্ছল?
ঢেঁকির গম্ভীর   শব্দে দিয়ে তাল   জাগবে হাতি- পায়ে   ভঙ্গি?
ব্যাঙের ছাতা কবে   সাজাবে পৃথিবীরে?   ডাকবে উল্লাসে   দর্দুর?
শিশির-বিন্দুর   আদরে ভরপুর   ঝুলবে আঙিনায়   কুমড়ো?
— ('তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে তিনটি কবিতা : ১)

এর প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে ৭+৭+৭+৪ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ৭+৭+৭+৩ মাত্রা। এই কবিতাটিরও শেষ পাদে মাত্রাসংখ্যা একবিধ নয়, কোথাও ৭ ('পূজ্য ব্রাহ্মণ'), ('রক্ত চক্ষু', 'দীর্ণ শূন্য',) কোথাও (৫ মায়ের কোলে' 'বৃষ্টি দাও'), কোথাও ৪ ('উচ্ছল', 'দর্দুর') 'পন্নগ', 'পরিণাম') এবং কোথাও ৩ ('পশুরা', 'বন্ধু', 'অণ্ণ', 'ভঙ্গি', 'কুমড়ো', 'সিন্ধু', 'আমরা' 'শান্তি', 'লাগ্‌লো')। মাত্রা-পরিমাণের এই অসমানতার দরুন পঙ্ক্তির পূর্ণযতিতে বিচিত্র হয়েছে ধ্বনিহিল্লোল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'যৌতুক না কৌতুক' কবিতা ১৮৮৩ খ্রি. লিখেছিলেন মাত্রাবৃত্তে ৭+৫+৭+২ মাত্রায় পর্ববিভাগ করে; পরবর্তীকালে এই মিশ্রপর্বিক রীতিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'গানভঙ্গ'। বুদ্ধদেব বসু ৭+৫+৭+৫ মাত্রার ছন্দে লিখেছেন : 'অসম্ভবের গান'। তার তৃতীয় স্তবক :

কোনো বিচক্ষণ   যুধিষ্ঠির   জানে না কেন এই   পরিশ্রম
জানে না সন্ধ্যায়   ক্লান্ত পাখা   হঠাৎ কাঁপে কোন   আকাঙ্ক্ষায়।
(শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর)

কবিতাটির দশম অর্থাৎ শেষ স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তি—

আবার বসন্তের   হুলস্থুল।   ব্রহ্মচারী তুমি,   সব্যসাচী?

এখানে 'আবার বসন্তের' পদটিতে অনবধানতাবশত ৭-মাত্রার স্থলে সন্নিবেশিত হয়েছে ৮- মাত্রা। মাত্রাবৃত্তে এরূপ ব্যতিক্রম কানে কটু ঠেকে।

বুদ্ধদেব বসুর 'আরোগ্যের তারিখ' কবিতাটির কোনো কোনো স্তবক উপরিউক্ত রীতিতেই রচিত। তার অনেক পঙ্‌ক্তি ৭+৭+৭+৫ মাত্রা-যোগে গঠিত। ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বেরিয়ে এলো ফের   তহিন বাত্যায়
                    পুঞ্জ বরফের ধবলে।
কিন্তু রাত্রির   খনিত গহ্বরে
                    ট্যাক্সি চুম্বনে তপ্ত ॥
ক্রমশ সরে যায়   ত্যক্ত তটরেখা,
                    লুপ্ত অতীতের প্রচ্ছদ।
অতল, উত্তাল   বন্যা ভাঙে বাঁধ
                    বাহাত্তর স্ট্রিটে, তেতলায় ॥

—(মরচে-পড়া পেরেকের গান)

উপরোদ্ধৃত প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতে আছে ৭+৭+৭+৩ মাত্রা এবং পরের দুটি পঙ্‌ক্তিতে ৭+৭+৭+৪ মাত্রা। কবিতাটির কয়েকটি স্তবকের বিচিত্র পর্বসজ্জা বিশেষ ধরনের ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্তে বুদ্ধদেব বসুর 'দ্রৌপদীর শাড়ি' এক নিখুঁত রচনা

আলোর বাঘ   কখনো ছায়া   হরিণে করে   তাড়া;
আশার দাঁত   চিবিয়ে ছেঁড়ে   দ্রৌপদীর   শাড়ি। ...
মন্ত্র-পড়া   অন্তরাল   দিলো না তবু   সাড়া,
অসম্ভব   দ্রৌপদীর   অন্তহীন   শাড়ি ॥

তাঁর 'ঝরাফুলের গান' ও 'স্বয়ংবরা' পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্তে রচিত; কিন্তু প্রথমটিতে 'চিরন্তনের' পদে এবং দ্বিতীয়টিতে 'অকথ্য এক' পদে পাঁচ-মাত্রার স্থলে ছয়-মাত্রার ব্যতিক্রম ছন্দঃপতন ঘটিয়েছে। অথবা, এই ব্যত্যয়ের বিশ্লেষণে এ-কথাও বলা যায় যে, এ দুই স্থানে ছয়-মাত্রায় চার-স্বরের প্রয়োগে মিশ্ররীতির ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্তে যে-সব কবিতা লিখেছেন, তাতে চতুস্বর স্বরবৃত্তের মিশ্রণ বাংলা ছন্দে এক নতুন সম্ভাবনার ইশারা ব্যক্ত করেছে। বরিস পাস্টেরনাক থেকে তাঁর অনূদিত 'একটি রূপকথা' শীর্ষক কবিতার কতকাংশ—

উপত্যকায়   পায়ের ছাপে   জানতে
পেলো, এ-পথ   গেছে জলের   প্রান্তে।...
ঝর্ণা যেথায়   আঁকাবাঁকা   অল্প জলে,
গুহার মুখে   গন্ধকের   আগুন জ্বলে।....
কখনো ঘোর   পুলকে নামে
            বিরামহীন   অশ্রুধারা,
কখনো তা'রা   মরণঘুমে   আত্মহারা।

এখানে 'উপত্যকায়' ও 'ঝর্ণা যেথায়' পর্বে আছে ৪-স্বর ৬-মাত্রা, ' আঁকাবাঁকা' পর্বে ৪-স্বর ৪-মাত্রা, 'গন্ধকের' ও 'বিরামহীন' পর্বে ৩-স্বর ৫-মাত্রা এবং 'পুলকে নামে' ও 'কখনো তারা' পর্বে ৫-স্বর ৫-মাত্রা। অতত্রব এ-কবিতাটি পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্ত ও চতুস্বর

স্বরবৃত্ত, এ দুই রীতির একটিতেও সমগ্রভাবে উত্তীর্ণ হয় না। আসলে এটি এ দুই রীতির সমবায়ে নির্মিত।[৯] এই মিশ্ররীতির এক চমৎকার নিদর্শন বুদ্ধদেব বসুর 'নূপুর'। তার কিয়দংশ—

কবিতা, আর করো না দেরি কবরী বাঁধো, পরো নূপুর,
দ্যাখো না মেঘে আঁধার হয়ে আবার এলো খর দুপুর।
বৈশাখের শুখানো চাঁপা উড়ায়ে
আষাঢ় দিলো যূথীর আশা ছড়ায়ে,

* * *

কবিতা, এই মেঘের দিনে সবি তোমার ভালোবাসার,
তোমার খুশি মন করেছে, বৈশাখে তাই এলো আষাঢ়।
তোমার চোখে পড়বে ব'লে বিকালে
অস্ত রবির রঙিন লিপি লিখালে,
— (দ্রৌপদীর শাড়ি)

এখানে 'করো না দেরি', 'কবরী বাঁধো', 'দ্যাখো না মেঘে' ও 'শুখানো চাঁপা' পর্বগুলোতে পাঁচ-মাত্রা; 'বৈশাখে' পর্বে তিন-স্বর পাঁচ-মাত্রা ; 'বৈশাখে তাই' ও 'অস্ত রবির' পর্বে চার-স্বর ছয়-মাত্রা এবং অবশিষ্ট পূর্ণপর্বগুলিতে চার-স্বর পাঁচ-মাত্রা রয়েছে। পূর্ণপর্বে যেখানে পাঁচ-স্বর ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে স্বরগুলো মুক্ত অর্থাৎ একমাত্রক। বুদ্ধদেব বসুর এই রীতির মিশ্রছন্দের কোনো কবিতাতেই পাঁচ-স্বরের পর্বে যুগ্মধ্বনির তথা বদ্ধস্বরের প্রয়োগ নেই। এই নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালিত হলে পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্ত ও চতুঃস্বর স্বরবৃত্তের সমন্বয়ে বাংলা ছন্দে একটা নতুন ধারা বিকাশ লাভ করতে পারে।[১০]

বুদ্ধদেব বসু বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত রীতিতেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। একটি স্তবক তুলছি—

ভাঙলো না সে একমুঠো গম স্কুলের জাঁতায়;
ভবিষ্যতের বাতাস টানে বটতলাতে;
চাঁদের আলোয় আন্দোলিত গন্দোলাতে
রূপসীকে জানায় পূজা ছেড়া খাতায়।
— (মরচে পড়া পেরেকের গান : 'লোকটা')

এর পঙ্‌ক্তিতে ৪+৪+৪ সিলেবল্। পঙ্‌ক্তিমিলের বিন্যাসেও বৈশিষ্ট্য আছে।

স্বরবৃত্তের পূর্ণপর্বে সাধারণত থাকে চার সিলেবল্। এ-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন :

> কঠোরভাবে চার সিলেবলে বেঁধে দিলে, স্বরবৃত্তের প্রধান গুণ যে স্থিতিস্থাপকতা, সেই গুণটিকেই নষ্ট করা হয়।[১১]

তাই তিনি স্বরমাত্রামিশ্রবৃত্ত কবিতায় পাঁচ-স্বর পাঁচ-মাত্রা যেমন সন্নিবেশিত করেছেন, তেমনি করেছেন তিন স্বর পাঁচ-মাত্রা। তাঁর বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত কবিতার পর্বে তিন স্বর পাঁচ-মাত্রা সংস্থানের নজির—

শিশুরা সব মায়ের হাত ধ'রে
পসারীদের ঘুরছে দ্বারে দ্বারে;
হাঁকছে তারা : "এই যে অঝোর মজা

কে নেবে তা নাও নাকো এবারে।”
— (মর্মবাণী, ‘মেলা’)

স্বরবৃত্তের নিয়ম এই যে, তার পূর্ণপর্বে উর্ধ্বপক্ষে চার-স্বর সাত-মাত্রা এবং ন্যূনপক্ষে তিন-স্বর পাঁচ-মাত্রা থাকে। তাতে ব্যতিক্রম হিসেবে তিন সিলেবল্ থাকলে তার অন্তত দুটি হয় বদ্ধ। এই বৈকল্পিক নীতি অনুসারেই উপরোদ্ধৃত কবিতাটিতে ‘মায়ের হাত’ পর্ব ত্রিস্বরিক (tri-syllabic) এবং তার দুটি স্বর বদ্ধ বলে ধ্বনি-পরিমাপে পঞ্চমাত্রিক (Pentamoriac) স্বরবৃত্তে ত্রিস্বরিক পর্বের নিয়মিত বিন্যাস করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

৪	৩	৪	৩
মিনিতে আর	বিনিতে	ঘুমিয়ে প’ল	ঝিনুকে,
আয় গো তোরা	দেখে যা	মিনুকে আর	বিনুকে।
ভিতর-রাঙা	ঝিনুকটি	বাহিরে তার	রূপালী;
সাগর-জলের	শব্দেতে	ঘুরে বেড়ায়	নিদালি।

— (তীর্থ-সলিল, ‘মিনি ও বিনি’)

নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন :

৪	৩	৪	৩
হাত হতে মোর	হৃদয় যায়,	দোহাই বাঁচাও	হৃদয়বান!
আফ্‌সোস্ আমার	গোপন সব	ফস্‌কে যে দেয়	নিদয় প্রাণ।
দশদিনের এই	দুন্‌য়া ভাই	স্বপ্ন কুহক	কল্পলোক;
করতে ভালোই	বন্ধুদের,	বন্ধু তোমার	লক্ষ্য হোক।

— (দীওয়ান-ই-হাফিজ : গজল-৩)

উপরোদ্ধৃত দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পর্ববিভাগ হয়েছে ৪+৩+৪+৩ সিলেবলে। দুটি কবিতাই বিদেশি ভাষা থেকে অনুবাদ। এই ছন্দের মিশ্রপর্বে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

৩	৪	৩	৪
চোখে চোখ	পড়েই যদি,	নিয়ো না	চোখ ফিরিয়ে
নিয়ো না	চোখ নামিয়ে	রাখো এই—	একটু খানি।
সীমাহীন	এক নিমেষে-	খোলা এই	জান্‌লা দিয়ে
কী আছে	তোমার মনে—	যা আছে,	সব দেখে নিই।

— (কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা : ‘গান’)

কিন্তু এর পঙ্‌ক্তিতে পর্ববিভাগ হয়েছে ৩+৪+৩+৪ সিলেবলে।[১২]
স্বরবৃত্তে বুদ্ধদেব বসুর একটি নিয়ম-নিরপেক্ষ (Irregular) সনেট :

পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া,
ছাঁটা চুলে যতো এঁকো টেরি;
লোকে দেখে ভাবুক, ‘আমাদেরি।!’
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া :
আক্রমণ, কাফে-র করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।—
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া

ঢাল তলোয়ার আর কী তোমার আছে,
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সেই আগুন?

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উনুন
রাঙিয়ে তোলে নিশ্বাসের হাওয়া—
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া !

— (*যে আঁধার আলোর অধিক* : 'এক তরুণ কবিকে')

এর পঙ্‌ক্তিতে ৪+৪+২ সিলেব্‌ল। এর মিল-বিন্যাস :

ক খ খ ক ঃ ক গ গ ক ঃ ঃ ঘ ঘ ঙ ঃ ঙ চ চ ॥

স্বরবৃত্তে বাংলা ভাষার প্রথম সনেট সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ইচ্ছামুক্তি' (১৩২৭ মাঘের 'প্রবাসীতে' প্রথম প্রকাশিত); তা ৪+৪+৪+৪+২ সিলেবলের পঙ্‌ক্তিতে সেক্সপীয়রয়ি রীতিতে রচিত। এই ছন্দে সনেট রচনার চেষ্টা বেশি হয় নি; কারণ স্বরবৃত্তের নৃত্য-চপল ভঙ্গিতে সনেটের ভাস্কর্য-কঠিন সুমসৃণ ভাব-দেহে সংযমসুলভ সুমধুর ছন্দঃসংগীত সৃষ্টি করা দুরূহ।

অক্ষরবৃত্তে সনেট রচনার রেওয়াজই বাংলা ভাষায় অবিসম্বাদিত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ১৪ ও ১৮ অক্ষরের পঙ্‌ক্তিই সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতির সর্বাধিক উপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু ২২-অক্ষরের পঙ্‌ক্তিতে 'সুদূরিকা' এবং ২৬-অক্ষরের পঙ্‌ক্তিতে 'অসূর্যম্পর্শা' ও 'আর কিছু নাহি সাধ' প্রণয়ন করেন। এরূপ অতি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে সনেটের সংহত রূপ ও সংগীত গুণ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, "আঠারো অক্ষরের ছন্দই বাংলায় সনেট রচনার সবচেয়ে উপযোগী। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তা ইংরেজি iambic pentametre এর corresponding বাংলা ছন্দ।"[১৩] কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত তাঁর বহু সনেট অসমপঙ্‌ক্তিক। তাঁর *যে আঁধার আলোর অধিক* কাব্যের 'স্মৃতির প্রতি : ১', 'কোনো কুকুরের প্রতি', 'রবীন্দ্রনাথ', 'রাত তিনটের সনেট : ১', 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১' প্রভৃতি চতুর্দশপদীগুলো এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত। 'স্মৃতির প্রতি : ১' রচনাটিতে ১৮ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির সাথে কাঁধ মিলিয়ে ২০ ২২, ২৪ ও ২৬ অক্ষরের পঙ্‌ক্তি। 'কোনো কুকুরের প্রতি' শীর্ষক চতুর্দশপদীটির নবম পঙ্‌ক্তি ১৪-অক্ষরের ও ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তি ১৬-অক্ষরে গঠিত : অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলো ১৮ মাত্রিক : প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'বিচ্ছেদে' পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'নৌকোয়' ও সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে 'গন্ধের' শব্দ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে দ্বিমাত্রক হয়ে ধ্বনি সম্মিতি সাধন করেছে। 'রাত তিনটের সনেট : ১' শীর্ষক রচনাটির পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে ১৬-অক্ষর, সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে ১৫-অক্ষর ১৬-মাত্রা ও একাদশ পঙ্‌ক্তিতে ২০-অক্ষর; তার অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে 'স্বত্বাধিকারী' শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে দ্বিমাত্রক। অসমপঙ্‌ক্তির আদলে এবং কোনো কোনো শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রক ধরে সনেট প্রণয়নের এই পদ্ধতি জীবনানন্দ দাশ অনুবর্তন করেছেন তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্যে। সে-সম্বন্ধে ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহরায় বলেছেন :

> জীবনানন্দ দাশের চরণগুলি অতি দীর্ঘ ও দুয়ের অধিক পর্বসমন্বিত, মাত্রাযোজনাও সবর্ত্র বিচারসম্মত নয়।[১৪]

বুদ্ধদেব বসুর অসমপঙ্‌ক্তিক চতুর্দশপদীগুলো সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে। এগুলো সনেট পদবাচ্য হতে পারে কি না, তাও প্রশ্নের বিষয়। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে,

মুক্তক পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে, মুক্তছন্দে বা কোনো অসমায়তন ছন্দোবন্ধে কুত্রাপি সার্থক সনেট অদ্যাবধি সংরচিত হয় নি। তবু বুদ্ধদেব বসু সনেটের আকৃতি ও আঙ্গিক নিয়ে যে প্রাথমিক পরীক্ষা করেছেন, তা ছান্দসিকদের পক্ষে হয়েছে কৌতূহলের বিষয়।[১৫]

বুদ্ধদেব বসুর *কঙ্কাবতী* কাব্যের 'ক্ষমা প্রার্থনা' শীর্ষক সনেটটিতে 'বার্তায়', 'বাত্যায়' ও 'আত্মায়' মিল দেওয়া হয়েছে। ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহরায় "এখানে 'বার্তায়, বাত্যায়' মিলের দুর্বলতা" লক্ষ করেছেন।[১৬] বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক সনেটটিতে 'ছিলে না' ও 'খেলে না' শব্দে এবং 'করো নি' ও 'যামিনী' শব্দে মিল দুর্বলতারই লক্ষণ বটে। কিন্তু তিনি বহু স্থানে মিল প্রয়োগে যে ওস্তাদি দেখিয়েছেন, তা বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। অক্ষরবৃত্ত রীতিতে : দাশরথি রায়ের "চক্ষে ধার তারাকার কারাগার হেরি " (অক্রূর সংবাদ), অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা-তাল্লা ডাকে" (আগরার যুদ্ধ) ; মাত্রাবৃত্ত রীতিতে : রবীন্দ্রনাথের "শলাকা-বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী" (কল্পনা, উন্নতি-লক্ষণ), কিংবা মোহিতলাল মজুমদারের "তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ শেষে" (বিস্মরণী, দীপশিখা) এবং স্বরবৃত্ত রীতিতে : দীনবন্ধু মিত্রের "গেলে কুড়ি থুব্‌ড়ো বুড়ী কেউ না ফিরি চায়" (কমলে কামিনী : ২/১) অথবা নজরুল ইসলামের "মাঠের বাঁশি বন-উদাসী ভীম-পলাশী গায়" (ছায়ানট, চৈতী হাওয়া) প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির পর্ব প্রান্তিক মিল শুধু ছন্দধ্বনিকে অলঙ্কৃত করে নি, করেছে মাধুর্যমণ্ডিত। নিম্নে বুদ্ধদেব বসুর রচনা তুলছি—

> তোমাকে বুকে করে, তোমাকে বুকে ভরে কাটে আমার রাত্রি।
> সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার মন্থিত মুহূর্তে
> থমকে দাঁড়ায়— যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী
> কোনো উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে
> — (নতুন পাতা, 'জন্ম')

এই পঙ্‌ক্তিমিলযুক্ত রচনাটিতে একাধিক প্রচলিত ছন্দ ও বৃত্তগন্ধি গদ্যের অনুমিশ্রণ রয়েছে; তাই এর অভিধা হতে পারে 'ফ্রি ভার্স' : মুক্ত ছন্দ। এর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'ক'রে' 'ও' ভ'রে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'কাল' ও 'উত্তাল,' তৃতীয় পঙ্‌ক্তির পূর্বাংশে 'দাঁড়ায়' ও 'হারায়' এবং পরবর্তী অংশে 'অবায়ু' ও 'চিরায়ু,' চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'উদ্যত', 'মতো' ও 'উত্তপ্ত' প্রভৃতি মধ্যমিলের ইতস্তত সমাবেশ রচনাটিতে ছিটিয়ে দিয়েছে পদ্যের মিষ্টতা।

মুক্তছন্দের (Vers Libre) কবিতার সাথে গদ্যকবিতার পার্থক্য এই যে, গদ্যকবিতার কোনো পঙ্‌ক্তিভাগে বা বাকপর্বে কোনো অতি-নিরূপিত পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ধ্বনিঝঙ্কার থাকে না,— তার ভাবপর্বের অনতিস্পষ্ট ধ্বনি স্পন্দন সর্বাঙ্গে সঞ্চার করে ছন্দাভাস : সুদৃঢ় গদ্যভঙ্গিতেই ভাস্বর হয়ে ওঠে ধ্বনি-সুষমা। বাংলা ভাষায় মুক্তছন্দের কবিতা রচিত হয়েছে সামান্য; ইদানীং গদ্য কবিতা প্রণয়নের দিকেই প্রবণতা প্রবল। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য কবিতার একটি স্তবক—

> '— বাহুতে হিল্লোল তুলে এগিয়ে এলো, জলের স্রোতে জ্যোৎস্নার মতো চঞ্চল,
> পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে যেমন রৌদ্রকণা, তেমনি তার কঙ্কণের রশ্মি,
> শঙ্খের মতো গ্রীবা, দু'টি কান যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু,
> বুকের দু'টি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল,
>
> শরতের বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ ও আর্দ্র তার দৃষ্টি,
> তার আননে চৈত্রপূর্ণিমার আকাশের আনন্দ,

মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্ঘায়—
এমনি ক'রে এগিয়ে এলো, তার নিশ্বাস স্পর্শ করলো আমাকে,

পুষ্প ধূপ, চন্দন ও ঘৃতভুক অগ্নির চেয়েও সে সুগন্ধি ;
তাঁর স্পর্শে আমার চোখে নামলো ধ্যানমগ্ন তিমির,
স্তব্ধ হ'লো হৃৎপিণ্ড, সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ,
ডুবলো এই দেহ-মন গভীর থেকে আরো গভীরে, শূন্য থেকে
গাঢ়তর শূন্যে;—
যেখানে ত্রিলোক এক অখণ্ড স্থির বিন্দুর মধ্যে সংহত,
ত্রিকাল এক সমতল ও নিরঞ্জন বিস্তার,
লুপ্ত সব দ্বৈত, তুমি আর আমি অনন্য—
আমি সেই ব্রহ্মলোকে স্থান পেলাম, তার আলিঙ্গনে
— (মরচে পড়া পেরেকের গান)

এখানে বাক্‌পর্বগুলোর ভাবগত বিন্যাসে বাচ্যার্থের ব্যঞ্জনা শুধু ইঙ্গিতবহ হয় নি, শব্দচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হয়েছে লিরিকের রস-সৌন্দর্য।

বুদ্ধদেব বসু বিদেশি সাহিত্য থেকে যে-সকল কবিতার অনুবাদ করেছেন, সেখানে গদ্য-কবিতা ও মুক্তছন্দের নতুন রীতি যেমন লক্ষিত হয়, তেমনই দৃষ্টি আকর্ষণ করে জটিল পদ্যছন্দের অনুসৃতি। ই. ই. কামিংস থেকে তাঁর অনূদিত একটি ক্ষুদ্র কবিতার চার পঙ্‌ক্তি—

গাছের স্ফূর্তি-ভরা ফলের চিকণ
বৃন্তে দিগন্তের নারেঙ্গি রং ...
উঠবে ঘাসের পথে ঢেউ সে পাখার
যেখানে একলা হাঁটে কান্তা আমার
—(যখন র'বো না আর মর্ত্য-ছাঁচে)

উপরের পঙ্‌ক্তিগুলি ৮+৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পয়ার। এখানে 'গাছের স্ফূর্তি-ভরা' এবং 'যেখানে একলা হাঁটে" আট- মাত্রার যুক্তপর্বিক পদ।

মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত 'মেঘদূত' কাব্য বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেছেন সপ্তমাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। ইতঃপূর্বে এই স্বভাবমন্থর ছন্দোবন্ধেই শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৩৩৭) ও শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৩৩৯) মেঘদূতের ভাবানুবাদ করেছিলেন। মেঘদূতের উত্তর-মেঘের ২২-সংখ্যক শ্লোক—

তন্বী শ্যামা   শিখরদশনা   পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা   চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা   নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা   স্তোকনম্রা   স্তনাভ্যাং।
যা যত্র সাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥[১৭]

এই ছন্দ মন্দাক্রান্তা। এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ৪+৬+৭=১৭ অক্ষর। প্রথম চার অক্ষর, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অক্ষর গুরু; অবশিষ্ট সাতটি অক্ষর লঘু। গুরু ও লঘু অক্ষরের এই পর্যায়-বিন্যাস প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে সুনিয়ন্ত্রিত। গুরু অক্ষর দুই-মাত্রা ও লঘু অক্ষর এক-মাত্রা ধরে উক্ত ১৭-অক্ষরে ৮+৭+১২= ২৭ মাত্রা। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু পঙ্‌ক্তিতে ঊর্ধ্বপক্ষে ৭+৭+৭+৫ মাত্রা এবং ন্যূনপক্ষে ৭+৭+৭+৩ মাত্রা সন্নিবেশিত করেছেন। উপরোদ্ধৃত চতুষ্পঙ্‌ক্তিক শ্লোকটির তাঁর কৃত অনুবাদ—

তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

এই অনুবাদে তিনি লঘু-গুরু-ধ্বনির সুনির্দিষ্ট গতিক্রম রক্ষা করেন নি; ফলে মন্দগতি মন্দাক্রান্তার সুগম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয় নি।

বাংলা ভাষায় অক্ষরের লঘু-গুরু-ভেদ স্বীকৃত নয়। তাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গুরু অক্ষরের স্থানে সর্বত্র বদ্ধস্বর ব্যবহার করে বাংলায় সংস্কৃত বৃত্তছন্দের ধ্বনিকল্লোল যথাসম্ভব আনয়নের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেই অভিনব পদ্ধতিতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 'মেঘ-দূত' বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। তিনি উপরোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ—

'কান্তার রূপ মোর— শ্যামলা কৃশা, তার মুক্তাসুন্দর দশন্‌চয়,
মধ্যস্থান ক্ষীণ, চকিত-মৃগী-চোখ বিম্বরক্তিম অধর হয়।
গম্ভীর নাভ তার, স্তনে সে নত-কায়, ধীর গমন তার নিতম্বেই—
কান্তার সেই রূপ হেরিলে মনে হয় আদ্যাসৃষ্টির স্বরূপ এই।

এখানে মন্দাক্রান্তার ধ্বনিসংগীত যথাসম্ভব প্রতিধ্বনিত করতে গিয়ে কাব্যের অর্থ সম্পদ ও ভাবরসের অকারণ হানি যাতে না ঘটে, সেদিকে অনুবাদক প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু ধ্বনিতেই কাব্যের ভাবরস হয় স্পন্দিত ও প্রাণবন্ত; তাই সত্যেন্দ্র-প্রবর্তিত প্রস্বরমাত্রিক (accentual) প্রক্রিয়ায় মন্দাক্রান্তার ধ্বনিরস যথাসম্ভব সংরক্ষণের দুঃসাধ্য সাধনায় যোগীন্দ্রনাথ যে সাফল্য লাভ করেছেন সেজন্য তার এই অনুবাদ বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিবৃত্তে সগৌরবে উল্লেখনীয় হয়ে থাকবে।

সংস্কৃত ছন্দে পদভাগে অসমানতা একঘেয়েমি প্রতিরোধের প্রধান উপায়। বাংলা প্রস্বরমাত্রিক পদ্ধতিতে যদি সমদূরত্বে যতি দিয়ে এই প্রকার পর্বের সমাবেশ করা হয়, তবে ছন্দে একঘেয়েমি অনিবার্য। বুদ্ধদেব বসুর রচিত একটি ষন্মাত্র-পর্বিক পঙ্‌ক্তির ছাঁচে তার নজির পরিবেশন করছি—

রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ওষ্ঠে হাসির জোছ্‌না ছড়ায় অঙ্গে রূপের বন্যা।
মন্দাকিনীর মুক্তধারায় স্বচ্ছ তাহার চিত্ত,
সর্বদা দেয় মন্ত্র প্রেমের নিত্যকালের বিত্ত।

এখানে চার-স্বর ছয়-মাত্রা সম্বলিত একই প্রকৃতির সমায়তন পর্বের পুনঃপৌনিকতা-জনিত একঘেয়েমি ছন্দের কানে অল্প সময়ের ব্যবধানেই কৃত্রিম ঠেকে। তাই বুদ্ধদেব বসু যেমন মিশ্রপর্বের প্রয়োগ পছন্দ করেছেন, তেমনই করেছেন প্রস্বরমাত্রিকের এরূপ একঘেয়েমি পরিহার। আধুনিক কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের পরে যে কয়জন শক্তিমান কবি বাংলা ছন্দ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

পাদটীকা

১. *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব;* (চতুর্থ সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪৩), ৪৫ পৃষ্ঠা
২. ছান্দসিকী, প্রথম সংস্করণ ২৩৭-৩৮ পৃ. / দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫০-৫১ পৃ.।
৩. 'পয়ারের উৎস-সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৫ সন, ২২২ পৃষ্ঠা।
৪. 'বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত'; শীর্ষক প্রবন্ধ : প্রবাসী চৈত্র ১৩৩০ সন, ৭৮৫ পৃষ্ঠা।

৫. 'বাংলা ভাষা-পরিচয়'। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ২৬শ খণ্ড, ৪০১-৪০৪ পৃষ্ঠা।

৬. ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে পাঁচ ভল্যুমে মুদ্রিত কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* তৃতীয় ভল্যুম, ৪ পৃষ্ঠা।

৭. ছন্দ ; চিঠিপত্র-২। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ২১শ খণ্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা।

৮. শ্রীদিলীপকুমার রায়ের *ছান্দসিকী* প্রথম সংস্করণ ১১১ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯. এরূপ মিশ্রছন্দের কবিতা শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর *পারাপার* কাব্যের 'বৈদান্তিক'; তার কয়েক পঙ্‌ক্তি—

প্রকাণ্ড বন, প্রকাণ্ড গাছ,
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার;
জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ বটের ঝুরি,
ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হল্‌দে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না হিম বুক চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের বৃষ্টি সেই আরণ্যক—
বেরিয়ে এলেই নেই।

এখানে ৪-স্বর ৪-মাত্রার পর্ব একটিও নেই। 'প্রকাণ্ড বন', 'প্রকাণ্ড গাছ', 'বেরিয়ে এলেই' ও 'সবুজ অন্ধ-' পর্বগুলিতে ৪-স্বর ৬-মাত্রা; 'ভিতরে কত' ও 'আরো গভীরে, পর্বগুলোতে ৫-স্বর ৫-মাত্রা ; পঙ্‌ক্তির মাঝে 'পেঁচার চোখ', 'জোৎস্না হিম,' মেঘের ঝড়' ও 'বৃষ্টি সেই' পর্বগুলোতে ৩-স্বর ৫-মাত্রা এবং অবশিষ্ট পর্বগুলোতে ৪-স্বর ৫-মাত্রা রয়েছে। একই কবিতায় "স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত পঞ্চমাত্রিক, এই তিন রকম স্থান" লাভ করতে পারে কি না, এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

"পয়ারের মধ্যে বিষম পঙ্‌ক্তির সুষ্ঠুতা বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন 'পারাপার' এর 'বৈদান্তিক' কবিতায়) এই মিশ্রণের ফল উপাদেয় হয়েছে। সতর্কভাবে এ পথে পরীক্ষা করতে থাকলে বাংলায় মুক্ত ছন্দ বা মিশ্রছন্দের একটা প্রকরণ গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়।"

— (কবিতা, ২০- বর্ষ, ২- সংখ্যা, পৌষ ১৩৬২ সন, ১৬৩ পৃষ্ঠা।)

১০. এই আদর্শের গ্রাম্য ছড়া—

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে ॥
ধান ফুরালো, পান ফুরালো, খাজনার উপায় কি।
আর ক'টা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি ॥

এখানে 'ছেলে ঘুমালো' ও 'পাড়া জুড়ালো' পর্ব পাঁচ-স্বর পাঁচ-মাত্রা; অবশিষ্ট পর্বগুলো চতুঃস্বরিক (tetra-syllabic) ছড়া-ছন্দের এই বিশেষ ছাঁচে আধুনিক কবিতা—

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি, নিম গাছেতে হচ্ছে শিম;
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা, কাগের মাথায় বগের ডিম।

— (সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল)

খুড়ি গো খুড়ি, হামাগুড়ি
খাটের তলায় লেপের মুড়ি।
সঙ্গে রেখো টাকা কুড়ি,
নইলে কখন যাবে চুরি ॥

— (অন্নদাশঙ্কর রায়, 'হিতোপদেশ')

১১. বাংলা ছন্দ। সাহিত্যচর্চা, ১১৪ পৃষ্ঠা।

১২. এই রীতিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক রচনা—

৩	৪	৩	৪
পলাশের	চক্ষু রাঙা	ভ্রমরী	ঝিমি গেছে;
দুনিয়ার	শুকনো পাতায়	খামোকাই	ঘুর লেগেছে।

— (ধূপের ধোঁয়ায় : ১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

নজরুল ইসলামের গান—

৩	৪	৩	৪
কে তুমি	দূরের সাথী	এলে ফুল	ঝরার বেলায়
বিদায়ের	বংশী বাজে	ভাঙা মোর	প্রাণের মেলায় ॥

— (নজরুল-গীতিকা : ১২৪)

১৩. ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ। কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৫ সন, ৭৬৯ পৃষ্ঠা।

১৪. শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ-সম্পাদিত *বাংলা সনেট*, ভূমিকা ২৪ পৃষ্ঠা।

১৫. বুদ্ধদেব বসুর *যে-আঁধার আলোর অধিক* কাব্যের ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’ শীর্ষক কবিতাটির পঙ্ক্তিতে ‘এক তরুণ কবিকে’ শীর্ষক সনেটটির ন্যায় ৪+৪+২ সিলেবল ; কিন্তু তার পঙ্ক্তিসংখ্যা ১৬ এবং মিল-বিন্যাস (rhyme-scheme) এরূপ— ক খ ক খ ঃ গ ঘ গ ঘ ঃ ঃ ঙ ঙ চ গ ঃ ছ ছ চ গ ॥
শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী এটিকে বলেছেন ঃ “১৬-চরণের সনেট।” *আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

সেক্সপীয়রীয় সনেটের চতুষ্কে (quatrain) থাকে একান্তর মিল (alternate rhymes) সেরূপ চারটি চতুষ্ক যোগে রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্যের ‘মানসিক অভিসার’ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের *তীর্থসলিল* কাব্যের ‘উদ্দীপনা’ বিরচিত; তাদের মিল বিন্যাস যথাক্রমে—
ক খ ক খ ঃ গ ঘ গ ঘ ঃ ঃ ঙ চ ঙ চ ঃ ছ খ ছ খ ॥
ক খ ক খ ঃ গ ঘ গ ঘ ঃ ঃ ক ঙ ক ঙ ঃ চ ছ চ ছ ॥
কিন্তু সেগুলো ১৬ পঙ্ক্তির কবিতা, কদাচ সনেট পদবাচ্য নয়। ইংরেজ কবি George Meredith (১৮২৮-১৯০৯খ্রি.) Modern Love নামক কবিতা-গুচ্ছ রচনা করেন; ১৬ পঙ্ক্তির কবিতাগুলোর চতুষ্কে আদি-ইতালীয় (ক খ খ ক) প্রথায় মিল দেওয়া হয়েছে; সেগুলোও ১৬-পঙ্ক্তির কবিতা, তাদেরও সনেট বলা হয় না। ১৬ পঙ্ক্তিতে আদিকালে ইতালীতে রচিত হয়েছিল ‘প্রলম্বিত সনেট’ (prolonged Sonnet) তার রূপকর্ম দ্বিবিধ, যথা—
ক খ খ ক ঃ ক খ খ ক ঃ ঃ গ ঘ গ ঘ গ ঘ ঃ ঃ ঙ ঙ ॥
ক খ খ ক ঃ ক খ খ ক ঃ ঃ গ ঘ ঙ ঃ ঃ চ চ ॥
এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মৎসম্পাদিত ‘বাঙলা সনেট’ সংকলনের ‘ভূমিকা’ ৪০-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬. শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত *বাঙলা সনেট*; ভূমিকা ২৩ পৃষ্ঠা।

১৭. শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮২ খ্রি.) অনুবাদ—
কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণী-তুল্য-ললিত-লোচনা,
স্তনভারে কিছু অবনত কলেবরা,
শ্রোণীভারে মন্দ গতি তথা যে বিরাজে
বিধাতার আদ্যসৃষ্টি যুবতী-সমাজে।
—(*মেঘদূত*, ৪৩ পৃষ্ঠা)

১৮. ছোটদের কবিতা : ‘চম্পাবরণ কন্যা’।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : রূপে ও রূপকল্পে

কমলেশ চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) আক্ষরিকভাবে না হলেও প্রকৃত অর্থে স্বল্পায়ু লেখক। কারণ তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক জীবনের একটি ফলপ্রসূ অধ্যায়েই মৃত্যু তাঁকে 'চুরি করে' নিয়ে গেল। তাঁর অমূল্য গ্রন্থ *মহাভারতের কথা*-র পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভই হতে পারলো না। 'আমার ছেলেবেলা'-'আমার যৌবন'-এর পর 'আমাদের কবিতাভবন' কবিতাভবনের প্রতীকতরণীটিকে নিয়ে কালসমুদ্রে ডুবে গেল। তবে ডুবে যেতে যেতেও যে শস্যটুকুকে দিয়ে গেল তার জন্য আমরা কবিতাভবনযাত্রীরা নির্মম মহাকালের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর কালগ্রাস থেকে আমাদের ভাগ্যবলে বেঁচে গেল বুদ্ধদেবের 'এক একর সবুজ জমি' (An Acre of Green Grass) তাঁর পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

(T. S. Eliot (1888-1965) যিনি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও মঞ্চসফল কিছু অমর কাব্যনাটকের স্রষ্টা তাঁর কাব্যনাটক (Poetic Drama) বিষয়ে আলোচনার কথা আমাদের মনে পড়বে। প্রসঙ্গত এলিয়টের *Poetry and Drama* (1950) প্রবন্ধটির কথা বলা যায়। মহৎ সাহিত্য সমালোচনা 'নিজেই একটি সৃষ্টিকর্ম' তা এলিয়টের সাহিত্য সমালোচনা পাঠ করলে বোঝা যায়।

কাব্যনাটক রচনায় তাঁর সামান্য সাফল্য কিন্ত— প্রকট ব্যর্থতার স্বীকারোক্তিসহ কাব্যনাটক নামক এক মায়ামৃগীর প্রতি (...It is an unattainable ideal.) একজন কবির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কথা বলেছেন '*Murder in the Cathedral*', `*The Family Reunion*', `*The Cocktail Party*' প্রভৃতির রচয়িতা এলিয়ট।

লক্ষ করা যায় কাব্যনাটকের আলোচনায় এলিয়ট বারবার শেকস্‌পীয়রের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। মহাকবি এবং মহান নাট্যকার শেকস্‌পীয়র প্রথাগতভাবে কোনো কাব্যনাটক লেখেন নি কিন্তু কাব্যনাটকের শ্রেষ্ঠ প্রতিমান তিনি রেখে গেছেন '*Macbeth*', *Hamlet*', '*King Lear*', '*Othello*' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোতে।

লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শুনে ম্যাকবেথ বলে উঠলেন :—

> ``...She should have died here after ;
> there would have been time for such a word.
> Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
> creeps in this petty pace from day to day
> to the last syllable of recorded time.
> And all our yesterdays have lighted fool's
> the way to dusty death..."

এলিয়টের ভাষা উদ্ধার করে বলা যায় ম্যাকবেথের এই খেদোক্তি— "Is great poetry and it is dramatic," তিনি অবশ্য 'হ্যামলেট' নাটকে হোরেশিওর একটি উক্তি উদ্ধার করে মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে ম্যাকবেথে ঐ Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow-ও উদ্ধার করেছেন।

যাই হোক কাব্যনাটক সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল কবিতা তার ঘনীভূত ভাবের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়ে আমাদের যে রসানুভূতি দিতে পারে রচনার গদ্যপ্রকরণে ততোখানি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সে কাব্যপ্রকরণকেও Dramatic হতে হবে—অন্তত কাব্যনাটক বা Poetic Drama-র ক্ষেত্রে হতেই হবে।

এলিয়ট তাঁর যে 'Murder in the Cathedral'-এর কাব্যিক সংলাপকে "...Only a negative merit" বলেছেন তার প্রথম 'Chorus'-টির (ক্যান্টারবেরির মেয়েদের) উক্তির কথাই বলা যায় :—

Here let us stand close by the Cathedral
-Here let us wait,
Are we drawn by danger ? Is it the
knowledge of safety that draws our feet
Towards the Cathedral ? What danger
can be for us, the poor, the poor women
of Canterbury....We are forced to bear witness."

এলিয়ট কাব্যনাটকের এই প্রকরণকে "only a negative merit" বলতে পারেন— হয়তো ওর চেয়ে বেশি আত্মপ্রশংসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আমাদের মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে কাব্যনাটক বা Poetic Drama-র শ্রেষ্ঠ আদর্শ তিনিই রচনা করেছেন। এতো শুধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) ভাষায় *গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন* নয়— এ হল এমন কাব্যভাষার সৃষ্টি যা একাধারে কাব্যিক এবং রুদ্ধশ্বাস নাট্যঘটনা ও নাট্যপরিস্থিতির যোগে নাটকীয়, যেমন আমার এখানে প্রশ্ন করতেই ভুলে যাই— ক্যান্টারবেরির গ্রামের মেয়েরা এমন কবিতায় কথা বলে কেমন করে? বরং ভাবী ও অবশ্যম্ভাবী Arch Bishop Thomas Becket-এর হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে শিহরিত হই— গ্রামের মেয়েদের (কোরাস) 'We are forced to bear witness' উক্তি নির্মম ভবিতব্যের প্রতীক হয়েও দেখা দেয়। পুরাণ, পুরাণপ্রতিম কালকে (১১৭০ খৃঃ) যেন আমাদের হিংসাদীর্ণ সমকালে রূপান্তরিত করে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (চার অঙ্কের নাটক ১৯৬৬) রচনার ক্ষেত্রে 'রূপকল্প' সৃষ্টিতে টি. এস. এলিয়টের ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হল..."রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল নাটকটা... ।" (*কবিতা ও আমার জীবন*, কবিতার শত্রু ও মিত্র, কলিকাতা, এম.সি. সরকার, ১৯৭৪)।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী যে সংলাপে রচিত হয়েছে তার কাব্যগুণ ছাড়াও এলিয়ট কথিত তার ঐ নাটকীয়তার প্রকরণ বা 'রূপকল্পের' কথা বলা যায়।

ক্যান্টারবেরির গ্রামের মেয়েদের কোরাসের সঙ্গে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে প্রথম অঙ্কের শুরুতেই রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ও উদ্যানের সংলগ্ন পথে গাঁয়ের মেয়েদের সমবেত উক্তি, খেদোক্তি ও বৃষ্টিহীন দেশে বৃষ্টির জন্য হাহাকার ও প্রার্থনা তুলনীয় —

"আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য। বৃষ্টি নেই।
...অঙ্গরাজ! বলো করেছি কোন পাপ এ কোন অভিশাপ লাগলো
জননী বসুমতী ভুলো না আমরাও তোমারি গর্ভের পরিণাম।
হে দেব ঐরেশ! মহান মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও— বৃষ্টি দাও।

'বৃষ্টি দাও— বৃষ্টি দাও।' প্রচণ্ড খরার দেশে এই প্রার্থনাই গ্রামের মেয়েদের কণ্ঠে কাব্যভাষা ও কথ্যভাষার যোগে প্রাণ পায়। অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীরা যে কেমন করে ওরকম কবিতায় কথা বলে সে প্রশ্ন করতেও নাটকের পাঠক ও দর্শকেরা ভুলে যায়। নাটকীয় একটি রুদ্ধশ্বাস শীর্ষবিন্দুতে এনে কাব্যনাটকের রচয়িতা সে কথা পাঠক ও দর্শককে ভুলিয়ে দেন। এটিই বোধ হয়, সার্থক কাব্যনাট্যগুলির মঞ্চসফলতারও একটি বড় কারণ।

দীর্ঘকাল যিনি কাব্যরচনায় ব্রতী— সেই এলিয়ট মনে করেন কাব্যনাটক রচনায় তাঁর আগ্রহ জাগে অনেক সময়েই। কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রতধারী ("আমার প্রতিজ্ঞা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত") বুদ্ধদেব কিন্তু তরুণ বয়সের একটি কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন। কাব্যনাটিকাটির নাম 'অনুরাধা'।

তরুণ বয়সেই দক্ষিণ কলকাতার একটি বাসায় 'কবিতা' পত্রিকার জন্মলগ্নে (১৯৩৫) 'অনুরাধা' নামক কাব্যনাটিকা রচনার কথা তিনি বলেছেন। তিনটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটলো। ভূমিষ্ঠ হল বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর প্রথম সন্তান (মীনাক্ষী) ও 'কবিতা' (১৯৩৫) সেই সূত্রে উক্ত *আমার যৌবন* গ্রন্থে বলেছেন '...উল্লেখযোগ্য আর একটি ঘটনাও ঘটলো।" সেটি "অনুরাধা"র রচনা ও এবং ঐ বাসাবাড়ির পারিবারিক 'মঞ্চে' অভিনয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো দু-একজন বন্ধু এবং আত্মীয় ছিলেন কুশীলবদের মধ্যে। বুদ্ধদেবই নায়ক। রানুই (প্রতিভা বসু) সেজেছিলেন নায়িকা। সংলাপে হালকা চালের চেষ্টা ছিল

'অদ্ভুত এ ফিরে আসা।
অনেক দিনের পরে
পাঁচ বছরের পরে
আপনার ঘরে...।
এখানে গন্ধের ডাক
এখানে শব্দের ভোজ
অদ্ভুত, মধুর—
আর যত চেনা মুখ পুরোনো দিনের।'

রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ' কাব্যের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব একটাতে আছে "ছন্দোবদ্ধ ভাষার কথ্যরীতি আর অন্যটায় আছে গদ্যের কাব্যিক ব্যবহার।" হাতে হাতে ঘুরছে এজরা পাউন্ড ও টি. এস. এলিয়ট, মুখে মুখে ঘুরছে সুধীন্দ্রনাথ কথিত ঐ *গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন* যার ফল বুদ্ধদেবের যৌবনের প্রয়াস 'অনুরাধা'। বোঝা যায় কাব্যনাটকের ব্যাপারটা বুদ্ধদেবের মনে ও মননে দীর্ঘকাল ধরেই জাগ্রত ছিলো। পরিণত বয়সে তার সফল রূপায়ণ তিনি ঘটালেন *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), 'প্রথম

পার্থ' (১৯৭০), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০), 'কলকাতার ইলেকট্রা' (১৯৬৮), 'সংক্রান্তি' (১৯৭৩), 'কালসন্ধ্যা' (১৯৯৮), 'ইক্ষাকু সেন্নিন' (১৯৭০), প্রকৃতিতে এর সবগুলিই হয়তো কাব্যনাটক নয়। 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি', 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা' যে অর্থে কাব্যনাট্য— অন্যগুলি হয়তো সে অর্থে নয়। কারণ কাব্যপ্রকরণের পরিবর্তে গদ্যপ্রকরণ— কয়েকটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে উক্ত নাটকগুলির মধ্যে গদ্যের রূপকল্পেই হোক কবিতার রূপকল্পেই হোক বুদ্ধদেব তাঁর নাটকের ভাব ও ভাষাকে সেই উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চেয়েছেন— যেখানে নাটকের ঘটনাসংঘাত এবং চিত্তসংঘাতও থাকবে আর থাকবে দূরবগাহ মানবসত্তার সেই দ্বন্দ্ব যা ধরা যেতে পারে মানবাত্মার ভাষা সঙ্গীতে বা কবিতায় কিম্বা সঙ্গীতের সুরসমৃদ্ধ কাব্যিক সংলাপে যা একই সঙ্গে লোকোত্তর এবং লোকায়তের মিলনে অভিনবভাবে নাটকীয়।

বুদ্ধদেব বসু একটি চিঠিতে (২০.১০.৭৩) আমাকে লিখেছিলেন, "...যৌবনকে সতেজ ও স্থায়ী রাখতে হলে কবিতার মতে টনিক আর নেই। আমার 'অনাম্নী অঙ্গনা' ও 'প্রথম পার্থ' বই দুখানা তুমি পড়েছো কি? ওতে দুটো নাটক আছে— একটা বিদুর জননীকে নিয়ে, অন্যটা কর্ণকে। তোমাকে লিখলাম এই জন্যে যে আমার নাটকগুলির মধ্যে অনাম্নী অঙ্গনাটি আমার বিশেষ প্রিয়, হয়তো তুমিও ওতে আনন্দ পাবে।"

লক্ষণীয় বুদ্ধদেব নিজে কাব্য প্রকরণে রচিত নাটক দুটিকে নাটকই বললেন কাব্য-নাটক বললেন না। কিন্তু আমার মনে হয় প্রথম পার্থ বা কর্ণকে নিয়ে রচিত নাটকটি তো তো বটেই— 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় বা 'বিদুর জননী'কে নিয়ে রচিত নাটকটিতে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী শিল্পসাধনার একটি সার্থক আধার খুঁজে পেয়েছেন। রানী নয়, পুরাণপ্রসিদ্ধ কোনো বীরাঙ্গনা নয়, এক তরুণী কুমারী (অম্বিকার ব্যক্তিগত পরিচারিকা) বা অনাম্নী অঙ্গনার গর্ভেই জন্ম নেবেন পৃথিবীমাতার বহুকাল প্রতীক্ষিত সু-সন্তান বিদুর। কৃষ্ণবর্ণ, কুৎসিতদর্শন ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলন অঙ্গনাকে কৃতার্থ করলো, সার্থক করলো— যার অভিব্যক্তি নাটকের অন্তিম তুঙ্গ মুহূর্তে নামহীনা অঙ্গনার কণ্ঠে এই ভাষা পেলে :—

> '...কোন দূরে উড়ে অদৃশ্য হলে তুমি
> ...মহাবিহঙ্গ সুন্দর!
> উন্মূল তরু মূর্ছায় অবসন্ন
> কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে
> ক্ষুদ্র নতুন পাখি
> মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেল উর্দ্ধে
> ঊষার আলোয় নীলিমায় ...নিঃশব্দে।

কাব্যভাষা এখানে অন্তঃশীলভাবে নাট্যভাষা এবং কাব্যনাটকের ভাষা হয়ে উঠেছে। মহাবিহঙ্গের তীক্ষ্ণ নখরে তরুণতরু অর্থাৎ কুমারীদেহ দীর্ণ হয়েছে— লুণ্ঠিত হয়েছে পুষ্পকোরক কিন্তু সে কুমারী হতে চলেছেন বিদুরজননী। অখ্যাত অজ্ঞাত নামহীনা রাজপুরীর পরিচারিকা নিঃশব্দে নীলিমায় গতি লাভ করেছেন। নামহীনা মর্ত্যনারীর সে গতি আনন্দময়— সে গতি ভাস্বর। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত!

'প্রথম পার্থ' বা কর্ণকে নিয়ে নাটক রচনায় বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন একথা কেউ কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য বোধ হয় তার বিপরীত। তিনি রবীন্দ্রনাথের কর্ণকে পাঠকদের মনে পড়িয়ে

দিয়েছেন— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ অমর নাট্যকবিতাটি তাঁর কাব্যনাটকটির প্রস্থানভূমি (Point of Departure) —যথা মাতা কুন্তীর প্রতি অভিমানাহত রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বীরের সদগতি চান :—

"জয়লোভে যশোলোভে রাজ্য লোভে অয়ি,
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।
(১৫ ফাল্গুন, ১৩০৬)

আর বুদ্ধদেবের 'কর্ণ' চরিত্রকেন্দ্রিক কাব্যনাট্যের কর্ণ চান অস্তিত্বের পরম সঙ্কটে অস্তিত্বেরই জয়ঘোষণা। এ নাটক বিংশ শতব্দীর মহাযুদ্ধোত্তর বীর এবং আত্মসচতেন ব্যক্তিমানুষের অস্মিতাবোধের নাটক। তাই মাতা কুন্তীর স্নেহপূর্ণ আহ্বান ব্যাস-মহাভারতের এবং রবীন্দ্রনাথের কর্ণের মতো উপেক্ষা করেন। ব্যাস-মহাভারতে বা রবীন্দ্রনাথের যার বাষ্পমাত্র নেই সেই দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করেন যদিও বন্ধুত্ব তাঁর কাছে পরম প্রার্থনীয়। বলে ওঠেন

মহত্তম সেই যুদ্ধ যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা যা নিষ্ফল।

এই কাব্যনাটকের অন্তিম পরিণতি আমাদের অসাধারণ কর্ণ কুন্তী কৃষ্ণ কিম্বা দ্রৌপদীর চরিত্রের দ্বন্দ্বময় চৈতন্যের গভীরে শুধু নিয়ে যায় না (...Human soul has its inner drama—Rabindranath), নিয়ে আসে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাক্ষীর কথোপকথনে আমাদের যুদ্ধদীর্ণ এই সমকালে :—

প্রথম বৃদ্ধ "কর্ণ বেছে ছিলেন মহত্ত্ব তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও
তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ কাল সূর্যোদয়ে
—মাতা কুন্তী কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?
দ্বিতীয় বৃদ্ধ— "কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরমলক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি
তাদেরই জন্য মানববংশ আবহমান।"

ব্যাস-মহাভারত থেকে, রবীন্দ্রনাথ রচিত নবপুরাণ থেকে কতদূরে সরে এসেছি আমরা! অথচ এই কাব্যনাটকের ভাষায় চরিত্রে এমনকি অনামা দুই বৃদ্ধের সংলাপে সেই পুরাণ কাব্যের আলোছায়া মাখানো আছে বলে মনে হয়— অথচ সে ভাষা আমাদের যুগের জীবনপ্রেমিক সাধারণ মানুষের বাসনা-কামনায় স্পন্দমান। মহাভারতের মৌষল পর্বের কাহিনী নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা' নাটকটি রচিত হয়েছে। ভূমিকায় বুদ্ধদের মহাভারতের প্রেক্ষাপটটি উদ্ধার করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি যেমন কুরু পাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে— আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।" কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "দেবী আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই উক্ত হলো..."

বুদ্ধদেবের *মহাভারতের কথা* গ্রন্থের পাঠক জানেন গীতার কৃষ্ণের কালাধীশরূপটি বুদ্ধদেব কোথাও কোথাও কৃষ্ণচরিত্রে দেখেছেন— কিন্তু 'কালসন্ধ্যা' নাটকে আমাদের

সময়কেই যেন মহাকালের ধ্বংসশক্তির প্রতীকরূপে দেখতে পাই। কৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে বলেন।

পরস্পর উন্মাদ হননে
যদুবংশ লুপ্ত আজ; বসুদেব শোকে আর বলরাম
যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেছেন।
অভ্রান্ত গান্ধারী।

এ কৃষ্ণ গীতার ভগবান নন। ভবিতব্য ভারাতুর এক নাট্যচরিত্র। আর অর্জুন? আর্ত যাদবরমণীদের রক্ষক ও যাত্রাসঙ্গী হয়ে বলেন

"বহু বৎসরের সঙ্গী বলীয়ান বিশ্বস্ত গাণ্ডীব,
হও তবে প্রস্তুত। উদ্যত হও, কিণাঙ্কিত বাহু।"

কৃষ্ণ বলেন,

'ত্বরা করো। সন্ধ্যা নামে।'
কিম্বা আসন্ন সময়।
কৃষ্ণ যদি হন মহাকালের প্রবক্তা, অর্জুন কালের পুতুল।

গাণ্ডীবের পরাজয় ক্ষোভ মনস্তাপ দেখে ও শুনে ব্যাসদেব অর্জুনকে বিদায় জানিয়ে বলেন :—

"এই সব কুশীলব ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।"

এখানে তাঁর কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই জীবনের উপর শিল্পের জয় ঘোষণা করেছেন কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। মৌষলপর্বের আত্মঘাতী ধ্বংসকাণ্ডকে নিয়ে আসতে পেরেছেন আমাদের আত্মঘাতী রাজনীতির সমকালে :—

"...যে মুহূর্তে সাত্যকি হাঠৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট
অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,
সেইক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হলো
সর্বভুক উৎসাহে রক্তিম...
পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত— অঙ্গে
কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়্গ...।"

কৃষ্ণের নিক্ষিপ্ত 'এরকাতৃণ' বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে পরিণত হল—যাদবদের আত্মঘাতের অনিবার্য অস্ত্র হল— এতো পুরাণকথা— কিন্তু সেই পুরাণের আলো-ছায়ায় বুদ্ধদেব নির্মাণ করলেন আত্মঘাতী যাদবদের তথা আত্মঘাতী তাঁর সমকালীন স্বজাতির, মানবজাতির আত্মহননের কথা। এ ভাষাকে শুধু গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন বললে কম বলা হয়। এ হল নাটকের শিরোনামের যোগ্য 'কালসন্ধ্যা'র ভাষা। সমাজ এবং সমকালচেতন কবির সমাজ-চৈতন্য ধূলিধূসরিত বর্তমান বা সমকাল থেকে কতোখানি ভাবের উর্ধ্বলোকে উন্নীত হতে পারে বুদ্ধদেবের 'কালসন্ধ্যা'র রূপকল্প তারও প্রমাণ।

বুদ্ধদেব বসুর আর একটি স্মরণীয় কাব্যনাটকের নাম 'সংক্রান্তি' (১৯৭০)। সংক্রান্তি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন, সঞ্চার, গমন ও ব্যাপ্তি, বাংলা মাসের শেষদিন— কিন্তু বুদ্ধদেব নাটকের শিরোনাম দিয়েছেন— মানুষের ইতিহাসের ক্রান্তিকাল, কিম্বা সঞ্চারকাল এই অর্থে— যখন "মহৎ বংশ লুপ্ত হয়ে যায়।"

বুদ্ধদেব বসুর পৌরাণিক বিষয়বস্তুসম্পন্ন কাব্যনাটক পাঠ করবার এবং অভিনয় দর্শনেরও আনন্দ এই যে তিনি পুরাণকাহিনীকে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেন এবং সেই কাললিপির উপর তাঁর সমকালের লিপি এমন করে রচনা করেন যে পুরানো অক্ষরগুলিও যেন পড়া যায়— একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া ('কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বিদায় অবিশাপ' প্রভৃতি) এ গুণ অন্য কোনো বাঙালি লেখকের রচনায় বোধ হয় দেখা যায় না।

যেমন মহাভারতের 'শল্যপর্বে' গদাযুদ্ধের উপক্রম অধ্যায়ে যখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে বললেন যে 'যুদ্ধের যে কোনো উপকরণ নিয়ে পাণ্ডবদের একজনের সঙ্গে দুর্যোধনকে যুদ্ধ করতে বলা যুধিষ্ঠিরের অবিবেচনার কাজ হয়েছে। শকুনির সঙ্গে তাঁর দ্যূতক্রীড়া করতে যাওয়ার মতোই এটি 'বিষমকার্য'। তাছাড়া গদাযুদ্ধেও ভীম অধিকতর বলবান ও সহিষ্ণু, কিন্তু দুর্যোধন অধিকতর কৃতী, বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ। ভীম বললেন "আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেয়ে দেড়গুণ ভারী, অতএব তুমি দুঃখ করো না..."

(রাজশেখর বসুর অনুবাদ)।

মনে হয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয়ের দূরদর্শনের ভাষায় এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনের প্রতি বাৎসল্যের ভাষ্যে ব্যাস-মহাভারত মূর্ত হল। *গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনের* কয়েকটি তুঙ্গ নাটকীয় মুহূর্ত আমরা পেলাম। সেই রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে রণনীতির অপলাপে-দুর্যোধনের 'উরুভঙ্গের' দৃশ্যেঃ—

"সঞ্জয় : চারিদিকে দীপ্তি ছড়িয়ে দুর্যোধন—
উল্লম্ফনে উঠে গেলেন শূন্যে,
তাঁর হাতে গদা উত্তোলিত, ভীমসেনের মস্তক লক্ষ্য করে—
এই বুঝি বিদীর্ণ— কিন্তু না— অকস্মাৎ
কুরুপতি আমাকে মৌনের আদেশ দিন।

আর্তচিৎকারে ধৃতরাষ্ট্র : ধমপুত্র তুমিও তবে বিশ্বাসহন্তা!
গান্ধারী "সঞ্জয়, সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"
গান্ধারী ক্রন্দনজড়িত স্বরে— "বাছা ফিরে আয়! ফিরে যায় শিশু হয়ে আমার কোলে— শুধু সদ্যে জাত শিশুরা নিষ্পাপ...।

ধৃতরাষ্ট্র বলেন "শিশুরাও নিষ্পাপ নয় গান্ধারী
মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ
দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই।
বিলাপ করো, পুণ্যবতী! ক্রন্দন ভোলো মাতা।
তোমার অশ্রুজলে বিধাতাকে লজ্জা দাও।"

এ কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিন— সংক্রান্তির দিন— নাকি এ আমাদেরই বিশ শতকের কুসন্তানদের কারণে জনক-জননীর বিলাপগাথা। যার ভাষা তীব্র আবেগময় কাব্যের আবার দ্বন্দ্বময় মানবচৈতন্যের— নাট্যভাষারও এ এক পরম অভিব্যক্তি।

বুদ্ধদেব বসুর নাটকীয় সাসপেন্সধর্মী গদ্যকাব্যের ভাষায় রচিত কাব্যনাটকগুলির কথা বলতে গিয়ে তাঁর গদ্যসংলাপে রচিত কিছু নাটকের কথা মনে পড়ে যায় ভাষাও অন্তঃশীলভাবে কাব্য এবং যার কোনোটিতে সরাসরি পুরাকালের নাট্যকাহিনীর ছায়া

আছে— আবার কোনোটিতে সমকালকে পুরাকালে—এমনকি মৃত্যুলোকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রথমটির উদাহরণ হিসেবে 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা' এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসেবে 'পুনর্মিলন' নাটকটির উল্লেখ করতে পারি। তিন অঙ্কের নাটক 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'র শিরোনামটিই বলে দিচ্ছে নাট্যকার মর্মন্তুদ গ্রিক ট্র্যাজেডির সেই পুরাকালকে সমকালে তাঁর প্রিয় কলকাতার বুকেই স্থানান্তরিত করতে চান।

"এস্কিলসের অরেস্টেইয়ার দ্বিতীয় নাটকে সে (ইলেক্‌ট্রা) উজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হল, তারপর তাকে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠিত করলেন সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস ...।"

পিতা আগামেম্‌ননের হত্যার প্রতিশোধ ভ্রাতা অরেস্টেসকে দিয়ে স্বামীঘাতিনী ব্যভিচারিণী তথা পিতৃঘাতী জননী ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে হত্যা করিয়ে ইলেক্‌ট্রা কিভাবে নিলেন— তার নাট্যরূপ বুদ্ধদেব গ্রিকযুগ থেকে তাঁর সমকালীন কলকাতায় কেবল মঞ্চস্থ করেন নি— "গ্রিকপুরাণের করুণ ভীষণ মোহিনীকে নাট্যভাষাকেও জীবন্ত এবং সমকালীন করেছেন। পরিস্থিতি ও নাটকীয় সংলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার ভাষাকে গদ্য নাটকের পরিবর্তে কাব্যনাটকের ভাষা বলতেই ইচ্ছা যায়— শম্পা (কলকাতার ইলেক্‌ট্রা) স্নেহের ভাই অদ্রিনাথকে (কলকাতার অরেস্টস) বলছে ...আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। —অদ্রি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছুটে বেরিয়ে এলাম, এসে দেখি— কুকুর, মহিষ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে ... আমাকে কী করেছিলো জানিস? ওষুধ গিলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো। ঐ অজেন ডাক্তার (কলকাতার এজিয়েসথাস) ফাঁকি দিয়ে। যখন জেগে উঠলাম, তখন আর কিছু নেই, কিছুই নেই। মানুষটা হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে, লুপ্ত, নিশ্চিহ্ন, চিরকালের মতো ...।" কিন্তু বুদ্ধদেবের নাট্যক্রিয়া ও নাট্যভাষার অভিনব সৃষ্টিতে এতো শুধু চিরকাল নয়, গ্রিক ট্র্যাজেডির কাল নয়, এ হল আমাদের লোভ, হিংসা, ব্যভিচার, প্রতিহিংসা, স্নেহ, বাৎসল্যযুক্ত রক্তাক্ত সমকাল। সেক্ষেত্রে একাধারে নাটকীয় ও কাব্যিক ভাষার উদ্ভাসনে বুদ্ধদেব সফল হয়েছেন। গদ্যে রচিত হলেও যাকে আবেগের স্পন্দমান ভাষায় রচিত কাব্যধর্মী নাটক বলা যায়, এমনকি কাব্যনাটক।

'পুনর্মিলন' নাটকটিও বুদ্ধদেবের খুব প্রিয় ছিলো। ২১.১০.৭০ তারিখের একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন : "কল্যাণীয় কমলেশ, পুনর্মিলনের প্রথম অভিনয় আমি দেখেছিলাম, তাতে অনেকটা ত্রুটি ছিলো। দ্বিতীয়টায় যেতে পারি নি, শুনলাম অনেকটা সংশোধিত হয়েছে। নভেম্বরে আবার অভিনয় হবে— কোনো এক সুযোগে দেখে নিতে পারবে হয়তো ...।"

তিনি তাঁর নাটকের মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে কতোখানি সচেতন ছিলেন সেকথা *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে "প্রযোজনার জন্য পরামর্শ" অংশটি থেকেও জানা যায়।

'পুনর্মিলন' নাটকের প্রথমে আছে প্রযোজনার দীর্ঘ পরামর্শ বা মঞ্চনির্দেশ যথা— "অর্ধালোকিত মঞ্চের উপর পর্দা উঠলো। ... নাটক অগ্রসর হতে হতে মঞ্চের পিছনের অংশ কখনো কখনো অন্ধকার থাকবে।" থাকবে এইজন্যই যে এই নাটকে ইহলোকের মধ্যেই প্রেতলোকের মায়া সঞ্চার করা হয়েছে যেন বৈতরণীর খেয়াঘাটে চরিত্রগুলির (পাত্র-পাত্রী) 'পুনর্মিলন' হলো নীলকণ্ঠ জয় শিবু (শিবেন্দু) মদনলাল আর আছে এক বৃদ্ধ চা-ওলা।

অঙ্ক ও দৃশ্যান্তরবিহীন এই নাটকে নিরবচ্ছিন্ন প্রেতলোককেই ইহলোকে এনেছেন কবি-নাট্যকার। দৃশ্যপরিকল্পনা এবং সংলাপ রচনার গুণে চরিত্রগুলির লোভ হিংসা কাম

বা রিরংসা বোধ জান্তব প্রকৃতি কখনো বা নতজানু স্বীকারোক্তি আমাদের খুব চেনা বলে মনে হয়। এ যেন আক্ষরিক অর্থেই প্রেতলোক প্রত্যাগত নরনারীর পুনর্মিলন যথা— নীলকণ্ঠ—'মৃত— আমরা সবাই মৃত। জয়া— 'না, না! আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো। কেমন শব্দ— ঢিবঢিব, ঢিবঢিব— তোমার জন্য, নীলু তোমার জন্য।" নীলকণ্ঠ (জয়ার বুকে হাত রেখে, গভীর হতাশার সুর) "এখনো! এখনো বুকের শব্দ! মরতে পারার মতো শেষ ক্ষমতাটুকু— তাও কি আমাদের নেই? মদনলাল। "নেই— শেষ নেই— শেষ নেই। ভীষণ।" নীলকণ্ঠ "ভগবান উদ্ধার করো।" গদ্যসংলাপেও কাব্যের স্পন্দন পাওয়া যায়। যে স্পন্দন কাব্যনাটকেরই রূপকল্পে প্রথিত বলে মনে হতে পারে।

'প্রায়শ্চিত্ত' উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর 'Purgatory'-র যে অনুলিখন বুদ্ধদেব করেছেন সেটিও একটি উৎকৃষ্ট কাব্যনাট্য। দুটি চরিত্র— এক বালক এবং এক বৃদ্ধ। কিছুটা ভারতীয় প্রচ্ছদে এই আইরিশ ঐতিহ্যের নাটকের অনুলিখনের কারণ বুদ্ধদেব বলেছেন পাঠক— দর্শকের মনে 'ইয়েটস-এর প্রতিভার রশ্মি অব্যাঘাতে বিদীর্ণ হোক তাই তিনি চান।' কাব্যনাটকের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিমানও তিনি তাঁর এই অনুলিখিত নাটকে তাঁর পাঠক ও দর্শকদের উপহার দিতে চান। যথা বালকের—

"আধেক দোর, আবছা দোর,
দিনরাত্তির এদিক-ওদিক
পাহাড় ভেঙে, গর্তে নেমে, মস্ত ঝোলা কাঁদে
তোমার বাক্যি শোনা ...।"

এই ছন্দোময় 'মিতকথনে' যে নাটিকার শুরু হলে সেখানে সেই মিতকথনের নাট্যকলা আগাগোড়া বজায় রেখেই যে এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে নাট্যকার আমাদের নিয়ে এলেন— বৃদ্ধ বালকের বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিলো "...আমার পিতা— আমার পুত্র— একই লম্বা ছোরাতে! এই অক্কা পেলি— এই— এই— এই—"

...খোকনমণি, সোনার খনি, থামাও এবার কান্না, বাপ তোমার চাঁদ সদাগর, মা রাজার কন্যা...।" বৃদ্ধের শেষ বাক্যটি প্রায়শ্চিত্ত না প্রার্থনা নাকি দুই-ই "...নিবিয়ে দাও জীবিতের যন্ত্রণা আর মৃতের মনস্তাপ।" 'প্রায়শ্চিত্ত' শীর্ষক কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব যেমন আইরিশ ঐতিহ্যের কাব্যনাটককে বাংলায় প্রায় মূলানুগভাবে নিয়ে এসেছেন তেমনি 'ইক্কাকু সেন্নিন' নামক কাব্যনাটককে তিনি জাপানি 'নো' নাট্যশিল্পকে বাংলায় এনেছেন। এটি কোম্পারু মোতোয়াসু'র একটি নো নাটকের অনুলিখন। এই নাটকের ইক্কাকু হলো ইউরোপীয় ঐতিহ্যের ঋষ্যশৃঙ্গ। যাঁর স্তম্ভিত বীর্য স্খলিত হওয়া মাত্র প্রকৃতি আবার প্রজনন-শক্তি ফিরে পায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে (রামায়ণ ও মহাভারত) নারীপুরুষের ভেদজ্ঞানহীন অস্খলিতবীর্য ঋষ্যশৃঙ্গ বৃষ্টিহীন বন্ধা নগরীতে (লোমপাদরাজ্য) পা দেওয়া মাত্র বৃষ্টি হয়।

আর মোহময়ী রমণীর দ্বারা চুরি হয়ে যাওয়া ইক্কাকু একশৃঙ্গ নামক (উক্ত নো নাটকে কথাহীন সেন্দ্রা) নামক রমণীর মোহে মদের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেও দৈত্য-দেবতারই বন্ধ্যা ভূমিতে বৃষ্টি আনার কাজটি সম্পন্ন করেন—"

"...আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝর্ঝর
ঝর্ঝর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন, বন্যার মতো শব্দে
আর এখন তাঁরা আকাশ পেরিয়ে, শব্দের সমুদ্র ছাড়িয়ে
অবশেষে তাঁদের দৈত্যধামে ফিরে যাচ্ছেন।"

অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার টানতে পারি। নাট্যধর্মী কবিতার সঙ্গে কাব্যনাটকের প্রভেদও বোধ হয় আমার বক্তব্যে স্পষ্ট হতে পারে। বস্তুত ও দুটি সাহিত্যপ্রকারণ বা রূপকল্প একদিক থেকে পরস্পরের পরিপূরক।

'মরচে পড়া পেরেকের গান' (১৯৬৬) কাব্যে উক্ত নামের কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আত্মকথা আছে। যেটি নাটকীয় একোক্তি বা Dramatic Monologuc-এর আঙ্গিকে রচিত :—

কিন্তু আমার কাছে রাজপুরী বিস্বাদ, বিস্বাদ আমার পরিণীতা রাজকন্যা,
বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন তিক্তকাম রাত্রি,
তিক্ত আমার মন্ত্রপূত মিলন, উৎপীড়িত আমার বীজস্রোত
যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে। যে দেশে
আমি হর্ষধারা নামিয়েছি,
একা আমি শুকনো ...(১৯৬৫)

এই ঋষ্যশৃঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের 'পতিত' কবিতার নামহীন বারাঙ্গনাকে 'তরঙ্গিণী' নাম দিয়ে বুদ্ধদেব রচনা করলেন তাঁর নাটক তথা কাব্যনাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। তিনি যাকে 'গোয়েন্দাগিরি বা গবেষণা' বলেন সেটি আমি তাঁর এই নাটক নিয়েই একদা করেছি 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার :— তপস্বী ও তরঙ্গিণী ভূমিকা', (মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮০)। এখন যে কথাটি বলতে চাই তা হল এই দুজন অসাধারণ নারীপুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী প্রথমে কাম থেকে প্রেমে ও পরে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। উক্ত 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতার ঋষ্যশৃঙ্গের মতোই ঋষ্যশৃঙ্গ পরিণীতা পত্নী শান্তার বাহুবন্ধেও তরঙ্গিণীকে ভাবেন। সেই ভাবনার আশ্চর্য কাব্যরূপ ও নাট্যরূপের সমীকরণ বুদ্ধদেব ঘটিয়েছেন,

...সেই আবির্ভাব— সেই উষা— সেই উন্মোচন
তার বাহুর হিল্লোল, আর্দ্র উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত,
সূর্যের হৃদয়স্রাবী তমিস্রা তার স্পর্শে
আমার রক্তে আগুন, রোমকূপে বিদ্যুৎ, শ্রবণে উতরোল সমুদ্র।

জীবনের এক উৎপীড়িত রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে ঋষ্যশৃঙ্গের কণ্ঠে কামের বিশ্বরূপের বন্দনাগীতি ধ্বনিত হল যার ক্ষেত্র পুরাণের লোমপাদরাজ্য নয়— আমাদেরই রিরংসাগ্রস্ত সমকাল। আর তরঙ্গিণী বারাঙ্গনা বৃত্তি পরিহার করে দর্পণে সেই তাঁর দ্বিতীয় মুখ দেখেন যে মুখশ্রীর কথা তিনি প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গ নামক এক পুরুষের মুখে শুনেছিলেন "দর্পণে গভীরভাবে তাকিয়ে— এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে? তাপস তুমি কে? কোন স্বর্গের দূত?"

তার আগেই আছে— "তুমি রাজপুরীতে তৃপ্ত? শান্তার পুষ্পশয়নে তৃপ্ত : আমার লজ্জা, আমার গর্ব, আমার যন্ত্রণা! আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত।"

নাটকীয় কবিতা ও কাব্যনাটক অনেকটা হাতধরাধরি করে এসে হাত ছাড়িয়ে ভিন্নপথে চলে যায়। এখানেও তা হয়েছে। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' শুধু ঋষ্যশৃঙ্গের রোদনসঙ্গীত আর তপস্বী ও তরঙ্গিণী আমাদের সমকালের বৃষ্টিহীন-বীর্যহীন-বন্ধ্যা-রিরংসা-পীড়িত সভ্যতার প্রতীক। কাম, প্রেম এবং শেষে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্তিসম্পন্ন সঞ্জীবনী শক্তিরূপেও কথিত হতে পারে। পৌরাণিক কালকে সমকালে রূপান্তরিত করে

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এবং অন্য অনেক কাব্যনাটকেও সেই মন্ত্রসিদ্ধি ঘটিয়েছেন বলা যায়। অন্য একটি কথাও বলা যায়। নাট্যকবিতায় যথা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' বা বুদ্ধদেবের 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এ দুজন নারী-পুরুষের জীবন-নাটক ক্রিয়াশীল রূপ পেতে পারে। কিন্তু কাব্যনাটকে অসাধারণ নারী-পুরুষের সমান্তরালভাবে সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনছন্দও পেতে পারে নাট্যক্রিয়াধর্মী বাস্তবতার ছন্দোময় রূপ। যথা লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দা করে থাকে তারই প্রভাবে একজন অসাধারণ তপস্বী ও একজন অসাধারণ বারাঙ্গনা পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল— কিন্তু তরঙ্গিণীর মা লোলাপাঙ্গী এবং তরঙ্গিণীর প্রেমিক চন্দ্রকেতু আশাহত হয়েও রচনা করলো নবসংসার। সাধারণ মানবজীবন হল কাব্যনাটকের ক্রিয়া-ছন্দে প্রবহমান। যথা

লোলাপাঙ্গী :—"শূন্যঘর, তরঙ্গিণী নেই। আমরা সমদুঃখী চলো। আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবো। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবে।

চন্দ্রকেতু। আমরা দুজনে এখন সমদুঃখী। চলো।

লোলাপাঙ্গী। আমি এখনো বৃদ্ধা হইনি। চলো।

'চলো'— এ যেন সঙ্গীতের ধ্রুবপদ। কাব্যনাটকের ভাব-ভাষা-রূপ এবং রূপকল্পের পরমতম বিন্যাস।

এক ক্রান্তিকাল ও বুদ্ধদেবের চারটি কাব্যনাটক

কুমার রায়

জীবনের প্রায় শেষ পর্বে বুদ্ধদেব বসুর মনস্বিতার ফসলগুলো মহাভারতকেন্দ্রিক। আর এই পর্বেই সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মহাভারতই তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যনাটকের উৎস। 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৯), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০), 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০) এবং 'সংক্রান্তি' (১৯৭৩)— এই চারটি কাব্যনাটক নিয়েই বর্তমান আলোচনা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে— এক অতি আধুনিক মন নিয়েই তিনি মহাভারতচর্চা করেছেন— মহাভারতে আশ্রয় খুঁজেছেন এবং কাব্যনাটকগুলিতে মূলের কোনো বিকৃতি ঘটান নি বরং মহাকাব্যসূত্রকে সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন— আধুনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন। তাঁর নিজস্ব জীবন এবং যে সময়ের মধ্যে তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন— সেই ভাব-পরিমণ্ডলে নতুন করে গড়ে নিচ্ছেন পুরাকাহিনীগুলোকে। ক্ষতবিক্ষত সমকালকে, নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিমানসের আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ কিংবা কর্ণের আত্মপরিচয়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ কোনো আধুনিক মানুষের মনন ও চিন্তা। প্রথম ও শেষ নাটকটি যেন একটা প্রাচীন মহীরুহের পতন-কাহিনী এবং ঘনিয়ে আসা ক্রান্তিকাল, প্রধান চরিত্ররা অসহায়,— যা ঘটবে তাকে রোধ করার ক্ষমতা নেই কারো।

মার্কিন দেশে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে যান তখন সেখানে তাঁর পড়াবার বিষয়ের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ ছিল— 'তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক'। স্বভাবতই রামায়ণ-মহাভারতই নয়— সেই সঙ্গে তাঁকে ইলিয়ড, ওডিসি, ঈনীড-এর গভীরে নিমজ্জিত হতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু এই সময়ে এই সমস্ত মহাকাব্য থেকে রস আহরণ করেছেন এবং আনন্দ পেয়েছেন— তারই চিহ্ন এই নাটকগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা এই নাটকগুলির সঙ্গে মনে রাখতে চাই তাঁর রচিত *মহাভারতের কথা* গ্রন্থটিকে (১৯৭১-৭৪ রচনাকাল), যা তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৭৪) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু ১৮ মার্চ, ১৯৭৪ সালে।

বুদ্ধদেব বসুর অন্য কাব্যনাটকগুলির মধ্যে মহাভারতের কাহিনী থেকে আহরিত উপাখ্যানগুলিই আমি বেছে নিয়েছি আমার এই আলোচনায়। কেন এই নির্বাচন, এর একটা ব্যাখ্যা হয়তো প্রয়োজন হতে পারে— তাঁর রচিত ছখানি কাব্যনাটকের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি ছাড়া অন্য পাঁচটি নাটকের বিষয়বস্তুও পৌরাণিক, অবশ্য 'ইক্ষাকু সেন্নিন' গদ্যছন্দে রচিত হলেও কাব্যনাট্য নিঃসন্দেহে। এতে আছে মহাকাব্যিক মেজাজ। 'প্রায়শ্চিত্ত' কাব্যনাট্যের সংলাপ তো যেন গদ্যছন্দে লেখা। এর গদ্যে এসেছে লৌকিক স্পর্শের উত্তরণ। "—মা কালীর দিব্যি ছোঁড়াটাকে আমরা ফাঁসিকাঠে লটকাবো।'

ইক্ষাকু যেন ঋষ্যশৃঙ্গের জাপানি সংস্করণ— 'নো' নাটকের অনুসরণ। এ কথাও বোধ হয় এই নির্বাচনের সপক্ষের কোনো যুক্তি নয়। আসলে মহাভারত উপাখ্যান

আমাদের রক্তের অন্তর্গত, কিন্তু সবটা উন্মোচিত নয়। তাই বোধহয় নতুন উন্মোচনের জন্য, আমরা প্রতিনিয়ত প্রবল আকর্ষণ । অনুভব করি মহাভারতের প্রতি। তিনি মহাভারতের কাহিনী পুনর্ব্যবহার করলেন সযতনে। পুরাণকাহিনীকে বিকৃত না করে— পুরাণসূত্রকে সম্প্রসারিত করে নিয়ে আমাদের শতক এবং শতকোত্তর অভিজ্ঞতার ভাবনায় জারিত করে দিয়েছেন। তাই মহাভারতের কাহিনীগুলোর নাট্যনির্মাণে আমার গভীর আকর্ষণ।

'কালসন্ধ্যা' নাটকের শুরুতেই বৃদ্ধদের কোরাসে পাই মানবজীবনের সনাতন আবর্তনের প্রতি আস্থা : "মৃত্যু আনে নব জন্ম, বার্দ্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব।" বিশ্বের ক্ষয় বৃদ্ধি এসবেরই পরিবর্তন হয়। সে নাটকে দ্বারকার দুর্লক্ষণ সব প্রকট। মানবজীবনের আবর্তনের প্রতি যেন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু সেখানকার প্রত্যয়— "চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান।" কিন্তু 'প্রথম পার্থ'-তে সাধারণ মানুষের বসবাস যে-পৃথিবীতে— সেখানে যে আবহমান মানববংশ। সার্বিক ধ্বংস তো নয়! তাই বালকের হাতে প্রদীপ অর্থবহ হয়ে ওঠে। টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পিস' উপন্যাসের কথা বুদ্ধদেব বসুই উঠিয়ে এনেছেন তাঁর *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে। সেখানেও "রাশিয়ার বুকের উপর যুদ্ধজনিত হাজার ক্ষত।" তবু সে উপন্যাসে কেন বলেন টলস্টয়— "দ্যাখো— এই স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, অতি সাধারণ, অতি দৈনন্দিন এরা, কখনো বিখ্যাত হবে না বা অন্যের জীবনকে প্রভাবিত করবে না— কিন্তু এরাই আসল, সব যুদ্ধ ও বিপ্লব ও ঐতিহাসিক আলোড়ন পেরিয়ে এরাই টিকে থাকে, নেপোলিয়ান ইত্যাদির 'সঙের নাচন' থেমে যাবার পর এদেরই মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে মানুষ, এরাই সভ্যতার আদি সত্য।" (*মহাভারতের কথা*, পৃ. ১৭৩-৭৪)

কর্ণের মহত্ত্বকে মহাভারত এবং বুদ্ধদেব স্বীকার করে নিয়েও তাঁর 'প্রথম পার্থ' নাটক শেষেও তো দ্বিতীয় বৃদ্ধের মুখে অন্তিম সংলাপ রাখেন,— "আমি বলি, তারাই সাধারণ,/ যাদের চরমলক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি/ তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।" বুদ্ধদেবই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন মহাকাব্যের আরও এক পুরুষকে *মহাভারতের কথা*-য়। অদিসেউস! ইলিয়াডে যুদ্ধ শেষ করে অদিসেউস কাব্যে হোমার যেন তির্যকভাবে গার্হস্থ্যেরই বন্দনা করলেন। আমাদের আধুনিক মন কি তৃপ্ত হল তাতে?

যে চারটি নাটক নিয়ে এই আলোচনা সেখানে 'অনাম্নী অঙ্গনা' আদি পর্বের কাহিনী। অথাৎ প্রথম পর্বের। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তখন সম্ভাবনার মধ্যেও নেই। কিন্তু নাটকের প্রথমেই সাধারণ নারীদের মুখে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়েছে,— "মাঝে-মাঝে এই রাজপুরীর বাতাস/ মনে হয় নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য।" কিংবা সূচনা দৃশ্যেই দেখি সেই সাধারণ মানবীরা বলছে, "ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ— তাঁরা দেবতার প্রিয়।/ ভূমি নয়, বিত্ত নয়, বেদমন্ত্র নয়—/ তাঁদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ— স্বাধীনতা।/ বেশ্যারমণ, পরদারগমন, পরপুরুষের সংস্রব,/ বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান—/ সব শ্লাঘা তাঁদের পক্ষে। কেন না তাঁরা/ তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন বসুন্ধরা ও বৈকুণ্ঠ,/ হরিৎ ও নীলবর্ণ দুই কামধেনুর মতো।/ কেননা তাঁরা প্রবল।/ আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,/ আমরা শুধু দেখে যাবো— মেনে নেবো— কথা বলবো না।"

'মহাভারতের কথা' বইটি লিখবার সময় মুখবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, অথবা— যেহেতু 'সাহিত্য' কথাটা বড় বেশি ব্যাপক— তাই বলা যাক কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজির উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে-সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন), আমি সেগুলিকে 'অবাস্তব' বলে প্রত্যাখ্যান করি নি, বরং সেই সব বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি।" সেই বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই কিন্তু নাট্যকার আমাদের বাস্তব ও আধুনিকতার সন্ধান নিয়েছেন। এসব ইতিহাস যে পৃথিবীতে অনেক অনেক আগে বলা হয়েছে— বর্তমানেও বলা হচ্ছে— এবং ভবিষ্যতেও অন্য কবিরাও বলবেন। তাই মহাভারত মহাকাব্য।

বুদ্ধদেব বসু 'প্রথম পার্থ' রচনা করেছেন মহাভারতের অষ্টম পর্ব অর্থাৎ 'কর্ণ পর্ব' থেকে। অর্জুনের হাতে কর্ণের বিনাশের আগের দিন বেলা শেষে এ নাট্যকাহিনীর আরম্ভ। 'সংক্রান্তি' সৌপ্তিক পর্ব থেকে— দুর্যোধনের দেহ যখন 'সূর্যাস্তের লোহিত বর্ণ আলোর মধ্যে' এলিয়ে পড়ল। যেখানে সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ বিবরণ দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করে বলবে— "দুর্যোধন, তুমি কি জানো না/ ক্ষাত্রধর্ম নিষ্ঠুর, নির্বিকার,/ তাতে দয়ার কোনো স্থান নেই, ন্যায়ের কোনো স্থান নেই,/ কোনো যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়।" আর 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাটকটির ঘটনা আহৃত হয়েছে মহাভারতের 'মুষল পর্ব' থেকে, যখন কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ। কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর। দ্বারকায় দুর্লক্ষণ তখন। "শাখামূল, কাণ্ড নিয়ে যদুবংশ উৎসন্ন, নিঃশেষ"— যখন, "এই দেশ বাসযোগ্য নেই আর।" তবু নাটক শেষে ব্যাসদেব আজ্ঞা দেন, 'পঞ্চভ্রাতা তোমরা বেরিয়ে পড়ো/ পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের।/ জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে— / হয় তো বা আরব্ধ এখনই।/ যাত্রা করো, বিদায়।'

এই ব্যাসদেব সেই বৃত্তের সূচনাও করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মালেন অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ আর অম্বালিকার পুত্র রুগ্ন পাণ্ডু— পুত্রের জনক হতে অক্ষম। এরা এই ব্যাসদেবেরই ঔরসজাত। নিয়োগ প্রথায় তাদের জন্ম। আবারও সেই নিয়োগ প্রথায় সাড়া দেওয়ার আহ্বান মাতা সত্যবতীর— রানী অম্বিকাকে। কিন্তু "ব্যাসদেবের মূর্তি নয় রতির উদ্দীপক", "চক্ষুপ্রীতিরও অনুকূল" নয়— ঈষৎ ভীতিকর তাই অম্বিকা রাজি নয়। তাই সে দাসী অঙ্গনার দ্বারস্থ হয়।

রাজমাতা সত্যবতীর আদেশ অবহেলা করবার সাহস নেই অম্বালিকার— অথচ সেই রাত্রে সে বীভৎস ব্যাসদেবের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারবে না। তাই সে দাসী অঙ্গনাকে রাজি করায়। অম্বার প্রতিবাদটা বোধ হয় এইখানেই। কেন দাসী ব্যবহৃত হবে? দাসী বলেই কি? কিন্তু অম্বালিকার অঙ্ক গরমিল হয়ে যায়। এ নাটকে ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োগ বেশ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকা ব্যাসদেবের শয্যায় সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেয়, নিজের বদলে অঙ্গনাকে, যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যায়। শয্যাসঙ্গিনীও হয় ব্যাসদেবের। তারপর তো তার মুক্তি নিয়ে চলে যাওয়ার কথা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে— অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটিরে। খড়ের চাল, সোনাঝরা রোদ্দুর, তেঁতুল পাতার শিউরে ওঠা ছায়া— তাই তো তার অভিপ্রেত জীবন—সেই নির্বাচিত সুঠাম যুবকটির সঙ্গে। সে তো নাট্যশুরুতে এই গানই গায়। সখীদের সঙ্গে সেই জীবনেরই তো স্বপ্ন দেখাল আমাদের। কিন্তু কী হল সেই রাত্রের মিলনের পর। বাইরে বাতাসের শব্দ, পল্লবের মর্মর তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল— সে আত্মসমর্পণ করেছিল সুখে। সে আর মুক্তি চায় না। তার উচ্চারণে সকল জড়তা কাটিয়ে আমরা শুনতে পেলাম,— যাকে বহন করছি দেহের মধ্যে, আমি তাকে জন্ম

দিতে চাই, লালন করতে চাই এই রাজপুরীতে, হস্তিনপুরে। ব্যাসের পুত্র সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে কেন? এমন অহংকারী উন্মোচন অম্বিকার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। অথচ অঙ্গনা মুক্তি নয়, ফিরে পেতে চায় পূর্বাবস্থা অর্থাৎ দাসীবৃত্তি! কেননা সে শুনতে পেয়েছে সেই ঘোরের মধ্যে যে তার পুত্রই যে ধীমান প্রাজ্ঞ, নম্র, মৃদুভাষী— তার নাম বিদুর কেন না বিদ্যা হবে যে তার স্বভাবসিদ্ধ। আরো-এক সংবাদ— সেই রাতের অতিথি বলে গেছেন যে 'ঘোর যুদ্ধ আসন্ন'। সে যুদ্ধেই তো এক ক্রান্তিকালের সূচনা।

২

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগুলি পড়তে পড়তে একবারও মনে হয়নি যে এগুলো তাঁর এযাবৎ চর্চিত কবিতার আর-এক ধরন। এ-নাটকগুলো নাটক এবং বলতেই হবে নাটকেরই গরিমাময় প্রকরণ। এই সময়ের সকলের সন্নিহিত কোনো জীবন তিনি বেছে নেন নি। বেছে নিয়েছেন মহাভারত-কথিত কয়েকটি জীবন তাঁর রচিত কাব্যনাট্যে। কবিতার জগতের অভিজ্ঞতা থেকে এই রচনাগুলো অনুসৃত হয় নি। অনুসৃত হয়েছে নাট্য-অভিজ্ঞতা থেকেই। প্রতিটি নাটকে শব্দে, ঘটনা সমাবেশে এবং মুদ্রায় ছড়ানো এর কবিতা। এসব গুণ নিয়েই কেবল আলংকারিক প্রকরণ হয়ে ওঠে নি 'কালসন্ধ্যা', 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা' ও 'সংক্রান্তি'— এক ধরনের মুক্তির স্বাদও দেয় আমাদের। নাটকের মধ্যে কবিতার কিছু মালমশলা সংযোগের উদাহরণ আমাদের কিছু নাটকে মাঝে মধ্যে মিলে যায়— কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর অন্বিষ্ট বোধ হয় নাটককেই কবিতা করে তোলা, কক্‌তো যেমন বলেছিলেন।

এই চারটি কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে আহৃত সেকথা আমরা আগেও বলেছি। মহাভারতের কাহিনী তো অনেক দূরবর্তী। তবু এলিয়ট-এর 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রল'-এর দূরবর্তী উপাখ্যান লিখে যেমন মনে হয়েছিল— 'সুচারুশীলিত কয়েকজন মাত্র লোকই শুধু এ নাটক দেখতে আসবে'— এমন কথা বুদ্ধদেব ভাবেন নি। মহাভারতের কাহিনী এতই আমাদের দেশে পরিচিত যে সবাইকে নিয়ে সেই পরিচিত জগতে হাঁটা যায় হয়তো। নিকট পরিচিত জগৎ নয় সেকথা ঠিক— কিন্তু সে কাহিনীর জগতে সবাইকে নিয়ে চলা যায়। কবিতা এবং নাটকের মিলনবিন্দুও খুঁজে নেওয়া যায়। কেন না বুদ্ধদেব বসুর কাছে, "মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান।" (*মহাভারত কথা*, মুখবন্ধ, পৃ. ৮)। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে নাটক এবং নাট্যকাব্য লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য উপস্থিতি মান্য করলেও এবং নৈকট্য অনুভব করলেও বোধ করি অন্য দুই অগ্রজ নাট্যকারের কাজ বুদ্ধদেবকে প্রভাবিত করে নি— যদিও ওঁরা দুজনেই অমিত্রাক্ষরে (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স) তাঁদের সেইসব পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন।

নাটক হিসেবে সেগুলো জোরদার নাটক অবশ্যই— কিন্তু কাব্যনাটক নয় নিশ্চিত। ১৯৬৭ সালে বুদ্ধদেব তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। আটান্ন বছর বয়স তাঁর তখন। তার আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগে, এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রল' তাঁকে কাব্যনাটক এবং তার রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল। এসব নাটক অবশ্যই মহাভারত কাহিনী। এক সময় তো মনে হয়েছিল তিনি নাটকেরই মানুষ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে পর পর প্রকাশিত হচ্ছে— 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬), 'কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ' (১৯৬৮),

'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৯), 'পুনর্মিলন' (১৯৭০), 'অনাম্নী অঙ্গনা' ও 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০), 'সংক্রান্তি : প্রায়শ্চিত্ত/ ইক্কাকু সেন্নিন' (১৯৭৩)। ইয়েটস এবং জাপানি নো-নাটক থেকে যথাক্রমে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'ইক্কাকু সেন্নিন'। ঢাকায় ছাত্রজীবনের শেষে লেখা 'রাবণ' নাটকটির কথাও তিনি জানিয়েছেন। সেটিই সম্ভবত তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। যুবক বুদ্ধদেবের এই নাটকটি নিয়ে অনেক আশা ছিল। 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে অভিনীত হবে এমন কথাও ছিল। আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছিল সে নাটকে। হরণ করে নিয়ে যাওয়া সীতার সামনে রাবণের মনে হয়েছিল অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা কিছু নয়। সীতার হৃদয় জয় করতে চায় সে ভালোবাসা দিয়ে। শেষে সেই রাবণ বলে সে নাটকে, "আশা করবার জয় করবার, যুদ্ধ করবার আর কিছু নেই। এখন আমি ক্লান্ত, আমি একা।" 'সানন্দা' পত্রিকায় সেই সাধারণ রঙ্গালয়ে হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশ ছাপা হয়েছিল ৩ কিস্তিতে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে। সেখানে সীতার প্রতি রাবণের উক্তিটিতে সেই অল্প বয়সের নাট্যকার যে আধুনিক মনকে শাণিত করতে চলেছেন তা বোঝা যায়। সীতাকে বলছেন— "এই অন্তহীন জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখন আমি মুক্তি চাই, মৃত্যু চাই।" (*বুদ্ধদেব বসু*, সুদক্ষিণা ঘোষ, পৃ. ৭৫)

আলোচ্য কাব্যনাট্য চারটিতে নাট্যকার পুরাণের পুনর্ব্যবহার করেছেন, পুরাণ-কাহিনীকে বিকৃত করেন নি। কবি রচনা করছেন এ কাব্যনাটকগুলো সেই কালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জারিত করে নিয়েই। শুধু তাই নয়, সেই সমকাল এবং বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব জীবন-ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নতুন রূপ দিয়েছেন। এই নাটকগুলোর মধ্যে আমরা যেমন মহাভারতের চরিত্রদের কণ্ঠ শুনি তেমনি কবিকণ্ঠও শোনা যায়। এ কাব্যনাটকগুলো তাই রিভাইভাল নয়। কবিতা এবং নাটকের যোগফলও নয়। এর জাত স্বতন্ত্র। মহাভারতের প্রত্যক্ষ স্তর, কবিতার স্তর, যার উৎস অভিজ্ঞতা। আর এই দুই স্তরের জৈবিক সমন্বয়ে তৈরি তৃতীয় ট্রান্সেনডেন্সের স্তর।

মহাভারতের মৌষল পর্ব 'কালসন্ধ্যা'-র কাহিনীকাল। আমরা তো জানি সেই যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী। কিন্তু বৃদ্ধদের সংলাপে, সত্যভামা-সুভদ্রার সংলাপে সমকালকেও দেখি। উঁকি মারেন বুদ্ধদেবও কোনো-না-কোনো সংলাপে। জনতার উগ্রকণ্ঠ কি মহাভারতের কালের— না একালের! মনে রাখতে হবে বৈকি যে এর রচনাকাল ষাট-সত্তরের দশকের অস্থির এই বাংলা। "যত অন্যায় যত অবিচার যত লজ্জা/ চাই প্রতিশোধ। আজ প্রতিশোধ! যত ভূপতি যাবে পাতালে,/ এই পৃথিবী হবে আমাদের।'—এ কার কণ্ঠস্বর! এই নাটকে শুধু দ্বারকাপুরী বা যদুবংশের ধ্বংস নয়— তা অতিক্রম করে "এই কাহিনীর ('কালসন্ধ্যা') ইঙ্গিত আরো বহুদূর প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।" ('কালসন্ধ্যা',—ভূমিকা)। দুটি অঙ্ক এ নাটকে। কিন্তু অঙ্ক আরম্ভের আগে একটি 'পূর্বরঙ্গ' আছে, শেষে 'উত্তর কথন'। 'উত্তর কথন' অংশে ব্যাসদেবের আবির্ভাব। এ যেন সংস্কৃত নাটকের নান্দী-অন্তে সূত্রধার আর অন্তিমে ভরতবাক্য উচ্চারণ— "এই সব কুশীলব— ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,/ একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।" আর পূর্বরঙ্গে দুর্লক্ষণের ইঙ্গিত। প্রথম অঙ্কে সেটা প্রকট হল। সমস্ত দ্বারকা "কুৎসিত উল্লাসে উন্মাদ", দুর্বৃত্তের বলগাহীন দৌরাত্ম্য সর্বত্র। স্বয়ং কৃষ্ণ এর কোনো মীমাংসা করতে ব্যর্থ। কেননা এসবই— "বিধিবদ্ধ, নিশ্চিত অন্তিম মাত্র।" এই নাটকের শুরুতে, অর্থাৎ পূর্বরঙ্গে, আমরা পাই মানুষের জীবনের আবর্তনের প্রতি আস্থা। সেখানে আছে ঋতু পরম্পরায় বিসংবাদী পঞ্চভূতের পরিণয়ের চিত্রকল্প। 'কালের ঘূর্ণন' এবং 'গতির মুক্তি'-র সঙ্গে অন্বিত হয়ে পরিণয় ঘটায়। দ্বারকার দুর্লক্ষণ এই আশঙ্কার জন্ম দেয়, ঋতুচক্রের সনাতন রীতি।

সঠিক ধ্বংসলীলাও নিয়মের অংশ যেহেতু 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব।' বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যনাটকে অশুভকে রূপ দেবার জন্য নানা ধরণের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন : "জায়মান ঝঞ্ঝার অগ্রিম গর্জন", "মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা", "ধিকি ধিকি পিঙ্গল পিণ্ড", 'উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা"। ভয়ার্ত রমণীদের উক্তিতে কীট ও জন্তুর প্রতিকল্প অশুভকেই ঘনীভূত করে : "আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভরে ইঁদুর/ খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।" স্বপ্নে দেখি, "আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে/ বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়।" 'কালসন্ধ্যা' প্রত্যক্ষত অমঙ্গলের নাটক। কিন্তু শুধুই কি অমঙ্গল, নাট্যকারের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় যেখানে তাঁর প্রত্যয় ক্রিয়াবান : 'জেনো, এই ধ্বংস— এও ভালো। এরই সংযোজনে/ ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হলো কালের ঘূর্ণন।" এ নাটকের বিষাদ যেন পরিণত হয়েছে নির্বেদে।

বুদ্ধদেব তাঁর নাটকে ছবি এঁকেছেন কথা দিয়ে, নাট্যভাষাকে তা সমৃদ্ধ করে নিঃসন্দেহে। এ ভাষাগত অলংকরণ নয়— নাটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না— বরং নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে নাট্যগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের কল্পনাকে একটা বৃহৎ জগতের মধ্যে মুক্তি দেয়।

'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকে তিনটি গান গায় অঙ্গনা। তা যেন অঙ্গনার নাটকের মধ্যে বিবর্তনকেই চিহ্নিত করে দেয়। ব্যক্তিগত সুখস্বপ্ন দিয়েই তো তার নাট্যজীবনের শুরু। 'তেঁতুল তলার ছায়া' আর খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা— তার ব্যক্তিগত সুখ ও স্বপ্নের প্রতীক। দ্বিতীয় গানে আছে জন্তু ও নারীজীবনের মধ্যেকার দ্বিধা : "কেন বধূবেশ, কেন চন্দনমাল্য,/ ...যদি হতে হয় জন্তু।/ রাজ্ঞী, দাসীর বিভেদ সেখানে লুপ্ত। ...কে আসে কঠিন, আঁধার আগন্তুক?/ এক মুহূর্ত— না কি তাই চিরকাল?/ না কি সেই হত জন্তুই নবজন্মে/ হবে বিশুদ্ধ নারী?" তৃতীয় গান নাট্যশেষে সংযোজিত— "সে ছিল তরুণ তরু/ রাতের অন্ধকারে/ নিষ্ঠুর বেগে মহাবিহঙ্গ নামলো/ অঙ্গে অঙ্গে হানলো কঠিন চঞ্চু/ তীক্ষ্ণ নখরে দেহ করে দিল দীর্ণ।/ লুণ্ঠিত হলো পুষ্পকোরক,/ সব পল্লব ছিন্ন।" শেষ দুটি লাইন গভীর তাৎপর্যময়— "মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো ঊর্ধ্বে/ উষার আলোয়— নীলিমায়— নিঃশব্দে।" নিষ্ঠুর ও সুন্দর মহাবিহঙ্গের মতো জীবন এসে আছড়ে পড়ে অঙ্গনার উপরে। নাটকটি ধরে রেখেছেন এই তিনটি গানের মধ্যে নাট্যকার। এ এক নতুন শিল্পের জন্ম যার শিল্পী অঙ্গনা নিজে। অম্বিকাকে দেখি এই ক্ষেত্রে গাভী ও বৃষের উল্লেখ করতে। 'আমি রাজকন্যা, রাজবধূ— বিদগ্ধা।/ রুচিরহিত গাভীর মতো/ যে-কোনও বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না।' ব্যাসের সঙ্গে সম্ভাবিত যে মিলনের সে কল্পনা করেছে সেখানে আছে বিতৃষ্ণা। কিন্তু অঙ্গনা— সেই মিলনের অন্য অভিজ্ঞতায় সিক্ত। যদি সেও বলে সে-অভিজ্ঞতা মনোরম নয়, "ঝঞ্ঝাহত ক্ষীণাঙ্গ তরুর মতো/ এখনো আমি কাঁপছি।""অগ্নিকুণ্ডের মতো চক্ষু"-তে আগুনের কথা মনে করিয়ে দিলেও জলের কথাও অনিবার্যভাবেই আসে— সেই মিলনের বিবরণ দিতে, এক নিঃশ্বাসেই সে বলে— "যেন তারার আলোয় পরিত্যক্ত এক স্রোতস্বিনী।" যৌনতা এখানে মিলে যায় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সঙ্গে— "তরুণ হরিৎ বাসন্তিক পল্লবগুচ্ছ"-র কথা সেই তো বলে। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের পর অঙ্গনার মনে হল— "তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দূর থেকে শোনা সমুদ্রের মতো তাঁর স্বর নববর্ষার প্রথম মেঘমন্দ্রের মতো।" এই উপমা কি কেবল অঙ্গনার মনের মধ্যে আলো ফেলা? অঙ্গনার জীবনে কামের আবির্ভাবে যেন সমুদ্র এবং মেঘমন্দ্রের সূত্রে জলের অন্বয় ঘটল। প্রকৃতিতে জল মানুষের মনে কাম মিশে গেল।

এই কাম-অনুভূতি বুদ্ধদেব বসুর নাটকে বারবার এসেছে। 'কালসন্ধ্যা' এবং 'সংক্রান্তি' নাটক দুটি ঘনিষ্ঠ। 'প্রথম পার্থ' নাটক মহাভারত যুদ্ধের সপ্তদশ দিনের কর্ণবধের আগের দিনের ঘটনা আর অষ্টাদশ বা শেষ দিনের দুর্যোধনের মৃত্যু নিয়ে 'সংক্রান্তি' নাটক। 'অনাম্নী অঙ্গনা'— আগেই বলেছি মহাভারতের আদিকাণ্ডের ঘটনা। দাসীপুত্র বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু সেই খাণ্ডবদাহনের কথা বলতে গিয়ে *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে 'আগুন-জলের' গল্পে শুনিয়েছিলেন, 'খাণ্ডবদাহন শুধু সামরিক বা রাজনৈতিক কীর্তি নয়, এর স্তরে স্তরে আরো অনেক অর্থ লুকিয়ে আছে, একটি বৈশ্বিক পটভূমির উপর এর প্রতিষ্ঠা।' আরো বলেছেন— 'আগুন ও জলের এই বৈরিতার মধ্যে একটি মৌলিক 'মৈত্রীও' দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতে। খাণ্ডবদাহনের বরুণ-অগ্নির ঘটনাটিকেই একটি সূত্রের আকারে বাঁধা হয়েছে— "নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্যে আগুন— এদের সহকর্মিতার ফলে জন্ম নেয় প্রাণীরা, সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।" 'অনাম্নী অঙ্গনা'-য় আমরা সেটা দেখেছি। 'কালসন্ধ্যা'-র ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে সে ইঙ্গিতের কথাও এর আগে আলোচিত হয়েছে। এই নাটকের একেবারে শেষে 'উত্তর কথন'-এ আমরা দেখি ব্যাসদেবের উক্তি— "খাণ্ডবদাহনকালে অগ্নি ও অর্ণব/ স্বভাববৈরিতা ভুলে সমবায়ী/" কিংবা একথাও বললেন, "অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,/ সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।/ শেখো :/ কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,/ যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,/ আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,/ আনে, যাকে লোকে ভাবে, যুগান্তর,/ কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য ঘাতকের স্থান বিনিময়।" 'সংক্রান্তি' নাটকে যখন অষ্টাদশ দিনে শল্যবধের পর হতোদ্যম কৌরবসেনা—একমাত্র দুর্যোধন উদ্দীপ্ত করতে চলেছেন কৌরব সেনাদের। ইতস্তত ঘূর্ণ্যমান সব নেতা— তখন সঞ্জয় বলে বিরতিহীন অস্ত্রপাত দেখে— "দেন ভাদ্রের শেষ বর্ষণধারা/ প্রতি মুহূর্তে প্রবলতর, বর্ধিতবেগ,/ বিদ্যুতে ও বজ্রপাতে ভয়ংকর,/ যেন একই সঙ্গে দাবানল আর বন্যা। ঐ জ্বলে উঠল আগুন/ অর্জুনে গাণ্ডীব থেকে, লক্ষ শিখায় লেলিহান/"; আবারও দেখি বর্ণনা— "সিন্ধুর তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বাস,/ ধূলোর মেঘে সূর্যালোক নিস্প্রভ,/ সংঘর্ষে অগ্নিকণা ওড়ে বাতাসে—/" এখানে আগুন আর জল সংঘর্ষেরই প্রতীক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত ধ্বংসলীলার মধ্যে নাট্যকার ভোলেন নি আগুন-জলের গল্প। বরং একে নাটকগুলির অপরিহার্য অঙ্গ মনে হয়। মানুষের ইতিহাসে বারেবারেই ক্রান্তি কাল আসে। 'সংক্রান্তি' নাটকে যুদ্ধ সামনাসামনি দেখানো হয় নি— কিন্তু নেপথ্যে ঘটা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সঞ্জয়ের বর্ণনায়, (গীতায় যেমন হয়েছিল)। বর্ণনার প্রাণময়তায় ও ধৃতরাষ্ট্র এবং পরে গান্ধারীর নাটকীয় প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধ হয়ে ওঠে সচল চিত্র। 'প্রথম পার্থ' নাটকে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ নয়, সেদিন। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জীবন্ত-সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে। সেখানে কর্ণ নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা তাকে জীবন ও চেতনার দ্বন্দ্বে দীর্ণ এক জটিল ও একাকী মানুষে পরিণত করে। আবার যখন সে বলে যে সে চায় না "উদ্ভিদের মতো জীবন,/ আমার সার্থকতা চেষ্টায়-সংগ্রামে।" উদ্ভিদের মতো জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে কি কর্ণ 'আগুন ও জল'কে অস্বীকার করলেন? জীবনকেই প্রত্যাখ্যান করে কর্ণ নিঃসঙ্গ। কর্ণ অস্বীকার করলেও তার জন্ম যে কুন্তির জঠরের জলে আর সূর্যের অগ্নিকণায় সেটা অস্বীকার করবে কেমন করে— যখন স্বয়ং কুন্তী এসে জানিয়ে দেন তার জন্মবৃত্তান্ত। কর্ণ তো নিজেই বলে সেই জন্মবৃত্তান্ত শুনে— "কিন্তু কে নয়,/ কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে স-প্রাণ/ তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ যারা পরস্পরকে আহার করে/ বংশপরম্পরায় বেঁচে থাকে,

জন্মজন্মান্তর ঘূর্ণিত হয়—/ সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।" তারপরেই তো বলে কর্ণ এ নাটকে— "একি সম্ভব যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে/ কখনো সহ্য করতে পেরেছিলেন কোনো মানবী—/ এমনি দীপ্তিময়ী কুন্তী?" তারপরেই সে আবার বলে— "মা তুমি—/ যাঁর গর্ভে আমার প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম,/ সেই তুমি—/" আগুন আর জলকেই তো মেনে নেওয়া এক অর্থে। এ-সবের পরেও যখন কর্ণ বলে— "আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তা ছাড়া আর কেউ নয়/" তখন মনে আসে *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন (পৃ. ৬৮-৬৯), "আমাদের চিন্তা স্বভাবত অস্পষ্ট, আমাদের ভাষা স্বভাবত বিশৃঙ্খল। আমাদের আবেগ স্বভাবত অপরিচ্ছন্ন, এবং এই প্রাকৃত ব্যবস্থা অথবা অব্যবস্থাতেই থাকে বলে কাজ চলে যায়, সর্বসাধারণ এই নিয়েই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কবি চান আত্মোপলব্ধি; তাই তাঁর জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।" কর্ণের জীবনকে কি বুদ্ধদেব এই অস্থির জীবনের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন? বোধ করি তাই-ই। যুদ্ধের মধ্যেই কর্ণের জীবন চিত্রিত হয়। সে তো মনে করেছিল তার জীবন "মেঘাচ্ছন্ন ঊষার মতো ধূসর এক স্বপ্ন"কে সম্পূর্ণ করা তার লক্ষ্য। দ্রৌপদীকে তো সে এ নাটকেই বলে, "তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,/ কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু বলে ভাবি না—/ আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।" সে কবিমনের অধিকারীও— নতুবা কেন বলবে এ সংলাপ, "এখনো/ একটি রাত্রি আছে আমার। অন্ধকার, নক্ষত্রময়,/ উজ্জ্বল, বিশাল এক রাত্রি।/ যদি কিছু ভাবতে চাই তা ভাবার জন্য,/ ...শুনতে চাই মনে-মনে কোনো কণ্ঠস্বর, বলতে চাই কিছু কথা কোনো স্মৃতিকে—/ তার জন্য এখনো একটি রাত্রি পড়ে আছে।" এই আত্মোপলব্ধির জন্যই কি সংগ্রাম! কিন্তু সেই কর্ণই তো আবার বলে— "হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম—/ অন্য কোথাও— যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে।" তবু অন্য দুটি নাটক 'কালসন্ধ্যা' এবং 'সংক্রান্তি'-তে মনুষ্যচরিত্ররা অসহায় দর্শক— অনিবার্য যা তাকে রোধ করার ক্ষমতা নেই কারো। আছে হাহাকার, উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব—আর এই দুই নাটকের মধ্যে নাট্যকারের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত সমকাল-দর্শনকে খুঁজে পাওয়া যাবে অব্যর্থভাবে। মহাকাল হরণ করছেন বুদ্ধি, রোপণ করছেন উন্মাদনা। কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে এ দুইয়ের মাঝখানে 'অনাম্নী অঙ্গনা' এবং 'প্রথম পার্থ' তাও অনুধাবন করি। আগেই বলেছি এই দুটি নাটক আত্মপরিচয় খুঁজে নেবার নাটক।

চারটি নাটকেই 'পুরাণের পুনর্জন্ম' ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব। লক্ষ করব বুদ্ধদেবের বিভিন্ন নাটকে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে চিত্ররচনার মুন্সিয়ানা। উপমাকে তিনি ভাষার অলংকার মনে করেন নি— তা ভাব প্রকাশেরই অপরিহার্য অঙ্গ। আর তার চলা গতিময়। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিমা চলতে থাকে, বাড়তে থাকে অর্থ ও ইঙ্গিত। একটির আলোয় অকস্মাৎ দীপ্ত হয়ে ওঠে অন্যটি— এমন কথাই কি বলেন নি— 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' নিবন্ধে শঙ্খ ঘোষ?

আমরা কি এই নাটকগুলি পড়তে পড়তে বা কখনো অভিনয়ের কথা ভাবতে গিয়ে কাব্যনাটকের ছন্দ সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন হয়ে উঠি? বোধ হয় নয়। আমরা ছন্দ-স্পন্দের দ্বারা বাহিত হই বোধ হয়, কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্নতর। গদ্যেরই প্রতিভাস খুঁজে নিলে প্রবহমানতা কি ধরা পড়ে না? পয়ার লেখা সম্ভব ছিল না আধুনিক কাব্যনাট্যকারদের। আমি জানি না বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যনাট্যে পদ্যকে গদ্যের ভঙ্গি দিতে চেয়েছিলেন কি না— কিংবা একেবারেই কথ্যভঙ্গি? কিন্তু তবুও দেখি তাঁর নাট্যকবিতার ভাষা তর্ক করতে সমর্থ, যুক্তি বিস্তারে পারদর্শী। বক্তব্যও হয়ে ওঠে অমোঘ ও স্পষ্ট। 'কালসন্ধ্যা' নাটক তো যুক্তি-পালটা যুক্তি, স্বস্তি-অস্বস্তি-হিংসা-দ্বেষ,

পাপের পসরা সাজানো সবই এসেছে নাট্যকবিতার বিভিন্ন ছন্দস্পন্দে। ভাবের এত বৈচিত্র্য অবশ্য অন্য নাটকগুলিতে নেই— কিন্তু 'কালসন্ধ্যা'-য় আছে। তাই কবিতার চালে এক ভিন্নতা। সে কি কথোপকথনের ভিন্ন চালকে ধরবার জন্যেই? গদ্যে নাটক লিখলে বোধহয় এমনটি হত না। অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির বিষয়ের জন্যই বেছে নিয়েছেন কবিতার এই ছন্দ। পদ্যের মধ্যে গদ্যের ধর্ম নিয়ে আসাটা তো চলছে প্রায় শতাধিক বছর ধরে। সেটাকে মুক্তির প্রয়াস বলেও মেনে নেওয়া হয়েছে। আর এই প্রয়াস সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে কাব্যনাটকে। ছন্দের মধ্যে থেকেও ছন্দের মধ্যে বন্দি থাকছেন না। 'প্রথম পার্থ' নাটকের এই সংলাপ : "থাক কর্ণ। অতীত আর আলোচ্য নয় এখন,/ কেন না সব তর্কের মীমাংসা হবে/ যুদ্ধে। তবু তোমার কাছে একটি জিজ্ঞাসা আমার।/ ঐ যাকে অবিচার বললে তুমি,/ তার দৃষ্টান্ত/ শুধু কি আমার স্বয়ংবর সভা?" কিংবা 'কালসন্ধ্যা' নাটকের সংলাপ। পূর্বরঙ্গ পর্বে প্রথম বৃদ্ধ, দ্বিতীয় বৃদ্ধের প্রস্তাবনায় অন্ত্যমিল রেখেই আঠারোমাত্রায় সংলাপ : "আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তমান,/ মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব; কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,/ কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে উঠে আরেক শ্মশান।" আবার রাজপথে একদল সুরা-বিহ্বল অভিজাত পুরুষের যে উক্তি পাঁচমাত্রায় ঘেঁষে যেন ছন্দেরই বেলেল্লাপনা— 'খেলা চলছে/ পা টলছে/ গা দুলছে/ ঠোঁট খুলছে/ চোখ জ্বলছে/ মদ লাস্যে।' বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন ছন্দের সংলাপ। এখানে অবশ্য চরিত্রদের এবং শ্রোতাদেরও কিছুটা ছন্দ সচেতন হতে হচ্ছে বৈকি! বাস্তব জীবনের মানুষের কথাবার্তা অতি নিরূপিত ছন্দ মেনে চলে না ঠিকই— কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রোতার মনে এই ছন্দের একটা প্রভাব পড়বেই আর সেটাই এক্ষেত্রে কাম্য 'কালসন্ধ্যা'-র সেই উচ্ছন্নে যাওয়া সমাজটার এই ছন্দে কথা বলাটা যেন এ্যানিমেটেড ছবির চালচলনের ছন্দে ফুটে ওঠে। অন্তত কোনো নাট্যনির্দেশক এমন ভাবতেই পারেন আর সেই অনুযায়ী নাচের কোনো ছন্দে একে বাঁধতে পারেন, সংলাপের ছন্দটাকে ধরে। কিছু পরেই অবশ্য কৃষ্ণ, সুভদ্রা, সত্যভামার সঙ্গে কথোপকথনে ছন্দ যায় পালটে। এখানে শ্রোতারা ছন্দ সম্পর্কে সজাগ না হলেও তার উপলব্ধিতে চলে আসে ছন্দ। 'কখনো বা মনে হয়। কোনো-এক অতীত/ কোনো-এক সংশয়ে ব্যাকুল,/ তুমি, পার্থ, কিন্তু প্রশ্ন করেছিলে আমাকে, হঠাৎ/ কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে গিয়ে, ঘটনার ঘূর্ণন থামিয়ে।/ আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম। কিন্তু—/ আমি যা বলেছিলাম, তুমি তা বোঝ নি।/ আমি যা বলেছিলাম, আমিও বুঝি নি।" কৃষ্ণের এই সংলাপে বিমূঢ় অর্জুন। এও তো বুকের ভাষাকেই মুখে তুলে নেওয়া। তাকে কি ছন্দের জন্য আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়? হয় না তো। এসব সময়ে ছন্দ শুধু অন্তর্নিহিত নাও থাকতে পারে— মাত্রানিয়ন্ত্রিতও হতে পারে। বুদ্ধদেবের কাব্যনাটিকাগুলোতে সেই পরীক্ষাই আমরা দেখতে পাব।

বুদ্ধদেব বোধহয় তাঁর কাব্যনাট্যে নিজস্ব কণ্ঠকে লুপ্ত করে দেন নি একেবারে। সে কণ্ঠ যেমন আমরা শুনতে পাই চরিত্রদের মধ্যে তেমনি কথক, বৃদ্ধ প্রমুখদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এই নাটকে এতরকম বিপরীত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। মহাভারতও যে তাই-ই।

'কালসন্ধ্যা' নাটকে যা ঘটবে, যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে। এর ব্যাখ্যা নাট্য-শেষে ব্যাসদেব শুনিয়েছেন আমাদের— 'কাল সেই গর্ভ বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,/ যা ঘটায় নিরন্তর, আবর্তনে, জন্ম বৃদ্ধি অবক্ষয় অবলুপ্ত/ আনে, কীর্তি এবং কীর্তির ধ্বংস/ যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর।' 'কালসন্ধ্যা'-র অন্যতম বিষয় হল 'বধ্যঘাতকের স্থান বিনিময়'।

নাটকগুলিতে মহাকাব্যিক পরিবেশ সযত্নে রচিত হয়েছে। আছে সেই বিশালতাও। এই 'ধূসর কাহিনী'-তে আছে আজকের এবং সেদিনের বিশ্বের কথাও। বুদ্ধদেব বসু কবি। তিনি নাট্যকারও। অন্তত নাটকে তাঁর আকৈশোর আকর্ষণের কথাটাও আমাদের জানা। শেষ জীবনেও তিনি নাট্যচর্চায় মন দিতে চেয়েছিলেন— সে কথাও আমাদের জানা হয়েছে। তাই নাটক ও কবিতার দরকারি শর্ত তাঁর জানা। কাব্যনাট্য এক দুরূহ নাট্যকর্ম। এখানে জীবনের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়— নাটক চলতে চলতে। 'জীবন চিন্তার সাময়িকতা ও কবি কল্পনার চিরন্তনতা' যুক্ত হয়েছে তাঁর নাটকে। বুদ্ধদেব তাঁর নাট্যকার সত্তাকে এই কাব্য-নাট্যগুলোর মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। যুদ্ধের বীজ গেঁথে দিয়েছেন তিনি 'অনাম্নী অঙ্গনা'-তে যখন যুদ্ধ অনেক দূরের। তারপর 'প্রথম পার্থ' ও 'সংক্রান্তি'-তে সেই যুদ্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর 'কালসন্ধ্যা'-য় যুদ্ধশেষে কৃষ্ণ এক ব্যাধের শরে নিহত। অর্জুন বুঝতে পারে কালসন্ধ্যা এসে গেছে— তিনি স্বনামের অযোগ্য।

মহাকালের মাহাত্ম্য কীর্তিত হল চারটি নাটকে— যে মহাকাল আনে মানুষের ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। তীব্র আবেগ প্রকাশে যা নিবিড় হয়। এখানে সেটা হয়েছে। বিশ্বজনীন একটা অধিবাস্তব স্তরে— মহাভারতকে আশ্রয় করেই উত্তীর্ণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকে। মহাভারতের স্বর যেমন বাঁধা পড়েছে— তেমনি কাহিনী ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন আধুনিক বিশ্বের কথাতে ও বোধের কাছেও। আমরা তো জেনেছি কাব্য ও নাট্যের মিলিত শিল্পরূপ কাব্যনাটক। তাই এখানে দেখি রূপকল্প ও ক্রিয়াকর্ম একাকার হয়ে গেছে। কবিতা ও কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে বেড়ে গেছে নাট্যশিল্পের শক্তি।

বুদ্ধদেব বসুকে এই চারটি কাব্যনাটকের নাট্যকার হিসেবে দেখি যে সবচেয়ে আকর্ষণী চরিত্রগুলিকে বেছে নিয়ে তাদের প্রবল বৈপরীত্যে স্থাপন করেছেন গোটা ব্যাপরটার নাট্যরূপ দেওয়ায়। আকর্ষণীয় ছিল না অঙ্গনা, —তিনি তাকে আবিষ্কার করে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন আমাদের কাছে। অম্বালিকা চরিত্রের প্রবল বৈপরীত্যে ধরিয়ে দিয়েছেন। 'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণ আকর্ষণীয় চরিত্র। —বিপরীতে কুন্তী, দ্রৌপদী, কৃষ্ণকে স্থাপন করে সে আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'সংক্রান্তি' নাটকে অনুপস্থিত দুর্যোধন নাটকে আকর্ষণযোগ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী চরিত্রের উপস্থাপনায় তীব্র নাটক তৈরি হয়ে যায়। সমগ্র দ্বারকাকেই আকর্ষণীয় চরিত্র করে তুলে বিপরীতে কৃষ্ণ-অর্জুন এবং সত্যভামা-সুভদ্রাকে স্থাপন করায় 'কালসন্ধ্যা' নাটক চূড়ান্ত নাট্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের মধ্যে রচিত-কাব্যনাটক পরিণাম অর্জন করে। সংলাপের পঙ্‌ক্তিমালা, অন্তর্নিহিত ভাব ও দর্শকমণ্ডলীর চেতনা— এই তিন স্তরে যুগপৎ কাজ কি সম্ভব নয় কাব্যনাটকগুলির সার্থক প্রয়োগক্ষেত্রে। নাট্যকর্মে বাস্তবের যে বিন্যাস ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় (যা বুদ্ধদেব বসুর নাটকে দেখতে পাওয়া গেছে) তাকে প্রযোজনার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন কি অসম্ভব? বোধ হয় না, অন্তত দুটি চেষ্টা তো আমরা দেখছি। বুদ্ধদেব বসু তো 'স্বভাবানুগ' নাট্যরীতি ছাড়িয়ে সন্ধান করে গেছেন নব-নবীন নাট্যরূপের। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন 'অভিব্যক্তিবাদী' নাট্যকলা থেকে— আকর্ষণ অনুভব করেছেন পুরাকাহিনী বা মিথের।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু

জগন্নাথ ঘোষ

তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমি কবি বুদ্ধদেবের নাকতলাস্থিত 'কবিতাভবন' -এ গিয়ে তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যে থাকার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সুযোগে তাঁকে আমি বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নের কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কিনা!

বুদ্ধদেব দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন, সেইরকম পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি। তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করে এসেছেন— মাইকেল বাংলা ভাষার 'মর্মে প্রবেশ করেন নি।' মাইকেল সম্পর্কে বুদ্ধদেব তাঁর উল্লিখিত বিশ্বাসের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন তাঁর ৩৮ বছর বয়সে লেখা একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে। তার নাম 'মাইকেল'। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে লেখা এই প্রবন্ধটির নামকরণের দিকে তাকালে বোঝা যায়, 'মাইকেল' শব্দটির ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বুদ্ধদেব বোঝাতে চেয়েছেন, মধুসূদন বিজাতীয় অনুষঙ্গের প্রতি অধিকতর মনোযোগী। এই বিজাতীয়তাকে মধুসূদন, বুদ্ধদেবের কথায়, বাংলা ভাষার মর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মেলাতে পারেন নি।

বুদ্ধদেবের মন্তব্যের সারবত্তা নির্ণয়ের পূর্বে জেনে নেওয়া যাক, বাংলা ভাষার সেবায় মাইকেল কতখানি আন্তরিক ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় নাটক লেখার কথা যখন মাইকেল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে পেশ করেছিলেন, তখন গৌরদাস অবাক বিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর বিস্ময় প্রকাশের যথার্থ কারণ ছিল। যে মাইকেল তাঁর ছাত্রজীবনের দিন থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আন্তরিকতা দেখিয়ে এসেছেন, তিনি কেমন করে বিনা অনুশীলনে বাংলা ভাষায় নাটক লিখবেন, এই চিন্তা গৌরদাসকে উদ্বিগ্ন করেছিল। তাঁর উদ্বেগের অবসান ঘটল যখন মধুসূদন পরপর দুখানি নাটক লিখলেন বাংলা ভাষায়। তাদের নাম 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী'। দুখানিই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'শর্মিষ্ঠা'র কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত। আর 'পদ্মাবতী'র কাহিনী গ্রীক পুরাণ থেকে। এই দুখানি নাটকের কাহিনী পৌরাণিক হলেও মধুসূদন পৌরাণিক নাটক লেখেন নি কিন্তু। এই দুখানিতে নাট্যকার রোমান্টিক প্রেমের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের চিরন্তনতাকে প্রকাশ করেছেন এমন বাংলায়, যে বাংলার প্রকৃতি সাধু ঘেঁষা তৎসম শব্দবহুল হলেও প্রেমের ভাষার চপল ব্যঞ্জনায় উচ্ছল। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় সাফল্য দেখে বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তাদের অনুরোধ-ক্রমে মধুসূদন লিখলেন দুখানি প্রহসন। তাদের নাম *একেই কি বলে সভ্যতা?* ও *সালিকের ঘাড়ে রোঁ*। প্রথমটির বিষয় ছিল ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপান, ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং সেইসঙ্গে বারবনিতা-বিলাসের লজ্জাহীন বেআব্রুতা প্রদর্শন। অথচ এই বেআব্রুতা ঢেকে রাখার জন্য তারা একটি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা গঠন করেছিলেন একটি সাহিত্য সভা। তার নাম

দেওয়া হয়েছিল 'জ্ঞানতরঙ্গিনি সভা'। এই সভার ঘোষিত উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, বাংলা ভাষার অনুশীলন, নারীমুক্তি ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় চিন্তাই হবে জ্ঞানতরঙ্গিনি সভার প্রধান কার্যক্রম। অথচ এই সভার যাবতীয় বিবরণ ও ভাষণ চলত ইংরেজিতে। নারী স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেও, এর সদস্যবৃন্দ তাদের স্ত্রীদের প্রতি ছিল প্রেমহীন এবং দায়হীন। ইংরেজি কেতা অনুসারে তারা রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর সামনেই পিতৃগৃহে অবস্থানরত স্বামীপরিত্যক্ত সহোদরাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মুখচুম্বনে ছিল সংকোচহীন। প্রথমোক্ত এই প্রহসনের নায়ক নবকুমারের বেয়াদবির পরিচয় পেয়ে তারা আদৌ সভ্য কিনা, সেই প্রশ্ন তুলেছিল তার বিবাহিতা স্ত্রী। তার প্রশ্নের ভিতরই লুকিয়ে ছিল তার অভিলষিত উত্তর।

দ্বিতীয় প্রহসনের বিষয় রূপে মধুসূদন বেছে নিয়েছিলেন গ্রাম্য বয়স্ক জমিদারের গরিব রায়তকে শোষণের পাশাপাশি সেই রায়তের সুন্দরী স্ত্রীকে ধর্ষণের দৃশ্য উদ্‌ঘাটন। লম্পট কপট জমিদারকে এঁকে মধুসূদন বোঝাতে চেয়েছেন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা কেমন ভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে গ্রামীণ মোড়লের হাতে।

উক্ত দুই প্রহসনের সংলাপের ভাষায় মধুসূদন আশ্চর্য কৌশলে প্রয়োগ করেছেন মৌখিক বাংলা ভাষার লব্জ। যে মধুসূদন ইংরেজি কেতার দুরস্ত, ব্যবহারে ও আচরণে সাহেব, সেই মধুসূদন কেমন করে মৌখিক বাংলার প্রকৃতি আয়ত্ত করেন এই চিন্তা বিস্ময় জাগায় বৈকি!

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের গোড়াতে বিলাতে যাবার আগে মধুসূদন লিখে গেছেন আরো একটি নাটক। তার নাম 'কৃষ্ণকুমারী'। সেই সঙ্গে চারখানি কাব্য। *তিলোত্তমা সম্ভব*, *ব্রজাঙ্গনা*, *মেঘনাদবধ কাব্য* ও *বীরাঙ্গনা কাব্য*। বিলাতে যাবার আগে তাই মধুসূদন তাঁর 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় বঙ্গমাতার প্রতি করুণ আবেদনে জানিয়েছিলেন 'মধুহীন কোরো নাকো তব মনঃ কোকনদে।' এই আবেদনে ধরা পড়ে— মধুসূদন জানাতে চেয়েছেন, তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল অভিধায় ভূষিত হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে মধুই।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জুনে মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় লিখেছিলেন "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখো শ্রীমধুসূদন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মধুসূদন তাঁর যাবতীয় বিজাতীয়তা নিয়েও ছিলেন জাতীয় কবি। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* তাঁর কবিপ্রতিভার প্রতিনিধিস্বরূপ। অথচ এই জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় ভরা কাব্যগ্রন্থের নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছিলেন ২১ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য শীর্ষক সমালোচনামূলক প্রবন্ধে খোলাখুলিই জানিয়েছিলেন, মেঘনাদবধ কাব্য 'মহাকাব্যই নয়।' রবীন্দ্রনাথ একথাও ওই প্রবন্ধে লিখেছেন, "তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যতপ্রকার পরিশ্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন।"

এমন কঠোর মন্তব্য করেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৪৬ বৎসর বয়সে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) লেখা 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন "মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।"

এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পাঠককে অবহিত করেছেন। পয়ারের বেড়ি এবং রাম ও রাবণ সম্পর্কে চিরদিনের বাঁধাবাঁধি ভাবের শাসন ভাঙাই হল। সেই বিদ্রোহ। *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হয়ে উঠেছে। রাম ও লক্ষ্মণ ধর্মভীরু। তাঁদের ত্যাগ দৈন্য ও আত্মত্যাগ মধুসূদনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার প্রকাশ দেখে আনন্দবোধ করেছেন।

রাবণ তার প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য করায়ত্ত করেছে। দেবতাদের পরাভূত করে রাবণ তাঁদের দাসত্বে নিযুক্ত করেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন প্রচণ্ড শক্তিধর হয়েও ধর্মভীরু ভিখারি রামের কাছে তারা পরাজয় বরণ করেছে। রাবণ ছিল ধর্ম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ রাবণকে দাম্ভিক করে তুলেছিল। তার জন্য তাকে ভয়ংকর সর্বনাশের অতলে চলে যেতে হয়েছিল। এমন শক্তিধরের পরাজয়ে কাব্যলক্ষ্মী 'নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।'

যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২১ বছর বয়সে মধুসূদনকে মহাকবিই বলতে চাননি তিনিই তাঁর ৪৬ বছর বয়সে তাঁর মাইকেল সম্পর্কিত মন্তব্য ফিরিয়ে নিয়ে মাইকেলকে তাঁর যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। অথচ বুদ্ধদেব বসু তাঁর ৩৮ বছর বয়সে মাইকেল সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'মাইকেল' প্রবন্ধে, সেই মন্তব্য তিনি ফিরিয়ে নেননি তাঁর শেষ জীবনেও। অথচ তিনি তাঁর উক্ত প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, মাইকেল একজন 'শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান।' তিনি এও স্বীকার করেছেন মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে উৎরে গেছে। এমনকি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ও। মাইকেলের প্রহসন দুখানিও অপূর্ব প্রাণশক্তিতে ভরপুর। যে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর জন্য মাইকেলের খ্যাতি, সেই কাব্যকে বুদ্ধদেব বলেছেন 'নিষ্প্রাণ'। এমন একটি নিষ্প্রাণ কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্রোহের স্বরূপ আবিষ্কার করেছিলেন, তাতেও বুদ্ধদেব সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধদেব তাঁর উক্ত প্রবন্ধের শুরুতে মাইকেলের কবিপ্রতিষ্ঠার প্রতি তাবৎ বাঙালির উচ্ছ্বাসকে 'অযথা প্রশংসা' বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি, দুর্মরতম কুসংস্কার।' মাইকেল তাঁর জীবনকালেই পরিণত হয়েছিলেন 'মিথে'। বুদ্ধদেব এই ভেবে দুঃখ পেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই মিথকে সত্য বলে ঠাউরে ছিলেন।

বুদ্ধদেব কেন মাইকেলকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবির শিরোপায় ভূষিত করেন, তার কারণও বর্ণনা করেছেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাব প্রথম আনয়ন করেন রবীন্দ্রনাথ। *মেঘনাদবধ কাব্যে* প্রকরণের অভিনবত্ব থাকলেও বিদ্রোহের কোনো স্বরূপ বুদ্ধদেবের চোখে পড়েনি। তাঁর মতে, মিল্টনের কাব্যধর্ম মাইকেলের আয়ত্তে ছিল না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি পোপের স্বগোত্রীয়। মিল্টন মনেপ্রাণে ছিলেন শয়তান-ভক্ত। তাঁর দেখাদেখি, মাইকেল তাঁর রাবণকে শয়তান-রূপে এঁকেছেন। মাইকেলকে পোপের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব পোপ সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছেন। সেই মন্তব্যটি হল : পোপ "did not write with his eye on the object."। মাইকেলও শব্দের গভীর তাৎপর্য অনুভবের ধার ধারতেন না। তিনি শব্দের আওয়াজেই খুশি ছিলেন। তাই দেখা যায় তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কেবল আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের সাড়ম্বর প্রয়োগ।

রাবণের সৈন্যবাহিনী দিনের পর দিন ক্ষয়িত হয়ে আসছে। এই ঘটনার বর্ণনায় মাইকেল লিখেছেন— "যাদংপতি রোধ যথা চলোর্মি আঘাতে।" মাইকেল সিংহের পরিবর্তে লিখবেন 'হর্যক্ষ'। তাছাড়া 'কড়মড়মড়ে' 'ঝক ঝক ঝকে' লিখে মাইকেল 'বালভাষিত পদাবলী'র পনুঃপুনঃ প্রয়োগে কখনও ক্লান্ত হন নি।

মাইকেল সম্পর্কে উপরিকথিত অভিযোগের কোনো জবাব নেই হয়তো। কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'প্রবহমানতা'র প্রশংসা করেছেন বুদ্ধদেব। তিনি একথাও না বলে পারেননি— "অমিত্রাক্ষর বাংলাছন্দের নবজন্মের যবনিকা উত্তোলক মাত্র, আসল পালা আরম্ভ হলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।"

এই উদ্ধৃতির দ্বারা কিন্তু প্রমাণিত হল, মাইকেলের কাব্যপ্রয়াসে তাহলে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব একথাও স্বীকার করেছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' যে একঘেয়েমি সৃষ্টি করেছিল, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের সেই একঘেয়েমির ভূত ঝাড়িয়েছিল। মাইকেলের এই প্রয়াস অনুধাবন করেছিলেন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ, মাইকেলের সমসাময়িকরা কেউ নন। বুদ্ধদেব কিন্তু একথাও স্বীকার করেছেন, মাইকেল শুধু বাংলা ছন্দের যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের আবিষ্কর্তা নন, 'বাংলা স্বরব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ' সম্বন্ধেও ছিলেন অবহিত।

মাইকেল কেন "আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি শর্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ"— না লিখে লিখেছিলেন "আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে"— তার রহস্য উন্মোচিত হবে, তাঁর শব্দের সূক্ষ্মতর ধ্বনি-সন্ধানের প্রয়াসের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল ধ্বনির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যে আধুনিকতার স্বর্ণ-দুয়ার খুলেছিলেন, তার প্রশংসাই করেছেন বুদ্ধদেব। তবে একথা তিনি না বলে পারেননি যে, "কিন্তু যেকোনো কাজ সর্বপ্রথম করতে গেলে তাতে আতিশয্য প্রায় আরোধ্য।"

মাইকেলের প্রহসন দুটির গদ্য-সংলাপ সম্পর্কে বুদ্ধদেব উদার মন্তব্য করতে দ্বিধা করেননি। মাইকেলের 'হেক্টরবধ'-এর গদ্যের ব্যবহারে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন বুদ্ধদেব। এই গদ্যের চর্চায় অগ্রসর হলে মাইকেল ঔপন্যাসিক হতে পারতেন— এমন মন্তব্য করতে বুদ্ধদেব দ্বিধা করেন নি। মাইকেলের বিভিন্ন রচনার সৌর্যের স্বরূপ উদ্ধার করে বুদ্ধদেব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন "যেদিকে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সেদিকে যথোচিত মনোযোগ নেই।"

আসলে মাইকেল ছিলেন বড় অব্যবস্থিত চিত্ত। তাঁর সাহিত্য চর্চার আয়ুষ্কাল মাত্র ৫ বছরের— ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরই তিনি সাহিত্য-সরস্বতীর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে বেরিয়ে পড়লেন ধনলক্ষ্মীর চর্চায়। অস্থিরতা হল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তার ফলে সাহিত্য রচনার উপযুক্ত উপকরণ হাতে পেয়েও তিনি তার সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হননি। মাইকেল সম্পর্কে এই খেদোক্তি করতে বুদ্ধদেব বিলম্ব করেননি। বুদ্ধদেব বলেছেন, "যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয় তবু একথাও সত্য যে অনুজ যা কিছু করেছেন তার কোনো কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও সাধিত হতে পারতো, যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন।"

আমাদের প্রশ্ন, এত উদার মনোভাব যে বুদ্ধদেব মাইকেল সম্পর্কে অন্তরে পোষণ করতেন, তিনি কেন বলে গেলেন জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, মাইকেল তাঁকে ভাবান না, যতখানি ভাবান রবীন্দ্রনাথ?

'মাইকেল' প্রবন্ধটি পড়লে আমরা অনায়াসে ধরতে পারি মাইকেল সম্পর্কে বুদ্ধদেব সম্পূর্ণভাবে স্ববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রবন্ধটি পড়লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বুদ্ধদেব মাইকেলকে অস্বীকার করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, মাইকেল আধুনিক কবিতার জনক নন। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিক কবিতার জন্মদাতা। কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপে বলা যায়, 'মাইকেল' প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব যথার্থ সমজদারির মন নিয়ে মাইকেলের সাহিত্যকৃতির সমালোচনা করেছেন।

মাইকেল সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বুদ্ধদেব কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছেন যথার্থ ঐতিহাসিকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মাইকেল বাংলা সাহিত্যের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরজাওয়ালার কবল থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।" প্রত্যেক কবিযশঃপ্রার্থীকে বুদ্ধদেবের 'মাইকেল' প্রবন্ধটি অতি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। এই পাঠের পশ্চাতে অবশ্যই থাকবে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা।

দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণের প্রতি

জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। এ-সব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এ-সবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের সৌন্দর্য ঝরে পড়ে এ-সব কবিতায় কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন— এ-রকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্রোহ আমাদের জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকলেও সে-টা মানবাত্মার পক্ষে ব্যর্থতারই জিনিস; এবং যেখানে বিদ্রোহের ততটা অবসর নেই সেখানেও কি জোর করে বিদ্রোহ আনতে হবে? শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা— এমন-কি শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধনা কি তা নয় যা বহুর স্খলন এবং ক্ষরণ এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জ্যামিতির— এবং যেখানে কোনো মহত্তর জ্যামিতি আর জ্যামিতি নয় শুধু— সমন্বয় ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে পারে? আমরা স্বীকার করে নেব যে 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য, এবং প্রেমের কবিতাগুলো এই বইয়ের ভিতর কতদূর কবিতা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক জিনিশ হয়েছে বিভিন্ন রকম ব্যাপকতা, গভীরতা, শূন্যতা, শববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা বা নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা নেই; কিংবা শাদা সূর্যের আলোও হাড় আর কড়ি কড়ি আর হাড় বলে মনে হয় যে-দেশে, সে-প্রদেশ নেই এখানে। তা নাই বা রইল, এই বইটি হল কবিতারাজ্যের আর একটা facet। এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জীবন চারদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্যের ভিতর নিজেকে গহন করে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের চলতি পথের ওপারে কোনো ধূসর প্রাসাদের মতো যেন : যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে, রয়েছে রূপ ও কামনার আরশি, জানালায় রঙিন কাচ, বাইরে আধো আঁধার, ধূ-ধূ শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মতো চাঁদ, এবং যেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী— কঙ্কাবতী!....

বইটির কোনো-কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশি, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা পড়ে পাখা মেলতে পারে নি। কোনো-কোনো কবিতায় জায়গায়-জায়গায় লঘু আমোদের ছোঁয়াচ রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানা রকম ভাঁজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ-রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে হয়; এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় propagandist। কিন্তু এ-চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে বলে মনে হয় না। ....এইসব কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে গভীর এবং পৃথিবীর সীমান্তে যেন কোনো শেষ শতাব্দীতে 'তিমিরতোরণে চাঁদের চূড়া' এবং 'আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মত তারকা-কণা' নিয়ে, আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য সে যা-কিছু নিয়ে আসতে পারে তারই স্বপ্ন দেখে সময়সীমানাহীন 'শেষের রাত্রি'। আধুনিক বাংলা কাব্যে বুদ্ধদেব যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি একমাত্র এই কবিতাটির উপরেও সে-সত্য নির্ভর করতে

পারত। ... যাঁরা বলেন 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলো আধুনিক সময়ের উপযোগী নয়— তাঁরা সময় বাংলাধুনিক সময় বলতে কোনো একটা কৃত্রিম কিছু তৈরী করে নিয়েছেন 'একখানা হাত' চিরকালই একখানা হাতের রহস্য; 'অন্ধকার সিঁড়ি' আজকের কোনো এক্সরের আলোতেই অন্ধকার সিঁড়ি আর কিছু হয়ে উঠবে না— এবং সেই জন্যই তা সব সময়ের। ... যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না-হলে দেখতে পারবেন না বলে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না— মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিককে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিক বলেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ; —যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো-কোনো মানুষের মন এক কণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরেই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায় আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন; —'কঙ্কাবতী' সেই কাব্য যার ভিতর এই আস্বাদ পেয়ে জলকে ততটা ইন্দ্রজাল বলে মনে হয় না মানুষের হৃদয়ের তৃষিত হবার অনুভবকে যতটা। পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পড়লে হৃদয়ে এই বোধ জন্মায়; হৃদয়ে এই অনুভব জন্মাতে পারেন যেই কবি (এবং তৃপ্তির অব্যর্থ পানীয় তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে আসেন) তাঁর কবিতাকে সময় ও মৃত্তিকা-ও-সময়োত্তর কাব্য।...

'কবিতা' ৩.২ (পৌষ ১৩৪৪)

> যাকে অস্পষ্টভাবে প্রগতি বলা হয়, সে বস্তুটি আর যাই হোক কবিতা কি সাহিত্য যাচাই করবার নিকষ নয়। সমাজ শোধনের কাজে ব্যবহার্যতার পরিমাণ হিশেব করে সাহিত্যের বিচার চলে না। ... আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা যখন প্রশ্ন করেন যে আধুনিক বাঙালি লেখক তাঁর বিষয় নির্বাচনে আজকের দিনের বিশেষ কতকগুলো ঘটনা বা সমস্যা এড়িয়ে যান কেন, তখন এই অভিযোগের আমি কোনো উত্তর খুঁজে পাইনে। লেখক তো বিষয়কে নির্বাচন করেন না, বিষয়ই লেখককে নির্বাচন করে। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা আজকের দিনের কোনো সমস্যারই এক চুল সমাধান হবে; সুতরাং এ-অভিযোগ সত্য হলেও সামাজিক দিক থেকে কোনো আশঙ্কা দেখি না।

বুদ্ধদেব বসু
'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৫

বুদ্ধদেব বসু

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনকথার 'আমার যৌবন' পর্বে এসে বুদ্ধদেব লিখছেন, "আমি অল্পবয়স থেকেই নানারকম লেখা লিখে আসছি, কলকাতা-বাসের আরম্ভকালে নিজেকে আমি নাট্যকার-রূপেও কল্পনা করেছিলাম।" ১৩৩২-এর *কল্লোল*-এ তাঁর পয়লা বছরেই দেখতে পাই কবিতা, অনুবাদ-কবিতা গদ্যপ্রবন্ধ বেরোলো পাঁচ মাসের মধ্যে পর পর, পিঠোপিঠি স্বল্পায়ু *প্রগতি*-তে একই সঙ্গে লিখছেন *সাড়া* উপন্যাস, জন মেসফিল্ডের উপরে প্রবন্ধ, নানা কবিতা এবং অনামিত আরও-সব সম্পাদকীয় গদ্য লেখা, আর নাট্যকাররূপে তাঁর শুরুও বাল্যের নাটুকে দল গড়ার পর গোচরতরভাবে কলেজজীবনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সে যে অভিনীত হয়েছে সে-কথা জানতে পাই অধ্যক্ষ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথায়। তাঁর আয়ুষ্কালে শেষ প্রকাশিত লেখাও একখানি কাব্যনাটকের বই। বস্তুত আজীবনের দেড়শতাধিক বইয়ের সমগ্রের জন্য বহুতরভাবেই তাঁকে নানারকম লেখা লিখতে হয়েছে। কবিতা অনুবাদ গল্প-উপন্যাস নিবন্ধ রম্যলেখা তাঁর অবিরলভাবে লিখতে হয়েছে প্রথমাবধি, পরে যোগ হয় ছোটদের লেখাও, যদিও সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ পাঠক তিনি ছোটবেলা থেকেই।

গোড়া থেকেই আরও দেখতে পাই তাঁর বিশিষ্ট রসবোধ ও রুচি, আর উদার গুণগ্রাহিতা— গোবিন্দচন্দ্র দাস থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী থেকে ফাল্গুনী রায়, সুকুমার সরকার— বিভিন্ন দিকেই যার সহৃদয় ব্যাপ্তি। বুদ্ধদেববাবুর "বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে" চরিতার্থ হয়েছিলেন জীবনানন্দ, নরেশ গুহর হাতে *কবিতা* পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে মার্কিন দেশে গেলে সেখানেই "প্রকাশিতব্য সমস্ত লেখা তাঁকে ডাকে পাঠানো হত, ওখানে বসে শেষ নির্বাচন তিনি নিজে করে দিতেন।" অপর কারও দেখার সঙ্গে কখনওই আপস-রফা করেন নি। ফ্যাসিবিরোধী দলে যোগ দিয়ে দু আনা দামের *সভ্যতা ও ফ্যাশিজ্‌ম্* পুস্তিকা লিখেছেন। *অরণি* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত সনেটে লিখেছেন, "...অন্তরে লভেছি তব বাণী,/ তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি" (এক পয়সার একটি গ্রন্থমালার '২২শে শ্রাবণ' পুস্তিকায় গ্রন্থিত), আবার অনতিবিলম্বেই দল থেকে বেরিয়ে এসে লিখেছেন, "দেশে আজ সাহিত্যিক দল ব'লে কিছু নেই, ...তার বদলে আছে পলিটিকাল পার্টি ...সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী— কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতির চর্চার জন্য সাহিত্যিক সমিতি, কিংবা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক— এসব নিদারুণ অপভ্রংশের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়।" প্রগতি লেখকদের অনুষ্ঠিত নাটকে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, বিষ্ণু দে বা সমর সেনের সঙ্গে অব্যাহত ঘনিষ্ঠতাও তাঁর ছিল। গ্রন্থকার-মণ্ডলী ও কবিতাভবন থেকে দুজনের কাব্যগ্রন্থও সাদরে ছেপে বেরিয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর তত্ত্বাবধানে। নির্বিকল্প শুদ্ধ সাহিত্যের দিকেই তাঁর প্রবণতা বা পক্ষপাত,

কিন্তু সাহিত্যকেই অনেকটা সময় বৃত্তি করতে হয়েছিল বলে স্বচ্ছন্দ করে নিতে হয়েছিল সাংবাদিকের ধাতটিও— খুশি বা বেখুশিতে, তার জন্য পরিতাপও করেছেন : "স্থূল প্রয়োজন আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা লেখা শেষ হওয়া মাত্র অন্য একটায়," প্রকাশ-পত্র, প্রকাশকও মিলে যাচ্ছে উপর্যুপরি, এমন আশু রচনায় লেখক কি নিজেকে ফুরিয়ে ফেলতে চাইবেন? শেষ দিকে দীপক মজুমদারকে লিখেছেন, "শিল্প তো প্রকাশসাপেক্ষ ও পরনির্ভর— নির্জনতম কবিরও পাব্লিক চাই", কিন্তু আজ এখন এই ১৯৭১ সালে "সাংবাদিকতা আভালাঁশের বেগে বর্ধমান। ... এ মুহূর্তে বাংলাভাষায় সাহিত্য লিখে কিছু রোজগার দূরে থাক, তা প্রকাশ করাও দুঃসাধ্য।"

পরিস্থিতি যাই হোক, লক্ষ করতে হয় অনেকানেক কৃতী সতীর্থের মতো সাংবাদিকতায় তিনি তলিয়ে যান নি। বরং পঞ্চাশ বছরের উপকণ্ঠ থেকে নতুন করে নিরত হয়েছেন আত্মবন্ধনে— কালিদাস বোদলেরের শ্রমিষ্ঠ আত্তীকরণ করে, নতুন কাব্যমণ্ডল রচনা করে মায়াবী টেবিলে, বাঁধা মঞ্চের টান ছেড়ে গাঢ় কাব্যনাট্যে, বিলিতি আবহ সংস্কারের ত্রয়ীর একা বুদ্ধদেবই বোধহয় পরাহত করতে পেরেছেন জনসামীপ্যের মূল্যে জনগণ্যতার অবরোহ, সংখ্যালঘু সহৃদয়ের দিকে লক্ষ্যান্তর রচনা করে নিয়ে। বাকি একজন কথায়কতায় আশ্রয় নিয়েছেন দেখতে পাই পরিণামে, একজন ছোটগল্পের সুকৃতিকে তরলিত করে দিচ্ছেন টল টেল-এর রোমহর্ষে আত্মদান করে, আর বুদ্ধদেব যৌবনের কলতান ক্ষান্ত করে, আবাল প্রেম ঈশ্বরে সমর্পণ করে ক্রমাগত সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হয়ে উঠছেন তখন— বোদলেরকে সরিয়ে রেখেই স্বয়ং টের পাচ্ছেন তিনি "একধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল।" সঙ্গী বা সমঝদার কারও আর ভূমিকা নেই তাঁর সোমযোগে। রবীন্দ্রনাথ যাঁর আবাল্য দেবতা, এবারে প্রস্তুত হয়ে উঠছেন তাঁর দ্বিতীয় মূল্যাবধারণে, গ্রিক আর ভারতপুরাণের ধ্রুপদী সংবেদনা আত্মস্থ করছেন নতুন করে, পরিপূর্ণ নিরাবৃতির জন্য দণ্ডিত হতেও আর কুণ্ঠা নেই যেন কথাসাহিত্যের সমাজ-নকশায়, আর সর্বোপরি সমস্ত স্নায়ু ইন্দ্রিয় উজাগর করে আস্বাদ করতে চাইছেন জীবনের মাদক রক্তক্ষরণ, এবং মর্মে মর্মে টের পাচ্ছেন–

আমার হৃদয় নিয়ে রাঁধো তুমি বিষাক্ত লবণে।
আমার নিদ্রার কাঁথা মনস্তাপে করো ছিদ্রময়।

মরচে পড়া পেরেক এতদিনে আজ ফের স্বপ্ন দেখছে সেই পুরোনো উন্মীলনের মুহূর্ত— সেই স্বর্গের, যখন "সূর্যের হৃদয়স্রাবী তমিস্রায় অনন্ত কাল মূর্ত" হয়ে আছে, আর তার হতজীর্ণ ক্ষণিক অস্তিত্ব সহসা ব্যাপ্ত হয়ে গেছে নক্ষত্রে চরাচরে সর্বজীবপ্রাণীর পরিকীর্ণ সত্তায়, জগৎ আর নরক পরিক্রমার পরে পাওয়া এ এক অভূত পারাদিসোর স্বপ্ন যেখানে দিব্যা বা অমরী নেই, রূপসীই পরিবদ্ধ হয়ে আছে— পাষাণে নয়, তার মরত্বে। জীবন-বীজ, প্রাণের ইন্ধন যে কামিকতা, সে কি হতে পারে কবির বর্জনীয়? শঙ্করাচার্য ও বোদলেরকে যুগ্মিত করে তাঁর যে-'মোহমুদ্গার' সেখানে ধ্রুবার মতো ফিরে ফিরে আসছে এই যাচনা-মন্ত্র :

হে কাম, শাশ্বত! করুণা করো তুমি আমার গুরু বৈরাগ্যে!

দেবাদিদেব অবিনাশ শাশ্বত মুক্তিদাতা ঈশ্বরোপম লোকোত্তর এই কামনা— মানুষের ইতিহাসে, কবির বোধিতে। কিন্তু ভাবনা যাই হোক, রচনায় একায়তন ছেড়ে এবারে সে যেন ভাঁজ ফেলতে, সঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে নতুন করে, যদিও সাবলীল একহারা লেখার প্রবণতা তাঁর মজ্জাগত। কিন্তু উত্তরাধ্যায়ের শুরু থেকে লেখার এই অবধান,

আর অনবসিত এতখানি যৌবন— ত্রিশের দশকের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব ধরে রেখেছেন প্রায় অতুলনীয়ভাবে।

তাঁর নানারকমের লেখার আরও বিস্তার হয়েছে দিনে দিনে, কোনোটাতেই পরিশীলনের চূড়ান্ত হয়েছে বলা যাবে না; সময়োচিত আধুনিকতাও সে পেয়েছে কি পায় নি সংশয়স্থল— কিন্তু যাবতীয় লেখাতেই কৌতূহল আর জীবনস্পন্দ হয়তো সে অব্যাহত রাখতে যত্ন করেছে বরাবর, সামাজিক সুভাষিত বা নিরাশ চিত্তবৈকল্যের বিস্তার না করে। এমন কি "একক আত্ম— অনুদ্দিষ্ট— ঝাপসা"-য় *দশমী*-র যে-রেশ, পরক্ষণেই সে ম্লান হয়ে যায় "সিনেমার ভিড়, বাঁকা রোদ্দুর, কোঁকড়া হাওয়া" কিংবা "স্তনগৌরবে অলস রেলিঙে"র উষ্ণতাতে, এমন কি *স্বাগতবিদায়* কাব্য জরা-বার্ধক্য-ভাঙাস্বাস্থ্যের ভস্মাসনে বসেও "মৌরির হলুদ রৌদ্রে সুবাসিত মহিলার নাম" তুলে আনতে চান কবি, "বারান্দায় শব্দের সন্ধানী" নিচের পথে এক মৃতাকে দেখে মানতে পারেন না সে মৃতা, এখনও যেন "যৌবনপ্রতিমা, নারী, হৃদয়প্লাবিনী, যেন স্বপ্নে দেখা চিরন্তনী সম্ভাব্য বনিতা"। মনে হয় "কবিতার চেয়ে কাম্য নারীর অঙ্গের মধু", নারীকে স্বর্গযাত্রার দিশারা না করে মর্ত্যের বনিতারূপে প্রতিষ্ঠা করেই একাধারে উত্তরণ ও কৃতার্থতা যেন কবির। জীবনের দুঃখ প্রসাদ ক্ষরণ আর ক্ষয়ের ক্রমান্বিত পরম্পরার ভিতরে অবিচলিত এই যেন কবির স্থির বিন্দু, বারে বারে সঞ্জীবন পান করে যাবার। দুর্যোগই জীবনে নিত্য, তাকে বারবার অতিক্রম করার স্থির বিন্দু যেন জীবনের রতি, যা জয় করে নিতে হয়। একখানি খোলা চিঠির বয়ানে পড়ি তাঁর উত্তরপর্বের শরেণ্য কবি সুশ্রী সুখী পত্নীপ্রীতিলব্ধ স্থিরযৌবন কালিদাস জীবনে একবারও অনুদ্ধার নরকে প্রেতের মতো ঘুরেছেন— না জানা অবধি তাঁকে তিনি ভালোবাসতে পারবেন না। *মেঘদূত*-এর তালে-মানে-লয়ে বাঁধা অপরূপ যে জগৎ অশুভ-অসুন্দরের উপরে গড়ে তোলা বিজয়সৌধ যদি না হয় তাহলে সে নিস্প্রাণ এবং নিরর্থক। বুদ্ধদেবের নন্দন-বিশ্বাসের এই বোধ হয় শেষের সূত্রটি।

২

বুদ্ধদেবের আরম্ভও শৃঙ্গার-কথা দিয়ে। *কল্লোল*-এ প্রথম দুটি গল্প-কবিতা পর পর প্রকাশিত হওয়া মাত্রে মন্দখ্যাতি রাতারাতি তাঁর বিপুল পাঠকপ্রসার ঘটিয়ে দেয়। 'রজনী হ'লো উতলা'-র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) প্রতিক্রিয়ায় বিহার সাহিত্য সম্মেলনে মজঃফরপুরে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন, "এমন সব সন্তান গর্ভে বহন ও বক্ষশোণিতে বর্ধন না করিয়া সূতিকায় একটু করিয়া নুন দিলেই ভালো হইত ..." (ডাকঘর, *কল্লোল*, ভাদ্র ১৩৩৪)। দীর্ঘ খ্যাতি ভোগ করার পরেও অতুলচন্দ্র গুপ্ত *বন্দীর বন্দনা* (ফাল্গুন ১৩৩৩) নতুন সংস্করণ থেকে পড়ে লেখেন, "খুব জোরের সঙ্গেই অতি আধুনিক মোহমুক্তির বাণী অতি আধুনিক নগ্নতায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে।" কিন্তু "কল্পনার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত নয়", কবির এ নিতান্ত ধার করা একটা 'attitude', কাব্যপাঠককে আকর্ষণ বা 'হিপ্নটাইজ' করতে পারে না। না পারুক, এরই নামাঙ্কিত কাব্যখানির সুবাদে প্রেমের কবিতার কবি বলে বুদ্ধদেবের যে-আখ্যা হয়, আজীবনে তিনি তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আধুনিক কবিতা-সম্বন্ধীয় প্রথম গবেষণাপত্রে প্রতিষ্ঠা হয় এই জনশ্রুতির। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী লেখেন, "বুদ্ধদেবের মনের ধর্ম প্রেম। তিনি প্রেমের কবি।" অতীন্দ্রিয় রোম্যান্টিক প্রেমও এ নয়, এ প্রেম নিরতিশয় carnal, বা দেহজ, কবি তাঁর নির্মম নির্মাতাকে অভিযুক্ত করছেন

তার জন্য : “প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি’ রচেছো আমায়”, যার ফলে “বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন”, আর সে “রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি”। মনে হয় ভারতচন্দ্রের নববেশ, বিদ্যাকে প্ররোচিত করছেন যিনি :

> অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
> বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি দশনে করহ খণ্ড খণ্ড।

কামনা অবশ্য কেবলই তাঁর কাছে আরক্ত আহ্লাদময় সুন্দর; আর “যৌবন আমার অভিশাপ” এই ধিক্কার হয়তো রোম্যান্টিক-ভিক্টোরীয় নীতিতাড়িত বিবেকের আত্মগ্লানি, বা হয়তো রাবীন্দ্রিক প্রেমলব্ধ উত্তরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তজনিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘যৌবন-বারতা’-য় যৌবনের অভিশাপের স্থানে আছে সৌন্দর্যের ইন্দ্রজালমুগ্ধতা, জীবনানন্দ প্রবৃত্তির কারাগারের বদলে লিখেছেন “নিঃসহায় নগরীর কারাগার”-এর কথা, *কল্লোল* বলয়ের মেধাবী ব্যবধানে *তন্বী*-র প্রেমকবিতা শুরু হয়েছে “প্রেমের চিতাভস্মশেষ”-এর উপরে। অমিয় চক্রবর্তীর বাস্তবতা নগরমালিন্য অথবা একান্ত বাংলাদেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব হয়তো তাঁর প্রথম দিকের প্রিয় গোবিন্দচন্দ্র দাস বা মোহিতলাল মজুমদারের দেহসংরাগকে আরও অ-দ্ব্যর্থ বা শানিত করে তুলেছেন। তাঁর দেবতাকল্প রবীন্দ্রনাথের *কড়ি ও কোমল*-স্থিতা রূপকথাপ্রভ নগ্নিকা, কিংবা *মানসী*-র প্রেমের অভিশাপে অকূলের উদ্দেশে ঊর্ধ্বযানী মনোরথের রূপক তাঁর অবাস্তব লেগেছে বাস্তবতা-দীক্ষিত মুহূর্তের অবস্থান থেকে। মনে রাখতে হয়, প্রেম তাঁর অনন্য বিষয়, কিন্তু রিয়ালিজ্‌ম্‌পন্থী অধুনাতনের মুখপাত্র হিসেবে তিনি কথা বলতে চাইছেন নবজায়মান নতুন তরুণ পাঠকের সঙ্গে, আর কবিতার ঘেরাটোপের ভিতরে যত অকপট কথার স্থান হতে পারে, গদ্য করে বলতে গেলে সামাজিক বিলোড়ন উঠবে তা নিয়ে। ‘রজনী হলো উতলা’-র যত ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া হয়েছে, ‘বন্দীর বন্দনা’ তার কাছে প্রায় অনুচ্চারিত, বলা যেতে পারে।

দেহরাগ-সম্পৃক্ত এই বাস্তবতা হয়তো *ভারতী*-র নরেশচন্দ্র-চারুচন্দ্রাদি কথাসাহিত্যিক-গোষ্ঠীর হাত থেকেই সরাসরি পাওয়া। *কল্লোল*-এর ত্রয়ীর মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সে-পথেই গেছেন লেখাকে খানিকটা দূরান্তের বা পেলব করে তুলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে সে নিম্নজনাশ্রয়ী ‘পাঁক’ বা ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’-র সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা। বুদ্ধদেবের সতীর্থ কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ নগরীর কারাগার ভেঙে অচিরে স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন স্বরচিত কৌম idyllic গ্রামে, সুধীন্দ্রনাথ নগরকেন্দ্রের বিদগ্ধ স্থিতধীর মতো বেদান্ত ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন জড়বাদে, তারপর ক্ষণবাদে, দর্শননিষ্পত্তির পরে ধ্রুপদী প্রকরণচর্চায় সমর্পিত তিনি। আর বুদ্ধদেবের একান্ত নির্ভর তাঁর ইন্দ্রিয়োপাত্ত, তাঁর যাবতীয় লেখা গ্রহীতা পাঠকের মুখ চেয়ে। নিজেকে খুশি করার, বা দর্শননিষ্পন্ন করে নেওয়ার তাঁর অবকাশ নেই। একটা লেখা শেষ হবার আগেই আর-একটা লেখায় হাত না দিয়ে তাঁর উপায় নেই। বস্তুত *বন্দীর বন্দনা*-র পরে ষোলো-পৃষ্ঠার একখানি কবিতা পুস্তিকায় পৌঁছোবার মধ্যে অন্যূন ছয়খানি গল্পোপন্যাসের বই তাঁর ছাপা হয়ে গেছে, পরের গণনীয় প্রমাণ-কাব্য *কঙ্কাবতী*-তে যাবার মধ্যে ছোটদের লেখা রম্য গদ্য মিলিয়ে কথা বা গদ্যের বইয়ের সংখ্যা তেতাল্লিশ। বুদ্ধদেব বসু তখন রীতিমতো নগরবাসী, ট্রাম-বাস-ঝংকৃত বড় রাস্তার উপরে আবাস, সমাজের ঘটনাঘটনের সঙ্গে তাঁর নিত্য বিনিময় আছে, অর্থাৎ সেই অর্থে তাঁকে অ-সামাজিক, এমনকি সুধীন্দ্রনাথের মতো কসমোপোলিটান বুর্জোয়া বা

জীবনানন্দের মতো নির্জনগ্রাসিতও বলা যাবে না। তবু গল্পোপন্যাসের যে প্রাথমিক বহুবাচিকতার (heteroglossia স্মর্তব্য) লক্ষণ, তাকে প্রায়াংশে পরিহার করে তাঁর আখ্যানমালা মূলত একোক্তিপ্রবণ যা তাঁর আপন ব্যক্তিটিরই ঘেরোয়াতে গড়ে তোলা। সে যেন তাঁর কবিতার, বা কবিপ্রবণতারই সম্প্রসার, মন-দেয়া-নেয়ার বেশি সমাজতথ্যে জড়িয়ে তিনি তাকে বিশৃঙ্খল করে দিতে চান না। *বন্দীর বন্দনা* থেকে *কঙ্কাবতী*-রই বা বিকাশ কতদূর, কিংবা কোন পথে? অমিতা বা অপর্ণার অনিশ্চয় সংশয়জনক ভালোবাসার দোলাচলের ভিতরে "নতুন ননীর মতো তনু" বা "তনুলতা" কঙ্কাবতীর দেখা পাওয়া গেছে *বন্দীর বন্দনা*-তেই, কিন্তু "দূর থেকে দেখে মুগ্ধ" হবার প্রতিদানহীন ভালোবাসা কিশোর প্রেমিককে যা দগ্ধ করছে তিলে তিলে, *কঙ্কাবতী* কাব্যে পৌঁছে যেন ভূমির আভাস জেগে উঠল দ্বিধা-অনাশ্বাসের ভিতরে : "কাল সে আসিবে হেথা— এই কথা লিখে পাঠায়েছে।" আর মুহূর্তেই নামের ভিতরে সশরীরী হয়ে উঠেছেন নায়িকা, সে-নাম অনুরণিত হয়ে উঠছে তাঁর প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে–

> তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো।
> ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি
> কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
> তারার মতন একশো কোটি।

কিংবা বিছানায় শুয়ে আছেন কবি, ঘুম হারিয়েছে, "না জানি এখন কত রাত", কবি যে পথে মোড়ের বাড়িটির নিচের ঘরের জানালায় সাদা হাতখানি দেখতে পেয়েছিলেন। আঙুলে হীরের আঙটির ঝলক, মণিবন্ধে সরু রুলি সে অধিকার করে নিয়েছে আজকে কবির ঘুমের শয্যা। কবি অঘুমে স্বপ্ন দেখছেন চুল এলো করে দিয়েছে কঙ্কাবতী : "আহা লাল চুল! ঝিকিমিকি সোনা! লাল সে চুল!" কবি ভাবছেন, বাতাস জেগেছে যেন মাঝরাতে, "এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও" আর মনে হয় যেন "আকাশ ঘুমায় মাথা রেখে কালো মেঘের কোলে"। কঙ্কাবতীও ঘুমোবে এখন, ঢুলে এসেছে তার চোখ দুটি। আর কবি লিখতে বসেছেন সেরেনাদ : "রমণীর বাতায়ন-তলে পুরুষ কর্তৃক রাত্রে যে গান গাওয়া হয়"। দেখতে পাই, কেবল জাগতিক ভূমি নয়, *বন্দীর বন্দনা*-র বাষ্পাকুল উচ্ছ্বাস এখানে শিল্পেরও একটা রচনা বা composition আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে— না হলে যা হয়তো হয়ে দাঁড়াতে চলেছিল উপন্যাসের— তার প্লট ক্রমোন্মোচনেরই একটা বয়ান। জীবনানন্দ *কঙ্কাবতী* পড়ে লিখেছিলেন, এ কাব্য তাঁর মনে হচ্ছে : "জীবন চারিদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্যের ভিতর নিজেকে গহন করে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে *আমাদের চলতি পথের ওপারে*, কোনো ধূসর প্রাসাদের মতো যেন; বাইরে আধো আঁধার, ধু ধু শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মতো চাঁদ, এবং যেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী— কঙ্কাবতী! বিচিত্রতর মনে হবে ব্রাউনিঙের লেডি অভ ট্রিপলিকে সে সুরে ডেকেছেন। কিন্তু সেই কবিতার পর 'কঙ্কাবতী'-র সুর বিচিত্রতর মনে হবে।" 'Rudel to the Lady of Tripoli' ব্রাউনিঙের Dramatic Lyrics-এর পাঠ। মনে হয় উপন্যাসের একটানা বিস্তারকে সঘন করে তুলতে নাট্যপ্রকরণেরও ভাঁজ ঢোকাতে চাইছেন কবি— কবিতার বিশিষ্টতা বা পৃথগত্ব রূপিত করে তুলতে?

[বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে প্রবন্ধকারের পরিকল্পিত বৃহত্তম একটি রচনার প্রাথমিক অংশ এটি। অনুপূরক হিসেবে বাকি অংশটির প্রাপ্তি বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ায় লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। –সম্পাদক]

চিত্ত সত্তায় বুদ্ধদেব বসু

নীলিমা ইব্রাহিম

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবছি অন্তর্জগতে নানাদিন নানা মুহূর্তে এতো কাছে যিনি ছিলেন হঠাৎ তাকে অনেক দূরে রেখে কোন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবো? কবি বুদ্ধদেব, কথাশিল্পী বুদ্ধদেব, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, অধ্যাপক কাকে আজ আলাদা করে ভাববো? সবই যে তুল্যমূল্য! সামগ্রিকভাবে এই স্রষ্টাকে কখনও ভেবেছি কি?

খর্বদেহ, অমিত তেজ মানুষটির ভেতর যে দাহিকাশক্তি ছিল তাতে আগুন জ্বলেছে কিন্তু তা সৃষ্টিকে না পুড়িয়ে জগতের সৌন্দর্যকে নতুন করে আলোকিত করেছে, ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে, দিয়েছে দীপ্তি ও প্রভা, মধ্যগগনের রবির আলোকে উদ্ভাসিত তরুণ পৃথক রশ্মি জ্বেলেও রবির কিরণে স্নাত হয়েছেন। এ এক পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব!

বুদ্ধদেব বসুকে শেষ দেখেছি, কথা বলেছি, শুনেছি সম্ভবত ১৯৬৮-৬৯ সালের শেষের দিকে। জনাব আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাড়িতে নৈশভোজে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, নরেশ গুহ, অর্চনা গুহ ও আমার বোন ইলা। আয়োজনটা করেছিলেন গৌরী আইয়ুব আমাকে উপলক্ষ করে। কারণ এর আগে অর্থাৎ দেশ বিভাগের পর থেকে প্রতি বছর অন্তত দু'একবার কলকাতা যেতে হতো পারিবারিক কারণে। সেখানে রক্তের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল না কিন্তু আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হতো অতি সতর্কতার সঙ্গে। যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি ঢাকায় বা ইসলামাবাদে খবর পৌঁছায় তাহলে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসা বন্ধ, তাই রাতের মূষিকের মতো অতি গোপনে আপনজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যেতে হতো।

১৯৬৮-৬৯-এ আমাদের ছাত্র-আন্দোলন তথা গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বুক কাঁপলেও কিছুটা সাহসে ভর করে এখানে ওখানে যাতায়াত করতে শুরু করেছি। এমনিই এক দুর্লভ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা।

আলাপ হয়েছিল সবটুকুই ঢাকাকেন্দ্রিক। বলেছিলাম বংশপরম্পরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আপনার নামটি পরিচিত। আপনাকে ও মোহিতলাল মজুমদারকে ঘিরে যেসব কাহিনী ওখানে গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অথবা বাদ দিয়ে এখনও প্রাণে বেঁচে আছে। বিষয়টা উপভোগ করলেন। তবে ঢাকার আলোচনায় খুব একটা ঔৎসুক্য দেখালেন বলে মনে হল না। নরেশ গুহ বাখরখানি থেকে অনেক আলাপে এলেন। বুদ্ধদেব বসু নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন। মনে হল হয়ত বা ঢাকায় চলে গেছে মন আর মনোনিবেশ করেছেন সেই পুরাতন স্মৃতির রাজ্যে। নোয়াখালীর বর্ণনায় আমরা দেখেছি তাঁর শৈশবস্মৃতি কতো জীবন্ত! সেখানে তারুণ্যের লীলাভূমি কতোখানি জায়গা জুড়ে আছে তা সহজেই অনুমেয়।

গত ১৮ মার্চ বুদ্ধদেব বসু অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। অসমাপ্ত লেখনী অতর্কিতে থেমে গেছে। মৃত্যুর দু'দিন আগেও বলেছেন, 'রানুর জন্য আমাকে আরও দশ বছর

বাঁচতে হবে।' আমরা ভুলে যাই শুধু নিজের জন্যে কেন কারও জন্যেই মানবের আয়ুর নির্দিষ্ট সীমারেখা পার হবার ক্ষমতা অমৃতের পুত্রের নেই। এ সত্য অমোঘ এবং অবধারিত।

মৃত্যুর পূর্বে কবিতা পত্রিকার জন্মকথা লিখে এক বিশেষ কবি-সাহিত্যিক মহলের কাছে বন্ধুকৃত্য সমাপন করে গেছেন। কথাশিল্পীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি অন্তরঙ্গ কবি শিল্পীদের ছবি এঁকেছেন। আর তাঁর রূপরেখা চিত্রিত করবেন তাঁর গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ।

বুদ্ধদেব বসু আজন্ম কবি। প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে কবির সামনে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব একে গ্রহণ করেছেন, লালন করেছেন, দশের সামনে অপরূপ রূপে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন; একে সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী করে তুলেছেন। এ রূপ চর্চা করেছেন তিনি কাব্যে, কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে এমনকি সমালোচনাতেও।

জীবন প্রকাশে বুদ্ধদেব বসু বাস্তবধর্মী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তির্যকপন্থী। স্বদৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে জীবন ও তার রূপের অভিব্যক্তিকে বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছেন এক বিশেষ ভঙ্গিতে :

বিধাতা জানোনা তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।

–[বন্দীর বন্দনা]

এ অমৃতকে কবি খুঁজেছেন পদ্মার বুকে, অরণ্য নীলিমায়, প্রেয়সীর সান্নিধ্যে, প্রেমের সাধনায়। এর অপর নাম রূপতৃষ্ণা।

দূরকে আমি ছুঁয়ে আছি অকূল জলের
কণায় কণায়,
বিরামহীন তরল তান চিরকালের
মন্ত্র শোনায়।
বুঝিনা তার কঠিন দয়া, কি নিষ্ঠুর ভালোবাসা
কেবল এ স্বপ্নরাতে এক হয়ে যায়
যাওয়া আসা।

–[যাওয়া আসা]

কবির কাছে 'শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত'। বাইরের জগতের সতীত্ব রাখার দায়িত্ব তাঁর নয়। জীবনকে দেখো, বিশ্লেষণ কর, শিখে নাও, উপলব্ধি কর :

ফুল, ফল, ঋতু, বারোমাস
ঘুরে ঘুরে যা বলে তা শিখে নাও, ঠিকানা রেখো না আর
কোনখানে;
আসামি অসাবধান, চেষ্টাহীন, অপ্রতিহত,
নতুন ভাষায়, শোনো, নক্ষত্রের দীপ্ত মন্দিরার
চরাচর, চিরকাল নিস্বন্দিত তোমার শিরায়।

–[রাত তিনটের সনেট]

বহির্বিশ্বের ঘাত-প্রতিঘাত কবিকে কি চঞ্চল করে, বেদনা দেয়? মাঝে মাঝে অনুভূতিতে জড়তা নামে, আত্মপ্রত্যয় স্তব্ধগতি হয়। কবির হৃদয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তার অন্তর্যামী তাকে দিয়েছেন বিপুল প্রশান্তি ভোগের অধিকার :

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মিজ্বলা পশ্চিমের স্মৃতি–
সব মিশে অন্ধকারে ভরে দেয় আলোর পুলিন:
শুধু স্বপ্নে শুনে একতাল্ ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর
নিঃসঙ্গতা! জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত উৎসব।

এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আঁকা অজিত চক্রবর্তীর মৃত্যুদৃশ্য-চিত্রের উল্লেখ করা যায় :

> ভিতরের ঘরে শুয়ে আছেন অজিত সাদা চাদর পাতা রাত্রিকালীন বিছানায়, কাৎ হয়ে হাঁটু মুড়ে, খাটের প্রান্তে— হয়তো সেটাই তাঁর ঘুমের আগেকার অভ্যস্ত ভঙ্গি। পাশে টিপয়ের উপর পড়ে আছে তাঁর সকালের চা—বিবর্ণ এবং পাতলা সরে আচ্ছাদিত; আর দেখলাম বড় একটা চৌকো শিশিতে বুক পর্যন্ত ভর্তি এক নতুন দ্রব্য— রঙটা হলুদ মিছরি-দানার মতো কোনাচে ও স্বচ্ছ। মনে হয় অজিতের দাড়ি ছিল না। তার মুখে দেখলাম সেই গরলজাত গাঢ় নীল বর্ণ যার বর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছিলাম— কিন্তু যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই। ঐ মিছরি-দানা বোধহয় এক মুহূর্তেই তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলো। ...একটা চিঠি রেখে গেছেন যার মর্মার্থ হলো : 'এই সংকল্প আমার বহুকালের, একদিন অসুস্থ ছিলাম বলে সাহস পাইনি; ইদানীং আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে তাই আর দেরি করলাম না।' ঐ শেষ কথাটা বড় আশ্চর্য বলে মনে হল আমার।

নিঃসঙ্গ অজিত চক্রবর্তীও হয়ত জীবনকে বড় বেশি ভালোবেসেছিলেন। বুদ্ধদেবের মতো যার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যায় 'জেনেছি তোমারই নাম শীত গ্রীষ্ম বসন্ত উৎসব।' তাই ভালো বোধের রেশটুকুকে আশ্রয় করেই জীবনের ইতি টেনেছেন। উপরের কবিতা ও পরবর্তী একটি মুহূর্তের অভিব্যক্তির ভেতর একটি অন্তরমিল সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাই :

এ জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত, আর আছেন ঈশ্বর।

–[মুক্তির মুহূর্ত]

ঈশ্বর আছেন বলেই মৃত্যু অমৃত দান করে। আর তা সুন্দরের অপর নাম মরণ। এও এক ধরনের সৌন্দর্যের আরাধনা।

শুধু জড় প্রকৃতি নয়, জীবন সম্পূর্ণতা পায় নারীরূপ প্রকৃতির সংস্পর্শে :

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব
(ওগো কঙ্কাবতী!)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার
(ওগো কঙ্কাবতী!)
ওগো কঙ্কাবতী!

–[প্রেমিক]

ভালোবাসা প্রত্যুত্তর চায় না। কারণ কবির ভালোবাসার প্রতিদান কে দেবে?

> বরং প্রেমের ভান করিয়ো না— সেই হবে ভালো;
> দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
> তবু মুগ্ধ হবো।
> না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
> আমিই বেসেছি।
> সে কথা তোমার কানে নানা সুরে জপিতে চাহি না–
> আমার সে ভালোবাসা তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে।

'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসের নায়ক পলাশের ভালো লেগেছে প্রতিমাকে যেমন ভালো লেগেছিল একদিন রেবাকে। কিন্তু এ ভালোবাসাকে কি ধরে রাখা যায়?— "একশো ঘোড়াও তাল রাখতে পারছে না তার মনের সঙ্গে যেখানে উঠছে অবিশ্রান্ত বুদবুদ। পালাও পালাও! হঠাৎ ঠেলে উঠেছিল তার ভেতর থেকে, যেন একটা রক্তের বুদবুদ ফেটে গিয়েছিল– তারপর আর সময় ছিল না। সময় ছিল না ভাববার, দ্বিধা করবার, বোঝবার কি বোঝাবার। আর তাই সে এ রেলগাড়িতে বসে পালিয়ে যাচ্ছে, জীবনের যে সব জটিল গ্রন্থি আচমকা এক একসময় আমাদের জড়িয়ে ধরে, যা কিছু আমাদের অনুমতি না নিয়ে, আমাদের সুবিধে–অসুবিধের কথা না ভেবে হঠাৎ হয়ে উঠতে চায়– হঠাৎ ঝলসে ওঠা জীবনের সেই সব ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল কোন– তা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে– শেষ পর্যন্ত, শেষ মুহূর্তে সে বেঁচে গেছে। ... জীবন একই; তা শুধু বিভিন্ন আধার খোঁজে। জীবনকে চলতে দাও, খেতের মাঝখানে দাঁড়ানো উলঙ্গ, নিঃসঙ্গ একটা ছেলে পলাশের দৃষ্টির উপর দিয়ে ঝলসে গেলো, কালই তো আমি কতোবার বলেছি, জীবনকে চলতে দাও। কিন্তু তা এমন ভয়ঙ্কর তা কে জানতো, জীবনের সেই চলা! একশো ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুতগতিতে আমাকে তা থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না। আর তবু পলাশ ভাবলে, শুধু সেই গোলাপের তোড়াটা কেন ছুটে চলেছে আমর সঙ্গে, জামা-কাপড়ের ফাঁকে, বাক্সের মধ্যে? তা নিয়ে আমি কী করবো?"— পথের পাশে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এ প্রেম, এ ঝলকানির আলো আনন্দ দেয়, পুড়িয়ে মারে। তবু একে আমরা চাই, ভাবনা করি, প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছা আমাদের হয় না।

'তুমি কি সুন্দর' উপন্যাসে আমরা আকে প্রেম দেখতে পাই। কালীতারা ভালোবেসেছে সাহিত্যিককে, সাহিত্যিক তার পূজা গ্রহণ করেন কিন্তু ভালোবাসেন সুকণ্ঠী মালবিকাকে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হল কালীতারাই মালবিকার ছদ্মনামে গান গায়। নায়ক-নায়িকার মিলন হল। কালীতারা চরিত্রটি এখানে অপূর্ব। পূজা করেই সুখী, দান করে তৃপ্ত। প্রতিদান চায়নি। আর নায়কের মনের সায় পাচ্ছি :

> পৃথিবীতে আর কিছু তো সুন্দর নয়, ছন্দই শুধু সুন্দর। কোনো এক আদিম চিরন্তন ছন্দেরই লীলা কখনো সুরে, কখনো বাণীতে, কখনো বর্ণে, কখনো জীবনে বারবার নতুন করে আমরা অনুভব করি। সেই ছন্দকেই আমি ভালো বেসেছি, আমার সেই সুর স্বপ্নরূপিনীকে বুকের মধ্যে বহন করেছি— জীবনের সমস্ত কোলাহল, সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যে– মালবিকার মধ্যে তাকেই দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু দেহরূপের সুষমার মধ্যে সুরলোকের ছন্দ তো সবসময়ে ধরা পড়ে না–

দেহটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাকে অতিক্রম করে যে মন, তাকে মুক্ত করে যে প্রাণ, সেই মন-প্রাণের প্রবর্তনা বাসা বাঁধে যে দেহে, সে যদি সুদৃশ্য হয় তো ভালো, না হলেই বা কী। ...আমার মনের মধ্যে যেন মুক্তির বান ডাকলো— তখনই বুঝতে পারলাম যে, দেহের রূপটা একটা বাধা, সে অন্যায় প্রভুত্ব করে সমস্তটা খাজানা নিজেই আদায় করে নেয়— মনে হলো আমি যেন প্রতিদিন পথ-হারানো পাখির মতো রূপের রুদ্ধ জানালার কাচে মাথা ঠুকে মরছিলাম— আজ সেই জানালা গেলো, আমি উড়ে চল্লুম যেনো আকাশে দিগন্তের অভিসারে।

এই মর্মে ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে :

যৌবন করেনা ক্ষমা
প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকারে করে মনোরমা
বিশ্বের নারীকে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায়
বোঝাও না যায়।
তার সে পসরা
কিছুতেই যায় না গোপন করা।

–[নির্মম যৌবন]

এ প্রকৃতির নিয়ম, মানবের আজন্ম ধর্ম। 'দেবযানীর স্মরণে কচ' কবিতার মাধ্যমে বহু জায়গায় কবি এ প্রেম, তার সুখকর তৃপ্তিদায়ক বিরহকে উপভোগ করেছেন। কবি তাঁর প্রেয়সীকে উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির সর্বত্র—হ্রদের ধারে, পাহাড় বন শহর, সাগরতীরে সব জায়গাতেই সেই একজন কবির অনুরাধা :

দাঁড়িয়েছি এক সাগর-তীরে
    বেলাবেলি,
রজস্বল জগৎ এসে
    সেথায় করে জল কেলি
নরম দিন উদার জল
    রৌদ্র মাথা,
কাছের ভিড়ে পটের মতো
    দেখছি আঁকা
সোনালি চুল নীলাভ চোখ
    বিরাম, সুখ, নিটোল দুটি
সম্ভোগের আঁচল ধরা অবসাদের
    কঠিন মুঠি।
মুগ্ধ আমি;– তবুও মন
    হঠাৎ ভাবে
উঠবে যখন যবনিকা
    নটেশ্বরীর আবির্ভাবে
    এবং বলে, 'বাধা'
ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে আমার অনুরাধা।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাস্তববাদী কবি বোঝেন, উপলব্ধি করেন জীবনটা স্বপ্ন নয়। কারণ :

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী
জানি সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো;
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত আমাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

–[প্রেমিক]

কিন্তু সব জেনেও তো ভালোবাসা বিমুখ হয় না। জানেন বলেই কবির ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাবার অধিকার আরও বেড়ে যায়। কবি জানেন তাঁর সৌন্দর্য তাঁর প্রিয়ার প্রেম আর তাঁর আত্মলীনতা। প্রিয়া নিঃস্ব হয়ে দিয়েছেন বলেই তো কবি আজ ধনী রূপবান। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রিয়ার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন :

পনেরো বছর ধরে তিলে তিলে শোষণ করেছো আমাকে
আমার দেহ, মন, প্রাণ আমার সত্তার সার আমার আত্মার নির্যাস
সেটাই তোমার ভালোবাসা তোমার প্রেম।
আমি লীন হয়ে গেছি তোমার মধ্যে, পেতে দিয়েছি তোমার পায়ের
তলায় আমার অস্তিত্ব
আর তারই নাম তুমি দিয়েছো আমার প্রেম।

–[কবির স্ত্রী]

এর বিপরীতে কবি স্মরণ করেছেন নিজের মধ্য-তিরিশকে:

যৌবন রাজ্যের সীমান্ত আমরা পেরিয়ে এলাম,
এবার যাত্রা হবে বার্ধক্যভূমির দিকে।'
প্রহরী বললে 'এখন থেকে কঠিন পথ সামনে গাড়ি উঠবে পাহাড়ে,
মালের বোঝা কমানো চাই।'

বাঙালির জন্যে উত্তর তিরিশই কবির কাছে প্রৌঢ়ত্বের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। আমাদের জীবনেতিহাস একথাই বলে— "আর আমরা বুড়ো হয়ে যাই সেই জন্যেই তো, শুকিয়ে যাই, শেষ পর্যন্ত মরে যাই— কখনো ভালো করে না- বেঁচেই। জমে ওঠা সময় সম্বন্ধে আমাদের একটা শ্রদ্ধার কুসংস্কার; বার্ধক্যের প্রতি সম্মানটাই ধরো না, সত্যি, বলো, বৃদ্ধকে সম্মান কেন করবো? বার্ধক্য ব্যাপারটাতেই কি মহৎ কিছু আছে? এদিকে আমরা তো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি যে বার্ধক্য মানে মূঢ়তা, অন্ধ, মূঢ় গোঁয়ার্তুমি; বার্ধক্য মানে বিলোল, শক্তিহীন লালসা : বার্ধক্য মানে লোভ, স্থূল আত্মসর্বস্বতা; বার্ধক্য মানে পচা ডোবার দুর্গন্ধ। এই বার্ধক্যকে কি আমাদের শ্রদ্ধা করতেই হবে যেহেতু কয়েকটা বেশি বছর সেখানে জমেছে।"— একদা তুমি প্রিয়ে]। বার্ধক্য সম্পর্কে, অন্ধ অতীত সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর একটি স্পষ্ট বাস্তব ধারণা ছিল।

ছিল বলেই তিরিশোত্তরের *কল্লোল যুগ* রচিত হতে পেরেছিল। পেরেছিল 'কবিতা'কে অবলম্বন করে এক ভিন্নপথধর্মী কাব্য জগতের সৃষ্টি।

কবি চিরকালই তারুণ্যের ও যৌবনের পূজারী। বার্ধক্যের জড়তাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। বুদ্ধদেবও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর সর্বশেষ লেখার ভেতরেও তিনি বাংলা সাহিত্যের এককালের যৌবনের প্রতিভা প্রমথ চৌধুরীর বৃদ্ধ অবস্থার বর্ণনা করেছেন, মনে শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর ওই অবস্থার জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বুদ্ধদেবকে বার্ধক্যের জড়তার শিকার হতে হয়নি। তাঁর প্রৌঢ়ত্বকে তিনি যৌবনের শক্তি নিয়েই পরিচালিত করতে পেরেছেন।

কাব্যজগতে বুদ্ধদেব যে জীবনকে চিনেছিলেন তা তাঁর যুগের নবলব্ধ জ্ঞানও তার প্রকাশ। সকল অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের সচেতন জিজ্ঞাসা। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথও প্রশ্ন রেখে গেছেন। বুদ্ধদেব 'কেন'র উত্তর চেয়েছেন :

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি–
অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
হাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি
আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন, কেন?
ব্যর্থ করে ক্রোধের তৃপ্তির জন্য? প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ? বিফল অহমিকার কুটিল চাতুরী?
না কি শুধু অন্য কিছু নেই বলে— এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকো? — কেন, বলো? এই প্রশ্ন মনে হয়— মৌলিক জরুরি

–[কেন?]

সুতরাং জীবন কি? কি তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য? কেন এই ব্যর্থতা? কবি তাঁর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সুন্দরের এই অসহায় অভিশাপকে এ অনুভূতি শুধু জগৎ সম্পর্কে নয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কেও সত্য। কি আমরা চাই জানি না। বারবার জীবনের আরাধ্যকে হারাই, পরিবর্তন করি, ব্যর্থতায় জর্জরিত হই :

যে-ভয় জীবন ফণিমনসার বন,
যে ভয়ে নিত্য মেপে চলি মহাজন,
যে ভয়ে কখনো গান্ধীর কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছা পূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে মরণ,
যে ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলই জীবনধারাণ,
জীবিকাই, হয়, জীবন। আজ
সে-ভয় ভোলো।

–[ম্যাল্ -এ]

নিত্যদিনের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের মোহে আমাদের চিত্তচঞ্চল। ফল সুন্দরের সাধনায় ব্যর্থতা। সর্বদাই পাবার সাধনা তাই তো হারাবার ভয়। তুচ্ছ বস্তুমোহ স্বর্ণ তৃষ্ণা আমাদের মহৎ জীবন থেকে, সত্যোপলব্ধি থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। প্রকৃতি

সহজ উদার অনন্ত সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অনেক সময় এ সত্যকে উপলব্ধি করি। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য আমাদের কাছে জীবনের এ বার্তা বহন করে আনে। নিজের তুচ্ছতাকে ভ্রান্তিকে আমরা উপলব্ধি করি, আবিষ্কার করি। সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পী কবিও তাই করেছেন। প্রত্যহের জীবনের চাপে আমরা স্বীয় সত্তাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হই। কবি আত্মচিন্তায় প্রার্থনা জানিয়েছেন :

যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বুর বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু; তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা বলে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।
–[প্রত্যহের ভার]

এ জীবন মহৎ শিল্পীর, দার্শনিকের, ঋষির, জীবনজয়ী মহামানবের। প্রত্যহের জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে এঁরা মুক্ত। এ জীবনের এ মহান সুখে সার্থকতম পুরুষ মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে 'নোয়াখালী' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন : 'কোথায় তাঁর পথের শেষ জানে না, কখনো ফিরবেন কি না তাও জানেন না। ...কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে বলে? চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন বলে? ওসব কথা কিছু বলতে হয় বলেই বলা : ওসব কিছু না। আসল কথা স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতোদিনে; সেই স্বর্গ নয় যা দিয়ে রাজনৈতিক রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে না-করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি বুদ্ধের মাতৃজঠর; সেই স্বর্গ যা ছাড়া আর স্বর্গ নেই, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ কেউ যার একটুমাত্র আভাস মাঝে মাঝে হয়ত পায়, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ রচনা করে সম্পূর্ণ ধারণ করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আছেন পৃথিবীতে, খুবই কম; আর তেমনি এক জনকে আজ আমরা চোখের ওপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালীর জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও নোয়াখালী; পৃথিবী, প্রমাণ কর।'

মহৎ মানুষ পৃথিবীকে প্রণাম জানায়। যেমন কবিগুরু জানিয়েছেন শেষ প্রণাম পৃথিবীতে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে। পৃথিবী বধির, অন্ধ প্রাণহীন নয়। মহামানবকে সেও প্রণতি জানায় তার অগণিত সন্তানের প্রার্থনার মাধ্যমে।

বিগত মহাযুদ্ধের জীবন বুদ্ধদেবকে নবদৃষ্টি নবসৃষ্টির প্রেরণা দান করেছিল। তিনি দেখেছিলেন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির নামে মানুষ জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে কিভাবে সৃষ্টি নাশ করে চলেছে। দুর্বলের ওপর সবলের আঘাত, অত্যাচার, লাঞ্ছনাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ভারত বহু বছর ধরে শোষিত হয়েছে, ইংরেজের কাছে গণিকাবৃত্তি করেছে, নিজের সর্বস্ব খুইয়ে সে প্রভুর সেবা করেছে। তবুও মন পায়নি।

হৃতসর্বস্ব ভারতকে ফেলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দল সেদিন ঝুঁকেছিল আফ্রিকার প্রতি। যেখানে সম্পদ আছে, আছে লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার। বুদ্ধদেব এ সত্য উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথ সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব অনাগত ভবিষ্যতের মুক্তির

বাণী উচ্চারণ করলেন। আজ তাঁর বাণী সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মানব মুক্তি আজ পথ খুঁজে পেয়েছে ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার গভীর অরণ্যে :

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিক বৃত্তির নিহিত মৃত্যুর পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
হে আফ্রিকা, হে গণিকা মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ঘ বিষুব রেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি নবজন্ম কাঁপে থরো থরো
জয়ধ্বনি কর।

–[ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা]

এই বিচিত্র-গামিনী চিন্তার আবর্তে বুদ্ধদেব আবর্তিত হয়েছেন। আনন্দ খুঁজেছেন, তৃপ্তি খুঁজেছেন। প্রকৃতির রূপমাধুরী আকণ্ঠ পান করেছেন, মহাজনের বাণীকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে জ্ঞানসাধনাকে জীবনসাধনায় পরিণতি দান করেছেন। হঠাৎ করেই কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। লেখার ভেতর, নব নব সৃষ্টির আনন্দে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেয়ায় শেষ হল না আমাদের প্রসারিত কর, অঞ্জলি বদ্ধ হল, যা পেয়েছি সেই কৃতজ্ঞতায় প্রণাম জানাচ্ছে তাঁর ভক্ত সাহিত্যিকবৃন্দ।

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজাই এ পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই 'কোনো মৃতার প্রতি' বুদ্ধদেবের উচ্চারিত কবিতার মাধ্যমেই আমরা তাঁকে স্মরণ করছি :

'ভুলিবো না'— এত বড় স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে পত্রে, ঋতু রঙ্গে, জলে স্থলে আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে— তুমি ছিলে তবু তুমি ছিলে।

আমরা বলতে চাই 'তুমি শুধু ছিলে নয়' তুমি আছ, তুমি থাকবে। এ তোমার ভক্ত পাঠকের স্পর্ধিত বাক্য শুধু নয়, হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের মনোভূমিতে তুমি সত্য, সুন্দর, উজ্জ্বল, অক্ষয়।

'কবিতা'র কথা

প্রবুদ্ধ বাগচী

ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। একশ বছর আগে যে প্রতিভাধর মানুষটি এই বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, সম্পাদক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে গেলে আজকে আমাদের সামনে হাজির আছে শুধুমাত্র তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া কিছু স্মৃতিকথন, বুদ্ধদেব বসুর দুয়েকটি আত্মজৈবনিক রচনা আর তাঁর এক প্রামাণ্য জীবনী। বুদ্ধদেব বসুকে ঘিরে যাঁরা একসময় বেড়ে উঠেছেন স্মৃতিচর্চা করেছেন মূলত তাঁরাই, সাধারণত এসব লেখায় ব্যক্তির খুব একটা নির্মোহ বিচার হয় না। জীবনীকাররাও সবসময়ে যে খুব নিরপেক্ষ থাকতে পারেন এমন নয়। আজকে আমরা বুদ্ধদেব বসুর জীবনকে যেহেতু এইসব তথ্যের দর্পণেই দেখব, তাই এসবের সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদক জীবন যেহেতু তার মূল জীবনেরই অন্তর্গত ফলে আলোচনার প্রামাণ্যতা নিয়ে ঝুঁকি থেকেই গেল, সৎ পাঠককে এটা জানিয়ে রাখা ভাল।

এবার একটা অন্য প্রসঙ্গ। আমার নিজের এই কথাটা বার বারই মনে হয়, বাংলাভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ব্যাপারটার সঙ্গে উনবিংশ শতকের নবজাগরণসঞ্জাত আধুনিকতার একটা যোগাযোগ আছে। এরই জের টেনে বলতে চাইব, সেই উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ছোটখাট উদ্যোগে (বেশিটাই ব্যক্তি-উদ্যোগে) যে সব সাহিত্যপত্র বা সাময়িকপত্র প্রকাশ হয়ে আসছে তার মধ্যে যত বর্ণময় বৈচিত্র্যই থাক না কেন, শেষ বিচারে এইসব পত্রপত্রিকা আসলে এডিটর্স মিডিয়া (editors media)। অর্থাৎ সম্পাদকের মেধা-প্রতিভা-মনন-দৃষ্টিভঙ্গি সবটাই ছাপ ফেলে পত্রিকার মেজাজে, বিষয়ে, রচনায়, প্রকাশনায়। বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাকে এইভাবে বুঝে নেওয়াই উচিত হবে।

অনেকেই জানেন বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৫ নাগাদ যখন 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশের তোড়জোড় করছেন বাংলাদেশে সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রের আদৌ কোনো অভাব নেই। অনেক নামী পত্রিকা তখন বেশ সাফল্যের সঙ্গে পাঠকদের মন জয় করেছে, তাদের প্রচার সংখ্যাও বেশ ভাল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী নিস্তরঙ্গ বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে একটি-দুটি সাহিত্যপত্রিকা নিয়মিত রাখার রেওয়াজ ছিল। বাড়ির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে-সব পত্রিকা মন দিয়ে আগ্রহ নিয়ে পড়তেন, এমনকি কেউ কেউ বৎসরান্তে এক বছরের সবকটি সংখ্যা বাঁধাই করে রেখে দিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের উজ্জ্বল ছাত্র এবং কবিতায় নিবেদিত-প্রাণ বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করেছিলেন এইসব জনপ্রিয় সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে কথাসাহিত্যের যেরকম কদর ও গুরুত্ব, কবিতার ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। নিতান্তই কোনো রচনার পাদপূরণের জন্য কবিতা ছেপে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে একটা প্রচ্ছন্ন তুচ্ছতার ইঙ্গিত। 'কল্লোল' পত্রিকা এই প্রবণতার বাইরে কবিতার একটা যোগ্য গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা করেছিল কিন্তু ১৯২৯-এর শেষের দিকে সেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। বুদ্ধদেব তখন একুশ বছরের ঝলমলে যুবক শুধু নন, বছর দুয়েক 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা তাঁর ভাঁড়ারে। আর, 'প্রগতি' পত্রিকার শেষ সংখ্যাটিও প্রকাশ হয় ওই একই বছরে। সুতরাং কবিতা নিয়ে সুসম্পাদিত এক পত্রিকা প্রকাশের ভাবনার সলতে পাকানোটা তৈরি হয়েছিল এই সময়ের থেমে-যাওয়া উদ্যোগগুলিরই মধ্য দিয়ে, এরকম ভেবে নিতে তেমন কোনো অসুবিধে নেই। এর অল্প পরেই 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে বুদ্ধদেবের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। প্রবন্ধপ্রধান পত্রিকা হলেও কবিতা সেখানে মর্যাদাসহ প্রকাশ করা হত। 'পরিচয়' পত্রিকার আড্ডাতেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে বুদ্ধদেব দেখেন ইংরেজি ভাষার 'পোয়েট্রি' পত্রিকার একটি কপি যা তাঁকে মুগ্ধ করে শুধু নয়, তাঁর পুরনো স্বপ্নটাকেও খানিক উসকে দেয়। ১৯৩২-এর মাঝামাঝি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর মতান্তর ঘটায় তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। ১৯৩৫-এর অক্টোবর নাগাদ প্রকাশ পায় 'কবিতা' পত্রিকা। শুধুই একটা পত্রিকা নয়, একটা স্বপ্ন; আর আজকে তা ইতিহাসের অন্তর্গত।

এই সূত্রে একটু মনে করে নেওয়া দরকার, বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রঘরানা-পরবর্তী আধুনিকতার সূত্রপাতের পেছনে যেমন সক্রিয় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব, তেমনই বাংলা কবিতার সম্ভ্রান্ততম কবিতাপত্রের প্রকাশনার পেছনেও একটা প্রভাব থেকে গেল ইউরোপীয় এক ইংরেজি কবিতাপত্রের। এটা তথ্য হিসেবেই স্মরণে রাখা দরকার, ভালো-কি-মন্দ সেসব বিচারে গিয়ে লাভ নেই।

২.

কিন্তু কেমন হল সেই 'কবিতা' পত্রিকার চেহারা?

আগেই বলার চেষ্টা করেছি সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব ভাবনা ও স্বপ্ন ডানা মেলবে এই পত্রিকার মধ্যবর্তিতায়। তিনি একান্তভাবেই চেয়েছিলেন 'এমন কোনো পত্রিকা' 'যার মধ্য দিয়ে কবিতা হতে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত ও রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর'– 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটিই এই ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। শুধু কিছু সুনির্বাচিত কবিতার আয়োজনে একটি পত্রিকা এর আগে এমনভাবে কেউ দেখেন নি। সত্যিই যে দেখেন নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পত্রিকা স্টলে দেওয়ার পরেই চাহিদা হল আরো পত্রিকার। অনেকে সাগ্রহে গ্রাহক হতে চাইলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লিখে পাঠালেন- ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নুতন পরিচয় স্থাপন করেছে' —যে রবীন্দ্রনাথ এর আগে 'প্রগতি' বা 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবিদের কিছুটা অপছন্দের চোখেই দেখতেন। তাঁর কাছ থেকে এই মূল্যায়ন আলাদা করে মনে রাখতে হবে এবং এ-ও মনে করে নিতে হবে যে শুধু এক দীর্ঘ পত্রে 'কবিতা' পত্রিকা বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত মতামত জানিয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি, পরে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কবিতাও । এরপর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন ঠিকই, কিন্তু সম্পাদক বুদ্ধদেবকে অস্বীকার করে নিছকই ব্যক্তিগত সখ্যের সূত্রে তিনি 'কবিতা'য় লেখা দিয়েছেন— এটা ভেবে নেওয়া সঠিক নয়।

কবিতাকে বিশেষ গুরুত্বে রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর করার যে অভিপ্রায় ছিল বুদ্ধদেবের, তার একটা অন্য প্রান্ত ছিল ভালো কবিকে এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত করা। একজন সৎ কবিতাপত্রের সম্পাদকের যে এইটাই প্রধান কাজ সেটা

বুদ্ধদেব বসুকে না দেখলে আমরা বুঝতেই পারতাম না। আজ এত বছর পরে সকলেই যাঁকে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রধান কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেই জীবনানন্দ দাশ সত্যি সত্যিই আবিষ্কৃত হয়েছিলেন সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর হাতে। 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দর কবিতা ছাপা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরিণততর জীবনানন্দ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায়। 'কবিতা' পত্রিকার তরুণ সম্পাদক বুদ্ধদেব অগ্রজ জীবনানন্দকে বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিত না করালে বাংলা কবিতার ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হত। অশোক মিত্র সম্প্রতি এক আত্মকথনে জানিয়েছেন, 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' পড়ে তিনি আধুনিক কবিতার নতুন রকম স্বাদ পান যা তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে আছে। অশোক মিত্র যখন 'কবিতা' পত্রিকা হতে পান তখন এই পত্রিকার বয়স চার-পাঁচ বছর হয়ে গেছে কিন্তু গুরুত্বের বিচারে পুরনো সংখ্যাগুলিও এককেটি স্বর্ণখনির মতোই উজ্জ্বল। এই কৃতিত্বটা সম্পাদকের ওপরই বর্তায়। এমনকী, অনেকে এই তথ্যটি বোধহয় জানেন না, 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার পর যাঁরা গ্রাহক হন তাঁদের অনেকেই ছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে রাজবন্দি। রাজবন্দি হিসেবে তাঁদের সরকারিভাবে একটা ভাতা দেওয়া হত, সে-ই অর্থে তাঁরা 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক হয়ে তা নিয়মিত পড়তেন।

শুধু জীবনানন্দ দাশই নন, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতার পাঠকের সামনে হাজির করেছিলেন আরো এক সম্ভাবনাময় তরুণ কবিকে, যিনি পরে বাংলা কবিতাকে অন্য এক সমৃদ্ধির প্রান্তে নিয়ে আসেন। তিনি 'পদাতিক' সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮ নাগাদ 'কবিতা' পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেবের খাঁটি জহুরির চোখ এই প্রতিভাবান কবিকে চিনতে ভুল করেনি, বছর দুয়েক বাদে তাঁরই উদ্যোগে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হল 'পদাতিক'। বুদ্ধদেব এক কপি বই পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে, সঙ্গে লিখেলেন : 'আমি নিজে সুভাষের কবিতার বিশেষ অনুরাগী, এত অল্প বয়সে এতখানি শক্তির প্রকাশ আমার তো বিস্ময়কর মনে হয়।'

একই ঘটনা ঘটেছে বুদ্ধদেবের আরেক অনুজ ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ সমর সেনের ক্ষেত্রে। সম্ভবত সমর সেনই বাংলা ভাষার একমাত্র কবি যিনি কেবলমাত্র 'কবিতা' পত্রিকাতেই লিখেছেন। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীকেও তিনি সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। এই কথাটা বলার দরকার হল, কারণ, বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক হলেও একই সঙ্গে তিনি নিজেও ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ কবি। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়, কবি-সম্পাদক নিজের সমকালীন কবিদের প্রচার-প্রসার তেমন একটা পছন্দ করেন না পাছে তাঁর নিজের গুরুত্ব কমে যায়— এমন এক অবয়বহীন আশঙ্কায়। সুখের কথা, হাল আমলের বাংলা কাব্যজগতের এই ঈর্ষাগ্রস্ততার কদর্য ভাইরাস গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে অন্তত বুদ্ধদেবের মতো সম্পাদককে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে নি। বরং বুদ্ধদেব বসু অকপটে জানাতে পারেন :

> "সাহিত্য আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পারি না। তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ করে থাকি যাকে চলিত বাংলায় বলে 'বনের মোষ তাড়ানো'। আমার এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেল 'কবিতা' বেরোবার পর, কেননা তখনই একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা,

> দেখা দিচ্ছেন বা প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণতি— বাংলাভাষায় কবিতা লেখার কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশাপূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি আন্দোলন, যার মুখপত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা।... আমার কৃতিত্ব হয়তো এটুকু যে উৎসাহের ঝোঁকে দু-এক বার ভুল করে থাকলেও মোটের উপর আমি ঠিক ঠিক ঘোড়াগুলিকেই ধরেছিলাম।"

আজকের এই রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশে যখন দেখি শয়ে শয়ে কবিরা একটা করে পত্রিকা প্রকাশ করে নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন অথবা অন্যদের দিয়ে পেটানোর ব্যবস্থা করছেন কিংবা ক্ষমতাবান কবি-সম্পাদকরা নিজের আসনটিকে মহত্ত্বদানের জন্য সমকালীনদের দূরে রাখছেন আর অনুজ কবিদের দাক্ষিণ্যবিলোনো স্তাবকে নামিয়ে আনছেন তখন সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর ওই অমল কবুলতির সামনে আমার অন্তত বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে সাধ হয়। মনে মনে ভেবে নিয়ে স্নিগ্ধ হই এমন এক সম্পাদকের ছবি যিনি নিবিষ্ট হয়ে খুঁজে চলেছেন কবিতার মণিমুক্তো আর সসম্মানে তাদের বিন্যস্ত করছেন 'কবিতা'র পাতায়। আজকের বেরঙিন সময়ে এর কোনো বিকল্প দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেন 'বনের মোষ তাড়ানো', কারোর মনে হতে পারে তার মধ্যে একটা অভিসন্ধির তির্যক ছায়া আছে। বিশেষ করে, আমরা যাঁরা প্রায়ই দেখি বিশেষ কোনো কবিকে যখন হঠাৎ করে প্রচারের আলোয় তুলে ধরা হয় তখন আসলে তার অন্তরালে থাকে একরকম প্রোমোটিং-এর বাণিজ্যিক ছক। যে প্রোমোটিং এরপরের ধাপে এসে তাঁকে বা তাঁদের ঘিরে তৈরি করতে থাকে একরকম মিথ, আমাদের গুরুবাদী দেশে যেটা পাবলিক বেশ খায়। কারণ এই তুরীয় প্রচারে ভেসে এরপর তাঁর অপ্রকৃষ্ট রচনাও দিব্যি বিকিয়ে যায় শুধু নামের জোরে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথও একসময় এই 'গুরুদেব' নামক মিথের আড়ালে ঢাকা পড়েছিলেন। ইদানীংকালে জীবনানন্দ নিয়েও একটি বাণিজ্যচক্র প্রবল। বাকিদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকা ঘিরে বুদ্ধদেবের এমন কোনো অভিসন্ধিময় আয়োজন আদৌ ছিল না। আর কী আশ্চর্য, কবির কবিতা বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে বুদ্ধদেবের বক্তব্যই এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। যে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে তিনি ১৯২৭-২৮ সাল থেকে ('প্রগতি' সম্পাদনার সময়কাল) অজস্র লিখে আসছেন, বারবার তাঁর কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, সেই জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা সূত্রে ১৯৪৪-এ 'কবিতা'র পাতায় লিখলেন :

> ...জীবনানন্দ আরো সাম্প্রতিক কবিতায় তিনি অফুরন্তভাবে নিজের পুনরুক্তি করে যাচ্ছেন। পুনরুক্তি মাত্রেই দোষের নয়— রবীন্দ্রনাথ পুনরুক্তির সম্রাট, কিন্তু তাঁর প্রতিটি পুনরুক্তি একটি নূতন সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য সেগুলি পুনরুক্তি বলে মনেই হয় না। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তা হয়নি; 'মহাপৃথিবী'র শেষের দিকে যেসব কবিতা আছে সেগুলি যেন কতকগুলি বাঁধাধরা বাক্যের বিচিত্র ও অদ্ভুত সংস্থাপন মাত্র, বাক্যগুলি সুন্দর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। একে পুনরুক্তি না বলে নিজের অনুকৃতি বলতে হয় এবং কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আরও দু'বছর পর ১৯৪৬-এ তিনি 'কবিতা' পত্রিকার দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে তুলে আনছেন জীবনানন্দকে ঘিরে তাঁর সুতীব্র আশাভঙ্গের সুর— "তাঁর প্রতিশ্রুত

ভক্তের চক্রেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ বলে আপত্তি নয়; নিঃসুর বলে আপত্তি, নিঃসাড় বলে।” বলেছেন : ‘হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন।’

‘কবিতা’ পত্রের সম্পাদক হিসেবে এই বলিষ্ঠ নির্মোহ আচরণ চিনিয়ে দেয় আসলে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন প্রকৃত কবিতার নিবেদিত আবিষ্কারক, কবিদের প্রোমোটার নন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি একসময় আবিষ্কারক ও প্রচারকের সদর্থক ভূমিকা নিলেও পরের দিকে রাজনীতির দলীয় আবর্তে জড়িয়ে পড়ে সুভাষ কাব্যপ্রতিভার অপচয় করছেন বলেই সোচ্চারে জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই এক স্মৃতিচারণে কৌতুকচ্ছলে লিখছেন : “...আমার নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প তাঁর মধ্যে সংক্রামিত করতে পেরেছি মনে করে খুশি হয়ে ফিরে আসি। কিছুদিন পরে গিয়ে দেখি আমার সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ...উল্টে আমাকেই কিনা বলেন, পার্টির খপ্পরে পড়ে লেখা নষ্ট করছি।”

তাহলে একজন সম্পাদককে এতটাই সংবেদী ও ওজনদার হতে হয়! প্রয়োজনে যিনি ভাল কবিতাকে বরণ করে নেবেন যোগ্য গুরুত্বে, আবার কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া কবির বিচারেও তিনি একইরকম খোলা মন নিয়ে যাচাই করবেন তাঁর কবিপ্রতিভা। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পাদকীয় ঋজুতা ও কর্তৃত্বের আরও দুটি দৃষ্টান্ত মনে করে নেওয়া দরকার। একটি কাজী নজরুলকে ঘিরে, অন্যটি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে।

কাজী নজরুলকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত মুগ্ধতা অনেকদিনের। এই ভাললাগা থেকেই হোক বা অন্য যেকোনও ভাবনা থেকেই হোক ১৯৪৫-এ ‘কবিতা’ পত্রিকার বিশেষ নজরুল-সংখ্যা প্রকাশ হয়। সেখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব নজরুলের কবিতা মূল্যায়ন করেন। এই লেখায় বুদ্ধদেব স্বীকার করে নেন ‘বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর সবচেয়ে বড় কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের’, কিন্তু একইভাবে তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেন না—

> “পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একইরকম। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা-প্রদীপে ধীশক্তির শুভ্রশিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হতে পারেনি কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপলোক থেকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেনি।”

স্মরণ করা দরকার, যে-সময়ে এই বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তখন কিন্তু নজরুল এক কিংবদন্তী প্রতিভা হিসেবে সবদিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদক বুদ্ধদেবের লেখনীর ওপর এই সবের প্রভাব পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। পাশাপাশি তুলনা এসেই যায়। আজকাল বহু রকমের কবিতা পত্রিকায় অজস্র আধাকবির জন্য বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের চল হয়েছে— সেখানে দেখতে পাই শুধুই পছন্দের আলোচককে দিয়ে মন ভোলানো কথার ফরমায়েসি গদ্যের আয়োজন। সম্পাদক বুদ্ধদেব, আজ জীবিত থাকলে, নিশ্চিত আড়ষ্ট হয়ে যেতেন এ-সবের সামনে দাঁড়িয়ে।

কেননা, ১৯৪৭-এ সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন বামপন্থী মহলে উঠতি শ্রেণীচেতনার কবি হিসেবে বেশ পরিচিত হয়ে উঠতে উঠতেই হঠাৎ প্রয়াত হলেন, বুদ্ধদেব তাঁকে স্মরণ করেছিলেন ‘কবিতা’র পাতায়। ‘কবিতা’য় তার আগে সুকান্তর দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে, কবিতার জাত-জহুরী হিসেবে অনুজের প্রতি সেই স্মরণভাষ্য ছিল বুদ্ধদেব বসুর এক মনে রাখার মতো প্রতিবেদন। বুদ্ধদেব লিখেছেন :

> "সুকান্তকে আমি ভালবেসেছিলাম, যেমন করে প্রৌঢ় কবি তরুণ কবিকে ভালবাসে; দূর থেকে লক্ষ্য করেছি তাকে, সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে। আর ভালো লাইন সে মাঝে মাঝেই লিখেছে; ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট করেই বলে।... মনে মনে আমি তাকে মার্কা দিয়ে রেখেছিলুম জাত-কবিদের কেলাশে; উঁচু পর্দায় আশা বেঁধেছিলুম তাকে নিয়ে।"

কিন্তু একই সঙ্গে তিনি চিঠি লিখে সতর্ক করেছিলেন সুকান্তকে— 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি' আর ওই সুকান্ত ভট্টাচার্য-র প্রয়াণ-উত্তর সম্পাদকীয়তেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : "কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, শক্তিশালী কবিরও কীরকম অপমৃত্যু ঘটে, তারই উদাহরণ সুকান্ত।... কবির কায়িক মৃত্যু যত দুঃখের, তার মানসিক পক্ষাঘাত কি তার চেয়ে কম?"

আমার বারবারই মনে হয় এই সাবজেকটিভ বিশ্লেষণ একজন যথার্থ সম্পাদকের কাজ। বাংলা কবিতাপত্রগুলির পরবর্তীকালের ধামাধরা সম্পাদকদের বেশিরভাগই যে-কাজটা আদৌ করে উঠতে পারেননি, করতে পারলে আজ একশ বছর পরে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতেন।

'কবিতা' পত্রিকার ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে (১৯৩৫-১৯৬১) সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেবের যে ভূমিকা তার মূল্যায়ন করতে গেলে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা আমাদের স্মরণ করে নিতে হবে। এর প্রতিটির অনুষঙ্গেই আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবেন এমন এক মনীষা যাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের কোনও জড়তা থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

মূলগতভাবে বাংলা কবিতার একটা রুচিশীল পরিচ্ছন্ন স্বভূমি তৈরির অভিপ্রায় থেকেই 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা হয়েছিল। বছর দশেকের মধ্যেই কিন্তু সম্পাদক বুঝতে পেরেছিলেন ভালো কবিতার একটা অনুভব করা যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৪৬-এ সংশয়ী বুদ্ধদেব সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন : "... প্রথম পাঁচ-ছ বছর আমরা যে পরিমাণে ভালো কবিতা পরিবেশন করতে পেরেছি, যে-অনুপাতে আশাপ্রদ ও অজ্ঞাত নবীনদের পাদপ্রদীপের সামনে আনতে পেরেছি, এখনও কি তা-ই পারছি?" যে কোনো পত্রিকার পক্ষে এটা একটা বড় সমস্যার কথা, আর, পত্রিকা নিয়ে পথ চলতে চলতেই এই সংকটটা টের পাওয়া যায়। আর, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সময়োচিত বাঁক বদলের। স্বাভাবিকভাবে সঠিক সময়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তটুকু নেওয়ার ভার থাকে সম্পাদকের ওপরই। বুদ্ধদেব বসুও মনে মনে ভাবছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার চরিত্রবদলের। কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি কবিতাবিষয়ক নিবন্ধ, আলোচনা প্রকাশ করে পাঠককে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ দেওয়ার প্রকল্পটি তাঁরই দূরদর্শিতার অভিজ্ঞান। এর অল্প আগে অবশ্য 'কবিতা' পত্রিকার উদ্যোগে দুটি অন্য রকমের কাজ করা হয়, সম্ভবত যেগুলির মধ্য দিয়ে 'কবিতা' তার ভাবনা ও চলাচলের পরিসর প্রশস্ততর করতে চেয়েছে। একটা হল, নজরুলের রেকর্ড করা ১৮০০ গানের তালিকা প্রণয়ন— ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'কবিতা'র পর-পর দুটি সংখ্যায় এই তালিকা ছাপা হয়, যা নজরুলের গানকে নথিবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা বলেই মনে করা হয়। এর পরের বছর প্রকাশ হয় 'কবিতা'র বিশেষ নজরুল সংখ্যা।

'কবিতা'র চরিত্র বদলের লক্ষ্যে অবশ্য তেমন যোগ্য সমর্থন পেলেন না বুদ্ধদেব বসু, এত কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-আলোচনা লিখবেন কারা? এক্ষেত্রে সম্পাদক বুদ্ধদেবের একমাত্র সহায় হলেন গদ্যশিল্পী বুদ্ধদেব। একের পর এক অনবদ্য রচনায়

সমৃদ্ধ হল 'কবিতা'—একজন সার্থক গদ্যকারের প্রতিভা মিশে গিয়ে পূর্ণ করে তুলল এক যোগ্য সম্পাদককে।

এরপরে 'কবিতা'র আরেক রকম পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করল বিদেশী সাহিত্যকে পত্রিকার বিষয়ের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির একটি সুন্দর সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট'-এ যেটি লিখেছিলেন সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিবিড় পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলেও প্রথম দশ বছর 'কবিতা' পত্রিকায় এ নিয়ে কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না। একাদশ বর্ষ থেকে নতুন বিভাগ 'বিদেশি সাহিত্য' চালু হলেও একবছরের মধ্যে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুনভাবে এই বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল ১৯৪৮-৪৯ থেকে। শুরু হল 'কবিতা' পত্রিকার নতুন একটা পর্ব। এরপরে পত্রিকার পাতায় আলোচিত হবেন এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখরা, বুদ্ধদেব-সহ অনেকের হাতে অনূদিত হবেন বিদেশী কবিরা, প্রকাশ হবে মার্কিন কবিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, দ্বিভাষিক সংখ্যা। পাশাপাশি কথাসাহিত্যিকদের নিয়েও 'কবিতা' জানাবে তার মুগ্ধতার ভাষ্য— বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক লেখায় সম্পাদক জানান দেবেন 'কবিতা' সত্যিই বদলে নিচ্ছে নিজেকে। সময়ের দাবি মেনে এই পরিবর্তন, যার মধ্যে কোনও আপোষ নেই, যা আছে তা হল, একটা চেনা ছক ভেঙে ভেঙে বৈচিত্র্যের সন্ধান। এই বিবর্তন ছাড়া কোনও সাহিত্যপত্র বাঁচে কি?

একেবারে গোড়াতেই বলে রেখেছিলাম, ছোট সাহিত্যপত্র আসলে সম্পাদকের মাধ্যম। 'কবিতা' পত্রিকা ঘিরে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ছিল বরাবরই, ছিল প্রকাশনা সংক্রান্ত লোকবলের অভাব। ১৯৫৩-এ সম্পাদকের বিদেশযাত্রা এই উদ্যোগকে কিছুটা শ্লথ করল, যদিও প্রবাসে থেকেও তিনি যথাসাধ্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আস্তে আস্তে বুদ্ধদেব বসু জড়িয়ে পড়লেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। 'কবিতা' পত্রিকা এর পরেও বেরিয়েছে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই। ১৯৬১-এ পর থেকে পেশাগত জীবনের ব্যস্ততায় বুদ্ধদেবের জড়িয়ে পড়া, আবার বিদেশযাত্রার আমন্ত্রণ ক্রমশ সম্পাদক হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে আড়াল করে দিচ্ছিল, স্বভাবত ১৯৬১-র মার্চ-এপ্রিলে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল 'কবিতা'র, বুদ্ধদেব তখন বিদেশে।

এই প্রসঙ্গেই আরেকটি কথা ভেবে নেওয়ার দরকার। যে পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং একজন প্রতিভাবান লেখক তাঁর ক্ষেত্রে কখনও নিজের সাহিত্যজীবনের দাবি সম্পাদকীয় দাবির থেকে প্রবল হয়ে উঠলে সেই প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধদেব বসু ও 'কবিতা' পত্রিকার ক্ষেত্রে এমন পরিণতিই ছিল স্বাভাবিক। যদিও বুদ্ধদেব বসু এক সাক্ষাৎকারে পরে জানাচ্ছেন :

"স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবার বিদেশ যেতে হ'ল এবং সেই সময়েই 'কবিতা' এত অনিয়মিত হয়ে পড়ল যে, আমি ফিরে আসার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। পারলাম না বললে ঠিক হয় না, ইচ্ছে করলে পারতাম। আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে সরে গিয়েছিল। তার কারণ কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোও চলনসই রকমের ভালো কবিতা ও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে আসল কারণ বোধহয় এই যে, আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশি সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।"

সত্যি সত্যি ছাব্বিশ বছর বড় কম সময় নয়। বুদ্ধদেব যখন একথা বলছেন তখন তিনি তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ়, অথচ ছাব্বিশ বছরের সম্পাদক জীবনে তিনি যে অনবদ্য দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন এখনও তা বাংলা কবিতাপত্র সম্পাদনার এক আদর্শ প্রকরণ। আর, সম্পাদক বুদ্ধদেবকে খুঁজে দেখার শেষ অধ্যায়ে অন্য একটা তথ্য সামনে আনা প্রয়োজন। সেটা একটা ভারসাম্যের প্রশ্ন। 'কবিতা' পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশ হয় তখন বুদ্ধদেব সাতাশ বছরের উজ্জ্বল তরুণ, আর, 'কবিতা' যখন বন্ধ হল তখন তিনি তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ়– মাঝখানের আড়াই দশকে 'কবিতা'র পাশাপাশি কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-প্রাবন্ধিক-অনুবাদক বুদ্ধদেব পরিণত থেকে পরিণততর হয়েছেন। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি কখনও নিজের বিষয়ে কোনো রচনা প্রকাশ করেননি! একেবারে শেষ সংখ্যায় জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত নাকি এমন একটা চেষ্টা করেছিলেন। এই সংবাদে ক্ষুব্ধ বুদ্ধদেব জামাতাকে লেখেন–"খবরদার, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি, 'কবিতা'য় আমার বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ বেরোবে না, বড়ো জোর বুক রিভিউ পর্যন্ত মার্জনীয়।"

হয়তো এইটাই স্বাভাবিক সংযম। কিন্তু অধুনা বঙ্গভাষী কবি-সম্পাদকরা নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকায় যেভাবে সাতকাহন করে নিজেদের কথা ছাপেন, তাতে এই স্বাভাবিক 'বৌদ্ধিক' সংযম এক স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে আসে। সম্পাদক বুদ্ধদেবকে বুঝে নিতে গেলে এই তথ্যকে অবহেলা করা যাবে না।

একশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যখন আমরা বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন সব্যসাচী প্রতিভাকে পুনর্বিচার করতে বসি, আমার ধারণা, তার মধ্যে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবেই। কারণ কবি বুদ্ধদেব বসু যেমন ভাবে লিখেছেন তার গৌরব যতটাই হোক আজকের কবিরা হাজার চেষ্টা করলেও সেভাবে লিখতে পারবেন না, তেমনভাবে লেখার প্রয়োজনও নেই। কথাটা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস-গল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু সম্পাদনার ক্ষেত্রে সেটা প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে পারে এখনও। কবি বুদ্ধদেবকে আজ আর অনুসরণ করা যায় না কিন্তু সম্পাদক বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করা চলে, অনুকরণ করলেও তেমন একটা কিছু আসে যায় না।

এই একশ বছরে বাংলাভাষায় কবিতা-পত্রিকার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বিস্ফোরিত হয়েছে। কবিতা-লিখিয়ের সংখ্যা বেড়েছে কয়েকশ গুণ। সত্যি সত্যিই বুদ্ধদেবের সময়ের রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর পরিধিতে বাংলা কবিতা আর আটকে নেই— শহরতলি–মফস্বল-গ্রাম-গঞ্জে কবিতা লেখা হচ্ছে, কবিতার পত্রপত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু সে-সব পত্রিকার সম্পাদনার মান বেড়েছে কতটা? এই উদ্যত প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আজও আমাদের অস্বস্তি বেড়ে যায়।

অথচ কবিতার জাগতিক কদর তো বেড়েছে অনেক। কবিতা লিখে অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি-বিদেশভ্রমণ সবই এখন করা সম্ভব। এমনকি এখন আর কোনো পত্রিকায় পাদপূরণের তাচ্ছিল্যেও কবিতা প্রকাশ হয় না, বরং তাকে ভরিয়ে তোলা হয় শোভন অলঙ্করণে।

একদিক দিয়ে কবিতার রুচিশীল প্রসার চেয়েছিলেন সম্পাদক বুদ্ধদেব। মাঝখানের সাত দশকের সুদীর্ঘ সময়ে সেই প্রসার কোথাও কি কবিতা মাধ্যমটার সেই আকাঙ্ক্ষিত অন্তঃসারটুকু সরিয়ে নিতে চাইছে? এমনই কি একরকম মেদযুক্ত বৃদ্ধি চাইতেন বুদ্ধদেব, নাকি তিনি ভাবতেন এমন এক স্বপ্নিল ভূমিতল, যেখানে 'কবিতাই

প্রধান উপাদান ও আলোচ্য', 'কবিরা যেখানে স্বজাতিসঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন, বিরূপ, বিরুদ্ধ ও বিপরীত প্রতিযোগিতায় পীড়িত হবেন না'!

আশ্চর্য এটাই, রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কবিতাভবন থেকে একদিন এক স্বপ্ন দেখানো আরম্ভ হয়েছিল, যে স্বপ্নের আজও সমাপ্তি ঘটেনি–যদিও কবিতাভবন আজ ইতিহাস, 'কবিতা' পত্রিকাও তাই।

আরো আশ্চর্য, রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কবিতাভবন তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারত। হয়নি। বেশিরভাগ মানুষ ওই জায়গাটা চেনেন এক কংগ্রেস নেতার নামী বারোয়ারি পুজোর সূত্রে।

বুদ্ধদেব বসু হেরে গেলেন?

বাংলায় মহাভারত-চর্চা

প্রবোধচন্দ্র সেন

কবি ও মনীষী মাত্রেরই অন্তরে জেগে থাকে একটি অতৃপ্ত পিপাসা– সুদূরের পিপাসা। নিরন্তর বাজতে থাকে 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী', এই বাণী। বুদ্ধদেব বসু কবি। তাঁকে এই সুদূরের পিপাসা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে হাজির করেছে ভাবলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয়। তাঁর অনতিদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে তিনি যে প্রায়-অবিশ্বাস্য সুদীর্ঘ ও বিচিত্র গতিপথ অতিক্রমণ করেছেন, তার প্রগতি-পথের সহযাত্রীরা কেউ তা পারেননি। এই প্রগতি পথের আকর্ষণ যে তাঁকে প্রায় সমগ্র বিশ্ব ঘুরিয়ে অবশেষে তাঁর স্বদেশেই ফিরিয়ে আনবে, যাত্রারম্ভকালে তিনি নিজে বা আর কেউ তা ভাবতেও পারেন নি। তাঁর জীবনচক্রের আবর্তনে দেখা গেল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিণামে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন বিদেশ থেকে স্বদেশে, নিছক আধুনিকতা থেকে চিরন্তনতায়, রবীন্দ্রবিমুখতা থেকে রবীন্দ্রপ্রমুখতায়। তিনি একই সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন নিজেকে এবং নিজের মনোভূমি ভারতবর্ষকে। তাঁর কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়েছে মনস্বিতায়। যাঁরা তাঁর বিচিত্র-পথগামী সাহিত্যচর্যার পরিণতিরেখা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, বুদ্ধদেবের দিগন্তব্যাপ্ত জীবনপরিক্রমায় তাঁকে শেষ লক্ষ্যের সন্ধান দিয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার দিগদর্শিকা। এই দিগদর্শিকাই তাঁকে পরিভ্রমণের অন্তে অবতীর্ণ করেছে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। বুদ্ধদেবের এই ভারততীর্থ-পরিক্রমার পরিচয় পাই তাঁর সদ্যপ্রকাশিত *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে।[1] রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চিৎসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন "যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চিরনূতন, তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার চিত্ত মহাভারতের অধিবাসী– এই মহাভারতের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই।" রবীন্দ্রনাথ যে মহাভারতের অধিবাসী তার কালগত সীমানাও নেই, তাই সে ভারত 'যথার্থ পুরাতন' ও 'চিরনূতন'। বুদ্ধদেব ও তাঁর *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে 'পুরাণ' কথাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন, পুরাণ হচ্ছে সে সামগ্রী যা 'একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনূতন'। মহাভারতকেও তিনি এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। এই মনোভঙ্গির সমীচীনতা সম্পর্কে আশা করি মতভেদের কোনো সম্ভাবনা নেই। বাল্মীকি-রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– "রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে। ... ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন– "মহাভারতকেও আমি বিশেষত এইভাবে দেখি।" এই 'বিশেষত' কথার তাৎপর্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের তুলনায় মহাভারতেই ভারত-আত্মার প্রকাশ ঘটেছে পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর মহিমায়। বস্তুত এ-কথা নূতন নয়। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভাবতে', এই প্রবাদবাক্যও চিরন্তন। মহাভারতেও আছে এ-কথা যদি হাস্তি তদন্যত্র, যন্তেহাস্তি তন্ন কুত্রচিৎ।' তা রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে

প্রকৃত সমালোচনা। ... যথার্থ সমালোচনা পূজা– সমালোচক পূজারী পুরোহিত তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র। বুদ্ধদেবও অনুরূপ মনোভাব নিয়েই মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন,– পূজার না হক, শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে। তাই তিনি বলেছেন– সম্প্রতি আমি প্রবলভাবে অনুভব করছি যে, মহাভারত কোনো নান্দনিক সূত্রে বিচার্য নয়। তবে কোন সূত্রে বিচার্য? উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন– বস্তুত এই সংহিতাটিকে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করাই বাতুলতা। না, কোনো শিল্পকর্ম নয়, কিন্তু শিল্পকর্মের অনিঃশেষ উপাদান-ভাণ্ডার, সমগ্র গ্রিক-রোমক মিথলজির চেয়েও ঐশ্বর্যবান ও বিশালতর। অর্থাৎ ইউরোপীয় পুরাণসাহিত্যে যে পরিমাণ বস্তু ও মনীষিতা ও কল্পনাবিভা বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, ভারতবর্ষ যেন স্পর্ধিত ভাবে, তার নিজের ধরনে ঠিক ততোটাই সন্নিবিষ্ট করেছিলো– একটিমাত্র গ্রন্থনের মধ্যে একটি মাত্র শিরোনামার তলায়। সত্যই স্পর্ধিতভাবে 'যন্তেহাস্তি তন্ন কুত্রচিৎ', এই উক্তিতেই ফুটে উঠেছে সংহিতাকারের কুণ্ঠাহীন স্পর্ধা। মনে রাখতে হবে উদ্ধৃত মন্তব্যটি এমন এক ব্যক্তির, যাঁর কাছে পাশ্চাত্য মিথলজিসমুদ্র মন্থনোত্থিত রত্নরাজি ছিল সুপরিচিত। এ-রকম অভিজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে মহাভারতকে আর কেউ দেখেছেন কিন জানি না। এক স্বকীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়েই বুদ্ধদেব মহাভারতকে নূতন আলোতে প্রতিভাসিত করেছেন। ফলে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্র তাৎপর্যে সমৃদ্ধ ও নতুন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই যে নতুন ও সামগ্রিক দৃষ্টি, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে। মহাভারতকে বিশ্বভূমিকায় স্থাপন করে তার স্বরূপ নিরূপণের এই প্রচেষ্টা গ্রন্থখানিকে একটি বিস্ময়কর অপূর্বতায় মণ্ডিত করেছে। শুধু তাই নয়, তিনি ভারতবর্ষেরই অপর মহাগ্রন্থ রামায়ণের পটভূমিকায় স্থাপন করেও মহাভারতের বিশিষ্টতাকে নতুন করে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা পূর্বে, অন্তত এই পরিমাণে ও এই ভাবে আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। এটাও এই গ্রন্থখানির পক্ষে কম মর্যাদার কথা নয়।

মহাভারতে যা নেই, অন্য কোথাও তা নেই। এই উক্তির মানে ভারতবর্ষের সমস্ত চিত্তসম্পদই সংকলিত হয়েছে এই ভারতসংহিতায়। ফলে মহাভারতের কোনো অংশকেই প্রক্ষিপ্ত বা অনাবশ্যক বলে বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে এই মহাগ্রন্থকে খণ্ডিত করে দেখা হবে, ভারতীয় চিৎপ্রকৃতির পরিচয় থেকে যাবে অপূর্ণ। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। ওগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না।' বুদ্ধবেদেবের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ তাই তিনি বলেছেন– এই পঞ্চম বেদটির স্বরূপ ঠিক বুঝতে হলে একে খণ্ডিতভাবে দেখা চলবে না। কেন না তাঁর মতে— 'এও মনে রাখা চাই যে, মহাভারতে— এবং একমাত্র মহাভারতেই— ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলো চিন্তাধারার পদচিহ্ন প্রতীয়মান এবং এটি কোনো গোষ্ঠীগত গুহাবদ্ধ ধর্মপুস্তক নয়।' তাহলে মহাভারতকে কোন পর্যায়ভুক্ত করা যায়? মহাভারতের আদিপর্বে এই গ্রন্থকে কখনও বলা হয়েছে ইতিহাস, কখনও কাব্য, কখনও বা পুরাণ। কিন্তু বর্তমান মহাভারতকে তার লক্ষণবিচারে ও নির্দিষ্ট অর্থে এই তিন নামের কোনো নামেরই অভিহিত করা যায় না। কেন না, মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর লক্ষণই কিছু— না । কিছু বিদ্যমান, সব লক্ষণই বিমিশ্রিত বা সংলগ্ন। অর্থাৎ মহাভারত একাধারে ইতিহাস— কাব্য ও পুরাণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একে এপিক

পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু 'অন্য সব এপিকের তুলনায় মহাভারত অভিপ্রায়ে ভিন্ন, পদ্ধতিতে বা পদ্ধতির অভাবে ভিন্ন।' এ জন্যই বুদ্ধদেব বলেন— 'আবহমান বিশ্বসাহিত্যে মহাভারত এক তুলনাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে বিরাজমান।' এজন্যই প্রাচীনেরাও এই গ্রন্থকে বলেছেন 'ভারতসংহিতা', অর্থাৎ সমস্ত ভারতবিদ্যার সংগ্রহগ্রন্থ, আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় ভারতকোষ। মহাভারতেই বলা হয়েছে 'যথা সমুদ্রো ভগবান যথা হি হিমবান গিরিঃ। খ্যাতাবুভৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥' অর্থাৎ মহাভারত একমাত্র মহাসমুদ্র ও হিমালয় পর্বতের সঙ্গেই তুলনীয়, মহাসমুদ্র ও হিমালয়ের মতো মহাভারতও নানা রত্ন্যের আকর। কিন্তু সাগরে ও পর্বতে রত্ন আহরণ করতে হয় নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ও ভীষণতার মধ্য থেকে। বুদ্ধদেব তা অনুভব করেছেন। তাই তিনি বলেছেন 'যদি চাই এক বিশাল তরঙ্গোচ্ছল পুরাণস্রোতে অবগাহন করতে, আর [যদি] সেই জলের তলা থেকে মাঝে যেসব সুন্দর, ভীষণ, অদ্ভুত ও মনোমুগ্ধকর ভাবমূর্তি মুহূর্তের জন্য উত্থিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য কিয়দংশেও উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে যা-কিছু আমাদের হিসেবে বিসদৃশ বা অসঙ্গত বা বিভ্রান্তিজনক সেই সবই আমাদের যথাযথ বলে মেনে নিতে হবে।' তিনি অকুণ্ঠিতভাবেই ঘোষণা করেছেন– 'আমি মহাভারতের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ করেও সে বিষয়ে অসহিষ্ণু হতে পারি না।' এই সহিষ্ণু ও সশ্রদ্ধ মনোভাবই যে ভারতসংহিতা-আলোচকের পক্ষে একমাত্র সমীচীন ও অত্যাজ্য মনোভাব তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু, অসংখ্য ত্রুটি এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও বুদ্ধদেব সমগ্র মহাভারতের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা ও ঐক্য লক্ষ্য করেছেন। তাই তার মতে– 'মহাভারতকে আমরা যত অবিন্যস্ত বলে ভাবি আসলে হয়তো তা নয়; প্রথম দর্শনে আমাদের চোখে যা অসংলগ্ন, তাও — সর্বত্র না হোক— অনেক স্থলেই যথাচিতভাবে সংস্থাপিত ।' প্রধানত মূলকাহিনীর কথা মনে রেখেই তিনি এ-কথা বলেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন– 'আমার কাছে এ-কথা অতি স্পষ্ট যে মহাভারতের মূলকাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত– অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধ ভাবে।' মহাভারতের কাহিনীগত এই ঐক্যের কথা চিরকাল নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই ঐক্যকে আশ্রয় করেই বুদ্ধদেব রসজ্ঞ সমালোচকের মতো মহাভারতের কাব্য-কাহিনীর সৌন্দর্য ও মহিমা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারত কাহিনীতে যা কিছু 'হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ররূপময়', তার সৌন্দর্য নিরুপণই তার লক্ষ্য। এই অভিপ্রায় নিয়ে তিনি ভারত কাহিনীর তিন প্রধান নায়ক যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও বাসুদেব কৃষ্ণের চরিত্রবিকাশের ধারা অনুসরণ করেছেন। যে অসামান্য রসদৃষ্টি, বিজ্ঞতা ও দক্ষতা সহকারে তিনি এ-কাজ সম্পন্ন করেছেন তাতেই তাঁর এই গ্রন্থখানি বাংলায় প্রাচীন সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও তাঁর নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমি মনে করি এই বইটি যদি ইংরেজিতে ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় তা-হলে এটি বিশ্বসাহিত্য-সমাজে, বিশেষত ভারতবর্ষের সর্বত্র, যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে, মহাভারতের ন্যায় মহগ্রন্থের যোগ্য পরিচয়গ্রন্থ বলেই সমাদৃত হবে।

কিন্তু তা বলে বুদ্ধদেবের সব সিদ্ধান্তই যে সকলে সমভাবে মেনে নেবে তা আশা করা যায় না। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকেই ভারতকাহিনীর নায়ক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, অর্জুনকেও নয়, বাসুদেব কৃষ্ণকেও নয়। যুধিষ্ঠির আবহমানকাল মহাভারতের কেন্দ্রচরিত্র বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ চরিত্র কিনা, অন্য কথায় নায়কচরিত্র কিনা, এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। মহাভারতের ঘটনার ধারাকে কে

পরিচালিত করে নিয়েছেন যুধিষ্ঠির, না কৃষ্ণ? রামায়ণের রামের সঙ্গে তুলনীয় কে যুধিষ্ঠির, না কৃষ্ণ? মহাভারতের একাধিক স্থানেই এই গ্রন্থকে বলা হয়েছে 'কার্ষ্ণ বেদ' অর্থাৎ কৃষ্ণায়ণ, যেমন রামায়ণ চিহ্নিত হয়েছে রামের নামেই। রাম বিষ্ণুর অবতার, কৃষ্ণও তাই অথবা স্বয়ং বিষ্ণু। পক্ষান্তরে 'রামরাজ্যে'র অধীশ্বর রঘুপতি রাম এবং 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠাতা যুধিষ্ঠির দুইজনই ভারতবর্ষের আদর্শ রাজা। পার্থক্য এই যে, রাম একাধারে বিষ্ণু ও আদর্শ রাজা, আর যুধিষ্ঠির বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ রাজা।

মতভেদের আর এক ক্ষেত্র যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্রবিকাশের ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন মহাভারতের পূর্বাংশের কৃষ্ণ উত্তরাংশে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। তবু তিনি উভয়ের মধ্যে সমতা-স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অর্জুন চরিত্রেও অনুরূপ বিরোধ লক্ষ করেছিলেন। বুদ্ধদেব শুধু কৃষ্ণার্জুনের নয়, যুধিষ্ঠির চরিত্রেও এই রূপান্তর অনুভব করেছেন, পূর্বগামীদের চেয়ে গভীরতর ভাবেই অনুভব করেছেন। কিন্তু তিনি এই তিন চরিত্রেই পূর্বাপর বিরোধের মধ্যে গভীরতর ঐক্য দেখতে পেয়েছেন এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই তিন চরিত্রের এই যে পরিবর্তন তা অবতরণ নয়,– উত্তরণ। এই উত্তরণের মধ্যেই ওই চরিত্রগুলোর ঐক্যও অভাবনীয় মহিমা। বুদ্ধদেব এই চরিত্রগত ঐক্য, তথা সমগ্র মহাভারতের মর্মগত ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের মনের মুগ্ধতায় পাঠকচিত্তকেও অননুভূতপূর্ব মুগ্ধতায় আবিষ্ট করেছেন। এখানেই তাঁর আসল কৃতিত্ব এবং তাঁর গ্রন্থের যথার্থ ও অতুলনীয় মহত্ত্ব।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মহাভারতীয় চরিত্রগুলোর এই যে রূপান্তর, তা কি এগুলোর স্বাভাবিক বিবর্তন, না ভারতীয় চিত্তপ্রকৃতির কালগত পরিবর্তনের প্রতিফলন মাত্র? এ-কথা চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মপ্রকৃতিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে *মহাভারত* গ্রন্থে। আর, এ-কথাও অবিসংবাদিত সত্য যে, অন্য সব দেশের ন্যায় ভারতচিত্তও কালে কালে রূপান্তর গ্রহণ করেছে। মহাভারতে চিত্রিত চরিত্রগুলোতেও এই রূপান্তরের ছায়াপাত ঘটেছে কি না সেটাই বিবেচ্য। অন্য কথায় জিজ্ঞাস্য, যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্রগত পরিবর্তন কি কালিদাসের অন্তঃপ্রকৃতির উত্তরকালীন স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়, না রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের রামচরিত্রের মতো ঐতিহাসিক কালপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল বলেই স্বীকার্য? এ প্রশ্নের উত্তর সবিস্তার আলোচনাসাপেক্ষ। সে আলোচনার স্থান আমাদের নেই। সময় ও সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার অভিপ্রায় রইল।

আলোচ্যমান গ্রন্থের একটি বড় সম্পদ প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত টীকাগুলো। এসব টীকা দীর্ঘকালের সনিষ্ঠ চর্চা ও গবেষণার ফল। যে-কোনো অভিজ্ঞ গবেষকের কাছে এগুলো হবে আদরণীয় বস্তু, আর নবীন গবেষকদের কাছে হবে আলোকবর্তিকার মতো পথপ্রদর্শক। বস্তুত এই গ্রন্থে রস স্রষ্টা কবির প্রতিভা ও সত্যদ্রষ্টা গবেষকের মনস্বিতা একাধারে সমন্বিত হয়েছে। এ হিসাবেও গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন। উক্ত টীকাগুলোরও একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সমবেতভাবে এগুলোকে মহাভারতচর্চার একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ বলে গণ্য করা যায়। সে হিসাবে টীকাগুলো ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় প্রত্যেক টীকাসংখ্যার পূর্বে পৃষ্ঠাঙ্কের অনুল্লেখ। টীকা থেকে মূলের প্রসঙ্গে খুঁজে নেওয়া পাঠকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিটুকু দূর করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সহায়তা করা হবে।

মহাভারতের স্বরূপ-বর্ণনায় এই মহাগ্রন্থটি তুলিত হয়েছে মহাকায় রত্ননিধি হিমবান গিরির সঙ্গে। এই তুলনা আপাতবোধ্য প্রশংসার চেয়েও গভীরতর তাৎপর্য বহন করে। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের উত্তর প্রান্ত ঘিরে দিগন্তপ্রসারী ও সমুন্নতশৃঙ্গ গিরিমালার মতোই চিরবিরাজমান। তেমনি, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সমতল ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর এই *মহাভারতের কথা* গ্রন্থখানি এমন এক আশ্চর্য তুঙ্গতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, তার প্রতি আমাদের তাকাতে হয় মাথা তুলে এবং সশ্রদ্ধ ও সবিস্ময় দৃষ্টি মেলে। এখানেই এ গ্রন্থখানির অসামান্যতা, তার অদ্বিতীয়তা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও মেঘদূত প্রসঙ্গ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

একজন আজীবন সাহিত্যিকের মধ্যবয়স পার হয়ে গেলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন প্রায় যথাযথভাবেই হওয়া সম্ভব এবং হওয়া উচিত। এবং তার পরেও তিনি যা-যা লিখবেন তা সেই মূল্যায়নে নতুন কিছু মাত্রা যোগ করতে পারে [পুনরাবৃত্তির কথা গণ্য নয়], কিন্তু চর্চিত বা কৃত সাহিত্যকর্মকে তা পুরোপুরি খণ্ডন করে না। অতএব তা যদি সত্য হয়, তাহলে পরিণতবয়স্ক সাহিত্যিকের জীবনকালে তাঁর সাহিত্যের যে মূল্যায়ন হবে, তাঁর মৃত্যুর পরে সে-মূল্যায়নের বিশেষ পরিবর্তন হবার কথা নয়, অন্তত স্বাভাবিক হিসেবে নয়। মৃত্যু লেখকের আরব্ধকর্মকে অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য করে, কিন্তু তাঁর কৃতকর্মের হেরফের ঘটানো তার সাধ্যাতীত। বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন সময়ে সমসাময়িক ও নবীন একাধিক কবির কাব্যমূল্যায়ন করে বিরল উদারতা ও সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক দূরে থাক, খণ্ড মূল্যায়নও তাঁর জীবদ্দশায় যথার্থত করা হয় নি বলে আমাদের মনে হয়। সে কারণেই তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এমন কি ঘনিষ্ঠমহলেরও কেউ কেউ যারা তাঁকে অগ্রগণ্য কবি বা গদ্যলেখক বা প্রাচ্যবিৎ হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন, মৃত্যুর পরে বুদ্ধদেবের সর্বতোমুখী প্রতিভাবিষয়ে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি। এর ফলে যাঁরা তাঁর প্রসাদধন্য নন, তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট নিচে নামিয়ে আনতেও দ্বিধাহীন এবং সর্বশেষ, যাঁরা আজীবন তাঁর গুণগ্রাহী, তাঁদের কণ্ঠ ও কলম দুই-ই [হোক অভিমানে বা হোক ভীরুতায়] রুদ্ধপ্রায়। ফলে বুদ্ধদেবের সাহিত্যকর্ম যেখানে ছিল সেখানেই আছে, কোন্ বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার দৃষ্টি তাকে আলোকিত করে আমাদের জানতে দেয় নি বুদ্ধদেব কোথায় প্রধান বা প্রতিভাবান, কোথায় গৌণ বা পরিশ্রমী, অথবা দুই-ই অথবা কোনটাই না।

বুদ্ধদেবের বিদেশী সাহিত্য-প্রীতি তাঁকে স্বদেশী পণ্ডিত ও গবেষকের কাছ থেকে দূর রেখেছিল একথা সম্ভবত সত্য। তাঁর মৃত্যুর পরে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কেউ বলেছেন, যেসময়ে তিনি ঘরে ফিরে আসছিলেন— মহাভারতচর্চা তাঁর 'হোম কামিং ভয়েজ'-সে সময়েই এমন হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হল। একথারও যথার্থতা হয়তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এও ঠিক বুদ্ধদেব বসু খুব দেরিতে শুরু করে যে মহাভারতচর্চা করে গেলেন, তার গুণগত উৎকর্ষ জীবনব্যাপী গবেষককেও নতশির করবে। মনে রাখা ভাল, কোন কাজ দেরিতে শুরু করলে দেরি ব্যাপারটাই একটা বাস্তবতা বা লোকসান, কাজ আরম্ভ করে দিলে তা পূর্ণভাবেই কাজ। এবং আগ্রহী কর্মীর পক্ষে তাতে ফাঁক রাখা অসম্ভব। সুতরাং তাঁর প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন কত সময়ব্যাপী সে প্রশ্ন দূরে রেখে আমরা দেখতে চেষ্টা করব তাঁর এই বিশেষ অনুশীলনের চরিত্র কী, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা বা ব্যাপ্তি।

মহাভারতের কথার [১৯৭৪, বাংলা ১৩৮১] মুখবন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন, এগারো বছর আগে [১৯৬৩] বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এপিক পড়াতে গিয়ে তিনি মহাভারত

সম্পর্কে একটি বই লেখার ইচ্ছে মনে অনুভব করেন এবং যেখানে অনুশীলনেরও কিছু সুযোগ আসে। এর সাত বছর আগে ১৩৬৩ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় [২১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা] 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' নামে তাঁর অনূদিত *মেঘদূতের* ভূমিকা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতচর্চার মাঝখানে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি কাব্যনাট্যও রচনা করেন, যেগুলি তাঁর মৌলিক রচনার পর্যায়ে পড়ে [তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধ্যা, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ এবং সংক্রান্তি।] এরপরে *মহাভারতের কথা* এবং তার দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা, যা লেখার সুযোগ তিনি আর পাননি।

মেঘদূত প্রসঙ্গ শুরু করার আগে প্রথমেই বলে রাখি, বুদ্ধদেব-অনূদিত মেঘদূত শ্লোক-গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়। কারণ তাঁর *মেঘদূতের* সে-ধরনের সমালোচনা 'কবিতা' পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল, লেখকের নাম সন্তোষ প্রতিহার। বাংলা মন্দা-ক্রান্তা ছন্দ সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, কী কী চরণ বা শব্দবন্ধ অনুবাদক ত্যাগ করেছেন, কোন কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তথাপি গ্রাহ্য, অনুবাদ মূলানুগ না ভাবগ্রাহী ইত্যাদি বহু-চর্চিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে আমি বুদ্ধদেবের ভূমিকা প্রবন্ধটিতে মনোনিবেশ করতে চাই। এ-যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মেঘদূতের অজস্র অনুবাদ হয়েছে [বুদ্ধদেবের উক্তিতেই তার কারণটিও অনায়াসে বোঝা যায়— "মেঘদূতের মস্ত একটি গুণ এই যে তা আকারে ছোটো"] এবং বাংলায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ পর্যন্ত সে সম্প্রসারিত [ব্যক্তিগতভাবে আমি গদ্যে রাজশেখর বসু এবং পদ্যে কৃষ্ণদয়াল বসুর অনুবাদ উৎকর্ষে বিশ্বাসী], তাই আক্ষরিকতার গুণাগুণ বিচারের চাইতে বুদ্ধদেবের মেঘদূতের ভূমিকার আলোচনা আমাকে অনেক বেশি উৎসুক করে। বস্তুত *মেঘদূতের* ভূমিকা বুদ্ধদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে মেঘদূতের মূল্যায়ন পড়তে পড়তে মুক্ত ও স্বচ্ছবুদ্ধির সাযুজ্যে পাঠকের চিত্তে যে উত্থান-পতনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, তা কোন অ্যাকাডেমিক সমালোচনায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তথাপি সব জায়গায় বুদ্ধদেবের অভিমত আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারি না এবং সেই সব জায়গা বা উক্তিগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। আর এও মনে রাখা ভাল, *মেঘদূতের* পরবর্তী সংস্করণে কোনো কোনো বিষয়ে লেখকের মত-পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয়। তাতে শকুন্তলা-কাহিনীর উৎস সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করার ইচ্ছা সম্প্রতি লেখক প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণে ১৩৬৩ সালের চৈত্রসংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটিই বর্তমান আলোচনার ভিত্তি বলে ধরে নিতে হবে।

বুদ্ধদেব বলেছেন— "সংস্কৃত সাহিত্যের, সাহিত্য হিসেবে, চর্চার পথ তৈরি হয় নি; চলতে গেলেই হুচোট খেতে হয় ইতিহাসে, ঘুরতে হয় দর্শনের গোলকধাঁধায়, নয়তো ব্যাকরণের গর্তে পড়ে হাঁপাতে হয়। আসল কথা আমাদের সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয় নি।" [পৃ. ১৭০] এর কারণ, আমরা অধুনাতন সাধারণ পাঠকরা সংস্কৃত ভাষা জানি না। এবং সংস্কৃত যেহেতু এখনকার কোন মানব গোষ্ঠীর মুখের ভাষা নয়, সেহেতু সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব। ভাষার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক যদি অনায়াস হয়, তাহলে সে-ভাষার সাহিত্য চর্চার পথে ইতিহাস-ব্যাকরণ দর্শনের বাধাগুলি পার হতে তার বেগ পাবার কথা নয়। এজন্যই উইলসনের পশ্চিমি কাব্যাংশ যুক্ত মেঘদূতের টীকার সঙ্গে এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ বা মালরোর রচনাবলির তুলনা অনভিপ্রেত। দ্বিতীয়ত বুদ্ধদেবের উক্তি— "সংস্কৃতে প্রতিশব্দসমূহ বিনিময়ধর্মী, তাদের

মধ্যে অনায়াসে অদল-বদল চলে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও প্রায় অফুরন্ত।" [পৃষ্ঠা ১৭৫] উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধদেব মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিমত থেকে নারী, স্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীজাতিবাচক কয়েকটি প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ তুলে নিয়ে অভিমত জানিয়েছেন যে সংস্কৃতে এই শব্দগুলি সমার্থক। সত্যি কি তাই? জায়া শব্দের ব্যুৎপত্তি হল 'অস্যাং জায়তে ইতি জন্-অধি-য+আপ্ (স্ত্রীত্বে), অর্থাৎ নিজের বিবাহিত নারীর গর্ভে নিজের সন্তান জন্মের ঘটনার সঙ্গে এই শব্দ শ্লিষ্ট, তাই সে গণিকা বা পরস্ত্রী সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় ["পতির্ভার্যাং সংপ্রবশ্যং গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।'' মনুসংহিতার এই শ্লোক এ প্রসঙ্গে দেখা চলে। তাছাড়া আরও একটি কথা, উইলসন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যেমন মনোভাব, মনিয়র উইলিয়মস্ সম্পর্কেও কেউ কেউ অনেকটা সে ধরনের মনোভাব পোষণ করে থাকেন অন্তত অভিধান প্রণেতা হিসেবে তিনি যে নির্ভুল আদর্শ নন, একথা মনে করার কারণ রয়েছে।] উল্টোদিকে আবার,— "রমণী বা কামিনী শব্দ আমরা ব্যবহারই করব না, যদি না রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতা বোঝাতে চাই" [পৃষ্ঠা ১৭৬] একথা বুদ্ধদেব জোর দিয়ে বলতে পারেন হয় তো, কিন্তু আমরা পারি না। সাধারণভাবে বাংলা ভাষায় রমণী, কামিনী, নারী এ সমস্ত স্ত্রীবাচক শব্দই বিনিময়ধর্মী শব্দ। অর্থাৎ স্ত্রীলোক বোঝাতে বাংলায়ও এদের যে কোন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি? আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় আধুনিক কালের লেখকদের পক্ষে তা হয়ে উঠবে একটি জরুরি প্রার্থনা-পূরণ। এরপর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রসঙ্গে, বুদ্ধদেব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন, সংস্কৃত কৌশলী, নিপুণ ও বিদ্বানের ভাষা, জীবন বা 'স্বাভাবিক' থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, অতএব কৃত্রিম; সে ভাষার কবিতাও তাই। একথা এত সহজে বলা নয় যদিও, তথাপি প্রসঙ্গত হয় তো তা মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু তারপরেই গীতার প্রসঙ্গে এলিয়টের উক্তির [The Bhagavad Gita is second greatest philosophical poem in my experience] সমর্থনে তিনি বললেন— "হয় তো এমন বললেও ভুল হয় না যে সংস্কৃত কবিতার মহত্তম মুহূর্তগুলি সে সব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যাদের সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বলা হয়।" [পৃ. ১৮৩] প্রশ্ন এই, তাহলে আর সংস্কৃত ভাষা ও তার সাহিত্যকে কৃত্রিম বলে দোষারোপ করি কী করে?

বুদ্ধদেবের উক্তি— "আমরা যাকে লিরিক বলি তার প্রকাশ সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলতার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল।" কারণ, সেটাই স্বাভাবিক, সংস্কৃতের মত দৃঢ় ও জটিল ভাষায় লিরিক রচনার কাজ দুঃসাধ্য। কাল এবং যুগমানসও এ প্রসঙ্গে বিচার্য। জয়দেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মেজাজ এবং সময়ের দিক থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলে গণ্য নন। 'যঃ কৌমারহর' কবিতার কবি শীলভট্টারিকারা সংখ্যায় যেমন অল্প তেমনি গোত্রপরিচয়হীন। সুতরাং আধুনিক অর্থে লিরিক সংস্কৃতে প্রত্যাশিত নয়। একই কথা রোমান্টিকতা বিষয়েও প্রযোজ্য। এরপরে বুদ্ধদেব বলেন, ''কালিদাসের মতো মহাকবি, সারা 'শকুন্তলা' নাটকটিতে হারেমবিলাসী দুষ্যন্তের পরোক্ষেও একবার নিন্দে করলেন না"— ইত্যাদি। নিন্দে, অবশ্য করেছেন, করেছেন শকুন্তলা, আত্মমর্যাদাশীল, পরিশীলিতরুচি মহিলার মত, কিন্তু ক্রুদ্ধ— "অনার্য, আত্মনো হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি। ক. ইদানীমন্যো ধর্ম কঞ্চু কপ্রবেশিন স্তৃণচ্ছনকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে?" [শকু/৫ম অঙ্ক] নারীপুরুষের সমান স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের উক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে "কোনো কুলবধূর পক্ষে বহুগমন ছিল কল্পনার পরপারে,"— এ বিষয়েও নিঃসংশয় হতে পারি না। কুলবধূর পক্ষে

পরপুরুষগমন কোন যুগে, কোন দেশেই সুপ্রচলিত ঘটনা নয়, কিন্তু বিরল ঘটনা হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যেও থাকার সমর্থন পাওয়া যেতে পারে কাব্যপ্রকাশ, *ধ্বন্যালোক* বা *রসগঙ্গাধর* গ্রন্থে উদাহৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলোতে। একথা ঠিক "কালিদাস সেই কবি, যিনি প্রমাণ করেছেন হাজার বিধিবিধান মেনে নিয়েও প্রতিভা তার সত্যস্বর শোনাতে পারে", কিন্তু *মেঘদূত* সম্পর্কে একথা প্রয়োগ না-করলেও কালিদাসের অবমূল্যায়ন হয় না। কারণ *মেঘদূত* ততটা উঁচুদরের কাব্য সম্ভবত নয়, গুণানুপাতে এর প্রসিদ্ধি অনেক বেশি।

এযাবৎ যেসব আপত্তির কথা উল্লেখ করলাম, বুদ্ধদেবের আলোচ্য প্রবন্ধে আমার গুণগ্রাহিতার পরিমাণ তার চাইতে বেশি, যা আগেও বলেছি। পরিণত বয়সে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে সে ভাষার সাহিত্য পাঠ, রসগ্রহণ ও মূল্যায়ন যে এমন বিচিত্র অথচ সম্পূর্ণভাবে সম্ভব, বুদ্ধদেবের এই সংস্কৃত কাব্যালোচনা প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। এবং এরপরে যখন *মহাভারতের কথা* পড়বার সুযোগ ঘটে, তখন সে-বিশ্বাস আমাদের বিদ্যাচর্চার প্রতিজ্ঞার কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ করেছেন, সাহিত্যবোধের সঙ্গে মনীষার নিরন্তর বিরোধ— এই প্রচলিত ধারণাটি সত্য নয়।

সেইসবদিন

সাক্ষীর আত্মকথা

মানসী দাশগুপ্ত

কবি ও কাহিনীকার বুদ্ধদেব বসুকে মুখামুখি দেখার অনেক আগেই আমি আমার বাল্যের ছোটদের পত্রিকা 'মৌচাক' থেকেই 'মিমির মা' এবং 'বাবা'-কে সপরিবারে চিনি। 'মিমি'র কথা লিখতেন তাঁরা, ছড়ায়—

'সাহেববাড়ির ইস্ত্রি করা জামা মিমিমণি পরবে না কিছুতেই।'

ওই পত্রিকাকেই একটি ছোট্ট মেয়ে মিমির দুঃখে দুঃখিত হয়ে লিখে পাঠায় একটা ছড়া। তার উত্তরে মিমির মা লিখলেন :

'কে গো তুমি ছোট্ট মেয়ে লেখো কবিতা
আমায় তুমি চিনবে না কো আমি মিমির মা।'

কিন্তু 'মিমি' বা 'মিমির মায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি— এমন বয়স বা উদ্যম কোনোটাই তখন আমার ছিল না। কিন্তু এই যোগাযোগটা যেন অনিবারণীয় ছিল। আমার বাবাকে তখন ঢাকায় নিজের কাজে মাঝে মাঝেই যেতে হত। তেমনই একবার ট্রেনে তিনি প্রতিভা বসুর পিতাকে মেয়ের সঙ্গে দেখেন। বাড়ি এসে তিনি মাকে বলেছিলেন, 'একটা মেয়েকে দেখলাম। নাম প্রতিভা। ওকে দেখে আমাদের লাবুর কথা মনে পড়ছিল।' লাবু ছিল আমার অকালমৃতা দিদি। এই জাতীয় ছোট ছোট ঘটনা আমার শিশুমনে বেশ ধাক্কা দিয়েছিল এবং কিছু চিরস্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছিল।

তারপর বহুদিন বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর লেখা ছাড়া আর কোনোভাবে যোগাযোগের পথ খোলেনি। যখন আমি ১৯৪০-এ কলকাতার কলেজে পড়তে আসি এবং দক্ষিণে থাকা শুরু করি, তখন ওই পাড়ারই আরেকটি মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বয়সে তিনি আমার চেয়ে অনেকটাই বড়, পড়ছে প্রেসিডেন্সিতে। তিনি ছিলেন আরেক বাতিকগ্রস্ত। বাতিকটা হল পাড়ায় পাড়ায় 'পাঠচক্র' (Study circle) চালানো। ভদ্রলোকের নাম অরুণ দাশগুপ্ত, যিনি পরে আমার স্বামী হবেন। তিনি 'মণিমালা'র সদস্যদের অর্থাৎ পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে এবং কিশোরদের নিয়েও পাঠচক্র করতেন। আমি একটু-আধটু গান জানতাম বলে ওদের গানের দলে তিনি আমাকে ডেকে নিতেন। সেগুলো ছিল সবই রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-উৎসব ও নানা ঋতু-উৎসবের গান। কিন্তু তবু পাড়ার লোকজন ওদের কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করত। হয়তো সে কারণেই আমি ওদের সঙ্গে কখনো প্রভাত ফেরীতে গান গাইতে বেরই নি।

ওই পাঠচক্রের দলের সঙ্গেই আমি প্রথম 'কবিতাভবন'-এ বুদ্ধদেব বসুকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। কারণ তারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সেই অরুণ দাশগুপ্ত। টলস্টয়ের জন্মদিনে তিনি পাঠচক্রের দলের সঙ্গে আমাকেও 'কবিতাভবন'-এ নিয়ে গেলেন। আমি

প্রথমবার বুদ্ধদেবকে দেখে যথার্থই মুগ্ধ হয়েছিলাম শুধু তাঁর টলস্টয় সম্পর্কে অসাধারণ কথাগুলোর জন্যই। সেইসঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁর সহজ আন্তরিক ব্যবহারও আমার মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই আমাদের প্রতি তাঁর অভ্যর্থনাটি ছিল রীতিমত উষ্ণ। আমাদের গোটা দলটাকেই তিনি সেদিন দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে নিলেন এবং প্রীতিপ্রদ স্বরে বললেন, 'বসে পড়ুন এখানে।' তাঁর সেই আন্তরিক কণ্ঠস্বরটা এখনো আমার কানে বাজে।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার সেই প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি অবশ্য কোনোভাবেই সংযুক্ত নয় 'রাত ভরে বৃষ্টি'র জন্য আমার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ঘটনার সঙ্গে। এতক্ষণ যা বললাম, তা সবই আমার যৌবনকালের আনন্দময় দিনগুলোর খানিক স্মৃতিচারণ। আদালতে সাক্ষ্য দেবার ঘটনাটা অবশ্যই ততটা আনন্দময় ছিল না।

ছোটবেলায় আমরা সাক্ষী বলতে বুঝতাম 'সাক্ষীগোপাল' অথবা 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল'। আমি অবশ্য ছোটবেলা থেকেই 'সাক্ষী' হিসেবে বেশ দড় হয়ে উঠেছিলাম। পারিবারিক নানা ছোট-বড় ঘটনা আমি খুঁটিনাটি সহ এত বেশি মনে রাখতাম যে প্রায়ই তর্কাতর্কির সময় গুরুজনেরা আমায় সাক্ষী মানতেন। প্রায়শই তাদের বলতে শুনতাম, 'আচ্ছা তুই মানুকে ডাক, ও বলবে কী হয়েছিল।' আমার এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তারিখ-সময় সহ মনে রাখার স্বভাব নিয়ে পরে আমার স্বামীও কম মজা করেন নি। কিন্তু সেই আমাকেও সাক্ষী হিসেবে যে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

সালটা ছিল ১৯৭০। তখন আমি লর্ড সিনহা রোডের শ্রীশিক্ষায়তন গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল। আমার ছেলের বয়স তখন পনেরো-ষোল। হঠাৎই 'রাত ভরে বৃষ্টি' নিয়ে চতুর্দিকে বেশ শোরগোল উঠল। আমি ততদিনে উপন্যাসটা পড়ে ফেলেছি এবং বলাই বাহুল্য, খুবই মুগ্ধ হয়েছি। তেমনই একদিন জ্যোতির্ময় দত্ত এবং তাঁর এক বন্ধু আমাকে 'রাত ভরে বৃষ্টি'র পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করলেন। আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবেই (যেহেতু ওটাই আমার অধ্যাপনার বিষয় ছিল) ওনারা আমার সাক্ষ্য চেয়েছিলেন, যেহেতু বিবাদটা ছিল অশ্লীলতা সংক্রান্ত।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য ছাপার অক্ষরে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে মামলা তোলাটাকেই গর্হিত মনে করতাম। আমি সাধারণ কথাচ্ছলে তার আগে-পরে অনেককেই বলেছি যে, ছাপার অক্ষর নোংরা মনে হলে ছিঁড়ে ফেলে দাও। তা নিয়ে আবার মামলা-মোকদ্দমা কী! বুদ্ধদেব বসু অবশ্য জানতেন, আদালতে গিয়ে একথা বললে সাক্ষ্য হিসেবে তার কোনো দামই থাকবে না। তিনি নিজে আমার বাড়িতে এসে গাড়িতে তুলে আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর কৌসুলি করুণাশংকর রায়ের বাড়িতে। করুণাশংকরবাবু প্রথমেই আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন 'রাত ভরে বৃষ্টি'র একটা কপি, যাতে সেই 'অশ্লীল' অংশগুলোতে দাগ দেওয়া ছিল। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সেই বইটিই আমার একমাত্র প্রাপ্তি ছিল।

আমি বইটা মন দিয়ে দেখছি লক্ষ্য করে বুদ্ধদেব ভেবে থাকবেন অমি বুঝি বিচলিত হয়েছি। তিনি খানিক আশ্বাস দেবার সুরে এবং মৃদুস্বরে বললেন, 'আসলে ওরা যা যা অভিযোগ তুলছে তার প্রত্যেকটা কথার উত্তর তো দিতে হবে না। আসল কথা এই যে, আমার নায়িকা মালতী একেবারেই ঐকান্তিক সত্যকে মেনে নিয়েছে। কাজেই সে সতী না অসতী এই প্রশ্নই ওঠে না।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট গলায় বললাম, 'কিন্তু আমি তো মালতীকে এইভাবে দেখি না। আর 'রাত ভরে বৃষ্টি'তে মালতীকে এইভাবে দেখানো হয়েছে বলেও আমি মনে করি না।' বুদ্ধদেবকে একথায় বেশ বিহ্বল দেখাল। বিভ্রান্ত হলেন করুণাশংকরবাবুও। তখন আমি উপন্যাসটা সম্পর্কে আমার মতামতটা তাদের গুছিয়ে জানালাম। আমার মতে, উপন্যাসের নায়ক নয়নাংশু আর তার স্ত্রী মালতীর গল্পটা যেকোনো অসহায় স্বামী আর তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গল্প নয়। নয়নাংশু তার নিজস্ব সত্তাটিকে যেভাবে গড়ে উঠতে দিয়েছে, সেই পশ্চাদপটটি দেখলেই বোঝা যায় যে, ওই ছেলেটির সঙ্গে মালতী তার সমস্ত রূপ-গুণ-সপ্রতিভতা এবং আকর্ষণশক্তি সত্ত্বেও মিলতে পারবে না। নয়নাংশু মালতীর প্রেম পড়েছিল বটে, কিন্তু মালতী নয়নাংশুর যথার্থ প্রেমে পড়ে নি। আসলে মালতীর ওইরকম প্রেম সচরাচর তরুণী মেয়েদের মনে জাগে যখন তারা দেখে যে কোনো উজ্জ্বল তরুণ তার প্রেমে পড়েছে। অর্থাৎ সে প্রেমেরই প্রেমে পড়ে। অথচ তাদের বিয়েটা হয়ে যায়। ওই অবস্থায় নয়নাংশু যদি ওই আহ্লাদী মেয়েটিকে নিজের সাবেকী প্রথাবেষ্টিত পরিবারে রেখে দিত, তাহলেও হয়ত ব্যাঘাত ঘটত না। কিন্তু পৃথক হয়ে নতুন সংসারে এসে মালতী হয়ে বসল নয়নাংশুর সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্র। এরপর বিপন্নতা আসতে বাধ্য এবং সেটাই ঘটেছে উপন্যাসে। মালতীর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে উপন্যাসে জয়ন্তর আবির্ভাবও সেই বিপন্নতার সূত্র ধরেই। মালতী নয়নাংশুর মধ্যে যে পৌরুষ হিসেবে আর অধিকারবোধ দাবি করেছিল তা সে পায় নি। নয়নাংশু ছিল স্বভাব-প্রেমিক, যত্নবান এবং মরমী মনের মানুষ। এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি আমি বুদ্ধদেব এবং করুণাশংকরকে এও জানালেম যে, ওই অশ্লীলতা-চিহ্নিতকারী দাগ দেওয়া অংশগুলোর ব্যাখ্যা কীভাবে দেব তা আমি জানি। করুণাশংকর আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু এটাও মনে করিয়ে দিলেন যে, আদালতে কিছু জানতে চাওয়া না হলে আমি যেন আগ বাড়িয়ে কিছু না বলি।

আদালতে আমাকে নিয়ে যেতেন প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার। সঙ্গে আমার চেনা মানুষদের ভিতরে বুদ্ধদেব-পুত্র পাপ্পা এবং সুবীর রায়চৌধুরি নিয়মিত থাকতেন। তখন আমার চোখে কনজাংটিভাইটিস হয়েছে, যা সে-সময় লোকের মুখে মুখে 'জয়-বাংলা' নামে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। ফলে ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিল, চোখে সবসময় কালো-চশমা রাখতে হবে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম যেদিন আদালতে লাল সালু মোড়া ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথবাক্য পাঠ করছি, তখনও আমার চোখে সেই কালো চশমা।

আদালতে আমার সাক্ষ্যদানের অভিজ্ঞতা খুব একটা মধুর যে হয় নি, তা তো আগেই বলেছি। সওয়াল-জবাব শুরু হতেই বাদী পক্ষের উকিল আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছিলেন। আমার বয়স কত, পুত্র-কন্যা আছে কি না, তাদের বয়স কত— এইসব একে একে জানতে চাওয়া হল। তারপর তাঁর প্রশ্ন হল, আমি যদি হঠাৎ দেখি যে আমার ছেলে ওই বইটা পড়ছে, তাহলে আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে? আমি বলি, 'এই বইটা আমি নিজে অনেক আগে পড়েছি এবং আমার ছেলেও তখনই পড়েছে।' (সম্ভবত তখনই তাঁরা বুঝতে পারেন আমার স্বভাব-চরিত্র কীরকম!)

কিছুদিন পর চোখের অসুখ সেরে যাওয়ায় আমি কালো-চশমা খুলেই আদালতে দাঁড়াতে লাগলাম এবং দেখলাম যে দর্শকাসনে সামনের দিকে বেশ কিছু অচেনা মহিলাকে এনে বসানো হচ্ছে। আমার সাক্ষ্যের সময় নানা টিকাটিপ্পনী করা আর হাসাহাসি করাই ছিল ওদের কাজ। ওই কাজের জন্য ওদের ভাড়া করে আনা হত বলেই আমার সন্দেহ।

আদালতের দু'দিনের দুটো ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। সওয়াল-জবাব চলাকলীন একদিন আমি দাবি করেছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পরিমাণ অশ্লীলতা আছে, তার কাছে 'রাত ভরে বৃষ্টি' কিছুই নয়। কিন্তু আমার দাবিটি অসংগত বলে খারিজ করে দেওয়া হল, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি ধর্মীয়-পুস্তক এবং বাজার-চলতি উপন্যাসের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হতে পারে না। যুক্তিটা আমার কাছে বেশ মজাদার লেগেছিল। আরেকদিন আমাকে প্রশ্ন করা হল উপন্যাসে মালতীর দৃশ্যমান স্তনের বিষয়ে। প্রশ্নটা ছিল : 'আপনি কী জানেন ওইরকম দেখলে কোনো যুবকের কি প্রতিক্রিয়া হয়?' আমি বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি যেভাবে জানেন আমি তার থেকে একটু অন্যভাবে জানি। আদালত যদি আমাকে অনুমতি দেন, আমি তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারি।' অনুমতি পেয়ে আমি বললাম, 'আমরা সবাই জানি যে, রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীর ঘরে ঢুকে তাঁর মধ্যে কীভাবে জগৎ-পালিনী মাতৃরূপ দর্শন করেছিলেন। আবার ডাক্তাররা দেখেন অন্যভাবে। বাদীপক্ষের বক্তব্য যথার্থ হলে মেয়েদের ব্রেস্ট-ক্যানসার অপারেশন করা কখনোই সম্ভব হত না।' তখন ওই পক্ষের উকিল আবার জানতে চাইলেন, 'নয়নাংশু যে তার বাবা-মাকে নিয়ে একটা কুৎসিত মন্তব্য করেছে, সেটাকে কি আপনার অশ্লীল মনে হয়েছে, সে বয়সে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মনস্তত্ত্ব তা-ই বলে। আমি মেনে নিচ্ছি যে কেউ ওকথা ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে না, নয়নাংশুও তা বলে নি।' এরপরই বাদীপক্ষের সেই উকিল জজসাহেবের দিকে ফিরে হতাশ গলায় বললেন, 'ইয়োর অনার, দিস উইটনেস ইজ্ ইনস্ক্রুইটেবল।' জজসাহেব হেসে বললেন, 'সাক্ষী তো আপনার সব উত্তরই দিচ্ছেন। আপনার আর প্রশ্ন না থাকলে ওঁকে ছেড়ে দিন।'

আমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা অবশ্য আদালতের বাইরেও কম করা হয় নি। যেটা ওরা সব থেকে বেশি করত, তা হল আমার কলেজের ঠিকানায় বেনামী চিঠি পাঠানো। উদ্দেশ্য, বলাই বাহুল্য, আমার চাকরিটা নষ্ট করা। সেসব চিঠি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান পরিচালক সীতারাম সাকসেরিয়া এবং সচিব ভোমরমল সিংগীর হাতেও পৌঁছেছিল। আমার সৌভাগ্য, তাঁরা সেই চিঠিগুলোকে মোটেও গুরুত্ব দেননি এবং আমার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেন নি।

আমার বেশ মনে আছে এক তুমুল বৃষ্টির দিনে আমি কলেজে ছুটি দিয়ে দেবার পর সচিব আমার কামরায় এলেন। একমুখ হেসে বললেন, 'কলেজের এখানে বৃষ্টি হলে কলেজ বন্ধ হয় আর রাত-ভর বৃষ্টি হলে মামলা হয়।' আমি জানতে চাইলাম, 'আপনিও চিঠিপত্র পাচ্ছেন, তাই না?' উনি হাসতে হাসতে বললেন 'হ্যাঁ, অনেক।' সেদিনই আমি বুঝতে পারি যে, কলেজ-কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিকে যথেষ্ট খোলামনেই নিয়েছে। এটা অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল সীতারামজীর উদার ও শিক্ষানুরাগী মানসিকতার জন্য। লোকে এমনি ওঁকে 'কলকাতার গান্ধী' বলত না!

ওই সময়ই হঠাৎ একদিন জানা গেল, 'জন-সঙ্কেত' নামে একটি হিন্দী পত্রিকার তরফে কলেজের বাইরে একপাতার একটা লিফলেট বিক্রি করা হচ্ছে, যার মূল বক্তব্য 'মেয়েদের কলেজের প্রিন্সিপাল মেয়েদের পরপুরুষ গমনের সমর্থক।' সেবারও সমস্যা নিরসন করল কলেজ কর্তৃপক্ষই। কলেজের হেড-ক্লার্ক পাণ্ডেজী প্রস্তাব দিলেন, মেয়েদের একদিনের জন্য কলেজ চলাকালীন বাইরে যাবার গেট-পাস দেওয়া বন্ধ করা হোক। আমি রাজি হলাম না। কারণ ওতে লিফলেট-বিলি আটকানো যেত না। তখন

পান্ডেজীই একটা বুদ্ধি করলেন। তাঁর পরামর্শমতো দারোয়ান মোহন গিয়ে নগদ টাকা দিয়ে সব লিফলেট কিনে নিয়ে এলো। সেগুলোর ঠাঁই হল কলেজের স্টোর রুমে।

ওই সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অল্পবিস্তর সামাজিক চাপের মুখেও যে আমাকে পড়তে হয়নি, তা নয়। একদিন কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষিকা সরাসরি আমার কাছে এসেই অভিযোগ জানালেন। তাঁদের বক্তব্য, 'আপনি যা করছেন, তাতে ছাত্রীরা কু-শিক্ষা পাচ্ছে।' এই জাতীয় কোনো অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দেওয়াই আমার বরাবরের স্বভাব। সেদিনও তাই করলাম। বললাম, 'আপনারা এতজন রয়েছেন সুশিক্ষা দেবার জন্য, আমি একা ওদের কী ক্ষতি করব?' ওঁরা বললেন, 'এরপর যদি ছাত্রীরা আপনার নামে ব্ল্যাকবোর্ডে বাজে কথা লেখে?' আমি আবারও হেসে বললাম, 'আপনারাই ওদের অভিভাবক। আপনারা নিশ্চয়ই ওদের দিকে নজর রাখবেন যাতে ওরা ওই জাতীয় অন্যায় না করে।' অবশ্য একথা না বললে অন্যায় হবে যে, শিক্ষিকা-মণ্ডলীতে এমনও অনেকেই ছিলেন, যাঁরা প্রকাশ্যেই আমাকে এবং আমার মতাদর্শকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এ-সবের বাইরে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ওই মামলার রিপোর্ট নিয়মিত বেরুত। তাতে আমার নামও থাকত। এতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ বিব্রত হয়েছিলেন। দু'একজন আমার কাছে 'এসব কী ঠিক করছিস?' গোছের মৃদু আপত্তিও তুলেছিলেন। আমি যথারীতি হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় বিশেষ কোনো গোলমাল তাঁরা পাকাতে পারেন নি।

আর আমার স্বামী যে সবসময়ই আমার পাশে ছিলেন তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না। উদারমনের এবং সমাজ-সংস্কারের বাতিকগ্রস্ত সেই মানুষটির অভাব আজ এই শেষ জীবনে পৌঁছে আমাকে বড়ই পীড়া দেয়।

নবীন কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুকাল পূর্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি পড়ে আমার কোনো-একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম এই কবিতায় ছন্দ ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েচে কেবল কবিত্ব-শক্তিমাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েচে, একদিন প্রকাশ পাবে। ... বোধ করি মহাযুদ্ধের অপঘাতে বা অন্য গভীরতর ভূমিকম্পে ইউরোপের ভিৎ নড়ে গেছে। সেখানে সাহিত্যে শিল্পে সমাজে বাণিজ্যে আজ সর্বত্রই যে-একটা কষ্টকল্পনা দেখা যাচ্চে সে-টাকে যদি আমরা উৎকর্ষের লক্ষণ মনে করি তবে প্রদীপের শিখার অন্তিম চাঞ্চল্যকেও তেলের প্রাচুর্যের লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে। অনেক সভ্যতা ইউরোপীয় শরৎকালের বনপল্লবের মতো মরবার আগে অতি প্রগল্‌ভ রং ফলিয়ে গেছে। সে-টাকে বসন্তের উপরে টেক্কা দেওয়া বলে কেউ যেন ধরে না নেন। মাঝে-মাঝে ভয় হয়েচে আমরা ইউরোপের বর্তমান কালকে চিরকাল বলে মেনে নেবার ভুল করচি।

যাই হোক বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। ...দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে-পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ-বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি সম্মান লাভ করবেন। আগামীকালের সাহিত্যদৌবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তাঁদেরই পরে। টিকিট তাঁরাই দেখে নেবেন, আমরা বাইরে থেকে নমস্কার করে বিদায় নেব।

সম্প্রতি দিলীপকুমার কয়েকটি কাঁচি-ছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ করে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েচেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেন নি। যে-কয়টি ও যতটুকু কবিতা পাওয়া গেল পড়ে খুশি হলুম। খুশি হলুম বললে মনে হবে মুরুব্বিয়ানা করচি। কেন না যখন-তখন ব্যবহারের ঘর্ষণে ঐ কথাটার ধার খয়ে গেছে। তবু বলতে হবে খুশি হওয়ার চেয়ে বড়ো দাম কবিতার পক্ষে আর কিছু নেই। এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টি ছাড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে-দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েচি। কবিতাগুলি সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্যে ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী।

যে-কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েচে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সঙ্গত হবে না। তাঁর হাতে যে-যন্ত্রটি আছে তার কতকগুলি তন্তু, তার কোন-কোন পর্দায় কত রকমের সুরের মীড় লেগেছে, তা বলতে পারলুম না। যে-লেখা কয়টি

দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল-ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরস উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালীবনরাজিনীলা' তটরেখা। কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ফরমাস চলে না। যা পাওয়া গেল সে যদি গজমুক্ত কৌটো হয় তবে আবদার করলে চলবে না কণ্ঠী কোথায়।

এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, সচ্ছলতা পেতো
সুন্দর, নির্ভরযোগ্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হিমানী পেতে-পেতে মনে হয়
আজো পাবো সহসা সন্ধ্যায়, ক্ষণকাল, ব্যস্ত তুমি, সৃজনের শান্ত কবি তুমি
তাও স্বচ্ছ নিমন্ত্রণ, এসো এসো, কী খবর বলো, সুনীল কেমন আছে তারাপদ,
আত্মীয়স্বজন?
সকলে নিশ্চিত ভালো, যতখানি ভালো থাকা যায়

নষ্ট ফল, ভিতরে গভীর কীট—মানুষের সকল হৃদয়ে ছোটো ও সংক্ষিপ্ত দুঃখ
কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য যেমন
তেমন অব্যর্থ, দীর্ঘ, কবিতার অগ্রজ কুসুম
তোমার হাসির তীব্র বাল্যকাল আমাকে ছুঁয়েছে
ভিতরের ভূ-কম্পনে স্থাপিত ভ্রান্তির ভাঙা ইট গুঁড়িয়ে হয়েছে ধুলো
যতগুলো পথ ছিল উঁচুনিচু সংহত হয়েছে ছন্দে, আনন্দে আনন্দে
কেটে গেছে কতদিন। এখন কীভাবে যাবে? কোন্ ভাবে যাবে?

তবু যায়। সমুদ্রের মৌন নিয়ে শোকযাত্রা চলে গঙ্গাতীরে....
শান্ত ও ঘুমন্ত মুখ কবিতার নীরব ভাষায় কথা বলে শোনা যায়—
কোনো কোনো শোকসঙ্গী শোনে

পাথরের চোখে জল, মনে হয় ধুলোই পড়েছে!
জল, নুন, দারুণ দুকূলে ক্ষয়, ধ্বংস হলো কলকাতা শহরে এইমাত্র
জ্বলে গেলো চিৎকারে, ঝড়ের হাতে, ক্রন্দনে সমস্ত ঘরবাড়ি
একি অকস্মাৎ যাওয়া, ঘর ছেড়ে পরের দুয়ারে!
স্বর্গ তো আপন নয়, তোমার নিজস্ব স্বর্গ ছিলো
ছেড়ে গেলে, কিন্তু কেন গেলে?

ছন্দের বারান্দা

শঙ্খ ঘোষ

আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'

'আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প' এ-কথা যখন বুদ্ধদেবকে লেখেন সুধীন্দ্রনাথ, 'ছোট' শব্দটি হয়তো তিনি সৌজন্যবশেই ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক ছন্দের কাঠামোর যাঁরা চেয়েছিলেন গদ্যপদ্যের বিরোধভঞ্জন, তাঁদের পক্ষে এ-নালিশকে নিতান্ত তুচ্ছ গণ্য করা স্বাভাবিক ছিলো না। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার ছন্দচর্চায় জরুরি সেই সেতুটিকে একেবারেই কি গ্রাহ্য করেননি বুদ্ধদেব বসু? মনে রাখা চাই যে সুধীন্দ্রনাথের আপত্তি উঠেছিলো কবিতার শব্দ বিষয়ে, 'গদ্যপদ্যের প্রভেদ ঘোচাতে চাই ভাষার দিক থেকে— উভয় প্রকরণে শব্দ ও বাক্যবন্ধ একরকম রেখে' এই ছিলো তাঁর ঘোষণা এবং স্পষ্টতই তিনি জানিয়ে দেন যে ছন্দোলিপিতে শৈথিল্য তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত। তাহলে ছন্দোলিপির পূর্ণ প্রথানুসরণই কি অভিপ্রেত? তার দ্বারাই পাওয়া যাবে মুক্তির পথ? তাহলে কি 'দময়ন্তী'র শব্দবিষয়ক ইস্তাহারের পরেই সংগত হতো এই অভিযোগের প্রত্যাহার? কিন্তু 'দময়ন্তী'তেই গদ্যের রীতি নিখুঁত বলে সুধীন্দ্রনাথ অন্তত ভাবেনি।[১]

তার একটা কারণ এই হতে পারে যে বাক্‌ছন্দ বিষয়ে ছ-টি অনুশাসন স্থির করে নিলেও ও-বইতে সে-বিধির সম্পূর্ণ অনুসরণ দেখা দেয়নি, হয়তো তার প্রয়োজনও ঘটেনি সর্বত্র। যে-দু-চারটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ বুদ্ধদেব নিজেই উল্লেখ করেন তার বাইরেও দেখি প্রায়ই ঘটেছে এই ধরনের বিচ্যুতি : 'অদৃষ্টের দোষে/বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে/ক্ষত করে', 'সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথবনে/কাটায়েছি', 'আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দুজনের চোখে', 'অতীতের ফুঁ দিয়ে নিবায়ে দেবে সব' অথবা 'তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে'র মতো অনেক প্রয়োগ।[২] বাক্‌রীতিকে যদি মূলত ক্রিয়াপদের দিক থেকে বিচার করি তাহলে মানতে হয় যে 'দময়ন্তী'র পরবর্তী কাব্যচর্চাতেই বরং এ-পথে আরো সিদ্ধার্থ হতে পারছেন কবি, ক্রমশ সরিয়ে দিতে পারছেন বাংলা কবিতার এই ভাষাগত কাব্যিকতা।

লক্ষ করার বিষয়, 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনায় ছ-টি প্রতিজ্ঞার অন্তর্বর্তী পাঁচটিই যাচাই করতে চাইছে শব্দপ্রকৃতি, কেবল প্রথম সূত্রে অন্বিষ্ট হলো 'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি।' এই রীতি নিয়ে ঠিক কী ভাবছিলেন বুদ্ধদেব তা হয়তো আমরা খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি, কিন্তু তখন প্রশ্ন জাগে মনে, রবীন্দ্রনাথ থেকে কতোটা নতুন করে ভাঙতে হয়েছিলো এই বিন্যাস? পদ্যকে দিয়েও যে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন, একথা তো বুদ্ধদেবই আমাদের মনে করিয়ে দেন। এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তেও আমাদের কান পুরো সায় দেয় যে, 'দেবতার গ্রাস'-এর আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের

কথা শুনছি বলেই মনে হয়। 'দেবতার গ্রাস' এ-ব্যাপারে কোনো একক উদাহরণও নয়। শব্দের বিন্যাসে তাহলে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতোদূর পরিণতি ঘটলো কবিতায়? 'কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয়, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গেই মৌখিক ভাষার ঠিক ততোটাই অনুরূপ হতে পারে, কবিতার পক্ষে যতোটা হওয়া সম্ভব' : এই কি হবে আমাদের শেষ কথা? কবিতার পক্ষে কতোটা সম্ভব তা কি-হিসেবে স্থির হবে? ছন্দের মধ্যেই চাই কথ্যভাষার সতেজ প্রাণশক্তির পরিচয়, কিন্তু বুদ্ধদেব যে তাকে চান ছন্দোবন্ধনের 'মাধুর্যের'ই সঙ্গে মেলাতে, ছন্দোমাধুর্যের সেই ধারণা কি কোথাও সংঘর্ষ তৈরি করছে না বাক্‌স্পন্দের বিকাশে?'

গদ্যের বাক্যবন্ধ নয়, আধুনিক ছন্দের অন্বিষ্ট ছিলো সমর্থ বাক্‌স্পন্দের ব্যবহার। সংগত বাক্যবন্ধ থেকে সেই স্পন্দ রচিত হয় একথা সত্যি তাহলেও স্পন্দকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব মূল্যে। সেই স্পন্দের সঞ্চার আনেন নানা কবি নানা ভঙ্গিতে, কখনো-বা ছন্দদেহ অটুট রেখে তারই মধ্যে বিপরীত বলয়ে আসে গদ্যের লড়াই, কখনো ছন্দকে তার পুরোনো অভ্যাস থেকে ঈষৎ খুলে দেওয়া আপাত-বিশৃঙ্খল গদ্যসমাজের দিকে, আর কখনো হয়তো অধৈর্য প্রত্যাখ্যানে সরাসরি গদ্যধরনেই নেমে আসা। এর কোনটি হতে পেরেছিলো বুদ্ধদের বসুর সন্ধান?

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় তিনি সহজে প্রস্তুত নন। কবিতার প্রাথমিক বিদ্রোহে অমিল মুক্তক লিখেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েক বছর আগে, বিষ্ণু দে-র মতোই, কিন্তু ছন্দ-সুষমার গাণিতিক অভ্যাস বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে মান্যই করতে দেখি। বাংলা ছন্দের পর্ববিন্যাস যে প্রায় নিষ্ঠুররূপে নিয়মিত, এমকি অক্ষরবৃত্তের প্রথম আটমাত্রায় ২-৩-৩ বা ৩-২-৩ বিন্যাসও যে একেবারে অচল, সুধীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও একথা শ্রুতিধার্য রাখেন অনেককাল। 'কিন্তু এই দুর্গ আজো টিকে আছে, না-বলে, অনবরত', 'অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর', 'ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সবকটি কম্পমান পাতা', 'নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান' : এ-সব মুক্ত প্রয়োগ দেখা দিলো কেবল *যে-আঁধার আলোর অধিক* বইতে, কিন্তু তখন তিনি আর এ-পথে একা নন, অনেকের একমাত্র মাত্র।[৪] অথচ পরবর্তী সময়ের বাঁকিয়ে-ধরা এই ভঙ্গি তাঁর প্রথম পঁচিশ বছরের রচনায় কতোই দুর্লভ! এমন নয় যে অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গেই গদ্যপদ্যের বিরোধ মিটে যায় অথবা তাকেই বলা চলে পরম সিদ্ধি। আসলে গদ্য বাক্‌বন্ধ ছন্দের ভিতর যে-ধরনের অবিরল বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে, এ হলো তারই এক ছোট ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু এই বিপর্যাস এক সময়ে বুদ্ধদেব বসুকে এতোটাই অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিলো যে 'স্ফুলিঙ্গ'-এর 'অপরাজিতা ফুটিল' বা 'যেন পেয়েছে লিপিকা' লাইন দু-টিকেও তিনি ভাবছিলেন তিন মাত্রার ব্যতিক্রম, একটু ফাটল-ধরানো এই অক্ষরবৃত্তকে নাম দিচ্ছিলেন মিশ্রছন্দ।[৫]

'আবার এই পিছুটানের জন্যই ত্রিশ বছর আগে বিষ্ণু দে-র 'জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র জানি সে যে সাধারণই মেয়ে' অথবা 'সংস্কৃত কবিতার নাগরীনাগর' ব্যবহারে তাঁর মন আপত্তি করে উঠেছিল, উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দ যে কখনো-কখনো টান খেয়ে যায় তা মানতে যেন পুরো প্রস্তুত ছিলেন না তখন।[৬] সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দোগত যথেচ্ছাচার বুদ্ধদেব যে প্রসন্ন চোখে দেখবেন না, তা এখন স্বাভাবিক বলেই বোঝা যায়, তাঁর নিজের পুরোনো রচনা সেই ভঙ্গিলতার বিরুদ্ধেই যেন তর্জনী তুলে আছে।

এমনকি ‘পদাতিক’ কবির শব্দ-সংশ্লেষ লক্ষ করে যতো উত্তেজনা বোধ করেছিলেন ‘কালের পুতুল’-এর লেখক (১৯৪০), ‘দেখা দিলো কলকাতার আরো এক কাল’ সত্ত্বেও বলা যায় না যে এর প্রয়োগও তাঁর রচনায় অবাধ হতে পারলো। বরং তার অভাবই কখনো-কখনো আমাদের বিচলিত করে যায়। যে-‘বিদেশিনীকে দেখে সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো ‘আমি যাকে গদ্যগুণ বলি তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য ওই কবিতাটিতে’, ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত সেই কবিতারই গদ্যটানকে থেকে-থেকে প্রত্যাহত করছে বলেই কিন্তু ধারণা জন্মায়। এখানে বুঝতে পারি বাক্‌রুদ্ধ এবং বাক্‌স্পন্দের ভিন্নতা। শব্দকটি কীভাবে বিন্যস্ত হবে গদ্যে, এই হলো বাকবন্ধের জিজ্ঞাসা। শব্দক’টি কীভাবে বলে থাকি আমরা, এই হলো বাক্‌স্পন্দের কৌতূহল। ‘তবু তার যথেষ্ট হয়নি দেখা’ ‘এখানে রয়েছে লেখা’ বা ‘কিংবা কিছু ঐ ধরনের’ বিষয়ে প্রশ্ন তুলব না, কিন্তু ‘হাতে হাত ঠেকলে ও চমকে না-উঠে’ ‘বাংলোর বারান্দায়’ ‘করব না খামকা বড়াই’ ‘তুমি তাঁকে বলবে আমার হয়ে’ ‘কে যেন উঠল হেসে’ : এ-সবও কি নিঃসংকোচ রাখে আমাদের?[৭] একে কখনোই বলা যাবে না ছন্দপতনের উদাহরণ, বরং পুরনো প্রথা মতো ছন্দোরক্ষাতেই এদের সতকর্তা, কিন্তু যদি একে বলি স্পন্দপতনের উদাহরণ? অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসগুণে চিহ্নিত শব্দা বলিতে অভ্যন্তরীণ রুদ্ধদলগুলি টান পেয়ে মাত্রা বাড়িয়ে নিচ্ছে, তার ফলে এর উচ্চারণ যতোটা দীর্ঘ হয়ে যায়, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে তার অভাব। ফলে কবিতাপড়ায় আসে অল্প কৃত্রিমতা, গদ্যের ধ্বনিসঞ্চার কিছু-বা বাধা পায়, চল্‌তি চাল সত্ত্বেও রচনায় আসে খানিকটা এলায়িত ভঙ্গিমা।

একথা ঠিক যে এই দুর্বলতা পরিহার করে উঠতে চান কবি। একদিকে সরে যান স্পষ্ট গদ্যের দিকে, যেখানে ছন্দতান আর কথ্যতান কোনো সংঘর্ষ তৈরি করে না, ‘বিদেশিনী’র পরেই লেখা হয় ‘মধ্যতিরিশ’, ‘খণ্ড দৃষ্টি’র মতো কবিতাবলি; অন্যদিকে দেখা দিতে শুরু করো আঁটো-সাঁটো একটি-দুটি সনেট বা সনেটকল্প ছোট লেখা। ‘প্রত্যহের ভার’ বা ‘মায়াবী টেবিল’-এর মতো রচনা যেন *যে-আঁধার আলোর অধিক*-এর অতিদূর পূর্বাভাস, দৃঢ়বন্ধনের আয়োজন। কিন্তু কবির আজীবন সুরপ্রত্যাশী মন সেই বন্ধনের সময়েও শব্দের সংশ্লেষভঙ্গির চেয়ে বিশ্লেষ ধরনকে কাজে লাগায় বেশি, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে। ‘বলে, এতো ফুর্তির ঋতু’ ‘রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি’ বা ‘এমনকি কবিতার শব্দে নয়, শব্দের ছন্দে সম্মোহনে নয়’— ‘শীতের প্রার্থনা’র এই শব্দছড়ানো রীতি *যে-আঁধার আলোর অধিক* বইতে যেন অতিচারী হয়ে উঠলো : ‘হৃদরেয় রত্নগুলি— সহনীয় সলজ্জতায়’ ‘বিচ্ছেদের পারিশ্রমিক’ ‘ব্যবসার অধ্যবসায়ে’ ‘লিখে গেলো সহস্রাধিক’ ‘বরং কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চড়ে’ ‘আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভরে আছে মন’ ‘পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে’ ‘বিরাট পরিশ্রম শেষ হলে’ ‘যুদ্ধ করে, খুঁটে খায়; নিমন্ত্রণে অভ্যর্থনার’ বাক্ অর্থ সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হলে’ : এই রকম আরো অনেক।[৮] আজকের দিনে অক্ষরবৃত্তের এই বিশ্লেষ কোনোক্রমেই আর অসংগত নয়, কিন্তু সংশ্লেষণের তুলনায় এর প্রতি কবির অপার পক্ষপাত আমাদের আরেকবার ধরিয়ে দেয় তাঁর স্রোতস্বান মেজাজ, গীতল প্রবাহের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহ।

সেই আগ্রহের স্পষ্ট রূপ ধরা ছিলো ‘কঙ্কাবতী’র কবিতায়। ‘বন্দীর বন্দনা’ আর ‘কঙ্কাবতী’কে দুই মহল বলে মনে হয়েছিলো কবির, হয়তো ছন্দের প্রকরণেও এরা দুই মহলের বাসিন্দা। প্রথমে বইয়ের ‘কোনো বন্ধুর প্রতি’ কবিতা দূরাগত আহ্বানের অংশে ছন্দকে একটু দুলিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু এর সামগ্রিক চেহারাই হলো অক্ষরবৃত্তের

কাঠোমোয় গাঁথা, কখনো সনেট কখনো-বা খোলা মুক্তকে। সন্দেহ নেই যে এইটেই তাঁর আদ্যন্ত কবিতাচর্চার প্রধান বাহন, বারবার ঘুরে আসেন এইখানেই, এবং 'কঙ্কাবতী'ও সে অর্থে সম্পূর্ণ কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবুও, ঐ ছন্দের অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও 'কঙ্কাবতী' আমাদের মনে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে মাত্রাবৃত্ত বা একটি-দুটি ছড়ার চালে, আর তা কেবল নাম-কবিতটির গুণেই নয়। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহী তাপ সরে গিয়ে প্রেম এখানে প্রায় গান হয়ে উঠেছে, খোলা হওয়ার গান, কবিতা হয়ে উঠেছে 'সেরেনাদ'। কবিকে এখানে মনেই হতে পারে কিছু-বা ছন্দবিলাসী, শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিতে মশগুল, শোনা যায় 'চোখে চোখ পড়েই যদি/নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে'র ঠমক, অথবা 'একসার মেঘ সরু এলোমেলো আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো/গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে পড়ে/আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,/ আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা'র উতরোল বাজনা।

'নতুন পাতাকে ছেড়ে দিলে অতঃপর বুদ্ধদেবের সব কবিতার বই দোলায়িত হচ্ছে এই দুই ভিন্ন বৃত্তে, বলা যাক 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র বৃত্তে। *যে-আঁধার আলোর অধিক*ও তার উদাহরণ। কিন্তু বিপদ এই যে মাত্রাছন্দে গদ্যের সঙ্গে বিরোধ আরো জোরালো হয়ে ওঠে, এই ছন্দের গহনে মুক্তির পথ আরো দুর্লভ। বেরিয়ে আসবার একটা ছোট ধরন হয়তো মেলে মুক্তক মাত্রাবৃত্তে, এবং প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তর্কচ্ছলে বুদ্ধদেব বলেওছিলেন 'মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারেও যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে বারবার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায়।'[৯] তবে তত্ত্বগতভাবে বাধা না-থাকা এক কথা আর তার অনায়াস বহুল প্রয়োগ হলো স্বতন্ত্র ব্যাপার। উত্তরকালের ইতিহাস থেকে বুদ্ধদেবকে অন্তত এর পরীক্ষায় ততোদূর উৎসাহী বলে মনে করা যায় না, ভাবা যায় না যে এই ছন্দের ভিতরকার সংঘর্ষে তিনি বেশি কোনো মন দিচ্ছেন।

তবে কি এর থেকে মুক্তি তৈরি হতে পারে মিশ্রছন্দে? যেখানে মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তে মেশামেশি হয়ে যাবে? ফ্রি ভার্স বা স্প্রাং রিদ্‌ম্ নিয়ে যখন ভাবছিলেন তিনি এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে বুঝতেও চাচ্ছিলেন এর জটিল রহস্য, সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'হঠাৎ মনে হলো যে ছড়ার ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং মধ্যে-মধ্যে, খুব সাবধানে, স্বরাঘাতপ্রধান, হলন্তাক্ষরবহুল ছয় মাত্রার ছন্দ মিশিয়ে লিখলে হয়তো-বা স্প্রাং রিদ্‌ম্-এর অনুকরণ বাঙালির পক্ষে সম্ভব। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না।' শুভার্থী এই পরামর্শ কতোটা তাঁকে সেই কারুকর্মে উত্তেজিত করেছিলো? এমন সম্ভাবনার উল্লেখ বুদ্ধদেবের নিজের আলোচনাতোও দেখতে পাই (দ্র. 'বাংলা ছন্দ'), এমনকি 'দ্রৌপদীর শাড়িতে পাওয়া যায় 'কালো চুল'-এর মতো কবিতা যেখানে আটমাত্রা সাতমাত্রা অনায়াস সফলতার জায়গা বদল করে : 'কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো/খুলে দিলো কালো চুল, বিপুল ঢেউ তুলে লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়।/খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা/রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানালায়' তাহলেও এই মিশ্রভঙ্গিমা মূলত অমিয় চক্রবর্তীর পথ, বুদ্ধদেব বহুদূর এগোতে চাননি এই ধরন নিয়ে।

অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, কোনো ছন্দেরই ভিতর থেকে খুলবার আয়োজন বুদ্ধদেবে বিশেষ দেখি না, উপরন্তু তাঁর চরিত্রে আছে সুরের প্রতি অরোধ্য আকর্ষণ। তাঁর কবিতা বানিয়ে তোলে আসক্তি, ছড়িয়ে দেয় 'তীব্র মত্ত আত্মহারা ভালোবাসা'— 'যে ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু— তীব্র মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়', আর তারই ফলে আধো ঘুমে আধো স্বপ্ন আচ্ছন্ন কবির স্বরে ভেসে ওঠে 'গান,

তাই আজও গান!’ এই গান তবে থেকেই যায় শিরায়-শিরায়, কিন্তু তবু তো ‘মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যর অন্ধকার’ দেখতে হয় তাঁকে, তবুও তো ‘স্বপ্নের তীব্রতা’র সঙ্গে আসে ‘দ্বন্দ্বের সংঘাত’। তাঁকে ভাবতেই হয় তবু মুক্তছন্দের কথা, মিশ্রছন্দ এবং স্প্রাং রিদ্‌মের ভাবনা, লক্ষ করতে হয় কীভাবে গদ্যের সঙ্গে অবিরতই সাযুজ্য তৈরি করতে চাচ্ছে আধুনিক পদ্য। ‘সাহিত্যচর্চা’র ‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধটি অথবা ‘কালের পুতুল’-এর রচনাবলি ছন্দবিষয়ে তাঁর এই উন্মুখ কৌতূহলকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তবে কি তিনি নিঃশ্বাস নেবার জন্যই মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসেন গদ্যছন্দের সমতলে, ‘বন্দীর বন্দনা’ আর ‘কঙ্কাবতী’র পর ‘নতুন পাতা’য় যেমন? হয়তো তাই। তবে লক্ষ করতে হবে যে ‘নতুন পাতা’ থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর গদ্যছন্দেরও মূল প্রবাহ রবীন্দ্রনাথেরই অনুষঙ্গ মনে ধরিয়ে দেয় বারংবার, তার শব্দে বা ছবিতে নয়, কিন্তু তার স্পন্দনে। এই পরীক্ষার সূচনাপর্বে এমনকি রবীন্দ্রনাথও দেখতে পাচ্ছিলেন তরুণতরদের গদ্যছন্দে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য প্রেমেন্দ্র মিত্রে, মনে হয়েছিলো তাঁর, ‘পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ’-সমর সেনের যেন ‘গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য’ আর বুদ্ধদেবের কবিতায় ‘গদ্যের কণ্ঠে তালমানছেঁড়া লিরিক’। তালমানছেঁড়া লিরিক? তাহলে এখানেও নয়, গদ্যছন্দের এই চেহারাতেও বুদ্ধদেব বসুর এমন কোনো মৌলিক স্পন্দসঞ্চার নয় হতে পারে একান্তই তাঁর আপন, তাঁর অথবা বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু ‘নতুন পাতা’রই মধ্যে যেন দেখা যায় আরেকটি কুঁড়ি, কবির আরেক রকম অস্বস্তির ইঙ্গিত। গদ্যের তালামানছেঁড়া চেহারাও তাঁকে বিব্রত করছে কোথাও, তার আভাস যেন দেখতে পাই এই বইতেই। গদ্য-ছন্দের যে-মৃদঙ্গওয়ালা বোল নেই বলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গদ্যকবিতায় স্বস্তি পাচ্ছিলেন, সেই মৃদঙ্গেরই ধ্বনি হঠাৎ বেজে উঠলো এর আর-কয়েকটি রচনায়। গদ্যের মধ্যে পদ্যের আমেজ ও মিলের চমক রবীন্দ্রনাথের মতো সুধীন্দ্রনাথেরও আপত্তির বিষয় ছিলো, তাহলেও এর প্রয়োগ ঘটছিলো চক্রবর্তীর ছন্দে, এবং বুদ্ধদেবের হাতেও উড়ে এলো তার স্ফুলিঙ্গ :

> তোমাকে বুকে করে তোমাকে বুকে ভরে কাটে আমার রাত্রি।
> সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মন্থিত মুহূর্তে
> থমকে দাঁড়ায়— যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
> কোন উদ্যত খড়গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

মনে রাখতে হবে যে অমিয় চক্রবর্তীর ‘অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত ‘verse libre’ থেকে এর চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন, এর আছে এক গড়িয়ে-যাওয়া ভারি মন্থর চলন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনার মতো ছিপছিপে নয় এর চেহারা।

> পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ
> ধান পাকানো তাপ
> টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া;
> সোনালিকাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম,
> ঝিকমিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

এ-সব লাইনের সঙ্গে প্রথমোক্তের সাদৃশ্য শুধু এই যে দুই লেখাতেই মিত্রাক্ষরের ব্যবহার।[১০] কিন্তু ‘নতুন পাতা’র উদ্ধৃত ঐ-অংশে এটাই মস্ত কথা নয় যে লাইন শেষে মিল আছে। কয়েক তাল শব্দ গড়িয়ে এসে ঐ যে একটা যুক্তব্যঞ্জনময় ছোট শব্দে আঘাত পেয়ে থেমে যাচ্ছে, গতি আর যতির এই বিশেষ চাঞ্চল্যটাই এখানে গণ্য

করবার, তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে একটা অনতিনির্দেশ্য পরিমাপের বোধ। যদি না-ই দেয়া হতো মিল? তখন উঠে এলো আরেক পরীক্ষা; স্তবকবন্ধের পরিমিতিতে গদ্যেরই একটা শ্লোকসদৃশ ধ্বনিরচনার পরীক্ষা। 'চিল্কায় সকাল'-এ দেখা দিচ্ছে এরই একটা প্রাথমিক ধরন :

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ সুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ– আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পরম্পরায় এমনি স্তবকবন্ধ, যার শেষ চরণে হঠাৎ ছোট-হয়ে আসা এক-একটি উচ্চারণ। ছন্দ আর অছন্দের মধ্যপথ খুঁজতে খুঁজতে একবার যেন এই শ্লোকবন্ধে এসে দাঁড়ালেন কবি। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র যোগসাধনকারী সরু বারান্দাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'পৃথিবীর পথে'। 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ লাইনগুলোতে তেমনি একটি বারান্দা পাওয়া যাচ্ছে বাক্‌স্পন্দ আর সুরস্পন্দের মধ্যে। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাবার পথে এই যে একবার চকিতে বারান্দাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন কবি, একে নিছক আকস্মিকও বলা চলে না, বলতে হয় এষণারই ফলাফল, মনে রাখতে হয় 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে তাঁর এই সর্তক বিচার : 'বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দু-টো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে : একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয়; —এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রি ভার্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

অবশ্য সন্দেহ নেই যে 'নতুন পাতা'য় এই নবীন ব্যবহার ততখানি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পরেও অনুরূপ পরীক্ষা বুদ্ধদেবে অবিরল দেখা যায় না। কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও এই যে তিনি অল্প সময়ের জন্য ঐখানেই ফিরে-ফিরে যান, ঐ খোলা হাওয়ার বারান্দায়, এবং নতুন-নতুন পর্বে আরো-একটু সামর্থ্য সঞ্চার করেন তার মধ্যে— সেটাও একটা বড়ো ইঙ্গিত। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' বইতে 'মধ্যতিরিশ' বা 'খণ্ডদৃষ্টি' কেবলই গদ্যকবিতা, ছন্দের কোনো মহিমায় তারা স্মরণীয় থাকে না :

শুধু এতেও চলে না,
ঘরে-ঘরে পরিচারক চাই।
এই তো আমাদের কালীচরণ।
বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।
সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধে বাড়ে,
দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হলেই তার চলে না।

এই প্রাত্যহিক গদ্য অতিক্রম করে যখন পৌঁছাই 'কলকাতা' বা 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'র মতো কবিতায় তখন আবার কানে ভেসে আসে পুরোনো সেই শ্লোকগম্ভীর চলন, আরো সংবৃত, আরো প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে।

যখন জন্ম নেয় যৌবন, নৌকোয় পাল ফুলে ওঠে,
আর দূরে, সোনালি কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
তেমনি তুমি ছিলে আমার কাছে– অস্পষ্ট উজ্জ্বল, অচিন্ত্যনীয়,
তুমি, কলকাতা।

অতিথি হয়ে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে,
কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নায়িকা, আমার ভীরুতা ভাঙিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার উপর, যেমন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে যায়
অফুরন্ত সমুদ্র।

মনে পড়ে সেই সব মুহূর্ত, যখন ঘুম-ভাঙা গম্ভীর প্ল্যাটফর্ম
সরে যেতো ঘোমটার মতো, আর ঘন্টা বেজে উঠতো আমার বুকে।
—তুমি, আবার তুমি! তোমার তীক্ষ্ণ, প্রবল পরিশ্রমী ভোর,
ভিস্তির জলে সদ্যস্নাত।

আর, অবশেষে এই রীতি পুঞ্জীভূত স্তবের মতো হয়ে উঠলো *মরচে-পড়া পেরেকের গান*- এর কবিতাগুলিতে যা আসলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সংলাপ।

এই যে গদ্যের ছন্দে শ্লোকের সুর আর সংহতি, ব্যাপ্তি আর সুমিতি একই সঙ্গে টান-টান করে ধরা, তাঁর একেবারে এই নিজস্ব ছন্দোরীতি কতটা প্রশ্রয় পাচ্ছিলো সংস্কৃত ছন্দ থেকে? দুই বিপরীত প্রান্তের মাঝখানে এই পথ পেয়ে যাওয়া কিছু কি বহিরাগত সমর্থনও পাচ্ছিলো না? 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ-প্রসঙ্গ এই সূত্রে অনিবার্যতই মনে আসে। মন্দাক্রান্তার ধ্বনিকল্লোল বিষয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন : 'কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিলো, যখন ডাইনিপুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিলো কবিতা— সেই অতি দূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন।'[১১] এই 'ছন্দের গম্ভীর আন্দোলনে'রই অনুরূপ এক ঢেউ তুলছেন কবি তাঁর এ-সব কবিতায়। ঠিক কোন সময় থেকে সংস্কৃত এই কবিতাবলির সাহচর্যে তিনি ছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু 'শীতের প্রার্থনা'র পরেই তাঁর অভিনিবেশ লক্ষ্য করি কালিদাস চর্চায়, আর *মেঘদূত*-এর ছন্দ-দীক্ষা যেন সম্প্রসারিত হয়ে এলো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পর্যন্ত। অনুবাদের কারণে বোদলেয়ার বা রিলকের নিরন্তর সামীপ্য তাঁর উত্তরকালীন অক্ষরবৃত্তকে যেমন অনেকটা ঘনতা দিচ্ছিলো বলে অনুমান হয়, মন্দাক্রান্তার ব্যবহারও তেমনি নিতান্ত নিষ্ফল থাকে নি তাঁর অভিজ্ঞতায়। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণীতে গাঁয়ের মেয়েদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা 'আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু' অথবা *মরচে-পড়া পেরেকের গান*-এ 'যে-তুমি বিশ্বের প্রথম শিহরন, আলোর জাগরণ-মন্ত্র' মনে রেখেই যে এ-কথা বলছি এমন নয়, যদিও সে-ও একটা কারণ বটে। 'অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ' কিংবা 'উজ্জ্বল হলো মঞ্চ, নটনটী চঞ্চল' এ-সব রচনারও থেকে-থেকে পশ্চদ্বলয়ে 'মেঘদূত'-এর আভা আনে, আনে তার স্পন্দনগত স্মৃতি। এই ছন্দের প্রয়োগে 'নতুন পাতা' দ্বিধামুক্ত ছিলো না, 'শীতের প্রার্থনা' সে-তুলনায় আত্মনির্ভর, কিন্তু এই এখানে-পর্যন্ত-শেষ পর্যায়ে তারও পর আরেকটি নতুন মাত্রা লাগলো প্রকরণে। কেবল শ্লোকবন্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত ছন্দের ধ্বনি ভরে উঠছে, যদিও অল্প পরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। কখনো-কখনো এতটাই এসে যায় নিয়ম :

মুক্ত হলো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হলো প্রতীক্ষা;
শান্তার প্রতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু :
—উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

এর তৃতীয় পংক্তি থেকে 'যেমন টুকু সরিয়ে নিলে এর পুরোটাই পাওয়া যায় পরিমিতির মধ্যে, কিন্তু তার পরেই আবার নবীন স্তবকে সরে যাচ্ছে বন্ধন। বাঁধন এবং খোলার

মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হতে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এর পর তাঁর রচনায় দেখতে পাবো আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ-পর্যন্ত ধরতে পারছি যে ফ্রি ভার্স বা মুক্তছন্দকে তিনি খুঁজতে চান এই বিপরীত সাধনায়, গদ্যকেই থেকে-থেকে আপাত-পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, 'গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার' এই মিশ্র ধরনে। যেমন শিল্পকে জীবনের দিকে নয়, জীবনকেই শিল্পের দিকে আকর্ষণ করতে চান এই কবি, যেমন তাঁকে বলতেই হয় 'তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস/আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান'— তেমনি বাঁধা-ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাংলা কবিতার ছন্দ-অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি।

তথ্যনির্দেশ

১. এই অনুচ্ছেদে, এবং প্রবন্ধের অন্যান্য অংশেও, সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি গৃহীত হচ্ছে বুদ্ধদেবকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে। দ্র. 'কবিতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতিসংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭

২. প্রথম তিনটি লাইন 'দময়ন্তী' এবং পরের পঙক্তিগুলি 'হে কাল!' এবং 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' থেকে।

৩. এ-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত বুদ্ধদেবের মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে 'দময়ন্তী'র ঘোষণাপত্রে।

৪. লাইনগুলি পরম্পরায় 'নির্বাসন' 'মরুপথ' 'প্রেমিকারা' এবং 'মিল ও ছন্দ' কবিতা থেকে। দ্র. *যে-আঁধার আলোর অধিক*।

৫. দ্র. *সাহিত্যচর্চা* বইতে *বাংলা ছন্দ* প্রবন্ধ।

৬. দ্র. *কালো পুতুল*-এর অন্তর্গত 'বিষ্ণু দে : চোরাবালি'।

৭. সব-কটি প্রয়োগই 'বিদেশিনী'র।

৮. 'কবিতার জন্য' 'কবি : লোকের চোখে, আর হয়তো— তার জিনের', 'কোনো কুকুরের প্রতি', 'নির্বাসন', 'রাত তিনটের সনেট ২', এবং 'রবীন্দ্রনাথ' থেকে।

৯. দ্র. 'বাংলা ছন্দ'।

১০. 'নতুন পাতা'র কবিতাটির নাম 'জন্ম'। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা 'বসুধা' : *অভিজ্ঞানবসন্ত* থেকে।

১১. দ্র. *মেঘদূত*-এর ভূমিকা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি

শামসুর রাহমান

বার বার স্বেচ্ছাচারী জ্যোৎস্না কেটে গিয়েছেন হেঁটে
সম্পূর্ণ একাকী, সঙ্গী মুক্তবোধ। চোখে নাগরিক
দৃশ্যাবলী গেঁথে নস্ট্যালজিয়ার মেদুর গলায়
কবিতার ডাকনাম ধরে ডেকেছেন কী ব্যাকুল।

জলের গভীরে ব্যালে উজ্জ্বল মাছের, দেখে দেখে
কেটেছে অনেক বেলা আপনার। সে-ও এক খেলা,
যা নেয় গোপনে শুষে মেদমজ্জা, জীবনের মধু।
জলের ঈষৎ নড়া অথবা ফাৎনার ডুব দেখে

বুক করতো ধুক পুক। জল ভাগ ক'রে আচমকা
কখনো গিয়েছে বেঁকে ছিপ মধ্যরাতে, তুলেছেন
কতো মাছ একান্ত শিল্পিত পদ্ধতিতে; মেরুদণ্ডে
গিয়েছে শিরশিরে স্রোত ব'য়ে অগোচরে কখনো-বা

সহসা আপনাকেই নিলো গেঁথে অদৃশ্য বঁড়শিতে
আরেক খেলায় মেতে অন্য একজন, কায়াহীন,
অথচ কী শঠ, ভয়ংকর। যখন লুকিয়ে ছিলো
সে অদূরে বারান্দায় কিংবা বাথরুমে অন্ধকারে,

তখন না-লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আপনাকে
ঘিরে ধরেছিলো বুঝি জোনাকির মতো, হয়তো বা
লভ্রির রঙিন মেমো, কবিতার পাণ্ডুলিপি বুকে
করছিলো গলাগলি নাকি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতি

অকস্মাৎ জেগে উঠেছিলো দীপ্র, যেমন ঢেউয়ের
অন্তরালে দ্বীপ, হয়তো অসমাপ্ত বাক্য সে মুহূর্তে
মগজের কোষে কোষে হয়েছে মায়াবী প্রতিধ্বনি।
শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায়
আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম।
অফলা সময় আসে সকলেরই মাঝে মাঝে, তাই
থাকি অপেক্ষায় সর্বক্ষণ। যতই যাই না কেন দূর
অচেনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে আমার জলযান,

হাতে রাখি আপনার কম্পাসের কাঁটা; ঝড়ে চার্ট
কখন গিয়েছে উড়ে, চুলে চোখে-মুখে রুক্ষ নুন,
অস্পষ্ট দিগন্তে দেখি বৌদ্ধ মুখ। আপনার ঋণ
যেন জন্মদাগ, কিছুতেই মুছবে না কোনোদিন।

নিদ্রাতুর আঙুলের ফাঁক থেকে কখনো হঠাৎ
সিগারেট খসে গেলে চমকে উঠে দেখি মধ্যরাতে
স্মৃতির মতন এক অনুপম স্বপ্নিল বারান্দা
থাকে প'ড়ে অন্তরালে অন্তহীন, কবি নেই তার।

বুদ্ধদেব বসু ও মহাভারতের কথা

শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের নানা খাতে বুদ্ধদেব বসু অনায়াসে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর প্রতিভার ধারা। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কাব্যনাটক, আত্মজীবনী, অনূদিত কবিতা ও কাব্য; এছাড়া কিশোর সাহিত্যে হাসির গল্প এবং রহস্যোপন্যাস, প্রতিটি প্রণালীতে স্বচ্ছন্দে বয়েছে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা। আমাদের কাছে সেই স্রোত কখনও দুরবগাহ ঠেকে নি। তাঁর স্বচ্ছ প্রকাশের অন্তরালে থাকে সাধারণ পাঠকের প্রতি গভীর মনোযোগ। বুদ্ধদেব বসুর সকল সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য। স্বকীয়তা অর্জনের জন্য তিনি নিজেকে দুর্বোধ্য করেন নি, এবং আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদেরও অবজ্ঞেয় ধরেন নি কখনো।

সাহিত্যের সব দিকে তাঁর সার্থকতা সমান নয়। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেও ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বা অচিন্ত্যকুমারের, উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং কবিতায় জীবনানন্দের নাম তাঁর আগে মনে পরে একালের পাঠকদের। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি অনন্য। রম্যরচনায় বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী এক পথিকৃৎ। পরবর্তী কালে সৈয়দ মুজতবা আলীর খ্যাতিও এতে বুদ্ধদেব বসুকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু, *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*-র লিরিক মেজাজ তেমনভাবে জাগে নি আর কারও হাতে। বাংলা কবিতার আধুনিক ভাষা ও ভাবকে কাব্যনাটকে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রয়াস উত্তরসূরির অপেক্ষায় আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর কোনো একটি বইয়ের জন্য সাধারণ বাঙালি পাঠক যদি তাঁকে চিরকাল মনে রাখে, তবে, আমার স্থির বিশ্বাস, তা হবে *মহাভারতের কথা*।

এর মুখবন্ধে তাঁর উক্তি থেকে বুঝতে পারি এই গ্রন্থের মূলে আছে তুলনামূলক সাহিত্যে গবেষণা ও অধ্যাপনার তাগিদ। সে-হিসেবে এ-বিষয়ে তাঁর ‘দু খাতা ভর্তি নোট’ হয়তো একটি থিসিসে পরিণত হতে পারত, যদি-না আমাদের কথা ভেবে বুদ্ধদেব একে সাহিত্যের আসরে আনতে চাইতেন। তিনি নিজেই বললেন, “...বইখানা লিখেছি বাংলাভাষায়, এবং মনে মনে এই উচ্চাশা পোষণ করছি যে সাধারণ পাঠকপাঠিকারাও এটি পড়বেন... ।”(৬)*

মহাভারতের মর্মকথা বুঝবার জন্য এবং বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে তা দেখার জন্য তাঁর অধীত বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থের একটি তালিকা মুখবন্ধে রেখেছেন তিনি।

তা ছাড়াও পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার থেকে টলস্টয় অবধি যত প্রসঙ্গ সে-বইয়ে ওঠে, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যের বিষয়ে দেশি-বিদেশি নানা পণ্ডিতের

---

* বন্ধনীর মধ্যে শুধু সংখ্যার উল্লেখে বুঝতে হবে তা *মহাভারতের কথা*-র পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করছে (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স্ - চতুর্থ মুদ্রণ)।

মতামত যেভাবে কথিত হয়, তাতে আমরা বুঝি তিনি নিজে ছিলেন এক অসাধারণ পাঠক। নিজেকে কিন্তু পণ্ডিত বলেন নি তিনি। বলেছেন,— "আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র। এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।" (১১)। মহাভারতের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য যে শেষ হয় নি, একটি দ্বিতীয় খণ্ড পরিকল্পনায় আছে, মুখবন্ধের অন্তে তা জানিয়েছিলেন তিনি।

এই বইয়ের সম্যক সমালোচনার জ্ঞান ও সামর্থ্য আমার নেই। তবে, সাধারণ পাঠকদের তিনি নিজে যে-অধিকার দিয়ে গেছেন তার জোরে এই বই আমার মনে কেমন সাড়া জাগায় বা প্রশ্ন তোলে তা জানাতে পারি। কোন পথে তিনি তাঁর বক্তব্যের পূর্ণতা চেয়েছিলেন, তা নিয়েও কিছু ভাবতে পারি। সে-আলোচনায় আমার অবলম্বন বাংলাভাষায় *মহাভারত*-এর রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং পূর্বপঠিত কিছু বইয়ের বিক্ষিপ্ত স্মৃতি।

২.

গ্রন্থের শুরুতেই বুদ্ধদেব পাঠককে নিয়ে আসেন *মহাভারত*-এর আখ্যানের একেবারে মাঝখানে এক বনের ভিতরে। সেখান পিপাসার্ত পঞ্চপাণ্ডবদের চার ভাই—সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম, একে-একে অদূরবর্তী সরোবর থেকে পানীয় জল আনতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির চলেছেন তাদের খোঁজে।

বর্ণনীয় কাহিনীর মাঝখান থেকে শুরুর এই কৌশলে পাঠকের কৌতূহল এর পূর্বাপর দুই দিকেই ধাবিত হয়। ক্লাসিকাল পাশ্চাত্য রীতিতে এপিক শুরুর এটি স্বীকৃত প্রথা। হোমারের *ইলিয়াড* আরম্ভ হয় ট্রয়যুদ্ধ ঘটবার কালে সেই নগরীকে বহু বছর ঘিরে রাখা আক্রমণকারী গ্রিক শিবিরে। তিনি *অডিসি* শুরু করেন ট্রয়যুদ্ধশেষে ঘরে ফেরা অডিসেউসের নিখোঁজ হওয়ার বহু বছর বাদে, নিজভূমি ইথাকায় তাঁর জীবনের বিষয়ে সংবাদহীন পুত্র টেলিম্যাকাস, এবং পাণিপ্রার্থীবেষ্টিতা স্ত্রী পেনেলোপির সকরুণ দশা বর্ণনায়। শুধু হোমারের প্রাচীন এপিক নয়, পরবর্তীকালের ইউরোপের সাহিত্যিক এপিক *ইনিড*-এ কবি ভার্জিল ভস্মীভূত ট্রয় থেকে পলাতক ইনিয়াসের কথা শুরু করেন সিসিলি থেকে আফ্রিকা উপকূলে কার্থেজ-অভিমুখী পাড়িতে তার জাহাজডুবির বিবরণ দিয়ে। দান্তের *ডিভাইন কমেডি*-র প্রথম পঙক্তি রচিত তাঁর জীবনব্রজের ঠিক মাঝপথে।

আমাদের প্রাচীন মহাগ্রন্থ *রামায়ণ* ও *মহাভারত* কিন্তু শুরু হয় শুধু কাহিনীর গোড়া থেকে নয়, সেই কাহিনীর বীজ কীভাবে বোনা হয়েছিল, বর্ণিত রাজবংশের উদ্ভব ও কীর্তি কেমন ছিল, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়ে, এবং পশ্চাদ্‌পট হিসেবে আমাদের পুরাণকথার ধারাবিবরণী রেখে। মূল কাহিনী পূর্ণাকারে বলার আগে তার সারসংক্ষেপ এবং পর্বসংগ্রহ, অর্থাৎ এর কোন পর্বে কী আছে তা-ও জানানো হয় আমাদের।

বুদ্ধদেব বসু প্রাচ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্যরীতির কথারম্ভে আমাদের কাছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদের আভাস দিলেন। নেহাত প্রকরণগত প্রভেদ রচনার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি তিনি। *মহাভারত*-এর প্রকৃত নায়ক যে যুধিষ্ঠির, তাঁর এই মূল বক্তব্যকে আমাদের চোখের সামনে আনতে এমন সূচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। *মহাভারত*-এর কথা ভাবলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা প্রথমে আমাদের মনে আসে। সেখানে শৌর্যে ও বীর্যে যুধিষ্ঠির তাঁর অপর দুই ভাই অর্জুন ও ভীম, এবং প্রতিপক্ষীয় ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন সকলের তুলনায় নিষ্প্রভ। তাই শুরুতে এমন এক

জায়গায় বুদ্ধদেব আমাদের আনলেন, যেখানে *মহাভারত*-এর এক মৌলিক দ্বন্দ্বে অর্জুন ও ভীমের সাহস ও বাহুবল পরাস্ত এবং যুধিষ্ঠিরের আত্মিক শক্তি বিজয়ী। কারণ, এখানে তাঁদের এমন এক দেবতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল যাঁর শক্তির উৎস শারীরিক তেজ বা বাহুবল নয়। তিনি ধর্ম। বকরূপী ছদ্মবেশী ধর্মকে অগ্রাহ্য করার ফলে যুধিষ্ঠিরের অনুজেরা সরোবরতীরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু প্রতিটি ধর্মজিজ্ঞাসার সার্থক উত্তরদানে ধর্মকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর প্রসাদে ভাইদের জীবন ফিরে পান।

অনুচ্ছেদের অন্তে বুদ্ধদেব আমাদের জানালেন, “এই ঘটনার তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে মহাভারতের একটি মূল রহস্য বেরিয়ে পড়বে।”(২০) আমরা লক্ষ করি তিনি ‘একটি মূল রহস্য’ বললেন, ‘মূল রহস্যটি’ বা ‘একমাত্র মূল রহস্য’ বললেন না। তাহলে ধর্মের রহস্য ব্যতীত *মহাভারত*-এর বিষয়ে অন্য মৌলিক রহস্যের কথাও কি ভেবেছিলেন তিনি?

৩.

পরের অনুচ্ছেদে তিনি জানালেন, *মহাভারত*-এর কোনো আংশিক বা পণ্ডিতবর্গ নির্ণীত প্রক্ষিপ্তের বর্জনে কোনো তথাকথিত ‘দোষমুক্ত’ বা ‘আদি’ সংস্করণের বিচার তিনি করছেন না। যে-আকারে আমরা একালে এই মহাগ্রন্থের রস উপভোগ করি, তার সমগ্রতাই তাঁর আলোচ্য। এর সকল বৈষম্য ও বিমিশ্রতা স্বীকার করে তিনি বলেছেন যে তা ‘প্রমাণের জন্য গবেষকের দ্বারস্থ হতে হয় না— অথবা সে-প্রয়োজন আছে শুধু অন্যান্য গবেষকদের, আমরা যারা পাঠক ও ভোক্তা, আমাদের নয়’।(২৫)

রাজশেখর বসু *মহাভারত*-এর যে-সারানুবাদ লেখেন তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গির একটি চিত্তাকর্ষক প্রভেদ আছে। তাঁর ভূমিকায় রাজশেখর লেখেন, “যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভারতই পুরাবৃত্ত, ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার, এর কোনো অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষঙ্গিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীরস ও বাধাস্বরূপ।” এই কারণে তিনি এর এমন সারানুবাদ রচনা করতে চেয়েছিলেন যার ‘উদ্দেশ্য— মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা’।

এই মতে বিপরীতে বুদ্ধদেব সমগ্র *মহাভারত*-এর সকল অংশকে সাধারণ পাঠকের রসগ্রহণের বৈধ ভূমি করলেন। রবীন্দ্রনাথের ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে *মহাভারত*-এর জন্মকথাবিষয়ক মতকে মেনে নিয়ে তিনি লিখলেন, বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের পরে কোনও এক সময়ে ‘হিন্দুরা তাঁদের সুদীর্ঘ ও অতিবিচিত্র ঐতিহ্যের সংরক্ষণকার্যে উদ্যোগী’ হয়ে ‘অবিক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধভাবে’...‘কোনো এক অস্পষ্ট-স্মৃত ইতিহাসবিন্দুকে ঘিরে যুগ-যুগ ধরে সেই গ্রন্থ রচিত বা নির্মিত বা সম্পাদিত’ করেন, ‘প্রাচীনেরা যার নাম দিয়েছিলেন ভারতসংহিতা’। পাদটীকায় তিনি জানালেন এ থেকে ‘এমন সিদ্ধান্ত অসংগত যে বর্তমান গ্রন্থের কোনো-কোনো প্রধান অংশ বৌদ্ধযুগ-পূর্ববর্তী নয়’।(২৫)

বুদ্ধদেব *মহাভারত*-কে সংহিতা বা সংগ্রহ গ্রন্থরূপেই গ্রহণ করেছেন। সংগ্রহ বা সংকলনের সঙ্গে সংহিতার একটি তফাত আছে। কিছু বস্তুকে সংগ্রহ করলেই তারা সংহত রূপ ধরে না। সংগৃহীত বা সংকলিত ফুলের রাশিকে সাজিয়ে আমরা যখন একটি

স্তবকে পরিণত করি, তখন তারা সংহতি পায়। সংহিতায় সম্পাদকের ভূমিকা প্রধান। *মহাভারত*-এর নির্মাতারূপে খ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'ব্যাসদেব' বা 'সম্পাদক' আখ্যা পেয়েছেন।

মহাভারত-কে রাজশেখর বসুও বলেছেন 'সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদ স্বরূপ ধর্মগ্রন্থ' (ভূমিকা)। তাঁর ভূমিকার আগে রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' থেকে তাৎপর্যময় উদ্ধৃতিতে তিনি আমাদের জানিয়েছেন, "...আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি (ব্যাস) এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ...ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষ রচিত ইতিহাস নয়, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।"

মহাভারত-এর রূপ নির্ণয়ে নয়, তার উপরে একালের সাধারণ পাঠকের অধিকার নিয়ে রাজশেখর ও বুদ্ধদেবের মতভেদ। বুদ্ধদেব তাঁর বইয়ের শুরুতে যা বলেছেন, তাতে মনে হয় না তিনি আমাদের কাছে এই মহাগ্রন্থকে এক উপন্যাসের আকারে দেখাতে চেয়েছিলেন।

এক জার্মান পণ্ডিত *মহাভারত*-কে কোনো অন্তহীন ভারতবর্ষীয় অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, বহু বৃক্ষ-লতা-গুল্মবিজড়িত, বিহঙ্গধ্বনিমুখরিত এবং নাগ ও শ্বাপদ-অধ্যুষিত সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের ভিতরে পাঠক দীর্ঘকাল সবিস্ময়ে চলতে পারে, কিন্তু কখনও উত্তীর্ণ হতে পারে কি না সন্দেহ। অর্থাৎ সেই মহা অরণ্যে পথ নেই। (২১-২২)

বুদ্ধদেব মহাভারত-এর এই রূপকল্পনাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার চরিত্রনির্ণয়ে বা তার মধ্যে পারপথ সন্ধানের বিষয়ে পূর্বোক্ত পণ্ডিতের মতো হতাশ হয় নি। যত দুর্গম বা বিস্তীর্ণ হোক, প্রতি অরণ্যের এক নিজস্ব বিশেষ চরিত্র থাকে। সুন্দরবনের চরিত্র ডুয়ার্সের অরণ্য থেকে পৃথক। বুদ্ধদেব আগে *মহাভারত*-এর বিশেষ চরিত্রকে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি এর বিস্তারের মধ্যে এমন এক সূত্র খুঁজেছেন যা এর প্রকৃতিকে খণ্ডিত করে না। রাজশেখরের মনোজ্ঞ সারানুবাদের যগোপযোগিতা সানন্দে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেও বলেছেন, "...কোনো সংক্ষেপীকরণ যতই তৃপ্তিকর হোক, তা কখনো পর্যাপ্ত হতে পারে না, তা থেকে বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়, এ কথাটি মনে রাখা চাই।" (৩৭) *মহাভারত*-কে নিছক এক যুদ্ধবৃত্তান্ত বলতে একেবারেই অস্বীকার করেন তিনি। (৩৯) তিনি আরও বললেন, একে যদি কেবলমাত্র ভরতবংশের বিবরণ ধরা হয়, তাহলে প্রথমেই বন ও মৌষলপর্বকে ছেঁটে ফেলতে হবে। তিনি কিন্তু দেখলেন, *মহাভারত*-এর 'মূল কাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে'। এর 'মহান পরিকল্পনা'-র মধ্যে তিনি এক 'বদ্ধমূল অভিপ্রায়' দেখেছেন, 'যা মাঝে-মাঝে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হ'লেও অবিরলভাবে সৃষ্টিশীল' এবং তার মধ্যেই রয়েছে 'মহাভারতের ঐক্য'। (৪০)

৪.

তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখলেন, *মহাভারত*-এর মূল ঐক্যসাধনের আবশ্যক উপায় হিসেবে ব্যাসদেব একটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই চরিত্র ও তার বিকাশকে আদ্যন্ত বুঝলে আমরা সমগ্র মহাভরত-এর উদ্দেশ্য, চরিত্র, সূচনা ও পরিণতি সবই বুঝতে পারব। সেই চরিত্রই মহাভারত-এর প্রকৃত নায়ক। তা হল জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র। কোন সূত্রে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব, তা বুদ্ধদেব আমাদের শুরুতেই দেখিয়েছিলেন বক বা যক্ষরূপে মূর্ত ধর্মের প্রশ্নসম্মুখীন পঞ্চপাণ্ডবের আখ্যানে। তার পরে সারা বইজুড়ে *মহাভারত*-এর সব প্রসঙ্গের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ, এবং উভয়ের সহমুখী প্রগতি তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য হল।

ধর্ম কী, অধর্ম কী এবং স্বধর্ম কী? এই প্রশ্নগুলি অফুরন্তভাবে উচ্চারিত হয়েছে সারা *মহাভারত*জুড়ে। তাদের মধ্যে পথ করে চলেছেন যুধিষ্ঠির। তাঁকে অনুসরণ করলে আমরা এই মহাবনের শৃঙ্খলা বুঝতে পারব এবং এই অরণ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পারপথও খুঁজে পাব।

এইখানে, এ-বিষয়ে আর এগিয়ে চলার আগে, আমার মনে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব কি নিজের অজ্ঞাতসারে, *মহাভারত*-এর মর্মকথা উদ্‌ঘাটনের উৎসাহে, তাঁর পূর্ববর্তী সংকল্প, অর্থাৎ সমগ্র *মহাভারত*-কে দেখবার উদ্দেশ্য থেকে একটু সরে এলেন? এই মহাগ্রন্থকে সর্বদা নৈতিক প্রশ্নে দোলাচল কোনো একক মানবহৃদয়ের জিজ্ঞাসার অঙ্গাঙ্গি ধরে, এর অভিপ্রায়কে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের দিকে সরিয়ে আনলেন কি তিনি? অথবা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরক কোনো বীক্ষণ কি তিনি স্থগিত রেখেছিলেন তাঁর পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য?

কোনো এপিক বা মহাকাব্য যে এক মূল চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে না তা অবশ্যই বোঝাতে চাইছি না। বুদ্ধদেব ইউরোপের দুই আদিম ও লৌকিক এপিক *ইলিয়াড ও অডিসি*-র সঙ্গে, এমনকি *বাল্মীকি রামায়ণ*-এর সঙ্গে তুলনাতেও বলেছিলেন, এদের ‘মানদণ্ড মহাভারতে ছোঁয়ানো মাত্র তা চূর্ণ হয়ে যায়’।(২৬) পরবর্তী যুগের ‘সাহিত্যিক’ এপিকের সঙ্গে এই প্রাচীন লৌকিক এপিকদের কোথায় তফাত, তা অবশ্য বিশদ করেন নি তিনি। আমরা এইটুকু জানি যে *রামায়ণ মহাভারত*-এর মতো *ইলিয়াড অডিসি*ও নানা পুরাণকথা ও লৌকিক কিংবদন্তি ধারণ করে। এদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যুগের, বিবিধ আঞ্চলিক বাচনভঙ্গির প্রয়োগও পণ্ডিতেরা লক্ষ করেছেন। এসব ‘প্রক্ষিপ্তের’ প্রচুর উপস্থিতিতে হোমার কে ছিলেন, বা আদৌ কেউ ছিলেন কি না এ নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতভেদ ছিল এক সময়ে। পরে অবশ্য এইটি মোটামুটি মেনে নেওয়া হয় যে এই এপিকদের পরিকল্পনা ও নির্মাণের ছাঁচ কোনো এক বিশেষ নির্মাতা বা সম্পাদকের পরিচয় বহন করছে। *রামায়ণ মহাভারত* সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য।

আদিম ওই মহাকাব্যদের মধ্যেই বিষয়গত একটি প্রভেদ কিন্তু লক্ষ করি আমরা। *রামায়ণ* এবং *অডিসি* যে এক চরিত্রকে ঘিরে রচিত তা তাদের নামকরণেই স্পষ্ট। রামের অয়ন *রামায়ণ*। অডিসেউসের বৃত্তান্ত *অডিসি*। *ইলিয়াড* কিন্তু ইলিয়ন বা ট্রয় নগরীর যুদ্ধকথা। নায়ক অ্যাকিলিসের ক্ষোভ দিয়ে তা শুরু হলেও প্রতিনায়ক হেক্টর অচিরে তাকে পরিণত ব্যক্তিত্বে এবং মানবিকতায় অতিক্রম করে। অ্যাকিলিসের হাতে দৈব ষড়যন্ত্রে হেক্টরের মৃত্যু হলেও, শেষ দৃশ্যে তার পিতা প্রায়ামের শোকের কাছে পরাভব মেনে অশ্রু বিসর্জনে মুক্তি পায় অ্যাকিলিসের অসাড়, অমানবিক চেতনা। *অডিসি ও মহাভারত*-এর বেলায় এ-কথা বলা চলে না।

বুদ্ধদেব বসুই প্রথম যুধিষ্ঠিরকে *মহাভারত*-এর নায়ক বলেন নি। রাজশেখর বসুও তাঁকে *মহাভারত*-এর ‘কেন্দ্রস্থ পুরুষ’ বলেছিলেন। বুদ্ধদেব তা স্বীকার করেছেন। (৪১) *মহাভারত*-এর উপক্রমণিকাতেও যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব বর্ণিত আছে এক বিশদ রূপকে : “বক্ষ্যমাণ মহাভারতে দুর্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময়

মহাবৃক্ষ, অর্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল, এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।”

এই রূপকে যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষরূপে পাণ্ডবদের ধারণ করছেন। তাঁর মূল কিন্তু নিহিত তিন উৎসে। তার মধ্যে ব্যক্তিনাম মাত্র একটি। তা হল কৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধর্মময় মহাবৃক্ষের ব্যক্তিউৎসকে খুঁজে *মহাভারত*-এ কৃষ্ণচরিত্রের সন্ধান করেছিলেন। একালে ‘ইতিহাস’ বা ‘পুরাবৃত্ত’ যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থেই তিনি এক ঐতিহাসিক *মহাভারত*-কে ছেঁকে বার করে নিতে চেয়েছিলেন *মহাভারত*, *হরিবংশ* এবং সব পুরাণের অতিকথা (myth) থেকে। কৃষ্ণকে তিনি এক আদর্শ মনুষ্যচরিত্র হিসেবে *মহাভারত*-এ দেখেছেন এবং বলেছেন কৃষ্ণ সমাজসংস্কারক ছিলেন না। অর্থাৎ, সনাতন চতুর্বর্ণ সমাজের বিধি তিনি বদলাতে চান নি।

‘পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।’ (গীতা ৪/৮)

এবং

‘প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম,
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংসাৎ কথঞ্চন।’*

তিনি ভারতজুড়ে এক ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, যেখানে সাধুব্যক্তিরা মুক্তভাবে বাঁচবে, দুষ্কৃতিরা বিনাশ পাবে, বিধি-বিধান বা আইনের শাসন বলবৎ হবে এবং হিংসার স্থান থাকবে না। অহিংসার স্থান সত্যেরও উপরে। কংসের মতো অত্যাচারীর কুশাসন, জরাসন্ধর মতো নরবলিপরায়ণ সম্রাটের বিকৃত ক্ষমতাভিলাষ, কালযবনের মতো বিদেশির আক্রমণ এবং শিশুপালের মতো আঞ্চলিক ভূস্বামীদের বিদ্রোহ থেকে মুক্ত করে ভরতের প্রাপ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য তিনি তুলে দিতে চেয়েছিলেন রাজা ভরতের বংশধর যুধিষ্ঠিরের হাতে।

কৃষ্ণের ধর্ম রাজধর্ম। বহুজনের সুখকামনায় তা নির্মিত। এর প্রতিষ্ঠার জন্য সাম, দান, ভেদ দণ্ড কোনো কিছুতে তিনি কুণ্ঠিত নন। নিজেকে এর সিংহাসনে না বসিয়ে, সামরিক শক্তিতে ধার্তরাষ্ট্রদের তুলনায় হীনমান, কিন্তু ধর্মাত্মা হিসেবে প্রখ্যাত যুধিষ্ঠিরকে যে তিনি সেই ধর্মরাজ্যের প্রতিভূ ধরেছিলেন, তাতেই কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রকাশিত।

সকল কৃতকর্মা পুরুষের মতো কৃষ্ণ প্রেম ও যুদ্ধজয়ে কোনো পথকে অন্যায় ধরেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতন ধর্মবোধ এবং উনিশ শতকের নীতিবোধ তা সহ্য করতে পারে নি। ফলে কৃষ্ণচরিত্রের অতিকথা ও বাস্তবতা দুদিকেই তাঁর কাঁচি চলে। *মহাভারত*-থেকে তাঁর মনের মতো এক আদর্শ মানবমূর্তি নির্বাচন করেন তিনি। বাকি অংশ *মহাভারত*-এর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের রচয়িতার দ্বারা কৃষ্ণকে দেবত্বদানের উদ্দেশ্যে প্রক্ষিপ্ত রূপে তিনি বর্জন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বুদ্ধদেব, দুজনের লেখা থেকেই এই ব্যাপারটি কিন্তু স্পষ্ট যে *মহাভারত*-এ ধর্মের দুইটি গতি আছে; একটি বহির্মুখী, পরার্থে চিন্তিত, অপরটি অন্তর্মুখী, নিজের বিষয়ে ভাবিত। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম প্রধানত ব্যক্তিগত, কৃষ্ণের ধর্ম প্রধানত

---

* এই শ্লোকটি মহাভারত-এর কোনো অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্র’-তে উদ্ধৃত করেছেন। (কৃ.চ.–৬/৬ পাদটীকা দ্র.)

সমষ্টিগত। প্রথমটিকে যদি *মহাভারত*-এর ধর্মকাণ্ড রূপে গ্রহণ করি, দ্বিতীয়টি এর কর্মকাণ্ড। সেই অর্থে ব্যক্তিগত নৈতিক ধর্মজিজ্ঞাসা *মহাভারত*-এর একমাত্র বিষয়বস্তু বা আলোচ্য নয়। যুধিষ্ঠির প্রথম অংশের নেতা হলেও দ্বিতীয় অংশে তিনি চালক নন, প্রচালিত।

সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে এর কর্মকাণ্ডে অবজ্ঞেয় ধরেন, তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে অহংকারজাত বা আত্মকেন্দ্রিক রূপে ভর্ৎসিত করেন কৃষ্ণের মুখে। তিনি লিখলেন, "ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পরে যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইলেন। বাহানা লইলেন বনে যাইব। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ...যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার।... আমি এই পাপ করিয়াছি— আমার এ শোক উপস্থিত, আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে।" (কৃ. চ.-১১)

কৃষ্ণ তাঁর পরিকল্পিত ধর্মরাজ্যের শীর্ষালংকার হিসেবে যুধিষ্ঠিরের নির্বাচন করেন, এর সম্পাদক বা নির্মাতারূপে নয়। এর নির্মাণের জন্য কৃষ্ণের প্রায়োগিক বাহুদ্বয় ছিলেন অর্জুন ও ভীম। অর্জুনের সঙ্গেই তাঁর সখ্য নিবিড়তর। তাই তাঁকে আমরা কৃষ্ণের দক্ষিণবাহু ধরতে পারি।

আত্মানুসন্ধানী যুধিষ্ঠির যে জগতের অনেক প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও অব্যবস্থিতচিত্ত, তা মেনে নিয়েই বুদ্ধদেব তাঁর আত্মিক প্রগতিকে এক মানুষী চরিত্রের উদবর্তন হিসেবে বিচার করেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের সব থেকে দুর্বলতা দ্যূতক্রীড়ায় অত্যাসক্তি। এর ফলে তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের সকলের সর্বনাশ ঘটে। তাঁর জীবনের সব থেকে বড় স্খলন কিন্তু এসব দুর্বলতা নয়। সে-পতন ঘটে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যকে নিধনের জন্য তাঁর মনোবল ভেঙে দিতে যুধিষ্ঠির বললেন 'অশ্বত্থামা হত' এবং 'ইতি কুঞ্জর' অব্যক্ত বা অস্ফুট রাখলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "আমাদের মতে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড নরকদর্শন মাত্র নহে— অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।" (কৃ. চ-৫)

যুধিষ্ঠিরের এই পতনও কিন্তু ঘটে কৃষ্ণের পরামর্শে। কৃষ্ণ ওই মিথ্যা বলার পরামর্শ অর্জুনকেও দিয়েছিলেন। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে অর্জুন কৃষ্ণের এমন অনৈতিক পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হলেন। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরের দুর্বল চিত্তই এই বিষবীজ বপনের উপযুক্ত জমি বুঝে তাঁকে শুধু ওই অসদুপদেশই দিলেন না, প্রাণরক্ষার জন্য, কামিনীর জন্য, বিবাহের জন্য এবং গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে মিথ্যাকথনে পাপ নেই, এই কুযুক্তির সাহায্যে যুধিষ্ঠিরকে বাধ্য করলেন মিথ্যা বলতে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভ্যস্ত প্রথা কৃষ্ণের এই ভূমিকা *মহাভারত*-এর দ্বিতীয় স্তরের রচয়িতার সম্পাদিত বলে পাশ কাটিয়েছেন। তিনি বলেন এই দ্বিতীয় স্তর কৃষ্ণকে ঈশ্বর প্রমাণ করতে ব্যগ্র ছিল। মানুষের সকল সুপ্রবৃত্তির মতো তার দুষ্প্রবৃত্তিও যে ঈশ্বর থেকে আসে, এটাই প্রতিপাদ্য ছিল তাতে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র *মহাভারত* ব্যাখ্যার জন্য কৃষ্ণচরিত্র লেখেন নি। কৃষ্ণচরিত্র বোঝার জন্য *বেদ*, পুরাণ, বিশেষত *ভাগবত পুরাণ* এবং *হরিবংশ*-র সঙ্গে *মহাভারত*-এর কথা বলেছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয় এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পরে তিনি কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রয়াণ, যদুবংশের ধ্বংস এবং কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথাই বলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'-য়। যুধিষ্ঠিরের পরিণতির কথা সরে যায় তাঁর দৃষ্টি থেকে।

অপরপক্ষে সমগ্র *মহাভারত*-এর মূল জিজ্ঞাসাকে বোঝার জন্য যুধিষ্ঠিরের সমগ্র চরিত্রকে বোঝা দরকার ছিল বুদ্ধদেবের। তিনি নিজে ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের প্রথায় ওই কেন্দ্রস্থ চরিত্রের একক মানসিক বিবর্তনে তাঁর মনোযোগ।

এর কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক কৃষ্ণের মানবচরিত্র সম্বন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, "—কৃষ্ণ এখন আমাদের চোখে একজন মানুষমাত্র— অসাধারণ মানুষ তা সত্য, কিন্তু ইতিহাস-শ্রুত অন্য অনেক অসাধারণের মতোই স্খলনপ্রবণ— অন্তত পুণ্যপ্রভ বা শুদ্ধশীল তাঁকে বলা যায় না— কেননা যুদ্ধকালীন নিকৃষ্টতম কর্মগুলো তাঁরই দ্বারা সাধিত বা প্ররোচিত হয়েছিলো।"(২১৪)

বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে কৃষ্ণের ধর্মের প্রতি অভিনিবেশে যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করেছিলেন, সেভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতি মনোনিবেশে কৃষ্ণের ধর্ম বুদ্ধদেবের দৃষ্টিবহির্ভূত রইল। এতেই ক্ষান্ত হন নি বুদ্ধদেব। আরও একধাপ এগিয়ে, ধর্মাধর্ম বিষয়ে দান্তের বিচার গ্রহণে যুদ্ধজয়ার্থে কুপরামর্শদাতা গ্রিক অডিসেউসের মতো তিনি মানব কৃষ্ণকে গোলোকধামের পরিবর্তে নরকধামে স্থাপন করাই সুবিচার ধরলেন। (২০৪)

অডিসেউস যে কোনও ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য গ্রিক বাহিনীতে যোগ দেন নি, লুণ্ঠনই যে ট্রয় আক্রমণে গ্রিকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সর্বোপরি, অডিসেউসের বিপরীতে কৃষ্ণের কূটকৌশল যে কখনওই স্ত্রী-পুরুষ বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে ট্রয়ের মতো কোনো নিরস্ত্র এবং সুষুপ্ত নগরীর অসহায় সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নি, তা বুদ্ধদেবের নজর এড়াল।

এর পরে *গীতা*-র অমৃতবাণীর জন্য পৃথিবীর মহোত্তম গীতেশ্বরগণের সঙ্গে তিনি নিরয়ের প্রথম চক্রে (বুদ্ধদেব ভুল করে একে নিরয়ের বহির্বর্তী বলেছেন,) লিম্বোতে অখ্রিস্টান কৃষ্ণকে (প্রকৃতপক্ষে ব্যাসদেবকে) স্থান দিতে রাজি হলেও, সেই বাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের জীবন ও কর্মের সাযুজ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হলেন। (২০৪)

অডিসেউসের কথা যখন উঠল, তখন তাঁর বিষয়ে বুদ্ধদেবের আর-একটি আপাত-অনবধানের উল্লেখ এখানেই করি। ব্যক্তিগতভাবে যুধিষ্ঠির উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। বনপর্বে তিনি জানান, অপ্রবাসী, অঋণী এবং শাকান্নভোজী জীবনের সুখই তাঁর প্রার্থিত। তাঁর শেষ যাত্রা কিন্তু মহাপ্রস্থানের জ্যোতির্ময় দুস্তর পথে। অপরপক্ষে *অডিসি*-তে হোমার দুঃসাহসী অভিযাত্রী অডিসেউসের কাহিনীতে ছেদ টেনেছেন প্রত্যাবর্তী নায়কের স্বদেশে, স্বগৃহে ইথাকায়, নিজ স্ত্রী পেনেলোপির পালঙ্কের বুকে, নিরুদ্যম সুখনিদ্রায়। দুই বিপরীতধর্মী নায়কের এই বিপরীত পরিণতি চিত্তাকর্ষক।

অডিসি-র কাহিনীর সঙ্গে অডিসেউসের যাত্রা যে শেষ হবে না সে-আভাস হোমার কিন্তু ওই মহাকাব্যের ভিতরেই আমাদের দিয়েছেন। অডিসেউস তাঁর দুঃসাহসী পাড়িতে পরলোকের সামনে পৌছালে দৈবজ্ঞ টাইরেসিয়াসের প্রেতচ্ছায়া সে-কথা তাঁকে জানান। বরুণদেব পসাইডনের ক্রোধে অডিসেউসকে দীর্ঘকাল ধরে অত বিপদ সইতে হয় সাগরপথে। সে-রোষ নিবৃত্ত না হলে শান্তি আসতে পারে না তাঁর জীবনে। তাই ইথাকায় মিলনান্ত পরিণতির পরেও আবার বৃদ্ধবয়সে তাঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। এবারে কিন্তু তিনি যাবেন সমুদ্রের বিপরীতমুখী স্থলপথে। নৌকোর একটি দাঁড় কাঁধে নিয়ে চলতে হবে তাঁকে। অবশেষে, যে-দেশে পৌছালে লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করবে, তাঁর কাঁধের ওই বস্তুটি কী জিনিস, অর্থাৎ যে-দেশে মানুষ জানে না নৌকো কাকে বলে, সেখানে সমাপ্ত হবে তাঁর ভ্রমণ। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা ও বলি নিবেদন

করে তখন ঘরে ফিরতে পারবেন তিনি। তখন সমুদ্রের বাতাস তাঁর জন্য বয়ে আনবে শান্তি ও মৃত্যু।

বুদ্ধদেব টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণীতে জানানো সমুদ্রবাতাসবাহিত অডিসেউসের শান্তি ও মত্যুর কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু হোমার-কথিত অডিসেউসের শেষযাত্রার কথা উহ্য রাখলেন। (১৭৯) সে-যাত্রার কথা ভাবলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অডিসেউসের পরিণতির বৈপরীত্য কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, কারণ দুজনেই শেষযাত্রায় ঘর শান্তির সন্ধানে।

এর পরিবর্তে বুদ্ধদেব তৃপ্তিহীন অডিসেউস বা ইউলিসিসকে আর-এক অশান্ত সাগরযাত্রায় নিলেন মধ্যযুগীয় মহাকবি দান্তের বর্ণনা অনুযায়ী। তাতে শান্তি নয়, জ্ঞানের সন্ধানে ইউলিসিস ঘর ছেড়ে, ঈশ্বরের নিষেধ ভেঙে, জীবিত মানুষের অগম্য পশ্চিম সাগরে তাঁর শেষ পাড়ির জাহাজ ভাসিয়েছেন ও সলিলসমাধিতে প্রাণ হারিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের ঈশ্বরমুখী শেষযাত্রার বিপরীতে ইউলিসিসের এই ঈশ্বর-অমান্যকারী অন্তিম অভিযান এক চিত্তাকর্ষক বৈপরীত্য রচনা করল আমাদের মনে।

সে-সূক্ষ্ম শাতন ও সীবনের সাহায্যে বুদ্ধদেব এই বৈপরীত্যের রূপ গড়লেন, সেই সুপটু সম্পাদনার কলাতেই তিনি *মহাভারত*-এর মর্মতলের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অন্তস্তলকে মিলিয়েছেন এবং *মহাভারত*-এর '...পৌরাণিক ঐশ্বর্য, ধর্মবোধ, ভালো মন্দ বিচারে ক্লান্তিহীন ও বিচিত্র অধ্যবসায়'-কে ইউরোপের হোমার থেকে শুরু করে দান্তে অবধি সুদীর্ঘ 'ভাবরেখারই সমান্তর' করেছেন। (৩০) এ সমান্তর রেখা যে ঐতিহাসিক বাস্তবতার বহির্জগতে পৌঁছোয় না, দৃষ্টিকে একান্তভাবে অন্তর্মুখী রাখার দরুন, তা বুদ্ধদেব গ্রাহ্য করেন নি। পাদটীকায় তিনি জানালেন, "খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপীয় সভ্যতায় আমাদের অর্থে ধর্মবোধ ছিল না। তাই প্রথম যীশুভক্ত কবি অবধি রেখা টানতে হল।" (৩৪) খ্রিস্টপূর্ব যুগে রচিত ভার্জিলের *ইনিড*-কে এক রাজকাহিনী হিসেবে অগ্রাহ্য করলেও, ওভিদের *মেটামর্ফোসেস* মহাকাব্য প্রকাশিত প্রাচীন গ্রিক-রোমান ধর্ম এবং পাইথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ যে *মহাভারত*-এ প্রকাশিত ধর্মের সঙ্গে দান্তের খ্রিস্টীয় ধর্মের থেকে নিকটতর তা তিনি ভুলে গেলেন।

ফিউডাল মধ্যযুগের শেষে এবং বুর্জোয়া যুগের সূচনায় দান্তের মহাকাব্যে প্রকাশিত ধর্ম বা ভালো-মন্দের বিচার যাজক শ্রেণীর পোপতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদী বাণিজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ উচ্চারিত, তা আমরা কীভাবে আশা করতে পারি চাতুর্বর্ণ ধর্মের সমর্থক প্রাচীন যুগের *মহাভারত*-এ?

পৌরাণিক অতিকথা (myth), ধর্ম ও দর্শনের ভাবনায় যদি বুদ্ধদেব সাধারণ পাঠকের অধিকার মানেন, তাহলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক আলোচনায় কেন তার এক্তিয়ার থাকবে না, সে-প্রশ্ন আপাতত মুলতবি রাখি।

মহাভারত-এর ঘটনা ও যুধিষ্ঠিরের চেতনার ক্রমবিকাশ কী সুন্দরভাবে তিনি মিলিয়েছেন, তা একটু দেখা যাক আগে।

৫.

বুদ্ধদেব বলেন *মহাভারত*-এর কেন্দ্রস্থ পুরুষ যুধিষ্ঠির তো শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের মতো নরদেহে অবতীর্ণ ভগবান ননই, তিনি কোনো আদর্শ বীরচরিত্রও ধরেন না। যুধিষ্ঠিরের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দৌর্বল্য ও স্খলনের কথা এর আগে বলেছি। দুটি গুণ কিন্তু অনন্য করে তাঁকে। তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং জিজ্ঞাসু। এই দুই গুণের জন্য সকল ত্রুটি ও স্খলন থেকে

নিজেকে উদ্ধার করে সর্বদা তিনি নতুন পথের সন্ধান পেতে সমর্থ হয়েছেন। জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণে তাঁর শেষ হয় না কখনো। শিক্ষার সাহায্যে তিনি ক্রমাগত আরোহী করতে পারেন তাঁর চেতনাকে। বুদ্ধদেব বসুর মতে সারা *মহাভারত* যুধিষ্ঠিরের চেতনার আরোহণের বিবরণ। সমস্ত বনপর্ব জুড়ে তিনি ছিলেন এক শিক্ষার্থী। তাঁর প্রকৃত পরিচয় বনপর্ব থেকে শুরু। এই বনে, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা ছেড়ে প্রকৃতির মধ্যে মুনি-ঋষিদের সঙ্গে আলাপচারিতে তিনি তাঁর প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পান। সেখানের শিক্ষা থেকে তিনি জীবনের বিষয়ে যে-সত্য আহরণ করলেন, তা-ই প্রশ্নোত্তর বা বনপর্বে কথিত কোনও ঘটনা বা কাহিনী *মহাভারত*-এ অপ্রাসঙ্গিক নয়। এদের প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু 'অভ্যন্তরীণ, যান্ত্রিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। এবং সেটা যুধিষ্ঠিরেরই জীবন সংক্রান্ত, অন্য কারো নয়'। (৪৯)

এখানে বক, বৃহদশ্ব, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিদের পুরাণ বা কিংবদন্তির দীর্ঘ কথনে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন জিজ্ঞাসু। 'তিনি যে শুনছেন এটাই বনপর্বের ঘটনা।' (৫২) বৃহদশ্ব মুনিকে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিজের সর্বস্ব হারানোর বিবরণ জানিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর মতো হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি না। এর উত্তরে বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান বললেন ও জানালেন কীভাবে রাজা নল পাশাখেলায় তাঁর ভাইয়ের ছলনায় হেরে সস্ত্রীক বনবাসী হন। বুদ্ধদেব বলেন, সে-আখ্যানে নল কর্তৃক দময়ন্তী ত্যাগ এবং 'দ্রৌপদী ও চার ভ্রাতার জন্য যুধিষ্ঠিরের অবিচ্ছিন্ন বেদনাবোধ— এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট একটি বৈপরীত্য লক্ষণীয়'। (৪৭) বনপর্বে কথিত আখ্যানগুলি এভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও চরিত্র বিজড়িত প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে।

অরণ্যে যুধিষ্ঠির শান্তি চেয়েছিলেন এবং তার মূলসূত্র রূপে অনৃশংসতাকে খুঁজে পেলেন তিনি, যুদ্ধবিদ্যা বা রাজধর্মকে নয়। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ছাড়া ধর্মের অন্য কোনো ধরাবাঁধা পথ যে তিনি দেখেন নি, তা নিজেই বলেছিলেন সেখানে। ধর্ম যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন— পথ কী? —তিনি উত্তরে বলেন— তর্ক মীমাংসাহীন, বেদ বা শাস্ত্রজ্ঞান বিভিন্ন, এমন কোনো ঋষি নেই যাঁর মত প্রামাণিক, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত,* মহাজনেরা (এর অর্থ মহাপুরুষেরা বা বহুজন, অর্থাৎ সাধারণ লোক, দুইটিই হতে পারে) যে-পথে গেছে সেটাই পথ। অঋণী, অপ্রবাসী, শাকান্নভোজী জীবনের সন্তুষ্টি বেশির ভাগ মানুষ কাম্য মনে করেন। যুধিষ্ঠিরও সেই সরল গার্হস্থ্য জীবন চেয়েছিলেন। সন্ন্যাসে মোক্ষলাভ, বা যুদ্ধে রাজ্যলাভ, বনপর্বের শেষে কোনোটিই কাম্য ছিল না তাঁর।

দুর্যোধনের হিংস্রতায় যুদ্ধ যখন আসন্ন হল, তখন 'যুদ্ধনিবারণের জন্য, বিরোধ-ভঞ্জনের' চেষ্টায় তিনি শেষ অবধি পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা চান দুর্যোধনের কাছে। তবু তাঁকে যুদ্ধভীরু ভাবলে আমরা ভুল করব। যুদ্ধঘোষণার আগে দুর্যোধনের দূত সঞ্জয়কে তিনি দৃপ্ত ভাবে সাবধান করে বলেন, যুদ্ধে তাঁর অভিলাষ নেই, কিন্তু সঞ্জয় যেন জানে, যতদিন অর্জুনের জ্যা-নির্ঘোষ না শোনে, ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে না দ্যাখে, ধার্তরাষ্ট্রেরা ততদিনই জীবিত থাকবে।

মৃদু ও দারুণ উভয় সম্ভাবনাতেই যে তাঁরা প্রস্তুত এই বলেই ভাষণ শেষ করেন তিনি। (৯৯-১০১)

---

* বুদ্ধদেবের গ্রন্থে মূল শ্লোক উদ্ধৃত হলেও, সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদে 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' অংশটির বাংলা অনুবাদ বাদ পড়ে গেছে। (৬৭)

যুদ্ধে নিরভিলাষ, নিরীহ অথচ নির্ভীক এই মানুষকেই কৃষ্ণ (বা ব্যাসদেব) ধর্মযুদ্ধের শীর্ষে রেখেছিলেন। এ-ব্যাপারকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি দুই বিপরীত দিক থেকে। যদি যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিচেতনার উদবর্তনের দিক থেকে দেখি, তাহলে মনে হবে যুদ্ধ কখনওই সে-চেতনায় কোনও চূড়ান্ত স্থিতি আনতে পারে না। তাঁর চরিত্রকে *মহাভারত*-এর প্রতিপাদ্য ধরলে সে-গ্রন্থের তাৎপর্যও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দিয়ে বোঝা যাবে না। বুদ্ধদেব এভাবেই *মহাভারত*-কে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, "...তা (*মহাভারত*) নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয়... যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী বলে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব, আর গীতাবর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত করে নিলেই আমরা 'বিশুদ্ধ' মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই... এভাবে সম্পাদিত হলে... এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে পড়ে থাকতো..."। (৩৯)

অপরপক্ষে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের বাইরে থেকে *মহাভারত*-কে দেখলে নানা ছোট-ছোট আঞ্চলিক রাজ্য ও ধর্মে বিভক্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে সংহত এক 'মহা'ভারত করার জন্য যেমন কৃষ্ণ এবং তাঁর ধর্মসংস্থাপনের মহাযুদ্ধ এ গ্রন্থের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তেমনি সেই ধর্মরাজ্যের শীর্ষে এমন এক সম্রাটের কথা ভাবতে হয়, যাঁর চরিত্রের মূল গুণ হবে সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা। এই দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির এবং কুরুক্ষেত্র উভয়েই এ গ্রন্থের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধদেবের মতে, নিজের মুখে যুদ্ধের আজ্ঞা দেবার সময় থেকেই যুধিষ্ঠির তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি হারিয়েছিলেন। (১০১) তারপর তিনি যখন যুদ্ধরূপ ঘোর কর্মে লিপ্ত হলেন, তখন থেকে তাঁর চরিত্রের এক পতন ঘটল। তা বুদ্ধদেবের ভাষায় 'দুঃসহ নিশ্চয়ই, আমাদের পক্ষে প্রায় অভাবনীয়... যদি যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মহাভারত সমাপ্ত হতো তাহলে, সন্দেহ নেই যুধিষ্ঠির এক ভণ্ডচূড়ামণি বলে চিরকালের মতো চিহ্নিত হয়ে থাকতেন'। (১০৫) এর একটু পরে সে-যুদ্ধের অন্তের দিকে তাকিয়ে তিনি বোঝেন 'যুধিষ্ঠিরের এই সব দুষ্কৃতিও যথোচিত ও সুসংগত... এগুলিরও প্রয়োজন ছিলো তাঁর জীবনে'। এই যুদ্ধকর্মে সঞ্জাত মর্মবেদনাই যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করে উর্ধ্বতর আরোহণে। আর যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয়, অতএব সেই কুলধর্ম অনুযায়ী তাঁর পক্ষে যুদ্ধের ঘটনাজালের বাইরে থাকাও সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে দূরে চলে গেলে সেটাই তাঁর পক্ষে হত 'নৈতিক অর্থে কাপুরুষোচিত আচরণ'। (১০৬) অর্থাৎ তাতে আরও বড় এক অনুত্তরণীয় পতন ঘটত তাঁর চরিত্রে।

যুদ্ধকর্মকে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এক অনিবার্য পতনরূপে দেখাবার পরে বুদ্ধদেব *গীতা*-র সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। আমরা *গীতা*-র কথোপকথনে শুধু কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করি। যুদ্ধক্ষেত্রের সব দৃশ্য এবং অন্য সব যোদ্ধাবৃন্দ আমাদের মন থেকে সরে যায়। বুদ্ধদেব জানালেন *গীতা*-র শুরুতেই (২/৪৭, ৩/৩৫) ধর্মের এক সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রচনায় কৃষ্ণ আমাদের দুটি সূত্র দিয়েছেন, নিষ্কাম ধর্ম ও স্বধর্ম। যুধিষ্ঠিরের মুখে এর আগেই আমরা শুনেছি ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে তিনি কাজ করেন না। (বন ৩১) হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষার কালেও তিনি দুবার বলেন 'স্বধর্মে নিষ্ঠাই তপস্যা' আর 'স্বধর্মে স্থিরতাই স্থৈর্য'। (১১৮)

কৃষ্ণের স্বধর্ম আর যুধিষ্ঠিরের স্বধর্মের অর্থ কি এক? সাধারণত ধরা হয় কৃষ্ণ বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্মকেই স্বধর্ম বলেন। এতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ বৈধ ধর্ম সুনির্দিষ্ট। কৃষ্ণ কিন্তু কখনও ব্রাহ্মণের স্তব বা শূদ্রের নিন্দা করেন নি। তিনি

গীতা-য় বলেছেন ঈশ্বররূপে তিনি যেমন চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি গুণত্রয় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে কর্মের বিভাগ গড়েছেন (৪/৩১)। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মের প্রভেদে গুণত্রয়ের উল্লেখের ফলে তাঁর নির্বচন মনুসংহিতার সীমা অতিক্রম করে। (১২০, ১২১) আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে *গীতা*-র সমাপ্তিমুখে কৃষ্ণ বহু বিরোধী দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ধর্মের স্থানে 'কর্ম' এবং 'স্বভাব' শব্দদের প্রয়োগ করেছেন :

> শ্রেয়াণ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম স্বনুষ্ঠিতাৎ
> স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম। (গী১৮/৪৭)

সম্যকভাবে পরধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্ম পালন করা ভালো; (কেন না) স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে পাপাক্ত হতে হয় না। (১২২)

এখানে *গীতা*-য় স্বধর্মের সঙ্গে স্বভাবের সমীকরণের ফলে আমরা বুঝতে পারি, যুদ্ধক্ষেত্রে স্ববর্ণনির্দিষ্ট কর্মে কেন যুধিষ্ঠিরের স্বভাব পীড়িত হয়েছিল। অর্জুন বা ভীম স্বভাবত যুদ্ধাভিলাষী। যুধিষ্ঠির তা ছিলেন না। তাঁর স্বভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্র নয়, গৃহাশ্রমেও চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারল না। আরও বিপুল এক মুক্তির পথে তাঁকে তা যাত্রী করল শেষ অবধি। (১৭৯)

তা নিয়ে আলোচনার আগে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন *গীতা* শুধু অর্জুনের প্রতি বলা হলেও, অন্যেরা এর বক্তব্য কৃষ্ণের কাছেই কিছু শুনেছিলেন আগে। *গীতা* ভীষ্মপর্বে পূর্ণাকারে কথিত হলেও সেখানে সহসা প্রক্ষিপ্ত নয়। এর আগে সঞ্জয়ের সন্ধিপ্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের মন সিদ্ধান্তগ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যেসব কথায় উদ্বোধিত করেন (উদ্যোগ-২৮), বুদ্ধদেব বলেন তা *গীতা*-র তৃতীয় অধ্যায়ের এক ভ্রূণরূপ। সে-পর্বে ভীমের মুখে 'অভূতপূর্ব শান্তির বাণী শুনে' কৃষ্ণ তাঁকে যে-ভাষায় তিরস্কার করেন (উদ্যোগ-৭৩৭৪) বুদ্ধদেবের মতে তার কোনও অংশ *গীতা*-র দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেতে পারত। (১০৯)

গীতা-র মর্মকে এইভাবে মহাভারতের আখ্যান এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে সংবদ্ধ করে বুদ্ধদেব *মহাভারত*-এর অভিপ্রায় ও যুধিষ্ঠির চরিত্রের সংলগ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অন্য কয়েকটি নায়কচরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই তুলনামূলক আলোচনায় যাবার আগে একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকা দরকার মনে করি। বুদ্ধদেবের যুক্তি ও বর্ণনা অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা যেন *মহাভারত* ও তার কেন্দ্রীয় পুরুষ যুধিষ্ঠিরের সংলগ্নতাকে ভুলভাবে না দেখি। *মহাভারত* যুধিষ্ঠিরের আধার। যুধিষ্ঠির *মহাভারত*-এর আধার নন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ও এর অন্তে বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠির চরিত্রের যে-চমৎকার, 'যথোচিত এবং সুসংগত' পতন ও উত্থান দেখিয়েছেন, সেটি দেখাবার জন্য *মহাভারত*-এর কবি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অজস্র শূর ও সেনার (স্ত্রী পর্বের মতে একশো ছেষট্টি কোটি কুড়ি হাজার) নিধন দেখান নি আমাদের। বুদ্ধদেবের বর্ণনা যেমন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে *মহাভারত*-এর সম্বন্ধ দেখায়, তেমনি সেই সম্বন্ধের সীমাও নির্দেশ করে।

৬.

বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের অডিসেউস, অর্জুন, ভীম ও শ্রীরামের পৌরাণিক চরিত্রের যে-তুলনা করেছেন তাতে এক বৈপরীত্যই প্রকাশিত। অভিযাত্রী অডিসেউসের বিপরীতমুখী পরিণতি এবং বাহুবলী ভীম ও ধনুর্ধর রোমান্টিক নায়ক অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পার্থক্যের উল্লেখ আগেই করেছি। যুদ্ধে ও শত্রুনিধনে এঁদের কারও চারিত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য

ব্যাহত হয় নি। পৌরাণিক আদর্শ নায়ক শ্রীরামের মন বালীবধ, সীতাবর্জন বা শূদ্রতপস্বী শম্বুকের হত্যার মতো নিষ্ঠুর কর্মেও বিচলিত হয় নি। স্বীকৃত ধর্মের পরিলেখে আবদ্ধ এঁদের সকলের বিবেক। এর বিপরীতে *গীতা*-র অমৃতবাণীর সাহায্যে বুদ্ধদেব যেভাবে কুলধর্ম ও স্বভাবধর্মের বিরোধিতাজাত যুধিষ্ঠিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখালেন, তাতে এই পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠল। একালের উপন্যাসের দুই নায়কের ছবি এঁকে বুদ্ধদেব সেদিকে আমাদের চোখ টেনেছেন।

প্রথমে অতি সংগতভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* উপন্যাসের নায়ক অতীন বা অন্তুর কথা মনে করালেন আমাদের। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী দলেন এক মানসিক হাতিয়ার হয়েছিল *গীতা*-র বাণী। তা বিদেশি ও বিধর্মী প্রভুদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু অভিজাতবংশীয় অতীন এক কবি। সন্ত্রাসের ভয়াল পথ তার স্বভাবধর্মে নেই। সেই পথে আসে বিপ্লবিনী এলার প্রতি রোমান্টিক প্রেমের টানে। তাই প্রহরশেষের রাঙা আলোয় সে এলার চোখে যা দেখেছিল, সেই সর্বনাশই হল তাদের প্রেম এবং এলার জীবনের পরিণতি। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে নেতার আদেশে অতীন এলাকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়। স্বধর্মচ্যুত অতীনের এই নৈতিক পতন থেকে উত্তরণের কোনো পথ আমাদের দেখান নি রবীন্দ্রনাথ।

সে-উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে দুজন নায়ক, প্রিন্স আন্দ্রেই এবং কাউন্ট পিয়ের বেজুহফ। বুদ্ধদেব বিশেষভাবে 'ধনী, কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল ও অবিন্যস্ত স্বভাবের যুবক, সেন্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোর অভিজাত সমাজে ঘূর্ণমান' (১৬৩) পিয়ের বেজুহফের আত্মিক পরিণতির দিকেই আমাদের চোখ টেনেছেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়।

এখানে প্রসঙ্গের উল্লেখে তাঁর কাঁচি কিন্তু চলেছে কতকটা বিক্ষিপ্তভাবে। এর ফলে পিয়েরের আত্মিক পরিণতি আমাদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছোল না, এবং এক বিপরীত বা বিকৃত চেহারা ধরল। তা বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্তকে অপূর্ণতা ও ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

যুদ্ধ ও শান্তি-তে নেপোলিয়নের রুশ অভিযান এবং মস্কো থেকে তাঁর পশ্চাদপসরণ ও পরাজয় বর্ণিত। বেজুহফ সে-যুদ্ধে সংগ্রামী সৈন্যদলে প্রত্যক্ষ নেয় নি। সে ছিল এই ঘোর যুদ্ধের এক দর্শকমাত্র। রুশদেশ আক্রমণের কাল থেকে সে নেপোলিয়নের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করত। নেপোলিয়ন মস্কো অধিকার করলেন। যাদের কিছুমাত্র সংগতি ছিল সেইসব নাগরিক সে-শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। ফরাসি বাহিনী মস্কোয় ঢোকার কালে পঞ্চাশভাগের একভাগ লোক মাত্র তখনও ছিল শহরে। এরা সকলেই সংগতিহীন গরিব লোক। আর রয়ে গিয়েছিল অভিজাত কাউন্ট বেজুহফ। কাণ্ডজ্ঞানহীন সেই যুবক পোশাকের আড়ালে এক ভারী পিস্তল আর একটি ছোরা নিয়ে ঘুরছিল নেপোলিয়নকে আকস্মিক আক্রমণে হত্যা করার মতলবে।

তার ওই অবাস্তব পরিকল্পনা অবশ্যই সফল হয় নি, কিন্তু মস্কোয় পড়ে-থাকা গরিবদের দুর্বিপাকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তার জীবনে এক নতুন শিক্ষা শুরু হল। এদের মধ্যে সে তার প্রকৃত স্বদেশকে চিনতে লাগল। এইভাবে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন ছেড়ে বনপর্বে যুধিষ্ঠির, অযোধ্যা থেকে নির্বাসনের চোদ্দ বছরে নিষাদ গুহকের মৈত্রী, নীচকুল শবরীর ভক্তি ও কিষ্কিন্ধ্যার তথাকথিত বানরদের সখ্যলাভে শ্রীরাম, আর রাজধানী কলকাতা ছেড়ে পাড়াগাঁর কলু কৈবর্ত এবং গরিব মুসলমানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গোরা স্বদেশের হদিস পেয়েছিল। বুদ্ধদেব এঁদের চরিত্রের এই মিলটির দিকে

একেবারেই নজর রাখেন নি; নইলে আগে যেমন *চার অধ্যায়*-এর অন্তর নাম উঠেছিল, বেজুহফ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে মিল খোঁজার কালে গোরার উল্লেখ একবার জাগত তাঁর লেখায়। বহির্জগৎ থেকে দৃষ্টিকে নিবৃত্ত রাখার ফলেই এমন ঘটে।

অধিকৃত মস্কোর ঝরতিপড়তি রুশীয়দের থেকে কিছু লোক, প্রতিহিংসায় হোক বা লুটতরাজের সুবিধার জন্য হোক, সেখানের বাড়িঘরে আগুন লাগায়। জনহীন, রসদহীন শহরে দখলকারী ফরাসি বাহিনী ধরপাকড় শুরু করল এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কিছু লোককে সামরিক বিচারে অর্থাৎ নির্বিচারে জনসমক্ষে গুলি করে মারল। এক গরিব মায়ের কান্না শুনে পিয়ের এক আগুনলাগা অঞ্চল থেকে তিনবছরের একটি রুগ্‌ণ মেয়েকে উদ্ধার করে। সেই সময়ে তাকে সৈনিকেরা অগ্নিসংযোগকারী সন্দেহে আরও কিছু হতভাগ্যের সঙ্গে গ্রেপ্তার করল। বন্দিদের সারিতে পিয়েরের পাশে দাঁড়ানো কুড়ি বছর বয়সের একটি শ্রমিক ছেলেকে টেনে নিয়ে সকলের সামনে গুলি করে মারল তারা। পিয়ের দেখল যে-ফরাসি সৈন্যরা হুকুমমাফিক গুলি চালাল, তাদের বিমর্ষ মুখে এই শ্রমিক কিশোরের আতঙ্কই ছায়া ফেলেছে। মর্মপীড়িত হলেও তারা গুলি চালাচ্ছে, কারণ তা না করলে তারা নিজেরাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তখন পিয়ের যুদ্ধের 'সেই রহস্যময় সহানুভূতিহীন শক্তিকে দেখতে পেল, যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে বাধ্য করে তারই সহসৃষ্ট মানুষকে মারতে'। সেই দৃশ্য 'বিশ্বের শুভ-শৃঙ্খলা, মানবাত্মা, তার নিজের আত্মা এবং ঈশ্বরের প্রতি সকল বিশ্বাসকে ধ্বংস করল পিয়েরের অন্তরে'।

ওই বন্দিদলেরই একটি লোক, পিয়েরের পাশে বসে থাকা রুশ চাষিঘরের এক বয়স্ক সৈনিক তার সদয় মানবিক ব্যবহারে এবং গ্রাম্য ভূয়োদর্শনের দু-একটি কথায় মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল পিয়েরের মনে। সে পিয়েরকে বলেছিল, "কষ্ট পেয়ো না বাছা, কষ্ট পেয়ো না; বিপদ থাকে এক প্রহর, জীবন থাকে চিরকাল।" ওই বৃদ্ধের নাম প্লাতোন কারাতেভ। জীবন বলতে যে কারাতেভ কারও বিশেষ জীবনের কথা বলছে না, কিন্তু যিশুখ্রিস্টের বলা সত্যজীবন এবং সকল মানুষের সমবেত জীবনযাত্রার কথা বলছে, তা ক্রমে বুঝতে পেরেছিল পিয়ের। ফরাসি সৈন্যদের উপরেও ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না কারাতেভের। সে বলত,— ওরাও মানুষ। ওদের ভিতরও ভালো মন্দ আছে।

যুধিষ্ঠিরের বনপর্বের মতো এই বন্দিদশা পিয়েরের বিশ্ববিদ্যালয়। সে পরে স্বীকার করত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কারাতেভই তার শিক্ষক। পিয়ের তার কাছে সারা পৃথিবীর অখণ্ডতা শেখে, যেভাবে তার স্কুলের শিক্ষক তাকে সারা পৃথিবীর বর্তুলতা শিখিয়েছিলেন একটি গ্লোব দেখিয়ে। টলস্টয় লেখেন, "তার (পিয়েরের) মনে চিরকালের জন্য প্লাতোন কারাতেভ রইল সব থেকে শক্তিশালী, সব থেকে মূল্যবান স্মৃতি। যা কিছু রুশীয়, যা কিছু সদয়, যা কিছু সুগোল, তার সমস্তর সে ছিল ব্যক্তিরূপ।"

বুদ্ধদেব পিয়েরের বন্দিদশার প্রসঙ্গে এ-সবের কোনো উল্লেখ করলেন না। তিনি প্রথমে জানালেন অভিজাত বেজুহফের বেশ ভালোই লাগছিল ওই অনভ্যস্ত রুক্ষ জীবনের নতুনত্ব, যেখানে 'সে আর চিন্তা করছে না, শুধু অনুভব করছে। ...ভালো লাগছে অশ্বমাংসের অজ্ঞাতপূর্ব আস্বাদ, সারাদিন পায়দল চলার পরে রাত্তিরে অন্যদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে আগুন পোয়ানো ...এক দুর্দান্ত জীবনলিপ্সা তাকে অধিকার করে নিয়েছে'। (১৬৮-১৬৯)

প্লাতোন কারাতেভের নাম বা শিক্ষাদানের উল্লেখমাত্র না করে তিনি লিখলেন,—" কিন্তু যে রুগ্ন, বৃদ্ধ সাধুস্বভাব বন্দিটি সন্ধ্যের পরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই গল্প বার বার বলে; এবং যে স্পষ্টত আর বেশিদিন বাঁচবে না, তার দিক থেকে সচেতন ভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় বেজুখহ— সম্পূর্ণ করুণাহীন ও অখ্রিস্টান ভাবে। ...সে হঠাৎ উপলব্ধি করেছে যে পৃথিবীতে কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই, বন্ধন নেই— কেননা ঈশ্বর আছেন, এবং এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তা দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে জীবনই সব, জীবনই ঈশ্বর,..." (১৬৯)

বেজুহফের এই উপলব্ধি যে হঠাৎ আসে নি, অতি সাধারণ মানুষের দলে মিশে, ওই বৃদ্ধ কারাতেভের শিক্ষাতেই যে পিয়ের বেজুহফ তা অর্জন করে, এই তথ্য আমাদের কেন জানালেন না বুদ্ধদেব?

কারাতেভের দিক থেকে সচেতন ভাবে দৃষ্টি ফিরিয়েও নেয়নি বেজুহফ। বন্দিদল যখন জবরদস্তি পায়দল যাত্রায় বাধ্য ছিল এগিয়ে যেতে, এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থ কারাতেভ যখন ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে গাছের তলায় কিছু বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখনই, সে আর তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না দেখে ফরাসি সৈনিক তাকে গুলি করে মারে। অগ্রবর্তী দল এবং সেদলে চলা বেজুহফ বুঝতেও পারে নি কারাতেভকে এভাবে মারা হল। কারাতেভের পথের সঙ্গী কুকুরটা শুধু ডুকরে কেঁদেছিল। আমরা, পাঠকেরা কিন্তু ফের দেখতে পেয়েছিলাম যুদ্ধের অমানবিক শক্তিকে।

মানুষের জীবনে মৃত্যুর শান্তি যে ঈশ্বরের ক্ষমার প্রমাণ, তা কারাতেভই বেজুহফকে শিখিয়েছিল তার ওই বারবার বলা গল্পে। গল্প বলার কালে প্রত্যেকবারই এক আনন্দময় আবেগ নতুনভাবে বেজুহফ আবিষ্কার করে করে কারাতেভের মুখে। —তোমার জ্বর কেমন আছে? —বেজুহফের এই প্রশ্নের উত্তরে কারাতেভ বলে,— অসুখ নিয়ে কান্না জুড়লে ভগবান মৃত্যু দেবেন না তোমাকে। তখন থেকে কারাতেভের জীবনের বিষয়ে নিজের সব দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে বেজুহফ। সে বুঝতে পেরেছিল কারাতেভ নিজে জীবন সম্বন্ধে উদ্বেগমুক্ত। বেজুহফের অনুদ্বিগ্নতাকে 'করুণাহীন ও অখ্রিস্টান' ভেবে ভুল করেছেন বুদ্ধদেব।

জনতার মাঝে মিশে-যাওয়া বেজুহফের শিক্ষালাভ এবং কারাতেভের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকে যখনই নিবিষ্ট চোখ রাখি তখনই *যুদ্ধ ও শান্তি*-র কেন্দ্রস্থলে বেজুহফের একক ব্যক্তিত্বের বদলে তার স্বদেশ, বিশেষত মস্কো আমাদের ফোকসে আছে। এর সমান্তরাল ভাবনা *মহাভারত*-এ নিলে বুঝি যুধিষ্ঠিরও এভাবে তাঁর স্বদেশকে খুঁজেছিলেন বনপর্বে।

বুদ্ধদেব তাঁর গ্রন্থের শুরুতে *মহাভারত*-এর অন্তহীন অরণ্যের রূপ নির্ণয়ে ভারতসন্ধানের কথা ভেবেছিলেন: "যুগ-যুগ ধরে সেই গ্রন্থ রচিত বা নির্মিত বা সম্পাদিত হয়েছেলো, প্রাচীনেরা যার নাম দিয়েছিলেন ভারতসংহিতা। এখানে 'ভারত' শব্দে যুগপৎ ভরতবংশ ও ভৌগোলিক ভারবর্ষ সূচিত হচ্ছে, এবং 'সংহিতা'রও অর্থ সংগ্রহ।" (২৫)

ওই সংহিতা যেভাবে ক্রমে এক 'সর্বগ্রাহী নির্বিচার আগার' হয়ে উঠেছে, তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে, এর মূল শৃঙ্খলাকে ধরবার চেষ্টায় বুদ্ধদেব এর সেই নায়কের সন্ধান করেন, যার আত্মিক প্রগতির সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকবে মহাভারতীয় আখ্যানের উন্মোচন। একক ব্যক্তিত্বের প্রতি এই অভিনিবেশের ফলে ভারতবর্ষ তাঁর

দৃষ্টিতে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। তাই যুধিষ্ঠির এবং বেজুহফের অন্বিষ্ট স্বদেশের কথা মনে থাকে নি তাঁর।

যুধিষ্ঠির বনপর্বে যা শিখেছিলেন বেজুহফও তাই শেখে বহুজনের জীবনে মিশে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' বেজুহফের বেলায় অতি স্পষ্টভাবে তা কোনো মহাপুরুষের একক চরণচিহ্ন-অঙ্কিত পথ নয়, কিন্তু বহুজন-ব্যবহৃত জীবনযাত্রার সাধারণ সড়ক। তাই যুদ্ধশেষে গৃহাশ্রমের সাধারণ এবং উত্তেজনাহীন প্রবাহে মিশে যাওয়ার সার্থকতাকে বেজুহফ আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

বুদ্ধদেব যে এই ব্যাপারটি লক্ষ করেন নি, তা নয়। তিনি টলস্টয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন : "তিনি কি আমাদের বলতে চাচ্ছেন : 'দ্যাখো— এই স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, অতি সাধারণ, অতি দৈনন্দিন... এরাই আসল, সব যুদ্ধ ও বিপ্লব ও ঐতিহাসিক আলোড়ন পেরিয়ে এরাই টিকে থাকে... এরাই সভ্যতার আদিসত্য।'? কিন্তু এ-ই যদি টলস্টয়ের বক্তব্য, সেটি উপন্যাসের ভিতর থেকে ঠিক ফুটে ওঠে নি, তাই এর যথার্থ বিষয়ে সন্দিহান না হয়ে পারি না।" (১৭৪)

বুদ্ধদেবের লক্ষ্যে তা ফুটে ওঠেনি, কারণ বেজুহফের স্বদেশসন্ধানের কথা ভুলে তার আত্মিক বিবর্তনে নিবিষ্ট ছিল তাঁর চোখ।

রাচেল বেস্পলিফ *অন দি ইলিয়াড* নাম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে হোমার-বর্ণিত ট্রয় আক্রমণ ও টলস্টয়-বর্ণিত মস্কো আক্রমণকে যুক্ত করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক দীর্ঘ সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর পদ্ধতির বিপরীতে তিনি সেই মহাকাব্য অথবা সেই মহা-উপন্যাসের কোনও বিশেষ চরিত্রের নির্ভরে রচনা করেন নি এই সেতু। তিনি লিখেছিলেন, "পেগানের অক্ষয় কীর্তি অর্জন এবং খ্রিস্টানের অনন্ত বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যতীত দেশপ্রেম প্রকাশিত হয় না বলে 'ইলিয়াড' এবং 'যুদ্ধ ও শান্তি' ওইভাবে খেলা হয়েছিল।" "পুণ্য ট্রয়, পুণ্য নগরী মস্কো, এরাই ওই এপিকদের প্রকৃত অভিকর্ষ কেন্দ্র (center of gravity)।"

বেজুহফ বন্দি কারাতেভকে প্রশ্ন করে,— তুমি কি এখানে কষ্ট পাচ্ছ? কারাতেভ উত্তরে বলে,— দুঃখ না পেয়ে উপায় কী বাছা? মস্কো হল সব নগরের মা। তাকে দেখলে দুঃখ হবেই যে-কোনো লোকের। হ্যাঁ, পোকা বাঁধাকপি খায় বটে, কিন্তু বুড়োরা যেমন বলত, খেয়ে শেষ করার আগেই পোকাটাকে মরতেই হয়।

রুশদেশের বহুজনের একজন কারাতেভের এই দেশপ্রেম, এই আশা ও বিশ্বাস পিয়েরের অন্বিষ্ট ছিল। সেদিকে চোখ রাখলে টলস্টয়ের বক্তব্যের প্রকাশ ঠিকই দেখতে পেতেন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের কৃতিত্বকে আমি কম করে দেখছি না। *মহাভারত*-এর কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, কর্ণ, দ্রৌপদী, কুন্তী, এমনকি ভরতবংশের আদি উপাখ্যান থেকে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তকে নিয়েও কালিদাস, ভারবি, ভাস প্রমুখ সংস্কৃত মহাকবি এবং বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহান লেখকের অনেক সুন্দর কাব্য, নাটক ও জীবনচরিত্র রচনা করেছেন। যুধিষ্ঠিরের মতো নিরীহ এবং নিষ্প্রভ ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ব্যাস-পরবর্তী কোনো সাহিত্যিক কাব্য, নাটক বা চরিতকথা লিখলেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে *মহাভারত*-এর ধর্মজিজ্ঞাসার সম্পর্ক অতি নিবিড়। বুদ্ধদেব বসু সেই অভাব পূরণ করলেন অতি সুষ্ঠুভাবে। সে-হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থ 'যুধিষ্ঠিরের কথা' নাম ধরলে পাঠকদের কোনো অভিযোগ থাকে না। একে 'মহাভারতের কথা' বললে এর পরিপূরক একটি গ্রন্থের

অভাব অনুভব করি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ও বুদ্ধদেবের মধ্যে পদ্ধতিগত তফাত বিশেষ নেই, পার্থক্য রয়েছে পাত্র নির্বাচনে।

এযাবৎ সবই বলা হয়েছে *মহাভারত*-এর কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। সংগতভাবে প্রশ্ন উঠবে কর্মকাণ্ডের সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে *মহাভারত*-এর আখ্যান কেন শেষ হল না? মৌষল পর্বে *মহাভারত*-এর সকল পার্থিব ঘটনা শেষ হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত কোন অনিবার্যতায় মহাপ্রাস্থনিক ও স্বর্গারোহণ, এই দুই সংক্ষিপ্ত পর্বের প্রয়োজন হল গ্রন্থ সমাপনে?

আমি নিজের সাধ্যমতো এর উত্তর দেব এবং বুদ্ধদেব কীভাবে সমাধান দেন দেখব।

৭.

প্রাচীন কিংবা আধুনিক সাহিত্যের যত নায়কদের উত্তরণ ও সমাপ্তির সঙ্গে বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের তুলনা করেন, তাঁরা সকলেই আখ্যানের শেষে ঘরে ফিরেছিলেন। অন্তর উত্তরণ নেই। তাই তার কথা এখানে ওঠে না। যুধিষ্ঠিরের অসমধর্মা রাম ফেরেন অযোধ্যায় আর অডিসেউস ফেরেন ইথাকায়। কতকটা সমানধর্মা বেজুহফও শান্তি পায় গৃহাশ্রমে ফিরে। যুধিষ্ঠিরের বেলায় কেন অন্যথা ঘটল? দেশে ফিরেও কেন তাঁর মনে শান্তি এল না? কেনই-বা শেষ অবধি তিনি মৃত্যুকামনায় শুধু ঘর নয়, ভারতবর্ষকেও ছাড়লেন? তাঁর সনাতন ধর্মে অবশ্য সংসারী মানুষের জীবনেও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থের কোনো বিরোধ নেই। গৃহীও শেষজীবনে বনবাসী হন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুরের জীবন সেভাবে শেষ হয়। পঞ্চপাণ্ডব বা দ্রৌপদীর কেন সেরকম কিছু হলা না? দেশ ছাড়ালেন কেন তাঁরা?

এর সহজ উত্তর আমাদের মনে জাগে যে, থাকার মতো দেশ আর খুঁজে পান নি তাঁরা। যে-দেশে ও সমাজে ধর্মরাজ্যস্থাপনের মহাযজ্ঞে কৃষ্ণ ছিলেন ঋত্বিক, আর যুধিষ্ঠির যজমান, যজ্ঞান্তে দেখা গেল তাঁদের ধরে রাখার মতো সেই দেশ, সেই সমাজকেই আহুতি দেওয়া হয়েছে যজ্ঞানালে। ভস্মশেষ পড়ে আছে শুধু।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপের দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে, শান্তিপর্বে তিনি সন্তাপিত নিজকুলের উত্তরাধিকারী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যুকে হারানোর শোকে। অজ্ঞানতাবশত নিজেদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকে হত্যা করার জন্যেও দারুণ অনুতাপ ছিল তাঁর। আশ্বমেধিক পর্বের শুরুতে এভাবে স্বজনবিয়োগজাত বেদনায় তিনি কাতর হন ভীষ্মের মৃত্যুতে। কৃষ্ণের কথায় এই কাতরতা কাটিয়ে উঠে তিনি রাজ্যশাসন এবং সাম্রাজ্যবিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অন্যান্য ভাই এবং বিদুরের সহায়তায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন পাণ্ডবরাও কৌরব। তাই এটি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের হৃতরাজ্য উদ্ধারে পাণ্ডবেরা তাদের মামাতো ভাই কৃষ্ণকে নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় এবং কৌরবদের প্রতিপক্ষীয় পাঞ্চলদের দলে যোগ দেয়। তারপর দুর্যোধনের কাছ থেকে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীর অধিকার আদায় করতে না পেরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘোষনা করে তারা।

যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্র বংশে দাসীপুত্র যুযুৎসু ছাড়া কেউ রইল না। সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সব পুত্রদের হত্যা করেন এবং পাঞ্চালদেরও নির্বংশ করেন।

পাঞ্চালেরা নির্বংশ হতে যুদ্ধশেষ হল। পাণ্ডব বংশে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান ছাড়া কেউ ছিল না বংশরক্ষায়। চেদি প্রভৃতি অন্যান্য রাজাদের কুলও নিঃশেষ হয়েছিল। একমাত্র কৃষ্ণ ও তাঁর যদুবংশ ছিল যুধিষ্ঠিরের জীবিত মিত্রপক্ষে।

আশ্রমবাসিক পর্বে তাঁর মনস্তাপের দ্বিতীয় পর্যায় বনবাসিনী কুন্তীর কাছে এভাবে ব্যক্ত করেন যুধিষ্ঠির : "বিশেষত এই পৃথিবী লোকশূন্য হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশরক্ষা করে এমন আর কেহই নাই। ...চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে... একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবন ধর্মসাধনাতেই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়।" (আ: ৩৫)

আশ্রমবাসে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, একে-একে সবাই প্রয়াত হলেন। মৌষল পর্বে যদুবংশ একবারে ধ্বংস হল। স্বয়ং কৃষ্ণ রইলেন না পৃথিবীতে। ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠির ও বাকি পাণ্ডবদের মানসিক অবলম্বন কিছুই রইল না।

বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরের এই নিঃসঙ্গতা লক্ষ করার কালে তাঁর জীবনে ধার্মিক আদর্শের পরিবর্তনের প্রতি বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট। বনপর্বে ধর্ম যুধিষ্ঠিরের সামনে এসেছিলেন বকরূপে বা জলবাসী যক্ষরূপে। আশ্বমেধিক পর্বের শেষে তিনি যুধিষ্ঠিরের দানসভায় দেখা দিলেন অর্ধদেহে সুবর্ণরোমধারী মহাকায় অদ্ভুত এক নীলচক্ষু নকুলরূপে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিলেন, সাম্রাজ্যবিস্তারে পরে এই দানের ঘটা কোনো এক দরিদ্র মানুষের নিজের সর্বশেষ আহর্য এক মুঠো ছাতু অতিথির প্রতি দানের তুলনায় পুণ্যার্জনে কত অকিঞ্চিৎকর হয়। যুধিষ্ঠিরের স্বভাবধর্ম এখন যে রাজ্যত্যাগের দিকে বিবর্তিত হচ্ছে নীলচক্ষু নকুলের আখ্যান *মহাভারত*-এ তা-ই বুঝিয়েছিল।

বুদ্ধদেব বলেন সকল পাণ্ডবদের এই ক্ষমতা হারাবার আভাস *মহাভারত*-এ সূচির হয়েছে অনেক আগে থেকে, যখন সর্বভুক হুতাশনই গ্রাস করলেন পাণ্ডবদের সব ক্ষমতার চিহ্ন। যুদ্ধশেষে অর্জুনের রথকে ধ্বংস করে অগ্নি। ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী অরণ্যবাসে প্রাণ হারান দাবানলে। মহাপ্রস্থানের পথে হুতাশনের নির্দেশে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব নিক্ষেপ করে সমুদ্রগর্ভে। গৃহস্থের অতি পবিত্র অগ্নিহোত্র নির্বাপিত করে, সলিলে অনল নিক্ষেপ করে তাঁরা বেরিয়েছিলেন সেই মহাযাত্রায়।

মহাপ্রাস্থনিক পর্বের শুরুতে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন নি যুধিষ্ঠির। অর্জুনকে তিনি বললেন : "ভ্রাতঃ! কালই প্রাণীদিগের কার্যসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরের সংকল্প শুনে বাকি পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদীও প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাদাসীপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যপালনের ভার দিয়ে, কৌরব সিংহাসনে উত্তরার গর্ভজাত অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করে এবং ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন যাদবদের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে দিয়ে তাঁরা রাজ্য ছাড়লেন।

এই যাত্রায় ঈশ্বরদর্শন নয়, স্বর্গলাভ নয়, মৃত্যু ছাড়া তাঁদের যে আর কিছুই প্রার্থিত ছিল না, তা লক্ষ করলে আমাদের মনে *যুদ্ধ ও শান্তি*-র প্লাতোন কারাতেভের ছবি ফুটে ওঠে। তার শেষ পদযাত্রাতেও ঈশ্বরের ক্ষমারূপে মৃত্যুর আশীর্বাদ তার প্রার্থিত ছিল।

আর আশ্চর্য হয়ে দেখি, একটি কুকুর সঙ্গী ছিল কারাতেভের শেষ চলার পথে। ঠিক ওইভাবে, হস্তিনাপুর ছাড়ার সময় থেকেই কুকুরের ছদ্মরূপ গ্রহণে ধর্ম চলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করে, তাঁর পথের সঙ্গী হয়ে।

ধর্মের এই রূপান্তার নির্দেশ করে যুধিষ্ঠিরের আদর্শের নবরূপায়ণ। *মহাভারত*-এ বিভিন্ন সময়ে নানা মনুষ্যেতর প্রাণীরূপে ধর্মকে দেখে আমার মনে হয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ধর্ম যে সরল এবং প্রজাতিগত (specific), তাতে যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অস্থিরতা নেই, সে-কথাই বোঝানো হয়েছে। নব পরিস্থিতির বা অভিজ্ঞতার মাঝে ব্যক্তির স্বভাবধর্ম যখন নব আদর্শ গ্রহণ করে, তখন সেই ধর্মের রূপও প্রকাশিত হয় অপর এক সরল আকৃতিতে।

বুদ্ধদেব বলেন পাণ্ডবদের এই সপরিবার মৃত্যুমুখী যাত্রাকে সন্ন্যাসগ্রহণ বলা যায় না। তিনি দেখালেন, সারা ভারতবর্ষের উপকূলভাগ প্রদক্ষিণ করে তাঁরা যখন পশ্চিম তটে জলমগ্ন দ্বারকাপুরীতে পৌছেন, তখনো তাঁদের গন্তব্য অকথিত। মহাভারত বলে দেশ পরিক্রমার পরে তাঁরা পৃথিবী পরিক্রমার বাসনায় সেখান থেকে উত্তরমুখে চলেন। বুদ্ধদেব দেখালেন এই পথে যুধিষ্ঠিরই নেতা ও প্রচালক, প্রচালিত নন। তখন না জানলেও পরে যুধিষ্ঠির এবং আমরাও জানতে পারি এই পথে অনুগত কুকুরের রূপে ধর্মও চলছিলেন যুধিষ্ঠিরের পদচিহ্ন ধরে। যুধিষ্ঠির কাউকে অনুসরণ করেন নি।

তাহলে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো আদর্শকে সামনে রেখে কি এগিয়ে চলছিলেন যুধিষ্ঠির? নিজেদের ধর্মের অপূর্ণতা অনুযায়ী দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম, সবাই মৃত্যুর কোলে একে-একে ঢলে পড়লেন সে-পথে। যুধিষ্ঠির থামলেন না, ফিরে তাকালেন না। শুধু তিনি আর তাঁর অনুগামী কুকুর যাত্রী সেই দুস্তর পথে। তখন ইন্দ্রের রথ সেখানে এল তাঁকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে। সশরীরে স্বর্গে যাবার কোনো ইচ্ছা যুধিষ্ঠির কিন্তু এ-পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি।

এইখানে স্বভূমি থেকে নির্বাসিত আর-এক স্বগযাত্রীর ছবি আমাদের মনে ভাসে। তিনি দান্তে। তাঁর স্বর্গবাসিনী প্রেম তাঁকে এক দিব্যদর্শনে পৃথিবীর সব কলুষ থেকে মুক্ত করে স্বর্গের পথে নিয়ে চলেছিল। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে দান্তের লেখা ইউলিসিসের কথা যদি বলতে পেরে থাকেন, তাহলে স্বর্গমুখে দিব্যাভিসারী স্বয়ং সেই কবির কথা এখানে একবারও ভাবলেন না কেন? নিঃসঙ্গ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখের অদৃশ্য আদর্শকে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি দেখতে পেতেন।

ইন্দ্র তাঁকে দেবযানে উঠতে বললে যুধিষ্ঠির তাঁর পথের সঙ্গী কুকুরকেও রথে তুলতে চাইলেন। অমন অপবিত্র জীবকে স্বর্গে নিয়ে যেতে দেবরাজ অসম্মত হলে যুধিষ্ঠির বললেন তাঁর বহুদিনের পথের সঙ্গী এই কুকুরকে ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন না।

স্বর্গ প্রত্যাখ্যানে যুধিষ্ঠিরের নব আদর্শ বাণীরূপ পরিগ্রহ করল। এ সেই 'জীবে প্রেম', যাকে ছেড়ে, বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন, ঈশ্বরকে আর কোথাও খোঁজার প্রয়োজন সেই। মৃত্যুমুখী কারাতেভের জীবনের বিষয়ে পিয়েরের উদ্বেগহীনতাকে বুদ্ধদেব করুণাহীন ও অখ্রিস্টান ভেবেছিলেন। কতকটা সেই ধারায় দেবরাজ প্রশ্ন করেন, অপর ভাইয়েরা এবং দ্রৌপদী পথে মৃত্যুমুখে পড়লেও তিনি যখন থামেন নি, তখন এক কুকুরের জন্য যুধিষ্ঠিরের এই উদ্বেগ কেন? যুধিষ্ঠির উত্তরে জানান, ইহলোকে মৃতের সঙ্গে মিলন বা দ্বন্দ্বের ক্ষমতা কারও নেই। জীবনদানে অসমর্থ বলেই তিনি

তাদের ত্যাগ করেন। জীবিত অবস্থায় তাদের ছেড়ে যান নি এবং এখন এই আশ্রিত জীবকেও পরিত্যাগ করতে পারবেন না তিনি।

যুধিষ্ঠিরের ঘোষণা শোনামাত্রই পথের কুকুর ধর্মরূপে প্রকাশিত হলেন এবং সর্বভূতে ক্রিয়াশীল যুধিষ্ঠিরের দয়াধর্মকে অভিনন্দিত করলেন। দান্তেও নিজহৃদয়ের ভালোবাসাকে অনুসরণ করে আকাশমার্গে আরোহী হন এবং অবশেষে উচ্চতম স্বর্গের অগ্নিলোকে ঈশ্বরের জ্যোতির মধ্যে দেখেন সর্বভূতে ক্রিয়াশীল সেই 'প্রেম, যা সূর্য এবং আর সব তারাদের চালক'।

সর্বভূতে ক্রিয়াশীল এই প্রেমেরে ধর্ম ইংরেজিতে 'charity' এবং সংস্কৃতে 'দয়া' নামে অভিহিত। *মহাভারত*-এ নীলচক্ষু নকুলরূপে ধর্ম কিন্তু আমাদের আগেই সাবধান করেছিলেন, কাউকে কিছু অর্থদানে আমরা যে-আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি, তার সঙ্গে 'দয়া' বা 'চ্যারিটি'-র সমীকরণ সংগত নয়।

দেবযানে আরোহমাণ যুধিষ্ঠিরকে দর্মও প্রীত মনে জানালেন, বকরূপে বনপর্বে তিনি যখন মৃত পাণ্ডবদের মধ্যে যেকোনো একজনের জীবনদানে সম্মত হন, এবং যুধিষ্ঠির যখন সহোদর ভীম বা অর্জুনের পরিবর্তে মাদ্রীতনয় নকুলের জীবন প্রার্থনা করেন তখন তাঁর মধ্যে এই একই ধর্মপরায়ণতা প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপে কৃষ্ণ যে-আত্মকেন্দ্রিক নঞর্থক ধর্ম দেখেছিলেন, তা *মহাভারত*-এর শেষে রূপান্তরিত হয়ে এইভাবে সদর্থক সর্বভূতে ক্রিয়াশীল প্রেমধর্মে স্থিতি ও শান্তি পেল।

বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের এই সদর্থক ধর্মের বিশেষ আলোচনা করেন নি তাঁর গ্রন্থশেষে। যুধিষ্ঠির কেমন স্বর্গলাভ করলেন তা নিয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন না। তিনি দেখালেন, আমাদের 'মর্ত্যভূমির মরণশীল মানুষ-এর' জীবনে 'সব যুদ্ধ থেমে যাবার পর এবং সব আশ্রয় ভেঙে যাবার পর' যা 'অবশিষ্ট থাকে' যা কেউ দান করে নি আমাদের, কিন্তু আমরা নিঃসঙ্গভাবে নিভৃত চিত্তে উপর্জন করেছি... আমাদের সেই শেষ সম্পদের প্রতীকরূপে, কোনো দুর্লভ অথচ প্রাপণীয় সার্থকতার প্রতিভূরূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকালের মতো বাসা বাঁধলেন যুধিষ্ঠির— ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাঁকে তুলে নিয়ে ইন্দ্রের রথ আমাদের পক্ষে 'অগম্য ধামে মিলিয়ে গেলা'। (২৭৮)

বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গারোহণ পর্বে অনুসরণ করলে দেখতে পেতেন, সেখানেও প্রথাগত স্বর্গলাভকে প্রত্যাখ্যান করে যুধিষ্ঠিরের প্রেমধর্ম। যুধিষ্ঠির স্বর্গে পৌঁছে দেখলেন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ হারানোর কারণে দুর্যোধন প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রগণ সকলেই বীরলোকে শোভমান। তাঁর ন্যায়বান ভাইদের, ধর্মচারিণী দ্রৌপদীকে, মহাবীর কর্ণকে, বা পাঞ্চাল কুলের কাউকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এঁরা কোথায় আছেন। এঁদের সাক্ষাৎলাভের জন্য ব্যগ্র ছিল তাঁর হৃদয়। এর উত্তরে ইন্দ্রের আজ্ঞায় এক দেবদূত তাঁকে ভয়ংকর নরকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন তাঁর স্বজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তিনি যাদের ভালোবাসেন তারা সকলেই নরকে দেখে যুধিষ্ঠির বললেন দুর্বৃত্তের সঙ্গে স্বর্গে বসবাস করার কোনো বাসনা নেই তাঁর। জীবনে যাদের ভালোবাসতেন তাদের সঙ্গে এই নরকেই তিনি থাকতে চান।

একথা তিনি বলামাত্র সেই মায়ানরক অন্তর্হিত হল। দেবতারা এসে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন অশ্বত্থামার বিষয়ে মিথ্যাকথনের জন্য তাঁর ওই ক্ষণিক নরকদর্শন হল। তার

প্রিয়জনেরা সকলেই নিজের কর্ম অনুযায়ী অভীষ্ট দেবলোকে স্থান পেয়েছেন। ধর্ম এসে জানালেন, এটি ছিল যুধিষ্ঠিরের শেষ পরীক্ষা। এ-পরীক্ষাতেও যুধিষ্ঠির তাঁর স্বভাবধর্ম থেকে বিচলিত হন নি। *মহাভারত* সমাপ্ত হল স্বর্গলাভের উপরে যুধিষ্ঠিরের প্রেমধর্মের বিজয় ঘোষণায়।

উপসংহার

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের আত্মকলহে দীর্ণ, নৈতিক অবক্ষয়ে জীর্ণ, শতচক্রান্তে রন্ধ্রময় এবং আঞ্চলিক বিভেদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন যে-পটখানি *মহাভারত* মেলে ধরে, আজ স্বাধীনতালাভের ষাট বছর বাদে চারপাশে সেই পৌরাণিক আদল আবার ফুটছে দেখে আমরা শিউরে উঠি। অথচ দেশের সংহতি ফেরাতে আমাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের মতো কোনো পরিচালক নেই, যুধিষ্ঠিরের মতো সততার কোনো প্রতিভূ নেই। তাই আজ *মহাভারত*-এর প্রকৃত বার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*-র সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারতের কথা* মিলিয়ে পড়া দরকার। এদের পরিপূরক একটি তৃতীয় পাঠের কথাও ভাবা উচিত আমদের, কারণ *মহাভারত* পুনরাবৃত্ত হয়েছে এদেশে। রবীন্দ্রনাথকে বারবার আহ্বান জানিয়েছিল ঐতিহাসিক হিন্দুস্থান। সেখানে তিনি রথে-প্রতিরথে জটিল রেখার জালে শুভ-অশুভর আলপনা এবং জীর্ণ যুগান্তের আরও ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখেছিলেন অস্তদিগন্তে। সেই সাবধানবাণী স্মরণে, কোনও বিশেষ চরিত্রকে আখ্যানের কেন্দ্রে আনার বদলে সারা দেশের পটভূমিতে হস্তিনাপুরকে ভরকেন্দ্রে রেখে, এই ভারতসংহিতাকে ফিরে পড়তে হবে আমাদের। আজ ফিরে দেখতে হবে নানা চরিত্র কীভাবে নিজের-নিজের সামর্থ্যে এই পুরাকথার মণ্ডপকে ধরেছিল এবং ভয়ংকর লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে মহাশ্মশানে পরিণত হওয়ার নিয়তি থেকে ভারতবর্ষকে কেন রক্ষা করা যায় নি।

অশ্লীলতার কাব্য?

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

...এই প্রতিভাশালী নবীন কবি কাব্যামোদী সমাজে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্বে 'অতি আধুনিক' সাহিত্যের প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকখানি এই কবিকে সহিতে হইয়াছে। তথাপি বিশেষভাবে যে-দু-একটি কবিতা বাজারচালান নীতির মাপকাঠিতে অপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহা হুবহু সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি যে দুঃসাহসী, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 'দুঃসাহসে দুঃখ হয়' –শৈশবে পাঠ্য পুঁথির মারফত এই অমূল্য উপদেশ পাইয়াও যাঁহারা দুঃসাহস প্রকাশ করেন, তাহাদিগকে ঠেকাইবার কোনোই উপায় নাই।

সাহিত্যে, কবিতায় শ্লীল ও অশ্লীলের সীমারেখা লইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবর অমল হোম পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, —সর্ববাদীসম্মত কোনো মীমাংসাই হয় নাই— হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। কাব্যে অশ্লীলতা কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। এক-এক যুগে দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকাশভঙ্গির তারতম্য ও ভাষার চাতুর্যের আবরণ কোথাও নিবিড়, কোথাও তরল! একশ্রেণীর রুচিবাগীশ জগতে আছেন এবং থাকিবেন, যাঁহারা সাহিত্যে বা কাব্যে যৌনমিলন সম্পর্কিত আবেগ, আক্ষেপ ও উন্মাদনার বর্ণনা বা ইঙ্গিত মাত্রকেই অশ্লীল মনে করেন ও করিবেন। আবার একশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বা মুখ্যত স্থূল কামবিলাসমূলক পদাবলী শুনিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ করেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা শুনিলে অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণবিবর রোধ করিবার ভাণ করিয়া লজ্জায় আরক্ত মুখে অধোবদন হন। এই দুই শ্রেণীর কাব্যামোদীরা নিশ্চয়ই 'বন্দীর বন্দনা'-র কোনো-কোনো অংশ বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া নিষ্ফল।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত না-হইয়াও যাঁহারা বলেন, অসুস্থ যৌনস্পৃহার বীভৎসতাকে উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া সস্তা বাহাদুরী লওয়া ছাড়া এই কবির কাব্যসৃষ্টির মূলে আর কোনো বস্তু নাই, তাঁহারা একদেশদর্শী। প্রত্যেকটি কবিতাকে সমগ্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ না-করিয়া দু-একটা পঙ্‌ক্তি লইয়া বিদ্রূপ, বিরক্তি এবং কটুভাষা করিলে তাহা আর যাহাই হউক, সমালোচনা নহে।

যাঁহারা সাহিত্য-পল্লীতে খড়ম পায়ে দিয়ে খট্ খট্ করিয়া পাড়া মাতাইয়া চলাফেরা করেন, তাঁহাদের মুখে বুদ্ধদেবের কবিতার কুৎসা ও অকীর্তির বার্তা পাইয়াছিলাম। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এই কবির অনেক কবিতাই পড়িয়াছি। সমালোচকগণের নিন্দা ও ধিক্কার সত্ত্বেও বুদ্ধদেব যে কবি, একথা মনে-মনে স্বীকার করিয়াছি। 'বন্দীর বন্দনা' ভালো করিয়া পড়িয়া সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইল।

বুদ্ধদেব কবি এবং বর্তমান যুগের কবি।....

মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন;

স্রষ্ট শুধু চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন–
নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি করে থেকে যেমন পশুরা।

বিষ-তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এই উগ্র প্রশ্নকে 'অশ্লীল' বলিয়া নাক সিটকাইয়া দেওয়া যায় না। প্রেম, বিবাহ, মন্ত্র ইত্যাদি আভরণহীন নিছক নিরাবরণ যৌন-লিপ্সা জীবের স্বভার-ধর্ম— এই সুস্পষ্ট সত্য অপ্রিয় বটে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবার অধিকার কবির আছে। এবং তাহা বলিতে গিয়ে কবি বাজার-চলিত ভণ্ডামির আশ্রয় লন নাই, ক্ষতকে পুষ্পোচ্ছাদিত করিয়া প্রকাশ করেন নাই, সৃষ্টির অন্ধ প্রেরণাকে 'জন্মজন্মান্তরের প্রেম সম্পর্ক' নাম দিয়া নরনারীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।...

আমি যে রচিব কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্যে রচিলাম এই গর্ব বিদ্রোহ— আমার

এই মনুষ্যোচিত গর্বের যে-বিদ্রোহ– সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন, অবশেষে জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া অন্ধ সৃষ্টিশক্তির অনুগামী মানুষের তাহার নিজের স্বতন্ত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্যে মহীয়ান করিয়াছে, 'বন্দীর বন্দনা' গীতি তাহারই উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত।

বলা বাহুল্য বর্তমান যুগের মানুষের সবখানি কথা আলোচ্য কবিতার বইটিতে নাই। এই কবিতাসংগ্রহে কবির একই ভাবের দশটি কবিতা রহিয়াছে। 'উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে' বসিয়া কামনার ও বাসনার মন্থনসঞ্জাত সুধাবিষ আহরণ করিয়া কবি কবিতার পাত্র ভরিয়া আনিয়াছেন। তিনি কিছুই পরিহার করেন নাই, আহরণ করেন নাই,... যৌবনের স্বপ্ন ও কল্পনা, ক্ষুধা ও লোভ যত বিচিত্র পথে গিয়াছে, সে সকলই পরিভ্রমণ করিয়া কবি 'মোহমুক্ত' হইয়াছেন— নরনারীর আকর্ষণ ও মিলনের অপূর্ণতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও ভালোমন্দ সমস্তই প্রথমে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া, পরে 'প্রেমিক' রূপে সন্তোষের সহিত সমগ্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধির নয়নে হৃদয়াবেগের বসন বাঁধিয়া, অ-দৃষ্টের অন্ধ অনুগামী হইয়া না-জানার মূঢ় সন্তোষ লইয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা প্রসন্নতার ভান করে নাই, মহৎ ও বৃহতের উপর ধ্রুবদৃষ্ট রাখিয়া, ক্ষুব্ধ অসন্তোষ অণুমাত্র গোপন না-করিয়া, কামনা ও ভোগকে যথাযথ স্থান দিয়া যৌবনকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন।...

এক অতুলনীয় কবিপ্রতিভার প্রভাবে বাংলার কাব্য-সাহিত্য যখন ... আধ্যাত্মিকতার আকাশে অস্পষ্টতার জাল বুনিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন যে-কয়েকজন কবি উহাকে মর্ত্যমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই অন্যতম। এবং এই নবীন ভাবধারাকে কাব্যের রূপান্তর বহন করিয়া আনিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে— আমি অসংকোচেই বলিব— বুদ্ধদেবের স্থান অন্যান্য অনেকের অগ্রে, কাহারো পার্শ্বে, কিন্তু পশ্চাতে নহে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩৯

সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব

সন্তোষকুমার ঘোষ

একটি কলমের থেমে-যাওয়া নিয়ে লিখতে গিয়ে বরাবরের প্রগল্‌ভ একটি কলম আজ কেবলই থেমে থেমে যাচ্ছে। তাতে যে মুঠো করে ধরে আছে, সে "কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়" গানটার মানে এতদিন বাদে, এই বয়সে, নতুন করে শিখছে। প্রচলিত অর্থে নিঃসম্পর্কিত কারও প্রয়াণে ১৯৪১ সনের ৭ আগস্ট যার চোখের পাতা ভিজে যায় সে তো তখন সবে কৈশোরের গন্ডী ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মাত্র। ওই বয়সে কান্নার গান বীণায় আনা সাজে। কিন্তু পোড়-খাওয়া এই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও তার ভিতর-বাহির যদি ঝাপসা একাকার হয়ে যায়, তবে দোষ-দুর্বলতা তার— কলমের নয়। সে পাড়ে বসে কতজনকে সম্মুখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেখল, তারা দূর থেকে দূরে গেল, তবু কই ইতিপূর্বে সে এত বিচলিত বোধ করেনি তো। কোমল একটা অনুভবের কথা কথায় বাঁধা কত কঠিন, তা এই লেখক আজ আবিষ্কার করছে এই প্রথম। পরে কী লিখবে, লিখতে পারবে তার ঠিক নেই, তাই সবচেয়ে আগে সে অলজ্জ অকুণ্ঠ এই সত্য স্বীকারোক্তিটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চায়, অনেক-অনেক দিন পরে সে, নির্মম নির্মোকে সর্ব অঙ্গে ও মনে আবৃত পুরুষ হয়েও আর একজন পুরুষের জন্য কাঁদল। সেই জলে শুরু তার চোখ নয়, তার সত্তা তার অহং-ও ভেসে গেল, বারে বারে, পর পর কয়েক দিন ধরে।

নতুবা এই লেখাটায় সে হাত দিত না। কোনো শেষ শোভাযাত্রায় সে সচরাচর হরিধ্বনিতে গলা মেলায় না, কোনো শবাধারে কদাচ পাঠায় না ফুলের মালা। প্রথমত এই কারণে, মর দেহাবশেষ কোনোদিন চেয়েও দ্যাখে না কে দিল, আর কী দিল। আর দেহমুক্ত বলীয়ান যে প্রাণ তার কিছুই দরকার নেই, সে ইন্দ্রিয়নির্ভর কোনো তৃপ্তির জন্য তৃষিত নয়, পার্থিব কোনও পুষ্পের জন্যও না। কেন না প্রাণ তখন মহাশূন্যের সহস্রদল নীলোৎপলে বিলীন, সেই প্রাণ তখন অপর্যাপ্ত পারিজাতের আঘ্রাণে রোমাঞ্চিত, সর্বোপরি, সর্ব-স্বাধীন। এই স্বাধীনতার কথা বুদ্ধদেব নিজেই উচ্চারণ করে গেছেন তাঁর শেষ পর্বের একটি কবিতায়, "শূন্য শিশি ধ্বংস করে যেদিন, গন্ধ হয়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন!" এই মুহূর্তে সন্তপ্ত বা সজল কিছু রচনা অতএব তাঁর স্বাধীনতার প্রার্থনায় হস্তক্ষেপ, যে-কোনো গদ্‌গদ বাক্যবিন্যাস শবাধারে মালা দেওয়ার মতই অর্থহীন। অসময়োচিত, অসমুচিত, যে 'বন্দী' একদা বন্দনা গান গেয়ে তুমুল আলোড়ন আনেন আমাদের সাহিত্যের দিকে এবং দিগন্তে, তাঁর শেষ মুক্তি-অভিলাষে বিলাপের ছিটে দিয়ে শুক্লতাকে যেন কলঙ্কিত না করি। বাঁধা রুচির, বাঁধা শুচিতাবোধের। আমাদের অগম্য অনায়ত্ত তিনি এখন ঈশ্বরের হাতে।

স্মৃতি ছড়ানো সামনে, সজল পাত্রে পাত্রে। সেই নিপুণতা নেই যে, কাঠি ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে আজ জলতরঙ্গের সংগীত বাজাতে পারি। অজস্র ভাবনা সন্ন্যাসীর রুক্ষ চুলের মতো জড়ানো, সাধ্য নেই যে করুণ চিরুনি চালিয়ে তাতে বিন্যাস আনি। কলম যদি

অস্থির হয়ে ওঠে, তার হেতু এই যে, কী লিখব তাই স্থির করা শক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষ আসে, মানুষ যায়। যান শিল্পীরাও, কিন্তু তাদের সৃষ্টি থাকে। কোন বুদ্ধদেবের বিষয়ে আজ লিখব, যে মানুষ গেল না যে শিল্পী রইল, তার সম্পর্কে? সব বাগবিস্তারই আজ সর্বৈব বাচালতা হবে। তাঁর প্রস্থানের অব্যবহিত পরে, লেখক হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন অসম্ভব, বিশেষ করে এতদিনই যখন হয় নি। গ্রন্থসংখ্যায় এই ভাষায় তাঁর রেকর্ড সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়ে থাকবে, তবে সেটা আদৌ কোন কথা নয়। আসল কথা, তিনি সময়ের চেয়েও আগে চলতে চেয়েছিলেন, যে রাস্তা তৈরি হয়নি, সেই রাস্তায় সর্বাগ্রগামী রূপে পা বাড়িয়েছিলেন। কবিতায় তিনি তো রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রথম বয়সেই প্রধান এবং আচম্বিত একটি কল্লোল, সেই সাহসের স্বাক্ষর নিহিত আধুনিক বাংলা কাব্যের মজ্জায়, ছন্দে মিলে, আর অতি সচেতন শব্দ যোজনায়। একমাত্র সূক্ষ্ম স্নায়ু সেই নিপুণ নির্মাণের যথাযোগ্য অনুকম্পিত হতে পারে, একমাত্র অধ্যবসায়ী প্রযত্ন তাকে আবিষ্কার করে। বিষয়ে আর প্রকরণের দিক থেকেও আশ্রান্ত পথ–পরিক্রমার উদাহরণও আমাদের সাহিত্যে বিরল, ব্যতিক্রম যদি কেউ থাকেন তবে তিনি আবার সেই অনন্য পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। *বন্দীর বন্দনা* থেকে *স্বাগত বিদায়*-এ উপনয়ন মানুষ হিসেবে স্বভাবতই ঘরকুণো বুদ্ধদেবের পক্ষে বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য এক ভূপর্যটন। তাঁর কাব্য-শরীরের বিশ্লেষণ এবং সেই কবিতার অন্তর্লোকে রঞ্জনরশ্মির আলো ফলে পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালের কবিকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধানের অপেক্ষায় আছে।

এই প্রসঙ্গে অপ্রিয় তথা রূঢ় এই সত্যটাও লিখে রাখতে চাই— সমকালীন যত সতীর্থের বিষয়ে সারা জীবন লিখে গেছেন তিনি, তাঁর সম্পর্কে কিন্তু অন্যেরা তার ভগ্নাংশও লেখেন নি। কৃপণতা এখানে কৃতজ্ঞতার অন্তরায় হয়ে থাকবে। মনে পড়ছে সেই ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’র কালেই ‘প্রথমা’ আর ‘কুসুমের মাস’ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা; সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একাধিক সবিস্তার রচনা, সময় সেনকে আবিষ্কার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি এবং জীবনানন্দের প্রতি তাঁর অনাবিল স্তুতি। বিষ্ণুদে, অমিয় চক্রবর্তী— কেউই বাদ যান না, কখনোই ব্যক্তিগত অথবা অন্যবিধ মতভেদ বুদ্ধদেবের উদার উচ্চারণের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। আরও পরবর্তীকালের কবিদের উপর তাঁর প্রভাবের পরিমাপ-পরিমাণের কথা টেনে আনা অবান্তর। উধ্বর্তন কোন পিতৃ-পুরুষের কতটুকু রক্ত বা চারিত্র্য আমাদের দেহে কিংবা অস্তিত্বে মিশে আছে আমরা জানি না। তথাপি প্রতিটি শ্রদ্ধাবাসরে মন্ত্রে মন্ত্রে প্রণাম জানাই তাঁদের, গলাজলে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি পূর্ণ করে তাঁদের তপণ করি। ওই তপণই নিবেদন এবং স্বীকৃতি। স্বীকৃতি আমরা যে সম্ভব হয়েছি, এখনও বেঁচে আছি তার। প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাই ওঠে না।

কথাশিল্পী বুদ্ধদেবের কথা লিখব কি, যিনি প্রথমাবধি গল্প-উপন্যাসে বলা যায় নির্বিষয়ী, (একটি লোকের সামান্য জ্বর, তাই সেদিন অফিসে যেতে তার তীব্র অনিচ্ছে, এই ‘রেখাচিত্রটি’ তিনি আঁকেন কত দিন আগে? সম্ভবত দশক চারেক হবে) পাথুরে শক্ত জমির ওপর কাহিনীর ইমারত গড়া কদাচ যাঁর অভিপ্রেত ছিল না, যিনি ভগীরথ এক অন্তঃসলিলা স্রোতধারার, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণ-বিবর্তনই ছিল যাঁর লক্ষ্য, সম্ভবত ধূর্জটিপ্রসাদেরও আগে তিনি মননশীলতায় ব্রতী হয়েছিলেন, ঘরের বাইরে ধূলি আর ধূমে আচ্ছন্ন যে জগৎ সেদিকে তো তাকানই নি, এমন কি জানালায় দাঁড়িয়েও সর্বদা যে আকাশের নীলে নিমগ্ন থেকেছেন তাও নয়, সব কিছু থেকে সরে এসে, অনেক কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরং ভালবাসতেন ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেখানে অন্তর্লীন

যে মহাবিশ্ব তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে, তার রহস্য উন্মোচিত করতে। এজন্যে আলাদা একটা বাগ্‌ভঙ্গি, বস্তুত আলাদা একটা গদ্যরীতিই সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাঁকে প্রকাশের একটি ভাষা যা জটিল অথচ, স্বচ্ছন্দ প্রবহমান সাবলীল।

এই গদ্যকেই অন্যবিধ আকারে পাই তাঁর প্রবন্ধে— কিন্তু নিরুদাহরণ এই নিবন্ধে তাঁর সাহিত্যের বিচার করতে তো বসিনি, সে কাজ আগামীকালের সৎ ও পরিশ্রমী অন্বেষক ও বিশ্লেষকদের জন্য তোলা থাক। আমাদের এই ভাষা যদি টিকে থাকে তবে একদিন না একদিন কৃতজ্ঞ রসবেত্তাদের কেউ না কেউ তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির কথা লিখবেই, জোর গলায় বলবেই। সে কথা আজকে নয়। আজ বরং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেবের তুল্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব আর দুটি নেই, শুধু এটুকু বলে যায় সর্বতো-লেখক। লেখাকে তিনি তাঁর আয়ুর একটি পর্বে জীবন আর জীবিকা দুই-ই করেন— এই অবেতন অনলস দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত আজকের বিকিকিনির হাটে দুঃসাহসেরই নামান্তর। কোন শিল্পী একলা চলেন, কেউ সবাইকে নিয়ে পথ চলাকে দায় করে নেন। বুদ্ধদেব দুটোকেই মিলিয়েছিলেন। স্বয়ং যিনি প্রধান এক কবি, তাঁর সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়-তার চেয়েও বড় কথা, আধুনিক বাংলা কবিতাকে তিনিই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় নিঃশর্ত প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই হেতুই তাঁর ভূমিকাকে বলেছি ঐতিহাসিক। কেউ লেখক, কেউ লেখকদের লেখক। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়টি।

২

লেখকদের লেখক সম্পর্কে অবিসংবাদী কয়েকটি সত্যের আভাস দিয়ে বরং অমলিন একটি মানুষের কথায় ফিরে আসি। এই লেখাটার শিরোনাম দিয়েছি "সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব।" শব্দবন্ধটা তাঁরই, আমি শুধু শেষের নামটি বদলে নিয়েছি। কে জানে বুদ্ধদেব নিজেই হয়তো কোনদিন নিজের সম্পর্কেই কথাটা ভেবে থাকবেন, পরে আপন নামটি কেটে বসান সেই নামটি— যাঁর শস্যক্ষেত্র থেকে বইয়ের পর শিরোনাম আহরণ করেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ'। সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা। কথাটা সম্ভবত সব শিল্পীর সম্পর্কেই সত্য। তাঁরা সঙ্গ কামনা করেন বাহিরে— নির্বাচিত কয়েকজনের— আর নিঃসঙ্গতাকে লালন করেন অন্তরে। তলার দিকে প্রতিটি বৃক্ষই যেমন, নিষ্পত্র। পাতা আর পল্লব সে মেনে ধরে উর্ধ্বে, সেখানে আলো আর বাতাসের স্পর্শ কামনা করে। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বও এই দ্বৈত সত্তায় বিভক্ত, এই ব্যাপাটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যাদের ঘটে, তাদের মধ্যে এই লেখকও একজন।

আমার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল না (ঘটনাটা এতই তাজা ও টাটকা যে, বারবার ক্রিয়াপদে অতীতকাল ব্যবহার করতে বাধছে, অন্যমনস্ক হাত মাঝে মাঝেই বর্তমানকালকে টেনে আনতে চাইছে), তবে তার চেয়ে কিছু বেশি ছিল। সেই সম্পর্ক, যা রক্তের চেয়ে ঘন। কিংবা করে যেন পরানো হয়ে যায় অলক্ষ্য একটা রাখি, যার রঙ রক্তবর্ণ। বহু সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, কতবার সন্ধ্যা পেরিয়ে নিশুতি রাত্রিও তার সাক্ষী।

লিখতে লিখতে বিষাদের সঙ্গে উন্নত একটি অহংকার মিশে যাচ্ছে, আমাকে তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অগ্রজের উচ্চ পীঠ থেকে নয়, পাশে বসিয়ে, কাছে বসে। এই সামান্যকে সমানত্বের আসন দিয়ে ধন্য করেন তিনি, আমার মার্জনাযোগ্য অহংকার সেইখানেই। মিথ্যে হয়ে যায়, গিয়েছিলও, সব ব্যবধান, কী বয়সের, কী বিদ্যার। সেই সখ্য সুতরাং এক হিসেবে অসবর্ণ। পাণ্ডিত্য তাঁর পর্বতপ্রমাণ, অধ্যয়নের সীমা সমুদ্র-

সমান, ইচ্ছে করলে নুড়ি গুনিয়েই এই অর্বাচীনকে হয়রান করে দিতে পারতেন, কিন্তু কখনও করেন নি। কথা বলেছেন অনর্গল, যার যতিচিহ্ন খালি হো-হো ছাদ-ফাটানো সেই হাসি, যা আর কোনো দিন শুনতে পাব না। কত তর্ক করেছি শুধু তাঁর সুরেলা, পরিশীলন-কোমল অথচ প্রত্যয়ে-নিশ্চয়তায় অভিব্যক্ত কণ্ঠস্বর শুনব বলে; উত্তেজিত করতে না-ও যদি পারি, একটু উসকে দেব বলে। অধ্যায়টা আজ শেষ, তাই বলে ইতিহাসটা মুছে গেল না, স্মৃতি উজ্জ্বল কোনো ধাতুপটে উৎকীর্ণ হয়ে রইল।

বস্তুর 'বন্ধু' শব্দটাকেই তিনি একটা বৃহৎ তাৎপর্য দিয়েছিলেন, একটি ব্যাপ্তি যা রবীন্দ্রনাথের গানে কখনও কখনও পাই। 'পিতা', 'প্রভু', কিংবা 'স্বামী'র বিকল্পে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন 'বন্ধু', সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে গেল আরও নিকট, আরও ঘন, আরও স্নিগ্ধ, আরও মরমী। বন্ধুরতা ঘুচে গেল। ভক্তি হয়ে গেল ভালোবাসা। বন্ধুদেব আরও একটু এগিয়ে গেলেন। বন্ধুবৎ ব্যবহারে আপ্লুতে করলেন মানুষদেরও, বিশেষত তাদের তাঁর স্বজন-পরিজন যারা। সহজ পরিবেশ 'কবিতা-ভবন'-এ সতত বিরাজিত, সেখানে শুধু স্বস্তির শ্বাস, সেখানে শুধু উন্মুক্তির আবে; সব খোলা বলেই সকলের মেলা। অন্তত তিনটি প্রজাতির মধ্যে সেই হেতুই অনায়াসে সেতুবন্ধ রচিত হয়ে গেল।

হালকা গল্পের কোন্‌টা কিংবা কতগুলো বলব? কবিতাভবনে নাকতলার নতুন ঠিকানায় গিয়ে তিনি চট করে বাড়ির গন্ডী ছেড়ে বের হতে চাইতেন না। প্রায় "পাদমেকং ন গচ্ছামির" মতো পণ। ঠাট্টা করে বলেছি "আপনাকে আজ একটু ঘুরিয়ে আনবই"। আপনি কি গৌতম বুদ্ধের মতো বোধিবৃক্ষতলে তপের আসনে বসেছেন? একেবারে 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং?'

কোনো দিন হয়তো সম্মত হয়ে বললেন, ''আপনার সঙ্গে যেতে পারি।" (আবার আমার সেই অহংকার!) তারপরই একটু থেমে 'রানুকে নেবেন না?' বলেছি "নিশ্চয়, নিশ্চয়। উনিও চলুন।"

রানু অর্থাৎ প্রতিভা বসু। আমার নিজেরই বয়স কম হল না; পরিণত বয়সের দাম্পত্যের এমন মধুর, পরস্পর-নির্ভর, একে আর-একজনকে নিয়ে পরিপূর্ণ ছবি আর কোথাও দেখি নি। মেড ফর ইচ আদার নয়; দে ওয়্যান ফর ইচ আদার। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় এই দৃষ্টান্ত তুলনারহিত।

এই লেখকের সঙ্গে একবার বাইরে কোথাও দিন-কয়েক কাটিয়ে আসতে সম্মত হন। হয়তো শান্তিনিকেতনে, অথবা দুয়ার থেকে অদূরে কোনো সমুদ্রতীরে। সব থেকে দূরের 'সব পেয়েছির দেশ'-এ তিনি তো এখন গেলেনই, চিরশান্তিনিকেতনেও স্থান হল। শুধু ঐহিক একটি ছোট্ট ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল।

নিজের স্মৃতির কত কথাই তো বলতে পারি। সেই যে সকৌতুকে আমাকে শাসন করে বলা "সন্তাষ ঘোষ, আপনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন না", অবশ্যই একটু বিশেষ অর্থে, কিন্তু এর বেশি বিশদ ব্যাখ্যা দেব না। কিংবা সেই যে একবার বিদেশে কোনান ডয়েলের স্মৃতিধন্য একটা কামরায় আমার দু'পাশে দুই সঙ্গিনী আর টেবিলের ওপাশ থেকে বুদ্ধদেব ক্রমাগত বলছেন "হোয়াই শুড্ সন্তোষ ঘোষ মনোপলাইজ্ অল্ দি ফেয়ার গার্লস্ অ্যারাউন্ড" মাথা নেড়ে বলছেন তো বলছেনই, কিন্তু মৃদু হেসে, সুতরাং ঈর্ষা নয়।

ঈর্ষা বরং আমি আজ করি তাকে— বিনা বাক্যে, সদর্পে প্রস্থান করলেন বলে; অতর্কিতে রোগ এল, কিন্তু ভোগের সে সঙ্গী আনল না। মৃত্যু তাঁর দেহকে অমোঘ

অধিকার করল কিন্তু বিনিময়ে মৃতু-যন্ত্রণা দিল না। মৃত্যুটা তাঁর, যন্ত্রণা যা, তা আমাদের। যে-গানটির কাব্যমূল্য আর আবেদন তাঁকে কম্পিত করত যেন সেই গানেরই সুর ধরে তিনি গভীর কোন্ অন্ধকার পার হয়ে গেলেন। অচেতন অবস্থা থেকে চির-অচেতনায় এই অবসৃতি, এ যেন "অন্ধকার হতে অন্ধকারে চলে গেল দিন।" তাঁর জীবন আর মৃত্যুর সম্মিলনও তেমনই। তাঁর সমকালীন লেখককুলে, সহযাত্রী-মহলে যিনি ছিলেন কনিষ্ঠ, মৃত্যুর অমৃতপানে তিনি সহস্য সকলের জ্যেষ্ঠ হয়ে গেলেন। সেই তিনি, বুদ্ধদেব বসু, যিনি কারও বিষয়ে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশে কখনও কোনও বক্রোক্তি করেন নি। মতভেদের ক্ষেত্রে উক্তির পরিবর্তে বড় জোর অবতারণা করেছেন যুক্তির। সভার মাঝে কেউ ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে কটাক্ষ করে যেই কিছু বলতে গেছে অমনই হাত তুলে বিব্রত মুদ্রার ভঙ্গি ফুটিয়ে বলে উঠেছেন, "আহা, ওসব কথা থাক।" চলে গেছেন প্রসঙ্গান্তরে। কতবার দেখেছি, আর এই হেতুই তাঁকে সর্বাগ্রে 'অমলিন মানুষ' বলেছি। তাঁর সঙ্গে মতান্তর হত, কিন্তু মনান্তর নয়। মান অভিমান ঘটেছে হয়তো, তবু কলহান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটাই ছিল অসম্ভব, অজ্ঞাত। সব ছাপিয়ে ভাব-সম্মিলনই ছিল সত্য।

৩

মৃত্যুকে আর তেমন করে দেখি না, আগে যেমন দেখতাম। প্রাথমিক বিহ্বলতার জোয়ার নেমে গেলে আজকাল তার নরম পলিমাটির গন্ধ পাই। মৃত্যু বিনষ্টি নয়, আসলে হয়তো নতুন সত্তার সৃষ্টি লয় নয়, বরং নির্ভর আরও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কোনও কোনও আঁধার আলোর অধিক হতে পারে, বিশ্বাস করি। এখন বুঝি, আমাদের বিধিতে দেহকে নিরালোক গহনে স্থাপন না করে প্রজ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করা হয় কেন। জীবনভোর মানুষ জ্বলে যে। চিতা জ্বলার রূপক। যা শেষ হয়ে গেল, তার। এর পর নির্বাণ, এর পর প্রশান্তি, শীতল। সেই মৃত্যুরই দাবি, শেষ ছাইটুকুও ধুয়ে মুছে ফেলা, ঘড়া ঘড়া জল, অবশেষে অস্থি-বিসর্জন। কিন্তু মুছে গেল কী; অবসান কিসের? ক্ষুদ্র সীমিত অর্থে যাকে বেঁচে থাকা বলি, শুধু সেইটুকু মোটে। নতুবা মৃত্যু শুধু মুছে দেয় না, এক অর্থে একদিন নিজেও মুছে যায়।

বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও মুছে যাবে, হয়তো বা ইতিমধ্যেই গিয়েছে, লেখাটা শেষ করার আগে এই প্রগাঢ় প্রত্যয়টি উচ্চারণ করছি। শিল্পী হিসাবে যিনি কোনদিন আপন সৃষ্টিকে জনপ্রিয়তার তৌলে তুলে বিকোতে যাননি; যাঁর উপহারের উপযুক্ত কিছু বই বাদে অনেক গ্রন্থ সংস্করণান্তরের স্বাদ পায়নি, কতগুলি তো আবার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার স্বর্গীয় তালিকায় উন্নীত; বাংলার ব্যবসায়িক মঞ্চের বা চিত্রপটের কোনো প্রয়োজন মেটাতে যতদূর জানি কোনো দিন যাঁর তল্লাশ কেউ করেনি তিনি তো অবশ্যই দ্বারস্থ হন নি কারও, তাঁর অনমনীয় দেহে বজ্রের শক্তি নিহিত ছিল, মহাকায় নন বলেই হয়তো তাঁর মধ্যে একদিন বিদ্রোহের মহাকায় স্পর্ধা জন্ম নিয়েছিল। আত্মখণ্ডন, আত্মখণ্ডন, যার কিছু কিছু নমুনা পাই বুদ্ধদেবের বিবিধ গ্রন্থের নাম করণেও। আঁধারকে তিনি নির্দ্বিধায় 'আলোর অধিক' বলেন, এক নিঃশ্বাসে 'স্বাগত' বলেই 'বিদায়' নিতে তাঁর বাধে না। একদিন 'চিরদিন' —অর্থাৎ একটি দিন লহমায় চিরকালীন হয়ে যায়। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এও দেখি বৈপরীত্যের সহ-অবস্থিতি। বোঝা যায় বিপরীতকে মিলিয়ে, দুই মেরুকে নিকটে এনে, তিনি কী-যেন, হয়তো বা কোনও একটা সমন্বয় খুঁজছেন, আজীবন খুঁজে গেছেন।

যেখানে খণ্ডন ছিল না আগাগোড়া একটানা সুর বেজে গেছে, সে তাঁর পিপাসা, সে তাঁর ভালোবাসা। জীবনের সকাল বেলায় যিনি লিখেছিলেন “বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার/অমৃতের তরে” (*বন্দীর বন্দনা*) বিকালে এসেও প্রায় ওই একই কথা : “যা কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা ... ভালোবাসি সবচেয়ে সত্য করে” (*শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)। এই ঘোষণারও প্রতিতুলনা রবীন্দ্রনাথে পাব। “সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি”– (*সেঁজুতি*।’) তাঁর রচনায় প্রধানতম সবাদী সুর এইটিই। রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কাছে বারে বারে ফিরবেন বলেই বুদ্ধদেব মাঝে মাঝে সরে যেতে চেয়েছেন। পারেন নি। অস্বীকার অর্ঘ্য হয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষ তাঁকে অরোধ্য টানে টেনে এনেছে। এই মাধ্যাকর্ষের নাম শ্রদ্ধা, এই মাধ্যাকর্ষের নাম সেই ‘ভালোবাসা’। একটু ভালো করে দেখার দরকারেই কখনও কখনও একটু দূরে গিয়ে বসা।

এলোমেলো ভাবনার যা স্বভাব, কোথায় বুদ্ধদেবের মরণের স্বরূপ নির্ণয় করছিলাম, আর কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি। খেই ফিরে পেতে তাঁর ছড়ানো যত অসমাপ্ত কাজ তা নিয়ে খেদ প্রকাশ করব কি? বোধ হয় সেটাও হবে অহেতুক। ন জায়তে, ক্রিয়তে বা কদাচিৎ–গীতোক্ত এই বাণী অন্তবন্ত দেহ সম্পর্কে যদিও নয়, আবহমান আত্মার বিষয়ে। জীবের জন্ম যদি না হয়ে থাকে, মৃত্যুও তবে অলীক। কিন্তু অত দূর যাব না। এ-ও বলব না যে, সমগ্র বিশ্ব যখন পূর্ব থেকেই পূর্ণ তখন তা থেকে তিলমাত্র যোগ-বিয়োগও অসম্ভব। এখানে যা অসম্পূর্ণ রইল,অন্যত্র তা ভরে উঠবে এই ভরসাও অবাস্তব। এখানে মানুষের বোধের সঙ্গে প্রবোধের বিরোধ ঘটে। কেন না, পরম বিশ্বাসের বাইরে প্রতিদিনের জীবনে একটা ব্যবহারিক আশ্বাসের প্রয়োজন আছে।

বিবিধ বিদেশী ভাষার পথে প্রান্তরে পর্যটনে ক্লান্ত, তিনি অবশেষে স্থির একটি নীড় পেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশের সংস্কৃতে; নিমগ্ন হয়েছিলেন মহাভারতে, পুরাণে। মহাভারতের প্রতিটি প্রধান চরিত্রের যে তন্নিষ্ঠ, গভীর ও তুলনামূলক বিচার তিনি আরম্ভ করেন, তার উপমা বিশ্বের মহত্তম সাহিত্যসৃষ্টিসমূহ নিয়ে তুলনায় কোনও কাজে কোথাও মিলবে কিনা জানি না, তবে তাঁর আরম্ভ লেখনের শেষ পরিচ্ছেদগুলির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বুঝি শাদাই থেকে গেল। ব্রত-উদযাপন হল না।

তবু যেন নিরাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস না ফেলি। সব কাজ সম্পন্ন করে এ-জগতে এ-যাবৎ কতজনই বা গিয়েছেন। যেতে পারেন? না মহত্তম শিল্পীরা, না মহাপুরুষেরা। তাঁদের কাজের ভার নেয় অপরে, অনুবর্তী যারা। ‘যত কিছু ছিল কাজ/সাঙ্গ তো করেছি আজ’ এই আত্মতুষ্টি কি কারও পক্ষেই প্রকৃত? সমে এসে কেউ কি কখনও থামে? কাজ কিন্তু থেমে থাকে না, এগিয়ে যায়। “কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না”—কথাটা খণ্ডিত সত্য মাত্র। কিছু থাকে না, আবার সবই থাকে। কিছু কিছু এবং কোনোকোনো মানুষ হয়তো-বা অনেকটা দূরে সরে যায়, এইমাত্র। সূর্য অস্ত গেলে দীনহীন কুটিরে কুটিরেও মাটির প্রদীপ জ্বলে। কাজ করতে করতে বুদ্ধদেব দূরে চলে গেলেন, এখন আমাদের তাঁর কাছে যেতে হবে। আমরা যাব। অস্তরাগ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সাধ্যমতো নম্র-মৃদু দীপ জ্বেলে জ্বেলে তমসাকে তপস্যা করে তুলব। কেন না, যা ‘মৃত্যুর পরে’ আসলে তা ‘জন্মের আগে’, এই উদ্দীপক বাণী বুদ্ধদেবের একটি কবিতারই।

বুদ্ধদেব বসুর বানাননীতি

সুভাষ ভট্টাচার্য

যেকোনো লেখকের বেলায় যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি বুদ্ধদেব বসুরও বানানভাবনা ও বাননানীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বদলেছে। কিন্তু এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে আমাদের যে, বানানচিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যায় নি। অল্প কয়েকজন বানানসচেতন বাঙালি লেখকের অন্যতম তিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি পেরেছিলেন বানানবিষয়ে সর্বত্র সুস্থির থাকতে। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে আমরা দেখেছি দোলায়মান, দেখেছি নিজেরই কোনো বানানকে পরবর্তীকালে বদলে ফেলতে। অবশ্য এটাকে অস্বাভাবিক বা অনুচিত বলে মনে করি না আমরা। বাংলা বানান তাঁর সমগ্র জীবনকালে একটা বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল ব্যাপার ছিল। মনে রাখতে হবে, তাঁর লেখকজীবন শুরু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কারের (১৯৩৬) অনেক আগে। আর তিনি যখন তাঁর লেখকজীবনের শেষ পর্বে, তখন নতুন নতুন বানানসমস্যায় বাংলা ভাষা বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বা আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাই তাঁকে বহু নিয়ম তৈরি করে নিতে হয়েছিল, এই বিষয়ে অন্য বহু লেখকের মতো নিশ্চিন্ত মনে নিরুদবেগে যা-মনে-হয় লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর মতো লেখকের পক্ষে। বারে বারে নিজেরই সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়েছে তাঁর, বারে বারেই দ্বারস্থ হয়েছেন রাজশেখর বসুর।

দুই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কারের নিয়মাবলি যখন (১৯৩৬) প্রকাশিত হয়, বুদ্ধদেবের বয়স তখন আঠাশ বছর। আর তখন তাঁর লেখা হয়ে গেছে *সাড়া, লাল মেঘ* প্রভৃতি উপন্যাস, লেখা হয়ে গেছে *মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী*-র মতো কাব্যগ্রন্থ। সেই গোড়ার দিকের রচনাগুলোতেই যে তাঁর বানাননীতি সুনির্ধারিত হয়ে গেছে বা নিরূপিত হয়ে গেছে তা মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু তাঁর কয়েকটি বানান সেই প্রথম যুগেও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সটেশন, সটিমার-এর মতো বানান দেখে অনেকের ভ্রূকুটির কথা জানি আমরা। ১৯৪০-৪২-এর পর থেকে বুদ্ধদেবের বানাননীতি নির্দিষ্টতা পেতে শুরু করে। ১৯৬০-৬৫-তে তা পূর্ণরূপ নিয়ে নেয়। ১৯৩৫-৩৬-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সরাসরি মন্তব্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু তিনি যে ওই সমিতির বহু প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি, একথা আমাদের সবারই জানা।

যে-সুপারিশে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল, যে-সুপারিশ প্রস্তুত করেছিলেন রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিদ্বজ্জন, তা কেন বুদ্ধদেব মানতে পারেন নি, তা দেখা দরকার। প্রথম কথা হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি জানালেও, তিনিও যে ওই সমিতির বানাননীতি পুরোপুরি মানতে প্রস্তুত ছিলেন এমন নয়। দ্বিতীয়ত, সুনীতিকুমার বা রাজশেখর বসুর প্রতি বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান

সমিতির সুপারিশকে তিনি নিশ্চয় পশ্চাৎমুখী বলে মনে করেছিলেন। আর সেই কারণেই সমিতির বানান তিনি সর্বাংশে গ্রহণ করেন নি। বানান বিষয়ে তাঁর অনেক সংশয় বা প্রশ্নের উত্তর বা নিরসনের জন্য বুদ্ধদেব রাজশেখর বসুর দ্বারস্থ হতেন, একথা তাঁর জবানিতেই জানতে পারি আমরা। কিন্তু বানান সুপারিশে যে কিছু ত্রুটি ছিল সেকথাও তো অস্বীকার করা যায় না। অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসুও কতকগুলো ব্যাপারে ছিলেন স্বাধীনচেতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির প্রস্তাবের কিছু অংশ প্রস্তাব প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে যায়, প্রায় কোনো বিতর্ক ছাড়াই। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বলোপ তার অন্যতম। তৎসম শব্দের বানান অপরিবর্তিত রাখার ব্যাপারটা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না বটে, তবে সুরটা ছিল। সাধারণভাবে এই সুরটি সকলেই ধরে নিয়েছিলেন। অসংস্কৃত শব্দের বানানের বেলায় বানান সমিতিকে কোথাও-কোথাও দোলাচল বলে মনে হয়েছে। নানা ক্ষেত্রে বিকল্প বানান রাখার প্রস্তাবে সেই দোলাচল-ভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। তা ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক বাংলা শব্দে হ্রস্ব-স্বরচিহ্নের ব্যবহার, ক্রিয়াপদে ও-কারের ব্যবহার প্রভৃতির জন্য রবীন্দ্রাথের যে-সপক্ষতা, তা মেনে নেয় নি বানান সমিতি। আমরা বুদ্ধদেব বসুকেও দেখি মোটামুটিভাবে এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারী।

বুদ্ধদেবের বানাননীতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনার আগে বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি রচনার অংশ আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই।

(এক) বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।

(*বন্দীর বন্দনা*)

(দুই) কিন্তু বিষয়হিসেবে গণজীবনকে অবলম্বন করেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ, চলতি মুহূর্তের উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ক্রোধ, কি ব্যক্তিগত দুঃখ; দুঃখটা কখনো-কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি করে বলা যে আমাদের মনে প'ড়ে যায় ...

(সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য : *কবিতা*, আশ্বিন ১৩৫৪)

(তিন) স্বভাবতই সুস্বাদু একটা জীবকে প্রচুর মশলাসহযোগে যে-কোনোরকমে ভোগ্য করে তোলা যায়, কিন্তু ঐ খোশাটাকে সুখাদ্য করে তোলা যায়-তার কাজ নয়।

(*সব-পেয়েছির দেশে*, শ্রাবণ ১৩৪৮)

(চার) তা না-হলে যে আমার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠতার শেষ ঘোষণা হতো না।

(*শেষ পাণ্ডুলিপি*, ১৯৫৬)

(পাঁচ) আমি দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক মানুষ আমি দেখেছি, বহু সাহিত্যিক, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু আর-কেউ আমার মনে তেমনভাবে নাড়া দেয় নি, যেমন দিয়েছে বীরেশ্বর।

(*শেষ পাণ্ডুলিপি*, ১৯৫৬)

(ছয়) তার মানে ওটা না-হলেও চলতো, রীতির সৌষ্ঠববর্ধনের জন্যই তার প্রয়োগ।

(*রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, ১৯৫৫)

(সাত) ভালো না-বেসে তো উপায় নেই।

(*শেষ পাণ্ডুলিপি*, ১৯৫৬)

(আট) দুধের মতো শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দের সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে— মস্ত বড়ো নদীটা যেন দুলে, ফুলে, গর্জে উঠে আরো প্রকাণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লো—

(*আমার ছেলেবেলা*, ১৩৭৯)

(নয়) সর্বতোভাবে কবি— আবার সেই সঙ্গে এমন-কি আছে যা তিনি নন, সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়? নাট্যকার, গীতকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র-ভ্রমণ-কথোপকথনে কারুশিল্পী— এমনকি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক।

(কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, ১৯৫৫)

(দশ) এই দুটি ধারা সান্তরভাবে আর কখনো বা মিশ্রিতভাবে, বনবাসী রামের জীবনে **প্রবহমান** : একটি বীরোচিত, অন্যটি প্রেমিকোচিত— দুটোই গৌরবজনক।

(*মহাভারতের কথা*, ১৯৭৪)

তিন

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিককার দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা *বন্দীর বন্দনা* ও *মর্মবাণী*। আর তাঁর শেষ প্রকাশিত রচনা *মহাভারতের কথা*। আমরা কালপরম্পরাকে কিছুটা অবহেলা করে তাঁর সারাজীবনের রচনাবলির কয়েকটি বেছে নিয়ে তা থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে উদ্ধৃত করেছি এইসব উদ্ধৃতি নেবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোতে বুদ্ধদেবের বানাননীতি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরের দশটি উদাহরণের ভিতরের এই শব্দগুলো পাঠককে লক্ষ করতে অনুরোধ করব— (১) কী, না-হয়, হলে; (২) ক'রেও, কি, করে; (৩) যে-কোনোরকমে, করে, ঐ, খোশাটাকে; (৪) না-হলে, হ'তো; (৫) দু-একটি, আর-কেউ; (৬) না-হলেও, চলতো; (৭) না-বেসে; (৮) মতো, শাদা, এলো, বড়ো, আরো, হয়ে, পড়লো; (৯) এমন-কী, এমনকি; (১০) কখনো, প্রবহমান।

একথা আমি নিশ্চয় বলব না যে, এই ছাব্বিশ-সাতাশটি শব্দের বানানে বুদ্ধদেবের বানানভাবনার পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের বানাননীতির একটা হদিস এসব বানান থেকে নিশ্চয় পেয়ে যাই আমরা।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে যে 'কী' ও 'কী' শব্দ দুটো রয়েছে তা থেকে বোঝা গেল যে, সেই ১৯২৯-৩০ সালেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অর্থভেদে কী-কি বানানভেদ মেনে নিয়েছিলেন। প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কী' আর প্রশ্নসূচক সর্বনাম 'কী'-র তফাত করার কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং বলেছিলেন বিংশ শতকের গোড়াতেই। আর আমরা বুদ্ধদেব বসুকেও দেখি অর্থভেদে ওই দুই কি-কী লিখছেন তাঁর সূচনাপর্বের রচনাতেই।

ক্রিয়াপদের বানান লেখার বিষয়ে বুদ্ধদেব বরাবরই উচ্চরণকে মান্য করেছেন। একথা বললে বড়-কোনো ভুল হবে না বোধ হয় যে, সাধারণত কবিরা ক্রিয়াপদের বানানে কিছুটা উচ্চারণানুগ হতে পছন্দ করেন। সাধারণ বর্তমান, বর্তমান অনুজ্ঞা, সাধারণ অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেব শব্দান্তে ও-কার দিয়েছেন, আর তা দিয়েছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। উদাহৃত চার আর আট নম্বর উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ রয়েছে। এর আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পারি আমরা।

ফেলতো, ভুলতো, করতো, গেলো, খেলো, ছিলো (*শেষ পাণ্ডুলিপি*)
হ'লো, ছিলো, দাঁড়ালো, পারতো (ভূমিকা, *কালিদাসের মেঘদূত*)
গিয়েছিলো, হয়েছিলো, দেখবো, হ'লো (রবীন্দ্রনাথ : *কথাসাহিত্য*)
জমলো, গেলো, পারবো, লাগলো (*আমার ছেলেবেলা*)
পারলো, ছিলো, এসেছিলো, হ'লো, হতো (*মহাভারতের কথা*)

কোনো-কোনো ক্রিয়াপদে উর্ধ্বকমার প্রতি বুদ্ধদেবের পক্ষপাত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আপতত ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার নিয়ে দু-এক কথা বলতে হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখকজীবনের বেশির ভাগ সময়েই ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার ব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে এর কারণ উচ্চারণানুগতা। ক্রিয়াপদের শেষে ও-কারের প্রবণতা কবিদের একটা সাধারণ অভ্যাস এ-কথা আগেই বলেছি। শঙ্খ ঘোষের বিভিন্ন সময়ের লেখাতেও তা দেখতে পাই—

কিন্তু এই বৈপরীত্যের বুনন না থাকলে শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় হতো না তাঁর কবিতা।
(*নিঃশব্দের তর্জনী*, ১৪০১)

ভিতরদিকের সূর্যমুখী এই চরিত্র হলো চিৎকারেরই আরেক পিঠ :—
(তদেব)

মাসিমার কাছে কারা এই অভিযোগ জানিয়েছে? খেয়াল হলো তখন :
(*অন্ধের স্পর্শের মতো*, ২০০৭)

এখনকার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিই বলি, কিংবা আনন্দবাজার পত্রিকাই বলি কিংবা সাহিত্য সংসদ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অনুজ্ঞা ছাড়া অন্য সমস্ত ক্রিয়াপদে ও-কার অনুচিত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। বুদ্ধদেব কোনোদিনই মানেন নি এই সূত্র। আর এ-বিষয়ে তিনি মোটেই একা নন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বহু বহু রচনায় ক্রিয়াপদে ও-কার জ্বলজ্বল করছে।

বাংলা ভাষায় উচ্চারণানুগ বানান সর্বত্র সম্ভব নয়। তেমন বানান লেখা শুরু হলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে বই কমবে না। উচ্চারণানুগ বানান লেখার নীতি গ্রহণ করলে কেবল স্বরচিহ্নের বেলায় তা মানলে তো চলবে না, মানতে হবে ব্যঞ্জনচিহ্নের বেলাতেও। সম্ভব কি তা? উচিত কি তা? আমরা মনে করি, বানান-সমতার স্বার্থে করত, করব, গেল, ছিল, যেত, বলব, হল, হত, এই রকম বানান লেখাই সংগত। তাতে উচ্চারণে বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তির কারণে নেই। নইলে, উচ্চারণানুগতার স্বার্থে হোতো, হোলো, কোরবো এসব বানানের দাবিও উঠবে।

এবারে উর্ধ্বকমার প্রসঙ্গ। বুদ্ধদেব লিখেছেন হয়ে, করে, হতো, হ'লে ইত্যাদি। অথচ গেলো, করবো এসব শব্দে উর্ধ্বকমা নেই। কারণটা খুবই সহজ। যে-শব্দে কোনো লুপ্ত স্বরের আভাস আছে, তাতে উর্ধ্বকমা দিয়ে সেই লুপ্ত স্বরটির অস্তিত্ব বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। হইতে>হ'ত; হইল>হ'ল; হইয়া>হয়ে ইত্যাদি। আবার বলব, এ-ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব একা নন। স্বয়ং রাজশেখর বসু অনুরূপ বহু ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমা ব্যবহার করেছেন—

ইনি জীর্ণ শাটীতে দেহ আবৃত করে তাঁর তরুণী ভার্যা ও বহু শিশুসন্তানদের নিয়ে...
(*বাল্মীকি-রামায়ণ*, ১৯৪৬)

রামের রথ বহুদূর অতিক্রম ক'রে অন্যদেশে উপস্থিত হ'ল।
(তদেব)

শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকলে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমার দরকার হতেও পারে। যেমন—

সে ওখানে কী করে?
তুমি কী ক'রে এলে?

এসব ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমা ততটা দোষের নয়। যদিও বাক্য দেখলেই অর্থের তফাত করা যায়। আর তা ছাড়া, লুপ্ত স্বর বোঝাবার জন্যই যদি উর্ধ্বকমা দিতে হয়, তবে তো অনুরূপ সব ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত। রাজশেখর বা বুদ্ধদেব কেউই কিন্তু সরব, করব, মরব এসব শব্দে উর্ধ্বকমা দেন নি। এসব শব্দেও তো লুপ্ত স্বর আছে—

সরিব> সরব, করিব> করব, মরিব> মরব

তাই উর্ধ্বকমার ব্যবহার যত কম হবে ভাষায় জটিলতাও ততই কমবে। আবার বলি, শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকলে তবেই উর্ধ্বকমা দেওয়া যেতে পারে। সেসব অতীত সীমিত ক্ষেত্র।

চার

বিদেশি শব্দের বানান লেখার সময়েও বুদ্ধদেব মোটামুটিভাবে উচ্চারণানুগতার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কোথাও আমাদের উচ্চারণের প্রবণতাকে মান্য করেছেন— যেমন গ্লাশ, শাদা, তামাশা, মজলিশ। আবার কোথাও বিদেশি শব্দের বিদেশি উচ্চারণ মেনেছেন— যেমন স্পীডোমিটার, য়োরোপ, জর্মনি, স্টর্জ মূঅর (১৩৪৬-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে)। কিন্তু বিদেশি শব্দের বানান লেখায় বুদ্ধদেব সারাজীবন সুস্থির কোনো নীতি নিতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বে তাঁকে আমরা ট্র্যাম, ট্রেইন, চেইন, লিখতে দেখেছি। পরে তাঁর নিশ্চয় মনে হয়েছে এই শব্দগুলো বস্তুতপক্ষে বিদেশি শব্দ নয়, বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে ওগুলো। পরে তাই তাঁকে লিখতে দেখি ট্রাম, ট্রেন, চেন। তবে লাতিন বা গ্রিক নাম বা শব্দ লেখার বেলায় বুদ্ধদেবের দ্বিধা ছিল সারাজীবন, যে-দ্বিধায় আক্রান্ত হই আমরা সকলেই।

যদি ট্যাসিটাস-কে তাকিতুস(Tacitus) আর সক্রেটিস-কে সোক্রাতেস লিখতে হয়, তবে সেই একই কারণে ফ্লোরেন্সকে ফিয়েরেন্ৎসে, ভেনিসকে ভেনেৎসিয়া লিখতে হয়। মিলানকে লিখতে হয় মিলানো, নেপলিয়নকে লিখতে হয় নাপলেয়ঁ। কতকগুলো ক্ষেত্রে বিদেশি উচ্চারণ অনুসরণ করে বানান লিখব, আর কতকগুলো ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতিতে লিখব, এর মধ্যে একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বৈত রীতি আছে। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, এই দ্বৈত রীতি একরকম অপ্রতিরোধ্য। বুদ্ধদেবের মধ্যেও এ-নিয়ে ছিল দ্বিধা ও সংশয়। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হল নাটক *কলকাতর ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ*। ১৯৭৪-এ *মহাভারতের কথা*-য় ওই নাম বদলে গিয়ে দাঁড়াল এলেক্ত্রা। অন্যত্রও অসুবিধেয় পড়তে দেখি তাঁকে। *মহাভারতের কথা*-র ভূমিকায় লিখেছেন—

> সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিলো তুলনামূলক ইন্দো-য়োরোপীয় এপিক— একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্যদিকে মহাভারত ও রামায়ণ।

যদি দন্ত্যব্যঞ্জন বলে অদিসি লিখতে হয়, তবে তো ইলিয়াদ আর ঈনীদ লিখতে হয়। এইরকম বহু ক্ষেত্রেই একটা সুনির্দিষ্ট বিধি মেনে চলা বড়োই কঠিন। এমনকি, বুদ্ধদেবের মতো ভাষাসচেতন ধীমান লেখকও পারেন নি তা।

পাঁচ

একাধিক শব্দকে হাইফেন দিয়ে জুড়ে একটি শব্দ তৈরি বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। হাইফেন কোনো লেখক উদারভাবে ব্যবহার করেন, কোনো লেখক আবার হাইফেনের ব্যবহারে কিছুটা যেন কুণ্ঠিত। বর্তমান লেখকের মতে হাইফেনের ব্যবহারে ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাস বিশেষ সক্রিয় হলেও হাইফেন যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনসাধক চিহ্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসু হাইফেন বোধ হয় একটু বেশিই ব্যবহার করেছেন, অন্তত তাঁর পরিণত বয়সের লেখালিখিতে। হাইফেনের নানাবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে বুদ্ধদেবের লেখায়। আমরা তার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি প্রয়োগ এখানে দেখে নেব।

প্রথমত, দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে একটি বিশেষ্যবাচক শব্দ তৈরিতে হাইফেন—

(১) আধ-পেটা-খাওয়া, মাইনে-না-দিয়ে-স্কুলের-নাম-কাটানো (*শেষ পাণ্ডুলিপি*) দুই বা তার বেশি শব্দ জুড়ে একটি বিশেষণবাচক শব্দ তৈরি করতে হাইফেন—

(২) নয়ন-মন-ডোবানো (*সব-পেয়েছির দেশে*);

দম-বন্ধ-করা, ছেঁড়া-কাপড়-পরা, শুয়ে-থাকা প্রণয়ীযুগল (*শেষ পাণ্ডুলিপি*) একই শব্দের পুনরুক্তির ফলে যদি একটিই শব্দ তৈরি হয়

(৩) মনে-মনে, কোটি-কোটি, লক্ষ-লক্ষ, নিতে-নিতে, আস্তে-আস্তে (*শেষ পাণ্ডুলিপি*)

ধীরে-ধীরে, কোনো-কোনো (*মহাভারতের কথা*)

এছাড়া কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, দেখতে-দেখতে, চলতে-চলতে, যেখানে-সেখানে এরকম অজস্র হাইফেন-যুক্ত শব্দ তাঁর রচনার ছড়িয়ে আছে।

(৪) সর্বনামীয় বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য বা সর্বনামকে জুড়তে হাইফেন বুদ্ধদেব বসু অজস্রবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এগুলো পাওয়া যায়—

যে-কেউ, যা-কিছু, যে-অবসর, এ-দেশে, সে-ভাষা, এ-ধরনের, যে-সব, আর-কেউ, এ-যুগে, এ-দুটো ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়াপদকে নঞর্থক করতে তিনি অনেকসময় 'না' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়াকে জুড়েছেন হাইফেন দিয়ে—

না-লিখে উপায় নেই, না-পারাই স্বাভাবিক, না-ভেবে পারি না

এইসব ক্ষেত্রে হাইফেন অনেকেই দেন না। কিন্তু ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ক্ষেত্রগুলিতে হাইফেনের ব্যবহার অযৌক্তিক নয়, বরং অনেকসময় তাতে বাক্যে ঋজুতা আসে, অর্থবোধ সুগম হয়। তবে অস্বীকার করা যায় না যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব হাইফেন দিয়েছেন অকারণে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

প্রাণ-রস (*সব-পেয়েছির দেশে*), নিয়ম-মতো (*শেষ পাণ্ডুলিপি*)

প্রাণরস আর নিয়মমতো লেখাই সংগত হত।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বাঙালি লেখকরা অনেকদিন ধরেই কতকগুলি শব্দের নতুন বানান লিখেছেন। সেইসব বানান সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মেনেও নিয়েছে। তার মধ্যে আছে— কখনো, কোনো, মতো, ভালো, বড়ো, ছোটো। তবে

এখনো, তখনো, আরো, কারো সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারছেন না। বাংলা আকাদেমি এগুলো এখনও পর্যন্ত মেনে নেয় নি। এ-ধরনের সমস্ত শব্দেই বুদ্ধদেব ও-কার দিয়েছেন।

বুদ্ধদেবের তালব্য-শ-এর প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাতের কথা কারও অজানা নয়। তিনি মজলিশ, ফর্শা, বালিশ, খশড়া, তোশক, তামাশা, গ্লাশ তো লেখেনই, এমনকী শাদা-ও লিখতে কসুর করেন নি তিনি। তাহলে সংগতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, কেন শাহেব, শাবান লেখা হবে না? আমরা কি শাঁড় (ষাঁড়), মাশি (মাসি), মোশ (মোষ) লিখতে পারব? পারব কি এভাবে এসব শব্দের চেহারা বদলে দিতে? উচিত হবে কি তা?

বানান-বিষয়ে যিনি এতটাই মনস্ক ও আধুনিক তাঁকেই আবার কিছু শব্দের পুরোনো, প্রায় পরিত্যক্ত রূপ লিখতে দেখি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন—

তফাৎ, শহীদ, উল্টো, হাৎড়ে, গুণ্ডা। এছাড়া লিখেছেন অধুনা-বর্জিত কাহিনী, ব্যবসা, বৌ। এগুলো নিয়ে আমরা মনখারাপ করব না। কিন্তু দুঃখ পাই যখন দেখি তিনি মেনিয়া-কে ম্যানিয়া (mania), মনোমেনিয়া-কে মনোম্যানিয়া (monomania) আর সাইকায়াট্রি-কে (psychiatry) সাইকিয়াট্রি লেখেন। (দ্র. কলকাতার ইলেক্ট্রা, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৭)। তাঁর মতো বিদ্বান ও মনস্ক লেখকের এই স্খলন আমাদের ব্যথিত করে। কিংবদন্তী, তরণী, ধরণী-র মতো শব্দের বানান বদলাবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। সারাজীবন তিনি এসব বানান বজায় রেখেছেন। নিশ্চয় তিনি জানতেন এসব সহজতর বিকল্প আছে। কাহিনী বা বিদ্রূপ সংস্কৃত শব্দ নয়। তবু বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘপ্রচলিত এইসব বানান বদলান নি, সম্ভবত তাতে অযথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এই আশঙ্কায়।

সাত

যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের সাহিত্যিক-জীবনে কতকগুলি পর্যায় থাকতে বাধ্য। ভাষাব্যবহারে পর্যায় থেকে পর্যায়ে কতকগুলি পরিবর্তন হওয়াও স্বাভাবিক। সেই রকম পরিবর্তন ছিল বুদ্ধদেবের বানাননীতিতেও। তাঁর *সাড়া* উপন্যাসে বা *বন্দীর বন্দনা* কবিতায় আমরা কিছু পুরোনো বানান দেখেছি। বাড়ী, মজলিস, ইংলণ্ড থেকে ক্রমে বাড়ি, মজলিশ, ইংল্যান্ড হয়েছে। খ্রিষ্টান (*মহাভারতের কথা*), উপলক্ষ হয়েছে উপলক্ষ্য। পাশ্চাত্য-র চেয়ে পাশ্চাত্ত্যকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরিশেষে যে-কথাটা না বললেই নয়, তা এই যে, Z ধ্বনির জন্য জ-এর নিচে বিন্দু দিয়ে জ লেখার প্রচলন বুদ্ধদেবই করেন। আজ মোটামুটিভাবে তা সর্বস্বীকৃত হয়েছে। advertise-কে আজ অবলীলায় অ্যাডভার্টাইজ্ লিখি, blazer-কে লিখি ব্লেজার। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে measure শব্দের জন্য জ-এর নিচে দুটো বিন্দু দিচ্ছি আমরা, অন্তর অভিধানে তা মান্যতা পেয়েছে। এই সাহস তো বুদ্ধদেবই জুগিয়েছেন আমাদের। তাঁর কিছু বানান এখন মানা হয় না এ-কথা ঠিক। তবু বাংলা ভাষার বানানের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টান্ত অনুপেক্ষণীয়।

বুদ্ধদেব বসু : কবি

সিকদার আমিনুল হক

'রবীন্দ্রনাথের পরে নানাগুণসমন্বিত একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি'— তাঁর নিজের সম্বন্ধেই সত্য ছিল এমন একটি প্রশংসার বাক্য সুধীন্দ্রনাথকে একদা উৎসর্গ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যে এরকম মহত্তম বিনয়ের উদাহরণ হয়তো আরো আছে— কিন্তু সবচেয়ে কৃতজ্ঞ ও ব্যঞ্জিত উচ্চারণ বোধ হয় জাঁ আর্তুর র‍্যাবোর, শার্ল বোদলেয়ারকে প্রণতি জানিয়েছিলেন এই সতর্ক বাক্যে : 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা।'

বহুমুখী, ভাস্বর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় হয়; তবু প্রাচুর্যে কিংবা বহুমুখী শিল্পচৈতন্যের রক্তিমতায়, রবীন্দ্রপরবর্তীদের মধ্যে তাঁকেই প্রধান ও অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছি আমরা। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা তাঁর সমকালীনদের চেয়ে বেশি— কথাটা প্রশংসার বলে আমরা মানতে পারতুম না। যদি না জানতুম যে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই আশ্চর্য ও উদ্দীপক— মন্থর ও বাধাগ্রস্ত সময়ের রচনাও কাব্যের মতই জীবিত ও নমনীয়।

তাঁর মননের পরিধি আমাদের পক্ষে বিচার সম্ভব নয়; কিন্তু তা ছিল কবিতার জন্যে দক্ষ হবার উপায়, নিঃসংশয়ে একথাটা মানতে আজ আর কোনো বাধা নেই। কবিতার জন্যে উৎসর্গীকৃত— হয়তো কবিতার জন্যেই বেঁচেছিলেন তিনি। পত্রিকায় দায়িত্ববান সম্পাদক, তরুণ কবিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ ও জীবিকার জন্যে নানা অর্থহীন কর্মে ব্যাপৃত থেকেও তিনি এক দুরূহ নিঃসঙ্গতাকে লালন করেছিলেন নিজের মধ্যে। এই নিঃসঙ্গতা না থাকলে কোনো কবিকেই আমরা মহৎ ও পরিশ্রুত আখ্যা দিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মত ভ্রমণের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না— কিন্তু ভিন্ন অর্থে নিরন্তর 'ভ্রমণবিলাসী' তিনি— শুদ্ধতার জন্যে সহিষ্ণু ও তৃষিত; স্পর্শ করেছেন প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রাঘিমা— কিন্তু মনে রাখতে হবে তা কেবল কবিতার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথকে 'বিদেশী' মর্যাদা থেকে সরিয়ে আনার দুরূহ কাজটিও তাঁকেই করতে হয়েছে— একজন 'জীবন্ত' কবি হিসেবেই তাঁকে চিনিয়েছেন বুদ্ধদেব— লিখেছেন সমকালীন ও তরুণ কবিদের পক্ষে অজস্র উদ্বুদ্ধময় প্রবন্ধ; তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংখ্যা একজন কবির জন্য অকল্পনীয়— কবিতার বিপর্যয় থেকে আত্মবিশ্বাসকে উড্ডীন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সমালোচনা; এমনকি প্রবুদ্ধ হয়েছেন শিশুসাহিত্যের শিক্ষকতায় : আর নাটকের সঙ্গে কবিতার চিরায়ত ছন্দ-সংযোগ ও স্পন্দনের দৃষ্টান্ত তো শেক্সপীয়র— আধুনিককালে সে কথা আর একবার প্রমাণ করলেন বুদ্ধদেব; অতুলনীয় তাঁর সিদ্ধি এবং অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়।

২

কিন্তু এ-সবই সম্ভব হয়েছে শুধু তিনি কবি বলেই। কিন্তু কবি হলেই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, সর্বক্ষেত্রে কবিতা করার দুঃসাহস; যে 'কবিত্ব' ছিল রিলকের,

জীবনানন্দের— ছিল না এলিয়টের— এবং সবচেয়ে বেশি ছিল অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের এবং সহজাতভাবে বুদ্ধদেব বসুর। 'প্রতি মুহূর্তে কবির জীবন' কিটসের এই তীব্রতম সত্যটি যদি কারো কারো মনে অমোঘ ও অবশ্যমান্য বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে, তবে তিরিশের দুজন কবির কথাই নিঃসন্দেহে আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়বে— জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব; সুধীন্দ্রনাথকে নয়— ম্যালার্মে-শিষ্যের গম্ভীর ও নিস্তাপ জীবন সত্ত্বেও।

জীবনে, স্বপ্নে, কর্মে, প্রেরণায়, ভ্রমণে ব্যাপ্তিতে; শুধু কবির মতো ক্রমশ 'বিদ্বান' হয়ে ওঠা— অমৃতের পথে এই যাত্রাই কাম্য ছিল তাঁর (আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্যেও জরুরি)— আমরা আশ্চর্য হইনা যখন দেখি, কৈশোরলগ্নের এক বিশেষ মুহূর্তেই কোনো ঝাপসা ঈশ্বরভাবনা নয়, কিংবা লাঞ্ছিতদের পক্ষে সহজ ও উদ্দাম জয়ধ্বনিও নয়— তাঁকে দগ্ধ ও একান্ত করলো 'নারীর প্রেম'।

হয়তো এই প্রেম, নারীর প্রেম কথাটায় আমরা আর তত উচ্চতার স্পর্শ পাইনে। অনেক তরলতায় সে আক্রান্ত হয়েছে; হয়েছে স্পষ্টভাবে কবিদের দ্বারা, পরোক্ষ তরুণের অগভীর বিহ্বলতায়— তাই এই শব্দটি আমাদের অনেকের জীবনে আর আকর্ষণের বস্তু নয়, এবং অনেকের কাছে বৈদেশিক। কিন্তু প্রেম যে নিন্দনীয় নয়, কিংবা ইন্দ্রিয়বিলাসের দ্বারা যে কেবল আবিল নয়; কিংবা মরমীদের মতো সে শুধু ঈশ্বরের পথে সোপানের কাজ করছে না— এই কথাটি বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিকদের মতই উপলব্ধি করেছেন। জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পরম ও অমরতা— এ-সবের মতো প্রেমও যে সত্তার একটি সমস্যা; এবং জীবনের একটি প্রধান অংশই এই প্রেম : এই উপলব্ধি আমাদের জীবনকে কোমল ও কমনীয় করে তোলে। তাই "লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ, দুটি নর-নারী, কেমন করে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত" হবে— শুদ্ধশীল এই উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধদেবের— হয়তো রোমান্টিকদের— 'তপস্বী' ও তরঙ্গিণী' সেই অমৃত লাভের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারীর প্রেম কোনো না কোনোভাবে সকল কবিরই প্রাথমিক আরাধ্য বিষয়; কিন্তু বুদ্ধদেবের সমস্ত জীবনেই তা ছিলো চর্চার ও অর্জনের বিষয়— তা শুধু রোমাঞ্চকর বলেই আরাধ্য নয়; প্রেম প্রকৃত অর্থেই 'আবশ্যক প্রাণশক্তি'। 'বন্দীর বন্দনায়' যা ছিলো অস্পষ্টভাবে 'তবু আমি অমৃতাভিলাষী! —/অমৃতের অন্বেষণে ভালবাসি, শুধু ভালবাসি/ ভালোবাসি— আর কিছু নয়।'— তাই নির্ভুল আদর্শে রূপান্তরিত হলো 'স্বাগত বিদায়ে'; রতিতৃপ্ত যুগলের দ্যুতিকে মনে হলো 'ব্যক্ত কোনো-এক ব্যক্তির প্রতিভার মতো'— যাদের মিলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টি, কবিরও যা উদ্দিষ্ট : মানবাত্মার মহিমার একটি লক্ষণই এই যে, সে স্রষ্টা হতে চায়, হতে চায় দেবতার মতো সৃষ্টিশীল ও বিস্তৃত। কিন্তু 'প্রেম একাই যথেষ্ট নয়'— কিংবা যা মদির রমণীয়, চিন্তাহীন ব্যবহারে তা ক্রমশ স্থূল ও তিক্ততায় নেমে আসতে পারে— তাই বুদ্ধদেব সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন 'মননের', আত্মার বিশুদ্ধতা— তার প্রেমিকের পক্ষে তাই 'চাই জ্ঞান, কষ্টকর গবেষণা'। জ্ঞান ও গবেষণা, কেননা কবিতা ও শিল্পের নিরন্তর মৃদু কণ্ঠস্বর কী করে উদ্ভাসিত করবে সেই চরম পরিচয়কে, যে 'সৃষ্টি এক অনাদি রহস্যে ঢাকা' আর 'কবিতাও প্রবঞ্চনা–সান্ত্বনা–বিকল্প মাত্র', কিন্তু বিগত যৌবন বলে নারীও কাম্য ও প্রথিত হতে পারে না— এমনকি যে-অন্ধকার যবনিকা আমাদের প্রস্থানের পথে জাগ্রত, অর্থাৎ মৃত্যু; আমাদের জাগতিক বোধ কিংবা ধারণা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা, আমাদের কল্পনার পক্ষে তা দুর্গম ও পাণ্ডুর। তাই এই অবরোধ থেকে মুক্তির পথ নিরন্তর কাজের মধ্যে, অবিরল পরিশ্রমে— কবির অবলম্বন যেহেতু শব্দ— তাকে শব্দের মধ্যেই তাই নিরন্তর নিয়োজিত ও শোধিত হতে হবে।

৩

শব্দে এরকম শোধিত হবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোদলেয়ার— আর বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসু। তাই 'বন্দীর বন্দনা'র পরিশ্রমী কবি *যে-আঁধার আলোর অধিক* কিংবা *মরচে-পড়া পেরেকের গান* পর্যায়ে এসে নিরস্ত হননি— হলেও স্বাভাবিক ও মান্য ছিল যে উজ্জ্বল ফসল— তিনি ভ্রমণ করেছেন, প্রবিষ্ট হয়েছেন, স্পষ্ট করে তুলেছেন বাংলা কবিতার সম্ভাবনার দ্রাঘিমাকে— যা নিজের জন্য এবং পরবর্তীদের জন্যেও শিক্ষণীয়। বোদলেয়ারের ঐতিহাসিক অনুবাদ তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়— দুজন ভিন্ন যুগের সমভাবাপন্ন কবির মুখোমুখি আলাপচারিতার চেষ্টা বললেও শুধু আংশিক সত্যকেই আমরা স্পর্শ করবো— এই মর্মর অনুবাদগুচ্ছ আধুনিক বাংলা কবিতার জাগরণের প্রথম ও অভূতপূর্ব ঘটনা। যে অনিবার্য পরিবর্তন কাম্য ছিল এতদিন, তাকেই মূর্ত করে তুলেছে এই অনুবাদ— আমার কাছে এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে এই অনুবাদগুচ্ছ তাই এক বিরল ঘটনা। ভবিষ্যতে এমন কোনো কবির কথাও আমরা ভাবতে পারিনা, যিনি বোদলেয়ারের নয়, বুদ্ধদেব বসুর *ল্য ফ্ল্যর দ্য মাল* না পড়ে নিজেকে প্রস্তুত কিংবা দীক্ষিত করবেন। শুধু কি বোদলেয়ার-রিলকের, কালিদাসের, হ্যেল্ডার্লিনের অনুবাদ গ্রন্থগুলো আক্ষরিক অর্থেই আমাদের শিক্ষিত করবে। তাঁর *মহাভারতের* তীব্র ও প্রোজ্জ্বল ব্যাখ্যাগুলো আমাদের সামনে খুলে দেবে একই সঙ্গে ভারতীয়, গ্রিক ও রোমক পুরাণের স্থায়ী ও লুপ্ত জগতকে।

একজন কবির কাছে আমাদের ঋণ প্রধানত কবিতার জন্য— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কাছে এই ঋণ বিচিত্র ও কোন কোনো অর্থে পরস্পরবিরোধী। তবু রবীন্দ্রনাথ দেবতার মতোই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন— দাতা হিসেবে তাঁর অনন্যতার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই; কিন্তু সমকক্ষ প্রতিভা না হলেও এক বিপুল দায়িত্বকেই বহন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু— এবং রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যে 'আবৃত' হবার একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে তাকে প্রণতি জানাবে সুবিবেচক ভাবীকাল।

৪

তিরিশের কবিদের মধ্যে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আছেন জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ— কিংবা গদ্যে উৎকৃষ্ট মননের উদাহরণ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে— কিন্তু সামগ্রিকভাবে, রবীন্দ্রনাথের পরে বিপুল ও বহুগামী হিসেবে একমাত্র দৃষ্টান্ত তিনি। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প পাঠকের মনে পড়বে যে তিনি এক ইন্দ্রিয়ময় কিন্তু মহত্তম আত্মিক চৈতন্যের কবি, তাঁর কবিতার পাঠককে অবশ্যই পড়তে তার প্রবন্ধ ও সমালোচনা; কেননা তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যেরই পূর্বাঙ্কুর— আর বুদ্ধদেবকে যিনি কবি হিসেবে স্বীকার করবেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নাটকের সমনস্ক প্রাণতপ্ত পাঠক। কেননা যা-কিছু তিনি রচনা করেছেন, সে উপন্যাসই হোক কিংবা কবিতাই হোক, প্রবন্ধ অথবা সমালোচনা; এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত পত্রাবলীতে— কোনো না কোনোভাবে তা কবিতার দ্বারা প্রভাবিত কিংবা কবিতার জন্যে তৃষিত। স্বল্পায়ু কিটস্ চেয়েছিলেন সার্বক্ষণিক কবির জীবন— আর বুদ্ধদেবের সমস্ত জীবনব্যাপী ছিলো এই আদর্শের নিরলস চর্চা। স্বভাবে, কর্মে চিন্তায়; শুধু কবির পক্ষে গ্রহণীয় ও অনুকূল, অর্থাৎ— কবিতা ছাড়া তাকে আর কোনো বাসনাই পীড়িত করেনি।

তাঁর প্রিয় কবিদের মধ্যে ছিলেন বোদলেয়ার ও রিলকে; গদ্য লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে তাঁর মনে পড়তো যন্ত্রণাকাতর ডস্তয়ভস্কিকে— ইউরোপের শুদ্ধতম সন্তানদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলেই নয়; এঁদের যন্ত্রণার মধ্যে আমরা মনুষত্বের আর শুদ্ধ ভাবীকালেরও

সন্ধান পাই। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে' বোদলেয়ারের ছিল এই তৃষ্ণার আহ্বান। এবং সেই অজানায় পৌঁছানোর শর্ত হিসেবে বুদ্ধদেব বললেন 'হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির'। কেননা, সেই চরম ও কাঙ্ক্ষণীয় অজানা মরত্ব মানুষের ভ্রমণের জন্যে সমতল নয় :

হাঁ খোলে পাতাল বেশ্যা, নেমে আসে কুমারী নীলিমা।
সেখানে ফোটে না ফুল, মরে যায় কীটের কালিমা
যা বলে বলুক ঋতু, তুই শুধু পার হয়ে যাবি।

[আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১]

বারবার বুদ্ধদেবের কবিতায় অমরত্বের প্রতি এই তৃষ্ণা, দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের প্রতি, শ্রুত থেকে অশ্রুতে, বস্তুর অবরোধ থেকে চৈতন্যের জাগরণের দিকে, মুক্তির প্রার্থনা নিরন্তর ধ্বনিত হতে দেখি। কবির বিষয়ে একটি বিশেষণই বোদলেয়ারের প্রিয় ছিল, 'পুণ্যবান',— কেননা কবির চৈতন্যই একমাত্র জাগ্রত ও ভাস্বর; আর বুদ্ধদেব সেই শাপভ্রষ্ট কবিকেই মনে করেন শাপভ্রষ্ট কুকুরের মতোই শাপের মোচনে অসহায় ও কাতর। 'দুই কুকুর' কিংবা 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'র 'কোনো কুকুরের প্রতি' পড়ার পরে, মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতীক এই নিরীহ জন্তুটির দুর্বলতা ও সুখ্যাতির একটা আলাদা অর্থও যেন খুঁজে পাই আমরা।

এরকম আলাদা অর্থ পাওয়া সম্ভব মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলোতে— কিংবা সেইসব কবিতায় যেখানে মৃত্যু প্রসঙ্গ স্পষ্ট। মৃত্যু স্বাভাবিক ও অনতিক্রমণীয় বলেই অমরত্বের প্রতি আমাদের এত প্রবল তৃষ্ণা— এবং কবিরা যে-কটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ও সার্থকভাবে আন্দোলিত হন— যেমন প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বরভাবনা, ইন্দ্রিয়বিলাস ও মৃত্যু— এর মধ্যে মৃত্যুই সবচেয়ে গভীর ও প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যাপ্ত। বোদলেয়ারের মৃত্যু বিষয়ে ছয়'টি প্রত্যক্ষ কবিতা পাই আমরা, আর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে একটি প্রধান অংশই মৃত্যুচেতনা, জীবনানন্দেরও তাই— তবু মৃত্যু বিষয়ে বুদ্ধদেবের কবিতাই সবচেয়ে 'প্রবল ও নির্দিষ্ট'। *স্বাগত বিদায়*-এ এর সংখ্যা পাঁচ, অন্যত্রও কম নয়।

মৃত্যু এমন একটি বিষয় যা, প্রত্যক্ষ না হলেও কবির চেতনায় সর্বসময়েই মুদ্রিত হয়ে থাকে। এমনকি একজন নীরোগ, সুঠাম সুন্দরীর সংস্পর্শে মৃত্যুর কথা কোনো না কোনো ভাবে যার স্মরণ হবে না— তার বিস্মৃতি ঈর্ষণীয় হলেও— কবি হিসেবে কখনোই মানতে পারিনা তাকে আমরা। 'মৃত্যুই সান্ত্বনা, কেননা সেই বাঁচিয়ে রাখে'— 'গরিবের মৃত্যু'র (বোদলেয়ার) এই হচ্ছে প্রথম পঙ্‌ক্তির আশ্বাস; কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে মৃত্যু 'পূর্ণ ও চরম', কেননা, 'জীবনকে পার হয়ে আসতে হয় বহু অবিশ্বাসী অপেক্ষার ভঙ্গুর উচ্ছ্বাস'। টেনিসের মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও দেখি মৃত্যুর জন্য শান্ত অপেক্ষা— ভালবাসা ও এষণায় আপ্লুত, এ-যেন প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের মতই মাধুর্যময় ও সুখের। বুদ্ধদেবও প্রকারান্তরে মৃত্যুর এই মহিমাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন; কেননা আত্মসমর্পণের 'মুখবন্ধেই মৃত্যু, আসলে পরিণামে পুনরুজ্জীবনে' যা অমরতার পথে ধাবিত হয়। বতু শরীরী মৃত্যুই কেবল নয়, 'জীবন্ত' মৃত্যুর কথাও বুদ্ধদেব ভোলেননি। *স্বাগত বিদায়* কবিতায় স্পষ্টভাবে সেই মৃত্যুর কথা বললেন :

কিন্তু কোনো জীবিতের কাম্য নয়
অজন্তার অমরতা–যদি তাকে অমরতা বলো।

তারা মৃত্যু চেতনায় বদ্ধমূল বলে
স্বভাবত জীবন-কাঙাল; যতক্ষণ দেহে আছে তাপ
ততক্ষণ মৃত্যু নেই— যেমন অবোধ শিশু নিজে চক্ষু বুজে
ভাবে সেও অদৃশ্য, শত্রুর পক্ষে।
কিন্তু নয় মৃত্যুও অনন্য, সেও বহুরূপে, বহুনামে খেলা করে
শুধু নয় শরীর মরণশীল,
হৃদয়, প্রণয়, মন, সবই ক্ষণকালীন, ভঙ্গুর।
তা, যারা বেঁচে আছে সমকালে এখনো, তারাও
সমতালে নেয়না নিশ্বাস,
মাঝে-মাঝে পরস্পরের পক্ষে মরে যায়,
মাঝে-মাঝে নিজের পক্ষে মরে যায়
অলক্ষিতে, অবিলাপে, ভোরবেলা লণ্ঠনের মতো,
অথবা যেমন
ফুটন্ত কেটলির বাষ্প মুক্তি পায় জলত্ব হারিয়ে।

৫

জগতে দু-রকম কবির কথা আমরা জানি। এক, যাঁরা পরিণত ও দৈব প্রতিভা নিয়ে জন্মায়— আবিষ্কারের জন্যে 'কষ্টকর অপেক্ষা' তাঁদের বেলায় প্রযোজ্য নয়; বরং এই সব প্রতিভার পূর্বে 'অলৌকিক' শব্দটি জুড়ে দেয়া যায়— আরেক ধরনের প্রতিভাকে বলবো, অপেক্ষার, নির্মাণের বিবর্তনের,— 'বিস্ফোরণের' তীব্রতম মুহূর্তটির জন্যে তাঁদের হতে হয় তৃষিত ও পরিশ্রমী, শোধিত ও চরিত্রবান— র‍্যাঁবো, কিটস কিংবা বাংলা কবিতায় 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র কবি বিষ্ণু দে যদি থাকেন প্রথম দলে, তবে দ্বিতীয় দলে নিশ্চিতভাবেই আমরা পাবো রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং অবশ্যই বুদ্ধদেবকে। 'প্রভাত সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমলে'র কবিকে অপেক্ষা করতে হলো 'মানসী'র স্বপ্নভঙ্গের জন্য, আরো যথার্থ হয় যদি বলি, 'ক্ষণিকার' মূর্ত মুহূর্তের জন্য।

বুদ্ধদেবকেও অলৌকিকতার বদলে বিনীত ও পরিশ্রমী হতে হয়েছে। 'নিরন্তর কাজ করো, কাজের মতো আর— কিছুই নেই' : রঁদার এই উপদেশকে মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন রিলকে– রিলকের পরে সম্ভবত বুদ্ধদেব। যদিও কবি তো এক অর্থে প্রেরণা-নির্ভর, ভাগ্যের মুখাপেক্ষী; তবুও আরব্ধ কর্মের সামনে তার প্রস্তুতি ও তিতিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো কবি তাই আপাত নিষ্ফলা সময়ে খুঁজে নেন অনুবাদ কর্মের আত্মপরীক্ষা কিংবা গদ্যের স্বেদাক্ত অধ্যবসায়। লক্ষণীয়, *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* ও *যে-আঁধার আলোর অধিকের* তিন বছর পরে ১৯৬১ সালে। আর মোটামুটিভাবে, রিলকের অনুবাদটিও তাই— *মরচে পড়া পেরেকের গান* ও *একদিন : চিরদিনের* মধ্যবর্তী রচনা।

আমরা জানি, বুদ্ধদেব চিরকালই প্রতীচ্য কবিতায় শিল্পিত ও শিক্ষিত। প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিলেন, শেলি, কিটস, বায়রন, সুইনবর্নের মতো কবিরা; তবু বুদ্ধদেবের রুদ্ধ নির্ঝরকে মুক্ত করেছিলেন, শেলি–বায়রন নয়— দু'জন বরপ্রাপ্ত, একান্ত শাশ্বত কবি— ফরাসি কবি বোদলেয়ার ও জার্মান কবি রিলকে— দু'জনই ভৌগোলিক অর্থে ইউরোপীয়, কিন্তু কেউ-ই ইংরেজিভাষী নয়। কেননা আধুনিক কবিতার দুই মুখ্য দিগন্ত— পাপক্লিষ্ট দুঃখ ও আত্মস্থ শান্ত বেদনা এঁদের কবিতায় তীব্র ও মূর্ত হয়ে

উঠেছে। এই দু'জন কবি বুদ্ধদেবকে প্রভাবান্বিত করেছেন, এমন কথা আমরা বলিনা— কিন্তু একজন কবি আরেকজন কবিকে যতটুকু প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাই করেছিলেন এঁরা।

*যে-আঁধার আলোর অধিক*কে আমরা বলবো 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', বুদ্ধদেবের এবং কোনো কোনো অর্থে বাংলা কবিতারও— কেননা ক্লিষ্টতা ও ভাবালুতার পরিবর্তে এই কবিতাগুলোতে আমরা পাই ঘনত্ব, আত্মস্থতা ও বহুমুখিতার দৃষ্টান্ত, যা একই সঙ্গে নির্ভর ও ভাবনামগ্ন। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তরে'ও ছিলনা সংহতির অপূর্ব আত্মস্থতা, দৃষ্টিতে আসেনি অনাসক্তি ও সংযম, পেলবতা ও মাধুর্যের মোহ ছিন্ন করার মৃদু চেষ্টা আছে, কিন্তু চেষ্টাই— উদ্বেল কবিতা থেকে তা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। বুদ্ধদেবকে অপেক্ষা করতে হলো *যে-আঁধার আলোর অধিকে*র জন্য; এবং তখনই জন্ম হচ্ছিল *ল্য ফ্ল্যর দ্যু মালে*র অনুবাদগুচ্ছ। এই অপেক্ষা দুঃসহ, মর্মান্তিক-কিন্তু শিল্পী বা কবির জন্যে অপরিহার্য; কেননা তাকে বর্জন করতে হয় লৌকিক সাফল্য ও অর্জিত অভ্যাসের প্রাণবন্ত সান্ত্বনা :

> ভুলে যা ঝংকার, ঝর্ণা, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
> যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই;–
> ওরে সেই বরফ-গলানো রঙ্গ আর যদি না থাকে কিছুই,

আমরা বুঝতে পারি, বুদ্ধদেব এতদিনের নির্ভরতা ও আশ্রয়ের নমনীয়তাকে বিদায় জানালেন— প্রস্তুত হলেন আরো দুরূহ কর্মে, স্মৃতি ও কল্পনার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটাতে— যখন কবিতা মাত্রই শোণিতের প্রদাহ ও আত্মোপলব্ধির সার্থক মিশ্রণ। দেবোপম 'অর্ফিয়ুসের পক্ষেই সম্ভব ছিল চিরন্তনের সঙ্গে যোগসাধনা, দ্বিখণ্ডিত চেতনার অধিকারী সাধারণ মানুষ নয়'— রিলকে ছিল এই অসহায় বেদনা; যা রিলকের মতো যে-কোন কবিরই মৌলিক অক্ষমতার বেদনা হতে পারে। বুদ্ধদেব সেই অর্ফিয়ুসকে আরেক দেবতার মধ্যে লক্ষ্য করলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ— 'অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর' রবীন্দ্রনাথ :

> তবু ছিলে প্রতিযোগিতা
> পরপারে, বিশ্রামের শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
> চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।
> যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে কেবল
> (রবীন্দ্রনাথ/ *যে-আঁধার আলোর অধিক*)

কিন্তু এরকম দৈব সৌভাগ্য সকলের জন্যে নয়। ম্যালার্মে চেয়েছিলেন কবিতার মধ্যে 'শ্রমিকতার ঘ্রাণ'— এরও কারণ বোধ হয় তাই। 'নিরন্তর কাজ' ও নিস্তাপ অপেক্ষা, শিল্পীর জন্য, এই প্রাণবন্ত পরিশ্রমই 'তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল'— *স্বাগত বিদায়ে*র প্রথম কবিতাটির মধ্যেই তিনি অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন এই বাক্যটি; কিন্তু তা এক অর্থে *যে-আঁধার আলোর অধিকে*র সময়কার নতুন পাওয়া পরিণত চেতনারই অংশ। কিন্তু *যে-আঁধার আলোর অধিক* মর্যাদা দিতে পারি না আমরা;— একটি বৃক্ষের সম্ভাবনাকে মূর্ত করছে— এরকম ভাবাই সমীচীন; যেমন রিলকে 'ডুয়িনো এলিজিস' ও 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ' রচনার পূর্বে আমরা পাই 'নতুন কবিতা'। এখন তাঁর নিত্য সঙ্গী ধৈর্য ও পরিশ্রমার্জিত জিজ্ঞাসা; কবিতা লিপিবদ্ধ করলেন অনাগত ও ঈপ্সিতের জন্য এই প্রার্থনা : 'অন্তরাত্মা যেখানে অর্পণ করো,

যেখানে অন্তিম অন্বয় খুঁজে পায় গতির তরঙ্গ আর স্তব্ধতার নীলাভ গুঞ্জন'। *মরচে-পড়া পেরেকের গানে* লব্ধ হলো এই বিশ্বাস :

সব স্বস্থ,
সব স্থির, নিশিত, অটুট,
রচিত নাটকে গাঁথা ঘটনার মতো :
শুধু আমি
হয়ে গেছি স্রোত, গতি, নিঃসরণ–
অফুরান, হাঁ-খোলা, রক্তিম
অচিকিৎস্য সংক্রমণ অবিরল স্রাবময় এক
ক্ষত।

শুধুই শব্দের অপলাপ নয়; এই 'স্রোত, গতি, নিঃসরণে'র ফলাফল সেই তিনটি গ্রন্থ, (*মরচে-পড়া পেরেকের গান*, *একদিন : চিরদিন* ও *স্বাগত বিদায়*) যা একই সঙ্গে, প্রেমের ও বিচ্ছেদের, দুঃখ ও প্রশান্তির, অনাসক্তি ও তীব্রতার, বিধ্বস্ত ও নির্মাণের কবিতা— আদি চেষ্টায় যা ছিল খণ্ডিত, এমনকি অপূর্ণ : তা এখন পূর্ণ ও শোধিত হলো— প্রত্যক্ষভাবে এই উপহার, এই নিবেদন আমাদের জন্য; কিন্তু গভীরতর অর্থে সমস্ত অর্চনার গ্রহীতা তিনি নিজেই।

৬

মরচে-পড়া পেরেকের গানে কবিতার সংখ্যা চব্বিশ, *একদিন : চিরদিন* ও *অন্যান্য কবিতায় সতেরোটি*, *স্বাগত বিদায়ে*ও তাই এবং এই সংখ্যা লঘু হবার কারণ কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের গভীর, মনস্ক ও ধ্রুব ভঙ্গি; কোনো আকস্মিক বেদনা. বা আবেগই এখন আর কবিতার বাহন হতে পারেনা,— যতক্ষণ না তা হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা ও অখণ্ড চেতনায় ভাস্বর। যৌবনকালীন প্রেম ও তার কম্পন, আবেগবিহ্বলতা ও শব্দের মুখরতা থেকে দূরে সরে এসেছেন তিনি— লিখতে পারছেন না 'কঙ্কাবতী' কিংবা 'শীত রাত্রির প্রার্থনা'র মতো কবিতা; কোনো দ্রুত বা অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ নয়— তাঁকে সিক্ত হতে হবে জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের মহার্ঘ উপহারে— এবং তা এমন এক তীব্র ও বিদীর্ণ মুহূর্ত, যাকে রিলকে প্রকাশ করতেন *মরত্ব* ও *অর্ফিয়ুসের মাঝামাঝি* সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত বলে। কবির পক্ষে রীতিমতো প্রত্যাশিত ও অনিবার্য সময় (যদি তিনি হন রিলকে, জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেবের মতো কবি), *ডুয়িনো এলিজিস* আর *সনেটগুচ্ছ* লেখার প্রাক-মুহূর্তে, কিংবা *মরচে-পড়া পেরেকের গান* ও *স্বাগত বিদায়ে*র আসন্ন উষায়। এই উত্তেজক মুহূর্তের বর্ণনা আমরা পাই এভাবে :

কেবল তোমাকে নিয়ে বেঁচে আছি। যদিও জানি না
কী তোমার নাম, কিংবা কেমন মুখের ছাদ।
নারী না পুরুষ তুমি? বোন ... বন্ধু? প্রতিহিংসা ... ঘৃণা?
তৃপ্তিহীন কাম/ না কি বিতৃষ্ণার বিশাল প্লাবনে
ডুবে-যাওয়া, ভেসে ওঠা, মৃতপ্রায়, অমর বিষাদ?

আমার হৃদয় নিয়ে রাঁধো তুমি বিষাক্ত লবণে,
আমার নিদ্রার কাঁথা মনস্তাপে করো ছিদ্রময়।
অথবা কান্তার মতো অন্ধকারে জানায় সংকেত—

তুমি— না কি বৃদ্ধ এক ক্ষমাহীন প্রেত,
যে বলে অনবরত : 'নেই—' কিংবা 'হয়নি সময়।'

সিদ্ধ হয়েছেন তিনি, *যে-আঁধার আলোর অধিকের* পরে সময়ের অনুকূলতা বিষয়ে আমাদের অন্তত সন্দেহ নেই— শুধু আমাদের পক্ষে তা স্পষ্টতর হবে, যদি সেই তিনটি গ্রন্থ একটি অভিন্ন প্রবাহ হিসেবে দেখি।

কবিতার বিষয়বস্তুকেও এসেছে নতুনত্ব; তা প্রসারিত হয়েছে ভারতীয় পুরাণ থেকে ইহুদি পুরাণে, কোনো উন্মাদ প্রিয় কবির প্রসঙ্গ থেকে মৃত্যুবিষয়ে নতুন প্রতীতির দিকে— কিন্তু যা কিছু সঙ্কলিত হলো, তা হলো পরিশ্রুত অবস্থায়।

পুরাণের প্রতি এই অভিনিবেশের কারণ কি; কেনই বা এই দুর্মর অতীতপ্রীতি— কোনো বিশ্বস্ত দিনপঞ্জি কিংবা 'একান্ত ডায়েরির' অভাবে আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রধানত কবিতাগুলোর ওপর নির্ভর করেই দেওয়া সম্ভব। এই নশ্বর ও ভঙ্গুর জীবনের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব কেবল অতীতের উপলব্ধিতে; ইতিহাসের মর্যাদার মূল কথাও এ-ই— ফলে তা সহনীয় হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে দীপ্ত ভবিষ্যতে 'আবৃত' করলে— বুদ্ধদেব তাই ক্রমাগত ভ্রমণ করলেন নিকট অতীত থেকে সুদূর অতীতে, পুরাণের ইঙ্গিতময়তায়— আমি এরকমই তার অর্থ করেছি।

মরচে-পড়া পেরেকের গানের পাঁচটি ও *স্বাগত বিদায়ের* তিনটি কবিতা তাই প্রত্যক্ষভাবেই পুরাণ আশ্রিত। বোদলেয়ারের *ইকারুস-বিলাপ* নিটোল ও মিথকথনের দৃষ্টান্ত কিন্তু বুদ্ধদেব গ্রহণ করলেন তার ব্যাপ্তি, রিলকের *আবিশাগ* আর বুদ্ধদেবের *বৃদ্ধ রাজার* দূরত্ব খুবই অল্প— কিন্তু অর্থবহ এ-কারণে যে অমোঘ ও অপ্রতিহত নিয়তিকে মেনে নিতে বৃদ্ধ রাজার মতো ততদিনে তিনিও প্রস্তুত হয়েছেন। *স্বাগত বিদায়* রূপক অর্থে নয়, নিবিড় উপলব্ধিতেই স্বীকার্য হলো।

প্রকৃতির বন্দনায় মুখর বুদ্ধদেব একদিন প্রকৃতি থেকেও নির্বাসিত হলেন— শেষ তিনটি গ্রন্থে কোথাও প্রকৃতি প্রধান নয়, বিরল— এই বিচ্ছেদের স্পষ্ট পরিচয় 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২' কবিতাটি— প্রকৃতিচ্যুত কবি অতঃপর মেনে নিলেন এক ভয়ঙ্কর বধিরতা :

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়— ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ,
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্ব, নির্বেদে।

প্রাঙ্গণে কিছুই নেই; পারিস তো বধির হয়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।

শীতের নোঙর পড়ে, আর কিসে তোর প্রয়োজন?
তীর, দ্বীপ, সিন্ধু নিয়ে জেগে ওঠে অমল দেয়াল,
এক হয়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন,
রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালিমারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকার ছুঁড়ে ফেলে সরে যায় নিখিল পৃথিবী,

কেননা, গতির পারে, তারে তুই সৃষ্টি করে নিবি।

[আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২]

কিন্তু দৃষ্টি, শ্রুতি ও স্পর্শময় জগত যখন রুদ্ধ হয়, তখনই শুরু হয় এক আত্মিক উদ্ভাস— সৃষ্টিশীলতার এক দৈব ও অনুকূল সময় (বিটোফেন বোধহয় এই অর্থে 'ভাগ্যবান')— এই বধিরতা তাই আরো গভীর ও সক্রিয়।

স্বাগত বিদায়ে তাই সমস্ত জিজ্ঞাসা অবসিত হলো। এতদিনে তিনি সত্যিই প্রস্তুত— বিদায়, প্রকৃত অর্থেই বিদায়; কিন্তু প্রস্থান কোনো অনির্দিষ্ট পথে নয়, উত্তরণের মধ্যে : আর এই উত্তরণের মুহূর্তে তাঁর অবলম্বন হলো অতীত,— কিন্তু উত্তাপের যে পরিচয় সেখানে পাই, তা-কে সমকালীন বলতে বাধা নেই— কিন্তু তা মূর্ত করে তোলে একই সঙ্গে সুদূর ভবিষ্যৎকে;— এবং এইভাবেই স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, ক্ষণিক ও চিরায়তকে একসূত্রে গ্রথিত করলেন তিনি।

৭

'যে-কোনো মৃত্যুই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু বীরের মৃত্যু মহান'— জগতের সকল কবি নয়, এক বিশেষ অর্থেই কোনো কোনো কবিকে আমরা বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকি। কবিতার প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষায় পার্থিব জীবনের প্রতিকূল অবস্থাতেও যাঁরা অটল ও অক্ষত থাকতে পারেন— তাঁদের ব্যক্তিত্বেই রয়েছে অপরাজেয় বীরের সত্তা। বুদ্ধদেবের মৃত্যুও তাই বীরের মৃত্যু। নানা গুণসমন্বিত, বহুমুখী এই পুরুষের রচনাপ্রবাহের বৈচিত্র্যও তুলনাহীন— সময়ের ব্যবধানে তার কোনো কোনো অংশ হয়তো প্রিয় ও প্রধান হয়ে উঠবে,— কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো তাঁর দুর্গমযাত্রার সঙ্গী ছিল অনেকেই; কিন্তু সবচেয়ে একান্ত, বিশ্বস্ত ও প্রিয় সঙ্গীটি যদি যুধিষ্ঠিরের জন্য হয় সারমেয়; তবে বুদ্ধদেবের বেলায় তা ছিল কবিতা— যে কবিতার জন্য এই মর জীবনে কবিরাই কেবল যুগে যুগে অমরতার প্রবল দাবিটি উৎকীর্ণ করার দুঃসাহস করেন।

একখানা হাত

আকাশে জমেছে মেঘ; পথ নিরিবিলি;
সব চুপ। রাত দু-পহর।
বাড়িগুলি অন্ধকার পথের দু-ধারে;
ঘুমায় শহর।

শরীরে জমেছে ক্লান্তি, দুই চোখে ঘুম,
হেঁটে-হেঁটে একা ফিরি বাড়ি।
এখনই আসিবে বৃষ্টি; তাই জোর ক'রে
চলি তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান-নীল ইলেকট্রিকের
আলো দেখা যায়।

শুধু এই জানালায় আলো জ্বলিতেছে,
অন্ধকার শহর নিরালা;
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম,
— বুজিলো জানালা।

নিলাম তাহারই ফাঁকে পলকের তরে
একখানা শাদা হাত দেখে—
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনই
দুই দিক থেকে।

একখানা শাদা হাত, কয়টি আঙুল,
আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো,
— চোখের পলক।

আবার দু-চোখ ভ'রে ঘুম জ'মে এলো,
সকল পৃথিবী অন্ধকার :
— এই কথা না-জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।

এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে,
হাওয়ার চিৎকার যায় শোনা,

যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনিবো না।

বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে;
না জানি এখন কত রাত;
— কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানিবো না,
এ-ই সেই হাত।

৫ মে ১৯৩০

কঙ্কাবতী

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি' বাজে, 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
(কঙ্কাবতী গো।)
দূর-সিন্দুর তরঙ্গ- রোল অমাবস্যায় অনবরত
(অন্ধকারের অন্তর-ভরা ছন্দ-শিহর স্পন্দমান)
সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে ফেটে বেজে ওঠে গানের মতো।
অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায়, ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো।)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিন-রাত, বাজে সারারাত, বাজে সারাদিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত;
ঢেউয়ের মতন গান গেয়ে যায় : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী।
কঙ্কাবতী গো!
দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দ শুনি,
(কঙ্কাবতী!)
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি।
(কঙ্কাবতী!)
গূঢ় গভীর মন্দির মাঝে ঘণ্টার মতো সুগম্ভীর
পলকে-পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে— 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আমার মনের গুহার বুকে :
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায়-চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশ দিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি :
আমার মনের অপর আকাশে হাজার হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাইনে ও বামে, উপরে ও নিচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি!
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী গো— কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—'
এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি।

দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ারে বহে,
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে আকাশে রটে
কী কলরোল।
আমি যে-দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজের শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে শুনি
(কঙ্কাবতী)

হৃৎশব্দের তালে তাল রেখে টিপ টিপ টিপ গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী—
কঙ্কাবতী গো।'
রাতের ঘুমের নীরব সময় মুখর তোমার নামের গানে,
প্রতি মুহূর্ত ফুটে ঝ'রে যায়, ফেটে ম'রে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝ'রে যায় তোমার নামে;
রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী!
কঙ্কাবতী গো!

মাঝরাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা— আলোর পোকা,
আকাশ কোমল।
আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে-আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাখার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ
চোখের পাতার খুব কাছে এসে মিটমিট ক'রে তাকায় হঠাৎ
আবার লুকায় আলোর পাখার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি : তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে
সেই সুরে ওরা ঘুরে-ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক!
সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট!
আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
তারার মতন একশো কোটি।

আবার কখনো জেগে রয় রাতে একা বাঁকা চাঁদ পশ্চিমেতে,
রাতের নদীতে আরো জেগে রয় আঁকাবাঁকা চাঁদ জলের নিচে;
পশ্চিম-ভরা আকাশ ফাঁকা
তারাদের কেউ দেয় নাই দেখা, আকাশ ফাঁকা,
একা জাগে চাঁদ— তাছাড়া সকল আকাশ ফাঁকা।
শুধু ঐ দূরে দিগন্তরেখা যেখানে চলেছে গাছের নিচে,
একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো
গাছের সবুজ জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ একা বাঁকা চাঁদ বাঁকারেখা চাঁদ,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।

আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ’রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ-চুপ-ক’রে কথা ক’য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ’রে পড়ে সুর— ‘কঙ্কা! কঙ্কা।
কঙ্কাবতী!’
সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ
লাল বিদ্যুৎ দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে;
আকাশ ফাটায় লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়— ‘কঙ্কা! কঙ্কা’! কঙ্কাবতী!’
আকাশের কোন ফাঁকা কোণ থেকে দেখা দেয় এক তাড়ানো তারা
হঠাৎ! হঠাৎ!
খসা তারা এক, মরা তারা এক আগুনের মুখ নিয়ে ছুটে যায়,
অবাক! অবাক!
চোখের পলকে ছুটে চ’লে যায়, ফুলকি ছড়ায়ে জ্ব’লে পুড়ে যায়,
মুখ থুবড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে মাটির ’পরে,
উবু হ’য়ে পড়ে ঠাণ্ডা, শক্ত মাটির ’পরে।—
তবু তার পিছে জ্ব’লে চ’লে আসে লাল আলোকের দীর্ঘ রেখা,
সাপের মতন আঁকাবাঁকা রেখা, দীর্ঘ রেখা,
জ্ব’লে চ’লে আসে, কেঁপে-কেঁপে জ্ব’লে, আর বলে— কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!’
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব’লে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, ‘কঙ্কা! কঙ্ক! কঙ্কা! কঙ্কাবতী।
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে-চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা
চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী!
আমার মনের কথা বেজে ওঠে : কঙ্কাবতী!
তোমার নামের শব্দ স্বনিছে, কঙ্কাবতী!
কঙ্কাবতী গো!

ডিসেম্বর ১৯২৯

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

কী বিশুদ্ধ উৎক্রমণ! দ্যাখো এক বৃক্ষের উত্থান!
গান গায় অর্ফিয়ুস! মহাবৃক্ষ কানের কন্দরে!
আর সব শব্দহীন। তবু অন্য কিছু জায়মান—
আরম্ভ, আহ্বান, বার্তা— সেই শান্ত মৌনের অন্তরে।

স্তব্ধতার প্রাণী যারা, ভিড় ক'রে বেরোলো তন্ময়
গুহা ছেড়ে, নীড় ছেড়ে, পরিচ্ছন্ন, উন্মুক্ত কাননে,
ক্রমে বোঝা গেলো তারা অমন নিস্পন্দ যে-কারণে
তা নয় পাশব শাঠ্য, উৎকণ্ঠাও নয়—

কিন্তু শুধু শ্রবণ। গর্জন, রোল, নিনাদে বধির
হ'য়ে গেলো তাদের হৃদয়। এবং, জানাতে অভ্যর্থনা,
যেখানে অস্পষ্ট কুঁড়েঘর ছিলো কোনোমতে,

কম্পমান খুঁটি নিয়ে অতি ক্ষুদ্র প্রবেশের পথে,
গোপন বিবর যেন, অন্ধকার ইচ্ছার রচনা—
সেইখানে, তাদের কানের রন্ধ্রে, তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির।

১৯ অক্টোবর ১৯৬৬
[রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতার অনুবাদ]

আকাশ-স্বপ্ন

আকাশ ভরে মেঘ ক'রে এলো,
ছোকানু, এখানে আয়;
আয় দু-জনায় বসি রাস্তার
ধারে এই জানালায়।
কেমন যে তুই করিস, ছোকানু,
এমন কী তোর কাজ?
দিদির কাছে সে-নতুন গানটা
না-ই বা শিখলি আজ।
কী যে তোর এক বিশ্রী খেয়াল
গল্পের বই পড়া,
তার চেয়ে ঢের ভালো— তুই বল!—
নয় কি গল্প করা?
সেই গল্পটা আজকে আমায়
বল না— না, থাক, শোন—
দেখছিস?— ঐ কালো হ'য়ে এলো
আকাশের সব কোণ।
দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, চারদিক হ'লো
হঠাৎ অন্ধকার,
কে যেন আসবে— চুপ ক'রে সব
শব্দ শুনছে তার।
এক ঝাঁক পাখি মেঘের মধ্যে
হাওয়ায় দিচ্ছে পাড়ি,
আকাশ ছাড়িয়ে অন্য আকাশে
আছে কি ওদের বাড়ি?
আচ্ছা, ছোকানু আকাশ যখন
মেঘে- মেঘে ছেয়ে যায়,
উড়ে যেতে তোর ইচ্ছে করে না
ঐ দূর কিনারায়?
আমি বলি, শোন, যদি পাই এক
ছোট্ট এরোপ্লেন—
পাগল! আমরা চুপি-চুপি যাবো,
মা কী করে জানবেন?
তোকে নিয়ে তবে উড়ে চ'লে যাই,
সব থাক নিচে প'ড়ে,
মেঘের উপরে, তারার উপরে
ছুটবো ভীষণ জোরে।
উঃ, সে কী মজা!— সত্যি, ছোকানু

তুই যদি হোস রাজি,
পড়াশুনা ছেড়ে আজই তবে হই
উড়ো জাহাজের মাঝি।
শূন্য ঘুরবে আমাদের ঘিরে,
গর্জাবে এঞ্জিন,
পাহাড় পেরিয়ে, সাগর ডিঙিয়ে
ছুটছি রাত্রিদিন।
এ-ধারে, ও-ধারে, সামনে, পিছনে
কিচ্ছু কোথাও নেই,
মনে হয় যেন সকল আকাশ
আমাদের জন্যেই।
রাত্রে অবাক তারারা করবে
চোখে-চোখে কানাকানি—
ছোকানু রে, আমি আকাশের রাজা
তুই তারাদের রানী।

দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, বাইরে উঠলো
উঃ— কী দারুণ ঝড়।
হাজার হাওয়ারে সাপের মতন
নাচায় কে বাজিকর।
তবু হাওয়া সে কি পোষ মানে! দেয়
পাগল ঝাপটে শিষ,
বৃষ্টি বাজায় বাজনা কেমন
শার্সিতে— শুনছিস?
দিন যেন আজ রাত হ'য়ে গেছে
এ তো ভারি অদ্ভুত!
বাজের শব্দে কাৎরে লাফিয়ে
জ্ব'লে ওঠে বিদ্যুৎ।
ভয়?— বোকা মেয়ে!— আমি আছি, দ্যাখ,
ওস্তাব কাপ্তেন,
পাগল ঝড়ের মুখে প'ড়ে গেছে
আমাদের ছোটো প্লেন।
তা ব'লে কি ভয়?— এতো আরো মজা?—
অন্ধ আকাশটাকে
লাল বিদ্যুতে আলো ক'রে দিয়ে
বজ্র যখন হাঁকে।
গুরুগুরু বাজ, ঝরোঝরো জল,
বাতাসের চিৎকার-
বৃষ্টি পেরিয়ে, রাত্রি ছাড়িয়ে,

আকাশ হচ্ছি পার।
সকল শব্দ ছাপিয়ে আমার
এঞ্জিন গর্জায়,
যত হোক ঝড়, সব যেন তার
কাছে এলে ভয় পায়।
দিকে-দিকে ঘন মেঘের ফাটলে
বিদ্যুৎ-ঝলকানি।
তার মাঝে তোকে করবো, ছোকানু,
সারা আকাশের রানী।

আরে, কী কাণ্ড! হঠাৎ যে সব
থেমে গেলো এক ফুঁয়ে,
বৃষ্টির জল আকাশের যত
ময়লা নিয়েছে ধুয়ে।
নতুন নীলের ঝলমল সাজ—
হাসি ধরে না তো আর,
সবুজ হাওয়ায় সন্ধ্যার সোনা
ঝরছে চমৎকার।
সূর্যের শেষ আলো যেইখানে
সন্ধ্যাছায়ায় মেশে,
আমরা দু-জন যাবো এইবার
সেই স্বপ্নের দেশে।
—সত্যি বলছি, ছোকানু রে, শুধু
তুই যদি হোস রাজি,
ইশকুল ছেড়ে এক্ষুনি হই
উড়ো জাহাজের মাঝি।
তোকে তুলে নিয়ে ওড়াবো আকাশে
ছোট্ট এরোপ্লেন—
পাগল! আমরা চুপি-চুপি যাবো,
মা কী ক'রে জানবেন।

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল : পদ্মপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।
মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

জুন ১৯৩৮

চাঁদ ও তুষার

আর সারারাত তুষারের রুপালি আগুন
আমার রক্তে জ্বলে।
হোটেলের ছোট্ট ঘরে, অন্ধকারে লেপের নির্জীবক আরামের প্রলেপের চাপে
বন্ধ আমি; এদিকে পুবের পাহাড়ের উপর দিয়ে
চাঁদ উঠে এসেছে আকাশের খাড়া চড়াইয়ে ভ্রমণের অর্ধ-পথে।
এবার বুঝি নামবার পালা। শহরের ধাপে-ধাপে আলো জ্বালা
যেন কোন অফুরন্ত দেয়ালির উৎসবের মালা।
তবু আকাশে এ কী ভাসে! এ কী নির্লজ্জ, অসংযত আলো!
এত সুন্দর যে চাঁদ, এমন অনাবৃত হওয়া কি তার ভালো!
গাছেদের মিশকালো ছায়াগুলি চুম্বনের মতো নিবিড়,
পাহাড়ি পথের মোড়ে হঠাৎ যুগলের শয্যা যেন,
তুমিই বলো, চাঁদ, এত নির্লজ্জ হওয়া কি ভালো?

উত্তরে কাঞ্চনজংঘার
পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারে রুপালি আগুন।
এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত? না কি দূরে বহু দূরে
এরই সন্ধানে আমাদের স্বপ্ন-অভিসার? অস্পষ্ট অপরূপ
ঝিলিমিলি তুলে শাদা ময়ূরের মতো আমারই দিকে আসছে?
জানি না। হোটেলের ছোট্ট ঘরে বন্ধ আমি।
তবু গুহার মধ্যে হাওয়ার নিঃশ্বাসের মতো,
ব্যর্থ জীবনে কাব্যরচনার ছিদ্রপথের মতো,
আমার রক্তে তুষারের রুপালি আগুন
কাল সারারাত জ্বলেছে।

১১ অক্টোবর ১৯৩৮, রাত্রি

তিথিডোর

যদি শুধু বিকল্প না-থাকতো, তাহ'লে কী নির্ভার হ'তো
জীবন!
 আমার জানলার বাইরে আধো-চাঁদ সমুদ্র
পাহাড়ের ধাপে-ধাপে রজস্বল নগর, রোদ্দুর-মাখা বৃষ্টি
যেন মুক্তোর ফোঁটা, আর বৃষ্টির পরে ভুবন-রাঙানো রামধনু।
আর অন্য দিকে তন্দ্রা-ভরা বাগান, মৃত্তিকার পুলক, ঘাস ফুল
পল্লবের উচ্ছ্বাস, যার গন্ধ আমার ব্রহ্মচর্যে ব্যাঘাত ঘটায়,
আর যেখানে এক তরুণী জলসেচন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—
সূর্যের প্রসাদে তাম্রবর্ণী, মেখলা আর কঞ্চুলী মাত্র
আবরণে, যেন মূর্তিমতী স্বাতী।
 হৃদয় আমার, এই কি তোমার বহুদিন ধ'রে
ঈপ্সিত ছিলো না? এই সামুদ্রিক দূর, এই সবুজ
ও স্তব্ধ দুপুরে জলের শব্দ, পৃথিবীর সৌরভ?
তবু কেন তোমার অবিরাম আক্ষেপ : 'হনলুলু, তুমি
নাগোপি হ'লে না কেন?'

আবার গ্রীষ্ম, এখন কলোরাডো। নীলতম অমল
আকাশে নিস্পন্দ আলো, অতল স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণ রৌদ্রে
প্লাবিত অফুরান দিন, দূর চূড়ায় জ্যোতিঃপুঞ্জ তুষার।
চলেছি শহর পেরিয়ে মোটরে, আমার রসনায় চেরিফলের
প্রণয়, হাজার দৃশ্যে মাতাল আমার চক্ষু। পথ উঠছে
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, নিচে প্রান্তর দিগন্তে গ'লে যায়,
আর উপর থেকে এগিয়ে আসে অরণ্য— গভীর, গম্ভীর,
মোহময়। কখনো আঁধার হয়ে আসে ক্যানিয়ন, দুই
দিকে তুঙ্গ গিরির বেষ্টন, দুই দিকে লম্বা গাছের পাহারা,
আকাশ নেই। আবার কখনো রৌদ্র জ্বলে পিঙ্গলবর্ণ
নগ্ন কোনো পাহাড়, আদিম ভাস্কর্যে ক্ষোদিত এক নামহীন
দেবমূর্তি যেন। নামে নির্ঝরিণী নির্জনে, বানানীর বুকে
সবুজ স্রোতে ব'য়ে যায়, তারই আশ্রিত মাছের মতো
উৎসাহে। হঠাৎ এক শিখর থেকে লাফিয়ে পড়ে
উপত্যকা, সান্ধ্য সোনায় কল্পনার মতো বিস্তীর্ণ,
কোনো মমতাময়ী স্বামিনীর মতো অতিথিবৎসল।
 আমার হৃদয়, এর বেশি আর কী তোমার কাঙ্ক্ষণীয়?
এই সোনালি গ্রাম, এই পুরোনো আস্তাবলে সরাইখানা—
স্নিগ্ধ মদ, টাটকা-সেঁকা রুটির গন্ধ, মোমবাতির আলোয়-আঁধারে
লম্বমান অবসর— এই কি প্রান্ত নয় পৃথিবীর,
যদি কোথাও শান্তি থাকে তবে কি তা এখানেই নয়?

তবু কি তুমি খিন্ন— সেই ঝর্ণার ধারে বারান্দাওলা
'পিত্তল কেৎলি'তে ব'সে চা খাওনি ব'লে? নদীর বাঁক ছাড়িয়ে
অন্য পথ নাওলি ব'লে? তুমি কি ভুলে যাচ্ছো,
তোমার একটা বই শরীর নেই?

আমি চিনি পঞ্চ নারীকে— চিত্রা, চম্পা, বিশাখা, অরুন্ধতী,
ও সরস্বতী। কেউ শ্যামা, কেউ গৌরী, কারো মুখশ্রী বিধুর
ও শান্ত, কেউ যেন পাত্র ছাপিয়ে উচ্ছল, আর কেউ বা
ক্ষরণ করে স্বপ্ন, চেতনভাবে সংবৃত কোনো ভঙ্গিতে। আমি যখন
তাদের চোখে চোখ রাখি, পাই স্থির আকাঙ্ক্ষার উত্তর।
এদের যে-কোনো একজনকে ভালোবাসতে পারতাম আমি—
কিন্তু কাকে? মনে-মনে যখনই যাকে বরণ করি, অন্যদের মধ্যে
মিলিয়ে যায় সেই একজন। এমন একটি নারী কি হয় না,
এই পঞ্চ কামিনীর সমন্বয়ে যার সৃষ্টি— যে একাধারে
গৌরী ও শ্যামাঙ্গী, বিষণ্ন ও সুরসিকা, রঙ্গিণী ও ভাবিনী,
যে হ'তে পারে ঘুরে-ফিরে বিশাখা ও চম্পা,
চিত্রা, অরুন্ধতী ও সরস্বতী!

কী সুখের হ'তো জীবন, যদি শুধু বিকল্প না-থাকতো!

৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ কলকাতা
[পুনর্লিখিত ১১ এপ্রিল ১৯৭০]

দ্রৌপদীর শাড়ি

রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা
মেঘের চেরা সিঁথি
হঠাৎ খুলে দিলো স্মৃতির
অন্তহীন ফিতে।
এমনি এক মেঘলা দিন
সীমান্তের শাসনহীন,
ভবিষ্যৎ দেখা না যায়,
অতীত হ'লো হারা।
দুঃস্বপনে পড়িলো মনে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

সেদিন মেঘে সোনার পাড়,
রৌদ্র ভিজে-ভিজে;
গাছের গায়ে আছাড় দেয়
হাওয়ার হিজিবিজি।
দুপুর যেন বিকেল, আর
বিকেল হ'লো অন্ধকার;
সন্ধ্যাকাশে উচ্চহাসে
সূর্য পেলো ছাড়া।
দুঃশাসন করিলো পণ
দ্রৌপদীর শাড়ি।
ভাঙলো ঘুম, লাল আগুন
ধৈর্যহীন শিরায়
উল্লসিত হুল্লোড়ের
আনলো কড়া নাড়া।
আকাশে তারই স্বৈরাচার;
কখনো নীল মেঘের ভার,
আলোর বাঘ কখনো ছায়া—
হরিণে করে তাড়া;
আশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

স্বর্গে আর মর্ত্যে যেন
বাঁধিয়া দিলো সেতু
অচির-পরিবর্তনের
তুমুল মত্ততা।
আলো-ছায়ার খেলার ঘরে
ভীষণ ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে,

বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের খাঁড়া;
মুষলধারে সাহস টানে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

প্রতিশ্রুতি হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি।
আকাশ ভ'রে উঠলো শোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড়;
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।

২৫ অক্টোবর ১৯৪৭

নিজের কবিতার প্রতি

হে নির্লজ্জ, হে অসহ্য, তবু তবু কেন আমাকেই, আমাকেই
তোরা পাগল করবি? কেন কেন কেন আমার বুকেই
হানবি এই জোয়ার? এই হাওয়ার ঝড়ের ঝাপটা? এই

আকাশ-ধোয়ানো মেঘ-নিঙড়ানো বন্যা? ওরে কথা, কথা,
ওরে দুরন্ত অফুরন্ত ওরে অবাধ্য উদ্দাম অজস্রতা,
ওরে মুখর তোরা চুপ কর। আর কত আর কত ব্যথা

আমাকে হানবি বল? তোরা কূল-ছোঁয়ানো কূল-ছাপানো নদীর
ঢেউ-তোলা কলরোলে আর কত ভাঙবি আমাকে? ওরে অধীর,
ওরে কবিতা, ওরে না-চাওয়া, না হাওয়া, হাওয়ায়-উড়ে-আসা কবিতার ভিড়,

ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, তোরা কি যেতে পারিসনে তার কাছে
যে স্বাধীন, যার প্রতিদিন দুশ্চিন্তার কাঁটায় ছেঁড়া নয়? যে বাঁচে
মোটা টাকার মোলায়েম আরামে, নিশ্চিন্ত অবসরে, শোভন সভ্যতার ছাঁচে,

তার কাছে যেতে পারিসনে তোরা? আমার শান্তি নেই, সময় নেই,
আমার প্রতিদিন পরাধীন মলিন ছেঁড়াখোঁড়া, আমাকে যেতে হবেই
পথে, হাটে, ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ির ঘামে ভিজতে, জীবনের দাবি মেটাতেই।

তবু তবু তবু তোরা আসবি, আসবি আমার কাছেই উদ্দাম হাওয়ায়,
আমার আকাশে বাতাসে আশে-পাশে দীর্ঘশ্বাসে, আমার চাওয়ায়
ছোঁওয়ায় আসবি কলোচ্ছ্বাসে উর্ধ্বশ্বাসে, আমার ব্যথায় হতাশায়

হানবি বিদ্যুৎ, ভাঙবি আমার বুক। ওরে কথা, ওরে কবিতা, ওরে
অজস্র অবাধ্য অফুরন্ত দুরন্ত কলরোল! কেমন ক'রে
তোকে বাঁধবো? তোকে এড়াবো, ফেরাবো? ওরে মূঢ় অন্ধ ব্যর্থ অবরুদ্ধ
    আবেগ! ওরে
না-চাওয়া না-হওয়া ফিরে-যাওয়া ফিরে-আসা— তবু ফিরে-আসা—
    ওরে কথা, কথা, কবিতা!

২৩ জুন ১৯৩৭

২

ওরে কবিতা, ওরে আমার কবিতা,
ওরে আমার যৌবনের জোয়ার-জলে
এলোমেলো টলোমলো ঢেউগুলি, ওরে
পৃথিবীর বাণিজ্যস্ফীতি আর সাম্রাজ্য প্রসারের বড়ো রাস্তায়
বাঁধ-ছেঁড়া খাপছাড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
কী করবে তোরা? কোথায় যাবি?
যাবি কার কাছে? কী বলবি গিয়ে?

যাবি তোরা ধনীর দরজায়, ঢুকতে পাবি না,
কি বাইরে দাঁড়িয়েই দু-টাকা বখশিশ পাবি।
যাবি তোরা গরিবের ঘরে, তারা থাকবে হাঁ ক'রে তাকিয়ে,
না খেতে-খেতে ওরা বোকা হ'য়ে গেছে।

যাবি আত্ম-সম্বল আত্ম-বৎসল
আত্ম-তৃপ্ত মধ্যবিত্তের ঘরে-ঘরে।
তারা লোক ভালো, করে আর্টের চর্চা, যদিও খরচা
তাতে বেড়েই চলে। তারা বলবে 'দুটো টাকা গচ্চা!
আচ্ছা, দেখি।'

আসলে তোদের ছেঁড়া কাপড়টা তাদের রুচিতে বাধে, আর তোদের
পৈতৃক পরিচয়টা পছন্দ হয় না। ...তেমন কেউ একজন হ'তো
যার বড়ো ঘরের উঁচুদরের গাড়ি-হাঁকানো সভা-জাঁকানো নাম, তা'হলে অন্তত
ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখা যেতো। ...তারা উঠতে চায়, উঠতে চায়,
পড়তে-পড়তে মরতে-মরতে চড়তে, চড়তে, চড়তে, চড়তে চায়।

ওরে কবিতা, ওরে আমার কবিতা,
ওরে খাপছাড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ঘুরে-ফিরে তোদের দিন যায়
কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি তোরা?

যুবকরা সিনেমায় ভিড় করে
আর খেলার মাঠে,
যুবতীরা মুখে রঙ মাখতে ব্যস্ত
নিখুঁত হওয়া চাই।
বয়স্ক পুরুষ টাকা-শিকারে বেরোয়,
মেয়েরা খরচা বাঁচায়,
বুড়োরা ধুঁকতে-ধুঁকতে মরে
আর শিশুরা চ্যাঁচায়।

কোথায় কোথায় যাবি তোরা, ওরে আমার
কবিতা, এই পৃথিবীর স্বার্থসিদ্ধি আর আত্মবৃদ্ধির
দারিদ্র্য আর অপমৃত্যুর
জীবিকাসংগ্রাম আর জীবনহত্যার
ধোঁয়াটে ঘোলাটে আঁকাবাঁকা রাস্তায় ওরে আমার
খাপছাড়া বাঁধছেঁড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
কী করবি তোরা এখানে? কোথায় দাঁড়াবি?
যাবি কার কাছে? কী বলবি গিয়ে?

২৩ জুন ১৯৩৭

৩
হায়রে, আমি যদি হতাম রাসায়নিক কি ভাষাতাত্ত্বিক,
তারাতত্ত্ববিদ কি যন্ত্রবিশারদ,
ছবি-আঁকিয়ে কি গাইয়ে,
কি মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর যা-কিছু,
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত ভালো হ'তো সেটা, সত্যিকারের সম্মানের।
যে-কোনো লোক, হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই
পারে না হ'তে রাসায়নিক কি পদার্থবিদ,
কি গাইয়ে কি আঁকিয়ে,
মিস্ত্রি কি মুচি, নাপিত কি দরজি হ'তেও পারে না :
কেননা সব কাজই শিখতে হয়,
মিস্ত্রি কি মুচির কাজ বিশেষ ক'রে।
কোনোখানেই অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অজ্ঞের জায়গা নেই,
একেবারেই নেই মিস্ত্রি কি দরজির দরজায়।

যে-কোনো, যে-কোনো লোক, যে ক খ গ ঘ লিখতে পারে
আর দু'চারখানা বইয়ের পাতা উল্টিয়েছে
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে
দস্তুরমতো লিখিয়ে।
গাইতে গেলে যার হাঁ বেরুতো না,
আঁকতে গেলে কাঁদতে হ'তো,
মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর
কিছু হবার যোগ্যতা যার নেই
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই সে হ'তে পারে
মস্ত বড়ো লিখিয়ে।

হায়রে, আমার এই লেখার কাজ!
এই পীড়িত, উৎপীড়িত, অশিক্ষিত-হাতে-বিক্ষত, বর্বরের-লোভে-লাঞ্ছিত,
ইতরের-অত্যাচারে-রক্তাক্ত এই লেখার পেশা!

কত সুখের হ'তে সেটা, কত সম্মানের,
আমি যদি হতাম পদার্থবিদ কি নৃতত্ত্ববিদ,
মনস্তাত্ত্বিক কি ভাষাতাত্ত্বিক,

পাহাড়-প্রয়াসী কি সমুদ্র-সন্ধানী,
ভাস্কর কি চিত্রকর,
কি গায়ক নিরক্ষর,
মুচি মিস্ত্রি ছুতোর,

দরজি নাপিত কুমোর,
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত সুখের হ'তো সেটা, কত সম্মানের।
কেন না আর কোনোখানেই কোনো কাজেই জায়গা নেই
অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অযোগ্যতার।

২৫ জুন ১৯৩৭

পুনরুজ্জীবন

আজ পৃথিবীতে বসন্ত আর আকাশ ভ'রে জ্যোছনা; আর আমার মন
পাকা ডালিমের মতো ফেটে পড়তে চাইছে
আরক্ত উত্তাপে;

পাকা ডালিমের মতো আমি স্তব্ধ,
তবু আমার বুকের মধ্যে ফুটে উঠছে সহস্র আগুনের কণা
ডালিমের সহস্র দানার মতো।

আমি জানি যদি আলো নিবিয়ে দিই আজ রাতে
তাহ'লে জ্যোছনা জ্ব'লে উঠবে ঘরের মধ্যে,
রক্তের স্রোতে কোনো নীল বিষের যেন নিঃশব্দ সঞ্চার :
আমি জানি যদি আজ চুপ ক'রে থাকি
উতরোল জোয়ারে ভেসে আসবে সুর
অনেক দূর থেকে, সময়ের দীর্ঘ গলির অন্য প্রান্ত থেকে,
স্মৃতির চিরন্তন রাত্রির প্রতিধ্বনিত মর্মর—
সে-সুর আমি সইতে পারবো না।
এ আমি সইতে পারিনে, এই জ্যোছনা, এই নিষ্ঠুর, অশান্ত বসন্ত।
সমস্ত রাত্রি বিশাল একটা রুপালি পাখি হ'য়ে উঠলো,
তার ক্ষুধিত ঠোঁটের মধ্যে আমার সত্তা :
আমি উপড়ে আনতুম এই রাত্রির উজ্জ্বল, সুন্দর চোখ, যদি পারতুম।
অন্ধ ক'রে দিতুম, অন্ধ হ'য়ে যেতুম, আকাশ ভেঙে পড়তো ঝনঝন ক'রে,
শূন্য থেকে উঠে আসতো অন্ধকারের অপরিমের স্তম্ভ—
কেন না আমি যাকে ভালোবাসি সে নেই।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, রাত্রি

২

আমি এতদিন ধ'রে ম'রে ছিলাম যে আজ
বড়ো আশ্চর্য মনে হচ্ছে প্রাণের এই নতুন জোয়ার।

জোয়ার! জোয়ার!
উদ্দীপ্ত, উৎসুক বসন্তের মতো,
বসন্তের গাছের মধ্যে সবুজ, সতেজ প্রাণরসের উৎসাহের মতো
জোয়ার! জোয়ার!
গাছ যেমন টেনে নেয় অন্ধকার শিকড় দিয়ে তার সবুজ অগ্নিস্রোত,
তেমনি আমার সমস্ত রক্তের সমুদ্রকে কে টেনে তুলছে—
সেখানে জোয়ার এসেছে,
মাংসের অন্তরালে আমার কঙ্কাল কেঁপে উঠছে সেই তরঙ্গসংঘর্ষে।

আমি ভেবেছিলুম আমি ভালোবাসতে ভুলে’ গেছি; কিন্তু আজ
এই অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হ'লো আমার চোখের সামনে,
বেরিয়ে এলো তার জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম,
তার কেন্দ্রে আমি।
আমিই তো তাকে সৃষ্টি করেছিলুম, যখন আর-কিছু সৃষ্ট হয় নি
আমার অপরিমেয় অনির্বচনীয় প্রেম দিয়ে।

আমাকে ব্যথা দিতে ভয় কোরো না তুমি,
এ-ব্যথা সৃষ্টির।
আমি নতুন হ'য়ে উঠছি, নবজাত, সদ্যোজাত
এ-ব্যথা সেই জন্মের।
পাছে আমি আঘাত পাই, সেই ভয়ে তুমি চোখ ফিরিয়ে নেবে কেন?
তোমার দৃষ্টি নেমে আসুক আমার উপর বিদ্যুতের ঝরনার মতো।
তাতে যদি আমি মরি, সে তো মৃত্যু নয়,
তা ভ্রূণের পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ ঘুম
জন্ম নেবার আগে।

আমাকে ব্যথা দিতে ভয় কোরো না তুমি।
যা-ই হোক না, যদি ভাগ্য আমাদের পায়ের নিচে মাড়িয়ে যায়
ক্রুদ্ধ মহিষের মতো;
আর যদি আমরা বেরিয়ে আসি, মুক্ত, ভয়হীন, চিরন্তন,
যা-ই হোক না, এটা তো আমি জানবো যে এখনো
এখনো আমি ভালোবাসতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, রাত্রি

বিবাহ

যাহারে স্মরণ করি' সিন্দুর দিতেছো শুভ্র ভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত' পরে
নামে বর্ষণের মতো? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গি-ভরে
তরঙ্গ তুলিয়া যায় খরস্রোতে, তীব্র, দ্রুত তালে?
তুমি কি দেখছো তারে অন্তরের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে-প্রহরে?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড়-নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন রয়েছে আড়ালে!

অথবা লভেছো তারে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায়
বাসনা-উত্তাপহীন, নিশ্চেতন সঙ্কীর্ণ সঙ্গমে?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন আরামে মসৃণ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি', হারায়ে ফেলেছো, উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায়, তন্দ্রা-বিজড়িত জড়তায়?

৯ এপ্রিল ১৯৩৩

মোহমুক্ত

দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
হাওয়ায় হারায়ে যায় সুগন্ধি নিশ্বাস আর কেশগন্ধভার,
অন্তহীন অন্ধকার শুষে লয় ক্ষণচ্ছটা অক্ষিতারকার।
উচ্ছৃঙ্খল কলরোলে চকিতে মিলায়ে যায় অর্ধস্ফুট বাণীর শিহর,
ঘন অরণ্যের মর্মে অলক্ষিতে ম'রে যায় ভীরু বনলতার মর্মর।
বুঝিলাম, কিছু সত্য নয়।
প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎপত্রে প্রেমের স্বাক্ষর—
জলের চিহ্নের মতো সব ধুয়ে-মুছে যায় একদণ্ড পর।
মধ্যরাত্রে শয্যাপ্রান্তে যত সাশ্রু প্রার্থনার সুন্দর বেদনা—
বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহা আনে না শান্তির স্পর্শ, শীতল সান্ত্বনা।
যত উচ্ছ্বসিত কান্না আকুলিয়া ভেঙে দেয় নয়নের কূল—
তাহাও শুকায়ে যায়; মনে হয়, তাও যেন ভুল।
যে-প্রেম ফুলের মতো গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়—
স্পর্শমাত্রে ঝ'রে প'ড়ে যায়।
যে-স্বপ্ন মেঘের মতো মনের নয়ন-'পরে গাঢ় নীলাঞ্জন দেয় মেখে,
মৃত্তিকার মলিনতা দৃষ্টি থেকে নিত্য রাখে ঢেকে,
উন্মাদ ঝটিকা এসে ছিঁড়ে ফেলে দেয় তারে শতখণ্ড ক'রে
স্বপ্নসৌধ খ'সে ধ'সে পড়ে।
যে-ব্যথা জড়ায়ে থাকে সর্ব অঙ্গে, সর্ব প্রাণে-মনে;
যাহারে রাখিতে হয় নিতান্ত গোপনে
কুমারীর প্রেমের মতন;—
তাহাও ফুরায়ে আসে, তাও ছেড়ে চ'লে যায় মনের অঙ্গন।
দেখিলাম, থাকে না কিছুই :
তোমরা যাহাই বলো, আমি জানি কিছুই থাকে না,
পলকে শুকায়ে যায়— সবই যেন সাবানের ফেনা,
রঙিন বুদ্বুদ উঠি' ক্ষণিকে ভাঙিয়া পড়ে, চকিতে মিলায়—
হাতে ধ'রে রাখা নাহি যায়।
যত মান-অভিমান— সব মিথ্যা, সকলই ছলনা,
স্মৃতির সঞ্চয়সাধ শূন্য প্রবঞ্চনা।
আকাশে ফোটে না ফুল, ফসল ফলে না কভু বন্ধ্য সিন্ধুনীরে,
নিরাশ্রয় স্মৃতিলতা কভু বেঁচে নাহি র'বে বাতাসেরে ঘিরে।
দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
স্বপন ভাঙিয়া যায়; অশ্রুজল— তাহাও শুকায়,
বেদনারও মৃত্যু আছে, তপস্যার বহ্নি নিবে যায়
নিষ্ঠুর বাত্যায়।

শুধু থাকে অমর কামনা।
যত কলঙ্কের দাগ— পাষাণে লেখার মতো সব লেগে থাকে,
পঙ্কের কলুষ-অঙ্ক— ধুয়ে নাহি ফেলা যায় তাকে।
চুম্বনের তিক্ত বিষ সঞ্চিত করিয়া রাখে অধরের ফণা,
ফেনিল রক্তের স্রোতে নিয়ত আলোড়ি' ওঠে গূঢ় উন্মাদনা;
আশেষ-আবেশ-তৃষ্ণা, উষ্ণতনু-আস্বাদনে আনন্দ-আশ্বাস
প্রতি সূক্ষ্ম রোমকূপে নিরন্তর তোলে কী উচ্ছ্বাস!
স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ কনিষ্ঠার ক্ষীণ প্রান্তভাগে
মদির শিহরসুখে ক্ষণে-ক্ষণে জাগে।
একমাত্র কামনা অমর;—
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা,
স্বপ্ন সে ভাঙিয়া যায়, ভুল হ'য়ে ভালোবাসা—
দূর তারকার তরে দুরূহ দুরাশা।

তাই আজ মুক্তকণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরাসম ফেলেছি উদ্গারি'।
নাহিকো সংশয় আর;— এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী— তোমার কী দাম!
করিব কল্পনা নহো, চিরন্তন অশীলতা তুমি বিধাতার,
অনঙ্গবিহারভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত্য কামনার।
আর-কিছু চাহি নাকো;— জানি, জানি, চক্ষে তব নাহি স্বর্গজ্যোতি—
তপ্ততনু নিঙাড়িয়া পরিতৃপ্তি ঢেলে দাও, হে জন্ম-অসতী!

কারো তরে স্নেহ নাই, সকলেই' পরে মোর লোভ,
সবারে ডাকিবো কাছে, কারো তরে করিবো না ক্ষোভ।
যদি কেহ না-ই আসে, অবহেলি' দূরে স'রে যায়—
করিবো না দণ্ড ক্ষয় তার লাগি' কাঁদিয়া বৃথায়।
যাহারা আসিবে কাছে, অনায়াসে বুকে লবো তুলে,
আছাড়ি' পড়িবো বেগে খরধার দেহ-উপকূল :—
তারপর নিঃশেষিত দেহপাত্র তার— বহুদূরে
হাস্যমুখে ফেলে দেবো ছুঁড়ে।
একেরে চাহি না তাই; এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহমদ্য পান করি'।
আনিয়ো না আর-কিছু, শুধু আনো প্রস্ফুট যৌবন,
মলিন গোলাপসম গাত্রবর্ণ উদ্ভাসিয়া উঠেছে বসন।
মসৃণ, চিক্কণ ত্বক্, ওষ্ঠাধরে প্রবল উত্তাপ,
পদতটে পদ্মগন্ধ, বাহুডোরে মদির প্রলাপ।
আর-কিছু চাহি না, সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডুষে লইবো পান করি'।
আর-কিছু নাহিকো তোমার;—

ক্ষণিকের উত্তেজনা— তা-ই দাও— হলাহল ঢালো অনিবার।
জানি, তব আর-কিছু নাই;
শরীর সর্বস্ব তব— দাও তবে, দাও মোরে তা-ই—
বুঝিয়াছি, কিছুই থাকে না।

২৭ অক্টোবর ১৯২৮, রাত্রি

সন্ধ্যায়

আমি যখন তোমার কাছে আসবো
দিনের কাজের শেষে,
সন্ধ্যার অন্ধকারে, সন্ধ্যার লাল আলোয়,
তুমি এ-কথা বলতে চেয়ো না : 'তোমাকে ভালোবাসি।'

কোনো কথা বোলো না।
ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসুক,
আর ম্লান লাল আলো জ্ব'লে উঠুক তোমার কালো চুলে
স্বপ্নের সোনালি স্মৃতির মতো।

আর আমাকে টেনে নিয়ো তোমার কাছে,
তোমার সবল উজ্জ্বল দুই বাহুর মাঝখানে,
তোমার উজ্জ্বল উদ্ধত বুকের মাঝখানে—
টেনে নিয়ো সেই অতল অনির্বচনীয় অন্ধকারে
যেখানে ঝরছে তোমার সঙ্গোপন সূর্য
পলবের পর পলবে—
যা আমাকে উষ্ণ ক'রে তুলবে আমার রক্তে বিদ্যুতের সঞ্চারে, আমি যখন
তোমার কাছে আসবো, দিনের কাজের শেষে,
সন্ধ্যার অন্ধকারে,
সন্ধ্যার লাল আলোয়।

সন্ধ্যায় শান্তি

ছুঁড়ে ফেলো তোমার সব অভিযোগ
আর অভিমান আর আক্রোশ আর বিদ্বেষ
যা নেকড়ের পালের মতো তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে।

ভুলে যাও, ভুলে যাও এই পৃথিবীকে
যা চাবুক মারছে তোমার মুখে।
ভুলে যাও মানুষ, আর মানুষের কথা—
তুমি কি এত বড়ো দুর্ভাগা যে মানুষের হাতে মরবে?

বাইরে তাকাও।
নীল কাচের মতো সন্ধ্যার আকাশ।
আর চেয়ে দ্যাখো, তোমার জানলার বাইরে রাত্রি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে
যেন কোনো মেয়ে প্রিয়তমের চুম্বনের অপেক্ষায় স্তব্ধ।

২ মে ১৯৩৪, সন্ধ্যা

২

মনকে বার-বার বলি : এত ভাবছো কী?
ভাবনার কী আছে এতে? তুমি কি এমনি বোকা
যে ব'সে ছবি আঁকবে মনে-মনে, কেটে দেবে,
আবার আঁকবে নতুন ক'রে— আর সেই ছেলেখেলার মোহে
ভুলে থাকবে রক্তের বিদ্যুৎস্পন্দন,
মেঘে-চাপা আকাশে প্রচ্ছন্ন বিদ্যুতের স্রোত!

চুপ! চুপ! চুপ করো,
ডুব দাও সেই নিস্পন্দ, নীরন্ধ্র অন্ধকারে
যেখানে মন নেই,
যেখানে আলো নেই,
ভাবনার উজ্জ্বলতম রং যেখানে লজ্জায় ম'রে যায়।
সেখানে রক্ত ফেনিয়ে উঠছে
তীব্র বিদ্যুৎস্রোতে
প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে বুদ্বুদ :
দেখছো না, প্রতিটি বুদ্বুদ একটি তারা হ'য়ে উঠলো যে,
সেই তারা তার দৃষ্টি, তার স্পর্শ, তার চুলের সৌরভ।

২৪ জুন ১৯৩৪

৩

হায়রে, আমি যদি হতাম রাসায়নিক কি ভাষাতাত্ত্বিক,
তারাতত্ত্ববিদ কি যন্ত্রবিশারদ,

ছবি-আঁকিয়ে কি গাইয়ে,
কি মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর যা-কিছু,
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত ভালো হ'তো সেটা, সত্যিকারের সম্মানের।
যে-কোনো লোক, হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই
পারে না হ'তে রাসায়নিক কি পদার্থবিদ,
কি গাইয়ে কি আঁকিয়ে,
মিস্ত্রি কি মুচি, নাপিত কি দরজি হ'তেও পারে না :
কেননা সব কাজই শিখতে হয়,
মিস্ত্রি কি মুচির কাজ বিশেষ ক'রে।
কোনোখানেই অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অজ্ঞের জায়গা নেই,
একেবারেই নেই মিস্ত্রি কি দরজির দরজায়।

যে-কোনো, যে-কোনো লোক, যে ক খ গ ঘ লিখতে পারে
আর দু'চারখানা বইয়ের পাতা উল্টিয়েছে
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে
দস্তুরমতো লিখিয়ে।
গাইতে গেলে যার হাঁ বেরুতো না,
আঁকতে গেলে কাঁদতে হ'তো,
মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর
কিছু হবার যোগ্যতা যার নেই
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই সে হ'তে পারে
মস্ত বড়ো লিখিয়ে।

হায়রে, আমার এই লেখার কাজ!
এই পীড়িত, উৎপীড়িত, অশিক্ষিত-হাতে-বিক্ষত, বর্বরের-লোভে-লাঞ্ছিত,
ইতরের-অত্যাচারে-রক্তাক্ত এই লেখার পেশা!

কত সুখের হ'তে সেটা, কত সম্মানের,
আমি যদি হতাম পদার্থবিদ কি নৃতত্ত্ববিদ,
মনস্তাত্ত্বিক কি ভাষাতাত্ত্বিক,

পাহাড়-প্রয়াসী কি সমুদ্র-সন্ধানী,
ভাস্কর কি চিত্রকর,
কি গায়ক নিরক্ষর,
মুচি মিস্ত্রি ছুতোর,
দরজি নাপিত কুমোর,
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত সুখের হ'তো সেটা, কত সম্মানের।
কেন না আর কোনোখানেই কোনো কাজেই জায়গা নেই
অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অযোগ্যতার।

২৫ জুন ১৯৩৭

আমার যৌবন

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে আমি ভর্তি হলাম ইংরেজি অনার্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'প্রগতি' ছাপার অক্ষরে প্রস্ফুটিত হলো। এই দুটি ঘটনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে— তার বিবরণ ঈষৎ কৌতুকজনিত।

ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা আমি দিয়েছিলাম খুব আটঘাট বেঁধে, প্রয়োজনের চেয়েও অধিকমাত্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমার পড়া চলতো তপ্ত কোকো নিয়ে শীতের রাতে দেড়টা-দুটো পর্যন্ত— তার মধ্যে সব-কিছু ম্যাট্রিক-যোগ্য না-হলেও বেশির ভাগই পরিকীর্ণভাবে তা-ই; প্রথম পরীক্ষার আগের রাতটা বিছানায় শুয়েও ঘুম এলো না। তবু পরদিন সকালে খাতা লিখতে বসলাম টাটকা দেহ-মন নিয়ে, অষ্টপত্র নির্বিঘ্নে সমাধা হলো। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমি পয়লা অথবা নিদেনপক্ষে দুই নম্বর দাঁড়াবো, কিন্তু আখেরে আমি পঙক্তি পেলাম পঞ্চম— একটা যেমন-তেমন বৃত্তিও আমার জুটলো না। এতে বড্ড দাগা লেগেছিলো আমার মনে, দ্বিগুণ দাগা এইজন্যে যে অবিশ্বাসী গণিত আমাকে বঞ্চনা করেনি, যেখানে আমার সবচেয়ে বেশি জোর সেই ইংরেজিতেই শোচনীয়ভাবে ভ্রষ্ট হয়েছিলাম। এক পাঠ্য-পুঁথি-লেখক হেডমাস্টার ইংরেজ ছিলেন পরীক্ষক; তিনি আমার খাতা পড়ে আমাকে 'পাগল অথবা প্রতিভাবান' ঠাউরেছিলেন, এ-রকম একটি রটনা একদিন কানে এলো আমার। কথাটা এমনিতে মন্দ নয়, বরং বলা যায় সম্মানজনক— কিন্তু ঐ 'অথবা'র অংশটুকুও আমাকে কিঞ্চিৎ মাত্র সান্ত্বনা দিতে পারলো না; আমি শুধু ভাবছি কোন ছিদ্রপথে আমার অতগুলো নিশ্চিত নম্বর তলিয়ে গেলো— আমি তো সব প্রশ্নেরই সঠিক এবং সবিস্তার উত্তর লিখেছিলাম। অবশেষে বুঝলাম ঐ বিস্তারটাই বড্ড বেশি হয়েছিলো; আমি ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম পাঠ্যকেতাবের বাঁধা গণ্ডি, ম্যাট্রিক-পরীক্ষার্থী বঙ্গদেশীয় বালকের পক্ষে শেলি-কিটসের আস্ত-আস্ত স্তবক তুলে দেয়াটা ধৃষ্টতা বলে গণ্য হতে পারে তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিলো না।

সেই আশাভঙ্গের তিতকুট সোয়াদ আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। ডিগ্রিদায়িনী বাগ্দেবীর ভজনা ছেড়ে কলকাতা গিয়ে যা-হোক-কিছু জুটিয়ে নেবো, সারাদিন খেটে-খুটে ফিরে রাত জেগে লিখবো আমার কবিতা গল্প ইত্যাদি— এমনি একটি কপোলকল্পনা নিয়ে খেলাও করেছিলাম কিছুদিন। তাই, আই. এ. পরীক্ষা যখন কাছে এলো, আমি রইলাম সুচিন্তিতভাবে চিন্তাহীন, বদ্ধপরিকরভাবে অনিবদ্ধ। হাতে মাত্র পনেরো-কুড়ি দিন সময় নিয়ে দৃষ্টিপাত করলাম ইতিহাস এবং ইকোনমিক্সের দিকে, ছেড়ে দিলাম আস্ত একখানা ভট্টিকাব্য বা অন্য কোনো অরুচিকর সংস্কৃত পুঁথি— ভাবতে ভালো লাগলো যে আমার ম্যাট্রিকের বোকা খাটুনির উপর এবারে বেশ প্রতিশোধ নেয়া যাচ্ছে। কৌতুক এই, সেই তাচ্ছিল্য-সাধিত আই.এ. পরীক্ষাতেই আমি পেলাম দ্বিতীয় স্থান— পরন্তু একটি স্কলার্শিপ। মানতেই হবে, এর পিছনে অনেকটা ছিলো দৈবের হাত, কেননা প্রথম-দাঁড়ানো ছাত্রীটির চেয়ে আমার মোট নম্বর ছিলো

অনেক নিচুতে, আর দ্বিতীয় বৃত্তিটি ঢাকা বোর্ড মাত্র সে-বছর থেকেই মঞ্জুর করেছিলেন। তা দৈব হোক আর যাই হোক, মাসিক কুড়ি টাকা মানে মাসিক কুড়ি টাকাই : — বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেলো হস্তলিপি-পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র-নিঃসৃত দস্তুরমাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোনো-এক দিনে আমার এবং টুনুর[১] যৌথ সম্পাদনায়— এবং প্রধানত এই দুজনেরই আর্থিক দায়িত্বে— 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে ঊর্ধ্বমুখ একটি নারীমুণ্ড আঁকা — প্রথম রচনা অচিন্ত্যর একটি অষ্টদশপদী কবিতা : 'আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে।' আর ছিলো পিরানদেল্লো বিষয়ে বুদ্ধু-দার[২] প্রবন্ধ, সম্ভবত জীবনানন্দর একটি কবিতা (সংখ্যাটি হাতের কাছে নেই বলে 'সম্ভবত' বলছি), তখনকার মাসিকপত্রের পক্ষে অপরিহার্য ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমিই কপাল ঠুকে শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিলো, মনে পড়ে, বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিলো। একদিকে এই পত্রিকা চালাবার উত্তেজনা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জীবন— আমার দিনগুলো দুই ধারায় উচ্ছল বয়ে যাচ্ছে।

২

কার্জন-কল্পিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে তৈরি হয়েছিলো রমনা— অনেকের মুখে তখনও নাম ছিলো 'নিউ টাউন'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে এখানেই অধিষ্ঠিত ছিলো ঢাকা কলেজ; বঙ্গভঙ্গ ভেস্তে যাবার প্রায় দেড় দশক পরে, সেই পুরোনো বিদ্যাপীঠকে কেন্দ্র করে, স্থাপিত হলো নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়— নবনির্মিত অব্যবহৃত হর্ম্যসমূহ প্রাণপ্রাপ্ত হলো। রেল-লাইন থেকে শহরের উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি; উত্তর অংশটি সরকারি কেষ্টবিষ্টুদের বাসভূমি, মধ্যিখানে আছে বিলেতি ব্যসন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গল্‌ফ-খেলার মাঠ; আছে ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব, যেখানে মদ্যবিলাসী বল্-নৃত্যপ্রিয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল-চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আসরে মিলিত হন; আর আছে কাননবেষ্টিত উন্নতচূড়া একটি কালীমন্দির, যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্ঘ্য দিতে আসেন 'শাহবাগের মা'-কে— সেই দিব্যবিভান্বিত ব্রাহ্মণী যিনি পরবর্তীকালে 'মা আনন্দময়ী' নামে সর্বভারতে বিখ্যাত হন। কিন্তু দক্ষিণ অংশটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত; সেখানে ছাত্র এবং অধ্যাপক ছাড়া ভিড় দেখা যায় শুধু শীতে বর্ষায় শনিবারগুলির অপরাহ্ণে, যখন জুয়াড়ি এবং বেশ্যায় বোঝাই খড়খড়ি-তোলা ঘোড়ার গাড়ি ছোটে অনবরত রেসকোর্সের দিকে— শান্ত রমনাকে মর্দিত করে, কলেজ-ফেরতা আমাদের চোখে-মুখে কর্কশ ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ ক্যাম্পাসটিতে ঐ একই বই অপলাপ ছিলো না।

ভিতরে-বাইরে জমকালো এক ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিলবাংলার একমাত্র উদ্যান-নগরে পনেরো-কুড়িটি অট্টালিকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তার কলেজ-বাড়ি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস : আছে ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াঙ্গন ও জলক্রীড়ার জন্য পুষ্করিণী— যেখানে-সেখানে সবুজ মাঠ বিস্তীর্ণ। ইংল্যান্ডদেশীয় পল্লী-নিবাসের মতো ঢালু ছাদের

---

[১] টুনু : কবি ও অধ্যাপক অজিত [কুমার] দত্ত।

[২] বুদ্ধু-দা : অধ্যাপক, সাংবাদিক ও প্রচার-সচিব ডক্টর প্রভুচরণ গুহ-ঠাকুরতা, *The Bengali Drama* ও '*এ ও তা*' প্রবন্ধ-পুস্তকের লেখক।

এক-একটি দোতলা বাড়ি— নয়নহরণ, বাগানসম্পন্ন : সেখানে, কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে বাস করেন আমাদের প্রধান অধ্যাপকেরা; অন্যদের জন্যেও নীলক্ষেতে ব্যবস্থা অতি সুন্দর। স্থাপত্যে কোনো একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। বিজ্ঞানভবনগুলি আরক্তিম ও তুর্কি শৈলীতে জাফরিখচিত, মিনারশোভন; অন্যান্য বিভাগ স্থান পেয়েছে একটি সরল ছাদের বহুপক্ষযুক্ত দীর্ঘাকার সাদা দোতলার একতালায়— সরকারি সেক্রেটারিয়েট হবার জন্য তৈরি হয়েছিলো বাড়িটি। সর্বত্র প্রচুর স্থান, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলির কোনো কথাই ওঠে না।

ভিতরকার ব্যবস্থাপনাও উচ্চাঙ্গের। ঘরে-ঘরে বিরাজ করছেন নানা-নামাঙ্কিত কর্তৃবৃন্দ : ডিন, প্রভস্ট, প্রক্টর এবং বিভাগীয় শীর্ষস্থানীয়েরা— ক্বচিৎ-দৃষ্ট, ক্বচিৎ-শ্রুত, ক্বচিতৎ-কথিত উপাচার্য মহোদয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। এঁদের কোনজনের সঙ্গে বিদ্যার্থী ঠিক কোন সূত্রে যুক্ত হয়ে আছে, তা সমঝে নিতে নতুন-ভর্তির বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। আক্ষরিক অর্থে আবাসিক নয়, কিন্তু গড়ন কিছুটা সেই ধরনের : যে-সব ছাত্র স্বগৃহবাসী তাদেরও সংলগ্ন থাকতে হয় কোনো-না-কোনো 'হল্' অথবা হস্টেলে— প্রাচীরাতিরিক্ত ক্রিয়াকর্মের সেটাই হলো ঘটনাস্থল। সেখানে আছে আলাদা-আলাদা গ্রন্থাগার ও রঙ্গালয় ও নানান ধরনের খেলার ব্যবস্থা; অনুষ্ঠিত হয় বিতর্কসভা, সংগীত-প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ভোজ ও আরো অনেক সময়োচিত অধিবেশন : সেখানকার নাট্যাভিনয় দেখতে নগরবাসীরাও সোৎসাহে সমবেত হন। ক্লাস ফুরোনোমাত্র কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকলো, এমন এখানে হতেই পারে না— কেননা প্রায়ই আমাদের ফিরে আসতে হয় কোনো-না-কোনো সান্ধ্য অনুষ্ঠানে— মনোজ্ঞ না হোক অন্ততপক্ষে কৌতূহলজনক। আর যেহেতু ছাত্ররাই এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজক ও প্রয়োজক, এবং মাস্টারমশাইরাও কেউ-না-কেউ উপস্থিত থাকেন ও অংশও নেন মাঝে-মাঝে, তাই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটি পারিবারিক সান্নিধ্যবোধ অনুভূত হয়। সবই ভালো; কিন্তু এই সূত্রেই আমাকে পেতে হয়েছিলো ভোটনির্ভর গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ পরিচয়— আমার জীবনে প্রথম এবং শেষবার— সেটা আমার পক্ষে সুখের হয়নি।

আমি ভর্তি হবার মাস দুয়েক পরে ছাত্র-নির্বাচনের সময় এলো। সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী নামে একটি বক্তৃতাপটু কর্মিষ্ঠ ও সহৃদয় যুবক আমাকে ধরে-পড়ে তাঁর 'পার্টি' থেকে 'দাঁড় করিয়ে' দিলেন— সাহিত্য-সম্পাদকের পদপ্রার্থী হিসেবে। তাঁর পাল্লায় পড়ে এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমাকে ক্লাসে-ক্লাসে ঘুরে দাঁড়াতে হলো আমার 'ইলেক্টরেটে'র সামনে, দেখতে হলো নিজের নামে লজ্জাকর দেয়াল-বিজ্ঞাপন— আর শেষ পর্যন্ত, সুধাংশুবিকাশের বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জোরে আমি যখন এই ভোটাভুটি-খেলায় জিতেও গেলাম তখন ব্যাপারটা হয়ে উঠলো আমার পক্ষে বিশুদ্ধ একটি বিড়ম্বনা। কমিটি, সাব-কমিটি, কনস্টিট্যুশন, আইনের তর্ক— এ-সব বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা আমি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি, মিটিং ডাকতে উৎসাহ পাই না, অন্য সদস্যেরা যা নিয়ে উত্তেজিত হয় আমাকে তা নিরতিশয় ক্লান্ত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক' হিসেবে আমি মন দিয়ে একটিমাত্র কাজ করেছিলাম— আমার চেষ্টায় জগন্নাথ হল্-এর বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'র কিছুটা হয়তো শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিলো সে-বছর।

ভুল বললাম– আমার আয়োজিত অন্য একটি ঘটনাও মনে পড়ছে, যার সঙ্গে আমার হৃদয়ের সংযোগ ছিলো। সেই ঘটনার নাম নজরুল ইসলাম।

সেই আমি প্রথম দেখলাম নজরুলকে, অন্য অনেক অসংখ্যের মতোই দেখামাত্র প্রেমে পড়ে গেলাম। চওড়া কাঁধে বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা-সিঁথি-করা কোঁকড়া চুল গ্রিবা ছাপিয়ে প্লাবিত, মুখখানা বড় ও গোলছাঁদের, নেত্র আয়ত ও কোণরক্তিম। গায়ে গেরুয়ারঙের খদ্দর পাঞ্জাবি, কাঁধে সূর্যমুখী হলুদ চাদর। কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর অফুরান আনন্দ— সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী একটি মানুষ। তাঁর জন্য আমি জগন্নাথ হল-এ যে-সভাটি আহ্বান করেছিলাম তাতে ভিড় জমেছিলো প্রচুর, দূর শহর থেকে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকারাও এসেছিলেন, তাঁর গান ও কবিতা শুনে সকলেই মুগ্ধ : মৃত অথবা বৃদ্ধ অথবা প্রতিষ্ঠানীভূত না-হওয়া পর্যন্ত কবিদের বিষয়ে যাঁরা স্বাস্থ্যকরভাবে সন্দিগ্ধ, সেই সব প্রাজ্ঞদেরও মানতে হয়েছিলো যে 'লোকটার মধ্যে কিছু আছে'।

সে-যাত্রায় আমার নজরুল-সংসর্গ সেখানেই অবশ্য শেষ হয়নি। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম সবান্ধবে আমার পুরানা পল্টনের বাড়িতে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক অধ্যাপকভবনে তাঁকে গান রচনা করতে দেখেছিলাম। তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁর রচনা-প্রক্রিয়ার দর্শক ছিলেন যাঁরা, শুধু তাঁরাই জানেন নজরুলের পক্ষে গান জিনিসটা কত সত্য ছিলো, কত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি হার্মোনিয়াম, প্রচুর পরিমাণে পান এবং ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা : এই উপকরণ নিয়ে তিনি সারাদিন ধরে গেয়ে যেতে পারেন— অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে, প্রাণের আবেগে, অক্লান্তভাবে মাঝে-মাঝে শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিবাণ হেনে, কোনো বিশেষ পঙ্‌ক্তি বা শব্দবন্ধে এসে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠে। গাইয়ের মাজা গলা নয় তাঁর, বরং একটু ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু সেই ত্রুটি বিপুলভাবে পুষিয়ে দেয় তাঁর অপর্যাপ্ত বাধাবন্ধহীন উৎসাহ। আর গীতরত নজরুলকে শ্রবণ এবং দর্শন করে আমরা আরো বেশি আনন্দ পাই এই কারণে যে সেই নবোদ্ভূত নবরসান্বিত গজলগুচ্ছের প্রতিটি পঙক্তি 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠা থেকেই আমাদের মুখস্থ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মুখে-মুখে সেগুলি সুরে-বেসুরে আবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন তাঁর গান গাওয়া নিষ্কুণ্ঠ তেমনি তাঁর রচনাও এক প্রকাশ্য ঘটনা : সৃষ্টিকর্মটি যে-নির্জনতা দাবি করে বলে আমরা চিরকাল শুনে এসেছি, তার তোয়াক্কা রাখেন না নজরুল, ঘর-ভর্তি লোকের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করেনা মুহূর্তের জন্য— বরং অন্যদের চোখে-চোখে তাকিয়ে হাসির উত্তরে হাসি ফুটিয়ে, তিনি যেন নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করেন। সামনে হার্মোনিয়ম, পাশে পানের কৌটা, হার্মোনিয়মের ঢাকনার উপরে খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেনপেন— তিনি বাজাতে-বাজাতে গেয়ে উঠলেন একটি লাইন, তাঁর বড়-বড় সুগোল অক্ষরে লিখে রাখলেন খাতায়, আবার কিছুক্ষণ বাজনা শুধু— দ্বিতীয় লাইন— তৃতীয়— চতুর্থ— দর্শকদের নীরব অথবা সরব প্রশংসায় চর্চিত হয়ে ফিরে-ফিরে গাইলেন সেই সদ্যরচিত স্তবকটি : এমন করে, হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যে, 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান-পিয়া' গানটি রচনা করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম— দৃশ্যটি আমার দেবভোগ্য বলে মনে হয়েছিলো। 'প্রগতি'তে প্রকাশিত নজরুলের লেখা সেই গানটাই বোধহয় প্রথম।

৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের খাশমহলেও মনোরঞ্জনী উপচার ছিলো। মনে পড়ে, ছাত্রদের কমনরুমটিতে প্রথম ঢুকে আমি চমকে গিয়েছিলাম, আমাদেরই বিশ্রামের জন্য এই ব্যবস্থা তা প্রায় বিশ্বাস করতে পারিনি। ঘরটি দুই কামরায় বিভক্ত, আয়তনে বিশাল ও

আসবাবপত্রে ঋদ্ধিশালী। প্রধান কক্ষটিতে সারি-সারি আরাম-কেদারা সাজানো, টেবিলে-টেবিলে ছড়িয়ে আছে সব সম্ভ্রান্ত বাংলা মাসিক ও 'পাঞ্চ' থেকে 'রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ' পর্যন্ত রঙ-বেরঙের লন্ডনি চালান— দুই ক্লাসের মধ্যবর্তী পঞ্চান্ন মিনিট চমৎকার কেটে যায় সেগুলি উল্টে-পাল্টে। আর যারা ভিন্ন ধরনের বিনোদ পিয়াসী, তাদের জন্য আছে দেয়াল ঘেঁষে তাসের টেবিল, দাবার ছক, ছোট কামরায় পিংপঙের সরঞ্জাম। ছেলেরা আড্ডা গল্প সিগারেট চালায় যথেচ্ছ— কর্তৃপক্ষ এতটাই সুবিবেচক যে যথেষ্টসংখ্যক ছাইদানিও জুগিয়েছেন; যৌবনকণ্ঠের কলরোল ঠেকাবার জন্য ভিতর দিকের দরজাগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এই কমনরুমে বসেই আমি প্রথম পড়েছিলাম 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক 'শেষের কবিতা', আর 'বিচিত্রা'য় 'তিন পুরুষ', দু-কিস্তি পরে রবীন্দ্রনাথ যার নাম বদলে 'যোগাযোগ' রাখলেন; পাশের একটি জনবিরল ঘরে, ছাত্রপরিচালিত 'ঢাকা য়ুনিভার্সিটি জর্নাল'-এর কার্যালয়ে, ইংলন্ডজাত কিছু উঁচকপালে ও আধা-উঁচকপালে পত্রিকাও চেখেছিলাম।

তুলনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দ্বিতীয় রঁদেভু, আদিত্যর দোকানটি বড় দরিদ্র। কম্পাউন্ডের এক প্রান্তে টিনের চালওলা দর্মার ঘর, ভিতরে মলিনবর্ণ টেবিলের পাশে লম্বা ন্যাড়া টুল পাতা : এখানেই আমরা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে থাকি, যেহেতু সারা তল্লাটে দ্বিতীয় কোনো চা-ঘর নেই। স্থূলবপু গুম্ফবান সুস্নিগ্ধ একটি মানুষ, আদিত্য, শীতে ভিন্ন ঊর্ধ্ববাস ধারণ করে না, 'ছাত্র-বাবু'দের প্রশ্রয়ের চোখে দেখে থাকে। তার ভোজ্যতালিকা অবশ্য অতি সীমিত : হাঁসের ডিমের 'মামলেট', টোস্ট-রুটি, কোনো বিরল শুভদিনে আলুর শিঙাড়া, আর কোনো-কোনোদিন তার সহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ছাড়া আর-কিছুই সে দিতে পারে না চায়ের সঙ্গে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না আমাদের; গদ্য-পদ্য সমস্ত খাদ্যই আমাদের পক্ষে উপাদেয় ও সুপাচ্য, সেগুলির রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ে চিন্তিত হবার মতো দুর্দিন তখনও বহুদূর। আমরা জুটি সেখানে বন্ধুর দল— টুনু, অমল, পরিমল,[৩] আরো অনেকে— ছুটির ঘণ্টায়, বা কখনো কেউ ক্লাস পালিয়ে; বসি গোল হয়ে ঘন সবুজ ঘাসের উপর ঘনিষ্ঠ, ফরমাশের পর ফরমাশ ছাড়ি আদিত্যকে;— অনেকখানি মাঠ পেরিয়ে আমাদের কলহাস্য ধ্বনিত হয় এক ক্লাসঘরে, যেখানে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকঙ্কণ পড়াচ্ছেন। দাম দেবার জন্য পকেট হাতড়াবার প্রয়োজন নেই, 'লিখে রেখো' বলাই যথেষ্ট। এই আদিত্যর, এবং আমার পুরানা পল্টনের মুদিখানায় সিগারেটের দেনা সম্পূর্ণ শোধ না-করেই আমি ঢাকা ছেড়েছিলাম, সে-কথা ভেবে আজকের দিনে আমার অনুশোচনা হয়।

একটি সুখস্থান, আমার টিনের ঘরের পরেই আমাদের প্রধানতম মিলনকেন্দ্র— এমনি ছিলো আমাদের পক্ষে এই বিদ্যালয়। আমরা কয়েকটি পূর্বপরিচিত বন্ধু পড়ছি এখানে একই সময়ে, নতুন দু-একটি সঙ্গীও পেয়েছি মনমতো। আমাদের পাঠাভ্যাস-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম চলে সুনিয়মিত ও স্বচ্ছন্দ; মৌলিক শৃঙ্খলার যেটুকু দাবি তা আমাদের পক্ষে কখনোই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে না। আমাদের সাবালকত্ব এখানে স্বীকৃত, আমাদের স্বাধীনতা বহুদূর পর্যন্ত অবাধ। পরীক্ষার খাতায় নিজস্ব মতের ঘোষণা, মাস্টারমশাইয়ের অনুমোদিত ভাষ্যের প্রতিবাদ, লাইব্রেরির অন্দরমহলে ঢুকে

---

৩. অমল : আলিগড় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু বসু : প্রকাশিত গ্রন্থ : *সাহিত্যলোক*। পরিমল : ধনবিজ্ঞানী ' ছোটো' পরিমল রায়, ঢাকা ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মৃত্যুকালে ন্যুয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *'ইদানীং'*।

যথেচ্ছবিহার— এই সবই আমাদের অধিকারভুক্ত; আমাদের সহজ অনুভূতিগুলি অসম্মানিত হয় না, আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার সুযোগ পায়। সাহিত্যবিভাগে দ্বৈতীয়িক গ্রন্থের ব্যবহার অল্প; কোনো প্রথিতযশা সমালোচক কী বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হলো মূল লেখকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। আবহাওয়াটি সত্যিকার উদার, কিন্তু এর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য।

একমুঠো ছাত্রীও আছেন আমাদের সঙ্গে— আছেন, এবং অনেক বিষয়ে নেই। যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পৃথক্কৃত ও সুরক্ষিত এক অতি সুকুমার উপবংশ, তাঁরা অবকাশের প্রতিটি মিনিট যাপন করেন তাঁদের পর্দায়িত বিশ্রাম-কক্ষে, অধ্যাপকদের নেতৃত্বে ছাড়া সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হন না। প্রতি ঘণ্টার শুরুতে এবং শেষে করিডোরগুলি বিভিন্নমুখী মিছিলে ভরে যায় : মহিলাগুচ্ছকে পশ্চাদবর্তী করে চলেছেন এক-একজন অধ্যাপক, পুনশ্চ নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের কমনরুমের দোরগোড়া পর্যন্ত। ক্লাসে তাঁদের জন্য বসার ব্যবস্থা আলাদা, আমাদের বেঞ্চিগুলো থেকে দূরে বসানো চেয়ারে : সেখানে তাঁরা চক্ষু নত রাখেন পুঁথির উপর, কোনো প্রশ্ন করেন না অধ্যাপককে, পাঠ্যবিষয়ে হাসির কথা থাকলেও তাঁদের গাম্ভীর্যে টোল পড়ে না। এমন নয় যে করিডরে বা ক্লাসের মধ্যে কোনো দৃষ্টিভ্রমর কখনো ছুটে আসে না আমাদের দিকে— কিন্তু দর্শন পেরিয়ে শ্রবণে তাঁরা কখনোই প্রায় ধরা দেন না, শুধু মূক শ্রোতার ভূমিকা নেন নাট্যাভিনয় বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের চার বছরে আমি প্রকাশ্যে ছাত্রী-কণ্ঠ শুনেছিলাম একবার মাত্র— শুধু-মেয়েদেরই-জন্য আয়োজিত এক সংগীত-প্রতিযোগিতায়; একটি সুন্দর মুখের মেয়ে পুরস্কৃত হয়নি বলে বিচারক অধ্যাপক-পত্নীর কাছে প্রতিবাদও জানিয়েছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যবর্তী এই স্বচ্ছ দেয়ালটিকে একেবারে নীরন্ধ্র ভাবলে কিন্তু ভুল হবে : বেয়ারার হাতে চিরকুট পাঠিয়ে 'লেডিজ' কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে, কোনো বাসন্তী সেন বা অমিতা চন্দর সঙ্গে দু-চার মিনিট কিছু অর্থহীন কথা বলা এবং শোনা যায় না তা নয়— কোনো-কোনো বদ্ধপরিকর ছাত্র তা করেও থাকে— কিন্তু দেখে মনে হয় উভয় পক্ষই অপ্রতিভ, স্বাচ্ছন্দ্য-রহিত, আলাপ ঠিক জমছে না, অথবা একে আলাপ বলাটাই ভুল। ব্যাপারটা খুবই কৌতুক শোনাবে আজকের দিনে, অল্পবয়সীদের পক্ষে অকল্পনীয়; কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেকার বাঙালি সমাজে, হাজারখানেক নবযুবার মধ্যে কুড়ি-পঁচিশটি বিদ্যার্থিনী তরুণী নিয়ে, এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ও সংগত ছিলো তা মানতেই হবে। 'আমরা জন্মেছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে'— এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে বলেছিলেন, তাঁর পৌত্রের বয়সী আমাদের জীবনেও সে-অর্থে প্রযোজ্য ছিলো।

সেই সময়কার কথা ভাবলে আমি নিজেকে দেখতে পাই রমনার বিশেষ একটি রাস্তায়, যা চলে গেছে পুরানা পল্টনের মোড় থেকে সোজা পশ্চিমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার পর্যন্ত এক মাইল। এইমাত্র খেয়েছি দিদিমার রান্না অতি তৃপ্তিকর মাছের-ঝোল-ভাত, হাঁটছি হালকা পায়ে প্রফুল্ল, হাতে দু-একটি বই-খাতা, মেঘলা অথবা রোদালো দিনের বেলা দশটায়। সাইকেলটাকে আস্তে করে দিয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো পরিমল, তার টাটকা-তৈরি কোনো ছড়া শুনিয়ে এগিয়ে গেলো। পাঁচ মিনিট পরে মেয়েদের হস্টেল— রমনার সব সুন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেই তথাকথিত চামাদিয়া-হাউস (আসল নাম 'The Chummery'); সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি অথবা সাতটি সহপাঠিনী, আমি চলার গতি শ্লথ করে দিলাম যাতে অন্তত পিছন

থেকে তাঁদের নিরীক্ষণ করা যায়। সৈনিক অথবা খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে হাঁটছেন তাঁরা, সমতালে পা ফেলে-ফেলে— মাথা আঁচলে ঢাকা, চওড়া-পাড়ের শাদা শাড়ি পরনে, যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ নেই, আর পা-ফেলা এমন ঢিমে লয়ের যে একটু পরেই তাঁদের অতিক্রম না করে আমার উপায় থাকে না। পথে-পথে আরো অনেক চেনা মুখ : কখনো দেখি বিজ্ঞানবিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু চলেছেন মন্দচরণে— হাতে গোল্ড ফ্লেকের টিন, জামা বোতামহারা, চুল উশকোখুশকো। ছাঁটা চুল, চোখে সোনার চশমা, গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবিতে সুপ্রসাধিত— সেই যানবিরল পথেও অতি সতর্ক সাইকেল চালিয়ে আস্তে আমাকে ছাড়িয়ে যান ডক্টর দে— সংস্কৃত-বাংলার অধিনায়ক সুশীলকুমার। বা হয়তো দেখা যায় জগন্নাথ হল্-এর দিক থেকে বেঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে ঢুকলেন ইতিহাস-বিশারদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যুবকদের চেয়েও দ্রুত এবং বলিষ্ঠ তাঁর পদক্ষেপ। অথবা, আমি যখন কলেজের গাড়ি-বারান্দায়, ঠিক তক্ষুনি সাইকেল থেকে নামেন আমাদের ইংরেজি বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁর তুল্য লাজুক অধ্যাপক আর নেই— আমাকে দেখে ঈষৎ লাল হন তিনি, মৃদু কেশে নরম আওয়াজে বলেন, ‘এই যে বুদ্ধ, ভালো আছো?’ আমি করিডোর দিয়ে যেতে-যেতে শুনি ঘণ্টার শব্দ; নানা ধরনের উৎসাহ বা বিরসতা নিয়ে চারটে অবধি বেলা কেটে যায়— তারপর আবার সেই একই পথে আমার বাড়িফেরা, পড়ন্ত রোদে, প্রায় প্রত্যহই সবান্ধবে। প্রচুর চা, টিনের মাখনের সঙ্গে বাড়িতে-দিয়ে-যাওয়া টাটকা গরম পাঁউরুটি, মুড়মুড়ে ষোলো-পৃষ্ঠার ‘স্টেটসম্যান’; ডাকের চিঠি, কাগজপত্র, কলকাতার সাহিত্যিক গসিপ, ‘প্রগতি’র জন্য প্রার্থিত বা অযাচিত কিছু রচনা। তখনই এক দফা পঠিত এবং আলোচিত হয় সেগুলো, কিন্তু সম্পাদকীয় বিলি-ব্যবস্থা আমি সমাধা করি বেশি রাত্রে— লিখি চিঠির উত্তর, হয়তো বা ইতালিয়ান ছাঁদের একটি বা দুটি সনেট, বা জাপানি ধরনে একগুচ্ছ তানকা। লিখে সুখ পাই, পরে সেগুলো বিশ্রী লাগলেও দমে যাই না, কেন না আমার অনবরতই লেখা ‘আসছে’।

৪

আমাদের আড্ডা জমে বেশিরভাগ আমারই বাড়িতে, মাঝে-মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য অনুষ্ঠানও টানে আমাদের— কিন্তু এমন নয় যে আমার চলাফেরা রমনা-পাড়াতেই আবদ্ধ। প্রায়ই যাই শহরে— কাজে, অকাজে, অথবা নিছক মুখ-বদলেরই জন্য। টুনু থাকে ইসলামপুরে অশোক লেনে (আসলে বোধহয় আসক লেন নাম); তার একতলার ঘরে নিভৃত কাব্যচর্চায় কোনো ছুটির সকাল কেটে যায়। কোনো-এক সময়ে সে বায়রনের ডন-জুয়ানি চালে একটি লঘু রসের দীর্ঘ কাব্য শুরু করেছিলো— প্রথম কয়েকটা স্তবক পড়ে শুনিয়েছিলো আমাকে, ছিপছিপে চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে চলছিলো বেশ— দুঃখের বিষয় এগোলো না। আমার আর-একটি গন্তব্য বুদ্ধু-দার বাড়ি— লক্ষ্মৌ থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি আসেন যখন; অথবা, অন্য সময়েও, তাঁর বোনেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোনো গীতালি-সন্ধ্যায়— রবীন্দ্রনাথের অনেক গান সেই তরুণীদের মুখেই আমি প্রথম শুনেছিলাম— শুধু শ্রোতাব্য নয়, দর্শন-যোগ্যভাবেও— কোনো-কোনো গান ভাবলে তাদেরই চোখের হাসি, ঠোঁটের ভঙ্গি, আমার এখনো মনে পড়ে। আর যাই ঘুরে-ফিরে একটি মেয়ের কারণে এক আত্মীয় বাড়িতে, আমাকে সঙ্গ দেন কিছু অধিকমাত্রায় মেয়ের মা— তবু আমাকে ঘুরে-ফিরে যেতেই হয় যেহেতু আমি মেয়েটিকে ‘ভালোবাসি’— অন্তত তা-ই আমি বুঝতে দিয়েছি তাকে, নিজেকেও বুঝিয়েছি। এতে

অবশ্য তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু আমি আমার কবিতা লেখার সাহায্য পাই, আমার উনিশ-বছর বয়সটারও ইজ্জত বাঁচে।

৫

শুনতে পাই, ঢাকা আজকাল বিলকুল বদলে গিয়েছে; তাই যে-শহরের পথে-পথে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখতে লুব্ধ হচ্ছি। আরম্ভ করা যাক রমনাসীমান্ত লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে : এতক্ষণ বিকেল ছিলো জ্বলজ্বলে, কিন্তু নবাবপুর ধরে চলতে-চলতে ছায়া করে এলো, আমার দু-দিকে বাড়ি, দোকান ঘেঁষাঘেঁষি; আমার ডাইনে রইলো পাঠ্যবই-বিক্রেতা প্রসাধনহীন অ্যালবার্ট লাইব্রেরি, যেখানে এক শ্মশ্রুমান সমর্থ বৃদ্ধ বসে থাকেন অর্ধদগ্ধ চুরুট মুখে নিয়ে সারাদিন; আমার বাঁয়ে পড়লো বিলেতি মদের ঝকঝকে দোকান রায়-কোম্পানি, যেখানে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমি আমার সদ্যস্বাদিত সুপ্রিয় চকোলেট কিনতাম মাঝে-মাঝে— সেই ছেলেমানুষি দিন কত দূরে মনে হয় এখন। রায়-কোম্পানির মুখোমুখি একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যা খোলা থাকে নিশুতি রাত পর্যন্ত, পাছে ছদ্মবেশে পরীরা খেতে এসে ফিরে যায়— আমি তার পাশ দিয়ে কখনো ঢুকি মালীটোলায়, যদি আমার গন্তব্য হয় আর্মানিটোলায় আমার পিতার বা কোনো বন্ধুর বাড়ি; আর বেশির ভাগ দিন সোজা এগিয়ে যাই সদরঘাট পর্যন্ত— সন্ধ্যা নামে ততক্ষণে, রাস্তায় ভিড়, শুধু পুরুষের ভিড়— রমনায় ও অন্য দু-একটি বিশেষ এলাকায় ছাড়া ভদ্র মেয়েরা পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেরোন না। পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি রাস্তা এসে মিলেছে ওখানে, এক মিনিট দূরে বুড়িগঙ্গা, করোনেশন পার্ক— ঢাকার নাগরিক কেন্দ্র বলতে এই সদরঘাটকেই বোঝায়, সারা শহরের মধ্যে শুধু এখানেই আছে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন। কাছাকাছি অনেকগুলো স্কুল-কলেজ আপিস-কাচারি, এক কোণে বড়ো-পোস্টাপিশটির কালচে-লাল অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যায়, ঢাকার দ্বিতীয় এবং উজ্জ্বলতর সিনেমাভবনটি খোলার পর থেকে জায়গাটার জৌলুশ আরো বেড়েছে। তিন পা হাঁটলে ব্রাহ্ম সমাজের রামমোহন লাইব্রেরি, গরিব চেহারার সাহিত্য-পরিষদ-লাইব্রেরিটিও দূরে নয়— আর, নেহাৎ স্কুল-কলেজের পুঁথি ছাড়া অন্য কিছু পাঠ্যবস্তুও যারা রাখে, এমন দু-চারটি বইয়ের দোকানও এখানেই। তারই একটিতে ‘প্রগতি’র জন্য কাগজ কিনি আমি, পত্রিকার কপি জমা দিই আর যথাসময়ে ফেরত নিয়ে যাই বেশিরভাগ; ‘বিচিত্রা’ প্রথম সংখ্যার চমক-লাগানো রামধনু-মলাট সেখানেই আমার প্রথম চোখে পড়েছিলো। একটি ছোট পুস্তকালয়ের সামনে কখনো দেখি পরিমল ঘোষ দাঁড়িয়ে : তাঁর মুখে পান, তাঁর মুখে হাসি, পাশে দোকানের মালিক মনোরঞ্জন চৌধুরী— সুদর্শন সুপরিচ্ছন্ন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক, কটাক্ষপাতে বুঝিয়ে দেন আমাকে তিনি পছন্দ করেন না, যদিও, সম্পাদক যেহেতু পরিমল ঘোষ, তাঁর পরিচালিত ‘দীপিকা’ মাসিকপত্রে আমার কবিতা বেরোয় মাঝে-মাঝে। প্রায় অনিবার্যভাবে দেখা হয়ে যায় কোনো-না-কোনো বন্ধুর সঙ্গে, অথবা আমি সবান্ধবেই বেরিয়েছিলাম : আমরা ফেরিওলার কাছে দু-চার পয়সার কিনি একটি নতুন ধরনের রসনারোচক— খুব মিহি, প্রায় ওজনহীন, চিনিতে রসানো ময়দার সুতো, জিভে পড়লে গলে যায়— আমরা এর নাম দিয়েছি ‘বুড়োর দাড়ি’। আমাদের হাঁটার জন্য একটি প্রিয় স্থান হলো ইডেন কলেজের পিছনকার রাস্তাটা— আলো কম সেখানে, লোক নেই, মহিলা-বিদ্যালয়ের উঁচু দেয়াল আর অনেক বেশি উঁচু একসার গাছের জন্য কেমন গা-ছমছম-করা, রহস্যময়— হস্টেলের কল্পিত অধিবাসিনীদেরও মনে হয় যেন

দুর্গবন্দিনী রাজকন্যা, অন্তত তখনকার মতো তা ধরে নিলে দোষ নেই। কখনো, সদরঘাট পিছনে ফেলে, আমরা যাই অল্প-ভিড়ের ওয়াইজ ঘাটে সূর্যাস্তের সময় বিখ্যাত আবেদ-কোম্পানির রুটি-বিস্কুটের গন্ধ ছাড়িয়ে নদীর ধারে সেই নির্জন প্রান্তে, যেখানে ছেয়ে গেছে আইভি-লতায় একটি পুরোনো বাড়ি, ফটকে এক ইংরেজের নাম দেখা যায় কিন্তু ভিতরে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। হঠাৎ কখনো যাই আরো দূরে, মেডিকেল স্কুলের পিছনে একটি নির্জন আঙিনায়— নদীর ধারে বসে জলের সঙ্গে চাঁদের আলোর খেলা দেখি কিছুক্ষণ। আর, এইসব রমণীয়তার উল্টো পিঠে, অন্য একটি অভিজ্ঞতাও পাই আমি, যখন গ্রীষ্মের কোনো চড়তি বেলায় বাড়ি ফেরার পথে দশ মিনিটের ঝাঁঝালো পথ বাঁচাবার জন্য আমি ঢুকি শাঁখারিটোলায় সেই অতিসংকীর্ণ অনতিদীর্ঘ আশ্চর্য গলি, যেখানে সূর্য উঁকি দেয় না কখনো, বাচ্চাদের ছুটোছুটির জন্য সাইকেলও চলতে পারে না, গায়ে-গা-লাগা তেতলা-চৌতলা বাড়িগুলোর উপর আকাশ জেগে থাকে চিলতে, শঙ্খের-কাজ-করা ঘরে বারান্দায় ব্যস্ততা চলে সারাদিন, শাঁখের করাতের কোরাস ওঠে প্রখর, হাওয়ায় ভাসে ঠাণ্ডা সোঁদা ভারি একটা গন্ধ, আর যেখানে, তাদের অস্বাভাবিক সাদা গাত্রবর্ণ নিয়ে, নিখাদ-কণ্ঠে উচ্চারিত অদ্ভুত বাচনভঙ্গি নিয়ে, একটি অনন্য উপজাতি বাস করছে বংশপরম্পর, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না-রেখে, কোনো অধিক মর্যাদাবান নতুন পেশায় লুব্ধ না-হয়ে, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে অবিচলভাবে স্বকর্মনিষ্ঠ। এখন ভাবতে পরিতাপ হয় কেন আমি তাদের সঙ্গে কথা বলিনি কখনো, কেন জেনে নিইনি কত শতাব্দী ধরে তারা বাস করছে এই গলিতে, আর কেমন করেই বা শঙ্খশিল্পের এত বড় একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো সমুদ্র থেকে দূরে এই জাহাঙ্গীরনগরে।

[অংশ বিশেষ]

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা। ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হলো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝরে গেল, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক বলেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু করে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার— যাঁর '*বেদে*', '*টুটা-ফুটা*' সবেমাত্র বেরিয়েছে– তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দুজন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায় নি। আর এঁদের মধ্যে– সম্পাদক দুজনকে বাদ দিয়ে– যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হতো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিল। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম বলে ভুল করেছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না বিষ্ণু দে'র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম কোনো বাস্তব মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিল যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারি নি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগল, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম– এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ– যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিল সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিল '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলো এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে– এখন পাতা উলটিয়ে প্রায় অবাক হয়ে দেখছি– প্রথম দেখা দিয়েছিল 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'।

'*ধূসর পাণ্ডুলিপি*'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'কাম্পে', 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতা'য়, আর কোনো-কোনোটি '*ধূপছায়া*'য় বেরিয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হলো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ বলে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয় নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ ছিল আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যে তাগিদ ছিল, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। দেশের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড় ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে পাশ করা প্রফেসর, আর কেউ বা ফরাসি জার্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিনা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত করে একটি মাত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাই নি, ভেঙে যাই নি, সরে যাই নি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দুবছর বা আড়াই বছর, যে-কদিন 'প্রগতি' চলেছিল, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-করে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম– সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া-লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘৃণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এইরকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হতো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলাম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক বলে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হলো, তা না হলে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার

দ্বারাই রুদ্ধ হতে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না– শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হয়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম *Remember to Remember*। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেন না আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড় একটা অংশ হলো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় বলে মনে না করি। যেন মনে রাখি, রাখতে ভুলে না যাই।

দুই

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিল তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলোর লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু সব দোষ সত্ত্বেও অংশগুলো অন্য কারণে ব্যবহার্য হতে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকমভাবে সাড়া তুলেছিল; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;–অচিন্ত্যবাবুর মতো তাঁর মধ্যে অসংখ্য imitator জোটে নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ, ... তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তাকে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়। ...তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে ভালো কি মন্দ বলা যায় না– তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। ... তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে– তাঁর অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না। ...[তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করে নি– যথা, "ফেঁড়ে", "নটকান", "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে-কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। ...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে

যান;– সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকব। ... [সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে।

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হলেও 'বলাকা'র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে; –'বলাকা'র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মতো তোড় এর নেই; –এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী– থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে।

জীবনানন্দবাবুর ... বহু কবিতায় ... পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।... দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কটি লাইন নেয়া যাক–

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,–
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,–
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,– জানি আমি–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

এখানে যেন কথা শেষ হয়েও শেষ হয় নি; – কথা ফুরিয়ে গেলেও তার বিষণ্ন সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার... ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মতো গুঞ্জন করে ভেসে যায়।

('প্রগতি'–আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনি নি তো!

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তার প্রমাণস্বরূপ আমি

তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি– 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।' ...আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে– একেই বলে magic line। আকাশ কথাটায় পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে; শব্দের মূল্যবোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালি কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি... উভচর ভাষা অবলম্বন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সবচেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়ল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার– নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে– ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি– বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাকে, music আছে– একটা ক্লান্ত উদাস সুরের mezandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়– তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন– 'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ ॥ তোমার, মতন কেউ। নাই আর ॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই– দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয় নি। ...শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিল না, কিন্তু ছেঁড়া

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে গেলেই এর সৌন্দর্য ধরা পড়বে। দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাংলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাংলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা– তার ব্যাকরণ, তার বিধি-বিধান, তার spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।... অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাংলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়নপাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত করে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে কাঙালপনা করে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে রাখব? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা করে তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন :

সেই জল মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা– শাদা– বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার– শুধু তোমার কেন? অনেকেরই– হাসি পাবে, বলবে– 'ঠাণ্ডা– শাদা– এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি– আর কবিতাতেই লিখতে পারব না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা? ...যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে ... কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ সম্ভার থেকে বঞ্চিত করব? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে তুলব না কেন?... আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাংলা, কারণ তা বাংলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি'– ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে করেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশি শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেন নি। মনে পড়েছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিল 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম জিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিল বলে। ওটা যে ঐকাহিক চমক– লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নতুনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর– তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পঙ্‌ক্তিটি পড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনি নি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তিন

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিসে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখি নি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধরে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চলে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে বসে আছি, শীতকাল, বিকেল হয়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল নড়ে উঠল, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিল– যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকত সব সময়– তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারি নি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম– আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমত না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে করে পিছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করি নি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার আমরা পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলাম; তাতে, এ.আর.পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত করে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনি নি, যদিও শুনেছি ইদানিং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিল। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিল বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর করে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে– যার অনেকখানি অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘটে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয় নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিল আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি করে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি *ধূসর পাণ্ডুলিপির* প্রুফ দেখে, '*এক পয়সায় একটি*' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা বলে, তাঁকে আবৃত্তি করে। বাংলা কবিতার যতগুলো পঙ্‌ক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলে নি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করে নি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধরে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন করে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে– ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখব না।

চার

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি; আজ আবার পড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ– আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ করে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি তাঁর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা বর্ণনাধর্মী, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত : যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'– পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন– আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা অন্য কিছু বলতে চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করব 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধ'-এর সঙ্গী-কবিতা– দুটিই কবির স্বগতোক্তি– প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হয়ে ঘোষণা করেছেন তাঁর নতুনত্ব (কেউ যাহা জানে নাই– কোনো এক রাণী,/আমি ব'হে আনি'), বলে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক',/পড়ি নাক' দুর্দশার গান/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান'); আর দ্বিতয়টিতে তিনি জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে বসে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'); দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হয়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভরে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মুখ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর বিস্ময়কর গঠনের কথা– কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন

একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায় চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠল – 'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

পাঁচ

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখান যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হয়ে উঠেছিল 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলোতে, কিংবা কেমন করে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করেছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'সেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইয়েটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন করে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখান যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইয়েটস-এর 'O Curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায় চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars'-এর 'ওল্ড টু এ নাইটিঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হয়ে ফলে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে– জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছলভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হন নি ('জাগিবার কাল আছে– দরকার আছে ঘুমাবার;/এই সচ্ছলতা আমাদের') নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন করে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন করে 'প্রেমের ভয়াভহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হয়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত করে' 'জীবনের গম্ভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায় হতে পারে। এর আরম্ভ– 'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/ নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে– আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন– মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে;

তবু তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়– অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়ল বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।...
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের– মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিল, ভিড় করে বাধা দিয়েছিল জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিল– কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারল না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরল লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না– কোনো দুঃখই ছিল না; স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল, প্রেম ছিল, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিল না। কিন্তু–

জানি– তবু জানি
নারীর হৃদয়– প্রেম– শিশু– গৃহ– নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়– সচ্ছলতা নয়–
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;

আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত– ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই...

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হতো, তাহলে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হতো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম– যেন একটি ঢেউ সরে যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল– কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারে নি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জপে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন– 'আমরা দু-জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' –মৃত্যু পার হয়ে বেজে উঠল জীবনের জয়ধ্বনি, আর– সেইসঙ্গে নির্বোধ ও পাশব জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

ছয়

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে

বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলব, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহলে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য : জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-করে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন; আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হতে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন– এইসব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেন নি বলেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করব আরো আগেকার লেখা একটি পঙ্‌ক্তি–

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন–

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নতুনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'– এটা হলো চাক্ষুষ উপমা কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হয়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি– 'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হলে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হয়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ করে-করে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত কখনো 'নক্ষত্রের রুপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোট-ছোট বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র করে দুটোকেই আরো স্পষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুদ্ধ বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে ... উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলো

ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যালোকে। বউবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝরে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চীনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হয়ে উঠল, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হতে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইল, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত করে দিলো। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচার জীবনস্পৃহার 'তুমুল গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার' – এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে বিদেশি শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য বলে আমরা জেনেছি– এই ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও নেই, কিন্তু সেজন্যে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হতো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা', 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পঙ্‌ক্তিটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই– নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই– রূপ ঝরে পড়ে তার–
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে;

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হতে পারল। হতে পারল। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়– আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেল শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে বলে–

> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে বলেই এখানে অসীমের আভাস লাগল।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ করে গেছে–

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
প্রেম ছিল, আশা ছিল,... তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত?

বলা বাহুল্য 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হতো।

সাত

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষয়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর' –তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায় সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের সঙ্গে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়– তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হয়েও, তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত বলে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে– তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন বা কোনো পূর্বসূরির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিল, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হতে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি– 'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো– একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গম্ভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হয়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে' 'কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

'কালের পুতুল'

নোয়াখালী

প্রথম চোখ ফুটলো নোয়াখালীতে। তার আগে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে আলোর ফুটকি কয়েকটি মাত্র। সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠার আগে উঠোন ভরে আলপনা দিচ্ছেন বাড়ির বৃদ্ধা, মুগ্ধ হয়ে দেখছি। রাতের বিছানা দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢালুর মতো করে উল্টানো, তাইতে ঠেশান দিয়ে পাতা উল্টাচ্ছি মস্ত বড় লাল মলাটের 'বালক' পত্রিকার। রোদ্দুর-মাখা বিকেলে টেনিস খেলা হচ্ছে; একটি সুডোল মসৃণ ধবধবে বল এসে লাগলো আমার পেরাম্বুলেটরের চাকায়, বলটি আমি উপহার পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে কোন মাঠ, কোন দেশ, সে কবেকার কথা, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। আমার জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের যোগ নেই : তারা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছবি, অনেক আগে দেখা স্বপ্নের মতো বছরের পর বছরের আবর্তনেও যে-স্বপ্ন ভুলতে পারিনি। সচেতন জীবন অনবচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হলো নোয়াখালীতে : প্রথম যে-জনপদের নাম আমি জানলুম তা নোয়াখালী; নোয়াখালীর পথে এবং অপথে আমার ভূগোলশিক্ষা, আর সেখানেই এই প্রাথমিক ইতিহাসবোধের বিকাশ যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে। আমার কাছে নোয়াখালী মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালী।

সব-আগের বাড়িটি একটি বৃহৎ ফল-বাগানের মধ্যে। লোকে বলতো ফেরুল সাহেবের বাগিচা। জানি না ফেরুল কোন পর্তুগিজ নামের অপভ্রংশ। ফলের এত প্রাচুর্য যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধুতেন। খুব সবুজ, মনে পড়ে। একটু অন্ধকার। কাছেই গির্জে। শাদা প্যান্ট-কোট পরা কালো-কালো লোকেদের অনাত্মীয় লাগতো। গির্জের ভিতরে গিয়েছি; ভিতরটা ছমছমে, থমথমে, বাইরে সবুজ ঘাস, লম্বা ঝাউগাছ, রোদ্দুর। বনবহুল ঘনসবুজ দেশ, সমুদ্র কাছে, মেঘনার রাক্ষসী মোহানার ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা। সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটির দু-দিকে ঝাউয়ের সারি, সেখানে সারা দিন গোল-গোল আলোছায়ার ঝিকিমিকি, আর ঝাউয়ের ডালে ডালে দীর্ঘশ্বাস, সারাদিন, সারা রাত। দলে-দলে নারকেল গাছ আকাশের দিকে উঠেছে, ছিপছিপে সুপুরি-সখীদের পাশে-পাশে; যেখানে-সেখানে পুকুর, ডোবা, নালা, গাবের আঠা, মাদারের কাঁটা, সাপের ভয়। শাদা ছোটো-ছোটো দ্রোণফুলে প্রজাপতির আশাতীত ভিড়— আর কোথাও আর কখনো দেখিনি সে-ফুল— আর কী-একটা গাছে ছোটো গোল-গোল কাঁটাগুলো গুটি ধরতো, মজার খেলা ছিলো সেগুলো পরস্পরের কাপড়ে-জামায় ছুঁড়ে মারা— কী তার নাম ভুলে গেছি। হলদে লাল ম্যাজেন্টা গাঁদায় সারাটা শীত রঙিন, এমন বাড়ি প্রায় ছিলো না যার আঙিনায় গুচ্ছ-গুচ্ছ গাঁদা ধরে না থাকতো— শ্যামল সুঠাম এক-একটি বাড়ি, বেড়া-দেয়া বাগান, নিকোনো উঠোন, চোখ-জুড়োনো খড়ের চাল, মাচার উপর সবুজ উদ্‌গ্রীব লাউ-কুমড়োর লতায় ফোঁটা-ফোঁটা শিশির। শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িটিতেও থেকেছি আমরা, কিন্তু ও-রকম বাড়িতে কখনো না : কেননা, সরকারি চাকুরেরূপী অধিপতিদের বাসা নয় ওগুলো, অধিবাসীদের বাস্তুভিটা। কতকগুলো বাড়ি ছিলো— এমন নিষ্কলঙ্ক-নিকোনো তাদের উঠোন, এমন অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন, যে যতবার চোখে

পড়েছে ততবার অবাক লেগেছে। ও-বাড়িগুলোতে কারা থাকে জিগ্যেস করে জবাব পাইনি। পরে জানতে পেরেছিলুম ওগুলো শহরের গণিকালয়, যদিও গণিকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তখনও বোধগম্য হয়নি।

এমন কোনো পথ ছিলো না নোয়াখালীর , যাতে হাঁটিনি, এমন মাঠ ছিলো না যা মাড়াইনি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়খেবড় পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরাবালির বিপদে। শীতের ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; যদিও আলস্টার আর কানঢাকা টুপিতে মোড়া, তবু বিশ্ববিধান আমার অসম্মান করেনি, শান্তাসীতার নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, দুরন্ত জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল করে দিয়ে। আবার সন্ধ্যাবেলা লাল-সোনার খেলা পশ্চিমে। কখনো গেছি সুদূর রেল-স্টেশনে রেল-লাইনের নুড়ি কুড়োতে, কখনো জেলখানার পিছনে ভুতুড়ে মাঠ, কি নৌকো-চলা খালের ধারে বাঁশ-পচা গন্ধে। একবার কী-কারণে পুলিশ লাইনে তাঁবু পড়েছিল, দুপুরবেলা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে ঘাসের গন্ধে নেশার মতো লেগেছিলো আমার, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে মনে হয়েছিলো সংসারটা জঞ্জাল, সমস্ত গোলমাল অর্থহীন, সবচেয়ে ভালো রাখাল হয়ে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো, গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো এখানে বলা দরকার যে তখন পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথ পড়িনি— রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই না।

অন্য সব যখন শেষ হলো, তখন ফিরতে হয় নদীর কাছেই। নোয়াখালীর সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালীর সর্বনাশ। সবচেয়ে জমকালো সম্পত্তি, সবচেয়ে নিদারুণ বিপদ। সে-নদী মনোহরণ নয়; বাংলাদেশের অন্য কোনো নদীর মতোই নয় সে, না গঙ্গা, না পদ্মা, না কোপাই। বিশাল, শ্রীহীন, দুর্দান্ত, অমিত্র, অসেতুসম্ভব। কেউ স্নান করতে নামে না; উপায় নেই। নানা রঙের শাড়ি-পরা ছিপছিপে তরুণীদের মতো নানা রঙের পালতোলা নৌকা এখানে কোথায়— বছরে দু-এক মাস, ভরা গ্রীষ্মের সময়, অর্ধেকটা নদীজুড়ে পড়ে থাকে বালি আর কাদা, তখন একটি খেয়া অতি কষ্টে পারাপার করে; আর বর্ষাকালে যে-একটি নড়বড়ে স্টিমার কুমির-রঙের ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে সন্দ্বীপে যায়, কিংবা হাতিয়ায়, তার দিকে তাকাতেই ভয় হয় এই ডুবলো বুঝি। মানুষের লাভের বা লোভের দিন-মজুরি এ-নদী করলো না; মানুষের ভালোবাসাকেও ভাসিয়ে দিলো কুটিল গোগ্রাসী আবর্তে। ধারে-ধারে না উঠলো কারখানা, না বাগানবাড়ি; ধার দিয়ে বেড়াবার একটি পাকা সড়ক— তা পর্যন্ত হতে দিলো না। মেয়েদের সঙ্গে গলাগলি ভাব করে গলে যাওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখেনি, বাবুদের নৌকো চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াবে এমন দিন যদি আসেই তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে সে। আর-কিছু না, শুধু ভাঙবে। খাড়া পাড়, পাহাড়ের গায়ের মতো ফাটা-ফাটা, ভাঙা-ভাঙা : তার ঠিক নিচেই ঘুরপাক খাওয়া তীব্র মত্ত জল : আর ঝুপঝুপ করে ধসে পড়ছে মাটি, যারা দাঁড়িয়ে আছে কি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, একেবারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাচ্ছে সরে, ফাটল ধরছে আবার একটু দূরে, কখনো প্রকাণ্ড চাকে গাছপালাসুদ্ধ ভেঙে পড়লো কান-ফাটানো শব্দে, কাছের বাড়িগুলো বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে। আদি শহরটি অত্যন্তই ছোটো হয়তো ছিলো না, নদী নাকি ছিলো তিন-চার মাইল দূরে, কিন্তু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নদী এগিয়ে এলো এমন দ্রুতবেগে যে দেখতে দেখতে কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেলো নোয়াখালী। আমি শেষ দেখেছি শহরের ঠিক মাঝখানটিতে টাউন হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিতক্ষুধা জল, তারপর

শুনেছি আরো ক্ষয়েছে; যে নোয়াখালী আমি দেখেছি, যাকে আমি বহন করছি আমার মনে, আমার জীবনে, আমার স্মৃতি-সত্তায়, আজ তার নামমাত্রই হয়তো আছে— কিংবা কিছু নেই কিছুই নেই।

আর সেই সব মানুষ? সেই আধ-বুড়ো পর্তুগিজ, যে-দুর্দম জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি উপকূলে একদিন তাণ্ডব বাধিয়েছিল, তাদেরই প্রক্ষিপ্ত, উচ্ছিন্ন, সর্বশেষ ধ্বংসাবশেষ? গায়ের রঙ তার আমাদের মতোই কালো, চুলের রঙ পুরোনো পয়সার মতো, ময়লা প্যান্ট-কোট পরনে, পায়ে জুতো নেই । খাস নোয়াখালীর বাংলা বলতো সে, প্রায় সারা দিনই পথে-পথে ঘুরে বেড়াতো, পথের কোনো ভদ্রলোককে ধরে জুড়ে দিতো আলাপ, চেয়ে নিতো চুরুট কিংবা দু-চার আনা পয়সা। আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় প্রায়-অলৌকিক মূর্তি— লম্বা, পাথরের মতো মুখে জ্বলজ্বলে চোখ বসানো, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত মস্ত ফোলা-ফোলা আলখাল্লায় ঢাকা, পিঠে ঝুলি, হাতে— বোধহয় একটা শানাই কিংবা ঐ-রকম কোনো যন্ত্র। মনে পড়ে না সে-যন্ত্রে সে কখনো ফুঁ দিয়েছে, মনে পড়ে না কখনো তাকে কথা বলতে শুনেছি। বেশির ভাগ তাকে দেখা যেতো হাটে-বাজারে, আর যত দূর থেকেই হোক, তাকে দেখামাত্র একটা কিলবিলে অস্বাভাবিক ভয়ে আমি প্রায় মরে যেতুম, হাতের আঙুল যদি গুরুজনের মুঠোয় ধরা থাকতো, তবু সে-ভয় পোষ মানতো না। ঋজু নিঃশব্দ, ঘনগম্ভীর ঐ মূর্তিকে কিছুতেই আমি ভাবতে পারতুম না মানুষ বলে। ঐ ঝুলিতে কী আছে? ভাবতে শিউরে উঠতুম। ও কোথায় যায়, কী খায়, কী করে? ভাবতে কাঁটা দিতো গায়ে। এমন সব কথা আমার মনে হতো যার কোনো ভাষা নেই; সে যেন বালকের কল্পনা মাত্র নয়, পূর্বপুরুষের সমস্ত ভীতিকর অভিজ্ঞতার অচেতন সঞ্চয়। যাতে অকল্যাণ, যাতে অন্ধকার, যাতে অবরোধ, যাতে আর যা-কিছু বিকৃত, বীভৎস, পিচ্ছিল, পৈশাচিক, সেই সমস্ত-কিছুর অবতার ছিলো আমার কাছে ঐ— খুব সম্ভব নিরীহ পাগল। পাগল হোক আর না-ই হোক, সে যে নিরীহ ছিলো এখন তা বোঝা সহজ, তবু তার কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত একটা ছমছমানির ঢেউ ওঠে আমার শরীরে।

যারা প্রধানত আমার সঙ্গী ছিলো, তাদের বাবারা কেউ এস. ডি. ও, কেউ পি. ডব্লিউ. ডি'-র কর্তা, কেউ বা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অনেকেই বিদায় নিয়েছে বদলির ধাক্কায় আমার আগেই। কিন্তু আরো অনেকে ছিলো যারা বদলির ঘুরপাকের বাইরে, বিলেতি কিংবা স্বদেশী সরকারের খুচরো কিংবা পাইকেরি বদলির হুকুমে উন্মূলিত হবে না যে-সব মানুষ। তারা আমার অস্তিত্বের অংশ ছিলো তখন। কয়েকটি পরিবার ছিলো একটু উঁচ-কপালে, গুহ, গুহরায়, রায়চৌধুরী; ছেলেরা পড়তো কলকাতায় কলেজে, ছুটিতে হৈ-হৈ করতো শহর ভরে, নাটক করতো টাউন হলে, ডাকের জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতো পোস্টাপিশের বাইরে সকালবেলায়। নন-কো-অপারেশনের ঝড় যখন উঠলো, তাদের কেউ কেউ উড়ে গিয়ে জেলে পড়লো, হিংসেয় বুক ফেটে গেলো আমার, শতবার ধিক্কার দিলুম নিজেকে আর কয়েকটা বছর আগে জন্মাইনি বলে। আর সেই সঙ্গে তারা ছিলো, যারা অনেক এবং অনুল্লেখ্য, যারা কোনোদিন জেলে যায়নি বা দ্রষ্টব্য কিছু করেনি; যারা বেঁচেছে তেমনি নিঃশব্দে, যেমন নিঃশব্দ আমাদের নিঃশ্বাস। যামিনীমাস্টার অঙ্ক কষাতেন আমাকে, তাঁর রাতের আহারের বরাদ্দ ছিলো আমাদের সঙ্গে, ঠিক আটটায় বারান্দায় শোনা যেত তাঁর কাশি, হ্রস্ব, কুণ্ঠিত, সশ্রদ্ধ— ক্ষুধার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, খাদ্যের প্রতি সেই মানুষের শ্রদ্ধা স্বল্পতম শব্দে তিনি প্রকাশ করতেন। তালতলার অশ্বিনী কবিরাজের নাম-ডাক ছিলো শহরে— সময়ে-অসময়ে এবং কারণে-অকারণে তাঁর লাল কালো বড়ি আমাদের খেতে হতো; তাঁর নিজের

চেহারা তাঁর ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজ করতো না, কিন্তু বৈঠকখানাটি করতো— রোদালো ঘর, পরিষ্কার ফরাশ, ঝকঝকে দেয়াল-ঘড়ি, আর ঘন একটি কবরেজি গন্ধ। এই সব পারিবারিক চেনাশোনার বাইরেও দু-একজন বন্ধু হয়েছিলো আমার, মুসলমান তারা, অত্যন্ত বিনীত, আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। একজন পোস্টাপিশে চিঠির টিকিটে ছাপ মারতো, সুশ্রী ছিলো সে, নম্র ছিলো কণ্ঠস্বর। আর-একজনের সঙ্গে গিয়েছিলুম বনপথ দিয়ে অনেকদূর হেঁটে তাদের গ্রামের বাড়িতে, খেতে দিয়েছিলো ডাবের জল আর ডাবের শাঁস, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে বিকেলের লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিলো। জানি না এরা সব কোথায় আছে এখন, জানি না এরা সব এখন কেমন আছে।

ভোর আসতো নোয়াখালীতে মোরগ-ডাকের সোনালি রথে চড়ে— কোক্-কোরোক-কো, কোক্-কোরোক্-কো— দিনের অভ্যর্থনা ধ্বনির ফোয়ারায় লাফিয়ে উঠতো আকাশে, আর সেই সঙ্গে শোনা যেতো পথে-পথে খোলা গলার উল্লাস, গ্রাম থেকে যারা শহরে আসছে সবজি দুধ গুড়ের হাঁড়ি বেচতে তারা শীতের কুয়াশায় পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে, কিংবা মিছিমিছি, নিছক ফুর্তিতে চিৎকার করে ডাকছে : এড়িও— আড়িড্ডু—ৎ! এড়িও—আড়িড্ডু—ৎ! একজন ডাকলো তো চার জন জবাব দিলো চার দিক থেকে, সমস্ত সকালটা ভরে উঠলো সেই তীক্ষ্ণ লম্বা গিটকিরি আওয়াজে, শেষের দিকটা ছুঁচোলো হয়ে প্রতিধ্বনির পিন ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোথাও শুনিনি ঐ ডাক, ঐ ভাষা, ঐ উচ্চারণের ভঙ্গি। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। চাটগাঁর যেটা খাঁটি ভাষা তাকে তো বাংলাই বলা যায় না, আর নোয়াখালীর ভাষা, আমার মতো জাত-বাঙালকেও কথায়-কথায় চমকে দিতো। শুধু যে ক্রিয়াপদের প্রত্যয় অন্য রকম তা নয়, শুধু যে উচ্চারণে অর্ধস্ফুট 'হ'-এর ছড়াছড়ি তাও নয়, নানা জিনিসের নামই শুনতুম আলাদা। সে-সমস্ত কথা মুসলমানি বলে মনে করতে পারি না, অনেক তার মগ, কিছু হয়তো বর্মি, আর পর্তুগিজের কোনো না ছিটেফোঁটা। একে তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হলো বাংলাদেশ, আবার সেই বাংলাদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন, মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালী।

নোয়াখালীর নগণ্যতা নিয়ে তীব্র আক্ষেপ ছিলো আমার মনে। ভেবে পেতুম না, বিধাতা বেছে-বেছে আমাকে এমন জায়গায় ছুড়ে ফেললেন কেন, যার নাম কখনো ছাপার অক্ষরে ওঠে না। কলকাতা দিল্লি মুম্বাইয়ের কথা ছেড়ে দিচ্ছি— ও-সব তো স্বপ্ন— খবর-কাগজে দেখতুম ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া শিলচরের কথা, এমনকি তমলুক, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জের খবরও মাঝে-মাঝে ছাপা হতো, কিন্তু নোয়াখালী— ও আবার একটা জায়গা, আর তার আবার একটা খবর! যদি-না দু-চার মাসে একবার মফস্বল নোটস-এর মধ্যে একটু জায়গা হতো নোয়াখালীর, সে এতই ছোট অক্ষরে যে রীতিমতো অপমানবোধ হতো আমার। কেন, এমনই কী তুচ্ছ জায়গাটা? এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন যারা নূতনকে লেখেন নতুন আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে 'সবুজপত্রে'র একজন অন্তত গ্রাহক আছেন— শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ 'সবুজপত্রে' ছাপা হয়ে 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত হয়েছে! আর অসহযোগের উন্মাদনার দিনে নোয়াখালী কি পিছিয়ে ছিলো কারো তুলনায়? স্কুল ছাড়া বলো, জেলে যাওয়া বলো, মিটিং, বক্তৃতা, গান— কোনটিতে কম! বন্দে মাতরম্ আর আল্লা-হো-আকবর, যুগ্ম-নিনাদ কি উচ্ছ্বসিত হয়নি গানের দুই চরণের মতো; মোটা খদ্দর পরে এঁটেল গ্রীষ্মে কি ঘামি নি আমরা, কুলির রক্ত জ্ঞান করে ত্যাগ করিনি চা? তবু, তবু কাগজওলাদের চোখে পড়লো না নোয়াখালী, এমনি

অন্ধ তারা! এই নীরন্ধ্র অখ্যাতির মধ্যে বসবাস করতে আমার আর ভালোই লাগছিলো না; কিন্তু চোখের উপর অমুক-অমুক বাবু বদলি হয়ে গেলেন কেউ চট্টগ্রামে, কেউ রংপুরে, কেউ ময়মনসিংহে; আমাদের ভাগ্যে শুধু বাসা-বদল এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, আমরা পড়ে আছি যে-তিমিরে সে-তিমিরে। শেষ পর্যন্ত যখন নোয়াখালী ছাড়বার দিন এলো আমাদের, এবং বোঝা গেলো আর আমরা ফিরবো না সেখানে, সেদিন আমি সুখীই হয়েছিলাম, আমার কিশোর প্রাণ একবারও কাঁদে নি বাল্যকালের লীলাভূমিকে পিছনে ফেলে যেতে।

এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালী, ভীষণ প্রতিশোধ; ছড়িয়ে দিয়েছে তার নাম বড়-বড় অক্ষরে, শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, লন্ডন, নিউইয়র্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম আরক্ত অক্ষরে মেয়েদের হৃৎকম্পনে, মায়েদের হৃৎপিণ্ডে। এমনকি সেই রামগঞ্জ থানা, সেখানে খালের উপর বাঁকা সাঁকো, আর খালের জলে কচুরিপানার বেগুনী ফুলের আলো, যেখানে একবার নৌকা করে বেড়াতে গিয়ে নারিকেল দিয়ে রাঁধা কইমাছ অমৃতের মতো খেয়েছিলুম, যার অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীতে কেউ জানতো না, সেই রামগঞ্জের নাম আজ সারা বাংলার মুখে-মুখে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর ... তুচ্ছ ভেবেছি এই সব নাম, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়, কী মারাত্মকরকম বড়। ঈর্ষাযোগ্য নয়, এই ভাগ্য, কিন্তু কে জানে। গান্ধী আজ সেখানে, আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের পৃথিবীতে আর কী?

ইতিমধ্যেই খবর-কাগজে নোয়াখালীর খবরের অক্ষর হয়েছে ছোট, স্থান সংকুচিত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই : কেননা খবর-কাগজে ঠিক জায়গায় ঠিক খবরটি প্রায়ই বেরোয় না, পৃথিবীর সত্যিকার বড় খবরগুলো তো একেবারে বাদ। জীবনে যাদের প্রধান উৎসাহ ধনবৃদ্ধি, ঘোড়দৌড় আর পলিটিক্স নামক সংঘবদ্ধ প্রতারণা, মুখ্যত তাদেরই জন্য পৃথিবীর সব কটি সর্বোত্তম সংবাদপত্র, অনুত্তমদের কথা কিছু না-ই বললাম। পয়লা পাতায় আবার জাঁকিয়ে বসেছে দিল্লি লন্ডন নিউইয়র্ক; কিন্তু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা আস্তে-আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে বাংলার অখ্যাততম অনার্যভূমিতে; বর্তমান সময়ের শুধু নয়, চিরকালের চরম একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে রচিত হলো, যার প্রভাব আজ মনে হতে পারে অকিঞ্চিৎকর : কিন্তু ছড়াবে, ছড়িয়ে পড়বে, ছড়িয়ে দেবে মাটির তলে-তলে শিকড়, দূরান্তরে, যুগান্তরে, বিকশিত হবে ফুলে পল্লবে ভ্রমরে, তারপর হয়তো ফলে নীড়ে পাখিতে দু-চার শতাব্দী পরেকার কোনো প্রভাতে। মানুষের মধ্যে যে-অংশ জীব, তার ইতিহাস আজ যুদ্ধের পরে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর নামজাদা নগরগুলোতে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-অংশ দেবতা, অন্তত দেবাভিমুখী, তার ইতিহাসের ক্ষেত্র আজ সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নোয়াখালী।

নিষ্ঠুর শোনাবে কথাটা, তবু বলবো ভাগ্যিশ নোয়াখালী ঘটেছিল। তাই তো গান্ধী মুক্তি পেলেন দিল্লি-লন্ডনের কূটচক্র থেকে; মুম্বাই-আহমেদাবাদের ঘনজটিল জাল থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, বিতর্ক, মন্ত্রণার অশেষ-বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে; সংখ্যা তথ্য ও আইনের পিচ্ছিলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে লোভীর বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় প্রচ্ছন্ন-প্রখর আবর্ত থেকে; স্বর্গরাজ্যের সর্বনাশী পরিকল্পনা থেকে; মিথ্যা থেকে, মত্ততা থেকে, গণনেতার আবশ্যিক আত্মহত্যা থেকে। গণনেতার নেতাই তো জনগণ, আর জনতার প্রমত্ততা যেহেতু সমাজের একটা মৌল সত্য, তাই নেতৃপদে একবার অভিষিক্ত হলে বারবার চারিত্র্যচ্যুত না-হয়ে উপায় থাকে না কোনো মানুষের। মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হলে, সংঘবদ্ধ হলেই সে মন্দ; অথচ

এমনি আমরা বোকা যে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে দু, দু-বার সংঘবদ্ধ মানুষের নারকীয়তা প্রত্যক্ষ করেও এবং তার অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রীতিমতো মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও এখনো আমরা জনগণের উদ্ধারকারীকে বিশ্বাস করি। এখনো এ-শিক্ষা আমাদের হলো না যে রাজনৈতিকের হাত থেকে যে-স্বাধীনতা আমরা পেতে পারি, তাতে আমরা বাঁচবো না; রাজনৈতিকরা যা দিতে পারেন, তার প্রত্যেকটিই মারণাস্ত্র, যুগে-যুগে শুধু অস্ত্র-বদল হয়, আমরা হৈ-চৈ করি প্রথম কিছুদিন তা-ই নিয়েই : পুরোনো মরচে-পড়া খাঁড়ার বদলে ঝকঝকে নতুন তলোয়ার দেখে তাকেই ভুল করি জীয়নকাঠি বলে। ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এ-ই আমরা দেখে এলাম, তবু ভুল ভাঙলো না, তবু আমরা মোহাচ্ছন্ন।

এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন পৃথিবীতে একজন মানুষ। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের জন্য ক্ষয় করলেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়, দীর্ঘ, তিক্ত, উন্মথিত বছরের পর বছর ; তারপর সেই রাষ্ট্রগঠনের সময় যখন এলো, তখন ? তখন দেখলেন, যে-স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে খেপিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রথমতম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠলো উদ্বেল হয়ে। তাহলে কী হলো? স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক দিন, তারপর যাত্রা শুরু হলো। দিল্লি তাকে দলে পেলো না, ওয়ার্ধা তাঁকে বেঁধে রাখলো না, মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো লন্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক। পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম, ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজনের অভ্যাসকেও ফেলে দিলেন ছুড়ে, একলা হলেন, শুদ্ধ হলেন, মুক্ত হলেন। এ-মুক্তিতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। এ না-হলে ব্যর্থ হতো তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। এই তার পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো কঠিন শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহণ।

কোন স্বর্গে? যেখানে সব আলো, সব খোলা, সব সহজ। যেখানে ভয় নেই, বীরত্বও নেই। লোভ নেই, ত্যাগ নেই। ক্রোধ নেই, সংযমও নেই। যেখানে আশ্রয় নেই, তবু নিশ্চয়তা আছে। যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালীর পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্র-কঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিত শান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায় পড়ে রইলো তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালী! কোথায় তার পথের শেষ জানেন না, কখনো ফিরবেন কিনা তাও জানেন না। ... কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে বলে? চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন বলে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় বলেই বলা : ও-সব কিছু না। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে; সেই স্বর্গ নয়, যা দিয়ে রাজনৈতিক রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না-করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর; সেই স্বর্গ, যা ছাড়া আর স্বর্গ নেই, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটিমাত্র আভাস মাঝে-মাঝে হয়তো পায়, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ রচনা করে সম্পূর্ণ ধারণ করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে, খুবই কম; আর তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের ওপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালীর জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালী; পৃথিবী প্রণাম করো।

পুরানা পল্টন

দেশ দেখা আমার কপালে খুব কমই ঘটেছে। খানিকটা আর্থিক কারণে, কিন্তু তারও বেশি দেশভ্রমণে স্বাভাবিক রুচির অভাবে। ঘুরে বেড়াতে আমি ভালোবাসিনে; জীবনের সবচেয়ে কল্পনাপ্রবণ এবং উদ্দাম সময়েও পারিপার্শ্বিকের বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের লোভ আমার বেশি ছিলো না। বরং— দু-একবার যা চেষ্টা করে দেখেছি— এই অত্যন্ত সভ্য যুগের দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত শারীরিক ক্লেশহীন যানেও ভ্রমণের অনারামই আমার বেশি মনে হয়েছে; এবং নতুন জায়গায় গিয়ে অতি সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যেও আমি শান্তি পাইনি। তাই বলে প্রকৃতির প্রতি যে আমি উদাসীন, তা নয়। বাইরের বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আমার আকর্ষণ ও আসক্তি যে কত গভীর তা আবিষ্কার করে এক-এক সময় নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সে-প্রকৃতি— আমি যেখানেই থাকি না কেন, সব সময় আমার জানলার বাইরে উপস্থিত : সন্ধ্যার মেঘের রঙ, সন্ধ্যার তারা, দ্বিতীয়ার নতুন বাঁকা চাঁদ। তার জন্যে রেল-কোম্পানির টিকিট কাটবার দরকার করে না। প্রকৃতির এই আটপৌরে, অসাবধান রূপই আমাকে মুগ্ধ করে; যেখানে প্রকৃতি টুরিস্ট-এর মনোহরণ করবার জন্য পাহাড়ে আর জলপ্রপাতে, বিদেশী ফুলের বর্ণচ্ছটায় আর নীল হ্রদে নীলতর আকাশের ছায়ায় সেজে-গুজে বসে আছে; যেখানে তার রূপ ভাঙিয়ে রেল-কোম্পানির বিজ্ঞাপন তৈরি হয়; যেখানে সে নিতান্তই সরকারিভাবে সুন্দর— আমার মন তার প্রতি স্বভাবতই বিমুখ। স্বীকার করছি, তেমন কোনো বিখ্যাত বিউটি-স্পট আমি দেখিনি; এবং দেখলে হয়তো আমার মত বদলাতে পারে। তবু এও ঠিক যে কোনো বাধা না-থাকলেও, নানারকম সুবিধে পেলেও প্রকৃতির সে-সব সরকারি সৌন্দর্য দেখবার জন্য আমার পরিচিত, অভ্যস্ত গৃহকোণ ছাড়তে আমার মন চায় না।

আসল কথা, আমি ঘরকুনো; আমি গুছিয়ে বসতে ভালোবাসি, শিকড় গজাতে ভালোবাসি; অনেকদিন বাস করবার ফলে যে-ঘরটি আমার ব্যক্তিত্বে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তার বাইরে বেশিক্ষণ মন টেকে না আমার। বাঁধা-ধরা কতগুলো অভ্যাসের দৈনন্দিন দাসত্বে আমার পরম তৃপ্তি। কখনো কোনো কারণে তার একটু বিচ্যুতি হলেও আমার অস্বস্তি লাগে। নতুনত্বের প্রতি মোহ তো আমার নেই-ই, বরং গভীর সন্দেহ আছে। এমনকি, আমার ঘরে যেখানে যে-জিনিস আছে, তার ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন হলেও আমি বিরক্ত হই। আমার নিতান্ত অপরিসর, আসবাব-বাহুল্যহীন ঘরে বই নিয়ে, লেখা নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব নিয়ে, নিজের মনের চিন্তা নিয়ে— নিজের ঘরে পরিচিত, অতিপরিচিত আবহাওয়ায় আমি বেশ থাকি, সবচেয়ে ভালো থাকি। বৈচিত্র্য আমার পক্ষে বৈষম্য। এমন সময় গেছে, যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বলা যায়— ঘর থেকে একেবারে না-বেরিয়ে আমি কাটিয়েছি। আমি যা চাই, যা-কিছু আমার ভালো লাগে, সব আমি ঘরে বসেই পেয়েছি; বাইরে যাবার কথা মনে হয়নি। এবং সে-সময়টা আমার পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে; একটা মুহূর্ত ম্লান মনে হয়নি; মুহূর্তের জন্য ক্লান্ত বোধ করিনি। এমন অনেক দিনই আমার কেটেছে পুরানা পল্টনের বাড়িতে।

পুরানা পল্টন— অনেক দিন আগে যে মেয়েকে ভালোবাসতাম, হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলো। এককালে যে নিতান্ত আপন ছিলো, তার নাম আজ কানে ঠেকছে নতুন। অবাক হতে হয়— তার সঙ্গে অতদিনের ঘনিষ্ঠতা তা কি সত্যি? সেদিন হয়তো তাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তার নামের শব্দে মধুরতা, বিষাদ। পুরানা পল্টন যেদিন শেষবারের মতো ছেড়ে এলুম সেই স্থানবিশেষের জন্য সেদিন আমার একটুও দুঃখ হয়নি। বরং, ঢাকা ছাড়তে পেরে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। ঢাকা শহরের প্রতি আমার কোনো প্রীতি নেই; তার বিরুদ্ধে অনেক-কিছু আছে। তার উপর, আমার যা পেশা, তাতে ব্যবসার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে না থাকলে চলে না। আমার অনেকদিনকার অভিসন্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেলে কলকাতায় এসে বসবাস করবো; তা যেদিন ঘটলো, খুবই খুশি হয়েছিলুম; ঢাকার কথা ভেবে মন-খারাপ করবার সময় ছিলো না। তবু এখন মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে তাকাতে ভালো লাগে। মানুষের মনে অতীতের মোহ আশ্চর্য— বর্তমানে যার সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নেই, তা যখন অতীতে পরিণত হলো, তার ধার ক্ষয়ে গিয়ে মনের উপর কোমল স্পর্শের মতো এসে লাগে; স্মৃতির রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সব জিনিশই সুন্দর দেখায়, মনোরম দেখায়। পুরানা পল্টন আজ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে; তাই তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে শুধু তার সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে আমার মনে ফুটে উঠছে; বর্তমানে যাকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হতে পারিনি, আজ অতীতের প্রেক্ষিতে তাকে একান্তরূপে ভালোবাসছি। আসলে যার মধ্যে অনেক অভাব ছিলো, স্মৃতিপটে তার যে-ছবি উঠলো দেখলুম তাতে কোনো খুঁত নেই। আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কোন জায়গা, আমি অনায়াসে উত্তর দেই : পুরানা পল্টন।

পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে আমি ছ-বছর কাটিয়েছি সমস্ত কলেজ-জীবন, সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ। এ-সময়টা আত্মপ্রকাশের না-হলেও আত্মপ্রস্তুতির দিক থেকে জীবনের সবচেয়ে প্রধান অংশ। এ-সময়ের পরিণতিতেই মানুষের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ নির্দিষ্ট হয়। বন্ধুতা স্থাপন করবার, অন্তর্জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করবার, রুচি ও অভ্যাস গঠন করবার এই সময়। এ-সময়ে মন আশ্চর্য দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠে; এক বছরে মানুষ পাঁচ বছর বাড়ে। মনের তখন সবে পাখা গজিয়েছে; সে দূর থেকে আরো দূরে উড়ে-উড়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করে; জীবন সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতায় প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করে নতুন আস্বাদ, নতুন অনুভূতি। সেই ক-বছরে মানুষের মন নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষটায় নিজস্ব রূপ নেয়; বাকি জীবনের কাজ সেই নির্দিষ্ট রূপের উপর গাঢ়তর রঙ ফলানো। এতদিনে আমি আমার নিজস্ব ছাঁচে গড়া হয়ে গেছি; মনের চেহারা আর বদলাবো না— যতদিন না রক্তের তেজ কমে আসে, জরার বাষ্পোদয়ে মনের স্বচ্ছতা আসে ঘোলাটে হয়ে।

সতেরো বছর বয়সে আমি পুরানা পল্টনের বাড়িতে আসি। পাড়াটা তখন সবে গড়ে উঠেছে; শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু-একখানা বাড়ি; পাকা রাস্তা নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই; সে-ই বড় রাস্তার মোড়ে একমাত্র জলের কল। ডাকবাংলোর পর থেকে রাস্তায়ও আলো ছিলো না। অসুবিধে যতদূর হতে হয়। প্রথম কয়েক দিন খুব বিশ্রী লাগলো; মনে হলো সভ্যতার এলাকার বাইরে নির্বাসিত হয়েছি। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর বোধহয় খান দুই বাড়ি তখন উঠেছে— তারই এক বাড়ির ছেলের সঙ্গে

প্রতিবেশিতার সূত্রে আমার পরিচয় এক কলেজে পড়বার উপলক্ষে বন্ধুতায় পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা যে-কয়টি বন্ধু একত্র হয়ে ‘প্রগতি দল’ বলে পরিচিত হলাম, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই সেইরকম সময়েই আলাপের সূত্রপাত।

দেখতে-দেখতে আমার চোখের উপর মস্ত-মস্ত বাড়ি উঠে পাড়া ভরে গেলো। কত গ্রীষ্মের দুপুর ছাদ-পেটানো গানের একঘেয়ে সুরে উদাস হয়ে উঠলো; পাকা রাস্তা তৈরি হলো, ইলেকট্রিসিটিতে চারদিক আলো হয়ে গেলো; দশ গজ পর-পর বসলো জলের কল। শেষ পর্যন্ত পুরানা পল্টন ভদ্র হয়ে উঠলো, ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠলো। সবাই আমরা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লুম। তবু এখন ভেবে দেখছি, হয়তো আগেকার সে-সব দিনই ভালো ছিলো, যখন বড়ো রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়ে তারপর জল-কাদা পার হয়ে বাড়ি আসতে হতো; যখন বন্ধুরা মাঝে-মাঝে সাইকেল ঘাড়ে করে এক হাঁটু কাদা ভেঙে আমার বাড়ি এসে পৌঁছাতো; যখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে তারার আলোয় পথ দেখে মাঠ পেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরতুম, আর শুক্লপক্ষে আকাশ ভরে জ্যোৎস্নার বান ডাকতো— তেমন জ্যোৎস্না কতকাল দেখি না। সে-সময়টায় আমি প্রায় রোজই বেশি রাত করে বাড়ি ফিরতুম; নির্জন মাঠের উপর দিয়ে একা হেঁটে আসতে কী ভালোই লাগতো। অন্ধাকারে খানিক দূর এসে হঠাৎ অদূরে ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউসের তীব্র আলো চমক লাগাতো; এক বন্ধু প্রায়ই বলতো যে তার মনে হয় ওখানে খুব সুখী এক পরিবার বাস করে। কত রাতে আসতে-আসতে ডান দিকের সবুজ বনরেখার উপরে লাল হয়ে চাঁদ উঠতে দেখেছি; আর আমার মন কবিতার রসে আপ্লুত হয়ে গেছে। একবার এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে আমি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছিলাম, এক ঝাঁক সাদা মূর্তি মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তখন আমার ভাবতে খুব ভালো লেগেছিলো যে আমি পরীর নাচ দেখতে পেলুম।

হ্যাঁ, সেই পুরোনো পুরানা পল্টনই ভালো ছিলো। আমার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে চোখ একেবারে সোজা রেল-রাস্তা অবধি চলে যেতো; তারও পিছনে বড় ব্যারাক-বাড়িটাও চেষ্টা করলে ধরা যেতো চোখে। গরমের দিনে সমস্ত সময় প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে হু-হু হাওয়া : শেষ সময় অবধি ঠিক আমার ঘরের সামনাটা খোলাই ছিলো; কিন্তু শেষের বছরগুলোতে সে-রকম হাওয়া পেয়েছি বলে আর মনে পড়ে না। পাড়াটা সভ্য হয়ে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতির উদ্দামতা কমে এসেছিলো যেন।

পুরানা পল্টনের যে-জিনিসটি আমি কখনো ভুলবো না, তা হচ্ছে তার বর্ষার রূপ। অমন ধ্বনিবর্ণবহুল, উচ্ছৃঙ্খল, অজস্র বর্ষা আর দেখতে পাবো না। কী ঘন সমারোহেই বর্ষা নামতো সেই নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে! সমস্ত আকাশ মেঘে-মেঘে ঘন হয়ে আসতো— স্তরের পর স্তর, ঢেউয়ের পরে ঢেউ গাঢ়-নীল; কখনো দিগন্ত থেকে যেন মেঘের স্তম্ভ উঠে আকাশ বিদীর্ণ করে দিতো; কখনো তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ মেঘের সমুদ্র আকাশকে জাপটে ধরে থাকতো, শুধু দিক রেখার কাছে খানিকটা বর্ণহীন শূন্য। মেঘের মিছিল গড়িয়ে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে আকাশের চেহারা, জানলার কাছে বসে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতুম। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটতো; তার ছোঁয়ায় যেন কিসের একটা স্রোত বয়ে যেতো আমার মেরুদণ্ড দিয়ে। তারপর জানলা দিয়ে দেখতুম, ঐ বৃষ্টি আসছে। রেল-রাস্তা আর দেখা যায় না, মাঠ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে— শোঁ-শোঁ শব্দ। বট গাছ দুটোকে আবছায়ায় ঢেকে দিয়ে বৃষ্টি এসে পড়লো, আমাদের টিনের চালের উপর দ্রুত বাজনা বাজছে। মুহূর্তে মেঘের সে-চোখ-ভোলানো মন-ভোলানো রং মুছে গেছে, সারা আকাশ বিবর্ণ, আচ্ছন্ন। বৃষ্টি! বৃষ্টি! জানলা বন্ধ করে দিতে হতো, তবু বেড়ার ফাঁক দিয়ে জল

এসে ঘরের মেঝেয় রীতিমতো স্রোত বয়ে গেছে। চালের উপর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বাজনা— সে-গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি কত রাত্রে।

পুরানা পল্টনের বর্ষার রূপ কিছুতেই ভোলবার নয়; সকালবেলাকার ছেঁড়া মেঘের আকাশ, ভিজে হাওয়া, মাঠে জমে-যাওয়া জল, মাঠ-ভরা নতুন সবুজ ঘাস, আমাদের উঠোনের তুলসীমঞ্চে ঘন লতার আড়ালে ঘন-নীল অপরাজিতা, মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ। আকাশভরা সেই নরম-নীল মেঘ, সেই অশ্রান্ত, অজস্র বর্ষণ; বাইরে তাকালে মনে হতো সমস্ত সৃষ্টি যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মনে হতো, পৃথিবীর শেষ সীমা এই খানে।

আগে দুটো বটগাছের উল্লেখ করেছি; স্মৃতি যে-সব দৃশ্য জমা করে রেখেছে, তাদের সঙ্গে, দেখছি, গাছ দুটো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমাদের ছোট্ট পাড়ার ঠিক বাইরে দু-দিকে প্রকাণ্ড গাছ একাধারে সিংহদ্বার ও দ্বারপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে; জানলার কাছে দাঁড়ালেই তাদের দেখতে পেতুম। আমার মনের সমস্ত ছবির সঙ্গে অজান্তে জড়িয়ে গেছে তারা। চৈত্র মাসে তাদের তলায় কত যে শুকনো পাতা ঝরে পড়তো। হাওয়ায় সেগুলো ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে যায় পাড়াময়। বর্ষায় তাদের নতুন রূপ; জট-বাঁধা প্রকাণ্ড ঝুনো শরীরে ছোটো, কচি পাতা ঠিক যেন মানাতো না। হাওয়ার দিনে অশান্ত, অশ্রান্ত মর্মর; রোদের দুপুরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হতো প্রতিটি পাতা অসহ্য প্রাণশক্তিতে থরথর করে কাঁপছে; সন্ধ্যার শেষ সোনালি আলো গাছ দুটোর মাথায় কতদিন আটকে যেতে দেখেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সমস্ত মাঠ যখন হারিয়ে গেছে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে গাছ দুটোর পরিচিত বিশাল আকার ফুটে উঠেছে আমার চোখের সামনে— মনে ভারি আরাম পেতুম। শেষের দিকে একটা গাছে এক পাল শকুন বাসা বেঁধেছিল; বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে তাদের পাখা-ঝাপটানি আর শকুন-ছানার মানুষের মতো ডাক শুনে ভয় পেতে ভালোবাসতুম। চলে আসবার কয়েকদিন আগে শুনেছিলুম পাড়ার সব প্রবীণরা একত্র হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন গাছ দুটো কেটে ফেলবার জন্যে; তাঁদের ধারণা হয়েছে, ঐ শকুনদের জন্য পাড়ায় নানারকম ব্যাধি ছড়াচ্ছে। আমার কপাল ভালো; পুরানা পল্টনের উপর সভ্যতার এই শেষ চণ্ডালবৃত্তি অনুষ্ঠিত হবার আগেই আমি ও-পাড়া ছাড়তে পেরেছি।

২

পুরানা পল্টনে প্রথম যখন গেলুম, বয়ঃসন্ধির প্রভাবে নিজেকে আমি ভীষণ দুঃখী কল্পনা করছি, এবং রোজ দুটো-তিনটে করে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখছি। সংসার-সমাজের প্রতি সমস্ত মন তখন বিমুখ; বোহিমিয়ানিজমকে সার করেছি জীবনের। তার ফলে তিন মাসে একবার চুল ছাঁটছি; নাওয়া-খাওয়া সম্বন্ধে অনিয়মকেই করে তুলেছি নিয়ম; দিন কি রাত্রির যে-কোনো সময়ে চায়ের দোকানে সবন্ধু আড্ডাই ছিলো আমার স্বর্গ। সে-সব দোকানের কথা মনে করলে এখন ন্যক্কারের উদ্রেক হয়। কিন্তু নিয়ম-করা উচ্ছৃঙ্খলতা বেশিদিন ভালো লাগে না; সে-ঢেউ কেটে গেলো শিগগিরই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম, সেই সময় থেকে আমার মধ্যে যেন নতুন জীবন এলো। আমরা প্রায় সম্পূর্ণ দল তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র— এবং দুজন ছাড়া সবাই জগন্নাথ হলসংলগ্ন। নিতান্তই বরাত-জোরে আমি আই.এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিলুম; তার খবর যেদিন পেলাম, প্রায় সেদিনই সবাই মিলে ঠিক করা গেলো যে 'প্রগতি'; (যা এতদিন হাতে লেখে বের করতুম) এইবার ছেপে বের করতে হবে।

হিসেব করে দেখা গেলো, মাসে একশো টাকা হলে টায়ে-টুয়ে একটি কাগজ চলে। একরকম নিজেদের ভিতর থেকে সহজেই দশজন লোক পাওয়া গেলো, যারা প্রতি মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দেবে। আমি দিতে পারবো কিনা, সেটাই ছিলো সন্দেহ; আমার বৃত্তি পাবার খবরে সে-দুর্ভাবনা ঘুচলো। এই আশাতীত পুরস্কার-লাভে আমি ঈশ্বরের অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখতে পেলুম; এবার আর 'প্রগতি' না-বেরিয়ে যায় না। দারুণ উত্তেজনা, জল্পনা, আলোচনা, কিছুদিনের পরমসুখকর পরিশ্রমের পর— শেষটায় একদিন, আষাঢ়ের এক শুভদিনে পীত মলাটে উর্ধ্বমুখী নারীমুণ্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত হয়ে— সত্যি-সত্যি একদিন 'প্রগতি' বেরোলো।

শেষে কী হলো একটু বলে রাখি। প্রথম সংখ্যা কাগজ বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের দশজনের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনা-চক্রান্তে কে কোথায় ছিটকে পড়লো— পরে আর তাদের পাত্তা পাওয়া গেলো না। কেবল দুজনের কাছ থেকে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছিলুম। কিন্তু মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিকপত্রের অগ্নিসংযোগে আশ্চর্য দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো। ('প্রগতি'র যা বার্ষিক আয়, তাতে ঠিক এক সংখ্যা কাগজ ছাপা হতে পারতো।) এমন অবস্থায় মাসিকপত্রের মতো প্রচণ্ড শখ মিটতেও বেশি দিন লাগে না, অকস্মাৎ মধ্যপথে 'প্রগতি'র গতি গেলো থেমে।

সে যা-ই হোক, 'প্রগতি' বের করা আর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া একই সময়ে— একই মাসে ঘটলো। জীবন উঠলো আশ্চর্যরকম পরিপূর্ণ হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিধি এবং নানা বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতায় প্রথমটায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কাজে, হাসিতে এবং গল্পে আড্ডায়, প্রাণশক্তি খরস্রোতে বয়ে চললো নানাদিকে। প্রতি মুহূর্ত সজাগ, প্রতি মুহূর্ত মধুর। বাড়িতে আড্ডা, বিদ্যালয়ও আর-একটা আড্ডার জায়গা ছাড়া কিছু নয়। ওখানে গেলেই সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। অনেক দিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে আমি খুঁজে-খুঁজে অন্য সবাইকে বের করে এনেছি— ক্লাস থেকে, লাইব্রেরি থেকে, কমন-রুম থেকে, যাকে যেখানে পাওয়া গেছে। এমন কোনো-কোনো ছেলেকেও দলে জুটিয়ে নিয়েছি, যাদের সঙ্গে খুব বেশি আলাপও নেই— the more the merrier। প্রকাণ্ড এক দল করে আদিত্যর দোকানের সামনে ঘাসের উপর গোল হয়ে বসে চা খাওয়া— শুনেছি, আমাদের হাসির শব্দে ঐ দিককার ক্লাসগুলোতে পড়াশুনার ব্যাঘাত হতো। বাড়ি ফিরেও বিকেল থেকে অনেক রাত অবধি আড্ডা; আমার নিকটতম প্রতিবেশী এক শান্তিপ্রিয় মুন্সেফ-ভদ্রলোককে না-জেনে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা। তারপর রাত জেগে-জেগে সব কাজ করতে হতো; 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা, 'প্রগতি'র পাতা ভরাবার জন্য 'কপি' তৈরি করা, আরো নানারকম লেখা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতাম না; একটা দিন কেটে যেতো এক মুহূর্তের মতো। দিনগুলো যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি, একটু বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। বন্ধুদের ভালোবাসা, সাহিত্যে দুরন্ত উৎসাহ, নতুন সব জিনিস লেখা, কল্পনার প্রসার, বিচিত্র বাসনার জাগরণ, জীবনের উপভোগে ক্লান্তিহীন আগ্রহ— যদি কখনো একটু অবসর পেতাম, বিস্মিত মন প্রশ্ন করতো : এ কি সত্যি? এ কি সত্যি? বছর দুই সময়ের মধ্যে আমার মন সৌন্দর্যে সাহসে দুরাশায় আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো। তারপর— তার পরের কথা বলে লাভ নেই; কী যেন হলো, 'প্রগতি' উঠে গেলো, বন্ধুতার নিবিড় বন্ধনও যেন শিথিল হয়ে এলা। বাইরে থেকে দেখতে গেলে সবই সে-রকম আছে— আমার ঘরে তেমনি হাস্যমুখর

সান্ধ্য আড্ডা– তবু কী-যেন নেই, কী-যেন নেই। শুধু যেন অভ্যাস-মতো ঠাট বজায় রেখে চলেছি; প্রাণ গেছে চলে। জীবনের চাকা ইতিমধ্যেই আমাদের মনে দাগ কাটতে শুরু করেছে— আমরা শক্ত হয়ে উঠছি, স্বার্থপর হয়ে উঠছি, হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে সন্দিহান, নিজেকে গোপন রাখতে প্রয়াসী। যত সুন্দর মন নিয়েই আমরা আসি না কেন, সংসারের ছাপ তাতে পড়বেই।

অবশ্য এ নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা— এরই নাম পরিণতি। জীবনকে এড়ানো অসম্ভব; সব অবস্থায় তাকে স্বীকার করে নেয়াই ভালো। তবু আজ এ-কথা মনে না-করে পারছি না যে সে-ই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়— তা আর ফিরে আসবে না। প্রথম যৌবনের সে-উচ্ছ্বাস, সূর্যোদয়ের কমনীয় রক্তিম আভা; ভোরবেলাকার স্নিগ্ধতা, স্বচ্ছ আলো— তা আর ফিরে আসবার নয়। জানি, আমার জীবনের অনেকখানি অংশ এখনো সামনে পড়ে আছে; সিদ্ধির, কীর্তির দিক থেকে সে-অংশই প্রধান। জানি, লোকে যাকে সুখ বলে, তার আরো অনেক আমার জন্য অপেক্ষা করছে— হয়তো। কিন্তু এও জানি, সে-আনন্দ আর কখনো পাবো না, পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে যা পেয়েছি। লোকে বলে, প্রথম প্রেমের মতো কিছু নয়। তখনকার জীবনকে আমি যেমন করে ভালোবেসেছিলাম, বহুকীর্তি–উজ্জ্বল, সম্মানভারাক্রান্ত পরবর্তী জীবনকে ঠিক সে-রকম করে আর ভালোবাসতে পারবো কি? কে জানে।

বাথরুম

বড় ছোট আমার বাথরুমটা। এত ছোট যে আমার মতো স্বল্পকায় মানুষেরও মনে হয় হাত-পা ছড়াবার আর-একটু জায়গা থাকলে বেশ হতো। যদি বিধাতা আমাকে শ্রীযুক্ত চেস্টারটনের মতো আয়তন দিতেন তাহলে একদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে আমার উদর অন্যদিকের দেয়ালে গিয়ে ঠেকত এবং হাত দুটি মাত্র একটুখানি বাড়িয়ে বাকি দেয়াল দুটো আমি চেপে ধরতে পারতুম। তাছাড়া, অন্য জায়গার অভাবে বাসন মাজা ইত্যাদি ওখানেই হয়ে থাকে বলে জায়গাটা সব সময় যে আশানুরূপ পরিচ্ছন্ন থাকে তাও নয়। অপরিমিত জলপ্রবাহে মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে হয়েই আছে। শীতকালে এসে ঢোকে কনকনে উত্তুরে হাওয়া। অথচ গরমের দিনে ভ্যাপসা— স্নান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আর একবার ঘামে নেয়ে উঠি। আস্ত একটা রাজ্যের মালিক টলস্টয় একবার এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন যে মাত্র ছ-ফুট জমিতে মানুষের প্রয়োজন। আজকালকার এই ঘেঁষাঘেঁষির শহরে আমাদের অনেককেই এই টলস্টয়িক আদর্শে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এই ছ-ফুট যে জুটেছে তারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার সঙ্গে-সঙ্গে এমন দুরাশাও মাঝে-মাঝে মনে স্থান না-দিয়ে পারি না যে বাথরুমের জন্য আরো কয়েক ইঞ্চি যদি ভাগ্যে জুটত!

আমি মানুষটা কিছু মিতস্বভাবের। কল্পনায় আমার এমন উদ্দামতা যে মাত্রা ঠিক রাখার জন্য জীবনের বাস্তব স্তরে আমার কম চাহিদার ধাত। অল্প নিয়ে আমি সুখী হতে পারি। সত্যি বলতে, একটা ঘর, যেখানে বসবার আর শোবার ব্যবস্থা আছে, কিছু বই, আর অভ্যস্ত সময়ে অন্ন জল চা পেলেই আমি মোটামুটি সুখে দিন কাটাতে পারি। আমার কোনোখানে না-গেলেও চলে, কিছু না-দেখলেও চলে, বাইরের কোনো আমোদ, কোনো চিত্তবিভ্রমের বেশি প্রয়োজন হয় না। বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের উপকরণ এত বেশি এবং তার ব্যবহার অনিবার্যরূপে এত অল্প সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ যে অন্য অনেকের মতো আমারও ঘোরতর অশান্ত ও অসুখী হয়ে ওঠা কিছুই আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার এই প্রকৃতিগত সীমানা আমাকে রক্ষা করেছে। পৃথিবীর প্রহার একেবারে যে গায়ে না লাগে তা নয়, কিন্তু তা নেহাৎই চামড়ার উপর দিয়ে যায়— ভিতরে দাগ কাটতে পারে না।

তবু, মনের পাপটাও এখানে বলে রাখি। একটা জায়গায়, আমার মনে প্রকাণ্ড একটা লোভ হাঁ করে আছে। একটা জায়গা আছে, যেখানে আমার বিলাসিতার ক্ষুধা অদম্য হয়ে ওঠে— তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারি না কিছুতেই। অন্তর্যামী সবই জানেন, আধখানা কথা বলে লাভ নেই। পৃথিবীর কাছে একটা বর আমি কামনা করি, এবং সেটা কিছুতেই পূর্ণ হচ্ছে না বলে মাঝে-মাঝে একটু খারাপও লাগে।

যদি কখনো বহু অর্থ আমার হাতে আসে— সে রকম সম্ভাবনা, অবশ্য, যতদূর দেখতে পাচ্ছি, অত্যন্ত ক্ষীণ— তবু এমন যদি হয় যে আমার কোনো অপরিচিত মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি আইনের আঁকাবাঁকা রাস্তা ঘুরে-ঘুরে আমারই হাতে এসে পড়ল :

কিংবা ধরা যাক, কোনো প্রকাশক অতি ভয়ংকর যন্ত্রণাময় মৃত্যুশয্যায় হঠাৎ জ্বলন্ত নরকের দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেয়ে দেবতাকে একটা উৎকোচ স্বরূপ দিয়ে গেলেন আমার নামে ভারি চেক লিখে— নক্ষত্রের কোনো অজেয় চক্রান্ত এমন যদি কখনো হয়ই যে আমার হাতে অনেক টাকা এলো, তাহলে— তাহলে সবার আগে আমি বাড়িতে ভালো একটা বাথরুমের ব্যবস্থা করব। অন্য ঘরদোর যেমনই হোক, স্নানের ঘরে কোনো খুঁত থাকতে পারবে না। আয়তনে হবে বেশ বড়, ছোটখাটো থাকবার ঘরের মতো। পুবে থাকবে জানলা, ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে আলো আসবে; দক্ষিণে দেয়ালের অনেকটা উঁচুতে জানলা থাকবে তির্যক ছাঁদের, গ্রীষ্মকালে বায়ু সঞ্চারে বাধা হবে না। শেলফে থাকবে বই সাজান, নানা রঙের পেন্সিল। আর থাকবে এনামেল-করা বিলেতি স্নানের টব, তার মধ্যে আকণ্ঠ জলে মগ্ন হয়ে আমি কোনো কবিতার বই পড়ব কি সিগারেট খেতে-খেতে যা খুশি তা-ই ভাবব, কি বইয়ের গোড়ার দিকের সাদা কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে এমন সব ছবি আঁকব, পৃথিবীর ভূত কি বর্তমান কোনো জীব অথবা বস্তুর সঙ্গে যার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। সে-ঘরে অধিকার থাকবে না আর কারো : সেখানে আমি থাকতে পারব যতক্ষণ খুশি, যতক্ষণ আমার খুশি— পৃথিবীর বাইরে নিজেকে নিয়ে একা।

এই! শুধু এই! এ আর এমন বেশি কী? কিন্তু আমার কল্পনাকে একেবারে নিরঙ্কুশ করে দিলেও এর বেশি ঐহিক সৌভাগ্য সে আর ভাবতে পারে না। এ বেশি কিছু নয়, বিশেষ-কিছু নয়, কিন্তু কেমন করে আমি বোঝাব কী সুখী, কী আশ্চর্য সুখী নিজেকে আমার মনে হবে সেই প্রশস্ত, সুন্দর স্নানের ঘরে, সেই সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ নিঃসঙ্গতায়?

কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে এমন মানুষের মৃত্যু সাধারণত ঘটে না যার কোনো আত্মীয় নেই অথচ প্রচুর বিত্ত আছে; এবং যেহেতু প্রকাশকেরা সাধারণত এমন ধাতুতে তৈরি যাতে শেষ নাভিশ্বাসের সঙ্গেও তাঁদের বিবেকের উদ্রেক হওয়া সম্ভব নয়, আমার এই কল্পনার বাথরুম আমার জীবনে কখনো সত্য হবে না। তা যা-ই হোক, তবু যে যে-কোনোরকমের একটা দেয়ালে-ঘেরা খুপরি আছে যেখানে একেবারে একা হওয়া যায়, তার জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

কেননা মানুষকে কোনো-না-কোনো সময়ে একা হতেই হবে— আজকালকার মানুষ, যারা মোটরে চড়ি আর মোটর-চাপা পড়ি; আমরা, যন্ত্র-নির্মাতা আর যন্ত্রপিষ্ট— আমাদেরও কখনো-না-কখনো একা হতেই হবে। আর এই শহরের কোথায়— কোন দূরপ্রান্তে, কোন অখ্যাত গলিতে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে আপনি বলতে পারেন : 'এখন আমি একা'? মানুষ, মানুষ, সমস্ত জায়গাটা ভরে কিলবিল করছে মানুষ ; শহরের পরিধি ছাপিয়ে উপচে পড়ছে মানবতার জোয়ার। রাস্তায় আর বাসে, দোকানে আর পার্কে, ময়দানে আর গঙ্গার ধারে— যত দূরের, যত নির্জন স্থানেই আপনি যান না, মানুষ যদি না থাকে তো যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। অন্যের চোখের আর কানের একেবারে বাইরে চলে এসেছেন, মুহূর্তের জন্য এ-কথা মনে করবার উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তে সভ্য ব্যবহারের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে হয়; যেটা নিছক খেয়াল, যেটা নেহাৎই মনের খুশি সেটাকে প্রশ্রয় দিতে গেলেই অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করতে হবে। ধরুন, বাসে যেতে-যেতে আপনার যদি হঠাৎ গান গাইবার ঝোঁক আসে, আপনি গাইতে পারবেন না : বাজার করে ফিরতে-ফিরতে যদি এমন হয় যে আপনার পা দুটো নাচের আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল, তবু আপনাকে অতি

কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রলোকের মতো ধীরে-সুস্থে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে। আর যদি আপনি কখনো একা পথ চলতে-চলতে শব্দ করে কিছু বলে ওঠেন, তাহলে পানের দোকানের ছোঁড়াগুলো তালি দিতে-দিতে আপনার পিছন নেবে এ-আশঙ্কা খুবই বেশি।

অথচ মানুষকে গাইতেই হবে এবং নাচতেই হবে— প্রচলিত অর্থে যারা গাইতে কি নাচতে পারে না, তাদেরকেও; কখনো-কখনো আপন মনে কথা বলে উঠতেই হবে। কখনো-কখনো, সব কানের, সব চোখের, সারা পৃথিবীর নাগালের বাইরে আসতেই হবে চলে। মাঝে-মাঝে একা-হওয়া— এটা আমাদের পবিত্রতম জন্মগত অধিকার। আর সেইজন্য— সেইজন্য আজকালকার মানুষের মোটর কি রেডিও কি বছরে দু-বার চেঞ্জে যাবার ক্ষমতা— কি হাসপাতাল কি আদালত কি ইশকুল কি খবর-কাগজ কি ভিটামিন-প্রধান খাদ্য— কিছুই তত বড় প্রয়োজন নয়, যত বড় প্রয়োজন বাথরুম।

আর কোনখানে, আর কোনখানে আমরা সত্যি-সত্যি একা হতে পারি— এক বাথরুম ছাড়া? নিজেকে এমন সম্পূর্ণ করে পেতে পারি আর কোনখানে? আর কোনখানে গিয়ে সংসারের দাঁত-বের-করা মুখের উপর নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে দিতে পারি দরজা বন্ধ করে? এখানে সব ভোলা যায়– কোথায় কী আঘাত লেগেছে, গোপন কাঁটা ফুটে রয়েছে কোনখানে— আমাদের বাঁচবার যত লজ্জা, যত জ্বালা, যত তুচ্ছতার রাশিকৃত ভাঙাচোরা, গায়ের উপর দিয়ে ঝরে-পড়া জলের সঙ্গে সব যায় ভেসে, মুছে যায় শরীরের নিতান্ত উপরকার ক্লেদেরই মতো। বাঁচা এখানে অবাধ, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ : কারো মুখের দিকে এখানে তাকাতে হয় না, ভাবতে হয় না অন্য কারো কথা। এখানে— কেবল এখানেই— যা ইচ্ছে হয় তা-ই করা যায়। অন্যের অধিকারের ল্যাজ মাড়িয়ে দেবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয় না সমস্ত সভ্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল এই একটি জায়গায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার যেমন গান গাইবার অধিকার আছে, তেমনি অন্যেরও আছে সেই বেসুরো গোলমাল না-শোনবার অধিকার : অতএব মনে যখন আনন্দ উথলে উঠছে তখন মুখ বুজে থাকতে হয়। কিন্তু স্নানের সময়ে আমার পরম স্বাধীনতা : তখন আমি নিঃসংকোচে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব গলা ছেড়ে গান গাইতে পারি, কেননা মনে-মনে নিশ্চিন্ত থাকি যে দরজা ভেদ করে যদি বা এ-শব্দের একটু-আধটু বাইরে পৌঁছবার আশঙ্কা থাকে, জলের শব্দে তা চাপা পড়ে যাবেই। কেননা এটা ঠিক যে গাইতে যে পারে না, তাকেও মাঝে-মাঝে গাইতে হয়; নয়তো জীবনে হাঁপ ধরে যায়।

সারা দিন কাটে নানা কাজে আর কথায় আর ভাবনায় : অমুক তারিখের মধ্যে এটা শেষ করতে হবে : ও-কথাটা না-বললেই কি ভালো করতুম : গোড়ায় যা ভেবেছিলুম তা-ই করলে এখন এই মুশকিল বোধহয় হতো না। লোক আসে, বসে কথা বলে, চলে যায় : অদৃশ্য যন্ত্রের সাহায্যে আমি নিজেকে ঠিক প্রত্যেকের মাপসই করে তোলার চেষ্টা করি তখনকার মতো। যে আমার কাছ থেকে যেমন আশা করে, খানিকটা তেমনি হতে হয় বইকি। সারা দিনের মধ্যে আমি সত্যি-সত্যি আমি হবার সুযোগ পাই কখন— সব সময় আমার সামাজিক ব্যক্তিত্বের কোনো-না-কোনো মুখোশের মধ্যে লুকোতে হয়। যখন থাকি একা, তখনও একেবারে একা তো থাকি না; তখনও সামাজিক চেতনা লুপ্ত হয় না, তখনও থাকি পৃথিবীর মধ্যে, মানবসমাজের অংশ হয়ে; রাত্রিতে বিছানায় শুই, তখনও হঠাৎ যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে এই পৃথিবী মুখ

ভেংচিয়ে ওঠে। মনে করিয়ে দেয় এলোমেলো-নকশা-কাটা সমস্ত দীর্ঘ দিনের কথা— তারই ছেঁড়া সুতো নিয়ে আবার কালকের দিনের বুনোন।

কিন্তু যে-মুহূর্তে বাথরুমে গিয়ে ঢুকি— দরজা বন্ধ করে দিই, গায়ের কাপড়ের সঙ্গে খসে পড়ে সামাজিকতার খোলস— কী মুক্তি তখন, আর কী আনন্দ। কী মুক্তি, কী শান্তি।

আর জল ঝরে পড়ে— ছোট-ছোট স্রোতে, সূক্ষ্ম, আঁকাবাঁকা রেখায় জল ঝরে পড়ে আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে; জলে চিকচিকে শরীর নিয়ে আমি একটু চুপ করে থাকি, হেসে উঠি কী মনে করে; নিজের মনে কথা বলি— আবার পরমুহূর্তেই করি তার প্রতিবাদ। শরীরের মতো মনটাও আমার একেবারে নগ্ন— খসে গেছে প্রয়োজনের কি সংস্কারের কি সৌজন্যের সব আচ্ছাদন। যেমন সাহস করে নিজের নিরাভরণ দেহের দিকে তাকানো যায়, তেমনি আমার অবিজড়িত ও মুক্ত মনকে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিতেও আর ভয় নেই। দরজা বন্ধ আছে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, একবারের মতো সমস্ত পৃথিবীর মুখের উপর দরজা বন্ধ। যতক্ষণ আমি নিজের হাতে না খুলব, এ-দরজা কেউ ছোঁবে না। এখানে সবাই আমাকে দেবে একা থাকতে, এখানে আমি সমস্ত আক্রমণ ও সংক্রমণের অতীত : এখানে আমি একা, আমি চরম, এখানে আমি রাজা। এই তো আমার রাজত্ব— এই কয়েক ফুট ভিজে জায়গা, আমার নিগূঢ় দুর্গ— পৃথিবীর সমস্ত সম্মিলিত শক্তির এমন সাধ্য নেই ওর দেয়াল ভাঙতে পারে। লোভের দীর্ঘ, অপরিসীম দীর্ঘ থাবা এখানে আমাকে পৌঁছতে পারে না— না, লোভ পর্যন্ত না, কি মানুষের নিষ্ঠুরতা, কি মূঢ়তা, কি জীবনের যত ছোট-ছোট জিনিস প্রতিদিন আমাদের ক্লান্ত করে— আমাদের বুড়িয়ে দেয় আর মেরে ফেলে।

শত্রুপক্ষ কখনো-কখনো আমার রচনাকে বাথরুম-সাহিত্য আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মনে বাথরুম জিনিসটা নোংরামির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; এবং ও-কথা বলে তাঁরা অবশ্য তাঁদের আন্তরিক ঘৃণাই প্রকাশ করতে চান। কিন্তু কখনো-কখনো এক কথা বলতে গিয়ে আমরা ঠিক তার উল্টো কথাটা বলে ফেলি। কেননা আমার রচনা যদি বাথরুম-সাহিত্য হয়, তাহলেই প্রমাণ হলো তার কিছু মূল্য আছে। পৃথিবীর যত লেখা সাহিত্য নামের যোগ্য সবই বাথরুম-সাহিত্য। যে-লেখা বাথরুম-সাহিত্য নয় তা আপনি হাতে তুলে নিতে পারেন, চোখ বুলিয়ে যেতে পারেন তার উপর, দু-লাইন পড়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন— তার বেশি পারেন না। বাথরুম হচ্ছে সেই পবিত্র, অবরুদ্ধ মন্দির, মানুষ যেখানে নগ্ন আর মুক্ত আর নিঃসঙ্গ— সমস্ত সাহিত্যের উৎস সেখানে। কারণ, বই আমরা যদিও পড়ি ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে, পরিপাটি করে বাঁধানো— সে-বই হয়ে ওঠার জন্য দাবি করে কত ভাবনার অনির্দিষ্ট ছায়া, কত অস্ফুট গুনগুনানি, কত স্তব্ধতা, কত নিষ্ক্রিয়তা, কত আলস্য— আর কত অপব্যয়। একটা বই লেখা হয় মস্ত জায়গা নিয়ে— যতটা লেখা হয়, না-লেখা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি— আর সেই না-লেখাটাও পরম মূল্যবান। সেই না-লেখার অস্পষ্ট সমুদ্র থেকে নির্দিষ্ট ও প্রদীপ্ত মূর্তি নিয়ে যা উঠে আসে— সে-ই তো বই, বারবার পড়েও যা শেষ হয় না, প্রতিবার যা নতুন ও সদ্যোজাত। যে-লেখাটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই, উজ্জ্বল, তার আড়ালে ছিল বিশাল, অস্পষ্ট এক ছায়ালোক— কেউ তা জানে না, শুধু যে লেখে সে জেনেছে, যদিও তারও ভুলে যেতে দেরি হয় না। কত কথা তার মনে হয়েছিল— হয়তো ভালো করে মনেও হয় নি : কিছু সে ভেবেছে, হঠাৎ তার চোখে পড়েছে কোনো

কিশোরীর গালের কোমল রঙ, স্মৃতির আবছায়া সুড়ঙ্গে কী আলো উঠেছে জ্বলে— দিনের পর দিন, এই সব জমা হয়েছে তার মনে, ঝরে-ঝরে পড়ছে ঝাঁজরার ভিতর দিয়ে যেন, আর যেটুকু রয়েছে বাকি, কী জাদুতে রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করেছে তার বই। ভাবনার সব ছোট-ছোট টুকরো দু-হাতে ছড়াতে-ছড়াতে গেছে সে— শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেও জানে নি কোনটা ঝরে পড়বে শূন্যতায়, আর কোনটা ফুটে উঠবে তার লেখায় : অকৃপণ অজস্রভাবে সে ছড়িয়ে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে কত কিছু, আবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কোণে জ্বলে উঠেছে নতুন কোনো আলো, তাকে চমকে দিয়ে। আর সেই নিবিড়, গোপন ঐশ্বর্যময় অবস্থাটাকেই তো পাই— যে-মুহূর্তে আমরা বাথরুমে প্রবেশ করি। লেখকরা যদি সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করতে এবং নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন তাহলে দেখা যেত, তাঁদের সেই সব কথা, যা মনে হয়েছে যেন আগুন দিয়ে লেখা— তার অনেকগুলো প্রথম ঝলসে উঠেছিল বাথরুমের অবরুদ্ধ আর্দ্রতায়। সমস্ত লেখার যেটা নিগূঢ় উৎসস্থল লেখক নিজেও সেটা সব সময় ভালো করে জানেন না, সেটা অন্ধকারের, সেটা সংগোপনতার, সেটা বাথরুমের।

যে করেই হোক এবং যে-রকমেরই হোক, একটা বাথরুম যেন আমাদের থাকে : নানারকম যন্ত্রপাতি-খাটানো ঝকঝকে ঘর যদি না-ও হয়, অন্তত এই স্বদেশী বাড়ির অতি কৃপণ খুপরি। পৃথিবীকে নিজেদের সবখানি যেন আমরা না দিই, কোথাও এতটুকু জায়গা থাক সম্পূর্ণরূপে যেটা একার— যেখানে আমরা গান করতে পারি, আর নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারি, আর এলোমেলো ভাবার রঙিন স্রোতের দিকে মনে-মনে তাকিয়ে থাকতে পারি চুপ করে।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী

‘রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্য লেখেন।’ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এই অতিরঞ্জন ঠিক সেই ধরনের, যা বিদ্যুতের মতো সত্যকে উদ্ভাসিত করে আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে যাঁদের বলা যায় আদিসমাজ-ভুক্ত, তাঁরা এই কথাটাকে পছন্দ করবেন না, এবং যে-তরুণের দল আজকের দিনে ‘ঘরে ফিরতে’ সচেষ্ট, যাঁরা এমনকি বাংলা মঙ্গলকাব্যেই বাংলা উপন্যাসের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও কথাটা অগ্রাহ্য হবে। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করানো সম্ভব; কেননা প্রতীচীতে তাঁর পরিচয় ছিল প্রাচ্যদেশের ঋষিরূপে; পাশ্চাত্য গতিধর্মের উত্তরে শান্তির বাণী তাঁর অবদান, সত্য শিব ও সুন্দর তাঁর জপমন্ত্র। আমাদের মানতেই হবে যে, তাঁর বিষয়ে পশ্চিমের এই ধারণাতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন নি, বরং সর্বতোভাবে তার পুষ্টিসাধন করেছিলেন। তবু— ইউরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্যে একটি সত্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলে ‘প্রভাব’ শব্দটি যান্ত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : ইবসেনের ‘প্রেত’ নাটক পড়ে বানার্ড শ লিখলেন ‘বিপত্নীকের গৃহ’, এলিয়ট ভগবদগীতার ভাবানুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে হিন্দু মানসের কাছে ঋণ স্বীকার করলেন। এই রকম প্রত্যক্ষ প্রভাব বা ঋণগ্রহণ সাহিত্যের ইতিহাসে অনবরত দেখা যায় এবং যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে গবেষণা করে থাকেন তাঁদের পক্ষে এই সম্বন্ধগুলোই খনিস্বরূপ। কিন্তু অন্য এক রকমের প্রভাব আছে যা গোপন বা লুক্কায়িত, যার বিষয়ে কবি নিজেও স্পষ্ট সচেতন নন; যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অর্ধালোকে থেকে বাইরে ভেসে ওঠে না কখনো, বা উঠলেও, ডক্টরেট-ডিগ্রিপ্রার্থীদের পরিশ্রমী মুষ্টিকে ফাঁকি দেয় এবং এই সব গোপন প্রভাবই সবচেয়ে স্থায়ী ও গভীর। রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক, তাঁর কবিসত্তার যা ভিত্তি ভূমি— আমি বলতে চাই তার বড় একটি অংশ ইউরোপের অন্তর্ভূত।

জানি, তথ্যের দ্বারা এই কথাটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের তথ্যনির্ভর সমালোচনা এখনো সম্ভব নয়। যদিও তিনি আধুনিক যুগের কবি, বলতে গেলে আমাদেরই সমকালীন, তবু তাঁর জীবনী-সংক্রান্ত সাহিত্যিক উপাদান এতদিনেও কিছুই প্রায় জমে ওঠে নি। আমরা এটুকু পর্যন্ত জানি না তিনি দীর্ঘ জীবন ভরে কোন-কোন বিষয়ে এবং কী পরিমাণ পুস্তক পাঠ করেছিলেন; কোন-কোন বইয়ের শুধু পাতা উল্টিয়ে গেছেন, কোনগুলো তাঁর প্রীতিসাধন করেছে, আর কোনগুলোকে শোষণ করে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। তাঁর আত্মজৈবনিক ও অন্যান্য গদ্য রচনার পরিমাণ বিপুল, কিন্তু তার মধ্যে অন্যের প্রণীত পুস্তকের উল্লেখ আমরা অল্পই পাই এবং সাধারণত সেগুলো সংস্কৃত বা পূর্ব-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সীমিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস,

টেনিসন প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা মাঝে-মাঝে দেখা দেন তাঁর রচনায়— প্রাচীন সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের বাইরে প্রধানত শুধু এঁরাই; ইউরোপীয় কবিতার যে-একটি পঙ্‌ক্তি তিনি ক্লান্তিহীনভাবে উদ্ধৃত করেন তা, আশ্চর্যের বিষয়— কিটসের— 'Beauty is truth, truth beauty' আর তাও কাব্যের খাতিরে নয়, নন্দনতত্ত্বের একটি ফলদ সূত্র হিসেবে। *শেষের কবিতায়* ও *চার অধ্যায়*-এ জন ডান ও ইবসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটা খুব সম্ভব তৎকালীন তরুণ গোষ্ঠীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আনুকূল্যের নিদর্শনমাত্র। প্রায় একই সময়ে 'আধুনিক কাব্য' নামে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন তা পড়েই বোঝা যায় যে, টেনিসন ও ব্রাউনিঙের প্রতি অনুকম্পায়ী হলেও, পশ্চিমী নব্যসাধকদের দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন নি— বা মনোযোগের যোগ্য বলেই ভাবেন নি তাঁদের। রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতায় প্রত্যক্ষ আহরণ লক্ষণীয় বলে মনে হয়, সেখানে উনিশ-শতকী ইংরেজ কবিরাই স্মর্তব্য, 'বর্ষশেষে'র সঙ্গে 'Ode to the West Wind', বা' 'মানসসুন্দরী'র সঙ্গে 'Epipsychidion'-এর তুলনাকে অর্থহীন বলা যায় না; মানসীর 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' পড়ে ব্রাউনিঙের 'Dramatic Lyrics' মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রত্যক্ষ আহরণ ও গভীরতর প্রভাব এক কথা নয়; রবীন্দ্রনাথের সত্যকার উত্তমর্ণ পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে কারা, এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি এখনো আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ।

কিন্তু এমন হতেই পারে না যে রবীন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাস উপরিউক্ত গ্রন্থ ও লেখক কটিতেই সীমিত ছিল; নিশ্চয়ই তিনি নানা ধরনের অসংখ্য পুস্তক পড়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী কবিরা সাধারণত যা করে থাকেন, সেই আত্মোদঘাটন তাঁর স্বভাবের বহির্ভূত ছিল বলে, তাঁর আহরণের সত্য ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। পত্ররচনায় অমিতব্যয়ী হয়েও তাঁর কোনো বিশেষ কাব্যের বিশেষ প্রেরণার উৎস বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকম নীরব। আমরা জানি জ্যোতির্বিজ্ঞান, কীটবিজ্ঞান, ঔপনিবেশিক রাজনীতি— এ ধরনের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল; 'এমিয়েলস জর্নাল' নামক অধুনা প্রায় অপঠিত পুস্তকের তিনি অনুরাগী ছিলেন, গোতিয়ে-র 'মাদময়াজেল দ্য মোপ্যা' তিনি সহ্য করতে পারেন নি, 'আনা কারেনিনা' পড়তে গিয়ে প্রতিহত হয়েছিলেন, যদিও জর্জ এলিয়টের উপন্যাসের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। উত্তর-জীবনে এজরা পাউন্ড ও এমি লোয়েলের উদ্দেশে বক্রোক্তি করে, আমাদের মনোযোগের জন্য তুলে ধরেছিলেন স্টার্জ মুরকে। যদি রবীন্দ্রনাথের স্বীয় উক্তিগুলোকেই প্রমাণস্বরূপ ধরতে হয়, তাহলে এমনকি তাঁর সাহিত্যিক রুচি বিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায় নেই আমাদের। তাঁর সমকালীন ও তাঁর সন্নিকট অগ্রজ ও অনুজদের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে সত্যকার কবি ও সত্যকার নতুন কবি যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জগতের কাছে তৎকালীন প্রতীচীর বাণীমূর্তি, আমরা ব্যথিত বিস্ময়ে দেখতে পাই যে তাঁদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো উল্লেখ করেন না। বোদলেয়ার বা সুইনবার্ন, ভেরলেন বা মালার্মে, রিলকে বা ভালেরি— কেউ তাঁর কৃপালাভে কৃতকার্য হলেন না; উনিশ শতকী রুশ উপন্যাস, ফরাসি চিত্রকলা, জার্মান সংগীত— পশ্চিমী সভ্যতার এই প্রোজ্জ্বল স্তম্ভগুলোকে তিনি অম্লানভাবে উপেক্ষা করে গেলেন। ইয়েটস বিষয়ে একবার যে-ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লেখেন, তাতে ইয়েটস-এর কবিতার বিষয়ে যথার্থ গুণগ্রাহিতার কোনো পরিচয় নেই। ঐ নিবন্ধটি যেমন বন্ধুকৃত্য, তেমনি—'Journey of the Magi'-এর অনুবাদটিও কর্তব্যবোধে বা ঘটনাচক্রে সাধিত। আর এই রবীন্দ্রনাথেরই

প্রতীচীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল নিরন্তর, বিদেশ-ভ্রমণে ক্লান্তিহীন তিনি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো সমকালীন লেখক তাঁর সঙ্গে অনুবাদ, সম্পাদনা ও বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ।

আশ্চর্য স্বতঃবিরোধ, প্রায় অবিশ্বাস্য। সংবেদনশীলতায় অতুলনীয় এই কবি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— তিনি কেমন করে তাঁর সমকালীন সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলোর প্রতি এমন অবিচলভাবে উদাসীন থাকতে পেরেছিলেন? যদি বলা যায় যে তিনি আসলে ছিলেন ইউরোপীয় বা ইংরেজি হিসেবে রোমান্টিক-ভিক্টরীয় কবি, ওঅর্ডস্বার্থ-টেনিসনের সগোত্র, অতএব রুশ উপন্যাস বা ফরাসি প্রতীকীদের প্রতি অনুকম্পা তাঁর কাছে আশা করাই আমাদের অন্যায়, তাহলে প্রশ্নটিকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সুবিচার হয় না। এ-কথা তো সত্য যে তিনি ১৯৪১ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন— এবং সার্থকভাবে বেঁচে ছিলেন; উপরন্তু তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকীরণের অধ্যায়টিকে ১০৮০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে— অর্থাৎ যে-অর্ধশতক ভরে তাঁর উদ্যম পূর্ণতেজে নিঃসৃত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রতীচীর সাহিত্য নতুন প্রেরণায় উন্মুখর। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেখানে-যেখানে পুনরুক্তির বদলে সৃষ্টিশীলতা দেখা দিয়েছে, গতানুগতির বদলে মৌলিক প্রতিভা— আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই-সেই অংশ আমাদের কবিগুরুকে কখনোই যেন স্পর্শ করে নি। প্রথম যৌবনে যে-সব কবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন, প্রবীণ বয়সেও উত্তম কবির নিদর্শনরূপে তাঁদেরই তিনি স্মরণ করেছেন। এই নিশ্চলতা কেমন করে সম্ভব হলো, তা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ কি তাঁর চরিত্রের অনাক্রমণীয় অবৈকল্যের প্রমাণ, না কি তাঁর এই লক্ষণ আমাদের এ-কথা বলার অধিকার দিচ্ছে যে তাঁর প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের দিকে, পরিণতির সম্ভাবনা তাতে ছিল না?

উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হতে হয় আমাদের; রবীন্দ্রনাথ আয়তনে এমনই সার্বভৌম যে তাঁর সম্পর্কে যে-কোনো বিষয়েই মনস্থির করা দুরূহ। এই যাকে বলছি সমকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনীহা, আমরা কি নিঃসংশয়ে ধরে নিতে পারি যে সেটা তাঁর ছদ্মবেশ নয়? অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পশ্চিমের প্রতি তার মনোভাব ছিল উভমুখী; একদিকে প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে অবমানিত পরাধীন স্বজাতির জন্য তীব্র বেদনাবোধ। যেমন পরিণত বয়সে বিলেতি বেশবাস ধারণ করতে তাঁর স্বমর্যাদাবোধ এতদূর পর্যন্ত আহত হয়েছে যে তার বদলে তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন এক বিচিত্র পরিচ্ছদ, যা আধুনিককালে পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রচলিত নেই এবং যা এক ও অনন্য রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই অব্যবহার্য— তেমনি তাঁর রচনার মধ্যেও পশ্চিমপ্রীতি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি, যেহেতু ভারতের বর্তমান শোষক ও উৎপীড়কগণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী।[১] তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপির

---

[১] একবার শুধু একবার এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল; সেই ব্যতিক্রম আশ্চর্য, অর্থময় ও অবিস্মরণীয়। অসহযোগ আন্দোলনে নিখিলভারত যখন প্লাবিত, যখন প্রতীচ্য সভ্যতার 'শয়তানধর্মিতা'র সূত্র নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন, তখন, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে, স্বদেশের উত্তাল লোকমতের বিরুদ্ধে, অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের যুক্তি ও ভ্রাতুস্পুত্র গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র অগ্রাহ্য করে, নির্ভীক, নিষ্কুণ্ঠ, অবিচল ও অবিরলভাবে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন প্রতীচীর সঙ্গে মিলনের মন্ত্র। একে তখন 'দেশদ্রোহ' বলে নিন্দা করা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু অবশেষে মহাত্মা গান্ধী যে-প্রবন্ধটিতে এই 'স্বপ্নবিলাসী' উড্ডীন কবিকে নমস্কার জানালেন, সেই 'The Sentinel on the Watch tower' ও অবিস্মরণীয়।

পাতায়-পাতায় এই সচেতন বিমুখতার আমরা প্রমাণ পাই। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী যে-প্রতীচীতে দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় সহনশীলতা, গণতন্ত্র ও সর্বমানবের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি, তার প্রতি কখনো-কখনো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না-করা যদিও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তবু ঐ দিনলিপিগুলোতে তিনি অবিরলভাবে ব্যক্ত করেছেন পাশ্চাত্য দ্রুতি ও ব্যস্ততার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নিরন্তর ইচ্ছা করেছেন তাঁর বাংলার অখ্যাত নিস্তরঙ্গ গৃহকোণে ফিরে যেতে। 'কী ভালো হতো— যদি বিদেশীরা ভারতবর্ষের সন্ধানই না পেতো কখনো!'— এই রকম একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাও একবার তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যদি তা-ই হতো, যদি বিদেশীরা না-আসত, তাহলে আমাদের আকাশে রবীন্দ্রনাথ নামক জ্যোতিষ্কেরও উদয় হতো না। আর তিনি তা নিজে জানতেন না তাও নয়।

প্রচ্ছদ সরিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এক জীবনব্যাপী সংগ্রাম চলছে; একদিকে তিনি কবি, অন্যদিকে নব্যভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র; একদিকে শিল্পী ও মরমী, অন্যদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক; একদিকে সৌন্দর্য প্রেমিক, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় ও প্রতিশ্রুত শত্রু। ভারতীয় ইতিহাসের যে-লগ্নে তিনি জন্মেছিলেন, তাতে একাধারে এই দুই দায়িত্ব স্বীকার না-করে তাঁর উপায় ছিল না— এই কথাটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারি, কেন তাঁর জীবন ও সাহিত্য এমন অদ্ভুত স্ববিরোধে আক্রান্ত। যাকে আজকাল আমরা আর্ট বলি, তার ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকে স্পষ্ট হয় নি; আমাদের সে-কালের মনীষীরা ইংরেজ-ফরাসি যুক্তিবাদ ও উপযোগবাদের প্রভাবে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে বুঝেছিলেন লোকশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন; এবং রবীন্দ্রনাথ— যাঁর অর্ধেক আয়ুষ্কাল উনিশ শতকের অন্তর্ভূত, তাঁর পক্ষে সেই ঐতিহ্য-রক্ষা অনিবারণীয় ছিল। তবে বঙ্কিমের মতো লেখকের চরিত্রে আমরা অন্ততপক্ষে অখণ্ডতা দেখতে পাই, অর্থাৎ, মনোরঞ্জনজনিত লোকশিক্ষার সূত্রকে তিনি সর্বান্তঃকরণে মানতে পেরেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই অন্য এক আদর্শের সন্ধান পেয়ে, সারা জীবনে তার আহ্বান ভুলতে পারেন নি। ফলে, তাঁর রচনাস্রোত দুই ভিন্ন ধারায় নিঃসৃত হয়েছিল; তার একটিকে আমরা বলতে পারি পোশাকি, সরকারি, গণসম্মত, অন্যটি তাঁর আপন ও গোপন, তাঁর অন্তঃসার। 'রবীন্দ্রনাথ' বলতে যে-ধারণাটি ধীরে-ধীরে লোকচিত্তে গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে বাইরের দিক থেকে নিজেকে তিনি আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন; সেখানে তিনি সুস্মিত ও করুণাশীল ঋষি, ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে লালিত, শিব ও শান্তির প্রবক্তা। কিন্তু ভিতরের দিকে তিনি অস্থির ও সংরক্ত, সেখানে অন্ধকারে ঢেউ তুলছে বেদনা, দিগন্তেও নিশ্চয়তা নেই— অর্থাৎ অন্যদিকে তাঁকে 'ইউরোপীয়' বললে ভুল হয় না, ভুল হয় না উনিশ-শতকী রোমান্টিকতার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে ভাবলে। যেমন পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিবিড়, তেমনি এও সত্য যে তাঁর কোনো-কোনো কাব্যের অপূর্বতা বাংলার অথবা ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করে গেছে। বেশি আর কথা কী, শুধু মানসীর কথা চিন্তা করলেই আমরা তাঁর অভারতীয় নতুনত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এই কাব্য-গ্রন্থ— যাকে বলতে পারি তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি অণুবিশ্ব— প্রাক-রবীন্দ্র সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার সঙ্গে তুলনীয় আমরা কিছুই পাব না। ঐ গ্রন্থে এবং প্রথম ঐ গ্রন্থে, উচ্চারিত হলো বিশ্ববিষাদ, অকারণ বেদনা, বেদনাময় পুলক, ব্যক্তিগত ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার রহস্য;— এবং এই সবই, আমরা জানি, আধুনিককালে ইউরোপে উদ্ভূত হয়ে আজকের দিনে আমাদের চৈতন্যের অন্তর্ভূত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরতম সত্তা যে-

সব কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোও এমন আপাতপ্রসন্ন, এমন প্রতারকরূপে সরল, যে আমরা অনেক সময় তাদের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারি না।

একবার, কোনো-এক আনুষ্ঠানিক উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পশ্চিমী সাহিত্যপাঠের একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। দান্তে ও গ্যেটে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভাষান্তরিত কাব্য বিষয়ে অরুচি ও ভাষাশিক্ষায় চেষ্টাহীনতার ফলে, অগ্রসর হতে পারলেন না। এক জার্মান মহিলার সহযোগে কিছু হাইনে পড়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই ধৈর্য অবসিত হলো। শেক্সপীয়র পড়ে থাকলেও, সন্তুষ্ট হন নি। 'জীবনস্মৃতি'র সেই অংশ স্মর্তব্য, যেখানে ওথেলোর 'ঈর্ষানল' ও লিয়রের 'অক্ষম পরিতাপে'র উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে তাঁর যৌবনকালীন বাঙালিরা ইংরেজি সাহিত্যে যা পেয়েছিল তা 'খাদ্য' নয়, 'মাদক'; উপরন্তু, শেক্সপীয়রীয় ধরনে মানবস্বভাবের 'তলাকার পাক' উন্মথিত করা 'সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যে'র অনুগামী কিনা, সে-বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের যে সব অংশে 'সংযমের সাধনা' পরিস্ফুট হয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয়-সাধনের পরামর্শে উক্ত অংশের সমাপ্তি।

অর্থাৎ, তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই রোমান্টিকতার বিরোধী, যা তাঁর সমকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের বিশিষ্টতম চরিত্রলক্ষণ। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের ঘোষণা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, কিন্তু দেখা যাক তাঁর সাহিত্যকৃতি কী-রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর প্রথম যৌবনের অন্যতম প্রবন্ধের নাম 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' এবং হাইনের সঙ্গে *ক্ষণিকার* সম্পর্ক হয়তো একেবারে কাল্পনিক নয়, যদিও সেই চপলমতি প্যারিসপ্রেমিক জার্মান ইহুদিকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়। শেক্সপীয়রের পক্ষপাতী নন রবীন্দ্রনাথ; অথচ *চিরকুমার সভা* ও *শেষ রক্ষায়* শেক্সপীয়রীয় কমেডির বহু কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন এবং *বিসর্জন* ও *চিত্রাঙ্গদা*-র অমিত্রাক্ষরকেও বলা যায় 'শেক্সপীয়রীয়', অন্ততপক্ষে মিল্টন-মধুসূদনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। যে-কারণে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রকাশ্য অনুমোদন পেলো না, সেই 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা'র দ্বারা তাঁরই বহু বিখ্যাত কবিতা অধিকৃত। শেষ জীবনে দান্তের যে-প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, তাতে একটি কৃশ, ম্লান ইটালিয়ান মুখে আমরা যাঁকে দেখতে পাই তিনি 'নরকে'র কবি, 'দ্যুলোকে'র নন। এবং নিজের যে-সব প্রতিকৃতি তিনি চিত্রিত করে গেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত না-হয়ে উপায় থাকে না আমাদের; যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের ও জগতের পরিচিত, তাঁর কোনো লক্ষণ সেখানে নেই, কোনো চিহ্ন নেই শান্তি বা সৌম্যতার; সেখানে এক দুঃখী মানুষের মুখ কোনো-এক শঙ্কাময় অজানার আভাস দিচ্ছে। আমরা কি বলতে পারি না যে এই ছবিগুলোতে রবীন্দ্রনাথ 'ধরা পড়ে' যান?— আমাদের মনে পড়ে যায় দেবতাপ্রতিম গ্যেটের অন্তিম ও ভীষণ স্বীকারোক্তি; 'জীবনে একদিনের জন্য আমি সুখী হতে পারি নি।'

বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে যে বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকতে হলো, তা এই জন্যেই; তাঁর সত্তার যে-অংশটিকে তাঁর অতিপ্রজ লেখনী সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি, তার জন্য একটি নির্গমন-পথ সায়াহ্নকালে তিনি রচনা করে নিলেন। বুদ্ধিনির্ভর ভাষার দ্বারা যা বলা গেল না, তা প্রকাশ করলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রেখা-বর্ণের বিন্যাস ঘটিয়ে; যে এক দুঃসহ তাপ নিবারণের জন্য শরণ নিলেন সেই শিল্পের, যা তর্ক করে না, শুধু তাকিয়ে থাকে। তা-ই মনে হয় আমাদের, যখন লক্ষ করি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদিও 'সুন্দর', অর্থাৎ সুষম ও মসৃণ, অমিত রায়ের ভাষায় 'গোল বা তরঙ্গরেখা'র ধরনে, তাঁর ছবিতে ভিড় করে আসে 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনে'র রচনা, 'খোঁচাওআলা,

কোণওআলা, কাঁটার মতো'; অদ্ভুত ও বিকৃত মুখের মেলা বসে গেছে সেখানে, ভেসে উঠেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, স্বপ্ন থেকে ছেঁকে-তোলা অতিপ্রাকৃত ভূদৃশ্য, বর্ণলেপনে যেন শোণিতের রক্তিমা উপচে পড়ছে। অঙ্কনবিদ্যায় অপটুতার জন্যেই ছবিগুলোতে এই বিকৃতি ঘটেছে, এমন একটি মত উপস্থিত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু পটুতা বা অপটুতা তাঁর যতটাই থাক, তিনি কেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'ওরিয়েন্টাল স্কুল'-এর অনুগামী হলেন না, এই প্রশ্নটি বাকি থেকে যায়। এ-কথা আমরা মানতে বাধ্য যে স্বীয় পরিবার-বা গোষ্ঠীভুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ধরনে ছবি আঁকার কোনো চেষ্টা অথবা ইচ্ছে আমরা রবীন্দ্রনাথে খুঁজে পাই না; একমাত্র ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে।[২]

এমনও নয় যে ছবিতে তাঁর যে-অংশটি ব্যক্ত হয়েছে, কবিতায় তা একেবারেই প্রচ্ছন্ন। বরং বলা যায় যে ছবিতে যা প্রত্যক্ষ, কবিতায় তা অন্তর্লীনভাবে আবহমান। তাঁর যে-সব কবিতা অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে জনপ্রিয়, তাদের বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য; কিন্তু তাঁর কবিতা যেখানে শুধুই কবিতা (এবং *গীতাঞ্জলি*-কেও তার অন্তর্ভূত করতে চাই), সেখানে ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের মায়াজালের অন্তরালে আমরা অনুভব করি এক বিরামহীন দ্বন্দ্ব ও বেদনা, এক নামহীন তিমিরক্ষরণের সংস্পর্শ; সে-সব কবিতা স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথকে সেই সব পশ্চিমী কবিরই পাশে বসাতে ইচ্ছে করে, যাঁদের তিনি সরকারিভাবে 'অপছন্দ' করেছিলেন অথবা কখনো যাঁদের নাম উচ্চারণ করেন নি। আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছি না যে পশ্চিমী কবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই আমার; কিন্তু কথাটা এই যে ছাত্র বা অধ্যাপকের ধরনে 'ঘনিষ্ঠ' পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনই তাঁর ছিল না। তাঁর যৌবনের বাতাসে ছিল রোমান্টিকতা; তিনি, প্রতিভাবান, তাঁর কবিসত্তার শিকড় পর্যন্ত সেটা শোষণ করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এক কবির ওপর অন্য কবির যে-প্রভাব ঘটে, সেটা অধ্যয়নের ব্যাপার নয়, অতি লঘু ও ক্ষণিক পরিচয়ের ফলেও সেটা সম্ভব হতে পারে। শেক্সপীয়র, শুধু জনরব শুনে, সমগ্র পাশ্চাত্য পুরাকালকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। আমরা কি জানি যে আধুনিক প্রতীচী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ অভিঘাত ঘটে নি? তাঁর ব্যক্তিত্বগঠনে ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তাঁর দ্বারা নিন্দিত বা অনুল্লিখিত কবিরা কোনো অংশ নেন নি, এমন কথা ধরে নেবার অধিকার আমরা কিছুতেই দিতে পারি না নিজেদের। আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে তাঁর যৌবনকালে ফরাসি দেশের যে-সব কবি কাব্যকলাকে নতুন করে তুলছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সম্পর্করহিত। সেই তরুণ ও নতুন কবিদের কোনো লেখাই কি পড়েন নি তিনি? হয়তো অনুবাদে, হয়তো আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে, হয়তো কোনো সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির সূত্রে– কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? আমরা তো জানি যে প্রতিভার প্রজ্বলনের পক্ষে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। অন্ততপক্ষে, তাঁর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' দুটি ফরাসি কবিতার সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, যদি তিনি বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' বা র‍্যাবোর 'মাতাল তরণি' নাও পড়ে থাকেন, তবু মানতেই হবে

---

২. এই প্রবন্ধ লেখার প্রায় এক বছর পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আমার চোখে পড়ল : 'আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই– আমি যে সমান পরিমাণে ইউরোপেরও এই কথাটিরই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।'– শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, নম্বর ১৭৪, তারিখ ১৮ আগস্ট, ১৯৩০, 'দেশ', ২৪ জুন, ১৯৬১। 'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় যামিনী রায়ও বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ছবি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা।

যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় এমন-কিছু আছে যা তাঁর দ্বারা প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত কোনো ভারতীয় কাব্যে আমরা খুঁজে পাবো না। উপরন্তু স্মর্তব্য যে ঐ কবিতায় তরণীটি পশ্চিমগামী ও রহস্যময়ী নায়িকাটি বিদেশিনী। স্বদেশীয় ঐতিহ্যের কাছে ঋণগ্রহণে ও ঋণস্বীকারে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর মুখর ছিলেন, কিন্তু যদি বলি যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় প্রতীচীর কাছে তাঁর ও বাংলা কবিতার ঋণের একটি অবগুণ্ঠিত স্বীকৃতি তিনি রেখে গেছেন, তাহলে কি বড্ড বেশি বলা হবে?

১৯৬০

রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য

ব্যাকরণগত অশুদ্ধির ভয়ে যাঁরা গদ্যকবিতার নাম মুখে আনেন না, গদ্যগানের উল্লেখ শুনে তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত বেশি কাতর হয়ে পড়া স্বাভাবিক। গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা যদি বা প্রকাশিত হতে পারে, গান কি তার চিরাচরিত ছন্দ-মিলের বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতে পারে কখনো? কিন্তু প্রতিভা বস্তুটির একটি লক্ষণ এই যে তা নিয়ম মেনে চলে না, কারো অনুমতির অপেক্ষা না-রেখে কখনো-কখনো সৃষ্টি করে সেই অপূর্বকে, শাস্ত্রমতে যার সত্তাই অসিদ্ধ। কত ভিন্ন-ভিন্ন শৈলীতে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, তা চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে সম্ভবপরতার সম্প্রসারণেই প্রতিভাবান সার্থক হয়ে থাকেন। যা নিয়মিত ছন্দে-মিলে বিন্যস্ত, যা ছন্দোবদ্ধ কিন্তু মিলের কোনো বাঁধা নিয়ম মানেনি, যাতে ছন্দ মিল দুয়েরই ব্যবহার আংশিক ও অস্পষ্ট, যাতে মিল নেই আর ছন্দের আছে আভাসমাত্র— এই সব রকম গানের উদাহরণই রবীন্দ্রনাথে প্রচুর, আর সর্বশেষ এমন গানও তিনি রচনা করলেন যার ভাষা গদ্য, আর যা শুনে আমাদের আনন্দিত হবার বাধা হচ্ছে না। গদ্য-গান হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাটা যে গানই তা আমাদের অশাস্ত্রীয় হৃদয়স্পন্দনেই অনুভব করা যায়, প্রমাণের জন্য পাঁজিপুঁথির দ্বারস্থ হতে হয় না।

বাংলা গান রচনার অনেকগুলো প্রচল রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করেছেন, এই কথাটা কারোরই অবশ্য অজানা নেই। প্রথম মিলটির অনুলাপ বাংলা গানের একটি বড় নিয়ম, কিন্তু এর বিরুদ্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন তিনটি গান যা আমাদের সকলেরই চেনা : 'দুঃখের বরষায়', 'এ শুধু অলস মায়া' ও 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু'। উপরন্তু, প্রথমোক্ত গান দুটির আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো অংশই ফিরে-ফিরে গাওয়া হয় না। ছন্দ ও মিলের দিক থেকে 'আঁধার অম্বরে' মনোযোগের যোগ্য : তার যুক্তবর্ণের ঢেউ-তোলা কল্লোল, 'মদিরা' ও 'ঝটিকা'র স্বরানুপ্রাস, চতুর্থ ও অষ্টম পঙ্ক্তির মিলহীনতা— এই সবের মিলিত প্রভাব, শুধু শ্রোতার নয়, পাঠকের মনেও মোহসঞ্চার করে; যে-ভাবে, একটু টেনে-টেনে, আমরা কবিতাটি পড়ি, সুর যেন তারই উন্নত ও সম্প্রসারিত প্রকরণ। এর ঠিক উল্টো ধরনের বিস্ময় আনে 'এ শুধু অলস মায়া' : ছাপার অক্ষরে এটি একটি পরিচ্ছন্ন চতুর্দশপদী, প্রতি পঙ্ক্তির মাত্রাসংখ্যা ষোলো, মিলের বিন্যাস চতুর ও অপ্রত্যাশিত (কখকখকগঘগঘগঘঙঘঙ)[১]। কিন্তু ছাপার অক্ষরে

---

[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ষোলো মাত্রার পয়ারের ব্যবহার বাংলা কবিতায় বিরল, তার কারণ এই যে ষোলো মাত্রায় কবিতার পংক্তি ঠিকমতো শেষ হতে পারে না, কেমন টলমল করে। হয়তো সেইজন্যেই 'এ শুধু অলস মায়া'র সুর এমন চঞ্চল ও রুদ্ধশ্বাস, একটি বাক্যাংশ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই পরেরটিকে ধ'রে ফেলা হচ্ছে। রচনাটি গান হিসেবে এত বিখ্যাত যে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিলে ধৃষ্টতা হয় না যে এটি 'গান রচনা' নামে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত; এবং ঐ পুস্তকেই অন্য কয়েকটি চতুর্দশপদীতে মিলের ব্যবস্থায় তুলনীয় কৌশল দেখা যায়। যেমন, 'যৌবন-স্বপ্ন'—কখককখকখগঘগঘঙঙঘ, 'ক্ষণিক মিলন'—কখকখগঘগঘঘঙঙঙচচ।

দেখে কল্পনা করাও যায় না এর সুর কী রকম হবে, গানটি শুনতে-শুনতে যেন অন্য এক জগৎ খুলে যায় আমাদের সামনে। মিলের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম মানেননি, তেমনি ছন্দ ব্যবহারেও তিনি সাহসিকভাবে অভিনব। সুর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়েও পদবিন্যাস ছন্দোবদ্ধ হবে, এই হলো বাংলা আধুনিক গানের সর্বস্বীকৃত রূপ, এর ব্যত্যয় দেখলে আমাদের উৎসাহ কেমন ম্লান হয়ে আসে। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের সব গানে, আর অতুলপ্রসাদের অধিকাংশে, কবিতার ছন্দ অনাহতভাবে বিরাজমান। বলা বাহুল্য, গানের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বরিকভাবে পূরণ করেছেন। ক্বচিৎ কোনো ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত, আমার অনুমান 'মায়ার খেলা' থেকে 'প্রবাহিণী' পর্যন্ত, তাঁর গানগুলোতে কাব্যের ছন্দোবন্ধন শুধু যে অক্ষুণ্ন তা নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর এইজন্যে যে গানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছন্দ লেখেননি, ছন্দ সৃষ্টিও করেছেন; স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তের অনেক নতুন ভঙ্গি, মিলের অনেক সূক্ষ্ম কৌশল, অনুপ্রাসের অন্তর্লীন চাতুরী— বাংলা কবিতায় এই সব কারুকর্মের উত্তম উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আমাদের *গীতবিতানের* আর বিশেষভাবে *গীতাঞ্জলি*-পর্যায়ের— শরণাপন্ন হতেই হবে। কিন্তু তাঁর উত্তর-জীবনের সবগুলো গানকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি না; কেননা তাদের মধ্যে ব্রাত্য অনেক, ছন্দ-মিলের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা; যেমন কবিতায় তিনি এই সময়ে স্বীকার করলেন গদ্যকে, তেমনি গানকেও ছন্দ থেকে ছুটি দিলেন। হয়তো এমনও বলা যায় যে তাঁর পূর্ব ও মধ্য-জীবনের অধিকাংশ গান নির্ভুলভাবে কবিতা, এবং কবিতা বলেও (বা এমনকি কবিতা বলেই) আদরণীয়, কিন্তু উত্তরজীবনে তাঁর গান অনেক বেশি গান হয়ে উঠলো, আর সেইজন্যই তাতে ছন্দোরক্ষার আর প্রয়োজন হলো না।

গীতবিতান সর্বশেষ (১৯৬০) সংস্করণের ১০১৮ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কৈশোরক গানের উল্লেখ আছে যা 'অল্পাধিক অমিত্রাক্ষরে' রচিত। শুধু মিলের নয়, ছন্দোবন্ধন বা এমনকি ধ্বনিস্পন্দেরও অভাব দেখা যায় এই রচনাগুলোতে, ধরে নেয়া যায় যে অনভিজ্ঞতাই তার কারণ : সাহিত্যের দিক থেকে এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা আলোচ্য হতে পারে না। পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর না হোক, গানে মিলবর্জন ও ছন্দোমুক্তির প্রথম উল্লেখ্য উদাহরণ 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'। গানটির রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১৩০২। সমকালীন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা ও গানের প্রতিবেশে দেখলে এটিকে বলতে হয় আকস্মিক। কিন্তু 'নীলাঞ্জন ছায়া'র সূক্ষ্ম ও সচেতন শিল্পকর্মের সঙ্গে সমকালীন অন্য অনেক গানের আত্মীয়তা নিবিড় :

নীলাঞ্জন ছায়া,
　　প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
　　বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
　　পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
　　কান্তাবিরহ কান্তারে॥

এই ক্ষুদ্র রচনাটিকে পরীক্ষা করলে অনেক বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, এই প্রায় অমিত্রাক্ষর, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষর ('বনান্ত-সুগন্ধ-দিগন্ত'কে মিল না-

বলে বরং অর্ধ-মিল বা স্বরানুপ্রাস বলা ভালো), আট পঙ্‌ক্তির মধ্যে একটিও ক্রিয়াপদ নেই, 'মোর' ছাড়া সবগুলো শব্দই তৎসম, আর কবিতার বিচারে ছন্দোবদ্ধ একে বলা চলে না। ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ আছে, কিন্তু তাল নেই, পুঞ্জিত যুক্তবর্ণের অনুপ্রাস কানে শোনাচ্ছে ভালো, দীর্ঘ স্বরগুলো যেন দীর্ঘায়িত উচ্চারণ দাবি করছে, 'কান্তারে' শব্দের 'এ' স্বর যেন একটি অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রচনাটিকে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে দিলে।

কিন্তু, এত রকম কারুকার্য সত্ত্বেও, আমাদের মানতেই হবে যে বাংলা ভাষার একটি কবিতা হিসেবে রচনাটিকে পাঠ করা দুঃসাধ্য। এই একই ধরনের রচনা 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো', 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও তা-ই। শেষেরটিতে একটিও মিল নেই, প্রথমটিতে আছে একটিমাত্র ('হরষে-বরষে-বাতাসে-আকাশে-সুবাসে), ছন্দ উভয়েরই শিথিল; হয়তো এরা মুক্তছন্দ বা ফ্রি ভর্সের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হতে পারে, এবং এই স্বাধীনতা কবির উত্তরপর্যায়ের অনেক গানেরই চরিত্রলক্ষণ। এগুলোকে কবিতার মতো আবৃত্তি করে সুখ হয় না, যেমন হয় 'গীতাঞ্জলি'র গান আবৃত্তি করে; এরা গীত ও শ্রুত হবার জন্যই রচিত, নিতান্ত পাঠক এদের স্বাভাবিক ভোক্তা নয়; মনে-মনে পড়লেও মনে-মনে সুরটাকে টেনে নিয়ে চলতে হয়, আর সুর যদি শোনা না থাকে তাহলে পাঠক অবলম্বনহীন।

ছন্দ ভেঙে দিয়ে, মিল বর্জন করে গান রচনার এই যে নতুন রীতি, এই যে রবীন্দ্রনাথের শেষ গীতিগুচ্ছ বাণীবাহিত থেকেও সম্পূর্ণ সুরনির্ভর হয়ে উঠলো, তাঁর তিনটি নৃত্যনাট্যে এই রীতিরই বিবর্তন ঘটেছে। নাটকত্রয়ের প্রথম প্রকাশের কাল বঙ্গাব্দ ১৩৪২ থেকে ১৩৪৬ পর্যন্ত; প্রায় একই সময়ে লেখা হচ্ছিলো তাঁর প্রধান গদ্যকবিতার গ্রন্থগুলো; *পুনশ্চর* ঈষৎ পরবর্তী এরা, এবং *বীথিকা*, *পত্রপুট* ও *শ্যামলীর* সমকালীন। বাংলা কবিতার ছন্দমুক্তির প্রসঙ্গে এই তিনটি নৃত্যনাট্য ঐতিহাসিকের আলোচ্য হবে, কেননা এদের সংলাপের অংশও সুরে বাঁধা, অথচ তাতে পদ্যের বাঁধুনি নেই। অন্তত *চিত্রাঙ্গদা* ও *শ্যামায়* সংলাপ রচিত হয়েছে শুধু ধ্বনিস্পন্দন ও মিলের সাহায্যে; পদ্য নয়, গদ্যও তাকে বলা যাবে না (কেননা 'সাধু' ক্রিয়াপদ ও পদ্যোচিত ব্যুৎক্রমের অবিরল ব্যবহার হচ্ছে), মনে-মনে কিছু-একটা সুর বানিয়ে না-নিলে ছাপার অক্ষর মূক হয়ে থাকে। আসলে যা শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য তাকে নিস্তাপ অক্ষরের পথে 'পাঠকের অভিসারে' পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। *চিত্রাঙ্গদার* 'বিজ্ঞপ্তি'তে তাঁকে বলতে হলো :

> এ-কথা মনে রাখা কর্তব্য যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হ'য়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

'নৃত্যনাট্য শ্যামা'র প্রথম লেখন পরিশোধের মুখবন্ধে আবার লিখছেন :

> কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলোর শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

'অপরিহার্য?'— আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে— তিনি কি পারতেন না ছন্দ অটুট রেখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে বসাতে? অনেক আগে কি মায়ার খেলাতে তা করেন নি? আর-এক প্রশ্ন : সত্যি কি কথাগুলোতে শুধু এক 'শ্রীহীন বৈধব্য' অনুভব করছি

আমরা? কই, না তো, মনে হচ্ছে এরাও কবিত্বরসে সিঞ্চিত, ছাপার অক্ষরে পড়েও কিছুটা বিচলিত হচ্ছি না তা নয়।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবন-কুঞ্জবনে॥
এল হৃদয়-শিকারে,
এল গোপন পদ-সঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণ-বিজড়িত অন্ধকারে॥
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধন দীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে॥

হ্যাঁ, বিচলিত হচ্ছি, যাকে বলে মনে একটা 'ভাব' জাগছে, কিন্তু তার কারণ কি এই শব্দবিন্যাস, না কি আমাদের বহুশ্রুত সংলগ্ন সুরের স্মৃতি, সে-বিষয়ে মনস্থির করা সহজ হচ্ছে না। এই অংশটিকে নিতান্ত কবিতা হিসেবে গ্রহণ করলে সপ্তম ও অষ্টম পঙ্ক্তি স্বরবৃত্ত বলে স্বীকার্য হতে পারে, নবম ও দশম পঙ্ক্তির দীর্ঘস্বর দীর্ঘায়িত করে পড়লে সেখানেও ছন্দ পাওয়া সম্ভব অন্ত্যানুপ্রাস প্রচুর তা তো স্পষ্ট দেখছি, তৎসম শব্দের ভিড়ের মধ্যে 'শিকার' ও 'বেড়াজাল'-এর মতো দৈশিক শব্দের অভিঘাতও লক্ষণীয়— অথচ মোটের উপর স্বীকার না-করে উপায় নেই যে এই স্তবক পঠিত হবার জন্য লেখা হয়নি, সুরের সংযোগে গান হয়ে ওঠাতেই এর সার্থকতা। অর্থাৎ, রচনাটি গদ্য-পদ্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় দোলায়িত হয়ে আছে, সাহিত্যবিচারে এর সংজ্ঞার্থ অস্পষ্ট।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'ও এই একই পদ্ধতিতে রচিত, কিন্তু তার কোনো-কোনো অংশে গদ্য পেয়েছে স্পষ্ট রূপ, সেই কারণে আমি একে সহচর নাটক দুটি থেকে একটু আলাদা করে নিতে চাই। এর প্রথম লেখন একটি গদ্য নাটিকা, অন্য দুটি কাব্য থেকে রূপান্তরিত, এই পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। উপরন্তু, 'চণ্ডালিকার' বিষয়বস্তুটিও এক বিশেষ অর্থে মানবিক, এবং তার রচনাশৈলী বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় এতে আভরণ বিরল, পদে-পদে মিলের ঝংকার নেই, স্থানে-স্থানে পদ্য ছন্দের আভাস পর্যন্ত ত্যাগ করে গদ্যের সরলতাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ভুলতে পারেনি, 'পরিশোধ' কবিতার স্মৃতি 'শ্যামা'কে জড়িয়ে আছে, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ কোনো কালে পদ্যরূপ দেননি, নৃত্যনাট্যটি তার অগ্রজ এক গদ্য নাটিকার অনুলেখন; আর সেইজন্যই গদ্য এখানে কোথাও-কোথাও সাবলীল ও স্বাবলম্বী। পদ্য ভেঙে অপদ্য রচনা করা দুরূহ, কিন্তু টানা গদ্য ও গদ্যকবিতায়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচনাগুলোতে ব্যবধান এতটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো যে একটি পত্রকে নতুন করে সাজিয়ে তিনি 'পুনশ্চ'র 'বাসা' কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। অনুরূপ উপায়ে 'চণ্ডালিকা'ও লাভবান হয়েছে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণ উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ('চণ্ডালিকা' গদ্যনাটিকা)

সেদিন রাজবাড়িতে
বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর।

মা-মরা বাছুরটাকে
নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে।

কখন সামনে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু,
পীত বসন তাঁর।

বললেন, 'জল দাও।'

প্রাণ উঠল চমকে,
শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে।

গদ্য-কবিতা হলো কি? নিশ্চয়ই—কিন্তু সুরে বসাবার উপযোগী হয়তো হলো না, অন্তত কোনো করুণ রসের সুরের পক্ষে 'নাওয়াচ্ছিলুম' কথাটার বেড়া টপকানো শক্ত হবে। সুরের গরজে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু মাত্র পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় লিখলেন :

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা
ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।

মিল নেই, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'পদ্যের বোল' তাও শোনা যাচ্ছে না; এর মনোমুগ্ধকর সুরের সঙ্গে যদিও আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত, তবু সেই সুরের স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে— 'করাতেছিলেম' ক্রিয়াপদে মৌখিকতার অভাব সত্ত্বেও— এই অংশটিকে গদ্য-কবিতা হিসেবেই পাঠ করা সম্ভব। তাহলে বলা যেতে পারে যে এই হচ্ছে সত্যিকার গদ্য-গান। বাইরের চেহারা একেবারেই গানের মতো নয়, বিষয়বস্তু আটপৌরে, ভাষাও নিরলংকার, মনে হয় যেন মুখের কথাই গান হয়ে উঠলো[২]।

---

[২] এখানে একটি আপত্তি ওঠা সম্ভব। এই ভাষা বিদগ্ধজনের 'মুখের কথা' হলেও হতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত চণ্ডালকন্যার মুখে তা অবাস্তব। এই আপত্তি একেবারে অবাস্তব, আমি তা বলবো না, কিন্তু

সুরমন্দিরে যে-সব প্রসঙ্গের প্রবেশের অধিকার ছিলো না, একটি অস্পৃশ্যার সঙ্গে সেই অস্পৃশ্যদেরও মুক্তি দিলেন আমাদের কবি। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়গুলো বাংলা গানে ইতিপূর্বে স্বীকৃত হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলোর অবলম্বন ছিলো কৌতুক, আর পিছনে ছিলো বিলেতি মিউজিক-হল-এর উদাহরণ। প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল, আর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় দস্যুদের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ, সেই সাংগীতিক হাস্যরসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' উন্নত ও গম্ভীর ভাবের রচনা, কৌতুকের সম্ভাবনামাত্র নেই এখানে (যা 'শ্যামা'র প্রহরীর দৃশ্যে আছে); উদ্ধৃত অংশের বেদনা ছাপার অক্ষরেও ধরা পড়ে; 'স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে'— এই অত্যন্ত সাদাসিধে কথাটিও যখন কারুণ্যে গলে সুরের মধ্যে মিশে যায়, তার অভিভাবে সংক্রমিত না-হয়ে উপায় থাকবে না।

অবশ্য 'চণ্ডালিকা'য় 'সাধু' ক্রিয়াপদের ব্যবহার অবিরল; 'মোর' 'হেন', 'উথলি', 'উদ্ধারিতে' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দেরও অভাব নেই; এবং পূর্বোক্ত অংশটি সমগ্র রচনার মধ্যে ব্যতিক্রম বলেই উল্লেখযোগ্য। অন্য কোথাও এই ধরনটা নেই তা নয়, কিন্তু পুরোপুরি গদ্যের ভাষা বেশিক্ষণ বজায় থাকেনি। যেমন—

কেউ যে কথা বলতে পারেনি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
    জল দাও।
    ঐ একটু বাণী—
        তার দীপ্তি কত;
আলো ক'রে দিল আমার সারাজন্ম।
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
        সেটাকে ঠেলে দিল—
        উথলি উঠল রসের ধারা।

'উথলি উঠল' গদ্যে অসম্ভব, পদ্যেও অশোভন, ব্যাপারটা গান না-হলে রবীন্দ্রনাথ এটা লিখতেই পারতেন না। কোনোক্রমে 'উথলে উঠল' লেখা সম্ভব হলে এই অংশটিকেও গদ্য বলে আমরা মানতে পারতুম। সর্বসাকুল্যে বলা যাবে না যে 'চণ্ডালিকা' গদ্যরীতি অবলম্বন করেছে, তবে তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে এটি যে সবচেয়ে বেশি গদ্য-ঘেঁষা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'গীতবিতানে'র সর্বশেষ সংস্করণের ৯৭১ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে—'চণ্ডালিকার বহু গান সম্পূর্ণই গদ্য ছন্দে লেখা', (ফাঁক অক্ষর মূলের) এটাকে আমি সদভিপ্রায়-প্রসূত অতিবাদ হিসেবে গ্রহণ করছি, কেননা রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ছন্দে লেখা কবিতার সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র গরমিলগুলো এত স্পষ্ট যে এই উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নেয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব।

এখানে স্মর্তব্য যে 'পুনশ্চ'র 'শাপমোচন' কবিতার একটি অংশে কবি সুরযোজনা করেছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে সেটি একটি গদ্য-গান হিসেবে স্বীকার্য। নবতম সংস্করণ

'রাজা' বা 'মুক্ত-ধারা'য় জনগণের সংলাপ এই অর্থে কৃত্রিম যে তা অবিশ্বাস্য, আর 'চণ্ডালিকা' কৃত্তি শুধু এই অর্থে যে তা শিল্পিত, অর্থাৎ এখানে অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন ঘটে। চণ্ডালকন্যার মনের কথা কবি যে এখানে নিজের ভাষায় প্রকাশ করছেন তাতে কোনো অসংগতি নেই, কেননা সুরের সংযোগে জীবনের সঙ্গে একটি 'দূরত্ব' রচিত হয়েছে, যে-দূরত্ব সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত। এই দূরত্বের অভাবেই 'রাজা'য় প্রাকৃতজনের গদ্য সংলাপ এত পীড়াদায়ক।

'গীতবিতানে'র 'প্রেম' বিভাগের অনেক গানে[৩] আমি সঠিক পদ্যছন্দ খুঁজে পাইনি, পুরোপুরি গদ্য না হোক, গদ্য বা মুক্তছন্দের দিকে এদের উন্মুখতা স্পষ্ট, যদিও 'সাধু'ভাষা ও মাঝে-মাঝে মিলের ব্যবহারের ফলে অমনস্ক বা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এদের ছন্দোবদ্ধ বলে কল্পনা করা আশ্চর্য নয়।

বলা দরকার যে গদ্যকবিতা বা ছন্দোমুক্ত কবিতাও সমিল হতে পারে, মাঝে-মাঝে মিল বা মিলের আভাস থাকলেই প্রমাণ হয় না যে রচনাটি পদ্যজাতীয়। যেমন, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ন সন্ধ্যায়' গানটিতে আমরা একটি মিল অথবা অর্ধ-মিল পাচ্ছি (সন্ধ্যায়-চায়-সাধনায়-বেদনায়), 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি'তে মিল আরো স্পষ্ট, কিন্তু এই গান দুটিতে কোনো বাঁধা-ধরা ছন্দ স্বীকৃত হয়নি, 'কাব্য আবৃত্তির আদর্শে' এদেরও বিচার চলবে না। আর যে-সব গান অংশত ছন্দোবদ্ধ বা যাতে একাধিক প্রকার ছন্দের ব্যবহার আছে, বা পাশাপাশি আছে ছন্দ ও ভাঙা ছন্দ, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে-প্রসঙ্গ ধরানো অসম্ভব। শুধু কয়েকটি বিখ্যাত গান উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করি। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে[৪] কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ নেই, 'আজি ঝরোঝরো মুখর বাদর দিনে'র আট পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র চারটিতে তা খুঁজে পাওয়া যায়; 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' আগাগোড়া স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান; 'আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণ-রাতি' বা 'সঘন গহন রাত্রি'র প্রতি পঙ্‌ক্তিতে নিয়মিত পর্ববিভাগের চেষ্টা করলে যে-কোনো ছান্দসিক পরাস্ত হবেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরই এমন গান একটি অন্তত আছে, যা রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ, অথচ যাতে একটিও মিল নেই; যাকে সম্পূর্ণরূপে অমিত্রাক্ষর বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এমন একটি গানের যদি নাম করতে হয় তা— 'বিশ্ববীণারবে' নয়, 'নীলাঞ্জন ছায়া' নয়, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও নয়, তা হলো 'চণ্ডালিকা'র 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে যেমন আসে স্বপ্ন'— এই গানটি। প্রথমোক্ত রচনা দুটিতে মিল একেবারেই নেই তা নয়, দ্বিতীয়টিতে তার আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, আর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বিধিবদ্ধ ছন্দে রচিত নয় বলে অমিত্রাক্ষরের প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। মিল আছে কি নেই, এই কথাটা শুধু সেখানেই ওঠে যেখানে কাব্যছন্দ অব্যাহত; গদ্যে বা মুক্তছন্দে মিল থাকতেও পারে, কিন্তু মিলের জন্য পাঠকের কোনো প্রত্যাশা থাকে না। ছন্দোবদ্ধ রচনা, যাতে আমরা মিল আশা করি, অথচ শিল্পিতার গুণে মিলের অভাব অনুভব করি না, 'অমিত্রাক্ষর' কথাটা শুধু সেখানেই প্রয়োজ্য। আর তারই সার্থক উদাহরণ— রবীন্দ্রনাথের সুরাশ্রিত কবিতার মধ্যে— হয়তো বা একমাত্র এই 'ঘুমের ঘন গহন হতে' গানটি এবং এটি আন্তরিক মূল্যেও গরীয়ান।

---

[৩] উদাহরণ : ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪ ও ২২৫ নম্বর গান, প্রথম পঙ্‌ক্তি যথাক্রমে, 'বাণী মোর নাহি,' 'আজি দক্ষিণপবনে,' 'আমার আপন গান,' 'অধরা মাধুরী,' 'আমি যে গান গাই', 'ওগো পড়োশিনী,' 'ওগো স্বপ্নরূপিণী,' 'ওরে জাগায়ো না' ও 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল'। কোনো কোনোটি প্রায় মিলবর্জিত। হয়তো অনুরূপ উদাহরণ আরো আছে, যা আমি লক্ষ করিনি, বা এ-মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

[৪] পঙ্‌ক্তির অনুক্রম 'গীতবিতান' অনুসারে উল্লেখ করছি, যদিও— যা আসলে, অর্থাৎ ধ্বনি দিক থেকে, দুই বা তিন পঙ্‌ক্তি, তা ঐ গ্রন্থে প্রায়শই এক পঙ্‌ক্তিরূপে মুদ্রিত হয়েছে।

কাব্যরচনার দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্র-সংগীতে বৈচিত্র্য যে কত বিপুল তা আমরা গীতমুগ্ধ হয়ে সব সময় মনে রাখতে পারি না; তবু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা অসম্ভব যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় তাঁর গান যেমন একটি বড় অংশের অধিকারী, তেমনি— শুধু সুর নয়— ছন্দ ও ছন্দমুক্তির কারুশিল্পেও তাঁর কৃতি এখানে অপর্যাপ্ত। আমার বিশ্বাস, শেষ জীবনে নিরন্তর রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না-হলে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-গানের আরো স্পষ্ট ও সপ্রতিভ কোনো আকৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, ব্যাপারটা এ-রকম পদ্য-গদ্যের মধ্যবর্তী অনিশ্চয়তায় সমাপ্ত হতো না। কিন্তু এই রাস্তাটি তিনি খুলেছিলেন মাত্র, মৃত্যু তাঁকে অগ্রসর হতে দেয়নি এবং এই বিশেষ পথে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো যাত্রী নেই।

১৯৬১

স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা

[“সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মণীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন, শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল”— প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩৪৯-এ যে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র প্রকাশ-আয়োজন তার ‘ভাদ্র ১৩৪৯ প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা’র ১০নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল উদ্ধৃত ঘোষণা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের প্রথম বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তখন। পত্রিকার এই সংখ্যাতেই সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধটিতে (‘আজকাল’) জানিয়েছেন— “যখন এ পত্রিকার নাম ‘বিশ্বভারতী’, তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের পদানুসরণ করব।” শুধু তাই নয়, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় সব কটি রচনাতেই (রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা বাদে) ‘গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ’ প্রবলভাবে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথসহ যে আট লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর ‘স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা’ প্রবন্ধটি সম-সময়ের ধ্বস্ত, রণক্ষুব্ধ পৃথিবীর কঠিন অসুখের শিকড়ে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, রবীন্দ্র-নির্দেশিত পথে কীভাবে তার আরোগ্য সম্ভব তার সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছে। এখনো পর্যন্ত অগ্রন্থিত এই প্রবন্ধটি এক অন্য বুদ্ধদেবকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয়। সভ্যতার যেকোনো সংকটের কালে যে ঐকান্তিক দায় রবীন্দ্রনাথ বহন করতেন, তাঁর প্রয়াণের পর সেই দায় বহন করার শক্তি ও ক্ষমতা যে পর-প্রজন্ম অর্জন করেছিলেন, প্রবন্ধটি তা প্রমাণ করতে সক্ষম। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের এই রচনা আজকের সন্ত্রাসবিক্ষুব্ধ, সাম্প্রদায়িক, জাত-বর্ণ সমস্যা-কণ্টকিত, সংকীর্ণচিত্ত সময়েও যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবন-যাপনের ‘ঘর থেকে বাহির, যেকোনো দিকে’ তাকালেই। তাই, আমরা মনে করেছি, অগ্রন্থিত এই রচনা পুনরায় মুদ্রিত হওয়া উচিত আজকের জটিল সময়ের দাবি মেনেই।]

কোনো-এক জার্মান দার্শনিক বলেছেন, স্বাজাতিকতার গর্ব তাকেই মানায় নিজের মধ্যে যার গর্ব করবার মতো কিছুই নেই। যার নিজের মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ আছে, সে নিশ্চয়ই ঘৃণা বোধ করবে এমন কিছু নিয়ে গর্ব করতে, লাখ লাখ লোক যার সমান অংশভাগী।

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। স্বজাতিবোধের গৌরব সকল ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। সাধারণ মানুষের অহমিকা থেকে তার জন্ম, কাল্পনিক ইতিবৃত্ত আর মেকি বিজ্ঞান তার সহায়। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে শুরু করে মহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি, আর এর ভয়াবহ ফলাফলের তো আজ আমরা প্রতক্ষ্যদর্শী। দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক লোকই আমরা দেখতে পাই যাদের মগজ কোনো-না-কোনো সমষ্টিগত গর্ববোধে ঠাসা, যার উত্তেজনায় ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যার ভেদ তাদের কাছে লুপ্ত। কেউ তাঁর নিজের বংশটিকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেনে নিয়ে পরম আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন; তাঁর সঙ্গে যে বিষয়েই আলাপ করুন না, স্বীয় বংশকৌলীন্যই তাঁর শেষ যুক্তি। কেউ বা বলবেন, ‘আমরা অমুক জেলার লোক, গান-বাজনার কিছু-কিছু বুঝি।’ অন্য কারো মুখে হয়তো শোনা যাবে যে তিনি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলেই তর্কবিদ্যায় পারদর্শী। কারো গর্ব তিনি

হিন্দু, কেউ আবার হিন্দু নন বলে ঠিক একইরকম গর্বিত। বাঙাল বলে অনেকে বুক ফুলিয়ে বেড়ান, আবার পশ্চিমবঙ্গীয় মর্যাদাবোধই অনেকের সম্বল। আমরা বাঙালিরা গত একশো বছর ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে চারদিকে খুব দম্ভ প্রকাশ করে বেড়িয়েছি, তারপর আজ যখন অন্য প্রদেশের লোকের মনেও স্বজাতিবোধ জেগে উঠেছে তখন আমরা অবাক হয়ে বলছি, 'আরে এ কী কাণ্ড! উড়ে মেড়ো খোট্টা— এরাও যে আবার কথা বলে।'

বলা বাহুল্য, এত রকমের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ববোধ সত্য হতেই পারে না। গুণ জিনিসটা কোনো শ্রেণীতে বা জাতিতে আবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক কিংবা জাতিগত কারণে মানুষে মানুষে মনীষার তফাৎ কতটা হয় এ-প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞান আজও করে উঠতে পারেনি। বরং আজকাল এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে এমন অনেক প্রভেদ, যা এতদিন প্রাকৃতিক বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তার কারণ আর-কিছুই নয়, শুধু সুযোগ-সুবিধার অসমান বিতরণ। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি শ্রেষ্ঠ কিছুদিন আগেও এ-বিষয়ে লোকের মনে সংশয় ছিলো না, অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে এ-শ্রেষ্ঠতা বিধাতারই অলঙ্ঘনীয় বিধান। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যখন অব্রাহ্মণের দক্ষতা কিছুমাত্র কম নয়। তেমনি আজও যারা এ-দেশে শূদ্র বলে গণ্য তারা যখন সমান সামাজিক অধিকার পাবে, তখন তাদেরও মধ্যে গুণী বিদ্বান বরেণ্য ব্যক্তির আবির্ভাব যে হবেই এ-ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে দৈবজ্ঞ হতে হয় না। বুদ্ধি জিনিসটা আলো-হাওয়ার মতো মানুষমাত্রেরই উত্তরাধিকার, অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য অনুসারেই জাতিতে জাতিতে প্রভেদ হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাভাবিক প্রভেদ থাকে; কিন্তু কোনো-এক সমষ্টির সঙ্গে অন্য কোনো সমষ্টির প্রভেদ অনিবার্য স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে এ-কথা কোনো যুক্তিসম্পন্ন মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, কেন না জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করলে বৈষম্যের বাস্তব কারণ সহজেই বেরিয়ে পড়ে।

মানুষ যে নিজেকে কত মিথ্যা সংস্কারে, কত কৃত্রিম অনুশাসনে শত ভাগে বিভক্ত করেছে, ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বর্ণ, জাতি, ভূগোল, ধর্ম, উপধর্ম— শেষ পর্যন্ত জেলা, গ্রাম, পৈতৃক বংশ, এই বিভাগের কত যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রশাখা তার যেন আর অন্ত নেই। এবং এই ভেদবুদ্ধি দুর্বল মনেরই আশ্রয়। নিজেদের সম্বন্ধে আর কিছুই যাঁদের বলবার নেই, তাঁরাই স্বজাতি কিংবা স্ববংশের গৌরবে স্ফীত হয়ে যথাসম্ভব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই গৌরবের সুবিধে এই যে এতে প্রমাণের দায় নেই। আমি যদি বলি, 'গণিতশাস্ত্রটা আমি কিছু-কিছু জানি', তাহলে তার প্রমাণ দাখিল করবার দায়িত্বটা আমরাই; কিন্তু, 'আমাদের বংশে সকলেরই অঙ্কে খুব মাথা'— এ-কথা বলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তার প্রমাণস্বরূপ বক্তাকে দুটো ক্যালকুলাসের অঙ্কও কষে দেখাতে হয় না। 'আমি খুব উদার' এ-কথা বললে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি হয়তো হাতেহাতে উল্‌টোটা প্রমাণ করে দেবে; কিন্তু, 'হিন্দুধর্ম খুব উদার এবং আমি হিন্দু', এ-কথা খুব সহজে বলবার কোনো বাধা নেই, কেন না বক্তা যে হিন্দু তা তো সকলকে মানতেই হবে, আর হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করবে তাদের বিধর্মী ও দেশদ্রোহী বলে গাল দিলে অন্তত এক দলের কাছে বাহবা পাওয়া সম্ভব।

অবশ্য এ-ধরনের মনোভাব আজকাল আমাদেরও শিক্ষিত সমাজে নিন্দিত, একে আমরা সাম্প্রদায়িকতা নাম দিয়েছি এবং মুখে অন্তত এ-কথা প্রচার করে থাকি যে সাম্প্রদায়িকতা বর্জনীয়। মনে মনে আমরা অনেকেই এখনো কোনো-না-কোনো ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার বশ, কিন্তু প্রকাশ্যে যে তার নিন্দা করে থাকি এটুকুই ভালো। বিশ শতকের

গোড়া থেকেই আমরা বিবিধ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি এবং পশ্চিমের অনুসরণে স্বাজাতিকতা বা ন্যাশনালিজমকে করে তুলেছি আরাধ্য। সকলের মনে ন্যাশনালিজমের আবেগ সঞ্চারিত করতে পারলে ক্ষুদ্র ভেদগুলো লুপ্ত হবে এই ছিলো আমাদের আশা। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের কণ্ঠ ছাপিয়ে ফেনিল হয়ে ঝরেছিলো স্বজাতিবোধের তীব্র নবীন সুরা। পাশ্চাত্য ন্যাশনালিজমের প্রকৃত স্বরূপটি যে কী তা সে-যুগে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না, অন্তত কাগজে-কলমে তার কোনো প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিলো ন্যাশনালিজমে প্রীতিকর মুখোশের অন্তরালে ইম্পিরিয়ালিজমের বিকট মুখ-ব্যাদন; বিশ শতকের আরম্ভেই লেখা 'জন চিনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাই। স্বদেশী আন্দোলনের যেটি ভাবের দিক, প্রেমের দিক, তাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বাণী গানে-গানে বইয়ে দিয়েছিলেন দেশের লোকের প্রাণে। কিন্তু ও-আন্দোলনের আর-একটি দিক দিক ছিলো যার মূল বিদেশী-বিদ্বেষে, মানুষে-মানুষে নতুন ভেদ রচনায়। এ দিকটিতে যে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই আস্থা ছিলো না তা বুঝতে পারি 'ঘরে বাইরে' পড়লে। বিদেশি ইম্পিরিয়ালিজমকে তাড়িয়ে তার গদিতে স্বদেশী ন্যাশনলিজমকে অধিষ্ঠিত করলে তারও বিপদ আছে— কেন না উগ্র স্বাজাতিকতা সুযোগ পেলেই নিদারুণ সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। এ-পরিণতি কেমন করে ঘটে এবং একবার ঘটলে তার ফল কী সর্বনাশা হয় আধুনিক ইতিহাসে তার উদাহরণের অভাব নেই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে দেশপ্রেম ও স্বাজাতিকতার প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দেশপ্রেম মানুষের একটি স্বাভাবিক সুন্দর বৃত্তি, তাতে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা আছে কিন্তু বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আর স্বাজাতিকতায় আছে আত্মম্ভরিতা, তার মধ্যে বিদেশের প্রতি বৈরীভাব কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকট। যতদিন তা প্রচ্ছন্ন ততদিন 'শান্তি'র সময়, অর্থাৎ ততদিন যুদ্ধের আয়োজন শুধু চলে, আর যখন প্রকট হয় তখনই যুদ্ধ বাধে। মানুষ যেমন তার মা-কে, তার নিজের বাড়িটিকে ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসে তার স্বদেশ, স্বদেশের জল হাওয়া আকাশ গাছপালা। কিন্তু কোনো সুস্থ মানুষই বলে না যে তার মা পৃথিবীর সমস্ত নারীর মধ্যে সব চেয়ে মহীয়সী, কিংবা তার বাড়ি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ। নিজের মা যা-ই হোন, তাঁর প্রতিই আমাদের হৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়; ক্ষুদ্র হোক, জীর্ণ হোক নিজের বাসস্থলের প্রতি আমাদের প্রাণের সহজ মমত্ববোধ। এ-ভালোবাসার এমনিই প্রকৃতি যে অপর ব্যক্তির মা-কেও আমরা স্বতঃই শ্রদ্ধার চোখে দেখি এবং বন্ধুর গৃহে অতিথি হয়ে তাঁর স্ববাসপ্রেমের অংশীদার হতে আমাদের বাধে না। সত্যি যেটা স্বদেশপ্রেম সেটাও এই জাতের বৃত্তি। তার প্রভাবে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ শুধু যে নিজের দেশকে ভালোবাসি তা নয়, কোনো বিদেশি যে তার স্বদেশকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসাকেও ভালোবাসি। স্বাজাতিকতায় এ-জিনিস সম্ভব নয়, তাতে অন্য-সকলের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার ভাবটা আছেই। আমার দেশ সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে সুন্দর, আমরাই বিধাতার নির্বাচিত জাতি— এ-কথা বারবার আওড়াতে-আওড়াতে চোখ লাল হয়ে ওঠে, রক্তে নেশা ধরে, আর তখন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রসার-সংকল্পে সুদূরপ্রসারী 'অসভ্য' জাতিদের সর্বনাশসাধন মনে হয় মহাপুণ্য, প্রতিবেশীদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ হয়ে ওঠে রাজকর্মের প্রধান প্রেরণা। নিজের বাড়ি ভালোবাসি বলে যদি আর-পাঁচজনের বাড়ি জোর করে দখল করতে যাই তাহলে লোকে আমাকে পাগল ছাড়া কিছু

বলবে না, কিংবা বড়জোর আমি ডাকাতের দলে নামজাদা হয়ে উঠবো; অথচ দেশাত্মবোধের নাম করে অপরের স্বদেশকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যে যেতে পারে, কিছুকাল অন্তত পৃথিবীর অনেক লোকের চোখেই সে হয়ে ওঠে বীর, দেশত্রাতা, মহাপুরুষ! ব্যক্তিগত জীবনের ছোট গণ্ডিতে যে-জিনিস নৈতিক বিচারে অবশ্য দুষ্য, সমষ্টিগত জীবনে তারই প্রকাশ যখন অত্যন্ত বৃহৎ, এমনকি অত্যন্ত বীভৎস হয়ে দেখা তখন তাকে বাহবা দেবার লোকের অভাব ঘটে না, মানবচরিত্রের এ এক অদ্ভুত অসঙ্গতি। 'আমার মা-র মতো মা আর জগতে নেই, তিনিই বিশ্বের চরমতম মা'— এ-কথা যদি কেউ মুখে বলে কিংবা এই মর্মে কাব্যরচনা করে, সভ্যসমাজের চোখে সে-ব্যক্তি হবে অতীব হাস্যকর, কিন্তু নিজের দেশ সম্বন্ধে অনুরূপ ভাববিলাসিতা লোকে যে শুধু ক্ষমা করে তা নয়, তার মোহে অন্ধ হয়ে হত্যার পথে ধ্বংসের পথে দলে দলে ধাবিত হয় এ তো আজ চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে। আমার স্বদেশ সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবে, এটাই বিধাতার ইচ্ছা, এ-রকম ভ্রষ্টবুদ্ধি ভাবালুতা যখন কাব্যে সাহিত্যে আবিল হয়ে ওঠে, তখন সব পাঠকই হো-হো করে হেসে ওঠে না, এমনকি দেশমাতৃকাকে যখন রক্তপায়িকা নরমুণ্ডলুব্ধা 'দেবী' রূপে কল্পনা করা হয় তখনও তার প্রতিবাদে খুব বেশি কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। নৈতিক বিচারের কথা ছেড়েই দিলুম— কিন্তু নিছক মূঢ়তা সংঘবদ্ধ মানুষ যে কতখানি সহ্য করতে পারে— শুধু তা-ই নয়, সেই মূঢ়তার দাসত্ব করে নিজের সর্বনাশ ঘনায়— তা ভাবলে আজকের দিনেও অবাক না-হয়ে উপায় থাকে না।

স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাতিকতার এই প্রভেদ খুব সত্য একটা জিনিস, কিন্তু অনেকের কাছেই এ-প্রভেদ স্পষ্ট নয়, অনেকেই মনে করেন ও-দুই একই বস্তু। তার ফলে আমাদের চিন্তায় ও কর্মে অনেক ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। 'জনগণমনঅধিনায়ক' স্বদেশপ্রেমের আনন্দধ্বনি, 'রুল ব্রিটানিয়া' স্বাজাতিকতার উচ্চ নিনাদ। আজ জাপান যে লড়াই করছে তার মূলে আছে অতিস্ফীত স্বাজাতিকতা, যার অন্য নাম ইম্পিরিয়ালিজম; কিন্তু চীন যে অনাহূত অতিথিকে বাধা দিচ্ছে সেটা তার দেশপ্রেমরই ব্যঞ্জনা— আজ যে কোনো চীনের মুখের দিকে তাকালে আমাদের মরা প্রাণেও উৎসাহ জাগে, এমন দীপ্তি তার মুখে, এমন দৃঢ়তা তার চোখে— তার দেশের যে হাওয়া তাকে প্রাণ দিয়েছে; সেই হাওয়াটিকে সে বাজাবে— তার শক্তির প্রেরণা তার নিজেরই প্রাণে। দুপক্ষের যুদ্ধের প্রকৃতিগত পার্থক্যটা আমাদের পক্ষে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা দরকার।

আজকের এই প্রলয়ের পিঙ্গল আলোয় খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা গেলো যে স্বাজাতিকতা বড়ো আকারের সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়। ন্যাশনালিজম— এই জাদুমন্ত্রের আড়ালে লুকোনো ছিলো যত হিংসা যত হীনতা যত ব্যভিচার আজ তা উলঙ্গ নির্লজ্জতায় সমস্ত ভূলোক ছারখার করে বেড়াচ্ছে। গত যুদ্ধের পর পূর্ব ও পশ্চিমের নানা রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথ এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই তাঁর নিতান্তই অযোগ্য কিন্তু নিতান্ত প্রিয় মনুষ্যজাতিকে সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই বাণী সাম্রাজ্যলোভীর কানে মধুবর্ষণ করেনি। কবির কথায় কাজের লোকেরা কর্ণপাত করে না— করলে কি পৃথিবীর এ-দৃশ্য হতো!— তাই যে রণক্লান্ত জার্মানি রবীন্দ্রনাথের বাণীকে গভীরতম শ্রদ্ধা নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছিলো সেই জার্মানিতেই স্বজাতিবোধের উন্মত্ততা পৈশাচিক হয়ে উঠলো। যাকে ফ্যাসিজম বলা হয় সেটা তো আর-কিছু নয়, স্বাজাতিকতারই চরমদশা— এবং মরণদশা। যে-সমাজনীতি ও রাজনীতি পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, যার ধ্বংস আসন্ন ও

অনিবার্য, তাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখবার শেষ প্রাণান্তকর যে-চেষ্টা, ইটালির ভাষায় তাকেই বলে ফ্যাসিজম্ আর জার্মানির ভাষায় ন্যাশনাল সোশ্যালিজম। এই আসুরিক প্রচেষ্টায় নাৎসি জার্মানি শুধু যে যন্ত্রপাতি বোমা-বারুদ আর যুযুধান অক্ষৌহিণী ব্যবহার করছে তা নয়, হত্যাকারী স্বাজাতিকতার সমর্থন-স্বরূপ মেকি বিজ্ঞান ও মেকি দর্শনও সৃষ্টি করেছে। 'জোর যার মুলুক তার' এই বর্বর নীতিই সেই 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞানে'র সারকথা। ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা করে নাৎসিরা বলছে যে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় হয়, অতএব দূর হোক ইহুদি, কালো ব্রাউন হলদে মানুষেরা উচ্ছন্নে যাক, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর্ডিক মানুষের গোলামি করে অন্য সব মনুষ্যাকৃতি জীব জীবন ধন্য করুক। নর্ডিক মানুষ অথবা তথাকথিত আর্যজাতির শ্রেষ্ঠতা 'প্রমাণ' করতেও অনেক পাণ্ডিত্য ঝরেছে, তবে তার শ্রেষ্ঠ যুক্তিটা বোধ হয় নাৎসি বেয়নেট, যা আজ পৃথিবীর বুক এ-পিঠ ও ও-পিঠ ফুঁড়ে দিয়েছে। দ্যাখো, কেমন আমাদের জোর, অতএব আমরা যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ কী! দেখতে পাচ্ছি জোরটা সত্যি ভয়ানক, সেজন্যই সন্দেহ করি এ টিকবে না, এ জীবন সংগ্রামের অযোগ্য।

'Survival of the fittest' বলতে কি এটাই বুঝবো যে সব চেয়ে যার গায়ে বেশি জোর তারই জয় হবে? তাহলে সেই সব অতিকায় জন্তু, নখদন্তে যারা আরক্তিম, যারা দুঃসীম পশুশক্তির তেজে পৃথিবীর নরম মাটিতে একদা প্রচণ্ড তোলপাড় তুলেছিলো, তারা কেন জীবনে নাট্যশালা থেকে বিলুপ্তির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, আর সেই মানুষই বা কেন পৃথিবীর রাজা হয়ে বসলো যে আকারে ছোটো, নখদন্তে অতি দুর্বল, ক্ষীণ চর্ম নিয়ে রোদে বৃষ্টিতে শীতে একান্ত অসহায়? যোগ্যতম বলতে তাকেই বোঝায় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সব চেয়ে ভালো করে যে আপন জীবনের ছন্দ মেলাতে পারে, যে তার পৃথিবীকে সঙ্গতির সূত্রে নিজের সঙ্গে বেঁধেছে। এই ছন্দোবন্ধনে মানুষ জীবকুলের মধ্যে সব চেয়ে কৃতী বলেই আজ এ-পৃথিবী তারই রাজত্ব। প্রকাণ্ড জানোয়ারগুলোর গায়ের জোর ছিলো, ছন্দের জোর ছিল না, তাই বিশ্বসৃষ্টির কারখানায় তারা বাতিল হয়ে গেলো। দেখা গেলো, এ-জিনিস চলে না। তেমনি আজকের দিকের উন্মত্ত স্বাজাতিকতার রক্তলিপ্ত স্ফীতকায় মূর্তির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায় যে এর বিনাশ আসন্ন। এও সেই আদি যুগের বিপুলায়তন ভীষণ জন্তুর মতো; তেমনি জোরালো, তেমনি অসঙ্গত। পদে-পদে তার তাল কাটছে, যা-কিছু সে করে তা-ই ছন্দ-ছাড়া। স্বাজাতিকতার প্রেরণায় প্রত্যেক জাতি যদি অন্য প্রত্যেক জাতির উপর প্রভুত্ব করতে চায় এবং সে-উদ্দেশ্যে রক্তস্রোত বইয়ে দিতে প্রস্তুত হয়, তাহলে তার কুৎসিত মাৎলামির বেতালা বিশৃঙ্খলায় মনুষ্যজাতির অস্তিত্বই হয়তো সংশয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসে এটাই বারবার দেখা যায় যে ছন্দোচ্যুতি মানুষ বেশিদিন সইতে পারে না। কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিজেরই পক্ষে দুঃসহ দুর্দশার সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত সে যে ছন্দের অনুবর্তিতায় ফিরে আসে তা থেকে এটিই বোঝা যায় যে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবার দিন মানুষের এখনো আসেনি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না, এবারেও সে ফিরবে ছন্দের পথে, সঙ্গতির পথে।

ইতিমধ্যে দুর্দান্ত স্বাজাতিকতার রক্তাক্ত জয়যাত্রার দৃশ্যে কেউ বা সম্মোহিত কেউ বা নিতান্ত হতাশ হয়ে বলছেন যে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে এটাই বিশ্ব-বিধান, এ নিয়ে আক্ষেপ নিষ্ফল, প্রতিবাদ বৃথা, আর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে বাধ্য। অতএব যতদিন দুর্বল আছো মুখ বুজে চুপ করে সহ্য করো, যদি কোনোদিন প্রবল হয়ে উঠতে পারো, তুমিও দুহাতে লুঠতরাজ করবে, কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস

পাবে না। জঙ্গলের জানোয়ারদের মধ্যে যেমন যে যাকে পারছে তাকেই খাচ্ছে, তার মধ্যে কোনো বিধি-ব্যবস্থা নেই, মনুষ্য-সমাজও সেইরকম, সেটা মেনে নেয়াই ভালো। এ-সব বুলি অবশ্য নাৎসি 'দার্শনিক'রাই জগৎকে উপহার দিয়েছেন এবং কথাগুলো বেশ চটকদার তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত কি জাতিগত স্বার্থের মাৎলামিতে যার বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি এমন লোকের পক্ষে এ-সব কথা মেনে নেয়া অসম্ভব। অরাজকতার অতল অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে-খেতে মনুষ্যজাতি পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে এবং চিরকাল তাই খাবে, কেননা সেটাই নিয়ম— এই কল্পনায় এত নৈরাশ্য এত ভীরুতা, মনুষত্ব বলতে যা-কিছু বুঝি তার এমনই চরম পরাভব যে বুদ্ধির আলো যাঁদের মনে এখনো জ্বলছে তাঁরা তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক বিচারেও এ-কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা, কেন না সমগ্র বিশ্ব-বিধানে যে একটি অটুট শৃঙ্খলা আছে এ-কথা ছেলেমানুষেও বোঝে; জঙ্গলের জানোয়াররাও জীবনের ছন্দ মেনে চলে, তাদের দুর্দান্ত জীবনসংগ্রামের অন্তরালে একটি পারস্পারিক সহনশীলতা ও শান্তির স্রোত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। যেখানে ভীষণ বিষাক্ত সাপের নিঃশব্দ চলাফেরা সেই প্রান্তরেই নববর্ষার শ্যামায়মান ঘাসে টুকটুকে লাল নরম মখমল-পোকা তাদের ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষণিক আনন্দটুকু আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয়— প্রকৃতির বিশাল লীলাভূমিতে দুটোই সত্য, দুটোই সার্থক। জীবজগতে মারামারি খাওয়া খাওয়ির কথাটাই যদি একমাত্র সত্য হতো তাহলে জানোয়ররা এতদিনে পরস্পরকে নিশ্চয়ই নিঃশেষ করে দিতো, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য এই যে তারা সকলেই বিশাল জীবনের সমান অংশীদার, যে যার রাজত্বে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকে কেউ কাউকে সরাতে পারে না— আর সেজন্যেই জীবজগতে এমন অফুরন্ত বৈচিত্র্যস্রোত আজ পর্যন্ত প্রবাহিত। সরে পড়াতে হয় শুধু তাদেরই যারা হঠাৎ অত্যন্ত অসংগত ও বিসদৃশ হয়ে ওঠে, তা ছাড়া সকলেরই জায়গা আছে।

তা ছাড়া পশুর সঙ্গে সভ্য মানুষের তুলনাটা মূলতই ভুল। এ-তুলনা পশুর পক্ষে অপমানকর এই রসিকতাটা আজ অত্যন্ত পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু এ-কথাও তো সত্য যে পশুর লোভ নেই, সে ক্ষুধার তাড়নায় মারে, 'আত্ম-সম্প্রসারণের মহৎ ব্রত' উদ্‌যাপনে লাখ লাখ আত্মজাতি হত্যা করে না। তেমনি এও সত্য যে পশুর বুদ্ধি নেই, বিচারশক্তি নেই, সে তার প্রবৃত্তির অদম্য তাড়নায় অন্ধের মতো চলে, সে একেবারেই প্রকৃতির দাস; কিন্তু মানুষ তার প্রবৃত্তিকে বাঁধতে শিখেছে, তার বুদ্ধি তার কল্পনা তার যুগ-যুগ-সঞ্চিত জীবন-সাধনা দিয়ে পদে-পদে প্রকৃতিকে জয় করেছে— তারই নাম সভ্যতা। এই সভ্য মানুষ যখন পাশবিকতার ভজনা করে তখন সে পশুর চেয়েও ঢের বেশি পাশবিক হয়ে ওঠে, কারণ তাতে সে প্রয়োগ করে তার আশ্চর্য বুদ্ধি যা তার মানবমহিমারই উত্তরাধিকার। এই মানুষী পশুত্ব যদি কখনো আপাতবিজয়ী হয় তাহলেই কি সঙ্গে-সঙ্গে বলতে শুরু করবো যে সভ্যতা মিথ্যা, পশুত্বই চরম সত্য, শৃঙ্খলার সাধনা ভাবালু বিলাসিতা মাত্র এবং অরাজকতাই মুক্তি? না কি এই কথাই বলবো যে যেমন করে হোক, সভ্যতাকে বাঁচাতেই হবে, ফিরিয়ে আনতেই হবে জীবনের ছন্দ, মানুষের মধ্যে যা সব চেয়ে বড়ো গড়ে তুলতে হবে তার সব চেয়ে অনুকূল পরিবেশ? সমগ্র মনুষ্যজাতি আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন। মানুষের মধ্যে এখনো যে কেউ-কেউ আছেন যাঁরা সভ্যতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেন নি তা দেখেই আশা হয় যে আজকের এই সংকট মনুষ্যজাতি উত্তীর্ণ হতে পারবে। তাঁরা কারা? তাঁদের কোনো জাতি নেই, বংশ নেই, গোত্র নেই— ধর্ম যদি কিছু থাকে তো মনুষ্যধর্ম। তাঁরা পৃথিবীর

সব দেশের গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, জীবনের পূর্ণতা যাঁদের তপস্যা, সংস্কৃতি যাঁদের সৃষ্টি। সংস্কৃতি জিনিসটাই বিশ্বমানবিক, তা ইতিহাস ভূগোলের কোনো সংস্কারই মানে না, তার হৃদয়ে সকলেরই আমন্ত্রণ, তার ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। স্বাজাতিকতার সঙ্গে তার মৌল বিরোধ। তাই যে-সব দেশে স্বাজাতিকতা আজ দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে সংস্কৃতি ক্ষত-বিক্ষত, অপমান মনীষীর পারিশ্রমিক। কিন্তু এমন কোনো অত্যাচার নেই যা মানুষের এই অমূল্য সৃষ্টিকে বধ করতে পারে। হিংসার দুরন্ত উত্তেজনা পার হয়ে তার হাওয়া দেশে দেশে মানুষের হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কারো কারো প্রাণে এই সহজ সত্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে সত্যি তো মানুষে-মানুষে মিলনের কোনো বাধা নেই— যাকে বলি জাতি সে একটা কথামাত্র। যাকে পর ভেবেছি সে যখন আপন হয় সে বড় আশ্চর্য। ব্যক্তিগত জীবনে এ-অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই হয়, অনাত্মীয়, বিদেশী, বিধর্মীর সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ে ধন্য হই, বুঝতে পারি মানুষে-মানুষে বিভেদগুলো তুচ্ছ, খুব একটা গভীর জায়গায় মিলনের ক্ষেত্র আছে প্রস্তুত। সেটা কোথায়? সেটা রুচির শিক্ষার প্রীতির আনন্দের ক্ষেত্র— সে-মিলন সংস্কৃতির মিলন। সেজন্যে এমনও অনেক সময় হয় যে রক্তের সম্পর্কে যে অত্যন্ত নিকট তাকে একবারেই দূর অনাত্মীয় মনে হয়, যে একান্ত পর, যে হয়তো আমার ভাষাও বলে না তার সঙ্গে মিলনের গ্রন্থি সহজে বাঁধা হয়ে যায়। সংস্কৃতির স্তর-যত নিচু, ততই নিজ-নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ঝোঁক, বিদেশী-বিদ্বেষ বর্বরতারই লক্ষণ। যাঁর মন যত বেশি উদ্বুদ্ধ, দেশে-বিদেশে অনুরূপ মনের সঙ্গে তাঁর ততই সহজ ও গভীর সংযোগ সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই মানুষের মনে-মনে বিশ্বমানবিকতার আবহাওয়া রচনা করতে হবে, তবে যদি সভ্যতাকে বাঁচানো যায়। এ-কাজে আমরা তাঁদেরই পাবো যাঁরা ধূর্ত গণপতি কি দাম্ভিক ধনপতি নন, যাঁরা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা জীবনসাধনায় অগ্রণী। তাঁরা কবি তাঁরা শিল্পী তাঁরা প্রেমিক। নতুন জগৎ রচনার ভার আসলে তাঁদেরই হাতে, কারণ প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ শুধু তাঁরাই। স্বজাতিবোধ যদি মানুষের মন থেকে উচ্ছিন্ন না হয়, যদি প্রত্যেক মানুষই বিশ্বমানবিকতার প্রীতিপূর্ণ উদার আনন্দে দীক্ষিত না হয়, তাহলে কুড়ি বছর পর-পর 'বৈজ্ঞানিক' যুদ্ধের জগৎব্যাপী পৈশাচিকতায় সভ্যতার টিকে থাকবার আশা কম। স্বজাতিবোধের বদলে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের চেতনা জাগলে যুদ্ধের মূল কারণ না হোক, মূল প্রেরণা দূর হয়ে যায়। এই যুদ্ধাবসানে পুনর্গঠনের দিনে এই হবে প্রধান কাজ এবং তার জন্য মনে-মনে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

বিশ্বমানবিকতা কথাটাকে অনেকেই ভুল বোঝেন, তাই গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যখন 'শিক্ষার মিলন' লেখেন তাঁকে এদেশে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো। বিশ্বমানবিকতা অসিধর স্বাজাতিকতারই বিরোধী; দেশপ্রেমের দীপশিখার নয়। বিশ্বমানবিকতার মানে এ নয় যে বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব এরকম হতে হবে। অনুরূপ হলেই যে প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তা নয়, ইউরোপের প্রতিবেশী দেশগুলো তো ধর্মে জাতিতে আচারে ব্যবহারে এক, চীন জাপানও অনেকটা তা-ই। এদিকে বৌদ্ধ যুগ থেকে চীন-ভারতের মধ্যে একটি প্রীতির স্রোত প্রবাহিত, যদিও এ-দুই দেশবাসী সব দিক থেকেই স্বতন্ত্র। আসল কথা এই যে চীন-ভারতের ভিত্তি ছিল 'ডিপ্লম্যাটিক রিলেশন্স' নয়, সংস্কৃতি; সে-যোগ স্বার্থের নয়, প্রাণের— তাই বহু শতাব্দী ধরে তা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। ঠিক এই সংযোগ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির সঙ্গে প্রত্যেক জাতির হতে

পারে, সমস্ত দেশের জনসাধারণ মনে-প্রাণে তা-ই চায়, তার বাধা শুধু পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি-বাণিজ্যসম্রাটের দল, যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপে বিশ্বমানবকে বলি দিতে কুণ্ঠিত নয়। মিলনের পথে বৈশিষ্ট্য বাধা নয়, বরং সহায়; বসন্তে যেমন নানা রঙের ফুল ফোটে ও সমস্ত রঙ মিলে একটি আনন্দগান হয়ে ওঠে, তেমনি নানা দেশের লোক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে সৃষ্টি করবে সমগ্র মানবজাতির বিশাল মহান সুর-সঙ্গতি—সভ্যতার এইতো চরম লক্ষ্য। স্বাজাতিকতাই বৈশিষ্ট্য-বিকাশে বাধা, কারণ তার প্রচণ্ড তাড়নায় যে-সব জাতির স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তারা আস্তে আস্তে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে, প্রভু-দেশে প্রস্তুত বিবিধ বিচিত্র মাল কিনতে বাধ্য হয়ে-হয়ে তাদের শিল্পকলা আচার-ব্যবহার সবই ক্রমে নির্জীব ও বিকৃত হয়ে আসে। বিশ্বমানবিকতায় প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সমান, তাই প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণবিকাশ শুধু তাতেই সম্ভব।

এ-আদর্শ আজ হয়তো অনেকেরই সুদূরপরাহত মনে হবে, অনেকে হয়তো ভাববিলাসিতা বলে একে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এ-কথা জোর করেই বলবো যে মনুষ্যজাতিকে যদি টিকে থাকতে হয়, সভ্যতার বিপুল সম্ভাবনা যদি পূর্ণ হতে হয়, তাহলে আজ হোক কাল হোক, কোনো দূর ভাবীকালে হোক এ-আদর্শই বাস্তব হয়ে উঠবে, এ ছাড়া মানবজাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই, অন্যসব ব্যবস্থাই পিছনে ফিরে যাওয়া। এ-আদর্শ বাস্তব হবে এ-আশা আছে বলেই এই বিভীষিকাগ্রস্ত জগতে জীবনের স্বাদ এখনো একেবারে চলে যায়নি। আরো অনেক দুঃখ হয়তো সইতে হবে, আরো করাল হবে প্রলয়ের-অন্ধকার; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগান্তকারী রক্তিম প্রত্যুষে জীবনের জয় হবে, জয় হবে মনুষ্য-ধর্মের। বিশ্বভারতী কবিকল্পনা মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের বাণী মিথ্যা হবার নয়।

[পুনঃমুদ্রিত অহর্নিশ, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যা, সম্পাদক : শুভাশিস চক্রবর্তী, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৮]

সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্

রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর কিছুতেই করি না এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাঁধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো— আমার সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণীশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। এই রসের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে রাজনীতির কোলাহল কখনো ভালো ক'রে আমার কানে পৌছায়নি। তারপরে আমার অন্তরের অবজ্ঞাই অনুভব করেছি। তার কারণ রাজনীতি বলতে বুঝেছি কপটাচরণ, ক্রুরতা, ধূর্ততা, ক্ষণিকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা। শিল্পী মনের পক্ষে ও বস্তু বিশেষ লোভনীয় হ'তে পারে না।

রাজনীতির যে একটা বড়োরকমের সংজ্ঞা আছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পরাধীন দেশে পাওয়া সহজ নয়। আমাদের অ্যাসেমব্লি সভার বিতর্ক, আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতা সবই যেন একটি অনুষ্ঠান মাত্র, তার পিছনে যথার্থ শক্তি নেই আর তাই এর অবাস্তবিকতা এক-এক সময় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ এত ক্ষীণ তার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের উদাসীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবু এই পরাধীন দেশেই কখনো কখনো এমন একটি বিরাট আন্দোলন আবর্তিত হ'য়ে ওঠে যা সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত ক'রে তোলে, এবং জাতির জীবনে স্থায়ীভাবে তার চিহ্নও রেখে যায়। এমন একটি আন্দোলনের দিন এসেছিলো বঙ্গভঙ্গের সময়, তখন আমাদের জন্ম-কাল। সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার কিছু নেই ; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে যে ফসল তা ফলিয়েছিল তা থেকে তার তীব্র উদ্দীপনাটি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারি। তার পরের বড়ো আন্দোলন গান্ধিজির সমাধান খুব সহজেই হ'য়ে যায়, কিন্তু প্রশ্নটি এত সহজ নয়। স্বদেশি যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছিলো, অসহযোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তার তারগুলি একবার কেঁপেও উঠলো না এর কি কোনো কারণ নেই? যে-হাওয়া হৃদয়ে এসে ঘাঁ দেয় সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হবেই, লেখক সেখানে যন্ত্রী নন, যন্ত্র। প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে এই দুই আন্দোলনের জাতের তফাৎ বুঝতে হবে। স্বদেশি আন্দোলনের মূলে ছিলো বাংলাদেশের হৃদয়-শতদলের উন্মীলন। তার মধ্যে শুধু স্বায়ত্তশাসনের, শুধু অখণ্ড বঙ্গভূমির কথা ছিলো না, শিল্পে কর্মে জ্ঞানে বানিজ্যে সমস্ত দেশে তা নবজীবন এনেছিলো। তখনকার দিনের দিশি কাপড়, দিশি জিনিস ব্যবহারে স্বদেশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগের কথাটাই বড়ো ছিল, অসহযোগে তা হয়েছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাত মারবার পলিসি। রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে শেষেরটাই হয়তো কার্যকরী এবং কার্যকরী হবার জন্যেই অসহযোগ আন্দোলনকে বড়ো বেশি না-ধর্মী হতে হয়েছিল। বিলেতি কাপড় পোরো না, ইংরেজের স্কুলে যেয়ো না, তাড়ি খেয়ো না, ট্যাক্সো দিয়ো না– চার-দিকে 'না' দিয়ে ঘেরা বলেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে

তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এত বেশি 'না' সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা ইতিহাস জড়িত, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতিও অসহযোগের সহযোগিতা ছিল না, স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষা স্থগিত রাখতে হবে এও তার পলিসির অন্তর্গত ছিল। বিলেতি পণ্য বয়কটের হিড়িকে যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেশে প্রতিকূল মনোভাব গ'ড়ে উঠতে লাগলো তখনই রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাতে হলো 'শিক্ষার মিলন' লিখে। সংস্কৃতি জিনিসটাই আন্তর্জাতিক, তা দেশ-কালের বেড়া মানে না, সুতরাং যে-আন্দোলন কার্যোদ্ধারের খাতিরেও সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশনাল তা সাহিত্যের উপাদান সহজে হয় না। একটা জিনিস আছে মানুষের স্বাভাবিক স্বদেশ-প্রেম, সে যেমন তার নিজের গৃহটিকে নিজের মাকে ভালোবাসে, তেমনি তার দেশকেও ভালোবাসে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সেই স্বদেশপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস। তাই তার ব্রত উদ্‌যাপনে এত গান এত ছন্দ এত কাব্য। কিন্তু অসহযোগের বাণী স্বদেশপ্রেমের নয় সর্বাঙ্গীন বিদেশিবর্জনের, তার মধ্যে এমন একটি শক্তি ছিলো যা দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছে কিন্তু হৃদয়ের এমন একটি শুষ্কতা ছিলো যা সাহিত্যের প্রেরনা জোগাতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বদেশি আন্দোলন আবেগপ্রবণ আর অসহযোগ কর্মপ্রধান। যা নিছক কাজ তা সাহিত্যের এলাকার বাইরে, কাজের পিছনে যে-আদর্শ যে-ভাবাবেগ সঞ্চিত থাকে সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। অসহযোগে ভাবাবেগের প্রাবল্য ছিল না, তার পিছনে যে-আদর্শ ছিলো তা বড়ো জোর শুষ্ক বৈরাগ্যের আদর্শ, সাহিত্যিকের পক্ষে তার কোনো আকর্ষণ নেই। একারণেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হিসেবে তার ব্যর্থতা— বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি।

গান্ধিজির লবণ আন্দোলন যে-সময়েই শুরু হলো বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যমন্দা। কী অসম্ভব সস্তা সমস্ত পণ্য, অথচ দেশব্যাপী দারুণ অনটনের হাহাকার। কাগজে পড়তে লাগলুম, মার্কিন দেশে রাশি-রাশি কফি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, স্তূপীকৃত শস্য দেয়া হচ্ছে জলে ভাসিয়ে, এদিকে ঘরে ঘরে অন্নাভাব। বাংলাদেশের বেকারবাহিনী জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। নিজের জীবনে উপলব্ধি করলুম কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকের মূল্য, সুজলা সুফলা বাংলাদেশে তার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় কি না হয়। কোনো কোনো দিকে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেলো, মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সেই প্রথম সচেতন হলুম। ইকনমিক্সের জটিল পথ আমার অধিগম্য নয়, কিন্তু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলে যে ঐ শাস্ত্রটাই হয়ত ভুয়ো, আমাদের দেশের রাজনীতির মতোই তা বাস্তবের সম্পর্করহিত। কেননা যে শাস্ত্র শুধু বলে যে কোনো-কোনো অবস্থায় লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে ক্ষুধিত রেখে শস্য জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, আর কিছু বলে না একেই নিয়ম বলে স্বীকার করে নেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা সহজ নয়। যাকে বলি অর্থনীতি তা তো পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক শাস্ত্র নয়, আলো এবং উত্তাপ যখন যে-ভাবে ব্যবহার করবার তা করবেই তার উপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু মানুষের কেনা-বেচা খাওয়া-পরা তো মানুষেরই হাতে, অতএব যে-শাস্ত্র পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের দুঃসহ দারিদ্র্য দুঃখকেই 'নিয়ম' বলে মেনে নেয়, তার সমস্ত যুক্তিতর্কের আড়ালে কোথাও না-কোথাও প্রচণ্ড ফাঁকি আছেই এ-সন্দেহ বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বানিজ্য-মন্দার জোয়ারে যখনি ভাটা পড়ে এলো তখনই দেখলুম ইটালি আবিসিনিয়ার গলা কাটবার জন্য ছুরি শানাচ্ছে— বর্তমান মহাযুদ্ধের সেই তো আরম্ভ।

সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হ'লো জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয় অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলুম একটা সুসভ্য উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম পরে বীভৎস মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘসছে। জার্মানির যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁদের নামে জগতের কাছে জার্মানির পরিচয়, নাৎসিশাসন সদ্য-ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণের মতো তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত – এ দৃশ্য যখন দেখলুম ; যখন দেখলুম আধুনিক জার্মানির দুই মহামানব— আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড— তাঁদের মধ্যে একজন হলেন চোরের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওলা ঘেরাও হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন ; যখন দেখলুম জর্মানির সব বড়ো-বড়ো লেখক শিল্পী, সাঙ্গীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্থ কিংবা মাতৃভুমিতে বন্দী ; যখন কানে এলো ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধিকারহরণের ইতিহাস, সমস্ত ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হল, তখন বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড়োরকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তার প্রমাণের জন্যও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ। এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো ; বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ; বিশেষ একটি শ্রেণির স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশি জাতির উপরেই অত্যাচার চলে নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয় ; শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের 'উন্নতি' সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ মানেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।

অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ছিল সাম্যবাদী রাশিয়া— রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে-দেশ ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে-দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম। ফরাসি বিপ্লবের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড়ো ঘটনা আর ঘটেনি। ইংরেজি অনুবাদে রুশ সাহিত্য প'ড়ে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দেশের উপর আকর্ষন জন্মেছিলো, রুশ গল্পে উপন্যাসে বঞ্চিত উৎপীড়িত বুভুক্ষু বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন যেমন শুনতে পেয়েছিলুম তেমন আর কোথাও শুনতে পাইনি। সেই দেশ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে, এই খবর একটি গভীর অনুপ্রেরণা হয়ে আমার হৃদয়ে বাজলো। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী— এ তো কবিরই বাণী, যুগে-যুগে কত কবির মুখে এই বাণী, সাম্যের বাণী জলন্ত সুরে বেজেছে ; এর কোনো বিশেষ স্থান কি কাল নেই, এ সমগ্র বিশ্বমানবের চিরকালের সংগীত। এই বাণী শেলির, এই বাণী রবীন্দ্রনাথের, এই বাণী দেশবিদেশের সকল মহৎ কবির ; মানুষকে মুক্তি দাও, মানুষকে ভালোবাসো, কঠোরের বদলে সুন্দরের পূজা করো, পাষাণহৃদয় উৎপাটিত ক'রে রক্তমাংসের হৃদয়কে স্বীকার করো। তাই যখন নবীন রাশিয়ার মূল মন্ত্র আমার কানে এলো— 'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'— তখন এই বাণীতে যেন বিরাট মহাকাব্যের কল্লোল শুনতে পেলুম। এত বড়ো কথা কে আর কবে বলেছে! পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সভ্যতা জেগেছে এবং ডুবেছে, কিন্তু চাঁদের উল্টো পিঠ আমরা কখনো দেখবো না, হয়তো তা ঘোর কালো, হয়তো দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কিন্তু সভ্যতার উল্টো পিঠটি একটু নাড়া দিলেই বেরিয়ে পড়ে— সেই একতলার ঘরে বোবা অন্ধকারে নরকঙ্কালের সারি, সেখানে দাসপ্রথা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, রক্তপাত–তা অতি ভয়ানাক।

কোটি-কোটি লোকের জীবনের মূল্যে কয়েকটি মানুষ সুরভিত অবসরে ব'সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ক'রে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই ছিল নিয়ম। ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ জমেছে, এ-নিয়ম বিশ শতকে এসে টলেছে কিন্তু একেবারে ভাঙেনি। সভ্যতার এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব যখন সব দেশেই মনিষীর ও শ্রমিকের মনে-মনে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন রাশিয়া বজ্র-স্বরে ঘোষণা করলে 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না' শুধু যে মুখে বললে তা নয়, কাজেও খাটলে। সভ্যতার একতলার ঘরে আলো জ্বললো – শুধু তা-ই নয়, নিচের তলা বলে কিছু আর রইলোই না। সভ্যতার ছন্দোহারা বেঢপ বেসামাল চেহারা দুর হ'লো, তা সর্বাঙ্গীন শ্রীতে উঠলো মুঞ্জরিত হয়ে। আমি বলি না রাশিয়াতে সেই নিখুঁত ছন্দের সুষমা আজই গড়ে উঠেছে, হয়তো তা হয়নি, না হয়ে থাকলে দোষও দেবো না কারণ বাধা বিস্তর, কিন্তু এ-পর্যন্ত রাশিয়া যেটুকু করেছে সেটুকুই আশ্চর্য এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে মানবজীবনে ছন্দের সেই সুষমাই রাশিয়ার লক্ষ্য, তারই জন্যে সেই বিরাট বিচিত্র দেশের অক্লান্ত সাধনা। রাশিয়া নবীন একটি সভ্যতার জন্মভূমি।

এদিকে জার্মান ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নিলিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ন রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখেছি তাঁর ধ্যানী আত্মস্থতাকে বহির্জগতের পীড়ন বার-বার ভেঙে ভেঙে দিয়েছে, তীব্রস্বরে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন হত্যাকারী অত্যাচারীকে, জাপান যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো, জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিক্ষোভের প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতায় আর নোগুচিকে লেখা চিরস্মরণীয় পত্রাবলীতে। লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিৎ এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভ'রে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ঐ বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো— এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের, কবি চরিত্রের এট ন্যূনতম দাবি।

বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জার্মান থেকে মনীষীরা যখন একে-একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বেমাবষৃণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হতে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হয়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহলে আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্ম-প্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না, শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের

কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিস আছে বলে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না-থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না সব একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। স্পানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোস খসে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধৃহত্যা নয়, নারীহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁছেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে-মাঝে এক-আধটা কবিতা লিখতে চাই, কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাসস্থান, প্রিয়জন, আমার সমস্ত আশা ভালোবাসা সুদ্ধু আমি একেবারে লোপাট হয়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার কলম, থামিয়ে দেবে আমার সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্ম-প্রকাশের আবেগে— তাহলেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে আমার ঘরে ব'সে আপন কাজ করবার অধিকার, যার উপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে— এবং অনেকের পক্ষেই— এ উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এঅধিকার থেকে যুগে-যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে, যারা তাঁত চালায়, যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশীবহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন ক'রে আসছে। আজকের দিনে এমন এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হ'য়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত এবং সকল মানুষকেই লৌহশাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক।

এরই নাম ফ্যাশিজম্। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাশিজম্-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। এটা কোনো চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের কথা নয়, কোনো পরাক্রান্ত মূঢ় যদি রবীন্দ্রনাথকে দুয়ো দেয় তাকে সহ্য করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ পুজ্য নন, এ-কথা যেমন মরে গেলেও বলতো পারবো না, তেমনি অপমানিত, লাঞ্ছিত কিংবা নির্বাসিত হলেও এ-কথা মানতে পারবো না যে দেশের তথাকথিত 'উন্নতির' জন্য সভ্যতার সর্বনাশ যদি দরকার হয় সর্বনাশই করতে হবে। আমাদের কাছে আগে সভ্যতা, আগে মনুষ্যত্ব, তারপর অন্য সব-কিছু।

তাছাড়া ভেবে দেখতে হবে যে ফ্যাশিজম্ শুধু একটা সামরিক নীতি কিংবা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাশিজম্ একটা মনোভাব। মনোভাব মাত্রই অত্যন্ত ব্যাপক, জীবনের সমস্ত ছোটো খাটো ব্যাপারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা আজকের দিনে

অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে উপলব্ধি করছি যে কোনো ব্যক্তির যদি রবীন্দ্রনাথের গান কি যামিনী রায়ের ছবি ভালো না লাগে, সেই রুচির কিংবা রুচির অভাবের সঙ্গে জড়িত আছে তার রাজনৈতিক মতামত। হয়তো সে-মতামত সম্বন্ধে সে নিজে খুব বেশি সচেতন নয়, কিন্তু খোঁচা দিলেই মনের কথা বেরিয়ে পড়ে এবং যে সব কথা সে অবলীলাক্রমে ব'লে যায় তার ভয়াবহ তাৎপর্য সে নিজেও বোঝে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, একদিকে ভৃত্য ও অন্যদিকে বড়ো সাহেবের প্রতি ব্যবহারে, বিদেশি ও বিধর্মী সম্বন্ধে ভঙ্গিতে, তার প্রতিদিনের তুচ্ছতম আচরণে ও আলোচনায় তার মূল মনোভাব নানাভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশেও আজকের দিনে এমন লোকের অভাব নেই যারা যা-কিছু প্রগতিশীল তারই বিরোধী, যা-কিছু নতুন সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যারা স্ত্রীজাতিকে সন্তানবাহী ক্রীতদাসী বানিয়ে রাখবার পক্ষপাতী, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করতে ও পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে যারা নিয়ত উৎসুক, এদিকে সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কথা শুনলে যারা মূর্ছা যায় যারা যে-কোনোরকম বিদেশি কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, অথচ পরস্পরের কুৎসারটনায় যাদের জিহ্বা চির চঞ্চল, যারা নিছক গুণ্ডামির একান্ত ভক্ত— অবশ্য সেগুণ্ডামির যতক্ষণ জিৎ হতে থাকে। গুণ্ডামিকে তারা পৌরুষ মনে করে, হৃদয়হীন কঠোরতাকে শক্তি ব'লে বাহবা দেয়। তাই যখনই যে-জাত পশুশক্তিতে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে তারা অন্য কিছু বিচার না করে তারই ভজনা করে। এ-সব লোক বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক, কিন্তু যে কোনো বিষয়ে দুএকটা কথা বললেই বোঝা যায় তাদের মনোভাবটা কী। চোখ বুজে ব'লে দেয়া যায় যে এটাই ফ্যাশিস্ট মনোবৃত্তি— হয়তো সচেতন নয়, অচেতন— কিন্তু শেষ হিসেব মেলাবার দিনে এদের সমস্ত অচেতন ইচ্ছা বাঁধন-ছেড়া ক্ষিপ্তা কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে তাদেরই কামড়াতে যাবে মুক্তির সাধনায় জীবন যাদের উৎসর্গিত। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে এই লড়াইতে আপাতত ফ্যাশিষ্টদের জিৎতে দেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রবল উৎসাহে ফেঁপে উঠছে ; এতদিনে সমাজজীবনে আমরা যেটুকু অগ্রসর হয়েছি এক দলের মনের ইচ্ছা তার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করে দিয়ে সেই যুগে ফিরে যায় যখন মনের সুখে বৌ ঠ্যাঙানো যেতো এবং ছোটোলোকদের পায়ের তলায় পিষে রাখলে তারা সেই শ্রীচরণযুগলকে জড়িয়ে 'ধরে ভক্তিভরে সেখানে মাথা ঠেকাতো। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকের মনেই এই প্রতিক্রিয়া আজ বন্দী সর্পের মতো ফোঁসফোঁস করছে, একবার ছাড়া পেলে তার বিষ সমস্ত জাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এমন আশঙ্কা আছে বলেই আজ আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাসী তাদের একত্রে হয়ে দাঁড়াতে হবে, জোর করে বলতে হবে যে এই কুৎসিত মনোবৃত্তির আমরা বিরোধ, এর বিরুদ্ধে যা-কিছু করবার সব করবো, তার জন্য যত নির্যাতন সইবার সব সইবো! এটা বীরত্বের কথা নয়, পেশাদার যোদ্ধার ফাঁকা বুলি নয়, এটা আমাদের প্রাণের কথা – কারণ সভ্যতার সুষমা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পেটে খেতে পেলেও জীবনের কোনো মানে থাকে না এই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

আমি জানি আমার এ-সব কথা অনেকের কাছে সেন্টিমেন্টাল লাগবে। অনেকে বলবেন, প্রগতি বলে কিছু নেই, পরিবর্তনের নিত্যচক্রে পৃথিবীর ইতিহাস ঘুরছে। সভ্যতার গতিপথ চক্রাকার এটা ফ্যাশিস্ট দর্শনেরই কথা, কিন্তু সে-কথা ছেড়েই দিলুম। বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতার বিবর্তনের ছবিটা ঋজু না গোল না সর্পিল আকারের, সে আলোচনার এখানে সময় নেই। আমি বলতে চাই যে আমি প্রগতিতে বিশ্বাস করি

সুদ্ধু এই কারণে যে তা না-করলে জীবন একেবার নিরর্থক হয়ে যায়। সভ্যতাকে মাঝে মাঝে বর্বরতা এসে গ্রাস করবেই এ-কথা যদি নিয়ম বলে মেনে নিতে হয় তাহলে কোনো কর্মে আমার আর উৎসাহ থাকতে পারে না, বেঁচে থাকবার মূল তাগিদটাই যায় মরে। তাছাড়া ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার আলো কখনোই জগৎ থেকে একেবারে নিভে যায়নি— কখনো চীনে কখনো রোমে, কখনো ভারতে কখনো আরবে কখনো বা ইওরোপে সে-আলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, তার রশ্মিবিকীর্ণ হয়েছে সমস্ত জগতে। ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, সেদিন থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলেও আর একদিকে আলো জ্বলেছে, এবং পর পর এতগুলি সভ্যতার ওঠা-পড়ার মধ্যে কোনো মিলনগ্রন্থি কি নেই? আছে বইকি, সমস্ত ইতিহাস এক সূত্রে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীস রোম মিশর ভারত চীনের উত্তরাধিকার জগৎ থেকে তো হারিয়ে যায় নি, তারা যা করে গেছে আধুনিক পাশ্চত্ত্য সভ্যতার কাজ আরম্ভ হয়েছে তার পর থেকে। এমনি করে-করেই মানবজাতির ইতিহাস গাঁথা হয়ে চলেছে, বংশের পর বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী। একেই তো বলি প্রগতি। অতীত এসে বর্তমানে মিলিত হয়, বর্তমান ধাবিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব, কত ভাঙা-গড়া কিন্তু সব মিলিয়ে এর অন্তরালে একটি ঐক্যের সুর বাজছে, তারই নাম প্রগতি। আরো মুক্তি,আরো সৌন্দর্য, আরো সভ্যতা, পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন বাণী তো এই। আজকের দিনে নতুন আলো জ্বলেছে রাশিয়াতে ; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে তাতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলেই কি তাকে আজ নিন্দে করতে বসবো? তাই বলেই কি বলতে শুরু করবো, ঢের ভালো ছিল আমাদের জাতিভেদ, সতিদাহ, ঢের ভালো জাপানের শিন্তোবাদ, যেহেতু এ-সভ্যতায় আর কাজ চলছে না সেইজন্যই বলে বসবে যে বর্বরতাই ভালো? কক্ষনো না। এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জগৎকে যা দিয়েছে তার মূল্য অসীম, কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, সব সভ্যতারই একদিন মরণদশা ঘটে। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তার মধ্যে যেটা মুল শক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের লৌকিক ব্যবহার সেটা থাকবেই, কিন্তু এ-সভ্যাতার যেটা দুর্মানুষিক দিক সেটা কালের কবলে ঝরে পড়বে। এ-সভ্যতা রুপান্তরিত হয়ে যে নতুন মূর্তি নেবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে রাশিয়াতে। আমরা তাকিয়ে আছি সে-যুগের দিকে যখন সমস্ত পৃথিবী এক হবে শান্তি হবে স্থায়ী, জগতে শোষিত জাতি কিংবা শোষিত শ্রেণি আর থাকবে না, বিজ্ঞানের বিকাশ হবে সর্বতোভাবে অপ্রতিহত। অনেকেই বলবেন এটা কবিকল্পনা মাত্র। এ-কখনো সম্ভব নয়, হিউম্যান নেচারই এ-রকম নয় যে ... কিন্তু এই কাল্পনিক হিউম্যান নেচারের দোহাই দিয়ে অনেক অসত্যই এতদিন আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে, আর আমরা ঠকবো না। মানুষ স্বভাবতই হীন, লোভী, ঈর্ষাকাতর কি দাম্ভিক নয় ; অবস্থার বিপাকেই সে ও-রকম হয়, এবং অবস্থা বদলালে তার স্বভাবও যে বদলায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া, যাঁরা বলেন যে পৃথিবী কখনো স্বর্গ হবে না তাঁদের জিজ্ঞেস করি যে এইভাবেই কি চলবে চিরকাল? পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের এত শক্তি নিয়ে এই অভাব এই হাহাকার কুড়ি বছর পর-পর খণ্ডপ্রলয়, একেই কি চুপ করে মেনে নিতে হবে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না হয় কিনা। যে-কারণে পৃথিবীতে আজ ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, সেই কারণেই যুদ্ধ আজকাল এমন ঘোর দানবিক যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের স্পৃহা কিংবা প্রয়োজন যদি দূর করা না যায়, পৃথিবীর সব দেশ সব জাতি এক প্রীতির বন্ধনে যদি যুক্ত না হয় তাহলে দুশো বছরের মধ্যে মনুষ্যজাতিই হয়তো আর থাকবে না। কেউ-

কেউ এমনও আছেন যাঁরা বলবেন না-যদি থাকে না-ই থাকবে, মনুষ্যজাতিকে থাকতেই হবে তারই বা কী মানে আছে? আমি স্বীকার করবো ও-কথা বলবার তো প্রকাণ্ড দার্শনিক এখনো আমি হ'তে পারি নি, জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক মমত্ববোধ, আমি কোনোরকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে-কোনো অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমায় একলার নয়, সকলেরই স্বার্থ। আমি আমার সেই ভালো চাই যাতে অন্য সকলেরই ভালো। আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ : তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো উদ্যোগ আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হলে চলবে না, নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।

একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ করে এ-প্রবন্ধের শেষ করি। একবার একটি কলেজের ছাত্র আমাকে বলছিল, 'হিটলারের আমলে জার্মানির কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা তো দেখছেন। আমাদের দেশে এইরকমই দরকার'। আমি তাকে বললুম, 'ওরা আইনস্টাইনকে তাড়িয়েছে'— সে বাধা দিয়ে বললে, 'জ্যুরা ভয়ানক খারাপ লোক, তাদের তাড়ানোই উচিত।' আমি তাকে জিজ্ঞাস করলুম, 'আচ্ছা ধরো আমাদের স্বদেশি হিটলার যদি রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে চান তুমি তাতে রাজি আছো?' সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে যদি তাড়াতে হয়ই তবে তাড়াতেই হবে।' আমি বললুম, 'যে-উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয় সে-উন্নতি আমি চাই না কারণ মনে-মনে আমি নিশ্চয়ই জানি যে সে উন্নতি নয়, ঘোর অবনতি।' এই কথাই আমার শেষ কথা।

আমরা তিনজন

আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, অসিত আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল!

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তার-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশন পাওয়া সব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন, এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড় রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠে ভরে গেলো, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হলো না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিল এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হল্‌দে-হল্‌দে-সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর!

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সবসময় যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাক্‌তো, 'বিকাশ! বিকাশ!' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক-পা মাটিতে ঠেকিয়ে-এমন লম্বাও, কাঁদে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হোত না, দাঁড়িয়ে থাকত তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে; আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে!

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনোদিন শহরে একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হলো না— চেষ্টা করেও শিখতে পারি নি ওটা, কিন্ত ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে বসে, ছোট ছোট তারা ফুটছে আকাশে, চোর-কাঁটা ফুটছে কাটড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকত না— আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হত বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিল না, অসিতের উপরেও না, দুজনে বসে

থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি চুপ দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে উনিশ-শো-সাতাশ সনে।

নাম তার— অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্ত ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ে নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যান্ট-পরে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে বলে ভুল হয়— আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলব! সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সবসময় দেখা যায় তাকে, মাঝে মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ;— সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো-একটি মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন— এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়ব না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্ত বের করেছিলাম আমি। রোজ সই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটা নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার করে লেখা : 'অন্তরা দে'। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম,তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি অন্তরা?'

'কার'— কিন্তু তক্ষুণি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বললো, ' বোধ হয়।' অসিত বললো, 'সুন্দর নাম!'

'ডাকে তরু ব'লে।'

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্ত সে-মুহূর্তে আমার মনে হলো, এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হলো যে, সমস্ত বাংলাভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেন না, যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বললো, 'অন্তরা থেকে তরু— এটা কিন্ত আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো!' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্ত ভেতরটা কেমন দমে গেলো।

'আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে! ইস্! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠলো, বেশ চোখাচোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠলো, 'আমিও তা-ই।'

বিশ্বসঘাতক!

এ-রকম ছোট ছোট ঝগড়া প্রায়ই হতো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত

হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়েছিল তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিল, না চুল খোলা ছিল, বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিল, না আঁক কষছিল— এমনি সব বিষয় নিয়ে চ্যাচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হতো যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত : ওর মুখের সঙ্গে মোনালিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনালিসার ছাপা-ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোল কথাটা-'ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো।' তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয় নি; তবে একটা সুবিধা এই হলো যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেলো মোনালিসা। অন্তরাতে যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না— অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই— একই তো বাড়ি,' আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে বলতো, 'যাঃ!' যার মনে হচ্ছে যে সেটা হলেও হতে পারে— আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলত আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এ-সব কিছু না, শুধুই কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে, নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের উপর কী রকম কেঁপে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা; 'উঃ' বলে সে নেমে পড়লো, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন,('Take care young man!') তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী-আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

'(Really you must)— ' বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন।—' (Oh its you!) কেশব বাবুর ছেলে!'

'আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

'আর এরা-তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সবসময়। বন্ধু বুঝি! বেশ, বেশ। (I live young men). এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওরাঁ চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বললো, 'কী কাণ্ড! ডহতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?'

'না তো! ঘাবড়াব কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—'

'কোনোদিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা ওঁদেও সামনে—'

'বেশ তো! হয়েছে কী? কারো পায়েও পড়ে নি, পড়েও যাই নি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে–'

'না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো—'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলা, 'চুপ করো, ভালো লাগে না'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিল', অসিত তবু ছাড়ল না ('ও' বলতে কাকে বোঝায় তা বোধহয় না বললেও চলে।)

'হেসেছিল তো বয়ে গেলো!' চিৎকার করলো হিতাংশু, কিন্ত সে চিৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে বিকাশ? কিন্তু মোনালিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেলো। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দুদিন আধমরা হয়ে রইলাম, সাতদিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বল্‌তে লাগল, 'চল্ না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।'

'পাগল।'

'পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?'

ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে দুঃখিত হবেন— এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশিরকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থিও করি 'আজ', রোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক'। কোনোদিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে; কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনোদিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্ত বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখই ভাবি— বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব বসব, আলাপ করব, চলে আসবো— ব্যস্!

সেদিন আকাশে মেঘ টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হলো ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুক্‌ল অসিত, লম্বা ফর্শা, সুশ্রী; তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা পরা, ভদ্রলোক মাফিক; আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকবো কিনা, কাকে ডাকবো, কী বলে ডাকবো এসব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি ততক্ষণ পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন, (`yes')?

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হলো। 'আমি— আমরা— মানে আমরা এসেছিলাম— আপনি বলেছিলেন—' আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। 'ও, তোমরা! তা...'

অসিত আবার বললো, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...' একটু কেশে— 'এসো, এসো তোমরা', পরদা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিলো, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদামাখা স্যাণ্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা করে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখি নি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়লের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনালিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রি মস্কেটিঅর্স। এটি কেশবাবুর ছেলে, আর এরা...'

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এর নাম অসিত আর এই হচ্ছে বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজনে। মিসেস দে ডাক দিলেন— 'তরু'!

মোনালিসা চোখ তুলল।

'এঁরা আমাদের প্রতিবেশী— আর এই আমার মেয়ে।'

মোনালিসা বই রেখে উঠলো, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়া গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করলো।

আমার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু— সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তা ছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা একটু তা ওরা দু'জনেই বললো, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কী বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হলো না, পাছে আমার বাঙলা টান বেরিয়ে পড়ে। মোনালিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভেতরে-ভেতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!

ইলেকট্রিসিটি না থাকলে জীবন কীরকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাঙ্ঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এসব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমরা কি কলেজে পড়?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বললো, ' হিতাংশু পনের টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাঃ বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

ঘঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠলো, 'বাবা, কীটস্ কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?'

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো?'

অসিত ফস করে বললো, 'বিকাশ নিশ্চয় বলতে পারবে— বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য— আমি অনুভব করলাম— মোনালিসার চোখ আমার উপর পড়লো। হাত ঘেমে উঠলো আমার, কানের ভিতর যেন পিঁ-পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধ কতটুকু সময়? পনের মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেখচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর করে দু'টা ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত— বকবক না করে ও থাকতে পারে না— বলে উঠলো, 'কী চমৎকার ওঁরা!'

'সত্যি! চমৎকার!' হিতাংশু সায় দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কথা বললাম, না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বলে, 'কিন্তু জুতাগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা! আর, হিতাংশু,তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে!'

'কখন?'

'ঘরে ঢুকতে গিয়ে।'

'যাঃ!'

'যাঃ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!' একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বললো, 'কিন্তু যখন— মোনালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো...'

অন্ধকারে আমরা তিনবন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, এবং অন্ধকারেই বোঝা গেলো যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদগবের মতো বসেই থাকলাম— উঠে দাঁড়ালাম না, কিছু বললাম না কিছু না, ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ-রক্ষা করতে পারল না।

কী যে মন-খারাপ হলো, কী আর বলব।

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর— তারপর মোনালিসা এলো ঘরে, তড়াক করে উঠে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা ...'! 'ও মা! এর জন্য আবার ...বসুন ...।' মনে-মনে এনরকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হলো একটু অন্যরকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভিতরে চলে গেলো, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ফিরে এলাম— কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। না, না। ঐ সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেওয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়— যেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনালিসা— মোনালিসাই। ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরান পল্টনে, মেঘে-ডাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনের দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন রোদ উঠলো, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো!'

তবে কি ওদের বাড়িতে— প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হলো। পরের দিন হিতাংশু গভীর মুখে বললো, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ।'

'ওরই অসুখ।'

'ওর অসুখ!'

'ওর!'

সেদিনও বড় ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু-বেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে দে-সাহেব গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভেতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বললো, 'আমাদের ডেকেছেন', 'মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে বললেন, 'তরুর অসুখ।' তার কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিলো।

'কী অসুখ?'

'টাইফয়েড!' ঐ ভয়ঙ্কার শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত বলে উঠলো, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেবো।'

'পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার...' বলতে বলতে চোখে তাঁর জল এলো।

মোনালিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিল, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে ঝড়ে, বৃষ্টিতে থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়েছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধরে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামল না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আফিস যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মার সারদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারারাত পালা করে করে জেগে থাকি আমরা— কখনো একসঙ্গে দু'জনে, কৃচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে একলা রাত— জাগার সুখ আমি পেয়েছি বেশি— অসিত সারাদিন ছুটাছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বারবার। সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দুমাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে-তিন মাইল— কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটল বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেল স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার, এদিকে আমি আসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বার-বার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোট ছোট ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়াচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই বলে বাইরের কাজ আমি কিছুই

প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুর-ঘুর করি তোমার মা-র কাছে কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচর লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে করে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না মোনালিসা, কোনোদিন জানবে না।

সারাদিন, সারারাত মোনালিসা মূর্ছিতের মতো পড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে মাঝে— এত ক্ষীণ-স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না তবু যে কটি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন করে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দু'জনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হলে তিনজন বসে সেই কথা কটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণি-মুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে 'উঃ', সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে; যদি বলেছে 'জল', তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল করে উঠেছে আমাদের মনে।

একরাত্রে হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দায় বিছানায় ঘুমাচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেওয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়-বড়, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঐ আলোটুকু যেন আর পারছে না; আমিও আর পারছিনা ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম আমার হাত-পা কেটে-কেটে টুকরো করে দিলো, মোমের মতো গলে যাচ্ছে আমার শরীর। যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি; লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে ডুবতে মনে হলো মোনালিসা তুমিও কি এমন করেই যুদ্ধ করছ মৃত্যুও সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো— কেমন করে আছো! মনে হতেই ঘুম ছুটল। সোজা হয়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে সেই ক্ষীণ আলোয় কাঁপা-কাঁপা ছায়ায় রাত চারটে স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছ না জেগে আছো? উত্তর নেই। তবুও আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হলো এর উত্তর আমি পাবই, পাব তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো একটি ভঙ্গিতে হয়তো— কে জানে— তোমার কণ্ঠেরই কোনো একটি কথায়। আর, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে চোখ তোমার খুলে গেলো, মস্ত বড় হলো উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হলো আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল— 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না?'

'হবে, আর দেরি নেই।'

'দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।'

আমি তার কপালে আমার বরফে-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।

'আহ, খুব ভালো লাগছে আমার।'

'তুমি চলে যাবে না তো?'

'না।'

'যাবে না তো?'

'না।'

'আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন?'

নিঃশ্বাস উঠলো আমার ভিতর থেকে, নিঃশ্বাসের স্বরে বললাম,— 'ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাকল। ভোর হলো।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক। একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দু-জনকে বলি নি, হয়তো ওদের এমন কিছু আছে যা আমি জানি না, আর কেউ-জানে না। তুমি, মোনালিসা, তুমি জানলে না, জানবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন তুমি ভাল হলে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হয়ে পড়লাম। আর তুমি ভাত-টাত খাবার দিন-পনের পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হলো যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।

কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি, সে ক্লান্ত হলে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক করে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে সাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই করে-করে আশ্বিন যেই এলো, ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি!

বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ করে নারায়ণগঞ্জে স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।

ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়ানো মোনালিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হলো তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয় নি। আমার ইচ্ছে করছিল বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হলো না।

অসিত বললো, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে?' একটু হতাশভাবেই বললো হিতাংশু।

'কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশু বাবার নামে মনি-অর্ডার, বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তাই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা চিঠি লিখব স্থির করলাম। ও লেখে নি বলে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাব, এটা কোনোরকম যুক্তি বলেই মনে হলো না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো করে শরীর সারে নি— কেমন আছে সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠে কী লিখব? আপনি লিখব, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমি বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ পর্যন্ত বলেছি আমরা— এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলি নি যার জোরে কালির আঁচড়ে জ্বলজ্বলে একটা

তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবই বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে তো কতই লেখা যায়— কিন্তু মোনালিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধরে জটলা করেও কোনো মীমাংসা যখন হলো না, তখন ওরা আমাকেই বললো চিঠিখানা রচনা করে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।

সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে ঘামতে আমি লিখে ফেললাম :

সুচরিতাসু,

ভেবেছিলাম একখানা চিঠি আসবে, চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলত কিনা রোজ সন্ধ্যায়।

বসে-বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের, কালো-কালো-সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো— আর যেন কখনো অসুখ না করে।

কারো কোনো অসুখ না করেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-বসে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।

মাসিমা মেসোমশায়কে প্রণাম।

আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এ-টুকুতেই রাত তিনটে বাজল। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই কটি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম; মনে হলো বেশ হয়েছে, আবার মনে হলো ছি-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুণি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল করে নিলাম, আর পরদিন তিনজন বসিয়ে দিলাম যে যার নাম সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চারদিন, পাঁচদিন— আচ্ছা ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটল; চিঠি নেই।

চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এইরকম :

কল্যাণীয়েষু,

হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচি মেয়াদ শেষ হলো, শিগগিরই ফিরব। ইতিমধ্যে, হিতাংশু, তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখো, তাহলে বড় ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।

আশা করি ভালো আছো সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা বলে। ইতি— তোমাদের মাসিমা

মাঝে মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে চিঠিটা পৌঁছেছিল। কি হলো চিঠির? কিন্তু

সে কথা বেশিক্ষণ ভাবার সময় কই আমাদের, তক্ষুণি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন করে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড : 'রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।' শুধু স্টেশনে! আমরা ছুটলাম নারায়ণগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনালিসাকে, কচিপাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি করে বরফ লেমনেড কিনতে লাগল, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়-বড় বাক্স-বিছানা হাঁই-হাঁই করে তুলতে লাগল গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।'

'না, না, সে কী কথা, আমরা— আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে এসো না'— বলে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা : মনে হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা করেছিল। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা করে আমরা বসলাম বাক্স-বিছানা উপর; তাতে একটা সুবিধে এই হলো যে একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম— দেখলাম মোনালিসা খুশী, ওর মা খুশী, বাবা খুশী, দেখতে দেখতে আমরাও খুশীতে ভরে গেলাম; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিল তা সহজ হলো এতদিন যা ইচ্ছে ছিল তা মূর্ত হলো— রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা; এতবড় রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশীর বেগেই চলেছে। মোনালিসা নাম ধরে-ধরে ডাকতে লাগল আমাদের— কত তার কথা, কত গল্প— আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো-এক বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?'

'তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি?'

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, 'জবাব দাও নি যে?'

'এতক্ষণ ধরে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরও দেবো।'

মিথ্যে বলে নি মোনালিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের, আমরা তিনজন আমরা চারজন হয়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছ, আর একবার খাটতে হবে। উনতিরিশে অঘ্রাণ ওর বিয়ে।'

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনালিসা, এ কী শুনছি!'

উনত্রিশের! আর দশ দিনের পরে

ভুরু কুঁচকে বললো, 'কী? কী বললে?'

গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী! মরিয়া হলে মানুষের যে সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে— যা যা আগে আমি কখনো করি নি— বেগনি-বেগনি কালো রঙের ওর চোখ, একফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি— তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনালিসা।'

'মোনালিসা! সে আবার কে?'

'মোনালিসা তোমারই নাম,' বললো অসিত, 'জানো না?

'সে কী?'

হিতাংশু বললো, 'আর কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা-তো—' কৌতুকের রং লাগল ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে ঘেল মুখের উপর দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইল, চোখের পাতা দু'টি চোখের উপর নামল একবার।

হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য— কী কারণে বুঝলাম ন— আমাদের একটু যেন মন-খারাপ হলো, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিল হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগল ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কী শুনছি? মোনালিসা, কী শুনছি?'

'কী শুনছ বলো তো?' বলে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেলো। বর এলো বিয়ের দু'দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্শা, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হয়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বারবার বলতে লাগল— 'হীরেন বাবু কী সুন্দর দেখতে।'

অসিত জুড়ল— 'ধুতির পাড়টা!

'পা দুটো!' বলে উঠলো হিতাংশু। 'ধমন ফর্শা পা না-হলে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!'

আমি ফস করে বললাম, 'যা-ই বলো, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।'

'কী! বোকা-বোকা!' অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোল না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাচামেচি করে-করে বিয়ের অনেক আগেই সে-গলা ভেঙে বসে আছে। রেগে যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে বললো, 'এমন সুন্দর দেখেছ কখনো!'

'মোনালিসার মতো তো নয়!' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো! খুব মানিয়েছে দুজনে। চমৎকার!' বলে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ করে কোথায় যেন চলে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষ-রাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে-তা-ই মনে হয়েছিল তখন— মোনালিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু করে আলো বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখ ভরে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে। শুনতে পেলাম বিয়েবাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ— কাছে গেলাম। মনে হলো আর একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভোর— এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না— গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাঁকে, কত কাজ, কত সাজ— এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরল, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে

তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হলো।

সেইদিনের অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিশফিশে হলো। এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেন না বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দু'টো ঘরে, একতলা দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে স্যান্ডেল ক্ষইয়ে ফেলল। আমি একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারাদিন ভরে, কিন্তু আমার নিজের মনে হলো না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাতপাক ঘোরাবার সময় এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুলল, দুহাতে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ও সাত পাক ঘুরল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পর দিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর বনে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হলো তুলনায়— আমারও আর মনে হলো না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমনকি, আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো করে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দুজনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দুজনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলি না।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'দ্যাখো তো ভাই; তরু গেলো কোথায়।'

'ডেকে আনব?' বলে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদ পিঠ দিয়ে বসে মোনালিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ যেমন নতুন লাগল তাকে, একটু অন্যরকম, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে— হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারেরও না— আমার মনে হলো এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে মোনালিসার শরীর। জোরে নিঃশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিমঝিম করে উঠলো।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী?'

'কিছু না'— সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনালিসা, নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগল।

'শুনছ না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে?'

'বাঃ—!'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো— 'আর কী— চলেই তো যাব শিগগির।'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে— ঢাকা কি একটা জায়গা!'

'ঢাকা খুব ভালো।' ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালি মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বললো, 'তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?'

'আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আর কথা না। চলো এখন।'

'দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি! বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।'

কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনালিসা উঠলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, 'তারপর? সেই লোকটার কী হলো, হীরেনবাবু?'

কিন্ত হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনালিসা চেয়ারে বসে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগল।

আমি পীড়াপীড়ি করলাম, 'বলুন না কী হলো!'

'এখন থাক।'

আমি খাটে বসে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি, ভারি মজার বই।'

হীরেনবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর-একটি বই টেনে নিয়ে বললেন, এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি— এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ে ফ্যালো, আমি চট করে একটু ঘুমিয়ে নেই। কেমন?' বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

আর কথা না-বলে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ও-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও বসেছিল ঠিক সেখানটায় বসে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই পড়ে ছিল, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।

আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এলো, পেছোল, আর একটা, একটা দিন শুধু; তারপর চলে গেলো।

চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে! তিনজনের হয়ে জবাব লিখলাম, আমি, একটু লম্বাই হলো, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠি বন্ধ হয়ে গেলো শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে দেখতে খাতা ভরে উঠলো।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওর আসানসোল বেড়িয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলে সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত কমে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চলে যাবে দারজিলিং।

না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম মনে-মনে, কিন্ত সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে! এখানে! ঢাকায়! দারজিলিং-এর কী হলো? আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।'

'কী? অসুখ করেছে আবার?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি,' মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগল। খারাপ লাগল মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভাল নয়, অথচ অসুখও না— এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ,— যেন খুশীই হয়েছেন খবর শুনে। রীতিমতো রাগ হলো মনে মনে।

ওরা পৌঁছোবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনালিসা সোফায় বসে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম— হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।

'কেমন আছো মোনালিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম স্ফূর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটা মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ করে বললো, 'এই—'

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বললো, 'তোমাদের কী খবর?' তারপর আস্তে আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগল, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগল ঘন ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, 'তরু এখন কেমন আছো?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশ আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—' হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর?'

'হয় নি কিছু, তবে...'

তবে কী? ওর কি এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হয়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা বলে, একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকে, হাসি পেলে ভালো করে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনালিসা নাকি এই হলো?

ছোট একটা প্লেট হাতে করে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ তো?'

'কী, মা?'

'দ্যাখ না—' বলে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুজে দিলেন।

'না, না, আর না—', মোনালিসা মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দ হাটলাম আমরা, ঘন বিষণ্ন খুবই। হঠাৎ অসিত বললো, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিল সিগারেটের টিনে।'

'যা!' আমি আতকে উঠলাম।

'সত্যি! আমি দেখলাম!'

হিতাংশু বললো, 'তা হলে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বললো, 'ওর ছেলে হবে।'

শুনে হিতাংশুটা খুকখুক করে হেসে উঠলো।

'হাসছো কেন?'— আমি রেগে গেলাম— 'হাসবার কী আছে এতে?'

অসিত বললো, 'ঐ জন্যেই তো টক এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হলে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো!' রাগে গর্জে উঠলাম আমি।

'হলো কী তোমার?' অসিত যেন সকৌতুকে আমার দিকে তাকালো।

'যাও! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।' ওদের ত্যাগ করে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলা শেষের আলোয় একটা বই খুলে পড়তে বসে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু'দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হলো : হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?'

'না, না, আমি যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হলো। অসিত সাইকেলে উঠলো— স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে আসবেন আবার?'

'আসবো— তোমরা দেখো ওকে,' বলে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু হু করে উঠলো।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী-রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ-শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি আর অসিতের সাইকেল, ছোট হতে-হতে রাস্তার বাকে অদৃশ্য হলো; আমি আর হিতাংশু ভেতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনালিসা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

'মোনালিসা!'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেন বাবু আবার তো আসবেন—'

'এরপর ওকে আর যেতেই দেব না আমরা!'

'আর না— আর কেঁদো না, মোনালিসা, তোমার পায় পড়ি।' থামল না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাটু ভেঙে বসে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন করে বলতে লাগলাম, 'আর না, আর কাদে না, একটু থামো, একটু চুপ করো মোনালিসা!' হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

একটু পরে মোনালিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই— কাঁদছ কেন? বোকা!' আমি দুহাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুলে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, 'পুরুষমানুষ— কাঁদতে লজ্জা করে না। থামো এক্ষুণি!'

আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হাতেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধরে একটু একটু কাঁপল, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিস ওর খেতে ইচ্ছা করে, অসিত শহর চুঁড়ে তা জোগাড় করে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চলে যাবে, জানা কথা; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে, তাহলে তো কথাই নেই— আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হলেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক করে দেবেন বলেই চিঠি লিখছে না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতিবারেই মোনালিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরা চুপ করে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিন ওর শরীরটা অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারী হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেকে থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে একমাস কাটালেন।

ততদিন ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই উপকার হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই;— চোখে কালি পড়েছে, দু'টো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হয়ে যায়। আমরা কাছে কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসি-ঠাট্টায় ভোলাতে চাই— কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ , ও-রকম পারলে বেশ হতো।'

অসিত হো-হো করে হেসে উঠলো— 'আর যাই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!'

লাল হয়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বললো, 'কী কষ্ট, সত্যি! সারারাত নাকি পাইচারি করে— ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বললো, 'হবে না, দেখতে কীরকম হয়েছে দেখছ!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'কীরকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা...'

আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

সত্যি তাই, আমার চোখে সত্যিই তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটল, তত ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না-বলে পারলাম না সে-কথা। আগের বছর যেদিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিল, যেদিন রেলগাড়ির একটা ছোট কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধরে গিয়েছিল, ঠিক সেইরকম একটি শীতের আমেজ-লাগা দিনে হঠাৎ ও বললো, 'বিকাশ তোমার হয়েছে কী বলো তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!'

আমি একটুও লজ্জিত না হয়ে জবাব দিলাম, 'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ কি না, তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?'

'এখনকার মতো না!'

'তাই বুঝি?' মোনালিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকালো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'সত্যি আমাকে ভালোবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম করে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।— ইস, কী রোদ!'

আমি উঠে সামনের জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিল, ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছো, না?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দু'টির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চলে গেলেন কেন?'

'বা রে! ওর বুঝি কাজকর্ম নেই?'

'কবে আসবেন আবার?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিল যাবার— আমার মোটে ভালো লাগে না!'

'হয়েছে হয়েছে, আর সর্দারি করতে হবে না'— বলে পাশ ফিরে চোখ বুজল। বোজা চোখেই বলে নিলো, 'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে! মনে-মনে বললাম— কার কাছে বললাম জানি না— ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হলো ও হয়তো এতক্ষণ ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পাইচারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘন্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুণি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে ভাবতে ঘুম ছুটল চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে, আমার জানালা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে বসে বসে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হতে লাগল এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চলে গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাব ওকে— এ কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হলো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর সুন্দর কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে— রাত তখন দুটো প্রায়— লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ বিকা— শ!' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দুজন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে রাত্রে তখনও চাঁদ ওঠে নি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠে নি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিল তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম— শীতের রাত্রি, মাঠের মধ্যে, টিপটিপ বুকে।

'কী, অসিত? হিতাংশু কী খবর?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধহয়,' কথা বললো হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা, কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ সাদা হয়ে গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ-কদিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম; হাসি, ঠাট্টা, ঘোরাঘুরি কমে গিয়েছিল আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধরে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোট গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করি নি, কোনো কথাও বলি নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচুগলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে— একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই বসে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত গিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ও-ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না। শুধু বাইরে বসে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হলো, চললো বাকি রাত ভরে, চললো তার পরের দিন। ভোর হতেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে— মনে মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই— কী অসহায়, তবু মানুষ অসহায়— কী হচ্ছে, কী হলো, কী হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমশা ছাড়া আর-কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কুঁকড়ানো বুড়োমানুষ যে লুকিয়ে ছিল তা কে জানতো! কে জানতো আকাশের নীল নরম ঘোমটার তলায় এই কান্না লুকিয়ে আছে! আর আমাদের কি আর কিছু নেই, আর কিছু করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?

দুপুরের আগেই বিকেল হয়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চিৎকার উঠলো একটা; উঠলো, পড়লো আবার উঠলো আকাশের দিকে; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হলো না; আবার উঠলো চিৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগশিশুর আর্তরব, ঘন্টার পর ঘন্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চলে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যতদূর যাই সে-শব্দ সঙ্গে চলে আমাদের, মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?

ফিরে এলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি, কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে-তারা ছিল মাথার উপরে নেমে এলো পশ্চিমে, যে-তারা ছিল চোখের বাইরে উঠে এলো দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হলো, ছোট ছোট অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে চলা আলো-জ্বলা নৌকায়। অন্তত একমুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিল, আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত?

অসিত ফিসফিস করে বললো, 'কী হলো?'

হিতাংশু বললো, 'কই, না!'

'সব যেন চুপ?'

'তাই তো।'

'যাব একবার ভেতরে?' অসিত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠলো, এমন স্থির হয়ে আমরা তাকিয়েছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :

'এসো তোমরা, ওকে দেখবো।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে, আরো কত কিছু, বেলা দু'টো পর্যন্ত শুধু সাজাল, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইল ওরা দু'জন। আরো অনেক এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে বলে বাদ পড়লাম, পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম একা-একা। ঠিক একা-একাও নয়, কারণ ততক্ষণ হীরেনবাবু এসে পৌঁছেছেন, গাড়ির কাপড়ে জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে পাশে।

হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চলে গেলেন বদলি হয়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরও অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী একটা অসুখ করে হঠাৎ মরে গেলো। হিতাংশু এম. এস. সি. পাস করে জার্মানিতে গেলো পড়তে আর ফিরল না, সেখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতল, এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। আর আমি— আমি

এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ-শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া— সেই মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুরে, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই— তুমি! মোনালিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

কাঠঠোকরা

চরিত্র

সুমন্ত্র
সত্যবান
মল্লিকা

প্রথম অঙ্ক

সুমন্ত্র ও মল্লিকা

[পাতার মরমর শব্দ আর তার সঙ্গে পাখির ডাক]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!... মল্লিকা!

মল্লিকা (*দূর থেকে*)। কী— ঈ?

সুমন্ত্র। শোন।

মল্লিকা (*কাছে এসে*)। কেন ডাকছো?

সুমন্ত্র। এমনি।

মল্লিকা। এমনি?

সুমন্ত্র। এমনি ডাকতে নেই?

মল্লিকা। মিথ্যে করেই না-হয় একটা কারণ উদ্ভাবন করতে।

সুমন্ত্র। উদ্ভাবন না-করেও কারণ দেখাতে পারি। তোমাকে ডাকতে ভালো লাগে। আর তাছাড়াও যদি কারণ শুনতে চাও, এই গোলাপফুলটা দেখবার জন্যে ডেকেছি।

মল্লিকা। বাঃ, কী সুন্দর! তোমার এত বড় বাগানে ওর চেয়ে সুন্দর ফুল আজ অন্তত নেই।

সুমন্ত্র। আমার বাগান নয়, তোমার।

মল্লিকা। (*একটু পরে*)। এখানে এসে কী যে ভালো লাগছে কী বলবো!

সুমন্ত্র। সত্যি? আমি তো ভেবেছিলুম এই অফুরন্ত নির্জনতায় আমি ছাড়া কারো মন টিকবে না।

মল্লিকা। কী যে বলো! এই ঢেউ-খেলানো মাঠ আর ছবির মতো সাজানো গাছপালা আর দূরে আঁকাবাঁকা নীল পাহাড়— এর চেয়ে সুন্দর কিছু আছে নাকি! আর তাছাড়া—

সুমন্ত্র। তাছাড়া?

মল্লিকা। তাছাড়া এই অফুরন্ত নির্জনতা।

সুমন্ত্র। এই নির্জনতা তোমার ভালো লাগে?

মল্লিকা। তোমার লাগে না?

সুমন্ত্র। আমি তো ভেবেছিলুম তুমি বুঝি দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবে। কথা বলবার লোকের মধ্যে তো আবদুল, লছমন সিং, আর আমি।

মল্লিকা। ওঃ, খুব বিনয় শিখেছো দেখছি!

সুমন্ত্র। তবে কি দাম্ভিক হতে বলো? বিশ্বাস করো, আমার সৌভাগ্য আমার নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি কখনো ভাবতে পারি নি যে তুমি—

মল্লিকা। থাক, থাক, এ-কথা অনেকবার শুনেছি তোমার মুখে। আশা করি তেরোই বৈশাখের পর থেকে আর শুনতে হবে না।

সুমন্ত্র। তেরোই বৈশাখ!... এক-এক সময় মনে হয় ঐ দিনটি যত দেরি করে আসে ততই ভালো। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে আছি। কেবলই ভয়, পাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়।

মল্লিকা। স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ-রকম আশঙ্কা তোমার হচ্ছে নাকি?

সুমন্ত্র। ভয় আমার নিজেকেই।

মল্লিকা। তার মানে— তোমার মন এখনো বদলাতে পারে?

সুমন্ত্র। না, তা নয়। ভয় এই যে পাছে আমার অযোগ্যতা তোমার চোখে ধরা পড়ে যায়।

মল্লিকা। দ্যাখো, এ-সব কথা তুমি আর কখনো বলবে না আমার কাছে।

সুমন্ত্র। বেশ, তবে আর বলবো না। সেদিন তোমাকে যখন আংটি পরিয়ে দিই, কী মনে হচ্ছিল জানো?

মল্লিকা। কী?

সুমন্ত্র। মনে হচ্ছিল, চুপ করে থেকেই সব চেয়ে গভীর কথাগুলো বলা যায়।

মল্লিকা। আংটিটা তোমার মা-র— না?

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তিনি রেখে গিয়েছেন।

মল্লিকা। কত বড় হীরে! অনেক দাম আংটিটার?

সুমন্ত্র। ওর সবচেয়ে বড় দাম এই যে তোমার আঙুলকে জড়িয়েছে।

মল্লিকা। তোমার মাসিমা বলছিলেন যে এর পাঁচ হাজার টাকা দাম?

সুমন্ত্র (*উদাসীনভাবে*)। তা হবে।

[একটু চুপচাপ। আবার পাখির ডাক]

মল্লিকা। কী পাখি ওটা?

সুমন্ত্র। কোন্‌টা?

মল্লিকা। ঐ শোন।

[একটু— আবার পাখির ডাক]

সুমন্ত্র। দোয়েল।

মল্লিকা। সত্যি-সত্যি দোয়েল বলে পাখি আছে তাহলে? আর সে ডাকেও! ঘুঘুর ডাকও এখানে এসে প্রথম শুনলুম।

সুমন্ত্র। আর কাঠঠোকরা!

মল্লিকা। হ্যাঁ— অদ্ভুত পাখি! দুপুরবেলা, সমস্ত পাখির ডাক যখন থেমে যায়, তখন আরম্ভ হয় ওর ঠুকঠুক অধ্যবসায়। সমস্ত দুপুরবেলাটা যেন ওরই একচেটে সম্পত্তি।

সুমন্ত্র। তুমি বুঝি পশুপাখি খুব ভালোবাসো?

মল্লিকা। ভালো যে বাসি তা তো এতদিন জানতুম না। এখানে এসে দেখছি পশু, পাখি, গাছপালা— এরা সকলেই আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত। এ যেন

এক নতুন রকমের বাঁচা। তোমাকে সত্যি বলছি, এত সব বিখ্যাত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু রাঁচি থেকে ছত্রিশ আর হাজারিবাগ থেকে চব্বিশ মাইল দূরে—

সুমন্ত্র। ভুল বললে। রাঁচি থেকে বিয়াল্লিশ আর হাজারিবাগ থেকে আঠারো মাইল। এ-বাড়ির সামনেই একটা মাইল-পোস্ট আছে।

মল্লিকা। সে যাক্‌গে। কথাটা এই যে তোমার এই রজতরুপ্পায় এসে যত ভালো লাগছে, এত ভালো আর কোথাও লাগে নি। এখানে সবই সুন্দর। বেঁচে থাকা যে এত অর্থময় কলকাতার হট্টগোলে কোনোদিন তা বুঝি নি। দ্যাখো, কলকাতায় আমরা আর না-ই ফিরলাম। এখানেই থাকি।

সুমন্ত্র। তুমি যদি বলো এখানেই আমরা থাকবো। কিন্তু তোমার ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে না?

মল্লিকা। ফাঁকা ঠেকবে কেন? তুমিই তো আছো।

সুমন্ত্র। অবশ্য তেরোই বৈশাখের জন্য একবার কলকাতায় যেতে হবে।

মল্লিকা (*একটু পরে*)। আর ঠিক একুশ দিন বাকি আছে।

সুমন্ত্র। ম্যানেজারবাবু লিখেছেন অন্তত চার-পাঁচদিন সময় হাতে রেখে আমাদের ফেরা দরকার।

মল্লিকা। কেন, ঠিক আগের দিন পৌঁছলেও তো চলে। এ-নির্জনতা যতদিন পারি ভোগ করতাম।

সুমন্ত্র। এ তো রইলোই।

মল্লিকা। তবু। সমস্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে কোথায় যেন চলে এসেছি, এই বিস্ময়ের ভাবটাই এখনো আমার কাটে নি। মনে হচ্ছে, অনেক অনেক বছরেও রজতরুপ্পা আমার কাছে পুরোনো হবে না। ঠিক এইভাবেই যদি সারাজীবন কাটতো... তোমার কে না এক বন্ধুর আসবার কথা দু'একদিনের মধ্যে?

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুকে আসতে লিখেছিলুম। তুমি কি তার জন্যে রাগ করেছো?

মল্লিকা। এমনিই তো বেশ ছিলুম।

সুমন্ত্র। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না তোমার।

মল্লিকা। না, না, অসুবিধের কথা নয়।

সুমন্ত্র। আমার বন্ধু অসাধারণ লোক, তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবে। পাছে তোমার একঘেয়ে লাগে, সেইজন্যেই আমি আরো...

মল্লিকা। আসল কথা, তোমারই আর একজন সঙ্গীর দরকার। কেবল আমার সঙ্গে কথা বলে সময় আর কাটছে না!

সুমন্ত্র। সত্যবান নিজেই একবার লিখেছিল আসবে, তাই আমি ভাবলুম...

মল্লিকা। থাক, আর জবাবদিহি দিতে হবে না।... কী নাম বললে তোমার বন্ধুর?

সুমন্ত্র। সত্যবান।

মল্লিকা। পুরো নাম কী?

সুমন্ত্র। সত্যবান দত্ত।... ও-নামের কাউকে চেন নাকি?

মল্লিকা (*ক্ষীণস্বরে*)। কী যেন, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে নামটা।

সুমন্ত্র। আমি ওকে অনেকদিন থেকেই বলছিলুম এখানে একবার আসতে, সময়ই হয় না ওর। এবারে বলছিল... আমি তাই ভাবলুম...

মল্লিকা। কী আশ্চর্য! এত কথা বলছো কেন? আমি ভেবেছিলুম আমাকে হলেই তোমার চলে। ভুল ভেবেছিলুম। কোনো পুরুষেরই তা চলে না।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!

মল্লিকা। উঁ।

সুমন্ত্র। চলো ঘরে যাই। চা খাবে না?

মল্লিকা। চলো... তোমার বন্ধু কবে আসবে?

সুমন্ত্র। তুমি এ নিয়ে এত ভাবছো কেন, মল্লিকা? সমস্ত জীবন তো আমাদেরই পড়ে রয়েছে। আমরা কি এতই কৃপণ যে দু'দিনের জন্যেও আর-একজনকে জায়গা দিতে পারবো না?

মল্লিকা (*শুষ্ক একটু হেসে*)। কী করবো, স্বভাবতই আমি কৃপণ, আমি হিংসুক।

সুমন্ত্র (*সরলভাবে হেসে*)। দুঃখের বিষয়, হিংসে করবার কোনো লোক নেই। আর তাছাড়া, সত্যবান এত চমৎকার মানুষ যে ও এলে তোমার নির্জনতা একটুও ভাঙবে না, অথচ আড্ডার সময় আড্ডা জমবে।

মল্লিকা। তুমি তোমার বন্ধুর একজন ভক্তও দেখছি!

সুমন্ত্র। তা বলতে পারো।

মল্লিকা। কী করেন ভদ্রলোক?

সুমন্ত্র। কথাটা যদি সাংসারিক অর্থে জিজ্ঞেস করে থাকো, অর্থাৎ, কত টাকা সে রোজগার করে, তা যদি জানতে চাও, তাহলে সে বিশেষ-কিছু করে না।

মল্লিকা। আর অন্য অর্থে?

সুমন্ত্র। অন্য অর্থে সে খুব বড় কাজ করে— কবিতা লেখে।

মল্লিকা। সংসার কী করে চলে?

সুমন্ত্র। সংসার বলতে ওর কিছু নেই।

মল্লিকা। কবি বুঝি বিয়ে করেন নি?

সুমন্ত্র। কোথায় আর!

[দূরে মোটরের শব্দ]

মল্লিকা। তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের অনেকদিনের আলাপ বুঝি?

সুমন্ত্র। তা বছর দশেক হবে।

মল্লিকা। তাহলে তো খুবই পুরোনো বন্ধু তোমার। কলকাতাতেই আলাপ?

সুমন্ত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই। একেবারে পাগল— গভর্মেন্টের একটা চাকরি পেয়েও নিলে না!

মল্লিকা। বিয়ে করলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে।

সুমন্ত্র। দেখা যাক।

মল্লিকা। এতদিনেও বিয়ে করেন নি, দু'একবার হৃদয় ভাঙে-টাঙেনি তো? কবি মানুষ— কিছু বলা যায় না।

সুমন্ত্র। ভেঙে থাকলেও তো আর আমাকে বলবে না!

মল্লিকা। কেন, এত না অন্তরঙ্গ বন্ধু!

সুমন্ত্র। ওরে বাবা— ভীষণ চাপা!

[মোটরের শব্দ আর একটু কাছে]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!

মল্লিকা (*অন্যমনস্কভাবে*) উঁ?

সুমন্ত্র। চলো চা খাওয়া যাক।

মল্লিকা (*একটু পরে*)। উঁ? কী বললে?... হ্যাঁ, চলো।

সুমন্ত্র। একটু দাঁড়াও। গাড়িটা আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে না?

মল্লিকা। তা-ই তো মনে হচ্ছে।

[গাড়ি ঢোকবার ও থামবার শব্দ]

সুমন্ত্র। আরে! সত্যবান! আমি ভেবেছিলুম তুমি কাল কি পরশু আসবে।

সত্যবান। আজই এলুম। তোমার চিঠি পেয়েই একেবারে হাওড়া ইস্টিশান।

সুমন্ত্র। জিনিসপত্র কোথায় তোমার?

সত্যবান। এই যে বাক্স।

সুমন্ত্র। আর?

সত্যবান। এই তো। বিছানা একটা দিতে পারবে না?

সুমন্ত্র। তা পারবো।... মল্লিকা, এঁর কথাই বলছিলুম তোমাকে। আমার বন্ধু সত্যবান...

সত্যবান। বাঃ, এঁর সঙ্গে আবার পরিচয় করিয়ে দেবে নাকি? কী মল্লিকা, কেমন আছো?

সুমন্ত্র। আমি তো জানতুম না যে তোমার পরিচিত।

সত্যবান। আর তুমিও বেশ লোক বাপু, কাকে বিয়ে করছো তা বলতে হয় না! বেশ, খুব সুখী হলাম। হ্যাঁ, সুমন্ত্র, ট্যাক্সিভাড়াটা দিয়ে দাও তো। দশ টাকা।

সুমন্ত্র। একটা তার করতে যদি, আমার গাড়িটাই পাঠিয়ে দিতুম স্টেশনে।

সত্যবান। ভেবেছিলুম বাস-এ-ই আসবো। তারপর ভাবলুম সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে এমন সুন্দর দৃশ্য ভালো করে দেখতে পাবো না!

সুমন্ত্র। তাছাড়া বাস্-এ বড্ড কষ্ট।

সত্যবান। কষ্ট তোমার হতে পারে, আমার হতো না। আমার পক্ষে ট্যাক্সিতে আসা হলো আরাম— বাবুগিরি— বিলাসিতা— যা বলো! এত বড় একখানা গাড়িতে এতখানি রাস্তা একা-একা আসতে বেশ লাগছিল। ইস্— 'জয়ন্তী'র সম্পাদক ব্রজগোপালটা একবার দেখলে না! দেখলে বুঝতো আমি একটা যে-সে লোক নই, দস্তুরমতো রাঁচি-হাজারিবাগ রোডে মোটর হাঁকিয়ে চলি। আর ও তো বোধ হয় হাওড়া পুল পেরোয় নি কোনোদিন।

সুমন্ত্র। চলো ঘরে। ট্যাক্সিভাড়াটা চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলেই হবে!

সত্যবান। চলো।... সুমন্ত্র, তুমি তো দেখছি বিরাট একটি ভণ্ড। সর্বদাই বলতে, ছোটখাটো একটি বাড়ি আছে রজতরুপ্পায়। বাড়ি! এ যে দেখছি প্রাসাদ! আর কী বাগান! কী গাছপালা! কী ফুল! এ তো স্বর্গ।

সুমন্ত্র (*লজ্জিতভাবে*) থামো, তুমি, সত্যবান। চলো ভিতরে।

সত্যবান। ক'টা ঘর আছে তোমার বাড়িতে? কুড়িটা?

সুমন্ত্র (*একটু হেসে*)। তা দশ-বারোখানা হবে। আমার কী দোষ, বলো— ঠাকুরদা করে গেছেন—

সত্যবান। বাঃ, আমি কি তোমার দোষ বলছি! ভাগ্যিস তোমার ঠাকুরদা কিছু বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেলেন, তাই তো তুমি আজ পায়ে পা তুলে মহা আরামে দিন কাটাচ্ছো, আর আমিও তোমার এই বাড়িতে এসে স্বর্গসুখ অনুভব করছি। পৃথিবীতে বড়লোকও কিছু থাকা দরকার— কী বলো, মল্লিকা?

সুমন্ত্র। মল্লিকা, আমি যদি জানতুম যে তুমি সত্যবানকে চেন—

মল্লিকা। আমি— আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

সত্যবান। অনেক আগে— ওদের বাড়িতে আমি মাঝে-মাঝে যেতুম। মল্লিকার দাদা যে-ফিল্ম কোম্পানির ডিরেক্টর, তার জন্যে একটা গল্প লিখেছিলুম সেবার। মল্লিকার কি আর সে-কথা মনে আছে! আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলে?

মল্লিকা। পেরেছিলুম।

সত্যবান। তুমি কেমন আছো তা তো বললে না।

মল্লিকা। ভালো আছি। আপ— আপনি কেমন আছেন?

সত্যবান। কেমন দেখছো? বুঝলে, সুমন্ত্র, ঐ ভিটামিন-বি ফুডটা খেয়ে রীতিমতো উপকার পাচ্ছি। চেহারা আমার ভালো দেখছো না একটু?

সুমন্ত্র। চেহারা তো তোমার বরাবরই ভালো।

সত্যবান (*খুশি হয়ে*)। বেশ ভালোই দেখছো তাহলে! একটা মল্ট-এক্সট্র্যাক্ট খেলে বোধ হয় আরো ভালো হয়।

সুমন্ত্র। আপাতত তোমার ওর চেয়ে ভারি কোনো খাদ্যের দরকার, নয়?

সত্যবান। নিশ্চয়ই! দারুণ খিদে পেয়েছে। কী খাওয়াবে চায়ের সঙ্গে? ডিম, রুটি-মাখন-মার্মলেড, আর চীজ, কী বলো? মল্লিকা, তুমি কি এখন থেকেই সংসার চালাচ্ছো?... ঐ যাঃ, সুমন্ত্রর যে দশজন চাকর রাখবার ক্ষমতা আছে, আর তোমার যে কিছুই করতে হবে না, তা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিয়ে কবে?

সুমন্ত্র। আর একুশ দিন পরে।

সত্যবান। সুখী হলাম, খুব সুখী হলাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তিন দিন পরে]

সুমন্ত্র ও মল্লিকা

সুমন্ত্র। বেড়াতে যাবে না?... মল্লিকা, বেড়াতে যাবে না?... মল্লিকা!

মল্লিকা। (*চাপা রাগের সুরে*) না, যাবো না।

সুমন্ত্র। সে কী! তুমিই তো বলেছিলে—

মল্লিকা। যখন বলেছিলুম, বলেছিলুম।

সুমন্ত্র। সত্যি যাবে না?

মল্লিকা। না।

সুমন্ত্র। রাগ করেছো?

মল্লিকা। আমি রাগ করলে তোমার কী এসে যায়?

সুমন্ত্র। কেন রাগ করেছো তা জানতে পারলে প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারি।

মল্লিকা। থাক্ থাক্, আর ভালোমানুষিতে কাজ নেই।

সুমন্ত্র। ধামাই জঙ্গলের ধারে বেড়াতে যাওয়া তোমারই তো সখ।

মল্লিকা। আর সখ নেই।

সুমন্ত্র। লক্ষ্মী তো! চলো নয়তো সত্যবান কী মনে করবে!

মল্লিকা। (*জ্বলে উঠে*) উনি কী মনে করবেন সেই ভেবে আমাকে চলতে হবে নাকি?

সুমন্ত্র। এ নিয়ে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, মল্লিকা? এ তো সাধারণ ভদ্রতার কথা।

মল্লিকা। বেশ তো, তোমার বন্ধু, তুমি ভদ্রতা করো। আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন?

সুমন্ত্র। কী আশ্চর্য—

মল্লিকা। হ্যাঁ, আশ্চর্যই! তুমি তোমার বন্ধুর যে-রকম অনুগত সেটাই আশ্চর্য। পারলে বোধ হয় পূজো করো। সত্যবান দত্তকে তুমি দেবতা মনে করো— না?

সুমন্ত্র। কী-সব বলছো!

মল্লিকা। সত্যি কথা বলছি। সারাটা দিন তো ওর সঙ্গেই আছো। আমি যে এ-বাড়িতে আছি তা কারো মনেই পড়ে না।

সুমন্ত্র। ওকে বাদ দিয়ে তুমি আর আমি গল্প করবো তা কি ভালো দেখায়? তুমিই বলো!

মল্লিকা। বেশ তো, যা ভালো দেখায় তা তো করছোই। কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল তাহলে আমাকে এখানে আনলে কেন?

সুমন্ত্র। তুমি কী বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

মল্লিকা। কেমন করে বুঝবে? যদি বুঝতে তাহলে কি আর এই দিনগুলোর মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে ঢুকতে দিতে! নষ্ট হলো এই সোনার দিনগুলো!

সুমন্ত্র (*একটু পরে*)। আমি কিন্তু ভেবেছিলুম ও এলে তোমারও ভালো লাগবে।

মল্লিকা। তুমি ভুলে গিয়েছিলে উনি তোমারই বন্ধু, আমার বন্ধু নন।

সুমন্ত্র। কেনই বা নয়? তুমি তো ওকে আগে থেকেই চিনতে।

মল্লিকা। চ্ছোঃ! ও-রকম চেনা কত লোকের সঙ্গেই হয়।

সুমন্ত্র। তবু— চিনতে তো। আর এখন আমার সূত্রে পরিচয় আরো ঘনীভূতই হওয়া উচিত।

মল্লিকা। বিয়ের এটা একটা শর্ত নাকি?

সুমন্ত্র। সত্যবান সম্বন্ধে তোমার মনে যদি বিরুদ্ধভাব থাকে, সেটা আমার পক্ষে দুঃখের কথা বইকি।

মল্লিকা। কী করবে তাহলে? বিয়ে ভেঙে দেবে? সত্যবানবাবু বললে তুমি বোধ হয় তাও পারো।

সুমন্ত্র। নাঃ, সত্যি তোমার মাথা-খারাপ হয়ে গেছে।... তবু, আমার একটা কথা তুমি রাখো। বাইরের ভদ্রতাটা যেন অন্তত বজায় থাকে।

মল্লিকা। ভদ্রতা সম্বন্ধে কী তোমার ধারণা, শুনি?

সুমন্ত্র। এ-পর্যন্ত সত্যবানের সঙ্গে তুমি বোধ হয় চার-পাঁচটার বেশি কথা বলো নি।

মল্লিকা। দরকার বোধ করি নি।

সুমন্ত্র। এমনকি, চুপচাপ খাওয়া শেষ করে তক্ষুণি উঠে যাও, সারাদিন নিজের ঘরেই বন্ধ হয়ে থাকো, আমাদের কোনো গল্পে, কোনো কথায় যোগ দাও না। ওতে কি সত্যবান মনে-মনে একটু দুঃখিত হতে পারে না?

মল্লিকা। দুঃখিত হলে আমি কী করতে পারি?

সুমন্ত্র। তার উপর আজ যদি বেড়াতে না যাও—

মল্লিকা। তুমি যতই বলো, কিছু-তেই আমি যাবো না।

সুমন্ত্র। তাহলে...

মল্লিকা। তুমি যাও না। আমার মন রক্ষা করবার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে না-থাকলেও চলবে।

সত্যবান। (*চেঁচিয়ে— বাইরে থেকে*) সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। এই যে।

সত্যবান। (*বাইরে থেকে*)। তোমার নতুন রেজার ব্লেড আছে?

সুমন্ত্র। আমার ড্রেসিং টেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে পাবে।

সত্যবান। আচ্ছা।

[একটু চুপচাপ]

মল্লিকা। যাও, বন্ধুর আর কী-কী দরকার দেখে এসো।

সুমন্ত্র। ওর যা দরকার ও নিজেই নিতে পারবে।

মল্লিকা। হ্যাঁ, তা পারবে। তোমার জিনিস তো ওরই জিনিস। এমনকি ট্যাক্সি-ভাড়াটা পর্যন্ত—

সুমন্ত্র। ওর হাতে টাকা ছিল না, আমি দিয়ে দিয়েছি, তা কী হয়েছে!

মল্লিকা। হ্যাঁ, তা-ই বলছি। মন-ভোলা মানুষ, কিছুই সঙ্গে আনেন নি, সবই তোমার উপর চলছে, সাবান, সিগারেট, ক্ষুরের ব্লেড, সব। তোমার অন্ধ চোখে তো কিছু ধরা পড়ে না, কিন্তু বাইরের যে-কোন লোকের চোখে এটা বিসদৃশ ঠেকবে। এমন নির্লজ্জভাবে পরের মাথায় হাত বোলাতে আমি তো কখনো দেখি নি।

সুমন্ত্র। ছি-ছি-ছি!

মল্লিকা। তুমি কি মনে করো ও সত্যি তোমাকে ভালোবাসে? নিছক স্বার্থ— যা পারে প্রাণপণে আদায় করে নিচ্ছে।

সুমন্ত্র। আস্তে, আস্তে!

মল্লিকা। তুমি হয়তো আমার কথা শুনে মর্মাহত হচ্ছো— ভাবছো, আমি হীন, আমার ছোট মন— তা আমার সম্বন্ধে তুমি যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু যা সত্য তা আমি বলবোই।

সুমন্ত্র। তোমার যা মনে হয় তা নিশ্চয়ই বলবে।

মল্লিকা। তোমাকে যত রকমে পারে শোষণও করবে, এদিকে তোমার ঈর্ষায় ওর বুক ফেটে যাচ্ছে, তা কি তুমি বোঝো না? লোকটা আস্ত একটা ক্যাড।... শুনলে তো আমার কথা? এখন যাও, বন্ধুর সঙ্গে বেড়িয়ে এসো।

[দরজায় টোকা]

সত্যবান (*বাইরে থেকে*)। আসতে পারি?

সুমন্ত্র। এসো, এসো।

[সেজেগুজে সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান। কী, মল্লিকা যাবে না?

সুমন্ত্র। না, ওর মাথা ধরেছে, বেরোবে না।

সত্যবান। তা মোটরে বেড়ালে তো মাথা-ধরা সারতো।

সুমন্ত্র। ধামাই জঙ্গলে আর-একদিন যাবো, আজ চলো মোটরের রাস্তা ধরে রামগড় পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।

সত্যবান। একা-একা বাড়ি বসে মল্লিকার কি ভালো লাগবে?

মল্লিকা। আমার ভালো লাগবার জন্য ভাববেন না, আপনারা ঘুরে আসুন।

সত্যবান। বুঝতে পেরেছি। মল্লিকার এখন কিছুই ভালো লাগছে না।

সুমন্ত্র। কেন? কেন?

সত্যবান। বাঃ, আমি এসে তোমাকে একেবারে একচেটে দখল করে রেখেছি এটা কি কোনো ভাবী স্ত্রীর ভালো লাগতে পারে?

সুমন্ত্র (*শুষ্কভাবে*)। হাঃ-হাঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই দিনই সন্ধ্যার পরে]

(মল্লিকা একা বসে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজাচ্ছে। বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ। একটু পরে সুমন্ত্র ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্যবান। এই যে মল্লিকা। বারান্দায় অন্ধকারে একলা বসে গ্রামোফোন শুনছো? আমাদের সঙ্গে গেলেই পারতে। খুব ভালো লাগতো। ও কী? বন্ধ করলে কেন রেকর্ডটা? বেশ তো চলছিলো।

মল্লিকা। থেমে গেল।

সত্যবান। মাথা-ধরা ছেড়েছে তোমার?

সুমন্ত্র (*তাড়াতাড়ি*)। তা ছেড়েছে নিশ্চয়ই, নয়তো কি আর গ্রামোফোন শুনতো। মল্লিকা, আজ আমরা এমনি একটু বেড়িয়ে এলাম। ধামাই জঙ্গলের ধারে আর একদিন যাবো, কেমন?

সত্যবান। ঐ জঙ্গলটার কোনো বিশেষত্ব আছে নাকি?

সুমন্ত্র। না, বিশেষত্ব আর তেমন কী! আমাদের এই বারান্দায় বসে ঐ যে ঘন সবুজ একটা রেখা দেখা যায়, ঐটে ধামাই বন। মাইল পাঁচেক দূর এখান থেকে। মল্লিকা এখানে আসবার পর দিন থেকেই বলছে ওখানে একদিন বেড়াতে যাবে।... কিন্তু একদিনও যাওয়া হয় নি এ-পর্যন্ত।

সত্যবান। বেশ তো, চলো না একদিন। শিকার পাওয়া যায়?

সুমন্ত্র। প্রচুর।

সত্যবান। তবে আর কী! তোমার বন্দুকটা আছে না?

সুমন্ত্র। ওঃ, ধামাই জঙ্গলে পাখির একেবারে ছড়াছড়ি।

মল্লিকা। প্রকাণ্ড পুরুষমানুষ বন্দুক ঘাড়ে করে গিয়ে ছোট-ছোট পাখিগুলোকে কী করে মারো? ভাবতে পারিনে।

সত্যবান। সত্যি, মারতে, কিংবা মারতে দেখলে, ভারি খারাপ লাগে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঐ পাখিই যখন রান্না হ'য়ে টেবিলে আসে, খেতে একটুও খারাপ লাগে না। কবে যাবে শিকার করতে?

সুমন্ত্র। গেলেই হয় একদিন। না-গেলেও হয়। ধামাই জঙ্গলের ভিতরে বেশিদূর কোনোদিন যাই নি।

সত্যবান। কেন, বড় জানোয়ারও আছে নাকি?

সুমন্ত্র। তা থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য নয়। জঙ্গলটা মস্ত, বেশিদূর গেলে পথ হারিয়ে যায়, ফিরে আসা মুস্কিল। একবার এক সায়েব শিকার করতে গিয়ে তো আর ফিরলোই না। বড়-বড় জঙ্গলে এ-রকম হয় জানো তো?

সত্যবান। তা বেশিদূর না-গেলেই হলো।

মল্লিকা। আমি তো মনে করি না-যাওয়াই সব চেয়ে ভালো।

সত্যবান। ঠিকই। সুমন্ত্র, তোমার এখন প্রাণের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে— সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

সুমন্ত্র। আচ্ছা, সে পরে যা হয় ঠিক হবে। তোমরা একটু বোসো, আমার গোটা কয় চিঠি লিখতে হবে।

সত্যবান। একটু চা খেলে হতো।

মল্লিকা (*তাড়াতাড়ি*)। আমি যাই, চায়ের ব্যবস্থা করিগে।

সুমন্ত্র। তুমি বোসো, মল্লিকা। আবদুলকে আমি চায়ের কথা বলে দেবো।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান]

[একটু চুপচাপ]

সত্যবান। তুমি বলো তো আমি নিজের ঘরে চলে যেতে পারি।

মল্লিকা। দরকার বোধ করলে আমিই যাবো।

সত্যবান। হয়তো তোমার ইচ্ছা এখানে একা বসে আকাশের তারা দ্যাখো।

মল্লিকা। আপনি থাকলে তার বিঘ্ন হবে না।

সত্যবান। হবে না তো? নিশ্চিন্ত হলুম। একটা সিগারেট ধরাতে পারি?

মল্লিকা। জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য।

[সত্যবান সিগারেট ধরালো]

সত্যবান। অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো।

মল্লিকা। (*চুপ*)।

সত্যবান। সুমন্ত্রর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কবে?

মল্লিকা। মনে নেই।

সত্যবান। মনে হচ্ছে চিরকালের চেনা— না?

মল্লিকা। তাহলে আপনি তো বোঝেনই।

সত্যবান। বুঝি বইকি। তুমিই একদিন বুঝিয়েছিলে।

মল্লিকা (*একটু পরে*)। আচ্ছা... আপনি বসুন। আমার একটু কাজ আছে।

সত্যবান। কাজ কিছু নেই। আমার কথা শুনতে তোমার ভালো লাগে না— এই আর কী। সেজন্য তোমাকে দোষও দিতে পারিনে।... কী, যাচ্ছো না?

মল্লিকা। একটা কথা জানতে চাই। আপনি কদিন আছেন?

সত্যবান। তুমি যদি বলো কালই চলে যাবো।

মল্লিকা। আমি অমন কথা বলবোই বা কেন, আর বললেই বা আপনি আমার কথামতো চলবেন কেন।

সত্যবান। আমি চ'লে গেলে তুমি সুখী হও তা জানি। কিন্তু মুস্কিল এই যে হঠাৎ চলে গেলে সুমন্ত্র খুব দুঃখিত হবে। ও আবার ভারি সেন্টিমেন্টাল মানুষ।

মল্লিকা। সৎ হওয়া, সরল হওয়া, আন্তরিকভাবে অনুরাগী হওয়া— এ সবই আপনাদের কাছে ন্যাকামির নামান্তর, তা-ই নয়।

সত্যবান। দ্যাখো মল্লিকা, সুমন্ত্রর যে কত গুণ তা আমার চেয়ে ভালো তুমিও জানো না। কিন্তু ওর সব চেয়ে বড়ো গুণ এই যে ওর প্রচুর পয়সা আছে।

মল্লিকা (*উষ্ণস্বরে*)। পয়সা যার আছে সে-ই একটা অমানুষ এমন কথা আমি কখনো ভাবতে শিখি নি।

সত্যবান (*হেসে*)। আমি কিন্তু একটুও ঠাট্টা করে বলি নি কথাটা।

মল্লিকা। তাছাড়া একজনের পয়সা থাকলে আর পাঁচজন উপকৃত হয়।

সত্যবান। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই যেমন সুমন্ত্রর দৌলতে আমি এই বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নবাবি করছি। জানো, মল্লিকা এখানে এসে অবধি আমার ইংরেজ কবির সেই লাইনটি বার-বার মনে পড়ছে—

'How pleasant it is to have money, heigh ho !
How pleasant it is to have money !'

সত্য, সত্য, এত বড় সত্য আর-কিছু নেই।

মল্লিকা। পয়সা সম্বন্ধে অত বেশি ভাবা আমার মনে হয় অসুস্থ মনের পরিচয়।

সত্যবান। সে তো সত্যি কথাই। পয়সার কথা জীবনে কখনো যাদের ভাবতে হয় না— যেমন তুমি কি সুমন্ত্র— তারা কত সুস্থ, কত সুখী, তাদের জীবন কত বেশি পরিপূর্ণ! সেইজন্যই তো বলছিলাম যে সুমন্ত্রর সব চেয়ে বড় গুণ এই যে ওর পয়সা আছে। সততা, নির্ভীকতা, আন্তরিকতা, উদারতা— মানুষের মধ্যে যা সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে মূল্যবান— পয়সা থাকলে তবেই সেগুলো ফোটে। যার মধ্যে যেটুকু ভালো, সচ্ছলতাই তা টেনে বার করে।

মল্লিকা। কেন, বড়লোকদের মধ্যে বিশ্রী, বাজে লোকও তো কত আছে।

সত্যবান। ওটা তোমার ভুল ধারণা, মল্লিকা। পয়সা যার নেই তার মতো চরিত্রহীন আর কেউ নয়। সে বোবা, সে বোবা, সে ভণ্ড, নিজের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে তার অফুরন্ত জোচ্চোরি। এই ধরো না— আমার যদি যথেষ্ট পয়সা থাকতো তাহলে তোমার জীবন আর আমার জীবন আজ—

মল্লিকা। থামো, থামো তুমি!

সত্যবান। তাহলে আমার মধ্যে যে-সব ভালো-ভালো গুণ আছে সেগুলো চাপা পড়ে থাকতো না, আর তুমিও—

মল্লিকা (*ক্ষীণস্বরে*)। ও-সব কথা আর কেন?

সত্যবান। তাহলে আমার জীবন এমন করে নষ্ট করতে তুমি পারতে না।

মল্লিকা। নষ্ট! কে নষ্ট করেছে তোমার জীবন! তুমি নিজে!

সত্যবান। না, না, মল্লিকা, তুমি— তুমি! তা হোক— তোমার জীবন শেষ পর্যন্ত সার্থক হলো সেটুকুই সুখের কথা।

মল্লিকা। তুমি যদি ভদ্রলোক হতে, তাহলে আজ আমার এই পূর্ণতার দিনে আমাকে এমন করে বিদ্রূপ করতে না।

সত্যবান। ভদ্রলোক আমি নই তা তো তুমি জানো, আর সেইজন্যই তো আমাকে ত্যাগ করলে।

মল্লিকা। আমার যে-নতুন জীবন গড়ে উঠছে তা ধ্বংস করবার জন্যেই কি তুমি এখানে এসেছো?

সত্যবান। কী আশ্চর্য! তোমার জীবন ধ্বংস করবার মতো শক্তি আমার কোথায়... যদি না তুমিই দিয়ে থাকো।

মল্লিকা। তুমি স্বার্থপর, তুমি ধূর্ত— তোমার মন ঈর্ষায়, বিদ্বেষে ভরা। এখানে— এই বাড়িতে ব'সে তুমি যার রাজকীয় আতিথেয়তা ভোগ করছো, অনায়াসে তারই সর্বনাশ করতে পারো তুমি।

সত্যবান। পারি... তুমি যদি রাজি হও।

মল্লিকা। আমি! আমি রাজি হ'বো! তুমি বলছো কী!

সত্যবান। যাবে, যাবে আমার সঙ্গে পালিয়ে? চলো ধামাই বনে গিয়ে বাসা বাঁধি— কেউ আমাদের সেখানে খুঁজে পাবে না।

মল্লিকা (*রুদ্ধস্বরে*)। তোমার সাহস হলো!... ও-কথা মুখে আনবার সাহস হলো তোমার!

সত্যবান। যদি বলি এ-সাহস তুমিই দিয়েছো?

মল্লিকা (*প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে*)। আর না! আর একটি কথা না! চুপ, চুপ, চুপ!

সত্যবান। তাহলে এখনো সময় আছে।

মল্লিকা (*প্রায় আর্তস্বরে*)। পায়ে পড়ি তোমার, যাও এখান থেকে, যাও।

সত্যবান। তুমি?

মল্লিকা। আমি?

সত্যবান। আছে, এখনো সময় আছে। ভেবে দ্যাখো, ভালো করে ভেবে দ্যাখো— সুমন্ত্র না সত্যবান? সুমন্ত্র না সত্যবান?

মল্লিকা। না— না— আমার জীবন নিষ্ঠুর হাতে ছারখার কোরো না তুমি— আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচতে দাও।

সত্যবান। দয়া? তুচ্ছ দয়া তুমি চাও?

মল্লিকা। তুমি বলো যে কালই তুমি চ'লে যাবে।

সত্যবান। কালই...

মল্লিকা। দ্বিধা কোরো না— বলো, কথা দাও আমাকে।

সত্যবান। তাহলে এই তোমার শেষ কথা?

মল্লিকা। বলো, বলো! বলো যে কালই তুমি চ'লে যাবে!

সত্যবান। আচ্ছা, যাবো।

[একটু চুপচাপ]

মল্লিকা (*সম্পূর্ণ অন্যরকম সুরে*)। এই যে, আবদুল চা নিয়ে এসেছে।... রাখো ওখানে।... আমি ঢেকে দিচ্ছি চা-টা। আপনি ক'চামচে চিনি খান?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুমন্ত্র, সত্যবান ও মল্লিকা

(পরের দিন)

সুমন্ত্র। সত্যি তুমি আজই যাচ্ছো?

সত্যবান। আজই যাচ্ছি।

সুমন্ত্র। কেন বলো তো?

সত্যবান। বাঃ, যাবো না? এখানেই চিরকাল থাকবো নাকি?

সুমন্ত্র। তাই বলে কি এসেই চ'লে যেতে হয়?

সত্যবান। তোমাকে আগে বলি নি, কিন্তু সত্যি আমার একটু জরুরি কাজ আছে।

মল্লিকা। কী এমন আপনার কাজ! থাকুন না আরো কিছুদিন।

সত্যবান। থাকতে পারলে নিশ্চয়ই থাকতুম— বিশেষত তুমি যখন বলছো।

মল্লিকা। কেন, আপনার বন্ধুর কথা কি যথেষ্ট দামি নয়?

সত্যবান (হেসে)। দেখলে তো, সুমন্ত্র। খুট্ করে লেগেছে কথাটা। মল্লিকার ধারণা যে তুমি হচ্ছো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব।

সুমন্ত্র (হেসে)। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারো।

সত্যবান। তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে থাকবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু উপায় নেই।

সুমন্ত্র। দু'দিনের জন্য কেনই বা এলে!

(একটু চুপচাপ)

[ঠুকঠুক কাঠঠোকরার শব্দ]

মল্লিকা। ঐ কাঠঠোকরা!

[হাওয়ায় গাছপালার শোঁ শোঁ. মড়মড় শব্দ]

মল্লিকা। হঠাৎ হাওয়া উঠলো। কী ভালো লাগে এখানে দুপুরবেলাগুলো— যখন হাওয়া ওঠে।

সত্যবান। সত্যি, পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে, ইউকালিপ্টস গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে প্রকৃতিসম্ভোগ এত বড় আরাম আর কী আছে!

মল্লিকা। আপনার স্বভাবটা ঠিক ঐ কাঠঠোকরার মতো। কেবল ঠুকঠুক টিপ্পনি। কিছুই আপনার কাছে সহজ নয়।

সত্যবান। মনে করো রেলগাড়িতে চলেছো— খুব খিদে পেয়েছে— কিন্তু দু'ঘণ্টার আগে রিফ্রেশমেণ্টরুমওয়ালা ইস্টিশানে গাড়ি থামবে না। জানলার বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য তখন কি আর ভালো লাগবে!

মল্লিকা। এ-সব কথার কোনো মানে হয় না।

[একটু চুপচাপ। কয়েক সেকেন্ড কাঠঠোকরার ঠুকঠুক শব্দ]

মল্লিকা। অদ্ভুত লাগে শুনতে।

সত্যবান। ও কী করছে জানো তো? কাঠের ফাঁকে-ফাঁকে পোকা ধরে ধরে— খাচ্ছে। এটা ওর জীবিকা।

মল্লিকা। ও কী করছে তা দিয়ে কী দরকার। শব্দটা কানে শুনতে ভালো লাগে সেটাই আসল কথা।

সত্যবান। তাহলে আমার মন্তব্যগুলোও তোমার খারাপ লাগবার কথা নয়। তোমার মতে আমার স্বভাবটাও তো ঐরকম।

মল্লিকা। ভালো লাগা কি না-লাগা সম্পূর্ণ খামখেয়ালি জিনিস। সেটা সব সময় লজিক মেনে চলে না।

সত্যবান। তা-ই দেখছি।

(একটু চুপচাপ)

সুমন্ত্র (*একটু হেসে*)। তোমরা দু'জন দেখছি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারো না।

সত্যবান। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

মল্লিকা। কোনো জিনিস সুন্দর, এ-কথায় সত্যবানবাবু রাগ করেন।

(আবার কাঠঠোকরার শব্দ)

মল্লিকা। ওর শব্দই শুধু শুনলুম, চোখে কোনোদিন দেখলুম না।

সুমন্ত্র। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পারো। ঐ বড় আমগাছটার কাছে যদি যাও—

মল্লিকা। আমাকে দেখলেই হয়তো পালিয়ে যাবে। ধরা যায় না ওদের?

সুমন্ত্র। কী জানি, চেষ্টা তো করি নি কোনো।

মল্লিকা (*একটু হেসে*)। দ্যাখো, ধামাই বনটাকে এখন কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত কাছে মনে হয়।

সুমন্ত্র। যাবে আজ ওখানে?

মল্লিকা। আজ থাক, কাল যাবো।

সুমন্ত্র। আজই যাওয়া যাক। সত্যবান, তুমি আজই যাচ্ছো?

সত্যবান। আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?

সুমন্ত্র। যদি যাওই, তাহলে চলো আজ বিকেলে ধামাই জঙ্গলের ধারে বেড়িয়ে আসি। তোমার গাড়ি তো সেই রাত এগারোটায়। মল্লিকা অনেকদিন ধরেই যেতে চাইছে।

সত্যবান। বেশ তো, কিন্তু আমি গেলে তোমাদের অসুবিধে হবে না তো?

সুমন্ত্র। কী আশ্চর্য, তুমি গেলে আবার অসুবিধে কী? বরং তুমি না-গেলেই—

সত্যবান। কী যেন, কালকের মতো আজ আবার মল্লিকার মাথা না ধরে।

সুমন্ত্র (*ব্যস্তভাবে*)। না— না— সত্যি কাল ওর মাথা ধরেছিল। তুমি কিছু মনে করো নি তো?

মল্লিকা। বেশ তো, আজ যাওয়া যাবে সবাই মিলে। ক'টা নাগাদ বেরুবে?

সুমন্ত্র। সাড়ে-পাঁচটায় বেরুলেই হবে। ওখানকার দৃশ্য ভারি সুন্দর। জঙ্গলটা ঠিক একটা পাহাড়ের গায়ে।

মল্লিকা। শিকার-টিকার কিন্তু না।

সুমন্ত্র। না, না, বিকেলে তো শিকারের কথাই ওঠে না।

সত্যবান। তবু— বন্দুকটা নিয়ে নিয়ো। যদি কিছু পাখি-টাখি চোখে পড়ে।

সুমন্ত্র। তুমি যদি থাকতে একদিন শিকারে বেরোতাম।

সত্যবান। কলকাতায় ফিরে আমাকে এর চেয়েও ঢের বেশি দুরূহ শিকারে ব্যস্ত হতে হবে— টাকা শিকার।

মল্লিকা। কী শিকার?

সত্যবান। টাকা। বাঘ-ভাল্লুক শিকারের চেয়ে কম কঠিন নয় সেটা।... আজ তাহলে ধামাই বনে যাওয়া ঠিক? বেশ।

সুমন্ত্র। ঘরে যাচ্ছো নাকি?

সত্যবান। হ্যাঁ, একটু ঘুমিয়ে নিইগে। বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

[সত্যবান বলে গেল]

(একটু চুপচাপ)

মল্লিকা। দিনটা মেঘলা করে আসছে। এ-রকম মেঘলা দুপুরে, আর এই হাওয়ায়, মন যেন কোথায় উড়ে চলে যায়। ঐ উঁচুতে ওটা কী? চিল?

সুমন্ত্র। বোধ হয়।

মল্লিকা। কত উঁচুতে দেখেছো? মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সুমন্ত্র। মল্লিকা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে সত্যবান তোমার মনের কথা টের পেয়েছে?

মল্লিকা (*চমক*)। কী কথা? কী মনের কথা?

সুমন্ত্র। ওর মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয় যে ওর প্রতি তুমি মনে-মনে বিরূপ।

মল্লিকা। (*আশ্বস্ত হয়ে*)। ও, এই কথা!

সুমন্ত্র। তবে তুমি কী ভেবেছিলে?

মল্লিকা। আমি আবার কী ভাববো? তা উনি বুঝি থাকলেই বা আমি কী করতে পারি, বলো!

সুমন্ত্র। ও যে আজই হঠাৎ চলে যাচ্ছে তার কারণও হয়তো এই।

মল্লিকা। দ্যাখো চেষ্টা করে— পায়ে ধরে সেধে যদি রাখতে পারো।

সুমন্ত্র। ওর প্রতি কেন যে তুমি এমন বিরূপ হলে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মল্লিকা। বুঝবেও না কোনোদিন।

সুমন্ত্র। এ যে আমার পক্ষে কত বড়দুঃখের কারণ তা কি তুমি বোঝো?

মল্লিকা। নাও নাও, ছোটো জিনিসকে আর বাড়িয়ে তুলো না। বিয়ের পরে মানুষের জীবনে কতই তো অদল-বদল হয়, তুমি না-হয় একজন বন্ধুকে ছাড়লে।

সুমন্ত্র। সত্যি বলে তুমি তা-ই চাও?

মল্লিকা। চাইবোই বা না কেন? সত্যবান দত্ত কি একটা মানুষ! উনি যে গরিব সেই দেমাকে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না!

সুমন্ত্র। (অত্যন্ত ব্যথিত)। তুমি কাউকে এত ঘৃণা করতে পারো তা আমার ধারণার অতীত ছিলো। আর তাও এমন একজনকে যার মতো শ্রদ্ধার, ভালোবাসার যোগ্য লোক খুব কমই আছে।

মল্লিকা (*একটু নরম হয়ে*)। বেশ তো— তোমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা তো আর আমি কেড়ে নিচ্ছিনে।

সুমন্ত্র। আমার এখনো আশা আছে যে ওর সঙ্গে আরো ভালো পরিচয় হলে আস্তে-আস্তে তোমার মত বদলাবে।

মল্লিকা। মত না-বদলানোই ভালো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেইদিন বিকেল। অসংখ্য পাখির কিচির মিচির। ধামাই জঙ্গলের ধারে মল্লিকা, সুমন্ত্র ও সত্যবান]

মল্লিকা। ইস্— কত পাখি।

সুমন্ত্র। ঘরে ফিরছে সব— চ্যাঁচামেচিটা শোনো একবার।

সত্যবান। সত্যি, অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

মল্লিকা। যাক্, তবু আপনার মুখে শুনলাম যে কোনো জিনিস সুন্দর।

সত্যবান। চারদিকে তাকিয়ে একটাও কিন্তু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না।

সুমন্ত্র। এখান থেকে রজতরুপ্পা গ্রামই সব চেয়ে কাছে। অসম্ভব নির্জন। দৃশ্যও চমৎকার, কিন্তু মোটরের রাস্তা খারাপ বলে এদিকটায় লোকজন বড় আসে না।

সত্যবান। ওঃ, যা কয়েকখানা ঝাঁকুনি লেগেছে! তোমার গাড়িটার কিছু হয় নি তো?

সুমন্ত্র। কি আর হবে। গাড়িটা আমি যেমন-তেমন ব্যবহার করি।

সত্যবান। করতেই পারো। একখানা নষ্ট হলে আর-একখানা কিনতে তো তোমার অসুবিধে নেই।

মল্লিকা। ঐ কাঠঠোকরা!

(নানারকম পাখির ডাকের মধ্যে কাঠঠোকরার শব্দ শোনা গেল)

সত্যবান। আমাকে বলছো?

মল্লিকা। না। একটা কাঠঠোকরার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাই বলছি।

সত্যবান। আমি ভাবলুম আমার কথার উপর বুঝি বললে।

মল্লিকা। আপনি কী বললেন আমি শুনি নি।

[নানারকম পাখির ডাকের মধ্যে কাঠঠোকরার ডাক আরো স্পষ্ট হলো]

মল্লিকা। ও এখানেও আছে।

সুমন্ত্র। থাকবে না! কতরকমের যে পাখি আছে এখানে তার অন্তই নেই।

সত্যবান। জঙ্গলটা কি অনেক বড়?

সুমন্ত্র। লম্বায় দশ মাইল আর চওড়ায় মাইল ছয়েক তো হবে। সমস্ত ছোটনাগপুরে এত বড় জঙ্গল আর নেই।

সত্যবান। ইস্— একদিন গেলে হতো ভিতরে।

মল্লিকা (উচ্ছ্বসিত)। দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর সূর্যাস্ত।

সত্যবান। বলো তো এত সুন্দর কেন লাগছে?

মল্লিকা। আপনিই বলুন।

সত্যবান। মেঘ আছে বলে। মনে হচ্ছে নাকি, সূর্যকে কালো মেঘের পাল টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে, রক্তে আকাশ লাল হয়ে গেল।

[ঠুকঠুক কাঠঠোকরার শব্দ]

মল্লিকা। আরে, এখনো!

সুমন্ত্র। কাঠঠোকরা তোমাকে আর ছাড়বে না।

মল্লিকা। তাই তো দেখছি। অন্য সব পাখির ডাক থেমে গেছে, চারদিকে স্তব্ধতার মধ্যে অদ্ভুত শোনাচ্ছে ওর আওয়াজ।

[দু'তিন সেকেন্ড পর-পর কাঠঠোকরার শব্দ ঠুক— ঠুক— ঠুক।]

সত্যবান। হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেলো চারদিক।

মল্লিকা। কাঠঠোকরা বোধ হয় কাছেই কোথাও আছে। ধরে আনতে পারো?

সুমন্ত্র। জীবিত না মৃত?

মল্লিকা। না, না, মেরে কাজ নেই।

সুমন্ত্র। আচ্ছা, একটু না-হয় দেখে আসছি।

মল্লিকা। জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু যেয়ো না।

সুমন্ত্র। না, না, ভিতরে যাবো না— ভয় নেই।

সত্যবান। দ্যাখো, সুমন্ত্র, যা মেঘ করেছে এখনই বোধ হয় ঝড় আসবে। বরং ফিরি চলো।

মল্লিকা। কবি হলে কী হবে, বেশ সাবধানি আছেন দেখছি।

সত্যবান। আমার মতে ঝড়ের শোভা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ততটা উপভোগ্য নয়। কংক্রিটের বাড়িতে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়েই সেটা ভালো জমে।

মল্লিকা। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় তাহলে এই পর্যন্তই! এই নিয়ে ধামাই জঙ্গলে কুঁড়েঘরে বসবাস করবার সখ!

সত্যবান। চলো, সুমন্ত্র, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

সুমন্ত্র। না, না, তা হয় না। মল্লিকাকে এখানে একা রেখে যাওয়া ঠিক না।

সত্যবান। আমাকে পাহারাওলা নিযুক্ত করছো, এতে দস্তুরমতো রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বন্দুক নিয়েই যাও, যদি পাখি-টাখি পাও... যাবার আগে রোস্ট খাওয়া যাবে। আর শোন— দেরি কোরো না কিন্তু মোটেও। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি এসে পড়তে পারে।

সুমন্ত্র। না, দেরি করবো না।

(সুমন্ত্রর প্রস্থান)

মল্লিকা (*চেঁচিয়ে*)। কাঠঠোকরা একটা ধরে এনো কিন্তু।

সুমন্ত্র (*বাইরে থেকে চেঁচিয়ে*)। আচ্ছা—।

সত্যবান। চলো ঐ গাছের গুঁড়িটায় বসা যাক।

(একটু চুপচাপ)

সত্যবান। ফিরে গেলেই হতো। বৃষ্টি এলো বলে।

মল্লিকা। এলোই বা।

সত্যবান। আমার আবার একটু ভিজলেই সর্দি হয়।

মল্লিকা (*হেসে উঠলো*)।

সত্যবান। তার উপর থার্ড ক্লাশের জার্নি আছে— এক রাত্রেই এক বছর আয়ু ক্ষয়।... কী রকম মেঘ সেজেছে দেখছো?

মল্লিকা। দেখছি তো।

সত্যবান। পৃথিবী যেন মুছে যাচ্ছে। একবার ভাবো, এ কি অদ্ভুত নয় যে তুমি আর আমি–

মল্লিকা। চুপ করো, চুপ করো।

সত্যবান। এ এমন এক মুহূর্ত যা আর আসবে না। মল্লি।

মল্লিকা। না— না— তুমি চুপ করো।

[দূরে মেঘের ডাক]

সত্যবান। মনে হচ্ছে তুমি আমি ছাড়া জগতে আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই।

মল্লিকা। বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ-সব কথা বলা কি ভদ্রতা হচ্ছে?

সত্যবান। বন্ধুর উপস্থিতিতেও বলতে পারি। বলবো?

মল্লিকা। কী বলবে?

সত্যবান। তাকে কিছু বলবো না, বলবো তোমাকে। তারপর তুমি যা বলবে, তা-ই হবে।

মল্লিকা। কিন্তু যা বলবার তা তো বলা হয়ে গেছে।

সত্যবান। কিন্তু তারও আগে একবার—

মল্লিকা। এ-সব কথা যদি বলো তাহলে আমি এক্ষুনি—

সত্যবান। কোথায় যাবে? চারধারে জঙ্গল। যেখানে যাবে, সেখানেই আমি আছি।

মল্লিকা। বিশ্বাসঘাতক! একটু লজ্জাও নেই তোমার!

সত্যবান। না, লজ্জা আমার নেই। তুমি যদি বলো, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারি।

[মেঘের দীর্ঘ গুরুগুরু ডাক]

সত্যবান। তুমি ধরা পড়ে গেছো, মল্লিকা। তোমাকে গাড়িতে তুলে আমি যেদিকে খুশি চলে যেতে পারি— সাধ্য কি তোমার বাধা দাও। তুমিও যে তা-ই চাও! মনে-মনে তুমি যে মরে যাচ্ছো!

মল্লিকা। আমি তাই চাই!

সত্যবান। চাও, চাও, আমাকেই তুমি চাও; আর সব মিথ্যা, আর সব ভুল।

মল্লিকা (*রুদ্ধস্বরে*)। এই তোমার মনে ছিল!

[দূরে ঝড়ের শব্দ]

সত্যবান। ঝড় আসছে। চলো গাড়িতে বসি। ভয় নেই তোমার, আমি গাড়ি চালাতে জানি নে।

মল্লিকা। সুমন্ত্র রইলো যে?

সত্যবান। ও এসে পড়বে এক্ষুনি। শিগগির চলো— কী রকম অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। টর্চটা কোথায়?

মল্লিকা। সুমন্ত্রর কাছেই তো ছিল।

[ঝড়ের শব্দ আরো কাছে]

সত্যবান। চলো, চলো, এসে পড়লো। দাঁড়িয়ে আছো কেন? বৃষ্টিতে ভিজে ইনফ্লুয়েঞ্জা না হয়।

মল্লিকা। সুমন্ত্র না এলে যাবো না।

সত্যবান। পাগল! এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজবে নাকি! নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

মল্লিকা। আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে।

সত্যবান। ভাবনা কিসের?

মল্লিকা। ধামাই বনের অপবাদ আছে—

সত্যবান। পাগল! সুমন্ত্র এলো বলে।

[দূরে পর-পর দুটো বন্দুকের আওয়াজ]

মল্লিকা (*চমকে*)। শুনলে?

সত্যবান। শুনলুম তো।

মল্লিকা। নিশ্চয়ই ও পথ হারিয়েছে। ডাকছে আমাদের।

সত্যবান। না, না, ও তো বেশিক্ষণ হয় যায় নি। তুমি ভেবো না। গাড়িতে চলো।

মল্লিকা। কিছু— তেই না। আমি যাবো ওকে খুঁজতে বনের মধ্যে।

সত্যবান। নাঃ, একেবারে উন্মাদ দেখছি।

মল্লিকা। আমি ভেবেছিলুম তোমার কাছেও সুমন্ত্রর জীবনের কিছু মূল্য আছে।

সত্যবান। ইস্, এ তো ভারি বিপদে পড়লাম!

মল্লিকা। বিপদ আর তোমার কী! তুমি তো চাওই যে সুমন্ত্র আর না ফিরুক।

[আর-একটা বন্দুকের শব্দ]

মল্লিকা (*চেঁচিয়ে*)। যা— ই।

সত্যবান। মল্লিকা, দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি ওকে খুঁজতে তুমি দয়া করে গাড়িতে গিয়ে বোসো। এই জলঝড় মাথায় করে একলা দাঁড়িয়ে থেকো না।

মল্লিকা (*বিহ্বলের মতো*)। হারিয়েছে... পথ হারিয়েছে।

সত্যবান (*শান্তভাবে*)। আনবো ওকে খুঁজে, ভয় কী, মল্লি? লক্ষ্মী তো, গাড়িতে গিয়ে বোসো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখো। (সত্যবানের প্রস্থান)।

সত্যবান (*একটু পরে, দূর থেকে*)। মল্লি— গাড়িতে যাও, বৃষ্টি এসে পড়েছে।

[সত্যবান চলে গেল]

[ঝড় আর বৃষ্টির শব্দ]

[মল্লিকা বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বৃষ্টি এলো ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে। খানিক পরে সুমন্ত্র ছুটতে-ছুটতে এসে ঢুকলো]

সুমন্ত্র। ইস্— একেবারে ভিজে গেলাম।

মল্লিকা। তুমি... ফিরেছো!

সুমন্ত্র। তবে কি ভেবেছিলে ফিরবো না! হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রেখে খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলে।... ওঃ, গাড়ির মধ্যে ঢুকে বাঁচলাম। তোমার গায়ে ছাঁট লাগে নি তো?

মল্লিকা। উঃ, আমার যা ভাবনা হচ্ছিল।

সুমন্ত্র। শেষ পর্যন্ত গোটা কয়েক পাখি না-মেরে পারলুম না। চমৎকার রোস্ট হবে।... সত্যবান কোথায়?

মল্লিকা। তোমাকে খুঁজতে... তাঁকে তুমি দ্যাখো নি?

সুমন্ত্র। আমাকে খুঁজতে? জঙ্গলের মধ্যে!

মল্লিকা। আমি পাঠিয়েছিলুম।

সুমন্ত্র। করেছো কী তুমি!

মল্লিকা। আমার এমন ভয় হয়েছিলো...আমি ভেবেছিলুম...।

সুমন্ত্র। ধামাই বন কি এতটুকু জায়গা! দু'একটা রাস্তা আছে সাঁওতালরা আনাগোনা করে সত্যবান তো ও-সব চেনে না। অন্য কোনোদিকে গিয়ে থাকলে....।

মল্লিকা। কী হবে?

সুমন্ত্র। কী হতে পারে বোঝো না? তার উপর এই অন্ধকার— ঝড়বৃষ্টি— তুমি করেছো কী?

মল্লিকা (*আবিষ্টের মতো*)। এ আমি কী করলাম!

সুমন্ত্র। আমার জন্যে ভাবনা হলো, আর ওর কথা একটু ভাবলে না!

মল্লিকা (*তীব্র চাপাস্বরে*)। আছে, আছে— এখানেই আছে। সত্যবান!

সুমন্ত্র। এ কী—কোথায় যাচ্ছো, মল্লিকা... শোন...।

মল্লিকা (*চীৎকার করে*)। সত্যবান, সত্যবান!

(প্রবল ঝড়বৃষ্টি বজ্রের শব্দ— তার ফাঁকে-ফাঁকে—)

সুমন্ত্র। এ তুমি করছো কী! মরে যাবে যে!

মল্লিকা। ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে!

সুমন্ত্র। এ-রকম পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালে কী লাভ!

মল্লিকা। সে আছে, সে এখানেই আছে। (*প্রাণপণ চেঁচিয়ে*) সত্যবা—ন।

সুমন্ত্র। ইস—কী বৃষ্টি!... আমার কথা শোনো, এখন ফিরে চলো, গাঁয়ের সাঁওতালদের ডেকে—

মল্লিকা। আমি যেখানে আছি সেখানেই সে আছে। কোথায়? কোথায়?

সুমন্ত্র। একটু শান্ত হও!... কী ভিষণ কাঁপছো তুমি! মল্লিকা!

মল্লিকা (*ভাঙা-ভাঙা গলায় চীৎকারে*)। সত্যবান! সত্যবান! (*ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না*) সত্যবা—ন! সত্যবা—ন!

তৃতীয় দৃশ্য

[দু'মাস পরে]

সুমন্ত্র। আজ ঠিক দুমাস হলো।

মল্লিকা। দুমাস!

সুমন্ত্র। এখনো যখন ওর খবর পাওয়া গেল না, তখন...

মল্লিকা। (*ক্ষীণস্বরে*) কোনোদিনই কি আর খবর আসবে!

সুমন্ত্র। সাঁওতালরা যতটা পারে খুঁজেছিল। কিন্তু ঐ দু'একটি বাঁধা রাস্তা ছাড়া অন্যদিকে যেতে কেউই সাহস পায় না। টাকার লোভেও না।

মল্লিকা। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করো নি।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। যদি তুমি অনুমতি দাও, এবারে আর-একটা তারিখ ঠিক করি।

মল্লিকা। (*ক্লান্তভাবে*)। করো।

সুমন্ত্র। আষাঢ়ের প্রথম দিকেই—

মল্লিকা। আচ্ছা।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। একটা কথা বলি, মল্লিকা?

মল্লিকা। বলো।

সুমন্ত্র। তোমার মন কাকে চায় তা যদি জানতেই তবে প্রথমেই সে-কথা বললে না কেন? তাহলেই তো... ...

[হঠাৎ কাঠঠোকরার ঠুকঠুক শব্দ]

মল্লিকা। থামাও, থামাও, ঐ পাখিটাকে থামাও। ও আমি সইতে পারিনে।

সুমন্ত্র (*সস্নেহে*)। কেঁদো না, মল্লিকা, কেঁদো না।

বার্ষিক 'বৈশাখী', ১৩৪৮

অমৃত প্রসাদ : বাবার চিঠি

দময়ন্তী বসু-সিংহ

বাবা ছিলেন বিশুদ্ধ ঘরকুনো মানুষ। ১৯৪৫-এ রিপণ কলেজে পড়ানোর যন্ত্রণা ত্যাগ করে বাড়িতেই সবসময় থাকেন তিনি তখন। একদিকে 'কবিতা' পত্রিকা চালান এবং 'কবিতাভাবন' প্রকাশনী থেকে নিয়মিত বই বার করেন, অন্যদিকে সমানে বই লিখছেন অর্থোপার্জনের তাগিদে। শুধু লিখে সে সময়ে বা আর্থিক আমদানি হতো তা দিয়ে সব দিক রক্ষার চেষ্টায় বিধ্বস্ত হচ্ছেন যখন, তখন বাধ্য হয়ে নিয়েছিলেন দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যানে মাসে দু'একটি করে সম্পাদকীয় লেখার কাজ। হোক সামান্য, তবু তো একটা নিয়মিত রোজগার। কিন্তু সেই গত-বাঁধা জর্নালিস্টিক লেখা তাঁর ধাতে সইলো না। কিছুদিন বাদে ছেড়ে দিলেন। বন্ধু হুমায়ুন কবীর তখন কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন। অনেক দ্বিধা কাটিয়ে তাঁকে লিখেছিলেন অর্থসংকটের কথা। কবীর তৎক্ষণাৎ ইউনেস্কোর একটি সাময়িক চাকরির ব্যবস্থা করলেন। তিন মাস দিল্লিতে, তিন মাস মহীশূরে— প্রকল্পটি 'অ্যাডাল্ট এড়ুকেশান' সম্পৃক্ত। যে-বাবা বাড়ি থেকে দু'দিন হাসপাতালে গিয়েও পালিয়ে চলে এসেছিলেন, তাঁর জন্য ছ-মাসের এই নির্বাসন মেনে নেওয়া সহজ ছিল না; কিন্তু যে আর্থিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা তখন, না-যাবার প্রশ্ন উঠল না। ১৯৫২ শেষ হতে চলেছে তখন।

এই যে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন, পরের বছর একেবারে দেশান্তরিত হতে হলো সেই ধাক্কায়। দিল্লি-মহীশূর বরদাস্ত হয়েছিল আমরাও স্কুল-কলেজের ছুটি হওয়ামাত্র বাবার কাছে চলে যেতে পেরেছিলাম বলে, কিন্তু তাঁর আমেরিকা যাওয়া আমাদের কাছে যতই চমকপ্রদ ও উত্তেজক ঘটনা হোক না কেন, স্বজন-স্বস্থান ছেড়ে প্রায় এক বছর দূরে থাকা তাঁর জন্য খুব কষ্টের হয়েছিল। তাঁর চিঠির মধ্য দিয়ে সেই কষ্ট অনুভব করা শক্ত নয়। করণীয় অবশ্য কিছুই ছিল না— কারণ সেই অর্থনৈতিক বাধ্যতা। প্রতিমাসে মা-কে টাকা পাঠাতেন, মা-ও সেই প্রথম খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলেন, কিছু শখ-সাধ মেটালেন। বাবা ফেরার পর এমন কি একটি ক্ষুদ্র ফ্রীজও কেনা হয়েছিল। মনে আছে, প্রতিবেশীরা ফ্রীজ দর্শনে আসতেন সে সময়ে।

সঙ্গের চিঠি ক'টি আমি মায়ের রক্ষিত মেলানো-মেশানো কিছু চিঠিপত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম নিজের পঁয়তিরিশ বছরের প্রবাস জীবনের শেষে কলকাতায় ফিরে। বলা বাহুল্য, আরও অনেক চিঠি তিনি নিশ্চয়ই লিখেছিলেন যা হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। তবু, যেটুকু পেয়েছি তার জন্যই আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তারই মধ্যে সাতটি চিঠি সাজিয়ে দিলাম প্রাসঙ্গিক টীকা-তথ্যাদিসহ। ভুলে যাওয়া শৈশব-কৈশোরের মধুর স্মৃতি এ চিঠির মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে আমার হৃদয়ে এসে স্পন্দিত হয়। রোমকূপে বাবার স্নেহ ভালবাসা সঞ্চারিত হয়— 'মৃত মাধুরীর কণা' হয়ে নয়, অমৃত প্রসাদ হয়ে। চোখ ছাপিয়ে জল আসে আমার, কারণ বুঝি নি, কিছুই বুঝি নি তখন এ প্রাপ্তির গরিমা।

—দময়ন্তী বসু সিং

(১)

দিল্লি
১১ ডিসেম্বর ১৯৫২ রাত্রি

রুম্,

ভেবে দেখলুম তুমিই সবচেয়ে ভালো। তোমার দিদি[১]— যাঁর ডাকটিকিট জোগাতে জোগাতে আমি ফতুর হ'য়ে গেছি— তিনি সেই কবে একখানা চিঠি লিখেই চুপচাপ, পাপ্‌পারও অর সাড়াশব্দ নেই। তা পাপ্‌পা না-হয় নিজে এখনো লিখতে শেখে নি, কিন্তু তোমার মাস্টার মশাই নিরুপম,[২] যাঁর পত্রাঘাতে কবিতাভবনের ভবনসুদ্ধু টলমল ক'রে উঠেছিলো, দু-দুবার চেষ্টা করেও সেই কল্পতরুর একটি পাতাও খসাতে পারি নি। চারদিকের এই মহান মৌনতার মধ্যে শুধু তোমারই গলার আওয়াজ আজ শুনতে পেলাম, রুমি! রবীন্দ্রনাথ তোমার ঠিক নাম রেখেছিলেন— যত তোমার বয়স বাড়ুক, মাঝে-মাঝে তোমার কাকলি যেন শুনতে পাই।[৩]

কিন্তু চিঠিটা তুমি বড্ড তাড়াহুড়ো ক'রে লিখেছিলে। আর লিখে একবার পড়োওনি, তিনদিনকে লিখেছো তিনিদিন, টুথপেস্টকে টুথপ্যাস্ট, ইত্যাদিকে লিখেছো ইত্যাদী[৪]। ম্যাট্রিকুলেশনের খাতায় কক্‌খনো কিন্তু ও-রকম লিখো না, আমি তো আর তোমার খাতা দেখবো না— যারা দেখবে কাছে একটুও মিষ্টি লাগবে না ওগুলো। তারা তো আর বুঝবে না কত তুমি ব্যস্ত ছিলে, কত তোমার কাজ, কত রকম খেলা— তার মধ্যে ছুটে এসে কোনোরকমে দু-কলম লিখে তক্ষুণি আবার দৌড়তে হবে তো! সত্যি তুমি তো আর আমার মতো বেকার নও— আমার দ্যাখো না এখানে তো কিছু করবার নেই— ব'সে-ব'সে তাই শুধু চিঠি লিখি, একটু লিখি, একটু ভাবি, এক ঢোঁক জল, একবার সিগারেট, মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাইচারি— জানো তো ও-সব। পাইচারিটা এখানে একটু বেশিই হচ্ছে— যা শীত!

এদিকে আমার এখানে টুথপেস্ট ফুরোয় না, কালি মনে হচ্ছে (এত চিঠি লিখেও) এক বছর চলে যাবে, আর সাবান সেই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলুম তা যে এতদিনে একটুও ক্ষয় হয়েছে মনে হচ্ছে না। আর কুঁজোটা ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিলুম কলকাতা থেকে— এখানে কোথায় পেতুম বলো তো? জল অর সিগারেট হাতের কাছে থাকলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। কিন্তু ২০২ নাম্বারেও যাতে কুঁজোয় জল এবং দোয়াতে কালি থাকে তারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তোমার মা যে রন্ধনকারিণী মহিলাটিকে নিযুক্ত করেছেন তিনি কি এখনো আসেন নি? যদি এসে থাকেন, তাঁর রান্নার নমুনা আমাকে পত্রযোগে জানিয়ো। আমাকে যে খুব ঠকাতে পারবে তা ভেবো না— আমিও আজ দুপুরে খেয়েছি— কী হলো তো?— ডালভাতে (ঘি আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা), পাবদা মাছ ভাজা, আর পাবদা মাছের শর্ষের ঝোল— খাঁটি বাঙালি কিংবা বাঙাল রান্না, এ না ব'লে আর বঙ্গভবন![৫] — জলসা তোমাদের ভালো লেগেছিলো সুখের কথা, কিন্তু ও-সব হিন্দি নাম আর আমার কাছে কোরো না[৬]— কখনো দু-একটা রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পাই তো প্রাণ জুড়োয়। তোমার বই কেনার টাকা শিগগিরই পাঠাচ্ছি।

বাবা

---

১. মিমি— মীনাক্ষী দত্ত। সে সময়ে প্রচুর চিঠি লেখার অভ্যেস ছিল দিদির। বিশেষ পত্র-বন্ধুতা ছিল এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যারা তখন পাটনার বাসিন্দা।

২. নিরুপম চট্টোপাধ্যায়। নিরুপমের কথা আগেও অমি অনেক লিখেছি। বাবা লেখার পাগল-ভক্তদের একজন, অসাধারণ চিঠি লিখেই সে বুদ্ধদেব বসুর হৃদয় জয় করেছিল। পরবর্তী কালে সে 'কবিতাভবনে'ই একজন হয়ে ওঠে। নিরুপম আমাকে তখন বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করত রাশি রাশি কবিতা লেখার কাজ দিয়ে। প্রায় প্রতিদিন সে পত্র প্রেরণ করতো বালক পাপ্পা শুদ্ধ পরিবারের সকলকে। সুন্দরী তরুণী হওয়ার দরুণ দিদিই শুধু বাদ।

৩. এ কথা এখন অনেকেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ আমার নাম রেখেছিলেন 'কাকলি'। তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছু বছর পরে নাম বদলে তাঁর প্রিয় নাম 'দময়ন্তী' নামে ভূষিত করেন আমাকে।

৪. চিঠিতে সর্বদাই বানান শুদ্ধ করতেন আমাদের। কতটা উন্নতি হয়েছিল তা অবশ্য বলতে পারি না।

৫. তিন নম্বর হেইলি রোডের 'বঙ্গভবন'ই বাবার বাসস্থান ছিল তিনমাসের জন্য। হেতু ভূমিকাতেই বিস্তারিত বলেছি। তখন সেটি ছিল প্রচুর জমি-জায়গার মধ্যে স্থির ৪-৫ কামরার একতলা বাংলো।

৬. আমাদের বাড়িতে হিন্দি সিনেমা দেখা তো বটেই, হিন্দি গান শোনাও পাপ ছিল। কুরুচির শেষ সীমা আর কি! এদিকে চারদিকে তখন 'লারে লাপ্পা', 'গোরে গোরে বাঁকে ছোরে'র ধূম। সে সব তালের গান অজানিতেই সব সময় আমার গলায়, নাচের তালে। বাবা বড়ই চিন্তিত ছিলেন তা নিয়ে। এখনকার পরিস্থিতি দেখলে তিনি যে কী বলতেন কে জানে!

(২)

MYSORE
১৯ মার্চ, ১৯৫৩
সন্ধ্যা

রুমি,

নববর্ষের দিন সন্ধেবেলা রাজার প্যালেসে আলো দিয়েছিলো। সে কী-রকম জানিস? চুড়ো থেকে ভিৎ পর্যন্ত আগাগোড়া ঘন ক'রে ইলেকট্রিক বালব বসানো— একটু দূর থেকে দেখলে দেয়াল আর চোখে পড়ে না, যেন সারা বাড়ির নকশাটা আলো দিয়ে এঁকে দিয়েছে। আগে নাকি রোজই এ-রকম হ'তো— আজকাল আর খরচে কুলোয় না, শুধু উৎসবের দিনে রোশনাই বরাদ্দ। নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে-থামিয়ে আমাকে দেখানো হ'লো— তোরা দেখলে খুব লাফালাফি করতিস— আমারও নেহাৎ মন্দ লাগলো না, ইংরেজিতে যাকে বলে প্রিটি, ঠিক তাই। যত দূরে যাচ্ছিলুম ততই ভালো দেখাচ্ছিলো। শহরের এক প্রান্তে ললিতা-মহল— একটু উঁচুতে— আগে বোধহয় রানীরা থাকতেন এখানে, এখন রাজারা এসে ওঠেন— রাজা মানে নেহেরু, রাজুবাবু ইত্যাদি— এই ললিতামহলের প্রাঙ্গণ থেকে সারা শহরটা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিলো, ধনুকের মতো বাঁকা, অসংখ্য আলো জ্বলছে। একটু উঁচু-নিচু হ'লে দেখতে বেশ বাহার হয়, একই দৃশ্যের নানান চেহারা চোখে পড়ে।[১] আরো ভালো করে দেখার জন্য চামুণ্ডি পাহাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত ওঠা হ'লো— আমার পরিচালক কী ভেবে শেষপর্যন্ত উঠলেন না জানি না— কিন্তু আমার বড্ড চায়ের তেষ্টা পেয়েছিলো ব'লে এই শেষের অংশটা তেমন উপভোগ করতে পারি নি।[২]

শহর থেকে দশ মাইল দূরে বৃন্দাবন-বাগান, জানি রোববার রোশনাই হয় সেখানে। লাল সবুজ বেগনি রঙের আলোর উপর দিয়ে ফোয়ারার ধারা ব'য়ে যায়, অনেকটা নিউ এম্পায়ারের পরদার মতো দেখতে হয়। এক পাশে কাবেরী নদী ব'য়ে গেছে, বাগানের মধ্যেও মস্ত জলাশয়— শুধু একদিকে প্রকান্ড উঁচু একটা ব্রিজ থাকায় ছন্দপতন হয়েছে। মন্দ না জায়গাটা, কিন্তু ও-সব লাল নীল আলো আমার কেমন ছেলেমানুষি লাগলো, মাড়োয়ারিদের দেয়ালির মতো ব্যাপার— প্রাণপণে সুন্দর হবার চেষ্টাতেই যেন ঠিক সুন্দর হ'তে পারে নি। রেডিওতে রেকর্ড বাজছিলো— বাংলা গানও ছিলো তার মধ্যে— বোধহয় সাইগল।

তোরা যে ঋতুরঙ্গ করবি সে কি ইস্কুলে, না কি দময়ন্তী নিজস্ব দল? স্থান কি কবিতাভবনের উঠোন? আর দর্শক? তুই নাচবি নিশ্চয়ই— আর রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভালো ক'রে যেন গাওয়া হয়, অন্য গানের প্রবেশ নিষেধ।[৩]

শাদা চামড়ার লোক যারা নতুন এ-দেশে আসে, গ্রীষ্মকালে তাদের একেবারে মানায় না। এখানে গরম কলকাতার তুলনায় কম, তবু এটুকু আঁচেই বিদেশী দু-জনের চাঁছাছোলা আলুসেদ্ধর মতো চেহারা হয়েছে। তারপর সেদিন গিয়ে দেখি, ম্যাকল্যারেন আণ্ডারওয়ার আর শর্ট পরে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরের দিনও তাই। আজ দেখি ধুতি পরেছে— মিসেস হুসেন আজ পৌঁছলেন, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে বোধহয়— ধুতি প'রে বেশ দেখাচ্ছিলো ছোকরাকে তা মানতেই হয়।

এখানকার "যাত্রিক"-এর পোস্টার, আর কাগজে দেখলুম পঙ্কজ মল্লিক মাদ্রাজে এসেছেন গান গাইতে। দেখা যাচ্ছে বাংলার নাম যা-হোক একটু নিউ থিয়েটার্সই বাঁচিয়ে রেখেছে— কাকাকে[৪] বোলো এ-কথা।

চুপি-চুপি একটা কথা বলি তোকে— ত্রিদিব বানান এ কী লিখেছিস! নিরুপম দেখলে তো ফিট হ'য়ে যাবে। ত্রিদিব, ত্রিদিব—তার মানে স্বর্গ। মাইকেল প্রথমে এত কম বাংলা জানতেন যে পৃথিবী বানান লিখেছিলেন প্রীথিবী। তা তিনিই মেঘনাদবধ লিখে উঠলেন। ইচ্ছে হয় তো মেঘনাদবধটা প'ড়ে ফেলতে পারিস— বানান শেখাও হবে, লাগবেও হয়তো মন্দ না।

বাবা

পুনশ্চ— আমার বাড়ির অনুমতিপত্র এসে গেছে, কাল বাসা-বদল করবো।[৫] কাল হয়তো চিঠি লেখার সময় পাবো না— দু-একদিন চিঠি না পেলে তোর মা যেন না ভাবেন। মা-কে বলিস। টাইপরাইটার এখনো পৌঁছয় নি।

---

১. দিল্লি থেকে গেলেন মহীশূরে। এ চিঠির তারিখ ১৯ মার্চ, অথচ উল্লেখ করেছেন 'নববর্ষে'র, অতএব ধরে নেওয়া যায় 'এপ্রিল' লিখতে 'মার্চ' লিখেছেন। বর্ণনা করেছেন মহীশূরের রাজার প্রাসাদের। দর্শণীয় বস্তুই ছিল সেটি। আর চামুন্ডি পাহাড়— সে-ও প্রতিদিন সাজতো আলোর মালায়। সে সময়ে মনে হয়েছিল মহীশূরের চেয়ে সুন্দর শহর পৃথিবীতে আর নেই। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কিছুই তখনো দেখি নি।

২. যেখানেই থাকুন, সময়মত চা বাবার চাই-ই চাই, নয়তো সব আনন্দ মাটি।

৩. বাবার অত ভয়ের কারণ ছিল না। 'ঋতুরঙ্গ' মানেই যে রবীন্দ্রনাথ এ যেন সবার জানা। তবে গান খুব ভালো হয়েছিল কিনা জানি না। ছোটবেলা থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমি মাঝে-মাঝেই 'ফাংশন' করতাম। সেটাই 'দময়ন্তী বসুর নিজস্ব দল'!

৪. সৌরেন সেন। নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ ছিলেন অনেক দিন।

৫. 'বাড়ি' হলো সরকারী অতিথিশালা— মন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। শহরের প্রান্তে, প্রচুর জায়গা-জমির মধ্যে লম্বা টানা বারান্দা ঘেরা একতলা হাত-পা ছড়ানো বাংলোর নানা ব্যবস্থার ঘর ও সুইট্স। এমন বিলাসে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না, অতএব উত্তেজনা অন্তহীন।

(৩)

মহীশূর
২১ এপ্রিল ১৯৫৩, রাত্রি

রুমি,

বাঙ্গালোরে যে-বাড়িতে ছিলুম তার কম্পাউন্ডে চারটে চন্দন গাছ ছিলো— এই প্রথম এই বিখ্যাত বৃক্ষটি দেখলুম। কালো দেখতে, বেশি বড়ো হয় না। মহীশূর রাজ্যের সমস্ত চন্দন গাছ সরকারের সম্পত্তি, যার জমিতে যার বাড়িতেই হোক আর কেউ কাটতে পারে না। আমি রাজার তহবিল থেকে কয়েকটি টুকরো হরণ ক'রে এনেছি— আগে তার নমুনা পাঠানো গেছে। আরো ক-টা ছোট্ট কুচি এই সঙ্গে পাঠাই— তোর, মিমির, পাপ্‌পার জন্য

বাঙ্গালোরে আরো একটা নতুন জিনিশ দেখলাম, লাল আর শাদা চাঁপা। বেগনি পিঙ্ক জাকারান্দাও পথে-পথে অনেক। আর নানা রঙের অ্যাকেশিয়া। সুন্দর ফুল, সুন্দর নাম।

এখানে গাছের তলায় 'ক্লাশ' নিচ্ছি। বড়ো-বড়ো গাছ, মাথা-ভরতি ছোটো-ছোটো রঙিন ফুল ফুটে থাকে। তলায় যে-ফলগুলো প'ড়ে থাকে অনেকটা তেঁতুলের মতো দেখতে। কিন্তু তেঁতুল নয়। কী গাছ কেউ বলতে পারে না।

এখানে একদম গরম নেই, আর আমার ভাগ্যে বৃষ্টিও এবার বেশি হচ্ছে। মেঘলা আকাশের তলায় সারি সারি কৃষ্ণচূড়া আশ্চর্য লাল দেখায়। রাসবিহারী এভিনিউর গাছগুলোর কথা ভেবে কান্না পায় আমার। তোরা শিগগির বড়োসড়ো হ'য়ে নে— তারপর কলকাতায় আর থাকবো না।[1]

ইস্কুল ভালো লাগছে, খুব সুখের কথা। বন্ধুও হয়েছে তো অনেক? কিন্তু লিখতে এখনো এত ভুল করিস কেন?

বাবা

---

[1] 'কলকাতায় আর থাকবো না'— এমন কথা বাবা যে বলতে পারেন এ চিঠি না থাকলে তা কিছুতেই বিশ্বাস হত না। সে মুহূর্তে প্রকৃতির যাদুতে ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন বোধহয়।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বড় বড় গাছগুলো এক এক করে কাটা হচ্ছিল তখন। প্রথম গাছ যখন কাটা হয় বাবা অনেক প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু কবির দাবির চেয়ে বণিকদের দাবি চিরকালই অনেক শক্তিশালী। যেদিন ২০২-এর সামনের বিশাল 'আকাশমণি; বধ হলো, সেদিন আমাদের বাকরুদ্ধ হয়েছিল। বারান্দায় হলুদ বেণু ছড়ানো সে গাছটির শোক এখনো তীব্র।

(৪)

মহীশূর
৩০ এপ্রিল ১৯৫৩

রুমি,

তোর চিঠি পেলুম। তুই ভাবছিস মাইসোরে এলে খুব মজা হবে— কিন্তু একটুও না! এখানে কিচ্ছু ক'রবার নেই, কারো সঙ্গে কথা কইবার নেই, কোথাও যাবার নেই। বৃন্দাবন-বাগান, চামুন্ডি পাহাড়, রাজার প্যালিস, সিল্ক ফ্যাক্টরি, চিঁড়িয়াখানা— এ ক'টা ছাড়া তোদের জন্য আর প্রোগ্রাম ভেবে পাচ্ছি না। কেউ নেমতন্ন করবে না— করলেও সে-খাবার মুখে দিতে পারবি না। তবে যদি খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ানোকে মজা বলিস, কি চুপচাপ বারান্দায় ব'সে তাকিয়ে থাকাকে মজা বলিস— তার সুযোগ এন্তার পাবি এখানে। সুবিধের মধ্যে এইটুকু যে গরম কম।[১]

আমি চামুন্ডি পাহাড়ে যাই না, ঝিলের ধারেও যাই না, শুধু সকালে একবার "কাজে" বেরোই আর বিকেলে প্রায় রোজই একবার পোস্টাপিশে। ধারে-কাছে লেটার-বক্স নেই, তাই গাড়ি ক'রে পোস্টাপিশে ছুটতে হয়। এ ছাড়া সারাদিন ঘরে ব'সে থাকি চুপচাপ— একেবারে লক্ষ্মী ছেলেটি হ'য়ে। আমার ঘর থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখা যায়, আর পিছন দিকের একটা বারান্দা থেকে সূর্যাস্ত। কিন্তু আমি সেই বারান্দাতেও বেশি যাই না।

ইস্কুল তোর ভালো লাগছে শুনে খুব খুশি হয়েছি। এবার খুব মন দিয়ে পড়, তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তুই যে চিঠি লিখিস তাতে এত ভুল থাকে, এত কথা ফেলে যাস, এমন সব বিদঘুটে বানান লিখিস মাঝে-মাঝে, সে যে আর বলবার নয়। স্কুলের পরীক্ষায় এ-রকম হ'লেই হয়েছে আর কি। আর তোদের স্কুলে "সাধুভাষা" লেখায় নাকি রে? তুই কক্খনো লিখিস না।

আজকাল আইসক্রীম খাওয়া বাদ দিস।

বাবা

তোমার মা-র আর কাকার চিঠি পেয়েছি। কাল তাঁদের লিখবো।

---

[১] বাবা যা-ই বলুন, মহীশূর শহর আমাদের যত ভালো লেগেছিল, তেমন ভালো মনে হয় কোনোদিন কোথাও লাগে নি— সারা পৃথিবী ঘুরেও। গরমের ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাবার কোন প্রথাই ছিল না আমাদের বাড়িতে। হঠাৎ অতদূরে বেড়াতে যাওয়া, তার উপরে রাজকীয় ব্যবস্থায় থাকা-খাওয়া, রাজার গাড়িশালের গাড়িতে অপূর্ব সুন্দর সব জায়গায় বেড়াতে যাওয়া— সম্পূর্ণ এক অন্য অচেনা জগৎ সেটা। আর পরিবেশ? বাবার বর্ণনা থেকেই বুঝবেন কী মনোরম ছিল তা। কিন্তু নিজের ছোট ফ্ল্যাট, লেখার টেবিল, বন্ধুবান্ধব, পরিবার ছেড়ে গিয়ে কিছুই মনঃপূত হতে চাইতো না তাঁর।

(৫)

পিটসবার্গ
১৮.৯.৫৩

রুম্‌,

রান্না শিখছো তো? বড়ো হ'য়ে দেশে-বিদেশে যদি ভ্রমণ করতে চাও, তাহ'লে ইংরেজি, ফরাশি এবং রান্নাটা ভালো ক'রে শেখো। প্রথম না-হ'লেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু রান্নাটা জরুরি। আমি তো এখানে আসার পরেই একটু-একটু ক'রে প্র্যাকটিস করছি। কলেজের খাওয়া তেমন মনোরম ব'লে বোধ হচ্ছে না, তাছাড়া অত কাঁটায়-কাঁটায় হাজিরা দেয়া কি বরদাস্ত হয়? কাল ন-টার সময় গিয়ে শুনি ব্রেকফাস্ট ওভার। রুমানিয়ান বৃদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছে, দয়া ক'রে আমাকে খাবার দিলে। এদিকে এদের ডিনার ছ-টায় সময়, বাইরে তখন জ্বলজ্বলে রোদ্দুর, অমন অবেলায় কি ডিনার খেতে মন সায় দেয় কখনো? আমি তাই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছি। আমাকে একটা হট প্লেট (ইলেকট্রিক স্টোভ) আর কিছু বাসনকোশন দিয়েছে, চা, চিনি, দুধ, মাখন এবং কিছু ফল-টল ইতিমধ্যে কেনা হ'য়ে গেছে। স্টোভটায় চায়ের জল ফুটতে আধ ঘণ্টার কম লাগে না, তবু একরকম চালিয়ে দেওয়া যাবে। তেমন অসুবিধে হ'লে একটা কেৎলি কিনবো, তাতে পাঁচ মিনিটে জল ফোটে, আবার ফোটামাত্র হুইসিল বাজায়, লন্ডনে লিলির[১] বাসায় দেখেছি। আস্তে আস্তে উচ্চাশা হচ্ছে, ভাত-ডালও পাকিয়ে নেয়া যায় কিনা মনে-মনে চিন্তা করছি। কেমন করে ভাত রাঁধতে হয়, কতটা চাল, কতটা জল, ডালটাকেই বা কেমন ক'রে বাগানো যায়, এ-সব তোমার মা-র কাছে জেনে নিয়ে আমাকে লিখো। ডালকে এরা কি বলে এখনো জানি না, অমিয় দাশগুপ্তর[২] স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে জানতে হবে। এখানে সবই পাওয়া যায়— শুধু নাম নিয়ে বিভ্রাট ঘটে। দইকে আমরা চিরকাল বলেছি 'Curd', কিন্তু লন্ডনে শুনলুম ইয়াগট, এখানেও তা-ই বলে। ঝোল-টোল চেষ্টা করার মতো সাহস আমার নেই, তবে ডাল ভাত ডিম সেদ্ধ আলু-সেদ্ধ কাঁচা লঙ্কা সহযোগে মাঝে-মাঝে যদি খাওয়া যায় তাহ'লেই সুখের অন্ত থাকবে না। শুনে তোমার মা যেন ভাবতে না বসেন, আমার খাওয়ার বুঝি কষ্ট হচ্ছে। এখানকার একটা সুবিধে এই যে প্রত্যেকটি খাবার টাটকা এবং উৎকৃষ্ট, যা খাওয়া যায় তা-ই যে গায়ে লাগে, এবং পরিমাণে কম খেয়েও চলে যায়, এ-দেশের হাড়-মোটা মজবুত মানুষগুলোই তো তার প্রমাণ। দুধ চমৎকার, এক-একটা ডিম আমাদের তিনটে ডিমের সমান, পাঁউরুটি তাও এত সুস্বাদু যে টোস্ট না ক'রেই খেয়ে নেয়া যায়— মুখের মধ্যে গ'লে যায় রীতিমতো। আপেল আঙুর এত ভালো আর কোথাও খাই নি, বিরাট আকারের এক-একটা কলা। অতএব আমার খাওয়ার জন্য ভাবনা নেই। ভিটামিন-ভরা খাবার, তার উপর বাধ্য হ'য়েই অনেকটা হাঁটা-চলা করতে হচ্ছে— ফলত চাইকি আমার বিখ্যাত কনস্টিপেশনও সেরে যেতে পারে!

আমার পক্ষে কলেজে খাওয়ার আর-একটা অসুবিধে এই যে সেখানে সাধারণত ছাত্রীরা ছাড়া কেউ খায় না। ঐ প্রমীলার রাজ্যে আমার একটু বাধো-বাধো লাগে— সমবয়সী হ'লেও বা কথা ছিলো। তৃতীয় অসুবিধে বার-বার যেতে হয়, আসতে হয়, তাতে সময় নষ্ট। এখানে আমাকে সবাই বলছে, "I'm sure you'll enjoy housekeeping"— আমিও এমন ভাব করছি যেন সেটা 'enjoy' করা আমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু কে জানে— হয়তো পাকা রাঁধুনি হ'য়ে এ-দেশ থেকে ফিরে যাবো, তোমার মা-কে তাক লাগিয়ে দেবো একেবারে।[৩]

বাবা

---

[১] লিলি, সম্পর্কে বাবার কাজিন ছিলেন। গায়িকা উৎপলা সেন, যার ডাক নাম 'বেলন', তাঁর আপন দিদি।

[২] অর্থনীতিবিদ অমিয় দাশগুপ্ত। তখন আমেরিকায় ছিলেন।

[৩] মা-কে তাক লাগাবার মতো কিছু না রাঁধলেও বাবা যে সিদ্ধভাত রান্নাও বাগে আনতে পেরেছিলেন তাতেই বাড়িসুদ্ধু সকলের তাক লেগে গিয়েছিল। বাবা কেন, আমি, দিদি, কেউ-ই কোনোদিন বাড়িতে রান্নাঘরে ঢুকি নি। যখন পি.এইচ.ডি করতে বিদেশে যাই তখন আমিও ভাত-ডাল রাঁধতে জানতাম না। যখন রন্ধন-শিল্পের প্রেমে পড়লাম, বাবাকে রান্না করে খাওয়াবার সুযোগ আর নেই তখন।

(৬)

পিটসবার্গ
১১ নবেম্বর ১৯৫৩

রুম্‌,

গত শনিবার, যেদিন তোমার মা-কে টেলিগ্রাম করলাম, সেদিন সকাল থেকে বরফ পড়ছিলো। আসলে তার আগে রাত থেকেই— সকালে উঠে বাইরে তাকিয়ে আমি অবাক। শহরের ঢেউ-তোলা ছাদের উপর জ'মে আছে তুষার, গাছগুলোর শুকনো ডালে ঝুলে আছে, হাওয়ায় ভেসে-ভেসে নিঃশব্দে ঝ'রে পড়ছে মাটিতে। আবছা ধূসর আকাশের ফুলকো-ফুলকো অফুরন্ত শাদা-পেঁজা তুলোর মতো, সমুদ্রের ফেনার মতো, চার পয়সা দামের কাঠিতে বেঁধা আইসক্রীমের মতো। প্রথমে বেশ মজা লাগলো দেখতে, কিন্তু একটু পরেই পুরোনো হ'য়ে এলো। বই প'ড়ে আর সিনেমা দেখে কোনো জিনিশেরই নতুনত্ব থাকে না। সবই জানি, সবই দেখেছি। বাইরে এসে হাত দিয়ে ছুঁলাম, ছোঁয়ামাত্রই জল হ'য়ে গেলো। পাৎলা বরফ, একটু পরেই গ'লে জল হ'য়ে যায়, তখন কাদায় নোংরায় তুষারের সৌন্দর্য আর কিছু থাকে না। অবশ্য এ তো সবেমাত্র শুরু— আরো ঘন বরফের দিন আসছে, মেয়েগুলো এখন থেকেই লাফাচ্ছে স্কেট করতে পারবে, স্কী করতে পারবে ব'লে।

সারাদিন বরফ পড়লো সেদিন— আর সেদিনও তোমাদের কোনো চিঠি এলো না। এর আগে পাঁচদিন কোনো চিঠি পাই নি। পরের দিন রবিবার, ডাক বিলি হবে না। চিঠির জন্যে যাই ঠিক দুপুরের খাওয়ার আগে, সেদিন চিঠিহীন অবস্থায় কেমন ক'রে কী খেলাম জানি না। খাওয়ার পরে টেলিফোন তুলে টেলিগ্রাম করলাম। টেলিফোনে কানেকশন পেতে, আর মুখোমুখে কথাগুলো বলতে এবং শুনতে অনেক্ষণ সময় লাগেলো। কিন্তু তারপরেই বুকটা একটু হালকা হলো যেন। কিছু-একটা করতে পারলেই মনটা একটু শান্ত হয়, মানুষের সবচেয়ে দুঃখের অবস্থা কিছুই করতে না-পারা।

পরের দিন বরফ থামলো, কিন্তু মেঘে কুয়াশায় হাওয়ায় বৃষ্টিতে দিনটার আর অস্তিত্ব থাকলো না। জানলার পরদা ফেলে ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে ব'সে আছি। বড়ো কষ্টে কেটেছে আমার এ-দুটো দিন— শোনো, তোমরা চিঠি না-লিখে আমাকে এ-রকম কষ্ট দিয়ো না।[১]

কাল সন্ধের পরে তোমার মা-র টেলিগ্রাম টেলিফোনে আমাকে জানিয়ে দিলে— কিন্তু তার আগে তোমাদের চিঠিপত্র অবশ্য পেয়ে গেছি।

'দেশ' পত্রিকার জন্য একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম, সেটা সাগরবাবু নিয়ে গেছেন কিনা কিংবা বেরিয়েছে কিনা কিছুই এখনো জানতে পারলাম না। সাগরবাবুকে লেখা একটা চিঠি ছিলো সঙ্গে— সেটা তোমার মা পাঠিয়েছিলেন তো? আর একটা কিস্তিও এতদিনে পৌঁচেছে, সেটার জন্যে সাগরবাবুকে চিঠি লিখে দিতে তোমার মা-কে মনে করিয়ে দিয়ো। তাঁদের হাতে পৌঁছতে যেন দেরি না হয়।[২] এই খবরগুলো সময়-মতো জানালে আমার একটু ভালো লাগে, তোমরা কেউ-না-কেউ সময় ক'রে লিখো।

মাঝে দু-দিন একটু রোদের ঝিলিক দিয়ে আজ বিকেল থেকে আকাশ আবার ঝাপসা। আর লিখতে-লিখতে আমার এমন ঘুম পাচ্ছে যে কী বলবো। অথচ বেজেছে মোটে রাত আটটা। এখন উঠে গিয়ে চা তৈরি ক'রে খেতে হবে।

বাবা

অমিয় চক্রবর্তী নরেশের[৩] নামে কবিতাভবনের ঠিকানায় 'কবিতা'র জন্য লেখা পাঠিয়েছেন। তা পৌঁছলো কিনা জানিয়ো। আগে একবার অন্য ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন, টিকিট কম থাকায় ফেরৎ এসেছে।

---

১. নিজের জায়গা ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, প্রথমবার আমেরিকা গিয়ে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন— বিশেষত যতদিন তাঁকে পিটসবার্গে থাকতে হয়েছিল। আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের চলাচল যে কত ঘন ঘন হতো, তারিখ দেখলেই পাঠক তা বুঝবেন। তা সত্ত্বেও ডাকের চিঠিতে সময়ের গোলমাল তো হতোই! বাবা সেই বিলম্ব সহ্য করতে পারতেন না।

২. 'দেশান্তর' লিখছিলেন তখন। 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কথা উল্লেখ করছেন।

৩. নরেশ গুহ। বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একদা ছাত্র-পুত্রবৎ শিষ্য আমাদের অগ্রজতুল্য নরেশদা।

(৭)

পিটসবার্গ
২৪ নভেম্বর ১৯৫৩

রুম্‌,

আজ বুধবার, বিকেল সাড়ে-চারটে, তার মানে কলকাতায় এতক্ষণে বিষ্যুৎবারের ভোর হবো-হবো। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তুমি স্নান ক'রে, শাড়ি প'রে, মার হাতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছো। আর যতদিনে এই চিঠি পাবে, ততদিনে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে কমলালেবু খাচ্ছো গল্পের বই কোলে নিয়ে। নিশ্চয়ই পরীক্ষা ভালো হয়েছে, মনে-মনে তাকিয়ে আছো আরামে ভরা বড়োদিনের ছুটির দিকে— আর তারপরেই তো নাইনে উঠে রীতিমতো ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া!

ওখানে তোমার পরীক্ষা, আর এখানে আজ কলেজ পাঁচদিনের জন্য ছুটি হ'য়ে গেলো। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-র ছুটি এটা। আমেরিকায় প্রথম যখন ইওরোপের মানুষ এসেছিলো, অনেক রকম দুঃখ বিষাদ অতিক্রম ক'রে প্রথম যখন একটু গুছিয়ে বসতে পারলো তারা, তখন হেমন্তকালের ধান কাটা হ'য়ে যাবার পর কোনো-এক দিনে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য একটি ভোজের আয়োজন করে। সেই ভোজে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরাও নিমন্ত্রিত ছিলো— দুই শত্রুপক্ষে সেই প্রথম মিলনের অনুষ্ঠান। অবশ্য শাদা মানুষের প্রবলতার কাছে লাল মানুষ টিঁকতে পারলো না, তাদের আজ প্রায় অস্তিত্বই নেই— কিন্তু সেই দিনটির স্মরণে মার্কিনিরা এখনো প্রত্যেক বছর এই উৎসব ক'রে থাকে। এদের কাছে এই দিনটি কত মূল্যবান তা বুঝতে পারা শক্ত নয়। ভেবে দেখো সেই মানুষদের কথা, যাঁরা প্রথম তাঁদের হাজার বছরের মাতৃভূমি ছেড়ে পালতোলা ছোট্ট জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই দেশে এসেছিলেন। বিশাল অজানা মহাদেশ, বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন, বাইসনের পাল যমদূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত তীর নিয়ে আদিম অধিবাসীরা। তারই মধ্যে গাছ কেটে, কাঠের বাড়ি তুলে, চারদিকের মস্ত বড়ো অন্ধকারের মধ্যে এক একটি ছোটো-ছোটো প্রাণের উপনিবেশ গ'ড়ে তোলা। কত বড়ো সাহস, কত বড়ো শক্তি, আর কী অবিচল নিষ্ঠা। এমনি ক'রে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা নামক দেশটার সৃষ্টি হ'লো— যে-দেশ দেখতে দেখতে হ'য়ে বসলো প্রায় পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা! আজকের দিনের আমেরিকা যা-ই হোক না, সেই প্রথম বীরের দলের স্মরণে আমরাও যদি শ্রদ্ধা প্রকাশ করি তো অন্যায় হয় না।

আমাদের ভারতবর্ষেও একদিন এমনি ক'রেই বাইরে থেকে একদল মানুষ এসেছিলেন— যাঁদের আমরা সাধারণত (হয়তো ভুল ক'রে) আর্য ব'লে থাকি। একই জাতির একদল গেলো পশ্চিমে, ইওরোপের দিকে, আর একদল পুবে-দক্ষিণে নেমে এলো ভারতবর্ষে। তাঁরাও পথ বানালেন, ঘর বাঁধলেন, বনজঙ্গল সাফ করলেন, নতুন একটি উজ্জ্বল সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করলেন এই দেশে— কোনো-কোনো বিষয়ে সে-সভ্যতা মার্কিনের চেয়ে অনেক বড়ো। আর মার্কিন সভ্যতা ইওরোপীয় সভ্যতারই একটা পরিণতি মাত্র, ভারতবর্ষ মৌলিক সভ্যতার জন্মভূমি। কিন্তু সেই দিনের কথা হাজার-

হাজার বছর অতীতের কুয়াশায় ঝাপসা হ'য়ে আছে— কেউ তার কোনো বিবরণ জানে না— কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে এই ঘটনা মাত্রই পাঁচশো কিংবা চারশো বছর আগেকার— বলতে গেলে এই সেদিনের কথা। কিন্তু আমার আজ ভারতবর্ষের সেই প্রথম ভোরবেলাটির কথাই মনে পড়ছে।

আরো একট কথা ভেবে দেখো। শাদা মানুষ যেখানেই গিয়েছে সেখানেই অন্য কাউকে সে টিঁকতে দেয় নি। এই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠার পিছনে একদিকে যেমন আশ্চর্য বীরত্ব, অন্যদিকে রক্তের স্রোতে বয়ে গেছে নিষ্ঠুরতার অন্যায়। নিগ্রোদের আফ্রিকা থেকে পশুর মতো ধ'রে নিয়ে এসেছে জাহাজ বোঝাই ক'রে— আজ পর্যন্ত এ-দেশে তাদের সমান মর্যাদা নেই। লাল মানুষকে টিকতেই দিলো না, কিংবা তারাই টিঁকতে পারলো না— আজ তাদের অল্প যে-ক'জন অবশিষ্টকে ঘেরাও-করা জায়গার মধ্যে আটকে রেখেছে, তাদেরও আয়ু বেশিদিন নেই। কিন্তু যে-আর্যরা ভারতবর্ষে বাসা বেঁধেছিলেন, তাঁরা আদিম অধিবাসীদের অন্যভাবে জয় ক'রে নিলেও ধ্বংস করে নি কাউকে— আজ পর্যন্ত কোল ভিল সাঁওতাল বেঁচে আছে ভারতবর্ষে, আছে মুসলমান, খৃস্টান, পার্শি, ফিরিঙ্গি, যুগে-যুগে যারা এসেছে সকলকেই জায়গা দিয়েছে ভারতবর্ষ— সকলকেই মিলিয়ে দেবার দিকে তার প্রথম থেকেই ঝোঁক— যদিও আধুনিক জগতের কুটিল ষড়যন্ত্রের মধ্যে প'ড়ে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে আলাদা হ'য়ে যেতেই হ'লো। হোক আলাদা, তবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই কথাটা একটুও কম সত্য নয়— যে-কথা বলা আছে 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থ জাগো রে ধীরে' কবিতাটায়। আবার প'ড়ে দেখো কবিতাটা, একটু ভেবে দেখো— আমার ভাবতে চোখে জল আসে।[১]

ছুটিতে মেয়েরা কলরব করতে-করতে বাড়ি যাচ্ছে— বাক্স নিয়ে ট্যাক্সি ডেকে হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছে পরস্পরকে— এতক্ষণে এরোপ্লেনে ক'রে মা-বাবার কাছে পৌঁছেও গেছে কেউ-কেউ। আমিও যাচ্ছি— যদিও মাত্রই ন্যু ইয়র্কে, তবু কোথাও যে যেতে পারছি সেটুকুই সুখের কথা।

বাবা

---

[১] এই চিঠিটি বাবার শিক্ষা দেবার পদ্ধতিটির একটি চমৎকার উদাহরণ। আমি বাবার কাছ থেকে চিঠির মাধ্যমে যে শিক্ষা পেয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পাওয়া যায় না। মানুষ যেমন দোষে-গুণে মেশানো, দেশ এবং জাতিও যে তেমনই এক সংমিশ্রণ— এ বোধ তাঁর থেকেই অন্তঃস্থ করেছি। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৭-র চৈত্র (১৫শ বর্ষ) ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'দু'জন'। সেই কবিতার পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিচে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা জীবনানন্দের একটি চিঠি (২৬.৫.৫০-এ লেখা) এখানে প্রকাশ করা হল।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি
নরেশ গুহ-কে লেখা

দেশ ও বিদেশ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর ধ'রে আমাকে লেখা বুদ্ধদেবের চিঠির সংখ্যা হবে দু'শোর কাছাকাছি। নানা পত্রপত্রিকায় তার সামান্য কিছু অংশ ইতিপূর্বে ছাপা হ'য়েছে। সংগ্রহ থেকে আরো দুটি চিঠি প্রকাশের জন্য দিলাম। বাকি চিঠিপত্র একত্র ক'রে, আশা করছি, বই আকারে কখনো প্রকাশ পাবে। —নরেশ গুহ

(১)

[কলকাতা]
২৭ আগস্ট ১৯৬০

নরেশ,

তুমি সপরিবারে গুছিয়ে বসেছ জেনে সুখী হয়েছি। মাঝে কিছুদিন চিনুর কোনো খবর না-পেয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলুম; তপন-গীতারা কাতর হ'য়ে পড়েছিল, তারপর খরব পাওয়া গেল চিনু তার বোনকে চিঠি লিখেছে। আশা করি বৈদেশিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার দেরি হবে না; অসুবিধে বা আরামের অভাবে যেমনই হোক, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তাতে সন্দেহ নেই।[১]

আমাকে ২৮শে জানুয়ারির আগে নিউইয়র্ক নগরে পৌঁছতে হবে।[২] ভেবেছিলুম ২৪-২৫ নাগাদ শিকাগোতে থেমে তোমাদের ও ডিমকদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো; কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম জাপানে জানুয়ারির প্রথম অর্ধাংশ শীতের ছুটির মধ্যে পড়ে, তাই আমার যাত্রার দিন পেছিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তা যদি হয়, তাহ'লে প্রথম দফায় শিকাগোতে থামার সময় হবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য তারিখগুলো এখনো একেবারে ঠিক হয়নি– আর তোমাদের সঙ্গে কোনো-এক সময়ে দেখা হবেই।

তুমি ভারতীয় গল্প সংকলনের অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছ জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। আমার গল্পের বিষয়ে ডিমক-কে তো জানিয়ে দিয়েছি; সে Asia Society-র সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে যা হয় স্থির করবে।[৩] ঐ প্রতিষ্ঠানে যে-ক'টি গল্প আমি পাঠিয়েছি, আমার ইচ্ছে সেগুলি আগে কোনো সাময়িক পত্রে বেরোয়— যদি অবশ্য সম্পাদকেরা গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেন। অবশ্য Despair ব'লে গল্পে (গল্প) আমেরিকায় আগেই ছাপা হয়েছিল, সেটা তোমাদের অ্যান্থলজিতে এক্ষুনি নিতে পারো— Asia Society-তে কপি আছে। কিছুদিন অপেক্ষা করলে অন্য কোনো গল্প পাওয়া যেতে পারে— তোমাদের কি খুব তাড়া আছে? (আমি নিজে অন্য একটা গল্পের পক্ষপাতী।)

জ্যোতি এ-পর্যন্ত আমার দুটো গল্প করেছে; আরো করার কথা ছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রর[৪] মৃত্যুর ফলে আমাদের অনেক পরিকল্পনাই বিচলিত হ'য়ে গেল। তুমি কাজে ডুবে আছো, আমিও তাই; কিন্তু আমার কাজের ধরন এত বিচিত্র ও পাঁচমিশেলি যে এখন

বুঝি এ-ভাবে আর বেশিদিন চালাতে পারবো না। হয়তো, নিতান্ত আত্মরক্ষার গরজে, 'কবিতা' পত্রিকাই বন্ধ ক'রে দেব। কিন্তু তার আগে (এবং আমার বিদেশ যাত্রার আগে) সুধীন্দ্র-সংখ্যাটি বের করা চাই : এটাই আমাদের এখন প্রথম কর্তব্য। দিন কেটে যাচ্ছে—এখনো ঠিকমতো তোড়জোড় শুরু করতে পারি নি। পুজোর ছুটির আশায় আছি। কিন্তু আরো অনেক কাজ সেই চার সপ্তাহের জন্য জ'মে আছে। যা-ই হোক, তোমার সুধীন্দ্র বিষয়ক লেখাটা আমাকে সেপ্টেম্বরের মধ্য ভাগে অবশ্য পাঠিয়ো— ছোটোই লিখো, পরে বিস্তারিত লেখার বহু সময় পাবে। আর যাদবপুরের Comp. Lit. জর্নালের জন্য লেখাটা আরো আগে পাঠাতে পারো তো ভালো হয়— তৈরিই তো আছে তোমার? বিষয় হিসেবে ব্লেকের চাইতে রিলকে-ইয়েটস-এর তুলনা বেশি উপযোগী হবে— কিন্তু তোমার নিজের যেটা ভালো মনে হয়, আর যেটা আগে তৈরি হবে, সেটাই পাঠিয়ো।

রুমি তোমাকে সুধীন্দ্রর প্রতিকৃতি সংক্রান্ত চাঁদার কথা লিখেছিল। ছবিটা শেষ হ'য়ে গেছে; কাল রবিবার সকালে মহাজাতি সদনে বড়ো স্মরণ-সভায় ত্রিগুণা সেন সেটি উন্মোচন করবেন। দাঁড়ানো ছবি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতে নিজের কবিতার বই। দুটো ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে করতে হয়েছে; সুনীলমাধব কাজটি ভালোই করেছেন।[৫]

তুমি সাধ্যমতো কিছু চাঁদা পাঠিয়ো : টাকার অঙ্কে কিছু এসে যায় না; দিয়ে তুমি নিজেই তৃপ্তি পাবে সেটাই আসল কথা। ছবিটা থাকবে যাদবপুর লাইব্রেরির তেতলায় : তলায় লেখানো হলো : 'Donated to Jadavpur University by his friends and admirers.' (সুনীলমাধব সেন : এই নামে চেক পাঠাবে।)

আমাদের যাদবপুরের সংসার খুব টানাটানিতে চলছে; আগামী বছর তুমি ফিরে এলে রক্ষে পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক আমাদের দেশে কত দুর্লভ তা তুমি জানো, এবং আমাদের দুর্লভতম রত্নকে হঠাৎ হারাতে হ'লো।[৬] ম্যাকুচেনকে অস্থায়ী ভাবে নিয়েছি। খুব উৎসাহী ও পরিশ্রমী সে— কিন্তু তার স্বাস্থ্য একেবারে ভালো যাচ্ছে না, প্রায় ভাবিয়ে তুলছে। এবারে 1st yr. B.A.-তে চারটি মেয়ে ও একটি ছেলে ভর্তি হয়েছে (একজনও যাদবপুর প্রেপারেটরি থেকে আসে নি)— বেশ ভালো ক্লাস, গীতার খারাপ লাগছে না, মনে হয়। বিভাগীয় পরিচালনায় অমিয়[৭] আমাকে সর্বতোভাবে, অক্লান্তভাবে সাহায্য করছে— আগে যেমন তুমি করতে— কেমন ক'রে বলি যে ভাগ্য আমাকে এক-এক সময় বিশেষ দয়া করে না?

রানু ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ভুগে উঠলো, এতদিনে রোগের গ্লানি কেটে গেছে। চিনুকে সে পরে লিখবে। তোমাদের মেয়েকে নার্সারি স্কুলে দিলে চিনু অনেকটা সময় পাবে। স্কুল ওদের অবৈতনিক ব'লে জানি।

(স্বাক্ষর নেই)

---

১. ফুলব্রাইটের পরে আরো দুবছরের জন্য রককেলার ফেলোশিপ পাওয়ার খবর পাকা হ'লে ষাট সালের জুলাই মাসে আমার স্ত্রী-কন্যাও এভানস্টনে এসে পৌঁছলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো ধনী গৃহস্থের দান করা কাঠের একটি মনোরম পুরনো বাড়িতে স্থান হ'লো আমাদের। আফ্রিকা, কানাডা, জাপান ও আফগানিস্তান থেকে আসা কয়েকটি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে একত্রে থাকতুম আমরা সেই পুরনো বাড়িতে। নিকটেই ছিলো বিশাল মিশিগান হ্রদ। সেই সুন্দর বাড়িতে এসে আমাদের আতিথ্য নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, নবনীতা, প্রণবেন্দু এবং আরো অনেকে।

২. নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনা কাজে এবং যাত্রাপথে বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অনেকগুলি বক্তৃতার আমন্ত্রণ নিয়ে বুদ্ধদেব দ্বিতীয়বার আসছিলেন মার্কিন দেশে।

৩. কিছু বাংলা গল্পের অনুবাদ নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন নিউ ইয়র্কের এশিয়াটিক সোসাইটি। সে-গ্রন্থের সম্পাদনার ভার যাদের উপরে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে এডোয়ার্ড ডিমক ছিলেন, ছিলাম আমিও। কেন সেই পরিকল্পনা পরে বাতিল করা হয়েছিল তা আমার মনে নেই।

৪. কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মৃত্যু ২৫ জুন, ১৯৬০।

৫. চমৎকার এই প্রতিকৃতিটি রক্ষিত আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান গ্রন্থাগারের ত্রিতলে।

৬. 'দুর্লভতম রত্ন' ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মৃত্যুর পরে তুলনামূলক সাহিত্যের শিক্ষকের অভাব পূরণ করেছিলেন কেম্ব্রিজ থেকে আসা ইংরেজ যুবক ডেভিড ম্যাক্‌কাচন। সাহিত্যপ্রেম ছাড়া আমাদের এই প্রিয় বন্ধুটির দ্বিতীয় প্রণয় ছিলো বাংলা টেরাকোটা মন্দির-ভাস্কর্যের প্রতি। দিনের পর দিন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সেই সব জরাজীর্ণ মন্দির বিষয়ে কঠোর এবং মূল্যবান গবেষণা করতে-করতেই অকালে এ-দেশেই মৃত্যু হয় তাঁর। টেরাকোটা মন্দির বিষয়ক তাঁর লেখা একটি বই বেরিয়েছিলো কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। মৃত্যুর পরে, সেই বিষয়েই সব দিক থেকে মহামূল্যবান, আর একটি গ্রন্থ বেরোয় মার্কিন দেশের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

৭. যাদবপুরে আমাদের ছাত্র ও সহকর্মী, পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

(২)

(Newyork) Hotel Chelsea
At Eleventh Avenue
West Twenty Third Street

১০ এপ্রিল ১৯৬১

নরেশ,

স্থানীয় ইন্ডিয়া হাউসে যিনি পাসপোর্ট-অফিসার, তিনি কবি রজনীকান্ত সেনের পৌত্র; তাঁর হাতে তোমার পাসপোর্ট দিয়ে এসেছি। ফর্ম ও অন্যান্য কাগজপত্র তুমি সোজা নিউ ইয়র্কের কনসুলেটে পাঠিয়ে দিয়ো (3 East 64th st.); সব ব্যবস্থা ওঁরাই ক'রে রাখবেন। নতুন ভিজাও এখানে করাতে পারবে, কিছু ভেবো না।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty Club-এ আঠারো তারিখ তোমাকে লাঞ্চে নিয়ে যেতে চাই, আমার বন্ধুস্থানীয় দু-একজন অধ্যাপককেও বলবো। অধ্যাপক এডেল-এর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে আশা করি সাড়ে বারোটা পৌনে একটা নাগাদ লাঞ্চে পৌঁছাতে পারবে। উনিশ তারিখটা ভারি গোলমেলে দিন; দুপুরে ব্রুকলিন কলেজে আমার বক্তৃতা (তুমিও যাবে); সন্ধ্যায় ক্লাস (আটটা পর্যন্ত); রাত ন-টায় টাউন হল-এ রবীন্দ্র স্মরণ-সভা,[১] ফ্রস্ট আসবেন, আমেরিকার সমগ্র উদ্যোগের চরম ঘটনা এটি। আমাকে যেতে হবে, তোমার জন্যেও টিকিট সংগ্রহ ক'রে রাখবো। চিনু যেতে পারলে খুব ভালো হয়, কিন্তু সুচরিতাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে, তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, রেখে যাবারই বা উপায় কী। এ-বিষয়ে. যা ভালো বোঝো আমাকে জানিয়ো।

কুড়ি তারিখ তুমি তো ইয়েল-এ যাচ্ছো; আমার পক্ষে সেই দিনটা বড্ড খাটুনির, সকাল দশটা থেকে চার ঘণ্টা এক টেলিভিশন স্টুডিওতে আবদ্ধ থাকবো,[২] রাতে একটা নিমন্ত্রণ নিয়েছি, তারপর একুশ তারিখ সকালের প্লেনে ওয়াশিংটন হ'য়ে মেরিল্যান্ড যেতে হবে। তুমি ইয়েল থেকে ইয়র্কে ফিরে মহিলাদের নিয়ে বাস্-এ ওয়াশিংটনে এলে সেখানে আবার আড্ডা জমানো যায়। অশোক[৩] কয়েকদিন আগে কলকাতায় ছিল, তার বিষয়ে আর কোনো খবর জানি না। সে তখন ওয়াশিংটনে থাকবে কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সব কিছু কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে, আর এই তাড়াহুড়োটা বড়ো বিশ্রী-- কিন্তু ক্ষণিক আলোয় ক্ষণিকের গানই গেয়ে নিতে হবে, তা ভিন্ন আর উপায় নেই। তবু ভাগ্যিস এভানস্টনে কয়েকটা নিরিবিলি ঘণ্টা পাওয়া গিয়েছিল।[৪]

তুমি ও সকন্যা চিনু একত্র আসবে, না আলাদা-আলাদা, ঠিক কখন কোন বাস্-এ পৌঁছবে— সব বিস্তারিত জানিয়ো। বাস টার্মিনাল আমাদের হোটেলের কাছেই; আমি বা আমরা হাজির থাকবো। বাস্-এর নাম জানাতে ভুলো না। আমার কবিতাগুলো এনো, আর পারো তো কিছু বাক্স-দেশলাই।

উনিশ তারিখ বিষয়ে যা লিখেছি তা থেকে অনুমান করবে যে ডনাল্ড কীন-কে সেদিন বাড়িতে আসতে বলা যাবে না, একটা লগ্নও ফাঁকা নেই।[৫] এমনভাবে একসঙ্গে এতগুলো ব্যাপার জুটে যাবে তা আগে বোঝা যায় নি, কিন্তু আমি এখানে ক্ষণিকের অতিথি ব'লেই এইরকম হচ্ছে।

শার্লি ড্রাই রানুকে একখানা অতি সুন্দর চিঠি লিখেছেন, আমরা দুজনেই তাঁর বিষয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আছি। পাপ্পাকে সেই পশুর বইটা শীঘ্র পাঠিয়ে দিয়ো— ওর পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলো।

বু. বসু

---

১. বুদ্ধদেব বসু জীবনে প্রথম এক বছরের জন্য আমেরিকায় যান ১৯৫৩ সালে। গিয়েছিলেন পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন-এ ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর আমন্ত্রণ পেয়ে। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে 'কবিতা' পত্রিকা পরিচালনার কাজ মোটামুটি আমাকেই দেখতে হ'তো। ফিরে এসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পারেটিভ লিটারেচার বা তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হন ১৯৫৬ সালে। আমাকেও তাঁর এক সহকারী হিসেবে ডেকে নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকায় যান নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনার দায়িত্ব পেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি অবস্থিত চেলসি হোটেলে তখন সস্ত্রীক বাস করতেন বুদ্ধদেব। এই এপ্রিল মাসেই স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে এভানস্টন থেকে আমরাও গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চেলসি হোটেলে থেকেছি কয়েকদিন। সেই সময়েই বুদ্ধদেবের সহায়তায় ন্যু ইয়র্ক টাউন হলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় আমিও উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। আমেরিকার প্রধান কবি রবার্ট ফ্রস্ট সেই সভায় ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে সেটাই ছিলো সমগ্র আমেরিকার প্রধান অনুষ্ঠান।

২. নিউ ইয়র্কের এই টেলিভিশন স্টুডিয়োতে বুদ্ধদেব সেদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মর্মস্পর্শী একটি বক্তৃতা রেকর্ড করেন। সেই বক্তৃতার একটি টেপ করা রেকর্ড শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে আমি দান করেছি।

৩. আমাদের বন্ধু অশোক মিত্র।

৪. এই চিঠি লেখার মাসখানেক আগে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার এভানস্টনে আমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কদিনের নিবিড় আনন্দ কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না।

৫. অধ্যাপক ডরাল্ড কীন ছিলেন মূল থেকে করা জাপানী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অনুবাদক। আমার ইচ্ছে ছিলো বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর যাতে পরিচয় হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব ব্যস্ত থাকায় তাঁকে চেলসি হোটেলে সেবার আমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কীন-এর সঙ্গে অনেকটা সময় আমি কাটাতে পেরেছিলাম।

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা
জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত চিঠি

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা
২৬.৫.৫০

প্রিয়বরেষু,

কিছু কিছু পরিবর্তিত ক'রে দিলাম।[১] আবার কপি ক'রে পাঠালেই ভালো হত, কিন্তু সময় পাচ্ছি না। শেষ প্রুফ আমাকে না দেখিয়ে নিলে ভুল থেকে যেতে পারে। প্রুফ পাঠাবেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'[২] ও 'বনলতা সেনে'র[৩] বাকি টাকাটা মে মাসের শেষ দিকে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন; এই চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দিলে খুশি হব; খুব দরকার। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধদেব বসু সমীপেষু
কবিতাভবন
কলকাতা

---

১. 'দু'জন' কবিতাটি প্রথমে ১৯৩৪-এ লেখা হয়েছিল। ১৯৫০-এ জীবনানন্দ এটি সংস্কার করেন এবং পুনরায় প্রকাশও করেন। কবিতার শীর্ষনামের নীচে প্রথম বন্ধনিতে তা উল্লেখও করে দিয়েছেন— '১৯৩৪-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু পরিবর্তিত'। চিঠিতে সেই পরিবর্তনের কথাই উল্লেখ করেছেন।

২. ১৯৩৬-এ 'কবিতাভবন' থেকে প্রকাশিত।

৩. কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯৪২ খ্রিঃ। সিগনেট প্রেস সংস্করণ প্রকাশ ১৯৫২-য় এবং নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত।

—শুভাশিস চক্রবর্তী

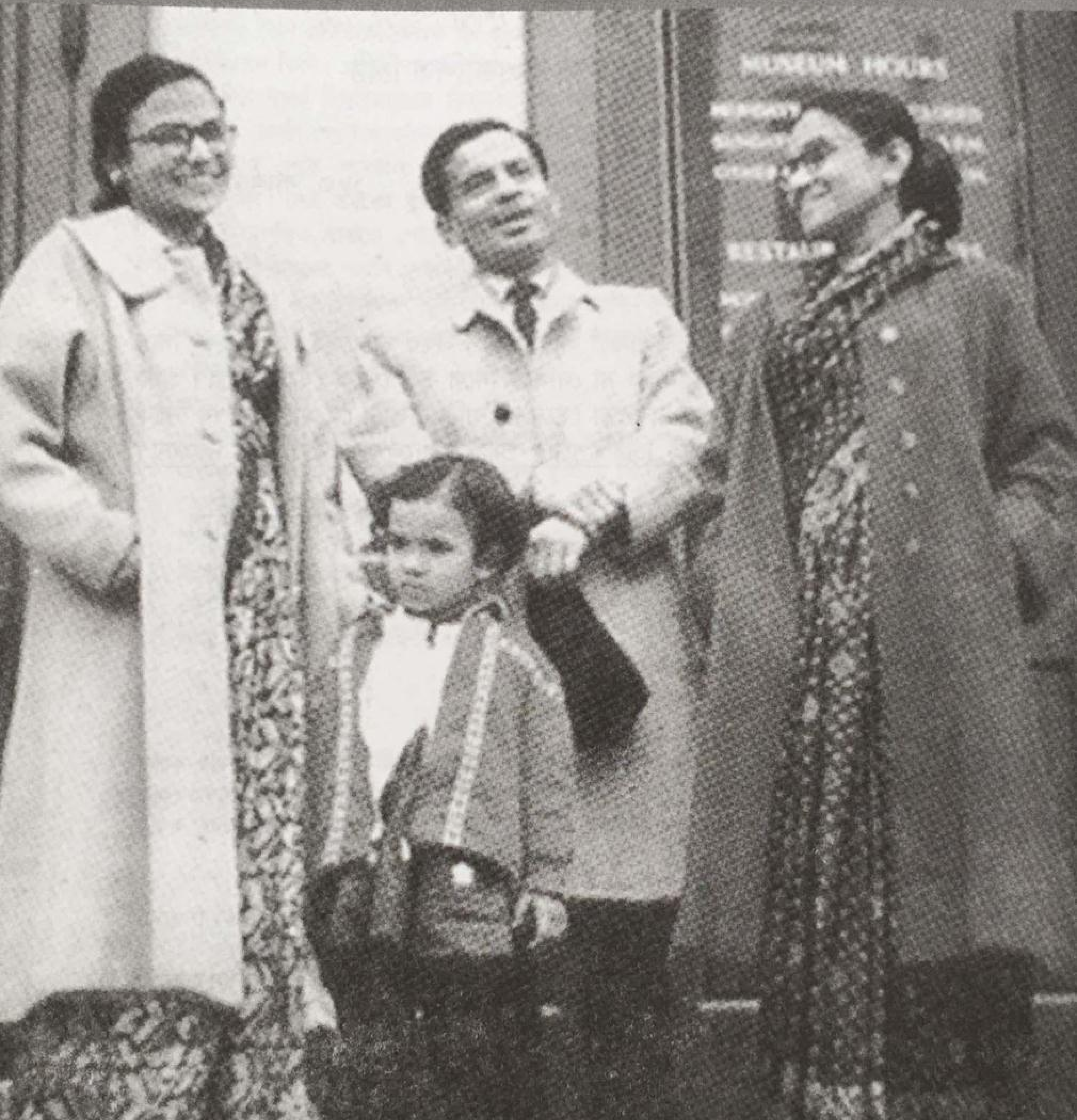
MUSEUM HOURS

আমেরিকার মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের সামনে অর্চনা গুহ (চিনু),
বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু এবং বালিকা সুচরিতা (১৯৬০)

বুদ্ধদেব বসু : জীবনকথা ও গ্রন্থপঞ্জি

১৯০৮ ৩০ নভেম্বর [১৩১৫] জন্ম; জন্মস্থান : কুমিল্লা, বাংলাদেশ; আদিনিবাস ঢাকা জেলার মালাখানগর, বিক্রমপুর পরগানা। পিতা : ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী।

১৯২৩ প্রাক-ম্যাট্রিক শেষ দুটি ক্লাস পড়বার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

হাতে-লেখা পত্রিকা ‘পতাকা’র সম্পাদক, লেখক ও লিপিকর হিসেবে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঢাকার ‘তোষিণী’ পত্রিকায় প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়।

১৯২৪ অক্টোবর [১৩১৩ আশ্বিন] প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মর্ম্মবাণী’র প্রকাশ [রচনাকাল : ১৯২৩-২৪]।

১৯২৫ ঢাকা বোর্ড-এর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন।

১৯২৬ ‘কল্লোল’ পত্রিকায় [৪ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ] ‘রজনী হলো উতলা’ গল্প প্রকাশ। এ-সময় থেকে আধুনিক সাহিত্যেও প্রতিপক্ষ ‘শনিবার চিঠি’র আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠেন।

জগন্নাথ কলেজ ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তরুণ বন্ধুরা মিলে ‘ক্ষণিকা’ নাম্নী একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার অন্তত ডজনখানেক সংখ্যার প্রধান লেখক ও লিপিকর ছিলেন বুদ্ধদেব।

১৯২৭ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পান।

ইংরেজিতে অনার্সসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ।

হাতে লেখা ‘প্রগতি’ মাসিকপত্রের প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ [আষাঢ় ১৩৩৪], সম্পাদক– বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত কার্যালয়– ৪৭ নং পুরানা পল্টন ঢাকা– বুদ্ধদেবের তদানীন্তন বাসস্থান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র সংসদ পরিচালিত সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৯ ‘প্রগতি’ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ [সম্ভবত কর্তিক ১৩৩৬ শেষ সংখ্যা]।

১৯৩০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, পদক প্রাপ্তি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ বুদ্ধদেব রচিত একাঙ্ক নাটক ‘একটি মেয়ের জন্য’ মঞ্চস্থ হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

সাড়া (উ) : রচনাকাল : ১৯২৮-২৯

অভিনয়, অভিনয় নয় (ছো. গ.), প্রথম পকাশ: ৯ মার্চ ১৯৩০। রচনাকাল : ১৩৩৪-৩৬

বন্দীর বন্দনা (ক)। রচনাকাল : ১৯২৬-২৯

১৯৩১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজিতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রথম স্থান, আড়াইশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্তি।

ধারাবাহিকভাবে ঢাকায় সাড়ে ন'বছর কাটানোর পর, এক ভাদ্রেও দিনে শেষবারের মতো ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় গমন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

রেখাচিত্র (ছো. গ.)। রচনাকাল : ১৯২৮-২৯

অকর্ম্মণ্য (উ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩১। রচনাকাল : ১৯২৯

১৯৩২ ডিসেম্বর *এরা আর ওরা এবং আরো অনেক* গল্পগ্রন্থেও জন্য আদালতে অভিযোগ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

এরা আর ওরা এবং আরো অনেক (ছো. গ.)।
রচনাকাল : ১৯৩০-৩১

মন-দেয়া-না নেয়া (উ) প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩২। রচনাকাল : জুলাই ১৯৩২

যবনিকা-পতন (উ), প্র. প্র.: নভেম্বর ১৯৩২। রচনাকাল : ১৯৩১

রডোডেনড্রন-গুচ্ছ (উ) প্র. প্র. : নভেম্বর ১৯৩২। রচনাকাল : ১৯৩১

একিট কর্থ (ক), প্র. প্র. : ডিসেম্বর ১৯৩২। রচনাকাল : ১৯৩০-৩১

১৯৩৩ এরা আর এরা এবং আরো অনেকে গ্রন্থের বিরুদ্ধে অভিযোগের মীমাংসা হয়; গ্রন্থটির দণ্ডপ্রাপ্তির পর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ঢাকার নর্থব্রুক হলে বুদ্ধদেব-এর উপন্যাস যেদিন ফুটলো কমল-এর প্রতিভা সোম-কৃত নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়।

সানন্দা (উ), প্র. প্র. : মে ১৯৩৩। রচনাকাল : মার্চ-এপ্রিল ১৯৩২

রঙিন কাচ (গ), প্র. প্র. : মে ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯২৯-৩০

পৃথিবীর পথে (ক), প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯২৬-২৮।

অদৃশ্য শত্রু (ছো. গ.), প্র. প্র. জুলাই ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯৩২-৩৩

আমার বন্ধু (উ) প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯৩২

যেদিন ফুটলো কমল (উ), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯৩৩

হে বিজয়ী বীর (উ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯৩৩

ধূসর গোধূলি (উ), রচনাকাল : ১৯৩৩

অনেক রকম (না. উ), রচনাকাল : ১৯৩৩

অসূর্যম্পশ্যা (উ), প্র. প্র.: ডিসেম্বর ১৯৩৩। রচনাকাল : ১৯৩৩

ঘুম-পাগলি (গ) রচনাকাল : ১৯৩১-৩৩

এলোমেলো (উ), রচনাকাল : ১৯৩২

জলতরঙ্গ (না. উ), রচনাকাল : ১৯৩০

১৯৩৪ ১৯ জুলাই প্রতিভা সোম-এর [ডাক-নাম রাণু, পিতা : আশুতোষ সোম, মাতা : সরযূবালা] সঙ্গে বিবাহ।

জুলাই মাসে রিপন কলেজ-এ [অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ] অধ্যাপনা কাজে যোগদান।

প্রকাশিত গ্রন্থ

মিসেস্ গুপ্ত (ছো. গ.) প্র. প্র. : এপ্রিল রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪

একদা তুমি প্রিয়ে (উ), প্র. প্র. : মে ১৯৩৪। রচনাকাল: ১৯৩৩

সূর্য্যমুখী (উ), প্র. প্র. : মে ১৯৩৪। রচনাকাল : ১৯৩৪

প্রেমের বিচিত্র গতি (ছো. গ.), রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪

শ্বেতপদ্ম (ছো. গ.) রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪

বিসর্পিল (উ) [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সঙ্গে] প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৪১। রচনাকাল : ১৯৩৪

বনশ্রী (উ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সঙ্গে রচনাকাল : ১৯৩৪

রূপালি পাখি (উ), প্র. প্র. : মে ১৯৩৪। রচনাকাল : ১৯৩৪

লাল মেঘ (উ), রচনাকাল : ১৯৩৪

পরস্পর (উ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৪। রচনাকাল : ১৯৩২-৩৪

অসামান্য মেয়ে (ছো. গ.) অক্টোবর ১৯৩৪। রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪

১৯৩৫ ১ অক্টোবর প্রথমকন্যা মীনাক্ষীর জন্ম। একই দিনে তদানীন্তন বাসস্থান ভবানীপুর ১২ যোগেশ মিত্র রোড থেকে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ [আশ্বিন ১৩৪২], সম্পাদক– বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক– সমর সেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

বাড়ি-বদল (উ), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৩৫। রচনাকাল : ১৯৩৪

ঘরেতে ভ্রমর এলো (ছো. গ.), প্র. প্র. : জুন ১৯৩৫। রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪

বাসরঘর (উ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। রচনাকাল : ১৯৩৫

সাগর-রহস্য (প্রেমেন্দ্র মিত্রসহ] (গ), প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৪২। রচনাকাল : ১৯৩৫

কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড (গ), রচনাকাল : ১৯৩৫

হঠাৎ আলোর ঝলকানি (প্র), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। রচনাকাল : ১৯৩২-৩৪

১৯৩৬ ১ ফেব্রুয়ারি টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট-এ অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় রচনায় এডওয়ার্ড টমসন 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

পারিবারিক (উ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৬। রচনাকাল : ১৯৩৫

নতুন নেশা (ছো. গ.), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৬। রচনাকাল : ১৯৩২-৩৩

আজগুবি জানোয়ার (গ), [প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সহযোগে]। রচনাকাল : ১৯৩৬

শনিবারের বিকেল (গ), রচনাকাল : ১৯৩২-৩৫

১৯৩৭ জুন রাসবিহারী এভিনিউ-ও ঠিকানায় বসবাস শুরু। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিবর্তন; প্রেমেন্দ্র মিত্র-স্থলে সমর সেন নিযুক্ত।

প্রকশিত গ্রন্থ

কঙ্কাবতী (ক), প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩৭। রচনাকাল: ১৯২৯-৩২
সমুদ্রতীর (ভ্র), রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৭
আমি চঞ্চল হে (ভ্র), রচনাকাল : ১৯৩৫-৩৬

১৯৩৬ হুমায়ুন কবীর ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশ [আশ্বিন ১৩৪৫]। ডিসেম্বর ২৪-২৫ কলকাতায় আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন-এ (প্রথম কলকাতা অধিবেশন) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য।

প্রকাশিত গ্রন্থ

গল্প-ঠাকুর্দ্দা (গ), প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৪৫। রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪ এক
পেয়ালা চা (গ), প্র. প্র. : পৌষ ১৩৪৫। রচনাকাল : ১৯৩২-৩৮
পরিক্রমা (উ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। রচনাকাল : ১৯৩৬। রচনাকাল : ১৯৩৬

১৯৩৯ 'কবিতাভবন'-এর উদ্যোগে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' [শ্রাবণ ১৩৪৬] সংকলন-গ্রন্থের প্রকাশ; সম্পাদক– আবু সায়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। করিমগঞ্জে ও শ্রীহট্টে সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন।

১৯৪০ ৯ জানুয়ারি দ্বিতীয় কন্যা দময়ন্তীর জন্ম।
'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একক নাম ঘোষিত হয় [চৈত্র ১৩৪৭]।

প্রকাশিত গ্রন্থ

নতুন পাতা (ক), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৪০। রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৯
পথের রাত্রি (গ), প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৪৭। রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮ দস্যুর
দলে ভোমরা (উ), রচনাকাল : ১৯৩৯

১৯৪১ জুন সপরিবারে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। 'কবিতা' পত্রিকায় বিশেষ 'রবীন্দ্রসংখ্যা' [আষাঢ় ১৩৪৭ ॥ ৬ বর্ষ সংখ্যা] প্রকাশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প (ছো. গ.), মার্চ ১৯৪১। রচনাকাল : ১৯৩৭-৩৯
ঘুমের আগে গল্প (গ), প্র. প্র. ; শ্রাবণ ১৩৪৮। রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮
ভদ্রতা কাকে বলে (গ), প্র. প্র. : কার্তিক ১৩৪৮। রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮
সব-পেয়েছির দেশে (ভ্র), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৪১। রচনাকাল : ১৯৪১

১৯৪২ ফেব্রুয়ারি 'কবিতাভাবন'-এর উদ্যোগে 'এক পর্যায়ে একটি' কাব্যগ্রন্থমালার প্রকাশ; প্রথম গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসু রচিত 'এক পয়সার একটি'। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগদান।

প্রকাশিত গ্রন্থ

এক পয়সার একটি (ক), প্র. প্র.: ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। রচনাকাল : ১৯৩৭-৪১
২২শে শ্রাবণ (ক), রচনাকাল : ফাল্গুন ১৩৪৮ : শ্রাবণ ১৩৪৯

কালো হওয়া (উ), প্র. প্র. : জুলাই ১৯৪২। রচনাকাল : ১৩৩৯-৪০

জীবনের মূল্য (উ), রচনাকাল : ১৯৪২

ছায়া কালো-কালো (উ), রচনাকাল : ১৯৪২

ভূতের মত অদ্ভুত (উ), রচনাকাল : ১৯৪২

১৯৪৩ ৩ এপ্রিল শ্রীরঙ্গমে 'মায়ামালঞ্চ' নাটকের অভিনয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

বিদেশিনী (ক), প্র. প্র. : মার্চ ১৯৪৩ । রচনাকাল : ১৯৪১-৪২

দময়ন্তী (ক), প্র. প্র. : মে ১৯৪৩। রচনাকাল : ১৯৩৫-৪২

খাতার শেষ পাতা (ছো. গ.), রচনাকাল : ১৯৩৫-৪৩

১৯৪৪ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় স্বাধীন সাংবাদিকতার শুরু।

'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ 'নজরুল সংখ্যা'র [কার্তিক-পৌষ ১৩১৫ ॥ ১০ বর্ষ: ২ সংখ্যা] প্রকাশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

অদর্শনা (উ), রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৪

রূপান্তর (ক), প্র. প্র. : ১৯ জুলাই। রচনাকাল : ৩০ জানুয়ারি-২৫ জুন ১৯৪৪

হাওয়া বদল (গ), রচনাকাল : ১৯৪৪

মায়ামালঞ্চ (কালো হাওয়া উপন্যাসের নাট্যরূপ), প্র. প্র. : ৩ মার্চ ১৯৪৪। রচনাকাল : ১৯৪৩

হাউই (অস্কার ওয়াইল্ড-এর অনুবাদ), রচনাকাল : ১৯৩৭-৪৪

১৯৪৫ ২ অক্টোবর একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল-এর জন্ম।

রিপন কলেজ-এর চাকরি থেকে পদত্যাগ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

উত্তরতিরিশ (প্র), প্র. : ১৯ জুলাই ১৯৪৫। রচনাকাল : ১৯৩৭-৪৪

গল্প সংকলন (সং), প্র. প্র. : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। রচনাকাল : ১৯২৮-৪৫

কাল বৈশাখীর ঝড় (উ), প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। রচনাকাল : ১৯৪৩

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা (গ), প্র. প্র.: এপ্রিল ৭ মে ১৯৪৫। রচনাকাল
১৯৪৫ পিরানদেল্লোর গল্প (গ), রচনাকাল : ১৯৪৪

গ্রন্থপঞ্জী (১৯৩০-৪৫), প্র. প্র. নভেম্বর ১৯৪৫

১৯৪৬ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

বিশাখা (উ), প্র. প্র. : ১৯ জুলাই ১৯৪৬। রচনাকাল : ১৯৪৫

একটি কি দুটি পাখী (গ), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৪৬। রচনাকাল ১৯৪৬

কালের পুতুল (সম), প্র. প্র. : ২ অক্টোবর ১৯৪৬। রচনাকাল : ১৯৩৫-৪৫

১৯৪৮ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

দ্রৌপদীর শাড়ী (ক), প্র. প্র. : মার্চ ১৯৪৮। রচনাকাল : ১৯৪৪-৪৭

অ্যান একর অফ গ্রিন গ্রাস (সমা), প্র. প্র.: ১৯৪৮। রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮

১৯৪৯ 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার তৃতীয় সম্পাদকীয় রচনা সম্পাদকীয় রচনার কাজে নিযুক্ত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

তিথিডোর (উ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। রচনাকাল : ১৯৪৬-৪৯

১৯৫০ 'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ 'মার্কিন' সংখ্যার [ডিসেম্বর ১৯৫০ ॥ ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা] প্রকাশ।

প্রকাশিত গন্থ

অন্য কোনোখানে (উ), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৫০। রচনাকাল : ১৯৪৭

১৯৫১ স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার কাজে ইস্তফা।

প্রকাশিত গ্রন্থ

মনের মতো মেয়ে (উ) প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৫৮

নির্জন স্বাক্ষর (উ), প্র. : জুলাই ১৯৫১। রচনাকাল : ১৯৫১

তুমি কি সুন্দর (উ), [অদর্শনা' উপন্যাসের পরিবর্ধিত সংস্করণ]।

তাসের প্রাসাদ (উ), রচনাকাল : ১৯৫১

১৯৫২ জানুয়ারি ইউনেস্কো পরিচালিত 'সেমিনার অন এডাল্ট এডুকেশন' প্রকল্পের উপদেষ্টা পদে যোগদান করে প্রথমে দিল্লি ও পরে মহিশুর যান। এক বছর এই কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ গল্প (সং), স. জগদীশ ভট্টাচার্য : প্র. প্র. জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ ॥ রচনাকাল : ১৯২৭-৪৬ *মৌলিনাথ* (উ), প্র. প্র. : নভেম্বর ১৯৫২

ক্ষণিকের বন্ধু (উ) ['অনেক রকম' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ]।

১৯৫৩ প্রথম আমেরিকা যাত্রা।

পিটসবার্গেও পেনসিলভেনিয়া কলেজ ও উইমেন্স-এ এক বছরের জন্য অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত।

'কবিতা' পত্রিকার 'ইংলিশ সাপ্লিমেন্ট' [আষাঢ় ১৩৬০॥ ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা] প্রকাশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

আধুনিক বাংলা কবিতা (সং), স. বুদ্ধদেব বসু প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৬০

শ্রেষ্ঠ কবিতা (সং) প্র. প্র. ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। রচনাকাল : ১৯২৬-৫২

১৯৫৪ পিটসবার্গ থেকে প্রত্যাবর্তন।

'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা'র [পৌষ ১৩৬১ ॥ ১৯ বর্ষ ২ সংখ্যা] প্রকাশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (উ) [প্রতিভা বসুর সঙ্গে], প্র. প্র. : ১ বৈশাখ ১৩৬১

সাহিত্যচর্চা (প্র), প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬১। রচনাকাল : ১৩৪৬-৫২

১৯৫৫ প্রকাশিত গ্রন্থ

শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর (ক), প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। রচনাকাল : ১৯৪০-৫৪ *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য* (সমা), প্র. প্র. : মে ১৯৫৫। রচনাকাল : ১৩৪৬-৫৯

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (গ), প্র. প্র. : মে ১৯৫৫। রচনাকাল : ১৯৩০-৪০ চার দৃশ্য (গ), প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৬২

স্ব-নির্বাচিত গল্প (সং), প্র. প্র. নভেম্বর ১৯৫৫

একটি কি দুটি পাখী (ছো. গ.), প্র. প্র. : নভেম্বর ১৯৫৫

১৯৫৬ ১ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এ তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শেষ পাণ্ডুলিপি (উ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৫৬। রচনাকাল : ১৯৫৫-৫৬

সুখী রাজপুত্র (গ), প্র. প্র. : মহালয়া ১৩৬৩

রান্না থেকে কান্না (গ), প্র. প্র. : ৭ আশ্বিন ১৩৬৩

বারো মাসের ছড়া (ক), প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। রচনাকাল : ১৯২৯-৫৫

স্বার্থপর দৈত্য (গ)।

১৯৫৭ ২৮ বৈশাখ শনিবার জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রভবনে কবিতা মেলার পক্ষ থেকে বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে একত্রে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

স্বদেশ ও সংস্কৃতি (প্র), প্র. : মার্চ ১৯৫৭। রচনাকাল : ১৯৪৫-৫৭

কালিদাসের মেঘদূত (অ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৮ 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে পুনরায় একক নাম ঘোষিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

যে-আঁধার আলোর অধিক (ক), প্র. প্র.: মে ১৯৫৮। রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৮

শোনপাংশু (উ), : অক্টোবর ১৯৫৯। রচনাকাল : ১৯৫৮

জ্ঞান থেকে অজ্ঞান (গ), মহালয়া ১৩৬৫

১৯৬০ ৯ মার্চ কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'ওয়েস্টার্ন ইন্‌ফ্লুয়েন্স অন বেঙ্গলী লিটারেচার : রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রচারিত হয়।

'কবিতা' পত্রিকায় বিশেষ 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা'র [আশ্বিন পৌষ ১৩৫৭। ২৫ বর্ষ ১-২ সংখ্যা] প্রকাশ।

'কবিতা' প্রত্রিকার প্রকাশ বন্ধ [চৈত্র ১৩৬৭ ২৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা]।

প্রকাশিত গ্রন্থ

নীলাঞ্জনের খাতা (উ), প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০। রচনাকাল : ১৯৫৬

দুই ঢেউ, এক নদী (উ), ['পারিবারিক' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ], প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৬৭

একটি জীবন কয়েকটি মৃত্যু (গ), প্র. প্র.: জুলাই ১৯৬০। রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৯

ডাক্তার জিভাগো (অ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

হ্যামেলিনের বাঁশিওলা (গ), প্র. প্র. : মহালয়া ১৩৬৭

১৯৬১ রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিদেশযাত্রা। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আমেরিকায় বক্তৃতা সফর ; সাবোন, কিয়োটো এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা; জার্মানি ভ্রমণ।

'যাদবপুর জার্নাল অব কমপেরিটিভ্‌ লিটারেচার' শীর্ষক বিভাগীয় পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যা (১৯৬৩) সম্পাদক ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (অ), প্র. প্র. মে : ১৯৬২। রচনাকাল : ১৯৪৯-৫৮

কিশোর সঞ্চয়ন (সং), প্র. প্র.: ফেব্রুয়ারি ১৯৬১।

হৃদয়ের জাগরণ (গ), প্র. প্র. চৈত্র ১৩৬৮। রচনাকাল : ১৯৫৮-৬০

১৯৬২ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে, বক্তৃতা বিষয় : 'রবীন্দ্রনাথ'।

প্রকাশিত গ্রন্থ

জাপানি জার্নাল (ভ্র), প্র. প্র. : মে ১৯৬২। রচনাকাল : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬১

টেগোর : পোর্ট্রেট অফ্ এ পোয়েট (সমা), প্রঃ আগস্ট ১৯৬২। রচনাকাল : ১৯৬২ হাসির গল্প (গ)।

১৯৬৩ যাদুবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ। দু-বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা সফরে আমন্ত্রিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (প্র), প্র. প্র. : জানুয়ারি ১৯৬৩। রচনাকাল : ১৯৫২-৬২

দময়ন্তী : দ্রৌপদীয় শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (ক), প্র. প্র. : জুলাই ১৯৬৩। রচনাকাল : ১৯৩৫-৪৭ ও ১৯৫৪

ভাসো আমার ভেলা (গ), প্র. প্র.: সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। রচনাকাল : ১৯৮২-৮৬

ছোটদের ভালো ভালো গল্প (গ), প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭০

১৯৬৬ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এ শরৎচন্দ্র বক্তৃতামালা প্রদান, বিষয় : রবীন্দ্রনাথ। জুন মাস থেকে শহরতলী নাকতলায় নবনির্মিত গ্রহ 'কবিতাভবন'-এ বাস করতে শুরু করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

বই ধার দিয়ো না (গ), প্র. প্র. : বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৭৩

দেশান্তর (প্র), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৬৬। রচনাকাল : ১৯৫৩-৬৫

প্রবন্ধ-সংকলন (সং), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৬৬। রচনাকাল : ১৯৪৩-৬৫

কবি রবীন্দ্রনাথ (প্র), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৬৬। রচনাকাল : ১৯৬৫

তপস্বী ও তরঙ্গিণী (কা. না.), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৬৬। রচনাকাল : ১৯৬৬

মরচে-পড়া পেরেকের গান (ক), প্র. প্র. : ডিসেম্বর ১৯৬৬। রচনাকাল : ১৯৫৮-৬৬

১৯৬৭ 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' গ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য আকাদেমী' পুরস্কার।

প্রকাশিত গ্রন্থ

পাতাল থেকে আলাপ (উ), প্র. প্র. : জানুয়ারি ১৯৬৭। রচনাকাল : মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৬

রাতে ভরে বৃষ্টি (উ), প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৬৭। রচনাকাল : মে-জুন ১৯৬৬

তুমি কেমন আছো (গ ও না), প্র. প্র. আগস্ট ১৯৬৭। রচনাকাল : ১৯৬২-৬৬ হেল্ডার্লিনের কবিতা (অ), প্র. প্র. : ডিসেম্বর ১৯৬৭। রচনাকাল : ১৯৫৪-৬৭.

১৯৬৮ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

গোলাপ কেন কালো (উ), প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮। রচনাকাল : ১৯৬৭

কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ (কা না), প্র. প্র. : জুন ১৯৬৮। রচনাকাল : ১৯৬৭

আয়নার মধ্যে একা (উ), প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৬৮। রচনাকাল : ১৯৬৮

১৯৬৯ 'রাত ভরে বৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য মামলা।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কালসন্ধ্যা (কা. না.), প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬। রচনাকাল: ১৯৬৭-৬৮

বিপন্ন বিস্ময় (উ), প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। রচনাকাল : ১৯৫৯-৬৯

১৯৭০ জাতীয় সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রাপ্তি; তিনি এই উপাধিপ্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি, অথচ তা প্রত্যাখ্যানও করেন নি।

প্রকাশিত গ্রন্থ

পুনর্মিলন (না), প্র. প্র. : মে ১৯৭০। রচনাকাল : ১৯৬৯

রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতা (অ), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৭০। রচনাকাল: ১৯৪৬-৬৮

অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (কা. না.), প্র. প্র. : নভেম্বর ১৯৭০। রচনাকাল: ১৯৬৯-৭০

১৯৭১ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

অ্যান এন্থলজি অব বেঙ্গলি রাইটিংগস (সম্পা), প্র. প্র. : জানুয়ারি ১৯৭১

একদিন চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা (ক), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৭১। রচনাকাল : ১৯৫২-৭০

স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা (ক), প্র. প্র.: জুন ১৯৭১। রচনাকাল : ১৯৬৭-৭০

১৯৭২ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

রুক্‌মি (উ), প্র. প্র. : জুন ১৯৭২। রচনাকাল : ১৯৭১

প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প (গ), প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৭২। রচনাকাল : ১৯৯৬৭-৭০

১৯৭৩ **প্রকাশিত গ্রন্থ**

আমার ছেলেবেলা (স্মৃতি), প্র. প্র. : মার্চ ১৯৭৩। রচনাকাল : ১৯৭২

সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত : ইক্কাকুসেন্নিন (কানা.), প্র. প্র. : জুলাই ১৯৭৩। রচনাকাল : ১৯৭০-৭১

১৯৭৪ ১৮ মার্চ কলকাতায় স্বগৃহে পরোলোকগমন।

'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র-পুরস্কার।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯৭৪ *মহাভারতের কথা* (প্র), প্র. প্র. : ১৯৭৪। রচনাকাল : ১৯৭১-৭৪

কবিতার শত্রু ও মিত্র (প্র), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৭৪। রচনাকাল : ১৯৬৮-৭২

১৯৭৫ *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*— ১, স. সুবীর রায়-চৌধুরী ও অমিয় দেব; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৮১। রচনাকাল : ১৯২৩-২৯

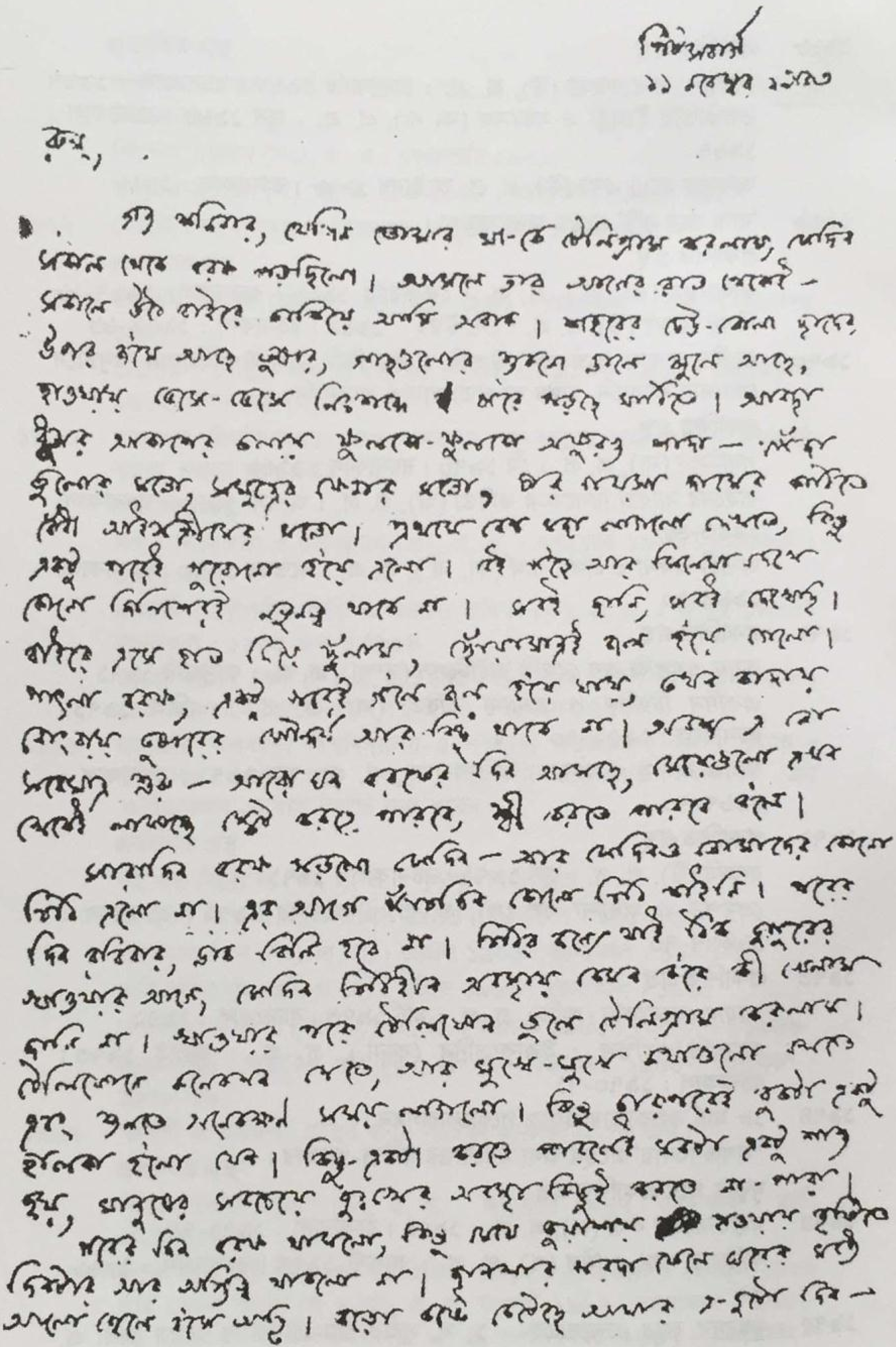

পিট্‌সবার্গ
১১ নবেম্বর ১৯৫৩

রুমি,

গত রবিবার, যেদিন তোমার মা-কে টেলিগ্রাম করলাম, সেদিন সকাল থেকে বরফ পড়ছিলো। আসলে তার আগের রাত থেকেই — সকালে উঠে বাইরে তাকিয়ে অবাক সকাল। পাহাড়ের ঢেউ-তোলা দৃশ্যের উপর বাঁধা আছে লুটিয়ে, গাছগুলোর শুকনো ডালে ঝুলে আছে, হাওয়ায় ভেসে-ভেসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে সর্বত্র। আবছা ধূসর সকালের আলোয় ফুলোনো-ফুলোনো অপূর্ব সাদা — পেঁজা তুলোর মতো, সমুদ্রের ফেনার মতো, তার মধ্যে গাছের কালো ঠিক ক্রিসমাস কার্ডের মতো। প্রথমে বেশ মজা লাগলো দেখতে, কিন্তু একটু পরেই পুরোনো হয়ে গেলো। এই শহরে আর দিনকয়েক থাকলে কোনো বিস্ময়েরই অস্তিত্ব থাকে না। সবই জানি, সবই দেখেছি। বাইরে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁলাম, স্পর্শমাত্রই জল হয়ে গেলো। পাতলা বরফ, একটু পরেই গলে জল হয়ে যায়, তবে কাদায় মেশানো বরফের সৌন্দর্য আর কিছু থাকে না। অবশ্য এ তো সবেমাত্র শুরু — আরো ঢের বরফের দিন আসছে, ছেলেগুলো তখন থেকেই লাফিয়ে স্কেট করতে পারবে, স্কী করতে পারবে বরফে।

সারাদিন বরফ পড়লো সেদিন — আর সেদিনও তোমাদের কোনো চিঠি এলো না। দুই সপ্তাহ ধরে কোনো চিঠি পাইনি। পরের দিন রবিবার, ডাক বিলি হবে না। চিঠির জন্যে আর ঠিক দুদিনের সোমবার আসবে, সেদিন নিরিবিলি অবস্থায় ভেবে ভেবে কী ভাবলাম জানি না। সোমবার ভোরে টেলিফোন তুলে টেলিগ্রাম করলাম। টেলিফোনে কানেকশন পেতে, আর ঘুরে-ঘুরে কথাগুলো যেতে তারে, অন্তত অনেকক্ষণ সময় লাগলো। কিন্তু টেলিফোনের পরেই বুকটা একটু হালকা হলো যেন। কিছু-একটা করতে পারলেই একটা একটু শান্তি হয়, মানুষের সবচেয়ে দুঃখের অবস্থা কিছুই করতে না-পারা।

পরের দিন বৃষ্টি নামলো, কিন্তু বেশ জোরালো [illegible] সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে বরফের আর অস্তিত্ব থাকলো না। বুধবার সকাল থেকে রোদ উঠেছে — অনেক দিন পরে হাঁফ ছাড়ছি। হয়তো এই ঠিক আমার এ-দুটো দিন —

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ২, স. হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৮২। রচনাকাল : ১৯২৮-৩২

প্রভাত ও সন্ধ্যা (উ), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৭৫। রচনাকাল ১৯৭২

১৯৭৬ *আমার যৌবন* (স্মৃতি), প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৭৬। রচনাকাল : ১৯৭৩

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ৩, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। রচনাকাল : ১৯২৬-৭২

১৯৭৭ *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*— ৪, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১ বৈশাখ ১৩৮৪। রচনাকাল : ১৯৩৩-৭৩

১৯৭৮ *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*— ৫, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ২ মাঘ ১৩৪৮। রচনাকাল : ১৯২৭-৩৪

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ৬, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১৫ আশ্বিন ১৩৮৫। রচনাকাল : ১৯২৬-৪৪

১৯৭৯ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ৭, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১৭ মাঘ ১৩৮৬। রচনাকাল : ১৯৩৩-৪৯

১৯৮০ কবিতাসংগ্রহ— ১, স. নরেশ গুহ; প্র. প্র. : নভেম্বর ১৯৮০। রচনাকাল : ১৯২৪-৪০ এক বৃদ্ধের ডায়েরি (উ), প্র. প্র. : আগস্ট ১৯৮০। রচনাকাল : ১৯৭৩-৭৪

১৯৮১ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ৮, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১ বৈশাখ ১৩৮৮। রচনাকাল: ১৯২৯-৫৮

১৯৮৪ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ৯, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ২ ভাদ্র ১৩৯১। রচনাকাল : ১৯৫১-৬২

১৯৮৬ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (প্র০, প্র. প্র. : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। রচনাকাল : ১৯৪৭-৭৪

১৯৮৮ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ — ১০, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫। রচনাকাল : ১৯৪৫-৬৫

১৯৮৯ কবিতাসংগ্রহ— ২, স. নরেশ গুহ; প্র. প্র. : ১৯৮৯। রচনাকাল : ১৯৩৭-১৯৫৫

১৯৯০ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ— ১১, স. নিরঞ্জন চক্রবর্তী; প্র. প্র. : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭। রচনাকাল : ১৯৬৬-৭১

১৯৯৩ কবিতাসংগ্রহ— ৩, স. নরেশ গুহ; প্র. প্র. ১৯৯৩ রচনাকাল : ১৯২৯-৭০

১৯৯৪ কবিতাসংগ্রহ— ৪, নরেশ গুহ; প্র. প্র. : ১৯৯৪। রচনাকাল : ১৯৪৯-৫৭

কবিতাসংগ্রহ— ৫, স. নরেশ গুহ; প্র. প্র. : ১৯৯৪। রচনাকাল : ১৯৫০-৭০

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু বিষয়ক আলোচনাপঞ্জি

অঙ্কুর সাহা পোয়েট্রির পাতায় বুদ্ধদেব বসু ॥ কবিসম্মেলন শারদীয় অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ৩৪০-৩৪৫ স. শ্যামলকান্তি দাশ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১. বুদ্ধদেব বসু আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৭৪ মার্চ ১৯; (পুর্নমুর্দ্রণ) অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী; ২. বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ ২-৪ স. বিমল রায়চৌধুরী।

অজিত দত্ত ১. নতুন পাতা : বুদ্ধদেব বসু (সমা.) ॥ পরিচয় ১৩৭৪ ফাল্গুন ১০ : ২য় পৃ. ৭৬১-৭৬৬ স. সুদীন্দ্রনাথ দত্ত; নতুন পাতা : বুদ্ধদেব বসু (সমা)॥ পরিচয় (পুনর্মুদ্রণ) ১৩৮১ মে-জুলাই সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন পৃ. ৭৪-৭৭ স. দেবেশ রায়; ২. বুদ্ধদেব ॥ দেশ ১৯৭৪ এপ্রিল ৬ ৪১:২৩ পৃ. ৭১৫-৭৫৫ স. অশোককুমার সরকার; ৩. বুদ্ধদেব ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫:১১ পৃ. ৪০৯:৪১৪।

অজিত রায় বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মানুষ অথবা নিছক প্রেমের কবিতা ॥ গোধূলি মন ১৯৮৭ জানুয়ারি পৌষ-মাঘ ১৩৯৩ ২৯ : ১ পৃ. ২৩-২৯ স. অশোক চট্টোপাধ্যায়

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১. বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৪৮ চৈত্র ৭:৪ পৃ. ৩১-৩৬ স. বুদ্ধদেব বসু; ২, সবপেয়েছিল দেশেরঃ বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৪৮ পৌষ ৭:৩ পৃ. ৩৪-৩৫ স. বুদ্ধদেব বসু।

অনল রায় বুদ্ধদেব বসুর 'রাত তিনটের সনেট : ১' সম্পর্কে আরো ॥ কবিতা কথা ১৩৯৪ চৈত্র ১৩৯৫ জৈষ্ঠ ৪ : ৩ পৃ. ১৫-১৮ স. সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

অন্যমনে (সাক্ষাৎকার) কবি মনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু॥ অন্যমনে ১৩৭৬ শরৎকালীন সংখ্যা পৃ. ৭৪-৭৮ স. সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় আশসকুমার সান্যাল।

অনুক্তা ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব ॥ অমৃতলোক ১১১ ৩৩ : ১ অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ২০-৩২ স. সমীকরণ মজুমদার।

অনুপম মুখোপাধ্যায় মহাভারতে বুদ্ধদেব : প্রাক-ঔপনিবেশিক পরিসর বনাম আধুনিকতা ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুপম হাসান বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ১৩৭-১৫৯ স. উত্তম দাশ

অনুত্তম ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু; ব্যক্তি সম্পর্ক ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

অপূর্ব মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু : আজ ও আগামীকাল ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩ : ৬ পৃ. ৪-৫ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

অপূর্ব সাহা ডাকভাবনা, লুপ্তপত্র এবং বুদ্ধদেবের আর যা কিছু ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

অভিজিৎ দাশগুপ্ত বুদ্ধদেব বসু : প্রবন্ধের শিল্পরূপ ॥ অনুক্ত ১৩৮১ নবপর্যায় ৭:৩ পৃ. ১৮৬-১৯৬ স. সুনীলকুমার নন্দী।

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব॥ সাহিত্য সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০:২ পৃ. ১৪৩-১৪৭ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

অমর সাহা উপন্যাসশিল্প : বুদ্ধদেব বসুর অভিনব সুর ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

অমলেন্দু বসু ১. একটি কবিতা ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৩৮-৪২ স. বিমল রায় চৌধরী; ২. প্রগতির প্রতিষ্ঠা ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ১১ ৪৫ : ১১ পৃ. ৪১৫; ৩. সমকালীন ॥ সাহিত্যচিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩ : ২পৃ. ৭-৯স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

অমিত দত্ত বণিক বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের প্রবন্ধ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

অমিতাভ চট্টোপধ্যায় ঈষৎ গোধূলির বিষণ্নতা ঘিরে ছিল তাঁকে ॥ অমৃতলোক ১১১ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩:১ পৃ. ৪৬-৪৯ স. সমীরণ মজুমদার।

অমিতাভ চৌধুরী ছাত্রজীবনের স্মৃতি থেকে ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ প্র. ২০০-২০৩ স. প্রতিভা বসু।

অমিতেশ মাইতি মেধাবীর নিঃসঙ্গতা ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ২৮১-২৮৯ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; (পুনর্মুদ্রণ) চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমিয় ভট্টাচার্য স্মৃতিপটে কবিতাভবন ও কবি বুদ্ধদেব বসু ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ২১-২৫ স. উত্তম দাশ।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পরিক্রমা : বুদ্ধদেব (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৫ মাঘ ৮ : ১ পৃ. ৯১-৯২ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

অমিয় চক্রবর্তী নতুন পাতা : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ ১৩৪৭ পৌষ ৬ : ৩য় পৃ. ৪৯-৫৬ স. বুদ্ধদেব বসু।

অমিয় দেব ১. 'অন্ধকবি' থেকে 'ইক্কাকু সেন্নিন': বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ ॥ অন্তঃসার ৪:১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পৃ. ০৮-৩১ স. রত্নাংশু বর্গী; ২. দর্পণে দুই মুখ ॥ কলকাতা ১৯৮৬ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ন সংকলন পৃ. ১১৩-১২২ স. জ্যোতির্ময় দত্ত; ৩ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা (নরেশ গুহ সম্পাদিত) (সমা) ॥ দেশ ৪. বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৮ অক্টোবর-ডিসেম্বর পৃ. ১১ স. বিমল রায়চৌধুরী : ৫. বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৯-২১ স. অরূপ আশ। ৬. ভাষা শ্রমিক বুদ্ধদেব ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ৭১-৭৩ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ৭. স্যার বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫ : ১১ পৃ ৪৪৯

অম্বুজ বসু বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ ও চিন্তা ॥ ধানসিঁড়ি ১৩৮২ তৃতীয় বর্ষ শারদ সংকলন পৃ. ২০-৩৩ স. দীপক কর।

অম্লান দত্ত ১. এ যুগের বুদ্ধদেব। ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ. প্রতিভা বসু; ২. বিশ শতকের কবি বুদ্ধদেব ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ৩৯-৪০ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); ৪. বুদ্ধদেব বসু : বৈপরীত্যে সাযুজ্যে ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯, পৃ. ১৭-২০, অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'রই পুনর্মূল্যায়ন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১১-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ ১১৩-১১৬স. অরূপ আশ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কালের পুতুল, তার শিল্পী ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭ : ৯ পৃ ৯১৩-৯১৮ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অরুণকুমার সরকার ১. কবি বুদ্ধদেব বসু ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫ : ১১ পৃ. ৪১৫; ২. বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৮ জানুয়ারি

৭-৮ যুগ্মসংকলন পৃ ১২৩-১২৮ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); ৩. যে আঁধার আলোর অধিক (সমা) ॥ উত্তরসূরি ১৩৬৬ শ্রাবণ-আশ্বিন নবপর্যায় ৬:৪ পৃ. ৩৩৬-২৩৯ অরুণ ভট্টাচার্য।

অলক মণ্ডল ১. বুদ্ধদেব বসু : ফিরে দেখা ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; ২. রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু॥ সহিত্য ও সংস্কৃতি এপ্রিল-জুন ২০০৭ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ ৪৩:১-২ পৃ. ১৭২-১৯৫ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

অলোক রায় একজন বিতর্কিত লেখক ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

অশোক মিত্র ১. কবিকাহিনী ॥ চতুরঙ্গ ১৩৮০ মাঘ-চৈত্র পৃ. ২২৭-২২৯ স. বিশ্বনাথ ভট্টচার্য; ২. কাব্যনাট্যভাষা ॥ তাঁতঘর একুশ শতক ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৪৫-৪৭ স. অরূপ আশ। ৩. দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ॥ সাহিত্যচিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩:২ পৃ ১৩-২৩ স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; ৪. দূরে এসে ভালো থাকি ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ৩১-৩৮ স. জ্যোতির্ময় দত্ত; (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ) ৫. স্মৃতি, শৈশব কবিতা (আমার ছেলেবেলা) (সমা) ॥ চতুরঙ্গ ১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ. ১০১-১০৪; হলো না, ছিল যা অবধারিত ॥ ৩০ নভেম্বর: কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ. ১-৯ স. প্রতিভা বসু।

অশোক সেন ১. তিথিডোর : প্রথম প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পরে ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ৯৫-১০২ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং। ২. বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭ পৃ. ৮২-১০০ স. বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

অশোককুমার ধর বুদ্ধদেবের শেষ পর্যায়ের উপন্যাস ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ আশ্বিন ১০ : ২ পৃ. ১৭৫-১৮৮ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

অশ্রুকুমার সিকাদার বুদ্ধদেব বসুর কাব্যজিজ্ঞাসা ॥ এক্ষণ ১৩৭৯ শারদীয় ১০ : ১-৩ পৃ. ৩৭-৪৯ স. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য।

অসীম সাহা বুদ্ধদেব বসুর বৈচিত্র্যমুখিতা, তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ : ১১ পৃ. ১৮৪-১৯৩ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র বুদ্ধদেব বসু : একটি তর্পণের ভুমিকা ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

অর্ণব সেন ১. বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস চর্চা ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ৯৩-১০৩ স. উত্তম দাশ; ২ বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দ ঘোষ হাজরা বুদ্ধদেব : আইয়ুব এবং রবীন্দ্রনাথ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ১৬০-১৮০ স. উত্তম দাশ : ২. বুদ্ধদেব বসু ও আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিত্য মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতা ও বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিত্য মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতা ও বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবদুল কাদির বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২: ১১-১২ পৃ. ১-১২ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রকৃতি ও সংস্কৃতি ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২: ১১-১২ পৃ. ২০১-২৩৮ নীলিমা ইব্রাহিম।

আবদুস শুকুর খান শাপভ্রষ্ট : চিরন্তন আত্মপ্রকার ছবি ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবু জাফর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ১৫৫-১৬১ স. নীলিমা ইব্রাহিম; (পুনমুর্দ্রন) অমৃতলোক ১১১ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩ : ১ পৃ. ৬৯-৭৫ স. সমীরণ মজুমদার।

আবুল হাসানাত ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ : ১১-১২ পৃ. ১৫২-১৫৪ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

আরশাদ আজিজ জীবন ভোগের অপর স্তর ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ : ১১-১২ পৃ ১৬৮ - ১৭৩ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

আশরাফ সিদ্দিকী বুদ্ধদেব বসু ॥ দেশ ১৩৮১ অগ্রহায়ন ১৪ পৃ. ৩৫৩-৩৬০ স. অশোককুমার সরকার।

আশিস অধিকারী সম্পাদক বুদ্ধদেব ॥ জ্বলদার্চি জানুয়ারি-ডিস্মেবর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

আশিস মজুমদার বুদ্ধদেব বসুর গদ্য ভাষা ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৯২৩-৯৪২ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আশিস সান্যাল বুদ্ধদেব বসুর শব্দচেতনা ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৯৪৩-৯৫০
স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা
স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়।

আসাদ চৌধুরী বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২: ১১-১২ পৃ ৯৬-১০০ স. নীলিমা ইব্রাহিম : (পুনর্মুদ্রণ) চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তম দাশ ১. কবি বুদ্ধদেব বসু ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ২৬-৫৪স. উত্তম দাশ; ২. বুদ্ধদেব বসুর ছন্দভাবনা ॥ কবি সম্মেলন শারদীয় অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ৫১-৫৮ স. শ্যামলকান্তি দাশ; ৩. বুদ্ধদেব বসুর 'সংক্রান্তি' ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী; ৪. সনেট শিল্পী বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদয়নীল ভট্টাচার্য প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

উজ্জ্বল মজুমদার শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ আশ্বিন ১০:২পৃ ১৫৮-১৬২ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

উৎপলকুমার গুপ্ত সেকাল বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কনককান্তি দে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে ঘটনা ও চরিত্রের ব্যবহার ॥ তাঁতঘর একুশ শতক ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৫২-৫৬ স. অরূপ আশ।

কবিতা সিংহ ১. বুদ্ধদেব বসু ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩ : ৬ পৃ ১২-১৩ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য; ২. বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্য; ২. বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৮ অক্টোবর ডিসেম্বর পৃ. ৯-১১ স. বিমল রায়চৌধুরী।

কমলকুমার মজুমদার রেখো মা দাসেরে মনে ॥ কৃত্তিবাস ১৯৭৪ জানুয়ারি-জুন যুগ্মসংকলন পৃ. ১৭-৫৪ স. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

কমলেশ চক্রবর্তী ১. অনুবাদ শিল্পী বুদ্ধদেব ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১০৩-১১৬ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কর্ম ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ১০৮-১২১ স. উত্তম দাশ।

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ১. বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১১৭-১২২ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. বুদ্ধদেব বসু'র কাব্যনাটক : রূপে ও রূপকল্পে ॥ তাঁতঘর একুশ শতক ১০-১২ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ২২-৪৪ স. অরূপ আশ।

করালীকান্ত বিশ্বাস কালো হাওয়া : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৯ চৈত্র ১২:১:৩ পৃ. ৬৯৩-৬৯৪।

করুণাময় গোস্বামী বুদ্ধদেব বসুর নাটক : পুরাণ প্রসঙ্গে ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ১১৪ ১৩৪ স. নীলিমা ইব্রাহিম; (পুনর্মুদ্রণ) অমৃতলোক ১১১ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩: ১ পৃ. ৫০-৬৮ স. সমীরণ মজুমদার।

কল্লোল মজুমদার বিষাদের নাট্যরূপ ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ২২-২৩ স. বিমল রায় চৌধুরী।

কাজল চক্রবর্তী বর্তমানের চোখে বুদ্ধদেব ॥ সাংস্কৃতিক খবর ৪৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৪৪-৪৫ স. কাজল চক্রবর্তী।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১. কবিতা-ভবন/দুশো-দুই ॥ দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১ পৃ. ১১৯-১২২ স. অশোককুমার সরকার। ২. 'কবিতা'র সাত বছর ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ৪৯-৫৪ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); ৩. ম্যাল-এ ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৭-৮ স. বিমল রায় চৌধুরী।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এই মুহূর্তের ভাবনা ॥ সাহিত্যচিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩:২ পৃ ১০-১২ স. কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত।

কেতকী কুশারী ডাইসন বুদ্ধদেব বসু : তাঁর কবিতার অনুবাদ ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১৪২-১৮০ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

কেদার ভাদুড়ী ইন্দ্রপতন ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩ : ৬ পৃ ৮ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

ক্লিন্টন বি. সিলি ট্রান্সলেটিং রাত ভ'রে বৃষ্টি : রেলিভিং থ্রু লেটারস ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ২০৮-২৩৮ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

কুমার রায় ১. এক ক্রান্তিকাল ও বুদ্ধদেবের চারটি কাব্যনাটক ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৩৪-৪৪ স. অরূপ আশ; ২. কবি বুদ্ধদেব বসু : সন্নিকট-বিকল্প নাটক ॥ বহুরূপী ১০৮ অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ৯-২৬ স. কুমার রায়।

কৌশিক সেন বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট : আমরা প্রাপ্তি ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৮১-৮৭ স. অরূপ আশ।

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসুর রম্যরচনা ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

কৃষ্ণরূপ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা সাহিত্য ॥ ও সংস্কৃতি ১৯৭০ ৬:২ স. সঞ্জ বকুমার বসু।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ১. অকর্ম্মণ্য : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৮ আশ্বিন ১:৩ পৃ. ৫০৮-৫১৩ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; ২. অভিনয়, অভিনয় নয়ও অন্যান্য গল্প/বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৮ শ্রাবণ ১:১ পৃ ১১৪-১১৬ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; ৩. এরা আর ওরা ও আরো অনেকে : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৯ মাঘ ২:৬ পৃ. ৪৬৬-৪৬৯ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; হঠাৎ আলোর ঝলকানি/বাসর ঘর : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৩ শ্রাবণ ৬:১ পৃ ৯৮-১০০ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী কল্লোলের কথাকোবিদ বুদ্ধদেব বসু ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০:২ পৃ. ১৪৮-১৫৭ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনবিলাসী এক কবি ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

চঞ্চলকুমার চট্টোপধ্যায় কঙ্কাবতী : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৪ কার্তিক ৭:৪ পৃ ৩৯১-৩৯৬ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; ২. সমুদ্রতীর/আমি চঞ্চল হে : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৪ পৌষ ৭:৬ পৃ ৫৯১-৫৯৩ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; সমুদ্রতীর/আমি চঞ্চল হেঃ বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় পুনর্মুদ্রণ ১৯৮১ মে-জুলাই সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন পৃ ৮৩-৮৫ স. দেবেশ রায়।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থপঞ্জি ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭-৯ পৃ ৯৫২-৯৬০ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চিত্ররথ দত্ত বুদ্ধদেব বসু— ক্ষণিক স্মৃতিচারণ ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭ পৃ. ১৩৩-১৪০ স. প্রতিভা বসু।

চিন্ময় গুহ বুদ্ধদেব বোদলের অনুবাদ : মিথ ও বাস্তব ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

চিত্রা দেব বুদ্ধদেব কাব্যে বর্ণালী ॥ অন্যদিন ২৭ কবি প্রণাম সংখ্যা ১৩৮৬ পৃ. ৫-১০; অন্যদিন ২৮ শরৎ সংখ্যা ১৩৮৭ পৃ ৫৫-৫৭; অন্যদিন ২৯-৩০ শীত-বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৮ পৃ. ২৯-৩২ স. শিশির ভট্টাচার্য।

চুনীলাল রায় বুদ্ধদেব বসু : একটি সাক্ষাৎকার স্মরণে ॥ সাহিত্যচিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩:২ পৃ. ২৫-৩৩ স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় কালসন্ধ্যা— একটি পাঠ অভিজ্ঞতা ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৪৭-১৪৯ স. অরূপ আশ।

ছায়া দেবী বাড়ি বদল : বুদ্ধদেব (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪২ কার্তিক ৫:২ পৃ ৩০০-৩০৪ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

জগদীশ ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসু ॥ কবিও কবিতা ১৩৭৪ শ্রীপঞ্চমী ৩:১ পৃ ১২৮-১৫৬ স. জগদীশ ভট্টাচার্য।

জগন্নাথ ঘোষ ১. বাংলা গদ্যের বিস্ময় : বুদ্ধদেব বসু ॥ মাঝি ১৯৮২ আগস্ট ত্রয়োদশ বর্ষ পৃ ২২-২৮ প্রশান্ত রায়; ২. বুদ্ধদেব বসু স্মরণে ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ ৯ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য; ৩. বুদ্ধদেব বসু : বাংলা গদ্যের বিস্ময় ॥ অন্বেষা ১৯৭৪ জানুয়ারি, ৪. বুদ্ধদেব বসুর নাটক : মায়মালঞ্চ (সমা) ॥ অহর্নিশ বর্ষ সাত নবম সংকলন শীত ১৪১০, ৪১-৪২ স. শুভাশিস চক্রবর্তী, রাতুল চন্দরায়, রাজা ভট্টাচার্য, অনির্বাণ দাস : ৫. রবীন্দ্রভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বসুর দু'খানি কাব্যনাট্য ॥ প্রান্তিক জুলাই-আগস্ট ২০০৬ স. খগেশ দেববর্মণ; ৬. সাময়িক পত্র সম্পাদনে বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮৯ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮:২ পৃ. ২০৭-২১৮ স. সঞ্জীব কুমার বসু; মাইকেল মধুসূদন দত্ত বুদ্ধদেব বসু ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

জয় গোস্বামী তাহলে উজ্জ্বলতর কর দীপ ॥ দেশ ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ বই সংখ্যা স. হর্ষ দত্ত।

জয়দীপ ঘোষ একচেটে সৌভাগ্য ও বুদ্ধদেব বসুর গল্প ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ : ১১-১২ পৃ ১৯৪-২০০ স. নীলিমা ইব্রাহিম ॥

জীবনানন্দ দাশ কঙ্কাবতী : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৪৪ পৌষ ৩:২ পৌষ ৩:২ পৃ. ৬৪ স. বুদ্ধদেব বসু।

জ্যোতির্ময় দত্ত ১. 'কবিতা'র প্রথম দুই খণ্ডের কবি ॥ ৩০ নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ. ২০৪-২১২ স. প্রতিভা বসু; ২. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ॥ কলকাতা ১৯৭৪ ৩:১০-১১ পৃ ৪৬-৭১ স. জ্যোর্তিময় দত্ত; ৩ বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর পৃ. ১১ স. বিমল রায়চৌধুরী ৪. রাত ভ'রে বৃষ্টি (আদালতে মামলা) ॥ কলকাতা ১৯৭৩ ৭:৮ পৃ ৮১-৮৬ স. জ্যোতির্ময় দত্ত। ৫. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ॥ সাংস্কৃতিক খবর ৪৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৪৭-৫১ স. কাজল চক্রবর্তী, সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ৯০-৯৪ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

তন্ময় দত্ত মেঘদূতের অনুবাদ (পত্র) প্রসঙ্গ : বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদ 'কবিতায় প্রকাশিত) ॥ কবিতা ১৩৬৩ পৌষ ২১:২পৃ ১৬৫-১৬৬ স. বুদ্ধদেব বসু।

তপতী মুখোপাধ্যায় 'মায়ামালঞ্চ' ও আমি ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭ পৃ. ১২৮-১৩২ স. প্রতিভা বসু।

তপন বাগচী বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ১২৯-১৩৬ স. উত্তম দাশ।

তরুণ মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতার বুদ্ধদেব বসু। চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারকানাথ লাহিড়ী প্রবন্ধ সাহিত্যে বুদ্ধধদেব বসু ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ৮০-৯২ স. উত্তম দাশ।

তারাপদ রায় পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রাতাময়ি ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ. ১১-১২ স. দেবকুমার বুস ও অন্যান্য।

দময়ন্তী বসু সিং ১. 'আমি হতাশ হয়েছিলাম শম্ভু মিত্র আগ্রহ না দেখানোয় ...' ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৯৫-১৯৮ স. অরূপ আশ; ২. তুলনামূলক সাহিত্য ও বুদ্ধদেব বসু : প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১৮১-১৮৪ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

দক্ষিণারঞ্জন বসু তরুণদের হিরো ॥ যুগান্তর ১৯৭৪ ১৯ মার্চ।

দিব্যেন্দু পালিত ১. আমরা ছেলেবেলা/আমর যৌবন : বুদ্ধদেব বসু (সমা) দেশ। ২. স্যার ॥ দেশ ১৯৭৪ এপ্রিল ৬ ৪১:২৩ পৃ. ৭৬৯-৭৭১ স. অশোককুমার সরকার ; ২. বুদ্ধদেব : বিষাদে, কৌতুক ॥ সাংস্কৃতিক খবর ৪৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৩৮-৩৯ স. কাজল চক্রবার্তী; ৩. বুদ্ধদেব বসু: স্মৃতি টুকরো ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাবনায় লোক-পৌরাণিক প্রতিফলন ॥ সাংস্কৃতিক খবর ৪৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৪০-৪২ স. কাজল চক্রবর্তী।

দিলীপ রায় বুদ্ধদেব বসু ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ ৫-৬ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

দিলীপকুমার সেনগুপ্ত অতিক্রমী বুদ্ধদেব ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৩৬-৩৭ স. বিমল রায় চৌধুরী।

দীপক কর বুদ্ধদেব বসু স্মরণে ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ. ৫-৬ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

দীপিকা হালদার বোদলেয়ার ও বুদ্ধদেব ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিণ ১০:২ পৃ. ২০১-২০৪ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

দেবী রায় বিতর্কিত বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবযানী রায়চৌধুরী ছোটদের নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

দেবকুমার বসু কবি ও কবিতার জন্য ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ. ১৪ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

দেবতোষ বসু দুটি আধুনিক কাব্যনাট্য ॥ অলিন্দ ১৩৭৪ বৈশাখ পৃ ৩৬ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর পন্যাস : ‘যে আধার আলোর অধিক ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রচর্চা॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৯-১১ স. বিমল রায় চৌধুরী।

দেবাংশু ঘোষ বৃত্তের মধ্যে জেগে থাকা পাণ্ডুর-চাঁদ জ্বালদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১. এক পয়সায় একটি : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৮৪ চৈত্র ৭ : ৪ পৃ ৫১-৫২ স. বুদ্ধদেব বসু; ২. ২২ শে শ্রাবণ : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৪৯ আশ্বিন ৮:১ পৃ ৪৫-৪৬ স. বুদ্ধদেব বসু।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ বুদ্ধদেব বসুর : এমিলিয়ার প্রেম ॥ বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮১ ২ বর্ষ পৃ. ২১৬-২৩১ সম্পাদকমণ্ডলী।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা শব্দ ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ২০৯-২২৫স. উত্তম দাশ; ২. বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ : কবিতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১. বুদ্ধদেব বুস ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ ৮৯৩-৮৯৫ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ২. বুদ্ধদেব ২. বুদ্ধদেব বসু : মানুষ ও লেখক ॥ যুগান্তর ১৯৭৪ মার্চ ১৯।

নবনীতা দেবসেন উলম থেকে লিখছি ॥ ‘বৈদগ্ধ্য’ বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১২৩-১২৪ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. চক্ষুরুন্মীলিতং যেন ॥ ৩০ নভেম্বর: কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ. ২১৩ স. প্রতিভা বসু।

নরেশ গুহ ১. কবির মৃত্যু ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫ : ১১ পৃ ৪১২; ২. কবির মৃত্যু ॥ কলকাতা ১৯৭৪ ৩: ১০-১১ পৃ ১০-১৪ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); (পুনর্মুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. গ্যেটের অষ্টম প্রণয় : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা (‘বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নাভানা প্রকাশিত) (সমা) কবিতা ১৩৬১ আষাঢ় ১৮:৪ পৃ. ২১৩-২২০ স. বুদ্ধদেব বসু; ৫. (শুভময় রায়ের পত্রের উত্তর) ॥ কবিতা পরিচয় ১৩৭৩ শ্রাবণ পৃ ১৩-১৪ স. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

নিখিলেশ গুহ মায়াবী টেবিল ও তারপর ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০:২ পৃ ১৮৯-২০০ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

নিরুপম চট্টোপাধ্যায় ১. কবিতাভবন : স্মৃতি ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ ১৮৮-১৯৩ স. প্রতিভা বসু। ২. শ্লীলতা অশ্লীলতার অবান্তর প্রসঙ্গে ‘সাড়া’ থেকে ‘যমুনাবতী’ ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ৯০-১০৪ স. জ্যোতির্ময় দত্ত।

নির্মলেন্দু ভৌমিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর মহাভারত রচনা ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৯৬৭-৯৮২ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রবীন্দ্রচর্চা, বুদ্ধদেব বসু ॥ কৃত্তিবাস ১৫ ১৩৬৮ পৃ. ৫২-৫৬ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

নীলিমা ইব্রাহিম চিত্তসত্তায় বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ২৬-৩৫ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

নীহাররঞ্জন রায় বিদেশিনী : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৪৯ চৈত্র ৮:৪ পৃ ২২৪-২২৬ স. বুদ্ধদেব বসু।

নৃসিংহ মুরারি দে কিছু অঘটন ও আপনি ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ২২৬-২৩৬ স. উত্তম দাশ।

পবিত্রকুমার ঘোষ বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যে প্রতারিত ও প্রতারক ॥ সৃজনী সংবাদ পূর্বখণ্ড ১৯৭৯ সেপ্টেম্বর ১৬ ১:১৭ অন্তখণ্ড ১৯৭৯ ডিসেম্বর ১৬ ১; ১৯ পৃ. ১৫-১৬; পৃ. ১৩-২৬ স. চিত্ত সিংহ।

পরিমল চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু স্মরণে ॥ সাহিত্য চিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩:২ পৃ. ১৭-২১ স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

পলাশ ভদ্র বুদ্ধদেব অনূদিত বোদলেয়ার ও অন্যান্য ফরাসি কবি ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল মহাভারতের কথা ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ১৪-১৭ স. বিমল রায় চৌধুরী।

পাপড়ি ভট্টাচার্য আমাদের শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিনাকী ঠাকুর জন্মান্তর থেকে নতুন জন্ম : 'ইক্কাকু সেন্নিন' ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৬৬-১৭০ স. অরূপ আশ।

পূর্ণেন্দু পত্রী ১. কালো চিঠি, সবুজ স্নেহ ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৪-৬ স. বিমল রায় চৌধুরী; ২. বুদ্ধদেব বসুঃ মুক্ত মনের মানুষ ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪ পৃ. ৭২; ৩. যতটুকু জানি ॥ সাংস্কৃতিক খবর ৪৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৪৩ স. কাজল চক্রবর্তী।

প্রাণবেন্দু দাশগুপ্ত ১. আমার শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু ॥ আজকাল (দৈনিক) ১৯৮৪ ৩; ২. কবিতার আন্তর্জাতিক সংখ্যা ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫ : ২১ পৃ ৪৫৯; ত. না-লেখা কবিতার প্রতি : ১ বুদ্ধদেব বসু কবিতা পরিচয় ১৩৭৩ বৈশাখ প্রথম সংকলন পৃ ১১-১২ স. অমরেন্দ্রচক্রবর্তী; ৪. 'যে আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে। কলকাতা ১৯৮৬ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ সংকলন পৃ ৪১-৪৮ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ)।

প্রতিভা বসু ১. বুদ্ধদেব বসু ॥ 'বৈদগ্ধ্য' বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ১-৮, অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলায় মহাভারতচর্চা ॥ দেশ ১৩৮১ কার্তিক ১৬ পৃ. ১৭-২৯ স. অশোক কুমার সরকার ; বাংলায় মহাভারত চর্চা। উত্তরাধিকার (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১৯-১২ পৃ ২১-২৫ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

প্রবুদ্ধ বাগচী 'কবিতা'র কথা ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

প্রভাতকুমার দাস ১. কবি বুদ্ধদেব বসু ॥ অব্যয় ১৯৭৬ এপ্রিল একাদশ সংকলন পৃ. ২৫-৩৩ স. অতীন্দ্রিয় পাঠক তপনলাল ধর। ২. 'কবিতা' শুধু কবিতার জন্য ॥ মাঝি ১৯৮২ নভেম্বর ত্রয়োদশ বর্ষ শরৎ সংখ্যা পৃ. ৯-৮৮ স. প্রশান্ত

রায়; ৩. 'কবিতা': 'নতুন কবিদের খেয়ার নৌকা ॥ কবিসম্মেলন শারদীয় অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ১২৪-১৩০ স. শ্যামলকান্তি দাশ; ৪. তরুণ কবিদের অভিভাবক ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব সংখ্য মে ১৯৯৯ পৃ. ২৪৭-১৫৮ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ৫. বুদ্ধদেব বসু : যে-আঁধার আলোর অধিক ॥ স্মরণাক্ষর ১৯৮৪ নভেম্বর ১ তৃতীয় সংখ্যা পৃ. ৫২-৫৫ স. অলকেন্দুশেখর পত্রী; ৬. বুদ্ধদেব বসু : তাঁর নাট্যচর্চার পূর্বপর ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৮৪-১৯৪ স. অরূপ আশ; ৭. বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দ : সম্পর্কের খতিয়ান ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ ১৮৯-২০১ স. উত্তম দাশ: ৮. রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব সম্পাদিত 'কবিতা/একটি বিরোধ ও বন্দনার ইতিহাস ॥ সিদ্ধার্থ ১৯৮৩ বৈশাখ ২৫ পৃ. ২-৫ স. দেবতোষ বসু; ৯. সমকালীন কবি জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব : মিল অমিল ॥ জীবনানন্দ আকাদেমী পত্রিকা ১৯৮৫ আগস্ট ৩০ পৃ ৫০-৬০স. তাপস বসু; ১০. সমকালের বন্ধুত্ব জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব ॥ সিদ্ধার্থ ১৩৯১ বৈশাখ ২৫ পৃ ২-৫ স. দেবতোষ বসু ১১. সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু : 'কবিতা' পত্রিকার পঁচিশ বছর ॥ দরোজা ১৯৭৫ ফেব্রুয়ারি ২য় সংকলন পৃ. ৩৩-৬২ স. পুরকায়স্থ; ১২. প্রগতি ও কবিতার উজ্জ্বল অধিনায়ক : বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রভাত মিশ্র তবু বুদ্ধদেব ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

প্রভাস রায় চৌধুরী বুদ্ধদেবের কবিকৃতি ॥ গোধূলি মন ১৯৮৭ জানুয়ারি ১৩৯৩ পৌষ-মাঘ ২৯:১ পৃ. ৪-২১ স. অশোক চট্টোপাধ্যায় : ২. বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য॥ মারীচি ১৩৯৩ শারদীয়।

প্রমথ চৌধুরী 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (সমা)॥ বিচিত্র ১৩৪২ অগ্রহায়ণ কলকাতা বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৬৮ ডিসেম্বর–১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ ১২৯-১৩২ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ)।

প্রশান্ত দাঁ মুখোমুখি (সাক্ষাৎকার) ॥ অন্বেষ্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১৩৮৭ মাঘ পৃ. ৭৭-৮০ স. বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম পরিচয়ের কালে ॥ যুগান্তর (দৈনিক) ১৯৭৪ মার্চ ১৯।

ফণিভূষণ আচার্য সেই অমোঘ চিত্ররথ ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৩১-৩৩ স. বিমল রায় চৌধুরী।

ফাদার রবার্ট আঁতোয়ান আমার চোখে বুদ্ধদেব ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫ : ১ পৃ. ৪১১।

বিকাশ চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ॥ জিজ্ঞাসা ১৩৮৮ বৈশাখ-আষাঢ় ২:১ পৃ. ৫৮৪-৫৯৮ স. শিবনারায়ণ রায়।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় ১. কিছু প্রশ্ন ছিল ॥ সমানুগ ১৩৮০ চৈত্র মার্চ ১৯৭৪ ৩:৬ পৃ ১৩ও ১৪ স. দেবকুমার বসুও অন্যান্য ২. বুদ্ধদেব বসুর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও মেঘদূত প্রসঙ্গে ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ১২-১৩স. বিমল রায় চৌধুরী; বুদ্ধদেব বসুর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও মেঘদূত প্রসঙ্গ ॥ উত্তরাধিকার ৯পুর্নমুদ্রণ) ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ৮৬-৮৯ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

বিনয় মজুমদার ১. বুদ্ধদেব বসু ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ ৬-৭ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য, ২. বুদ্ধদেব বসুর মুখোমুখি ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৬ মে স. বিমল রায় চৌধুরী।

বিপ্রদাপ বড়ুয়া 'বিপন্ন বিসময়' ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ১৬২-১৬৭ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

বিমল কর নিঃসঙ্গ ॥ দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৬ বৈশাখ ২৫ ২৬:২৮ পৃ. ১৮১-১৮৬ স. অশোককুমার সরকার।

বিশু মুখোপাধ্যায় বিদগ্ধ সন্দর্ভ শিল্পী বুদ্ধদেব ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ ৯৮৩-৯৮৬ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ১. বুদ্ধদেব বসু শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ কালি ও কলম পঞ্চম বর্ষ : দশম সংখা, অগ্রহায়ণ ১৪১৫, ২. বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে ঢাকা শহর ॥ বুদ্ধদেব বসু শ্মারকগ্রন্থ, কলকাতা, ২০০৯

বিশ্বজিৎ রায় ব্যাক্তি বনাম দল ॥ আনন্দবাজার পত্রিকা জানুয়ারি ২০০৮ স. অভীক সরকার।

বিদ্যুৎ পাল শিশুসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু ॥ জ্বরদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

বিপ্লব মাজী বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কবিতা ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

বিষ্ণু দে ১. একটি কথা : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৯ মাঘ ২:৩ ৫০৯ স. সুধীনাথ দত্ত; ২. অ্যান একর অফ গ্রিন গ্রাস : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ সাহিত্যপত্র ১৩৫৫ শ্রাবণ ১:১ পৃ ৬৯-৮৬ স. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু : ছোটগল্পের ভুবন ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেলাল চৌধুরী ফিরে দেখি ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ১৮৫-১৯২ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ৭০-৭৩ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

ভবতোষ দত্ত বুদ্ধদেব বসু : স্কুল আর কলেজে। বুদ্ধদেব বসু : স্কুল আর কলেজে॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ ৩১-৩৬ স. প্রতিভা বসু।

ভবানী মুখোপাধ্যায় ১. দ্বীপের মানুষের বুদ্ধদেব ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৯৬৩-৯৬৬ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ২. বুদ্ধদেব বসু॥ অমৃত ১৩৭৬ বৈশাখ ২৬ ২৬ পৃ. ১৩৪।

মধুসূদন সান্যাল কবিতাভবন থেকে সাফল্য ও ব্যর্থতা ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০:২ পৃ. ২০৫-২৩৮ স. সঞ্জীবকুমার বসু।

মণীন্দ্র রায় ২২ শে শ্রাবণ : বুদ্ধদেব বসু ॥ পরিচয় ১৩৪৯ ভাদ্র ১২:১ পৃ. ১৬২-১৬৪

মন্দাক্রান্তা সেন প্রথম পার্থ : প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৩১-১৩৬ স. অরূপ আশ।

মন্দার মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

মঞ্জুভাষ মিত্র বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ৫৫-৬৭ স. উত্তম দাশ।

মলয় মুখোপাধ্যায় নাট্যকার বুদ্ধদেব/ছিন্ন ভাবনা ॥ সিদ্ধার্থ ১৩৮২ তৃতীয় বিশেষ সংখ্যা পৃ. ৬৭-৭৩ স. দেবতোষ বসু সুদীপ্ত চক্রবর্তী।

মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ১. বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৮ অক্টোবর-সেপ্টেম্বর পৃ. ৯-১১ স. বিমল রায় চোধুরী।

মানসকুমার কুণ্ডু বুদ্ধদেবের 'বাস্তব' ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১. বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের লেখা ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ১০৫-১১২ স. জ্যোতির্ময় দত্ত; ২. 'বড়ো হওয়া' ॥

মানসী দাশগুপ্ত ১. আলোর অধিক অন্ধকারের আধুনিক ভাষ্য কথা ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ৪৭-৫০, অ. স. দময়ন্তী বসু সিং ; ২. বুদ্ধদেব বসুর নায়ক সন্ধান (অনুবৃত্তি) ॥ জিজ্ঞাসা ২০:৪ পৃ ৪২১-৪৩০ স. শিবনারায়ণ রায়; ৩. সাক্ষীর অভিজ্ঞতা (রাত ভ'রে বৃষ্টি) ॥ কলকাতা ১৯৭৩ ৩:৮ পৃ ৮৬-৯১ স. জোতির্ময় দত্ত; ৪. সেই সব দিনে : সাক্ষীর আত্মকথা ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

মাহমুদ কামাল দ্বিতীয় পাঠের তিথিডোর ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭, পৃ ১০৪-১০৭ স. উত্তম দাশ।

মিল্টন বিশ্বাস বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' : ভিন্নপাঠের প্রত্যাশায় ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১০০-১১২ স. অরূপ আশ।

মেঘনাদ ঘোষাল রাত্রির ভাস্কর্য শিল্পী ॥ রাত্রির ভাস্কর্য শিল্পী ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ. ২৩৭-২৪২ স. উত্তম দাশ।

মীনাক্ষী দত্ত ১. আমার বাবা বুদ্ধদেব বসু ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ মে পৃ. ৮১-৮৯ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. আমাদের ২০২ ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৯ ২:১১-১২ পৃ ২২০-২৩৬ স. প্রতিভা বসু।

মুহম্মদ মতিউল্লাহ বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর 'কবিতা' : দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর ২:১১-১২ পৃ ১৪৯-১৫১ স. নীলিমা ইব্রাহিম; (পুনর্মুদ্রন) অমৃতলোক ১১১, অক্টোবর ২০০৭ ৩৩ : ১ পৃ ৪৪-৪৭ স. সমীরণ মজুমদার।

যশোধরা রায় চৌধুরী কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, আমরা.... ফিরে তাকানো ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১. অবিকল্প ॥ সংবাদ প্রতিদিন (ছুটি) ২ ডিসেম্বর ২০০৭ রবিবার স. সৃঞ্জয় বস্যু ; ২. বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে। কল্পবানী ১৩৭৭ ভাদ্র আশ্বিন ১:২ পৃ ২৫-৪৭ স. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঞ্জিৎ সিংহ বুদ্ধদেব বসু– একটি শ্রদ্ধেয় নাম ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ. ২-৩ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

রবিশংকর বল অর্ফিয়ুসের বাঁশি ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নবীন কবি' ॥ বিচিত্র কার্তিক ১৩৩৮; 'নবীন কবি' কলকাতা বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৬৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংখ্যা পৃ. ৫৫-৫৬ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ)।

রবীন্দ্রনাথ সেন ১. প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ভাবনা ॥ ৩০ নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ ৬৩-৭৭ স. প্রতিভা বসু; ২. শেষ পর্যায়ে কবিতা পত্রিকার আলোকে বুদ্ধদেব বসু॥ ধ্রুপদী ১৩৮১ বৈশাখ-আষাঢ় ১২:১-৩ পৃ. ১-৯ স. সুশীল রায়

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী ১. বুদ্ধদেব বসুর কবিতাঃ দ্রৌপদীর শাড়ি (সমা) ॥ কবিতা ১৩৫৯ পৌষ ১৭:২ পৃ ১১৬-১২৯ স. বুদ্ধদেব বসু; ২. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : যে আঁধার আলোর অধিক (সমা) ॥ কবিতা ১৩৬৫ চৈত্র ২৩:৩ পৃ. ১৫৫-১৬৩ স. বুদ্ধদেব বসু।

রশীদ করীম তিনি একটু অন্য রকম ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ১৩৪-১৪৮ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

রাজা মিত্র পটভূমি : 'একটি জীবন' ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ২৭৭-২৮০ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

রাজা ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের ছোটগল্প ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

রানা চট্টোপাধ্যায় কালের পুতুল ও অন্য কিছু প্রবন্ধ ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামরঞ্জন রায় 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' : বুদ্ধদেব বুস ॥ জ্বালদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

রুদ্র কিংশুক বুদ্ধদেব বসু-র ছোটগল্পের অন্তর্জগত ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

লায়েক আলি খান নাট্যকার বুদ্ধদেব ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

শংকর চট্টোপাধ্যায় শীতের প্রার্থনা... ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ২০-২২ স. বিমল রায় চৌধুরী।

শঙ্খঘোষ ১. ছন্দের বারান্দা ॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ৬৭-৭৭ স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); ২. বুদ্ধদেবের স্বধর্ম ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ৫৭-৬৪ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; (পুনর্মুদ্রণ) ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

শম্পা ভট্টাচার্য বসু অধরা মাধুরী ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ১৭৯-১৮৩ স. অরূপ আশ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১. বড় মনের মানুষ ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ. ১-২ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য; ২. বুদ্ধদেব বসু : কবি ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ২৩-২৫ স. বিমল রায় চৌধুরী; বুদ্ধদেব বসু : কবি ॥ উত্তরাধিকার (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ৭২-৮৫ স. নীলিমা ইব্রাহিম; বুদ্ধদেব বসু : কবি॥ অমৃতলোক (পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩:১, পৃ. ৩৪-৩৯ স. সমীরণ মজুমদার।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ১. শিশিরকুমার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কিছু কথা ॥ সমতট ৭৫-৭৬ ১৯৮৮ জানুয়ারি-জুন ১৯ : ৩-৪ পৃ. ৩০১-৩০৪ স. অর্ঘ দত্তগুপ্ত ও অন্যান্য; ২ বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প : ১৯৬০-১৯৭২ ॥ সন্ধিৎসা নভেম্বর ২০০৭; ৩. বিশশতকের পাশ্চাত্য সাহিত্য আধুনিকতার সমস্যা ও বুদ্ধদেব বসু ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাষিস চক্রবর্তী।

শান্তি লাহিড়ী মানুষ বুদ্ধদেব ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ. ৩৪-৩৫ স. বিমল রায় চৌধুরী।

শান্তিকুমার ঘোষ আমার অীবজ্জতায় বুদ্ধদেব বসু ॥ বররুচি ১৩৮৩ বৈশাখ পৃ ২-৪ স. মদনমোহন বৈতালিক শ্যামলকান্তি দাশ।

শামসুর রাহমান ১. বুদ্ধদেব বসু, তাঁর স্মৃতির তীর্থে ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ৫১-৫৬ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; (পুনর্মুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাহাবুদ্দীন আহমেদ বুদ্ধদেব বসু : বোদলেয়ার ও 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর অনুবাদ ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ৩৬-৬২ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

শিবনারায়ণ রায় ১. বাংলা গদ্য ও বুদ্ধদেব বসু॥ বৈদগ্ধ্য মে ১৯৯৯ পৃ ৯-১৬, অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. বুদ্ধদেব বসু : কয়েকটি স্মৃতি ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ ১৯৪-৩৯৯ স. প্রতিভা বসু।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কথা ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ৬৫-৬৮ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

শ্যামল ঘোষ প্রসঙ্গে কাব্যনাট্য বুদ্ধদেব বসু ও আকাশবাণী ॥ তাঁতঘর একুশ শতক ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ. ৫৭-৭১ স. অরূপ আশ।

শুদ্ধশীল বসু ১. সেই দিন ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৮৬ অক্টোবর-ডিসেম্বর পৃ ৯-১১ বিমল রায়চৌধুরী।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু বুদ্ধদেব বসু ॥ সময়ানুগ ১৩৮০ চৈত্র ১৯৭৪ মার্চ ৩:৬ পৃ ১০ স. দেবকুমার বসু ও অন্যান্য।

শুভময় রায় (নরেশ গুহর আলোচনা বিষয়ে পত্র) ॥ কবিতা পরিচয় ১৩৭৩ আষাঢ় পৃ. ১৩-১৪ স. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

শুভাশিস চক্রবর্তী উপেক্ষিত কান্তিকুমার ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

শুভেন্দু দাশমুন্সী ১. ছোট-বড়র দ্বন্দ্ব : ছোটদের বুদ্ধদেব ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯-পৃ ২৯৯-৩০৫ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

শৌনক চক্রবর্তী আমার বুদ্ধদেব বসু ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ৩০৬-৩০৮. অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

শেখর সমাদ্দার তপস্বী ও তরঙ্গিণী : নাট্য ও কাব্যের মিলন॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ ৯১-৯৯, স. অরূপ আশ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১. দ্রৌপদীর শাড়ি : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ চতুরঙ্গ ১৩৫৫ শ্রাবণ পৃ. ২৭৮-২৮৩ স. হুমায়ুন কবীর; ২. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ॥ নিরুক্ত ১৩৫০ চৈত্র ৪:৩ পৃ ১১১-১১৭ স. প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টচার্য, ৩. বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা (সমা) ॥ পূর্বাশা ১৩৬০ বৈশাখ পৃ. ৫৯-৬০ স. সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অশ্লীলতার কাব্য? ॥ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৩৯ ; অশ্লীলতার কাব্য? কলকাতা বুদ্ধদৈব বসু সংখ্যা (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংখ্যা পৃ ৫৪-৬৬ স. জ্যোতির্ময় দত্ত।

সন্তোষ চকদার উপন্যাসে আইডিয়া : বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ॥ চতুরঙ্গ ১৯৮৭ সেপ্টেম্বর ৪৮ : ৫ নি. স. আবদুর রউফ।

সন্তোষ প্রতিহার ১. দময়ন্তী : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ কবিতা ১৩৫০ চৈত্র ৯:৪ পৃ ১৯২-২০৯ স. বুদ্ধদেব বসু; ২. মেঘদূত ও তার অনুবাদ ॥ কবিতা ১৩৬৪ আষাঢ় ২১:৪ পৃ ২৭২-২৮৬ স. বুদ্ধদেব বসু।

সন্তোষকুমার ঘোষ ১. শীতের কাছে প্রার্থনা ॥ কলকাতা বুদ্ধদেব বসু সখ্যা ১৯৮৬ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম পৃ জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); ২. সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব ॥ দেশ ১৯৭৮ এপ্রিল ৬ ৪১:২৩ পৃ ৭৫৭-৭৬৩ স. অশোক কুমার সরকার; সঙ্গ; নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব॥ উত্তরাধিকার (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ৬৩-৬৯ স. নীলিমা ইব্রাহিম; (পুনর্মুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩. সাহসী, সপ্রাণ ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫:১১ পৃ. ৪১৩।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪ পৃ. ৬১ সমীর দাশগুপ্ত ব্লুমিংটনের একরাত ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫:১১ পৃ ৪১৬-৪৫১।

সমীর রায়চোধুরী বুদ্ধদেব বসু : জীবনে যেভাবে তাঁকে দেখেছি॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ, জীবনানন্দের বুদ্ধদেব ॥ বৈদগ্ধ্য বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ৭৮-৮০ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং। (পুনর্মুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমীর গেনগুপ্ত ১. যে আঁধার আলোর অধিক ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১৩২-১৪১ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. প্রথম পার্থ ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি পৃ. ১১৯-১৩০ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

সমীরণ মজুমদার প্রসঙ্গ কাব্যনাটক : রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন কবি ॥ বোধ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ১. 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', বুদ্ধদেব বসু আর এক নোটে ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ২৬৮- ২৭৬ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ২. বুদ্ধদেবের কাব্যানাট্য : থিয়েট্রেন-এর চর্চা। (গণনাট্য মার্চ-এপ্রিল ২০০২ থেকে আংশিক পুনর্মুদ্রণ) তাঁতঘর একুশ শতক ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ ৭২-৮০ স. অরূপ আশ।

সংহিতা শ্রীমানী বন্ধু ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবার্তী।

সায়ন্তন ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের কবিতা : 'একটু আলো, একটু ছায়া'॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সিকদার আমিনুল হক বুদ্ধদেব বসু : কবি ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ১৭৪-১৮৩ স. নীলিমা ইব্রাহিম।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ॥ উত্তরাধিকার ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ : ১১-১২ পৃ ৯০-৯৫ স. নীলিমা ইব্রাহিম। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু (পুনর্মুদ্রণ) অমৃতলোকে ১১১ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩:১ পৃ. ৪০-৪৫ স. সমীরণ মজুমদার।

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ১. কবি বুদ্ধদেব বসু ও প্রকৃতিবোধ ॥ অন্যমন ১ ১৯৮১ মে; ২. সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর রবীন্দ্রদৃষ্টি ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৯৮৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩:১ পৃ. ১৪৫-১৫০ স. সঞ্জীবকুমার বসু; ৩. কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসু : কবির অভিজ্ঞতা ॥ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ২২:৩-৪ ১৩৯১।

সুকুমার রায় স্মৃতিচারণ॥ সাহিত্যচিন্তা ১৯৭৪ এপ্রিল-মে ৩:২ পৃ. ২২-২৪ স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

সুখময় সোম তপস্বনী ও তরঙ্গিণী : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ সারস্বত ১৩৭৩ বৈশাখ ১:১ পৃ ৫৪-৬১ স. দিলীপকুমার গুপ্ত ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

সুমিত বসু 'গ্রহণ'-এ বর্জনে বুদ্ধদেব ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সুচেতা মিত্র জীবন যেখানে কবিতা ॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন ১৯৭৪ পৃ ২৬-২৭ স. বিমল রায় চৌধুরী।

সুজয়কুমার মাইতি 'নোয়াখালি': বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতির স্বর্ণরেণু ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী আগুন-জল ও মুমূক্ষার কথা॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সুতপা ভট্টাচার্য ১. কবির চোখে : বুদ্ধদেব বসু–রবীন্দ্রনাথ ॥ দেশ (ধারাবাহিক) ১৩৮৩ ফাল্গুন ৭, ১৪, ফাল্গুন ২১ ২৪৯-২৫৬ পৃ. ২৯৩-২৯৮ স. সাগরময় ঘোষ; ২. বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ ॥ কোরক ১৪১৪ শারদ সংখ্যা পৃ. ৫৩০-৫৩৬ স. তাপস ভৌমিক।

সুধীরকুমার চৌধুরী রেখাচিত্র : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৮ কার্তিক ১:৪ পৃ. ৬৮৭-৬৯৩ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; রেখাচিত্র; বুদ্ধদেব বসু (সম)॥ পরিচয় (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৮১ মে-জুলাই সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন পৃ ৮৫-৯৪ স. দেবেশ রায়।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পত্রবিনিময় ॥ বেতার জগৎ ১৯৭৪ মে ২২ ৪৫-১১ পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১. আমাদের ঋণ। দেশ ১৯৭৪ এপ্রিল ৬ ৪১:২৩ পৃ ৭৬৫-৭৬৭ স. অশোককুমার সরকার; আমাদের ঋণ॥ উত্তরাধিকার (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ ৭৪-৭৮ স. নীলিমা ইব্রাহিম; (পুনমুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যার স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; ২. টুকরো টুকরো স্মৃতি ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৭ পৃ ৫৫-৬১ স. প্রতিভা বসু: ৩. বুদ্ধদেব বসু ও উত্তরাধিকার ॥ কৃত্তিবাস ১৩৬৫ একাদশ সংকলন পৃ ৩-৮ স. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়; ৪. জীবন্ত বুদ্ধদেব বসু ॥ সাংস্কৃতিক খবর জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৪১-৪২ স. কাজল চক্রবর্তী; ৫. স্বপ্নে ভেসে আসে ॥ বৈদগ্ধ্য বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ৬৯-৭০ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

সুনীল কুমার নন্দী বুদ্ধদেব বসু : প্রসঙ্গ, শেষের কবিতা ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ১. ‘একদিন : চিরদিন’-এর বুদ্ধদেব ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০:২ পৃ ১৬৩-১৭৪ স. সঞ্জীবকুমার বসু; ২. বিশেষণ-প্রিয়তায় বৌদ্ধিক বাক্‌বিধি ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুব্রত রায়চৌধুরী জাপান, অনুভবে দুই কবি রবীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেস সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সুবীর রায় চৌধুরী ১. আধুনিকতা বনাম রুচিবিকার : বুদ্ধদেব ও শনিবারের চিঠি ॥ হীনযান ১৩৮১ আশ্বিন ১:৩ পৃ ৩৭-৫১ স. সুভাষ ঘোষাল ; ২. ‘ক্যালিওপের সীমানা ছাড়িয়ে’ ‘মহাভারতের কথা’॥ যাদবপুর জার্নাল অফ কমপিরেটিভ লিটারেচার ১৯৭৫ পৃ ১৫১-স. নরেশ গুহ; ৩. বুদ্ধদেব বসু; ‘প্রগতি’ থেকে ‘প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ॥ কলকাতা ২০০০ ১৩৯১ নববর্ষ ১:৮-৯ পৃ ২৪-৬২ স. জ্যোতির্ময় দত্ত। ৪. বুদ্ধদেব বসুর গদ্য ॥ কলকাতা ১৯৭৪ : ১০-১২ পৃ ২৭-৪৫ স. জ্যেতির্ময় দত্ত; (পুনর্মুদ্রণ) ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; ৫. বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি ॥ ৩০ নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী ১৯৮৬ পৃ. ৯৫-১০০ স. প্রতিভা বসু; ৬. বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ (সাক্ষাৎকার) ॥ দৈনিক কবিতা ১৯৬৮ অক্টোবর-ডিসেম্বর পৃ. ৯-১১ স. বিমল রায় চৌধুরী ৭. সাদৃশ্যের সন্ধান : ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ এবং রাত ভ’রে বৃষ্টি’ ॥ শব্দমন্ত্র বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা ১৯৭৬ পৃ. ৭৮-৮২ স. আনন্দ রায় অতীন্দ্র রায়।

সুভদ্রকুমার সেন কবি, কবিতা ও বুদ্ধদেব বসু ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ১৯৩-২০৭ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং।

সুমন গুন ১. বুদ্ধদেব বসু ঘটণাপ্রবণ কবিতা : সুরম্য ও আমন্ত্রণময় ॥ বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ. ২৮৪-২৯৮ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং ২. বুদ্ধদেব বসু: বাংলা সংস্কৃতির শিরোধার্য বৈদুর্য ॥ চান্দ্রমাস নভেম্বর ২০০৭ ২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা স. গৌরশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়; ৩ সঙ্গ ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিষ চক্রবর্তী।

সুভাষ ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূত' ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শাপভ্রষ্ট দেবশিশু॥ কলকাতা ১৯৬৮ ডিসেম্বর-১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ সংকলন পৃ ২৫-৩০ স. জ্যোতির্ময় দত্ত।

সুরঞ্জন চৌধুরী মরচে-পড়া পেরেকের গান॥ আজকাল শারদ সংখ্যা ১৪১৪ পৃ ৩০৫-৩০৯ স. অশোক দাশগুপ্ত।

সুমিতা চক্রবর্তী ১. চিন্তনমূলক রচনা ও বুদ্ধদেব বসু॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ ৬৮-৭৯ স. উত্তম দাশ; ২. বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প॥ বৈদগ্ধ্য বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ২৫৯-২৬৭ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং; ৩. বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : রোমান্টিক অভিনবত্ব ॥ জ্বলদর্চি জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭ ১৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, স. ঋত্বিক ত্রিপাঠী।

সুবোধ সরকার 'ফিরে আসে আবার সেই পাপের মধ্যে বাঁচতে'/'পরগৌরি' থেকে 'প্রায়শ্চিত্ত' ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ ১৬২-১৬৫ স. অরূপ আশা ॥

সুশান্ত চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ॥ মহাদিগন্ত ৯২ শারদীয় ২০০৭ পৃ ২০২-২০৮ স. উত্তম দাশ।

সমুনা দাস সুর গোলাপ কেন কালো : আলো ও অন্ধকারের স্বরলিপি॥ এবং মুশায়েরা ১৪১৪ শারদীয় ১৪:২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ পৃ ১৯-৩১ পৃ ১৯-৩১ স. সুবল সামন্ত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত পৃথিবীর প্রথম যৌবন॥ দৈনিক কবিতা বুদ্ধদেব বসু সংকলন-১৯৭৪ পৃ ১৮-২০ স. বিমল রায় চৌধুরী।

সুশীল রায় ১. বুদ্ধদেব বসু স্মরণে॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ ৯৮৯-৯৯১ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ২. সম্পাদকের কথা/বুদ্ধদেব বসু ধ্রুপদী ১৯৮১ বৈশাখ-আষাঢ় ১২-:১-৩ পৃ ২২-২৪ স. সুশীল রায়।

সোমা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী ভোজনরসিক বু. বু. ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

সোমেন ঘোষ দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখে : বুদ্ধদেব বসু ॥ সত্তর দশক ১৯৭৪ অক্টোবর ১৩৮১ শরৎসংখ্যা পৃ. ৯৪-১০৬ স. জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন সেন।

সোমন্দ্রেনাথ বসু বুদ্ধদেব বসু ও রবীন্দ্রালোচনা দু একটি কথা॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৯১৯-৯২২ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সৌমিত্র বসু বুদ্ধদেবের কালসন্ধ্যা : অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন ॥ তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায় ১০-১১ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ পৃ ১৪১-১৪৬ স. অরূপ আশ।

স্বপন মজুমদার ১. বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থপুঞ্জি (কালানুক্রমিক) ॥ কালকাতা ১৯৬৮-ডিসেম্বর ১৯৬৯ জানুয়ারি ৭-৮ যুগ্ম সংকলন পৃ. ১১১-১৫১. স. জ্যোতির্ময় দত্ত (অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ); বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থপুঞ্জি উত্তরাধিকার (পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২:১১-১২ পৃ. ২৩৯-২৫৬ স. নীলিমা ইব্রাহিম; ২. বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থপুঞ্জি ১৯৬৮ ১৯৬৮-৭৪ ॥ কলকাতা ১৯৭৪ ৩:১০-১১ পৃ ১৫-১৮ স. জ্যোতির্ময় দত্ত; ৩. সম্পাদিক বুদ্ধদেব বসু ॥

বৈদগ্ধ্য বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা মে ১৯৯৯ পৃ ২৩৯-২৪৬ অ. স. দময়ন্তী বসু সিং। (পুনর্মুদ্রণ) অমৃতলোক ১১১ অক্টোবর ২০০৭ ৩৩:১ পৃ. ৭৮ স. সমীরণ মজুমদার।

হরপ্রসাদ মিত্র ১. বুদ্ধদেব বসু ১৯.৮-১৯৭৪॥ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১৩৮১ বৈশাখ-আষাঢ় ১২:২ পৃ ১২২-১৩২ স. রমেন্দ্রনাথ মল্লিক; ২. ভাষা শিল্পী বুদ্ধদেব ॥ কালি ও কলম ১৩৮১ বৈশাখ ৭:৯ পৃ. ৮৯৭-৯১১ স. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিরণকুমার সান্যাল ১. এক পয়সায় একটি : বুদ্ধদেব বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৪৮ বৈশাখ ১১:৩ পৃ ২৬০-২৬২ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; ২. প. পৃথিবীর পথে : বসু (সমা) ॥ পরিচয় ১৩৩৯ কার্তিক ৩:২ পৃ ২৭৮-২৮২ স. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; ৩. সব পেয়েছিল দেশে : বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য ও আমার বর্ণপরিচয়সুলভ কিছু ভাবনা ॥ অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা স. শুভাশিস চক্রবর্তী।

বুদ্ধদেব বসু বিষয়ক গ্রন্থ

অমিয় দেব বুদ্ধদেব বুস (সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ১৬০ নং গ্রন্থ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা প্র. প্র. মাঘ ১৪১২ দাম : ৪০ পৃ. (৪) + ১২৪।

আনন্দ রায় (সম্পাদক) বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ ॥ বর্ণালী, কলকাতা প্র. প্র. মার্চ ১৯৭৮ দাম ১৫ টাকা পৃ (৬) + ১৯১।

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার/বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভূমিকা ॥ মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্র. প্র. আগস্ট ১৯৮০, দাম ১৭ টাকা পৃ. ১৬+১৭৬+ (৩)।

জগন্নাথ ঘোষ নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু ॥ শিশির কুমার ভাদুড়ি ইনস্টিটিউট অফ ড্রামাটিক রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, কলকাতা প্র. প্র. ১০ নভেম্বর ১৯৭৮ দাম ৮ টাকা পৃ. ৯৬।

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে ॥ কলকাতা, প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৮৮ দাম : ৫০ টাকা পৃ. (৮) + ৩১৮।

প্রভাতকুমার দাস 'কবিতা পত্রিকা : সূচীগত ইতিহাস' ॥ প্যাপিরাস কলকাতা-৪, প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ দাম: ৫০ টাকা পৃ. (১৮) + ২২৯।

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু : কাব্যনাটক ॥ পাইওনিয়ার পাবলিশার্স কলকাতা প্র. প্র. রথযাত্রা ২৮ জুন ১৯৮৭ দাম ১৫ পৃ. (৮) + ৯৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ন ॥ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৯৭ মূল্য : ১১০.০০ পৃ. ৩৪৪

ভুঁইয়া ইকবাল বুদ্ধদেব বসু ॥ বাংলা একাডেমী ঢাকা, মাঘ ১৩৯৮ দাম : ২০ টাকা পৃ. ১৯০।

মাহবুব সাদিক বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ ॥ বংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৯১, মূল্য : ১২০.০০ পৃ. ৪০৩

শুভাশিস চক্রবর্তী (সম্পাদিত) বিপন্ন বিস্ময় : শতবর্ষের ॥ অহর্নিশ প্রকাশনা, অশোকনগর, প্র. প্র. ৪. ফেব্রুয়ারি ২০০৮ দাম : ১৫০ টাকা পৃ. ৩৪৮।

সমীর সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বসুর জীবন ॥ বিকল্প প্রকাশনী কলকাতা-৩ , প্র. প্র. ৩০ নভেম্বর ১৯৯৮ দাম : ২০০ টাকা পৃ. (৩৪) + ৩৯৬।

সুদক্ষিণা ঘোষ বুদ্ধদেব ॥ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কলকাতা-২০ প্র. প্র. ২০ মে ১৯৯৭, দাম : ৩০ টাকা, পৃ. (৬) + ১৪১।

ALOKERANJAN DASGUPTA BUDDHADEVA BOSE Sahitya Akademi new Delhi First Published 1977 Price Rs. 2.50 pp. (8)+71.

(রচনাটি ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও প্রভাতকুমার দাস–এর গবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত। প্রভাতকুমার দাস-এর লেখাটি 'অহর্নিশ'–এর বুদ্ধদেব বসু সংখ্যায় এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ–এর লেখাটি *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* শীর্ষক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।

বুদ্ধদেব বসু